অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

...১...

খাঁচার দরজাটা খুলে দিতেই ব্যস্ত পায়ে ঢুকে পড়ল কাকলি। আর তক্ষুনি কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে হাজির সুকান্ত।

লিফ্‌টম্যান এক পলক তাকাল আগন্তুকের দিকে। কিন্তু সুকান্ত তাকে দ্বিধা করতে দিল না এতটুকু। অবধারিতের মত ঢুকে পড়ল।

উপায় নেই, প্রায় গা ঘেঁষেই দাঁড়াল কাকলির।

অন্তত, একে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ানোই বলে। একটা চারকোনা বাক্স, জায়গা কম, এ কে না জানে। তবু এরই মধ্যে বরাদ্দ দূরত্ব রাখা অসম্ভব ছিল না, শালীন দূরত্ব। লিফ্‌টম্যানের ওপাশের দেয়ালের দিকে হেলতে পারত অনায়াসে। এ যেন হৃৎপিণ্ডে মারবে বলে ছুরি উঁচিয়ে এসেছে। কিংবা শাড়ির বুনটটা হাতে নিয়ে উদাসীন মমতায় দেখবে পরখ করে। দাম জিজ্ঞেস করবে।

বিরক্ত মুখে কাকলি বললে, 'আপনি! আপনাদের—'

'হ্যাঁ, আমাদের, ছেলেদের বারণ। তবে যারা রুগ্ন, যাদের হার্ট দুর্বল—'

'আপনি কি রুগ্ন?'

কাকলির চোখে একটু বা প্রশংসার রঙ মাখা।

'না।' হাসি-হাসি মুখে সুকান্ত বললে, 'তবে, বলতে বাধা নেই, হৃদয় বড় দুর্বল।'

'হার্টের মানে বুঝি হৃদয়?' বলবে না ভেবেছিল তবু কথার পিঠে বলে ফেলল কাকলি।

'আরো একটা মানে করা যায়।' বললে সুকান্ত: 'আঘাত। প্রহার। যন্ত্রণা।'

কথা বললেই কথা বাড়ে, চুপ করে রইল কাকলি। কয়েক সেকেণ্ডের তো মামলা। এখুনি উঠে আসবে তেতলা। বারোটা চল্লিশে তার ক্লাশ।

'কিন্তু এখন হার্টের যে অবস্থা, মানে যে রকম বুক কাঁপছে, সহজেই ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে, সিঁড়ি ভাঙা বিপজ্জনক লিফ্‌টই প্রশস্ত।' বুক ফুলিয়ে নিশ্বাস নিল সুকান্ত: 'তবে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ না করলে কিছু হবার নয়।'

কাকলি চোখ নিচু করে রইল।

কিন্তু, এ কি, লিফ্‌ট হঠাৎ আটকে গেল মাঝখানে। দোতলা আর তেতলার মধ্যে। ঘোর-ঘোর আধছায়ার রাজ্যে।

'কি সর্বনাশ!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কাকলি।

'কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।' লিফ্‌টম্যানের হয়েই যেন বললে সুকান্ত।

তার কথা কে গ্রাহ্য করে? সে তো চালাচ্ছে না। সে কলকব্জার জানে কি!

'কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে?' চোখ কপালে তুলে লিফ্‌টম্যানকে জিজ্ঞেস করলে কাকলি।

'কল বিগড়ে গিয়েছে।' নিশ্চেতনের মত বললে লিফ্‌টম্যান।

এ যেন তেমনি একটা নিস্পৃহ-নিশ্চল থাকবারই অবস্থা। দু হাতের মুঠি তুলে অস্থিরের মত কাকলি বললে, 'তা হলে কী হবে?'

'যতক্ষণ না কারেন্ট আসে অপেক্ষা করতে হবে।' বললে সুকান্ত।

'আর যদি অন্য কোনো গোলমাল হয়?' কাকলির মুখ আতঙ্কে প্রায় শাদা।

'যতক্ষণ মিস্ত্রি না আসে—'

'বলেন কি। ততক্ষণ ঝুলব ত্রিশঙ্কুর মত?' কাঠ-কাঠ গলায় বললে কাকলি।

'কিন্তু নিঃশঙ্ক হয়ে।' যেন খুব একটা আনন্দের ব্যাপার, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আগাপাশতলা মুখস্থ জানা উত্তর—এমনি উৎসাহ সুকান্তর ভঙ্গিতে।

'নিঃশঙ্ক হয়ে?' ভিতরে-ভিতরে মৃদু-মৃদু কাঁপছে যেন কাকলি: 'বলতে চান কোনো ভয় নেই?'

'না, কিসের ভয়?' যেন এক পা এগিয়ে এল সুকান্ত: 'আমিই তো আছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝি লিফ্‌টম্যানকে। মানে লিফ্‌টম্যান যদি অশোভন কোনো আচরণ করে তবে প্রতিকর্তা স্বয়ং সুকান্ত। যেন সুকান্তের থেকে কোনো ভয় নেই। সে যেন বনে বাঘ নয়, ঘরে কালসাপ নয়। সে এক দেবশিশু।

আর, সত্যি, লিফ্‌টম্যানের ব্যবহারকেও বলিহারি। কলকব্জা যদি কোথাও খারাপ হয়ে থাকে, তবে হাতের যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করবে তো, বুঝুক বা না বুঝুক, কোথাও করবে তো একটু তদন্ত-তদারক। তা নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনড় পুতুলের মত। লক্ষ্য নিজের দিকে নয়, অন্য দুই আরোহীর দিকে।

চেঁচাবে? শুনতে পাবে কেউ? শুনলেই বা উদ্ধার করবে কে? কে করবে সাহায্যের তোড়জোড়?

ছটফট করতে লাগল কাকলি।

'আপনি অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন ?' সুকান্ত বললে, 'বসুন সিটটায়। বিশ্রাম করুন।'

ঝলসে উঠল কাকলি : 'এটা এখন বিশ্রাম করবার সময় ?'

'উপায় কি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ছু পায়ে ?' বললে সুকান্ত। 'পা ধরে গেলে এক সময় বসতে তো হবেই।'

'এখনো ধরে নি।'

'আমার উপরে অকারণ চটছেন। আমি ভালো কথাই বলছি। কখন মেরামত হয়ে লিফ্ট আবার চালু হয় ঠিক নেই। চাই কি এই সিটটায় বসে ঘুমুতেও হতে পারে—'

'ঘুমুব এখানে ?' করুণ কান্নার মত করে বললে কাকলি। 'আর আপনি ?'

'যদি জায়গা দেন—'

'এখানে জায়গা কোথায় ?' কাকলি দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

'জায়গা নেই, জায়গা নেই এই তো এই যুগের হাহাকার।' আরো কিছুটা যেন এগিয়ে এল সুকান্ত : 'সেটা তো স্থানের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকে নয়। কেননা, যদি হৃদয়ে জায়গা থাকে তা হলে ঘরে কেন, খাঁচায়ও জায়গা আছে। ঐ যে কি বলে, যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় দু-জন—দু-জন নয় ন জন। কথাটা হয়তো ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে, আমি যাব কোথায় ? যতই কেননা রাগ করুন, এই মুহূর্তে আমাকে ফেলবারও তো কোনো জায়গা নেই। সুতরাং—'

আরো কি এক চুল এগিয়ে এল নাকি সুকান্ত ? আপনার শাড়ির উপর এ কি একটা ছারপোকা না ডেঁয়ো পিঁপড়ে এই অছিলায় গায়ে হঠাৎ হাত দিয়ে ফেলবে নাকি ? কাকলি আরো কুঁকড়ে গেল, শিটিয়ে গেল।

'সুতরাং আসুন সিটটায় বসি।' সুকান্ত সরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল।

'আপনিও বসবেন ?'

'বাধা কি। এটা তো আর ট্র্যাম বাস্-এর লেডিজ সিট নয়! এখানে সবাই পাশাপাশি, সবাই সমান-সমান।'

'আপনি বসুন। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

'কিন্তু কতক্ষণ থাকবেন !' সুকান্ত দার্শনিক হবার ভান করল, মানুষ কখনো কোনো অবস্থায়ই খুশি নয়। কেবলই সে ভোল বদলাচ্ছে, ভঙ্গি বদলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন— দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু বসতে পাব। বসে আছেন— বসে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু পা টান করে শুতে পাব। শুয়ে আছেন—

শুয়ে আছেন, মনে হবে, আর নয়, এবার উঠে পড়ি। উঠে পড়েছেন কি, আবার সেই বসে পড়ার, শুয়ে পড়ার জন্যে কান্না। সুতরাং যতই কেননা দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে থাকুন, বসতে ইচ্ছে করবেই আপনার এক সময়, আর যখন বসবেনই শেষ পর্যন্ত—'

'তখন কোন না শুয়ে পড়ব!' কাকলির রাগের স্বরটা কৌতুকের মত শোনাল।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' এতটুকুও কি বিচলিত হবে না সুকান্ত? 'বলা যায় না ক ঘণ্টা ক রাত্তির এমনি বন্দী থাকতে হয় আমাদের।'

'ক রাত্তির!'

'তা ছাড়া আবার কি। কিছুই তো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কোথাও। আর সবই যখন অন্ধকার, নিশ্চল নিঃশব্দ, তখন রাত ছাড়া আর কি। প্রত্যেকটি মুহূর্তই এক গহন রাত্রি। কথাটা তা নয়—'

'তা নয়?' চোখ তুলল কাকলি।

'না। আপনি যদি নিতান্ত শুয়েই পড়েন আমি না হয় এই মেঝেতেই কুকুরকুণ্ডলী হব, নিরীহের মত ঘুমুব শান্তিতে।'

'ঘুমুবেন? পারবেন ঘুমুতে?'

'দেখুন না পারি কিনা।' হাসতে লাগল সুকান্ত।

'আপনার এতটুকু ভয় করছে না?'

'কেন করবে? কিসের ভয়? সঙ্গী যদি ভালো হয় মানে সৎ, কি বলে, সুন্দর হয়, তা হলে ভয় থাকে না। সেই কারণে আপনিও নির্ভয় হতে পারেন হয়তো। পারেন না?'

'কিন্তু আপনি কি সুন্দর?'

'সুন্দর ভাবলেই সুন্দর।' একটু লাজুক হবার ভঙ্গি করল সুকান্ত: 'সুন্দর না হই, সৎ তো বটে। ভালো মানে ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে নই। ভালো মানে ভালোবাসার ভালো ছেলে। কিন্তু কথাটা তা নয়—'

'তা নয়?' কাকলির চোখে কে গাঢ় করে কালো রেখা টেনে দিল।

'না। আমি বলছিলাম আপনার বসবার কথা। বলছিলাম, যখন শেষ পর্যন্ত আপনাকে বসতে হবেই, তখন আগেভাগেই বসে পড়ুন। আমার দরকারি কথাটা সেরে নিই।'

'দরকারি কথা!' একটু বা চমকাল কাকলি। বললে, 'এই বিপদে কারু আবার দরকারি কথা থাকে নাকি? থাকলেও মনে পড়ে নাকি?'

'পড়ে। কে জানে হয়তো ঐ দরকারি কথার জন্যেই এই বিপদ।' ঢোঁক গিলল সুকান্ত: 'কথাটা আর কিছু নয়, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ভুলে গেছি—'

'ভুলে গেছেন মানে?' চমকে উঠল কাকলি, 'কোনোদিন জানতেন নাকি?'

'জানতাম।'

'কি করে? কে বললে?'

'কেউ বলে নি।'

'তবে?'

চোখের উপর স্থির চোখ রাখল সুকান্ত, 'আপনিই লিখেছিলেন।'

'আমি?' চোখের পলক ফেলল না কাকলি, 'আপনাকে?'

'হ্যাঁ, আমাকেই। আর কাকে!'

লিফ্‌টটা ফের চলতে শুরু করল নাকি? যেন একটু দুলে উঠেছিল, নিজেকে সামলাল কাকলি। দেখল লিফ্‌টের নয়, হৃৎপিণ্ডের দোলা।

'কী লিখেছিলাম? চিঠি?'

'তা তাকে চিঠি ছাড়া আর কী বলে?'

'বা, আমি আপনার ঠিকানা জানলাম কি করে?' কাকলি প্রায় ঝংকার দিয়ে উঠল।

'সে চিঠি আমার বাড়িতে পোস্টে পাঠান নি। তাই আমার বাড়ির ঠিকানা না জানলেও চলে। সেটা আমাকে কলেজেই পৌঁছে দিয়েছেন এবং বেয়ারা মারফৎ। কি, মনে পড়ে?'

খুব একটা নির্দোষ ব্যাপার, এমনি হালকা হাওয়ার ঢেউ তুলে কাকলি বললে, 'কলেজ সেমিনারে কোনো বক্তৃতা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে অনুরোধ। মনে পড়েছে। কি, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।' গর্বের নিশ্বাস ফেলে সুকান্ত বললে, 'আমাদের গলিতে থাকেন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক, তাঁকে সেমিনারে ধরে নিয়ে এসে কিছু বলাবার জন্যে প্রার্থনা—'

'প্রার্থনা!' বাক্যের নির্বাচনে আপত্তি কাকলির।

'নয়তো বলুন আদেশ। আপনি যখন সেমিনারের সেক্রেটারি তখন আপনার বলাই হুকুম করা। কিন্তু,' একটু কান চুলকোল সুকান্ত: 'কোথাও একটু মিনতিও হয়তো ছিল। নচেৎ, কোনো দরকার নেই, ঐ চিরকুট চিঠিতে ফলাও করে আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন কেন?'

'দিয়েছিলাম বুঝি?' চোখের কোণের কাছটিতে লজ্জার রেখা ফোটাল কাকলি: 'ওটা কেমন হাতের টানে অভ্যেসের বশে এসে গিয়েছিল।'

'তাই হবে। কিন্তু কী বিচ্ছিরি ঠিকানা। বাড়ির নম্বর নয় তো ধারাপাতের অঙ্ক। ধারাপাতের অঙ্ক বলা ভুল হল, কেননা তাতে একটা শৃঙ্খলা থাকে। আপনাদের নম্বরটা তো অঙ্ক নয়, আতঙ্ক। কোনো ছিরিছাঁদ বা নিয়মকানুন নেই। তিন শ তিয়াত্তর না ছ শ সাতাত্তরের সতেরো, তার আবার বাই—সাতাশ না সাতাশি। কখনো এমন বিদঘুটে নম্বর হয় শুনেছেন?' মুখচোখ গম্ভীর করল সুকান্ত: 'সতেরোর সাতাশ না সাতাশের সতেরো এই ঠিক করতেই প্রাণান্ত। তারপর ঐ তিন শ তিয়াত্তর—আচ্ছা, বলুন, অমন কখনো নম্বর হয়?'

এত বিপদেও মানুষে হাসে! দিব্যি হাসি বেরুল কাকলির। বললে, 'মোটেই তিন শ তিয়াত্তর নয়।'

'নয়! তবেই দেখুন কিরকম অসম্ভব গোলমেলে ব্যাপার, কারু সাধ্যি আছে তা মনে রাখে!'

'মনে রাখবার কী দরকার! চিরকুটটা দেখে নিলেই পারেন।'

'চিরকুট বলতে আপনার লেগেছে বুঝি। চিরকুট বলুন বা গেট-পাশ বলুন, দলিলটা হারিয়ে গেছে।' মুখ অবিশ্বাস্য করুণ করল সুকান্ত: 'আমার সব জিনিস খালি হারায়।'

'তাই দেখছি। স্মৃতি-শক্তি ধৃতি-শক্তি দুইই।' মুখ টিপে একটু হাসল কাকলি।

'ধৃতি-শক্তি মানে?'

'ধরে রাখবার শক্তি। না পারলেন ঠিকানাটা মনে রাখতে, না বা চিরকুটটা ধরে রাখতে। অতএব আপনাকে ঠিকানা দিয়ে লাভ কি।'

'আর না দিলেই বা ক্ষতি কি।' নৈরাশ্যে মুখ ধূসর করল সুকান্ত: 'কে জানে এই পিঞ্জরই হয়তো আমাদের শেষ ঠিকানা।'

'তাই যদি হবে, এই পিঞ্জরই যদি আমার শেষ বাড়ি,' বেশ সরল হতে পারছে কাকলি, 'তবে ঘটা করে প্রাক্তন বাড়ির খোঁজ করছিলেন কেন?'

'বুঝতে পারছি, অনর্থক করছিলুম। সুতরাং,' সুকান্ত সিটের দিকে ইঙ্গিত করল, 'আসুন, হতাশ হয়ে বসে পড়ি।'

'না, হতাশ হবার তো কিছু দেখছি না।' সহাস্য নির্ভয়ে বলতে পারল কাকলি, 'খাঁচার বাইরে কোথাও এক আকাশ আছে। সমস্ত জনতার মধ্যেও আছে এক নির্জনতা।'

এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে নাকি কেউ? কাকলির চোখের মধ্যে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

কথাটা শেষ করে নি কাকলি। জের টেনে বললে, ‘সমস্ত ঠিকানার বাইরে মানুষের আরেক বাসস্থান।’

‘হ্যাঁ,’ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুকান্ত, ‘মানুষের সে আবাস স্থানে নয়, কি বলেন—’

‘হ্যাঁ, মনে।’

লাফিয়ে উঠল সুকান্ত। ‘তার মানেই হৃদয়ে। তার মানেই—’ স্থির হয়ে তাকাল লিফ্‌টম্যানের দিকে। বললে, ‘ঠিক আছে।’ চোখের ইঙ্গিত করলে।

লিফ্‌ট উঠতে শুরু করল।

ব্যস্ত হয়ে কাকলি বললে, ‘চট করে আপনার ঠিকানাটা বলুন এবার।’

‘আমার ঠিকানা ?’ লিফ্‌ট কি বাড়ি ছাড়িয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে নাকি ? এমনি হতচেতন চেহারা করল সুকান্ত।

‘আপনার ঠিকানা না পেলে আমার ঠিকানা আপনাকে জানাব কি করে ? কি, বলছেন না কেন ? খুব কঠিন ? মনে রাখতে পারব না ?’ ঠিক আঁচল বেঠিক করে আবার ঠিক করল কাকলি।

‘না, একটুও কঠিন নয়, খুব সোজা। দু নম্বর কাঁটালতলা লেন।’

লিফ্‌ট থামল তেতলায়। এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে, সবাই হৈ-হৈ করে উঠল।

যান্ত্রিক গোলমাল। কিছু বলবার নেই। স্বয়ং লিফ্‌টম্যানই তার প্রবক্তা। আর এ দু-জনকে যে একসঙ্গে দেখছ এও যান্ত্রিক গোলযোগ ছাড়া কিছু নয়।

দু-জন বেরিয়ে এসে দু দিকে পালাল। একটা দুর্ঘটনার বেশি কিছু নয় এমনি ভাব দেখিয়ে একসঙ্গে হাঁটল কয়েক পা। যা দৈবের ব্যাপার, অপ্রতিকার্য, তার সম্পর্কে অভিযোগ করে লাভ নেই।

ফাঁকায় এসে, চলতে চলতে ব্যবধান কত বড় হয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে গলার স্বর চড়া করল কাকলি। বললে, ‘অমন বিচ্ছিরি গলির নাম এখনো আছে নাকি ? আপনাদের অঞ্চলে কোনো গ্রেট ম্যান হয় নি ?’

‘গ্রেট ম্যান মানে ?’

‘কোনো মন্ত্রী-টন্ত্রী ? নিদেন কোনো কাউন্সিলর—’

‘গলিটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।’ উপর-ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল বুলোল সুকান্ত।

‘আর আপনি অপেক্ষা করাবার জিনিস পেলেন না ? একটা হতচ্ছাড়া গলি—’

'গলিটা বিচ্ছিরি হতে পারে, কিন্তু যাই বলুন বাড়ির নম্বরটা ভালো।'

'নম্বরটা ?'

'নম্বরটা দুই। ভুলে গেলেন এরই মধ্যে ? খুব ভালো নম্বর। কিছুতেই ভোলা যায় না। দুই। দ্বৈত, দু'হু'। এক আর দুই।' সুকান্ত আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে পরে লক্ষ্য করল কাকলিকে : 'আমি আর আপনি।'

'কি বুদ্ধি!' শব্দ করে হেসে উঠল কাকলি, 'দুইয়ে বুঝি আমি আর আপনি হয় ? দুইয়ে আমি আর তুমি।'

ক্লাশে ঢুকে পড়ল কাকলি।

...২...

কত রাত কে জানে, সুকান্তর ঘুম ভেঙে গেল। বুকে-পিঠে অসহ্য ব্যথা। এ কি, কী হয়েছে তার ? যেন ঠিকমত নিশ্বাস নিতে পারছে না। পারছে না পাশ ফিরতে। মনে পড়ল, দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। দুঃস্বপ্ন দেখছিল, যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা দিতে এসে শুনছে, পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ কী ভয়ংকর কথা! দু বেলা টুইশানি, কত কষ্ট করে ফী জোগাড় করা, বাবার ঐ তো প্র্যাকটিস্, পরীক্ষা বন্ধ করে দিলেই হল ? এক বছর ড্রপ করার মত গতরও নেই, রসদও নেই। কিন্তু কেন, কী হয়েছে, পরীক্ষা নামঞ্জুর কেন ? অঙ্কের পেপারে তোমার পার্সেন্টেজ নেই। অঙ্ক কী মশাই ? এম-এ দিচ্ছি হিস্ট্রিতে, একমাত্র সাল-তারিখ ছাড়া সেখানে আর অঙ্ক কোথায় ? অঙ্ক তো ইস্কুল থেকেই পলাতক। ওসব শুনছি না, অঙ্কে পাশ নেই বলে বি-এই নাকচ হয়ে গিয়েছে। কী সর্বনাশ! বি-এ বাতিল হয়ে গেলে চাকরি পাব কি করে, খাব কি, দাঁড়াবে কোথায় সংসার ? তা জানি না। অঙ্কে আগে বসতে হবে, বেরিয়ে আসতে হবে বেড়া টপকে। এই নাও কোশ্চেন পেপার, বসো, শুধু ফলটা মিলিয়ে দাও। কী অঙ্ক ? পারব তো ? খুব সোজা, সামান্য যোগ-বিয়োগ। এ আবার কে না পারে ? দিন, দেখি। খাতাপত্র নিয়ে বসে পড়ল সুকান্ত। কিন্তু এ কি, কলম আনে নি তো ? লিখবে কি দিয়ে ? এ-পকেট ও-পকেট পাগলের মত হাটকাতে লাগল। এই যে,

কী আশ্চর্য, একটা কলম বেরিয়েছে। কিন্তু, শুকনো, খড়ের মত শুকনো, এক ফোঁটা কালি নেই। তবে আর কি, হল থেকে বেরিয়ে যাও, নেমে যাও অন্ধকারে, নিরালায়। তাই নামতে লাগল সুকান্ত। সিঁড়ি নেই, লিফ্‌ট নেই, তবু নামতে লাগল। নামতে-নামতে পা ঠেকল এসে শোবার ঘরে, তক্তপোশে।

এমন আজগুবি স্বপ্নও হয়! না, ভয় পাবার কিছু নেই, হতাশ হবার কিছু নেই, নিজের ঘরে তক্তপোশেই সে ঠিকঠাক শুয়ে আছে। পাশে আলাদা তক্তপোশে শুয়ে আছে ছোট ভাই সুবীর। জ্বর হয়ে ছটফট করছিল প্রথম রাতে, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার আলো এসে পড়েছে মশারির উপর। খুটখাট ইঁদুরের শব্দ হচ্ছে এখানে ওখানে, ওষুধের শিশিটা বুঝি ফেলল কাত করে। রাস্তায় কাকে দেখে কটা কুকুর উঠেছে হল্লা করে, আর, একবার আওয়াজ তুললে, সে লোকটা থাক বা চলে যাক, কিছুতেই যেন আর ঠাণ্ডা হবার নাম নেই। হুস করে একটা মোটর বেরিয়ে গেল। হর্ন দিচ্ছে কেন? পথ জুড়ে গরু শুয়ে আছে বোধ হয়। না কি রাস্তার মাঝখানে এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে এক মাতালের ঝগড়া?

মামুলি, মুখস্থ পরিবেশ। একেবারে হুবহু। কিছুই সুকান্তর খোয়া যায় নি, না পার্সেণ্টেজ, না বা কলমের কালি। তার বি-এ পাশ বহাল আছে, অঙ্ক কিছুই ঘটাতে পারে নি গরমিল। সব তার মজুত আছে, নিখুঁত আছে, কিছুই হয় নি তছরূপ। চোখবোজা অন্ধকারে চারদিক সে ভালো করে চেয়ে দেখল। সব যে-কে-সে।

শুধু তাই? শুধুই পূর্বাবস্থা? শুধুই একটা বাসি, পুরোনো হিসেবের মিটমাট? নতুন কিছুই হয় নি? নতুন কিছুই আসে নি জমার ঘরে?

কী যেন এসেছে, কী যেন হয়েছে, কী যেন পেয়েছে—আশ্চর্য, মনে করতে পারছে না। টিক-টিক-টিক-টিক, টেবিলের উপরে টাইম-পিস ঘড়িটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে—এক, দুই, তিন, চার—তবু ভাবনার স্লেটে স্মৃতির দাগ পড়ছে না। কী যেন একটা ভালো খবর, পথে কুড়িয়ে-পাওয়া কিছু টাকা, একটা হয়তো বা শাঁসালো টিউশানি, নয়তো বা পরীক্ষার কটা নির্ঘাত ফাঁস প্রশ্ন—সৌভাগ্যের চেহারাটা কল্পনায় কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছে না। হাতড়ে-হাতড়ে মরছে।

অস্থির-অস্থির লাগছে। কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

হবেই তো, বুকে অসহ্য ব্যথা। পাশ ফিরতে পারছে না।

যন্ত্রণাটা কি রকম, সমস্ত চেতনা ঘন করে, একত্র করে অনুভব করতে চাইল সুকান্ত। কী অদ্ভুত, ব্যথা কোথায়? এ যে সুখ। উত্তাল সুখ। এ যে সৌরভের সমুদ্র।

সুখ যখন খুব বেশি হয় তখন বুঝি ব্যথার মতই লাগে।

আশ্চর্য, বুকের কত কাছে দাঁড়িয়েছিল কাকলি।

কত কাছে! প্রায় নিশ্বাসের নাগালের মধ্যে। এক ফুঁয়ে ধুলো উড়িয়ে দেবার কাছাকাছি।

পাশ ফিরতে কষ্ট হচ্ছে নাকি সুকান্তর? কোথায় কষ্ট? এ তো গভীর আরামের ঢেউ। দিব্যি পাশ ফিরল। উপুড় হল। আপ্রান্ত বিস্তৃত হল। ঘুমের নবনীর মধ্যে ধীরে-ধীরে নেমে যেতে লাগল, ডুবে যেতে লাগল।

এত কাছে, তবু তাকে একটুও ছুঁতে পারল না। গহ্বরে নেমেও ধরতে পারল না বিগ্রহ।

কাঙালের মত কটি কৃপণ আঙুল ধরলে হত কী! উঃ, সে কতকেলে পুরোনো কবিতার ঢং। তার চেয়ে দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্জয় দুই বাহুর মধ্যে সেই এক তাল কোমল ভয়কে পারত লুফে নিতে? কই, পারল কই? কেউ পারে?

কেউ পারে না। ভাবতেও পারে না।

চুপ করে ঘুম যাও। কল্পিতার সামনে অন্ধকারে এখন সাহস দেখাচ্ছ কিন্তু সাধ্য নেই দিনের বেলায় ছোঁও সেই বাস্তবী তনু। সাধ্য নেই তার এক তন্তু বসনকে বিশৃঙ্খল করো। কষ্ট করে পাহাড়ের চুড়োয় উঠলেই ধরা যায় না চন্দ্রমা।

যে সমস্ত জোরকে স্থগিত রাখে, তটস্থ রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখে একটা ধারালো ক্ষুরের উপর, তারই শক্তি অসীম।

আর যে তুঙ্গতম শৃঙ্গে উঠেও নিচের অন্ধকার গুহায় ঝাঁপ দেয় না, পুরদ্বারে উপনীত হয়েও ফিরে দাঁড়ায়, হায়, তার কোনো শক্তি নেই!

আগুনের উপশম জলে, ক্লান্তির উপশম ঘুমে, খিদের উপশম আহারে। কিন্তু যন্ত্রণার উপশম যন্ত্রণায়।

পাহাড়ের চুড়ো যত উঁচুই হোক পায় না চাঁদকে। কিন্তু সমুদ্র, যে অনেক নিচে প'ড়ে, তারই উদ্বেল বুকে শত-কোটি অজস্র হয়ে ভেঙে পড়ে চাঁদ।

আহাহা, যাবার সময় কী না জানি বললে। কান খাড়া করল সুকান্ত।

পাশের ঘরে সেণ্টু কেঁদে উঠেছে বুঝি। ওর মা ওকে ধমকাচ্ছে। যত ধমক খাচ্ছে তত চড়ছে তার চিৎকার। কী চাইছে ছেলেটা? যেমন অবুঝ মা, তেমনি অবুঝ ছেলে। উঠে ওকে নিয়ে এলে হয় এ-ঘরে। সুকান্তর কোল পেলে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চিন্তে। সকাল হতে আর কত বাকি? সকাল হলেই দরজা খোলা পেয়ে ঠিক চলে আসবে গুটি গুটি। মশারি তুলে মুখ বাড়াবে। ডাকবে দুগ্‌গা দুগ্‌গা

বলে। কবে আর ভোরের সূর্য দেখেছে সুকান্ত, রোজ দেখছে এই শিশুর মুখ। প্রত্যহের একটি পরিচ্ছন্ন আরম্ভ।

মাকে হারিয়ে দিয়েছে সেন্টু। যা আদায় করবার করে নিজের থেকেই শান্ত হয়েছে।

আহাহা, কী যেন কথাটা, কেমন করে না জানি বলেছিল! সঙ্গে ছিল কি একটু হাসি, একটু বা হাসির অতিরিক্ত ইশারা?

হাসির শব্দটা মনে-মনে নির্মাণ করতে পেরেছে সুকান্ত।

হাসি কোথায়, থমথমে জমাট আকাশে মেঘ ডাকছে। ঝেঁপে বৃষ্টি এল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল রাস্তাময় মানুষের শোরগোল। ছাদহারা ঘুমহারা মানুষ। যার যা কাঁথা-ন্যাতা চট-মাদুর সব গুটিয়ে নিয়ে উঠে এসে বসেছে উবু হয়ে। যারা মাথার উপরে ঝুলবারান্দা পায় নি তারা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তোড় বেশি হলে বা বেশিক্ষণ ঝরলে এ বিরাট বিনিদ্র জনতা কোথায় গিয়ে মাথা রাখবে কে জানে। আহা, বৃষ্টিটা ধরুক, ফুটপাত শুকিয়ে যাক দেখতে-দেখতে। ওদের আবার নতুন করে ঘুম আসুক। ওরা জেগে আছে জানলে এই বাকি রাতটুকু বুকের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ নিয়ে, হাসির শব্দ নিয়ে, সে ঘুমোয় কি করে?

কিন্তু কাকলি জেগে আছে জানলে?

আমি আর তুমি। আমি আর তুমি। সূর্য আর সোম। নাদ আর বিন্দু। প্রাণ আর মন।

ছোট-ছোট হাতে বন্ধ দরজায় কে ধাক্কা মারছে। ভোর হয়ে গিয়েছে বুঝি। অন্য দিন হলে সুবীরই আগে থেকে উঠে দরজা খুলে দিত, ধাক্কা মারবার দরকারও হত না সেন্টুর, টুক করে ঢুকে পড়ত, আর তাকে নিয়ে বিছানায় আরো খানিকটা গড়িমসি করতে পারত সুকান্ত। কিন্তু আজ যে সুবীরের জ্বর। তাই সুকান্তকেই উঠতে হল উদ্যোগ করে। কিন্তু, আশ্চর্য, বিরক্ত হল না। কেন বিরক্ত হল না? খোলা জানলা দিয়ে উনুনের ধোঁয়া আসছে, তবু না। ও! কী যেন তার হয়েছে, কী যেন তার এসেছে—মনে করতে পারছে না। দাঁড়া, খুলছি। তার আগে ছোঁড়াটাকে একটু দেখি। সুবীরের বিছানায় গিয়ে তার ঘুমন্ত কপালে হাত রাখল সুকান্ত। ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। সুবীর চোখ চাইল। এ কি, তুমি? এ যেন সুবীর ভাবতেও পারত না—ধড়মড় করে উঠে বসল। অপরাধীর মত মুখ করে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজাটা খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছি।'

'না, তোর উঠতে হবে না। আমিই খুলছি।' সুকান্তর হাতে-কণ্ঠে মমতা

ঝরে পড়ছে : 'তোর শরীর দুর্বল, সারা রাত তোর জ্বর গিয়েছে। তুই শুয়ে থাক চুপ করে।'

বাধ্য ছেলের মত সুবীর শুয়ে পড়ল।

নিজেই দরজা খুলল সুকান্ত। আর তার বাড়ানো দুই হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেণ্টু।

'কতক্ষণ তোমাকে ডাকছে।' ঘুম-খসা শাড়ির আঁচলটা মেঝেতে লুটোচ্ছে, এলোমেলো পায়ে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে বন্দনা।

এখন সেণ্টুকে গল্প বলো—অন্ধকার-দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে ধরে হটিয়ে দিয়ে গায়ে রক্ত মেখে কেমন করে পাহাড়ের উপর উঠে এল সূয্যিমামা, কেমন করে আলোর বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাগিয়ে দেয় পাখিদের, ফুলদের, শিশুদের—ঝণ্টু-সেণ্টুদের—কত হাসি ফোটায়, গান ফোটায়, রঙ মাখায়—

'আমাকেও জাগিয়ে দেয় ?' চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে সেণ্টু।

'তোমাকেও।'

'কিন্তু রাত্রে যখন জাগি ?'

'তখন তো অন্ধকারের দত্যিটা আসে। তখন তো তুমি কাঁদো—'

'দত্যিটা তো খারাপ। আমার ভয় করে। আর, শোনো কাকা', সুকান্তর চিবুক ধরে মুখটা নিজের দিকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে নেয় সেণ্টু : 'সূয্যিমামা খুব ভালো। তার বাণে একটুও ব্যথা নেই।'

'কি করে থাকবে। তার বাণ যে আলোর বাণ। চুমুর মত মিষ্টি। ছোট-ছোট কচি আঙুলের মত।'

'সুড়সুড়ি দেয়, তাই না ?' বলতে-বলতেই চিবুকের নিচে কাকার প্রত্যাশিত আঙুলের আদর পেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে সেণ্টু।

মৃণালিনী ঘুম থেকে উঠেই সংসারবন্দনা শুরু করে দিয়েছে। প্রথমেই চাকর-ধোলাই। এত দেরি ক'রে উনুনে আগুন দিয়েছে কেন ? আর ধোঁয়ার পরিমাণ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, কত বেশি খোরাক পোরা হয়েছে গহ্বরে। চারদিক থেকে এমনি যদি অপচয় চলে, তা হলে ভরাডুবির আর বাকি কি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়া। খরখরে গলায় পালটা জবাব দেবার লোভ সে সামলাতে পারে না : 'হরিপদ কোথায়! ভোর রাতে কয়লাঘর থেকে ঘুঁটে আনতে গিয়ে তার হাতে বিছে কামড়েছে। তাই আমিই আগুন দিয়েছি।'

'সেই যখন দিলে ঠিক টাইমে দিলেই হত।' কথার পিঠে কথা বলতে কখনো

নিবৃত্ত নয় মৃণালিনী : 'চায়ের পাট উঠবে, তারপরে প্রশান্তর অফিসের ভাত। ছুটো ঠিকঠাক আজ খেয়ে যেতে পারলে হয়।'

'কেন, প্রশান্তর বউ কি করে ?' ঝামটা দিয়ে উঠল বিজয়া।

'সে তো রাঁধবেই এ-বেলা। শুধু উনুন ধরিয়ে চায়ের জলটা গরম করে রাখা।'

'কিন্তু যার তা করবার কথা সেই চাকরের যদি কোনো বিপদ হয় তা হলে দেরি তো একটু হবেই।' মৃণালিনীর মুখ আবার কুটকুট করে উঠছে দেখে বিজয়া দাবড়ে উঠল : 'একটা লোক কষ্টের মধ্যে পড়লে তাকে একটু দেখতে-শুনতে হয় তো! সেই বিছেটাকে মেরে ঘষে দিতে হয় তো সেই যন্ত্রণার জায়গায়। আমি তো আর উপরতলার বাসিন্দে নই যে, নিচেরতলার লোকের কান্না শুনব না। যান না, দেখুন না কেমন ছটফট করছে হরিপদ।'

সে পরে দেখা যাবে। এখন এই উপরনিচ বলে খোঁটা দেবার মানেটা কি! কে থাকতে বলছে নিচে! সোজা বেরিয়ে গিয়ে তেতলার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকলেই তো হয় আলাদা। মৃণালিনী মারমুখো হয়ে উঠল।

বিজয়াও মরীয়া হতে জানে। বললে, 'তা হলে মাস মাস গুনে গুনে এক মুঠো টাকা পেতে হত না। সংসারের তলা ফুটো হয়ে যেত।'

'সংসারটা ছিল বলেই, গায়ে লাগে না তো, চলছে বরফট্টাই।' কাটান ঝাড়ল মৃণালিনী : 'ঐ যে কি না বলে, উপরে চিকনচাকন ভেতরে খ্যাড়।'

মূল নেই তুমুল শুরু হয়ে গেল। চটি পায়ে ভূপেন নেমে এল উপর থেকে। পিছু-পিছু বন্দনা। নিচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হেমেন।

'ভালো করে এখনো কাক ডাকে নি, আর তোমাদের ডাক এরই মধ্যে তারস্বর হয়ে উঠেছে।' ভূপেন সালিশির ভঙ্গিতে বললে, 'এদিকে চাকরটা যে যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে তার খেয়াল করলে না ? একজন ডাক্তার ডাকতে হয় তো!'

দু পক্ষ চুপ করল। শোনা গেল হরিপদর গোঙানি।

'গান থামে তো বাজনা থামে না। আমার ঘুমের পরিশিষ্টটা এখনো বাকি।' হেমেন ফিরে গেল নিজের ঘরে। নিজের মনে বললে, 'ঘুমের পরিশিষ্ট মানে বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙা। আর বেড-টির জন্যে অপেক্ষা করা।

'বেড-টি! ব্যাড টি-ও জুটবে না আর এখানে।' বিজয়া ঝাঁজিয়ে উঠল।

যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বিছানায় আবার ঢুকে পড়ল হেমেন।

'ও কি, আবার শুচ্ছ যে।'

'তখন সেটা ঠিক ওঠা হয় নি, ছোটা হয়েছে।' ভয়ে-ভয়ে হাসতে চাইল হেমেন :

৮৮৮৮

'ঘুম থেকে ওঠা আর বিছানা ছেড়ে ছোটা ছুটো আলাদা জিনিস। তোমাদের ঝগড়া শুনে আমি তখন বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছি, ঘুম থেকে উঠে আসি নি। আমার ঘুম তাই একটু বাকি আছে। কীর্তনের পরে বাতাসা। ঘুমের পরে ঘুমো-ঘুমো একটু আলস্য করা—'

গজগজ করতে লাগল বিজয়া।

যত খুশি বকো আর ঝকো রাজি আছি, দয়া করে কাঁদতে বোসো না।

এ বাড়িতে কাকে আর বলবে, ভূপেন নিজেই গেল ডাক্তারকে খবর দিতে।

প্রশান্তও উঠেছে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছে জানলায়। সংসারের বাঁধিগতের ঐকতান শুনে এতটুকুও সে বিচলিত হচ্ছে না। শুধু ভাবছে, বন্দনা না তার কাঁসিটা জুড়ে দেয় এর সঙ্গে।

পেস্ট দিয়ে সেণ্টুর দাঁত মেজে দিচ্ছে সুকান্ত। বলছে, 'ওরা-ওরা ঝগড়া করুক, আমরা কোনোদিন ঝগড়া করব না।'

এক মুখ ওথলানো পেস্ট নিয়ে সেণ্টু বললে, 'না।'

'আমরা সব সময়ে মিলে-মিশে থাকব, মিষ্টি করে কথা কইব।'

মুখ খোলসা করে নিয়ে সেণ্টু বললে, 'কইব।'

'আমরা খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ কথা কইব না, খারাপ কথা শুনব না—'

'আমরা, না কাকা ?'

'হ্যাঁ, আমরা।'

'আমি আর তুমি—খুব মিষ্টি— না, কাকা ?'

'ভীষণ মিষ্টি। ভয়ংকর মিষ্টি।' অবোধ শিশুটাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরল সুকান্ত : 'আমি আর তুমি। জগৎসংসার উচ্ছন্নে যাক, ভেসে যাক প্রলয়ের জলে, তবু আমাদের ছাড়াছাড়ি নেই।'

মৃণালিনী বাজারে পাঠাবার লোক খুঁজছে।

'তুই ছাড়া আর লোক নেই।' পড়ার টেবিলে বসে কি লিখছিল সুকান্ত, মৃণালিনী আর্জি পেশ করল।

'আমি ? আমি বাজারে যাব ?' যেন নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে এমনি মুখ করল সুকান্ত।

'উপায় নেই।' গাম্ভীর্যে মুখ কঠিন করল মৃণালিনী : 'হরিপদ অচল। সুবীরের জ্বর। কাজে কাজেই—'

কাজে কাজেই ? আমি যাব ঐ চটের থলে নিয়ে, এমনি লুঙ্গি পরে, গেঞ্জি-গায়ে,

লক্ষ্মীছাড়া চেহারায়? আর কোন বেশবাস বা মিল খাবে ঐ থলের সঙ্গে? জলকাদার মধ্যে বাজার ঘুরে-ঘুরে জিনিসের দর করব, নেড়ে-চেড়ে, টিপে-টুপে, উলটিয়ে-পালটিয়ে? তারপর ঠকে আসব? থলের মুখ দিয়ে আনাজপাতি বেরিয়ে থাকবে আর তাই বয়ে নিয়ে আসব অশালীনের মত? আমি কি উদ্‌ভ্রান্ত না মতিচ্ছন্ন?

'বাবাকে বলো।' উদাসীনের মত বললে সুকান্ত, 'বাইরের ঘরে নিশ্চয়ই বসে আছেন নিশ্চিন্ত হয়ে। মক্কেল নেই—'

'তোরও তো আক্কেল নেই।' আর্জি নয়, ফরমাশ জারি করল মৃণালিনী: 'ওঠ বলছি। প্রশান্তর আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—'

'সে আফিস আর কদ্দিন!' একটা নাটুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'উঠলি?' টেবিলের কাছ ঘেঁষে মুখিয়ে এল মৃণালিনী। বোধ হয় গায়ের জোরে টেনে তুলবে হাত ধরে।

'বা, আমার এ বছর শেষ পরীক্ষা না? নোটগুলো তুলে না নিলে চলবে কেন? যার নোট তাকে তার খাতা বিকেলের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। তোমরা কি চাও আমি একটা থাড্‌ডো ক্লাশ নিয়ে বেরিয়ে আসি? এরই জন্যে আমি সকালের টিউশানিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম—'

'তাই বলে বাজার ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, তুই নোট টুকছিস কোথায়?' লেখাটার উপর মৃণালিনী উপুড় হ'য়ে পড়ল: 'এ তো বাঙলা লেখা। নীল কাগজের প্যাড, এ তো তুই কাকে চিঠি লিখছিস—'

অসম্ভব। কতগুলো বইখাতা দিয়ে লেখার কাগজটা চাপা দিয়ে উঠে পড়ল সুকান্ত। এম-এ পরীক্ষার্থী ছেলের লেখাপড়ায় আড়ি পাততে আসে, কী দুর্ধর্ষ মা দেখ একবার! 'দাও, টাকা দাও, ফর্দ দাও।' হাত বাড়াল সুকান্ত: 'দরে যদি ঠকে আসি কিছু বলতে পারবে না কিন্তু। খুঁত ধরতে পারবে না। যা আনব তাই গিলতে হবে।'

মৃণালিনীর চোখ তখনো নীল কাগজটা খুঁজে বেড়াচ্ছে: 'কিন্তু কাকে চিঠি লিখছিলি?'

'কাকে আবার চিঠি লিখব? আমার কি কোনো লোক আছে, না, কারু আমি ঠিকানা জানি? আমি অমনি শুধু একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম। এক লাইব্রেরিতে একটা এসে-কম্পিটিশন হচ্ছে—ক্যাশ প্রাইজ আছে, ভাবছি পাঠালে হয় একটা রচনা। তারই একটু মক্স করছি। দাও, দাও, আর দেরি কোরো না। দাদার আবার নটায় হাজিরা।'

মৃণালিনী একটু আড়াল হতেই প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরল সুকান্ত। নইলে মার যখন একবার নজর পড়েছে তখন আর ওটাকে বাঁচানো যাবে না।

মনে-মনে একটা চিঠি লিখছিল কাকলিকে। নিভৃতে-নেপথ্যে ঐ লেখাটুকুই মনে মনে লেখা। যদি লেখবার অধিকার থাকত, যদি ঠিক মুখস্থ থাকত ঠিকানা, তা হলে কিভাবে লিখত তারই নির্জন নিদর্শন।

আপনি মনেও ভাববেন না, আমি লিফ্‌টম্যানকে হাত করে আপনাকে খাঁচায় পুরে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। দুর্ঘটনায় কত কি বিপরীত কাণ্ড ঘটে কেউ অনুমানও করতে পারে না। একটা জাহাজডুবির পর দেখতে পারি শুধু আমি আর আপনিই বেঁচে আছি, আর, শুধু বেঁচে আছি নয়, পাশাপাশি বসে আছি সমুদ্রতীরে। সবই দৈবের ব্যবস্থা।

না, না, এভাবে লিখলে ভারি বিসদৃশ শোনাবে। তার চেয়ে মনের কথা সোজাসুজি লিখে ফেলাই ভালো। প্রাণ যাতে জল হয় সেই প্রাঞ্জল কান্নায়।

মৌটুসকি—বলো, এছাড়া আর কী বলে তোমাকে সম্বোধন করতে পারি? তোমার নাম কাকলি, আদর করে সম্বোধন করতে হলে কাক বা কাকু বলে ডাকতে হয়—দুইই ভয়াবহ। তার চেয়ে তোমাকে মধুমুখী, তাচ্ছিল্যে মুড়কিমুখী ডাকা অনেক মিষ্টি। শোনো, তোমার জন্যে কত কিছু করতে পারি, এ তো সামান্য একটু কৌশল। এ কি তুমি মার্জনা করে নেবে না? এটুকু না করলে কি করে পাই তোমার সান্নিধ্যের সৌরভ, তোমার উষ্ণতার স্বীকৃতি? বলো, আমার কি খুব অপরাধ হয়ে গিয়েছে? তুমি কি উপরওয়ালার কাছে আমার নামে নালিশ করবে? এনকোয়ারি বসাবে? একটা গরিব লিফ্‌টম্যানের চাকরি খাবে?

না, না, তুমি তো বুঝতে-পারা টলটলে চোখ মেলে হাসলে, আমি-তুমি বললে। ঐটুকু নৈকট্য না হলে এতটুকু কি হত?

কী সুন্দর তোমার চোখ, তোমার দাঁড়াবার ভঙ্গি, তোমার নাকের ঠিক নিচে আর উপর-ঠোঁটের ঠিক উপরে ছোট্ট এক তিল ঢেউ, তোমার ঘননিবদ্ধ লাবণ্যের দুটি স্তূপ—

ছি, অমনি করে কি লেখা যায়?

বা, এ তো মনে-মনে লেখা। এ তো কেউ পড়বে না, কেউ দেখবে না। যে জানলে খুশি হত সেই কাকলিও নয়।

চিঠির কাগজটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো পকেটের মধ্যেই রাখল সুকান্ত। রাস্তায় জায়গায়-জায়গায়, এখানে-ওখানে কিছু-কিছু করে ছড়িয়ে দেবে।

নইলে, বাড়িতে; টেবিলের নিচে ঝুড়ির মধ্যে ফেললে, মার যা উৎসাহ, কে জানে, হয়তো বা ভাঙা প্রাণ জোড়া দিতে বসবেন। ধরা পড়ে গেলে কিছুতেই তাঁর কাছে আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। টিউশানির মাইনের পর্যন্ত চুলচেরা হিসেব নেবেন। তার মানে অগুন্তি মিথ্যে কথা বলাবেন। কদাচিৎ একটা পয়সা এদিক-ওদিক হলে ভিখিরিকে দিয়েছি বলে পার পেতে দেবেন না। ছাড়া পাঞ্জাবির পকেটে, এমন-কি ঘড়ির পকেটেও, হাত ঢোকাবেন লুকিয়ে।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, স্বাধীনতার চেয়েও সতর্কতা।

বাজারের থলে আর টাকা নিয়ে এল মৃণালিনী। সুকান্ত বললে, 'একটা ফর্দ লিখে দাও।'

'নিত্যিকার বাজারে আবার ফর্দ কি। যা বলছি তাই মনে করে নিয়ে আসবি। নইলে মাথাওয়ালা ছাত্র হয়েছিস কি করতে?' মৃণালিনী বিস্তৃত ফিরিস্তি মেলে বসল।

'কার কি দর?' অন্ধকার দেখল সুকান্ত।

'নিজে দেখে-শুনে দেখে নিবি, ঘুরে-ঘুরে—'

হরিপদকে দেখতে গেল সুকান্ত। এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে খানিকটা। তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে জেনে নিল দরাদর।

হরিপদর বাজারদরের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে সুকান্ত দেখল নিট বারো আনা পকেটে।

তুমি আমার এ মূর্তিটা দেখো না। আমি থলে হাতে বাজার করে ফিরছি, আমি চোর, আমি মিথ্যেবাদী, এ আমার পরিচয় নয়। তুমি কোন না একদিন কোমরে শাড়ি জড়িয়ে ঝাঁটা হাতে করে তোমার শ্যাওলা-পড়া নোংরা উঠোন পরিষ্কার করবে, কোন না দুটো মিছে কথা বলবে, খরচ-বাঁচা টাকা দুটোর একটা কোন না সরাবে এদিক-ওদিক। তবু সেই তোমার পরিচয় নয়। আমি চাকর নই, তুমিও দাসী নও। আমি আসলে রাজা, তুমি আসলে সম্রাজ্ঞী।

৩

তারপর একটা চিঠি এল।

যেন কী একটা তুচ্ছ অকেজো জিনিস এমনি অবহেলায় পিওন ছুঁড়ে দিয়ে গেছে জানলা দিয়ে। কান্নার মতন উপুড় হয়ে রয়েছে মেঝের উপর। আফিস-কাছারি টাইমের তাথৈ চলছে, গিন্নিবান্নিরা দিতে-থুতে ব্যস্ত, চাকরটা ছুঁচো-বাজির মত এখানে-ওখানে ছুটছে, ঠিক এ সময়টাতেই জমাদার আসে। যাতে খোলা নর্দমার মুখে ভর্তি-জল বালতি-সমেত চাকরের সঙ্গে না মুখোমুখি দেখা হয়। যাতে ঝাঁটা-গাছটা শিল্পীর তুলির মত এখানে-ওখানে এক-আধটু বুলিয়েই পালিয়ে যেতে পারে। যদি গোলমেলে হাওয়া উঠত আর চিঠিটা ঘুরে-ঘুরে উড়ে চলে যেত বারান্দায় তা হলে জমাদারের হাত থেকে তাকে আর বাঁচানো যেত না। গ্যাসপোস্টের নিচে যেখানে আবর্জনা জমা তারই উপর মাতৃহীন শিশুর মত পড়ে থাকত। আর ঐ যে নোংরা বস্তা হাতে কাগজকুড়োনো লোকটা আসে, দেখতে আধপাগল, সে ছোঁ মেরে কেড়ে নিত—জানতেও পারত না কী সে কুড়িয়েছে।

ভাগ্যিস হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছিল সুকান্ত।

একটা শাদা খামে কালো কালির অক্ষর। মেঝের দিকে তাকাতেই নিজের নামটা স্পষ্ট চোখে পড়ল। স্ট্যাম্প দেখা যাচ্ছে না। স্ট্যাম্প বুঝি ওপিঠে সাঁটা। সেটাই বুঝি সন্ত্রান্ত। ঠিকানার পিঠটা নিটুট রাখা। আর যেখানেই স্ট্যাম্প, সেখানেই সীল। যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি। কে জানে কী চিঠি! হয়তো হাতে করে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা ওলটালে দেখবে একটা বুকভাঙা বুক-পোস্ট! মুখটা পেটের মধ্যে ঢোকানো। তার নামে আবার সুস্থ-মস্ত খামের চিঠি এল কবে? যে দু-একটা এসেছে ঐ আজে-বাজে বুকপোস্ট ছাড়া আর কী! হয় কোনো বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল, নয়তো কোনো বারোয়ারির নিমন্ত্রণ। আর কখনো-সখনো পোস্টকার্ড। পোস্টকার্ড তো নয় থান ইট। লাইব্রেরির বইয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে—শিগগির ফেরত দিয়ে যাও, নয়তো কোনো ক্লাবের মেম্বর হয়ে চাঁদা বাকি ফেলেছে, তার এক আহ্নিক হৃৎকম্প।

নিচু হয়ে সুকান্ত তুলল চিঠিটা। চোখ বুজল। লাগ ভেলকি লাগ, যেন বুকপোস্ট হয়—তা হলেই উলটোটা হবে। চোখ বুজে ওলটাল খামটা—ধীরে ধীরে চোখ মেলল—না, আশ্চর্য, আগাপাশতলা মোড়া পরিপূর্ণ মাশুল চাপানো আস্ত-সুস্থ সুরক্ষিত চিঠি। আঠার আহ্লাদ একেবারে খামের সীমা পেরিয়ে বাইরে চলে এসেছে ; তার মানে খুব সতর্ক হয়ে নিবিষ্ট যত্নে এঁটে-সেঁটে দিয়েছে, যাতে সহসা না কেউ মুক্ত করতে পারে, আলগা করতে পারে প্রাণ-ভ্রমরের কৌটো। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি ?

আর কে !

হাওয়ায়-আসা গলার স্বর শুনে মেয়ে বলা যায়, বলা যায় জুতো দেখে, আরো একটু সূক্ষ্মে গেলে, তেলের বা সাবানের গন্ধে, তেমনি বলা যায় হয়তো হস্তাক্ষরে।

আর একটু গভীর গবেষণা করলে বলেও দেওয়া যায় কত বয়সের হস্তাক্ষর। গায়ে যদি নতুন যৌবনের গর্ব থাকে সাধ্য কি অক্ষরে সেই গোলালো গরিমা না মানো। সাধ্য কি না ফোটাও একটু ছিমছাম টানটোন। তা ইংরেজিতেই লেখো বা বাংলাতেই লেখো। মেয়ে ভাবতেই অত উৎসাহিত হবার আছে কী! মাসিমা-পাসিমার তো হতে পারে, কিংবা পিসিমা-টিসিমা। কার কী দরকার পড়েছে, চিঠিতে লিখতে তো বাধে না, ফরমাশ করে পাঠিয়েছে। চিঠিটা ওজনে বেশ ভারি, হয়তো কারু ছেলেমেয়ের বইয়ের ফিরিস্তি, ওল্ড বুকশপ থেকে কিনে দেবার বায়না। ভাগ্যের ভাণ্ডারে কত রসিকতাই আছে। হালকা একটা ইচ্ছেকে হোঁচট খাওয়াবার জন্যে পথচলতি কত নিষ্ঠুরতার ইট। কিন্তু যাই বলো, বনগাঁবাসী মাসিপিসিরা কেউ নয়, স্ট্যাম্পের কালি ধেবড়ে গেলেও টি-টি-এ পড়া যায়। কলকাতা ছাড়া অমন নামের ঘটা-ছটা আর কার। গড়বেতা বরপেটা দীনহাটা হরিণঘাটা যাই ভাবো, যাই বলো, সব একটা টি। শুধু কলকাতাতেই ডবল টি।

সন্দেহ কি, কাকলির চিঠি। কলকাতায় কাকলি ছাড়া আর মেয়ে কই ? বেশ তা, স্থির হলে, এখন খুলে দেখলেই তো হয় কে লিখেছে! অচল-অনড় হয়ে আছে কী করে ? আহা, কী লিখেছে সে কি আর জানে না ? নেহাতই মামুলি নীরস টা কথা, পড়া-পরীক্ষা নিয়ে নিষ্প্রাণ এক-আধটা প্রশ্ন এবং শেষকালে 'শুভেচ্ছা' ও সই। জানে, জানে, ওদিক থেকে গাছে উঠে মই খোয়াবার তার ভয় নেই। তো বা তার ব্যবহারের ত্রুটিতে আপত্তি করে পাঠিয়েছে। ফৌজদারিতে কাসুন্দি রানো হয় না, অপরাধের তামাদি নেই। আর যদি কিছু লেখেও ভাষার টানে, খবে, ইচ্ছে করেই ঠিকানাটা উল্লেখ করে নি। যাতে ছটফট করলেও উত্তরে উপশম পায় কোনোদিন।

জানে, জানে, সব সুকান্তর জানা। আরো জানে, যা লিখেছে দু লাইন, সামান্য একটা পোস্টকার্ডেও তা লিখতে পারত অকপটে। কিন্তু ন্যাড়া পোস্টকার্ড না পাঠিয়ে সজ্জিত ও আবৃত যে একটি খাম পাঠিয়েছে তাইতেই সুকান্ত ভরপুর। খামের মধ্যে চিঠিতে লিখিত তেমন কিছুই নেই, না থাক, কিন্তু চিঠির অতিরিক্ত, অলিখিত কিছু আছে, সেইটিই মহৎ। কাকলি জানুক আর না জানুক, খামের মধ্যে সে শুধু চিঠির কাগজই ভরে নি, ভরে দিয়েছে একটি প্রতীক্ষা বা একটি আকাঙ্ক্ষার কস্তুরি। চিঠির আর মূল্য কি, চিঠির মূল্য আমি তার মধ্যে কী পড়ছি তাতে নয়, কী অলিখিত উদ্ধার করবার আশা করে আছি তাতে। কী লিখেছে তার চেয়ে কে লিখেছে সেই আমার অনেক। এ সামান্যটিই অমূল্যের পোশাক পরতে পারে শুধু আমার দেখবার গুণে, একান্ত করে আমার কাছে। ধানের শিষে শিশিরটিকেই দেখি না, দেখি সেই হাসিখুশি সূর্য, গগন ছাড়া যার স্থান নেই। তাই চিঠি কে দেখে! এক মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখি। তার নত একটি দৃষ্টি, নম্র একটি পৃথুলতা, নিবিড় একটি নিভৃতি, নিটোল একটি বিন্দুর মত মন। তোমরা তট দেখ আমি তল দেখি।

চিঠিটা রাখবে কোথায়, লুকোবে কোথায়? ছি ছি, এ তার কী পোশাক, গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। লোকে ঠিক রকবাজ হামলাবাজ মনে না করলেও বাউণ্ডুলে ভাববে। কে জানবে তার ভিতরের কথা। সাধে কি আর মানুষে নেমপ্লেট লাগায়, পদবীর পদ্মবনে ঘুরে মরে! আমার ভীষণ ভূষণে দরকার নেই, গায়ে একটা শুধু জামা থাকলেই আমার এখন চলে যেত, চিঠিটা অপ্রকট করতে পারতাম। খামের চিঠি প্রকাশ্যে কেউ খুলবে না, তা ঠিক, কিন্তু কৌতূহলী তো হবে। আর মেয়েদে কৌতূহল গলাকাটা ছুরির চেয়ে বেশি।

তাকের থেকে বাবার একটা আইনের বই তুলে নিল সুকান্ত। তার মধ্যে গুঁজ চিঠিটা। কি একটা আইনের বই দরকার এমনি ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি উঠ উপরের দিকে।

বাবা খাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নিলি?'

'এই বইটা।' কন্‌ট্রাকটের বইটা দেখাল কাত করে।

'লাগবে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আবার ফিরিয়ে দিস মনে করে। যে বই সরে সে বই আর ফেরে না।'

একেক লাফে দু তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সুকান্ত চলে এল তার নিজের ঘরে বইটা টেবিলের উপর রেখে পোশাক বদলাতে লাগল। চোখ রাখল নিষ্কম্প, শেষকা

না ভুলে যায়। ঘাঁড় ফেলে ভাঁড় নিয়ে না বেরিয়ে পড়ে। একবার একটা দশ টাকার নোট এমনি বইয়ের মধ্যে গুঁজে রেখে কী কেলেঙ্কারি, কোন বই আর মনে করতে না। বই সরে গেলে আর ফেরে না, যে নিয়েছে দশ টাকা বেশি নিয়েছে। বোঝা তো নিয়েইছে, শাকের আঁটিটাও নিয়েছে।

সে ভুল যেন না হয়!

লুঙ্গি ছেড়ে পরল ট্রাউজার্স, গেঞ্জির উপরে শার্ট। বইটা তুলে নিল। না, অটুট আছে চিঠি, উড়ে যায় নি অবাস্তব হয়ে। না, বাড়িতে বসে পড়বে না—পরে আরো এক শ সাতবার না হয় পড়বে যদি পড়ার, মত কিছু থাকে—প্রথমবার পড়বে নির্মল কটি নির্জনে। চিঠিটা বুকপকেটে রাখল। আর নিল ছুরিটা। অপারেশন করার ছুরি।

বইটা হাতে নিয়েই নামল নিচে। বাবা আঁচাচ্ছেন মানে মুখ আর দাঁত আলাদা রে ধুচ্ছেন, দেখতে পেলেন। বললেন, 'কি, হয়ে গেল পড়া?'

'একটা সেকশান একটু দেখে নিলাম—'

কোন সেকশান জিজ্ঞেস না করলে হয়। তাড়াতাড়ি বইটা রেখে কেটে পড়ছিল, মা ধরলেন: 'পড়া-টড়া ছেড়ে এখন চললি কোথায়?'

'একজন ছাত্রের কাছে যাচ্ছি প্রফেসারের নোট আনবার জন্যে।' বেমালুম বললে সুকান্ত।

দোহাই ওরকম ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিও না। খামটা যে পকেটের থেকে ঢ্যাঙা এ মার নজরে পড়লেই হয়েছে! অবশ্য পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে কিন্তু মার চোখে সন্দেহের সাপ মরবে না। সসর্প ঘরে কি বাস করা যায় শান্তিতে?

তার চেয়ে চিঠিটাকে ভাঁজ করে ছোট করে নিলেই হত। ও বাবা, চিঠিটা তা হ'লে দুমড়ে দাগি হয়ে যেত যে। যে দাগি তার কি আর দীপ্তি আছে?

'ফিরতে দেরি করিস নে যেন।' মা মনে করিয়ে দিল।

'না, যাব আর আসব।' সুকান্ত বাইরের রকে দাঁড়াল এক পা: 'আর যদি দেরি হয় তোমরা খেয়ে নিও, বসে থেকো না।'

'তার মানেই হচ্ছে', বউদি টিপ্পনি কাটল: 'ভাত নিয়ে বসে থাকবার লোক ঠিক রে দাও।'

'মন্দ কি, পরীক্ষার পর সুকুর এবার বিয়ে দিয়ে দি।' বললে কাকিমা।

'বিয়ে দি!' মা উঠল ঝামটা দিয়ে: 'বউ নিয়ে উঠবে তার ঘর কোথায়?'

কাকিমাও ধনুকে ছিলা চড়াল: 'আমাকে বলছ তো? বেশ তো, তুমি বিয়ে ও, বউ আসবার আগের দিনই আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

'আমি সেই কথা বললাম!' মা তুড়ুং ঠুকল: 'বউ-বরণের সময় তুই বাড়ি থাকবি না?'

'নেমন্তন্ন করে গাড়ি পাঠালে থাকতেও পারি বা—' কাকিমা ছাড়বার পাত্রী নয়: 'তবে কতদূরে ঘর পাই, কি রকম সুবিধে-অসুবিধে হয় কে জানে।'

ঠাণ্ডা লড়াই। বারুদ বিদীর্ণ হয় বুঝি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে পথে বেরুল সুকান্ত। অনেক ভিড়, অনেক গাড়ি-লরি, ট্র্যাম-বাস, রিকশা-ট্যাক্সি, হ্যানো-ত্যানো, ঠেলাঠুলি-ঝুলাঝুলি, অনেক গিজগিজ-গমগম—সব পেরিয়ে এগুতে লাগল ফাঁকায়-ফাঁকায়। হাঁটাপথে জায়গায়-জায়গায় অনেক নিরিবিলি, ঐ গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে অনায়াসে পড়ে নেওয়া যায়। কিংবা ঐ বিজ্ঞাপনের বাক্সটার আড়ালে।

কী যে মানুষের কথা! এ কি একটা খবর যে এক ঢোঁকে গিলে নেবে? মাথা উঁচু করে এক চমক দেখে নেবে কী হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে? এ কি শুধু চিঠি পড়া? এ একজনকে পাশে নিয়ে বসা। তাই মাঠ বা ছায়া বা একটি জলের ধার পেলে ভালো হত। সুন্দর সবুজ ঘাস, নয়তো ঝিলিমিলি-ছায়া গাছ, নয়তো ঝিকিমিকি-আলো জল।

কিংবা কে জানে ডাক্তারের নির্জন চেম্বার আর একাকিনী রুগিণী।

আরো খানিকদূর এগিয়ে একটা পার্কে ঢুকল সুকান্ত। এখন আর লোক কোথায়! ঝোপের কোলে একটা বেঞ্চি বেছে নিয়ে বসল সন্তর্পণে। চারদিকে চেয়ে দেখল ধারে-পারে কেউ কোথাও নেই। এ যেন কাকে ও একটু আদর করবে। অন্যে না দেখে, অন্যের চোখে পড়ে আদর না তার কদর হারায়।

চিঠিটা বার করল পকেট থেকে। খুলে ফেললেই তো খোলসা। এক শক্তিশেলেই লক্ষ্মণপতন। প্রতীক্ষার রথ ভেঙে পড়া। আশার বাসা ছাড়া। স্বপ্নের মহাপ্রয়াণ।

তবু খুলতে তো হবে। রুগীর যন্ত্রণায় ডাক্তারের রোগ। পকেট থেকে ছুরি বার করল সুকান্ত। কত বাঁধনেই যে বেঁধেছে। সর্বত্র দড়ির দারোয়ানি। চুলে, বুকে, কোমরে—পায়েও হয়তো। সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে শল্য প্রয়োগ করল সুকান্ত। খামের মাথার দিকে ছুরি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঋজুরেখায় দীর্ণ করতে লাগল। একটুকু কোথাও এবড়োখেবড়ো না হয়, শাদা একটি সুতোর মত পরিচ্ছন্ন ধার থাকে তারই জন্যে ধারালো মনোযোগ।

আবরণ সরে গেছে, দু আঙুলে আলতো করে বার করল চিঠিটা। ধীরে-ধীরে মেলে ধরল পায়ের দিক—ইতিতে কী আছে দেখি। পরে মাথার দিক, সম্বোধন

দেখব। ইতিতে কাকলী। ঈ-কার দিয়ে লিখেছে। হ্রস্বদীর্ঘ ছেড়ে দিয়ে প্রায় ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠবার মত। কিন্তু সম্বোধন? সপ্তমীর বহুবচনওয়ালা গালভরা কিছু একটা থাকবে নির্ঘাত—তা কাকলির দোষ কী, বাঙলা ভাষার কার্পণ্য। প্রীতিভাজনেষু। ঠিকানা? ঠিকানাটা দিয়েছে তো? আঃ, যেন হার্ডল রেসের সব বেড়া ডিঙিয়ে এসে শেষ বেড়ায় পড়তে পড়তে লাফিয়ে গিয়ে ফার্স্ট হওয়া। দিয়েছে, বেশ বিস্তীর্ণ ভাবেই দিয়েছে। দেশ, কাল, সম্বন্ধ ঠিকই আছে, এখন বস্তু কী? বক্তব্য কী?

কিচ্ছু না। পরীক্ষার আগে ক্লাশ ভেঙে গিয়েছে, ছোট-ছোট ক্লাশ এখনো হচ্ছে, কিন্তু কাকলি যেতে পাচ্ছে না। তার বাবা বলছেন, যা পড়েছ তাতেই হবে। কিন্তু আপনি বলুন, যা দিয়ে কি তা হয়?

আপনি নিশ্চয়ই যাচ্ছেন। যদি কিছু দরকারি হতে পারে বলে মনে করেন চিঠি লিখে জানাবেন দয়া করে। বাড়ি ভীষণ প্রাচীনপন্থী, কিন্তু চিঠির উপরে স্বাধীনতা আছে এই যা সোয়াস্তি।

তারপরে শেষদিকটাতেই অশেষ।

কি, ভালোবাসা জানিয়েছে? দূর! অন্য কিছু? আষাঢ়ে গল্প! তবে, প্রীতি-শুভেচ্ছা? গাঁজার কলকে। তবে, শ্রদ্ধা? গলায় দড়ি।

তবে কী!

লিখেছে: 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?'

আমি ভালো আছি—এ কেউ লেখে? শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে বাপকে লেখে, নয়তো প্রবাসী স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে। কি রকম শাদাসিধে বোকাসোকা মেয়েটা। মনে-মুখে ভালো-ভালো গন্ধ। আর, আপনি কেমন আছেন? এ আবার একটা প্রশ্ন? সাধু, সরল, বিশ্বাসী—ভাবখানা এই, যেহেতু উনি ভালো আছেন সেহেতু আমিও ভালো থাকব এইটেই শুনতে চায়।

আসলে আপনিটা আর্ষ প্রয়োগ। আপনি কেমন আছেন না, তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ—এ কথার কোনো মানে নেই। ওটা কোনো বিবৃতি নয়, প্রশ্ন নয়—ও হচ্ছে শাশ্বত একটি শ্লোকের দুটি ঘনিষ্ঠ চরণ। সুধা-সমুদ্রের পাশাপাশি দুটি ঢেউ।

শুধু এতেই খুশি?

না, তারপরে আরো একটু আছে।

একটি 'তারপর' আছে।

মানে ?

পড়ছি, পড়ে শোনাচ্ছি। সুকান্ত আবার পড়ল : 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ? তারপর— ? ইতি কাকলী'

তারপর ? তারপর ?

লাফিয়ে উঠল সুকান্ত। গাছপালা ঘাস-ফুল পর-ঘর লোকজন সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল—তারপর ? একটি অনন্তকালের প্রশ্ন জড়ে প্রাণে মনে সর্বত্র সর্বদা দুলতে লাগল চোখের উপর : তারপর ? তারপর ?

এক কবি লিখেছিল কে যেন রোদ হয়ে গিয়েছে। তখন কথাটা বোঝে নি সুকান্ত। আজ মনে হল সে যেন সত্যি রোদ হয়ে গিয়েছে, আলো হয়ে গিয়েছে, তারপর হয়ে গিয়েছে।

ঈশ্বরের স্রষ্টা কে ? ঈশ্বর। তার স্রষ্টা কে ? ঈশ্বর। যদি শেষ স্রষ্টা কল্পনা করতে পারো সেই ঈশ্বর।

তার পরের পরে কী ? তার পরে ? তার পরে ? তার পরের শেষ সংহর্তা তারপর। ঈশ্বরের জন্ম নেই। তারপরের মৃত্যু নেই।

এখন যাই কোথায় ?

একবার দীপঙ্করের কাছে যাই।

পকেট ফাঁকা মাঠ, হেঁটেই যাই। হাঁটতেই ভালো লাগছে। দিবারাত্র কত নালিশ করেছে ঘরে-পরে, ভালো লাগে না। এই মেয়েলি কান্নাই তো জীবনের নিশ্বাসবায়ু হয়ে আছে, কিন্তু, আশ্চর্য, এখন যেন অভাব বলে কিছু নেই, অভিযোগও দেশান্তরী। এই রোদ এই পথ এই চলবার ইচ্ছে, চলতে পারার শক্তি, এই অনেকানেক। দীপঙ্করও তাই বলে। বলে, চাকরি-বাকরি নেই, ধারে-ভারে দুঃখে-কষ্টে আছি, তবু এত সত্ত্বেও নিজেকে অসুখী বলে ভাবতে লজ্জা করে। একেক সময় মনে হয়, আমি তো রাজা। কখন জানিস ?

'যখন কবিতা লিখি।'

'সত্যি ?'

'একটা গোটা রাত কেটে যায় কখনো। একটা কবিতাকে মেলতে-ঢালতে সাজাতে-গোজাতে, ভাঙতে-চুরতে। সে যে কী সুখ কাকে বোঝাই। ভাবি, কত লোকের এ আনন্দে অধিকার নেই। কত লোক কবিতা পড়ে একটুও রোমাঞ্চিত হতে জানে না, এক আকাশ তারা বা এক মাঠ মানুষ কোনোই অর্থ আনে না তাদের কাছে। ভাবি, ওদের চেয়ে আমার পাল্লা কি ভারি নয় ওজনে ? আমার এই

যোঝবার মত মন বোঝবার মত মন এ কি আমার একটা সম্পদ নয় ? না-এর মধ্যেও কি হ্যাঁ নেই ?'

'সাধে কি আর তোকে কবি বলি ?'

'কিন্তু যখন চাকরি পাব, প্রাচুর্যের ঘরে আসব, তখন কে জানে এই মন থাকবে কিনা, এতখানি থাকবে কিনা। তখন কে জানে, নরুন পাব নাক খোয়াব। কত লোক জানি আরাম পেয়ে অভিরামকে হারিয়েছে। স্থূল পেয়ে সূক্ষ্মকে। স্ত্রী পেয়ে প্রেয়সীকে।'

'তবু দরকার তো উদর আর স্ত্রী আর টাকা—'

'এক শ বার দরকার। শুধু দরকার নয় ফুল আর তারা, প্রেম আর শ্রী, ধর্ম আর কবিতা—'

'আমরা তোমাকে এমন স্টেট দেব যেখানে তুমি আরামে থাকবে আর কবিতা লিখবে।'

'কে জানে স্বচ্ছন্দে থাকলে ছন্দ বাজবে কিনা। যন্ত্রণা না থাকলে হবে কিনা সৃষ্টি। আর যদি সংগ্রামই না থাকে থাকবে কিনা ভালোবাসা !'

'কী বলছ তুমি ? সংগ্রাম তো ঘৃণায়, আক্রোশে।'

'না, যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ঘৃণা নয়, ক্রোধ নয় ; যাদের জন্যে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কাজ করছে না বলেই কিছু হচ্ছে না।'

তাই ভালোবাসি বলো, জীবনকে ভালোবাসি। কোনো কিছু কেটে-ছেঁটে নয়, বাদ-সাদ দিয়ে নয়, না মাথার দিকে, না পায়ের দিকে। বিরাটের বার্তাবহ মানুষ, তার পা পাতালে, মাথা আকাশে।

আজ যদি এসব কথা বলে দীপঙ্কর, তবে সুকান্ত বলবে, 'তারপর ?'

তাকে স্তব্ধ করে দেবে।

'দীপঙ্কর কোথায় ?' ঘর খালি দেখে থমকে দাঁড়াল সুকান্ত।

'আপিসে। চাকরি পেয়েছে যে।' মেসের বাসিন্দে একজন বললে।

'চাকরি পেয়েছে ?' উৎফুল্ল হল সুকান্ত : 'কোথায় ?'

'ধীরেন এণ্ড সন্‌সে।'

'ও, আমাদের বরেনদের ফার্মে।' এ যেন আরো খুশির খবর।

কিন্তু—তারপর ?

বুকপকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করল সুকান্ত। একটা একসারসাইজ

খাতার মাঝখান থেকে ডবল পৃষ্ঠার আস্ত পাতা ছিঁড়ে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে দ্বিতীয়টা শাদা রেখেছে। তবে, তারপরে কি শূন্যতা, শুভ্রতা, নিশ্চিহ্নতা?

তবুও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। তারপর?

৪

সকলের আগে যাবে আর সকলের শেষে ফিরবে, এই ছিল ভূপেনের গুরু-মন্ত্র: আর কখনো হাকিমের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তোমার আইন না-জানা থাকলেও চলবে, হাকিমকে জানো, লোকচরিত্রে ব্যুৎপন্ন হও। হাকিম যদি ত্যাড়া হয় তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও, আর যদি তুখোড় হয় তুমি বোকা সাজো। নইলে তুমি কিসের উকিল? কিসের তোমার কথাবেচা পেশা? কিসের তবে তোমার তুকতাক, উচাটন-বশীকরণ? যেমন তরবার তেমন দরবার। যে ব্রতে যে কথা। শনিপুজোয় নারকেল, হরির লুটে বাতাসা, সত্যনারায়ণে সিন্নি। হাকিম যদি স্তব্ধ হয়, যদি সাত চড়েও রা না কাড়ে তা হলেই গেছ। যদি শতং লিখ মা বদ এই মন্ত্র ধরে, বলে, বলব না, শুধু লিখব তা হলেই কঠিন। তখন তাকে তোয়াজ করো, যা করে পারো কথা কওয়াও। যে বউ হাসে না কাঁদে না কথা কয় না তাকে নিয়ে ঘর করবে কি করে? তবে তুমি উকিল, তোমার অসাধ্য বলতে কিছু নেই, হয় তুমি তাকে হাসাও, নয় রাগাও, নয়তো পিছনে লেগে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ো। বোবার শত্রু নেই ভেবেছ, কিন্তু উকিল কারু মিত্র নয়, এমন-কি নিজের মক্কেলেরও নয়।

'এত সকালে যাচ্ছ কি, কোর্টে গিয়ে ঝাঁট দেবে নাকি?' মৃণালিনী গোড়ায় গোড়ায় বিদ্রূপ করত: 'এখন তো লাইব্রেরিও খোলে নি।'

'উকিলের লাইব্রেরি কি ঘর নাকি? উকিলের লাইব্রেরি তো সমস্ত বটতলা।'

'বটতলা?'

'ভূসংসারে এমন কোনো আদালত পাবে যেখানে বটগাছ নেই? বটতলার বই কথাটা চলেছে শুনতে পাই, কেন চলেছে জানি না। আসলে কথাটা হবে বটতলার বউ, মানে উকিলের স্ত্রী—'

এমনি সকাল সকাল গিয়েই এক মক্কেল গেঁথেছিল ভূপেন। কে একটা লোক দূর মফস্বল থেকে এসেছে বোধ হয়, ফ্যাফ্যা করে ঘুরছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে

ভ্যালভ্যাল করে। ভূপেনের খপ্পরে পড়ে গেল। ভূপেন তাকে একটাও মিথ্যা কথা বলল না, একটুও বাকতাল্লা মারল না, ভুল পথ বা ঘুর পথ দেখাল না—ফেলল না খরচের নর্দমার মধ্যে—মোলায়েম কথায় তার বিশ্বাস জন্মিয়ে সম্বন্ধ পাকা করে নিল। পরে দেখা গেল শাঁসালো মক্কেল—ক্ষীরের বাটি—হাত লাগাতে না লাগাতেই ডুবে যায় কব্জি পর্যন্ত।

'আশেপাশের সমস্ত বাবুরা কখন সন্ধে হতে না হতেই ফিরে আসে। তোমারই আর দেখা নেই।' মৃণালিনীর এ আরেক অভিযোগ।

'ওদের আপিস, আমার আদালত। কর্তব্য শেষ হয় ধর্তব্য শেষ হয় না, মানে কখন কাকে ধরা যাবে কেউ বলতে পারে না।'

তেমনি সন্ধের দিকে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভূপেন ধরেছিল আরেক মক্কেল। হাকিমরা চলে যায় বটে, কিন্তু আমলারা থাকে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সরকারি আলো জালিয়ে কাজ করে। আর যতক্ষণ আমলা ততক্ষণ হামলা। এ নথি ঘাঁটো ও নথি হাটকাও। এর থেকে চোরাই নকল নাও, ওর থেকে সিল খুলে দলিল দেখ। ঘুষ দেওয়া অপরাধ হতে পারে, কিন্তু ধুলো দেওয়া তো অপরাধ নয়। অনেকে আছে হাত পেতে ঘুষ নেবে না, কিন্তু চোখ পেতে ধুলো নেবে না এমন চোখ কার। স্বয়ং বটবৃক্ষকেই ধুলো দিতে পারো এ তো তৃণগুল্ম। আর ধুলো দিয়ে দলিল সরাও, কাটাকুটি করো, তোলাপাঠ মারো কিংবা টিপটাপ ধেবড়ে দাও। আর এই সব কৌশলের কার্তিক, যে যাই বলো, উকিলই। আমলার ঘরও যদি বন্ধ হয়, আছে খাবারের দোকান, পানের দোকান, অবশেষে বারান্দা। উকিলের সেরেস্তা ট্র্যামস্টপ পর্যন্ত প্রসারিত।

তেমনি একদিন অনেকক্ষণ থেকে, শেষ পর্যন্ত থেকে, এক সাহেব ধরেছিল ভূপেন। রেল কোম্পানির সাহেব।

আসতে আসতে দেরি করে ফেলেছে। বিদেশী মানুষ, কায়দাকানুন কিছু জানে না, জানে না অন্ধিসন্ধি, চারদিক কালো দেখছে। তার মধ্যে আরেক কালো, কালোর কালো দেখে উৎফুল্ল হল।

হ্যালো ব্ল্যাক—হাত তুলে ভূপেনকে ডাকল সাহেব।

ভূপেন বুঝল, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো নয়, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো কোট।

এত বড় সম্মান তাকে আর কে দিয়েছে? এতখানি আসান!

সাহেব জিজ্ঞেস করলে, তুমি উকিল?

হ্যাঁ।

সিভিল না ক্রিমিন্যাল ?

চেহারায় নিঃসন্দেহ সিভিল, চরিত্রে কিরূপ, মাথা চুলকে ভূপেন বললে, তুমি বলবে।

আমাকে উপশম দিতে পারো ?

উকিল উপশম করতে জন্মায় নি। তবে আইন যতদূর সিঁড়ি ফেলে রেখেছে ততদূর নিয়ে যেতে পারে উকিল—এই পর্যন্ত।

ভূপেনকে ভালো লাগল সাহেবের। ভূপেনের জুটল আরেক কাঁকুড়ের খেত।

কয়েকটা বছর নথিতে নাক ডুবিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল ভূপেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার কেমন বেসুরো লাগতে লাগল। সে দেখল সত্যের স্থান খুবই সংকীর্ণ আদালতে—শুধু স্থান কেন, সম্মানও। যার মামলা নিরাবরণ সত্য তাকেও মিথ্যের গয়না পরাতে হয়—গয়না না-পরা থাকলে কোনো মামলাই পাবে না ছাড়পত্র। আর যার মামলা ডাহা মিথ্যা, নির্বনেদ, বন্ধ্যাপুত্রের মত বানানো, সে শুধু টাকার জোরে, সাক্ষীর জোরে, উকিল-ব্যারিস্টারের চোপার জোরে ঠিক জিতে নেবে মামলা। পর-পর কটা মিথ্যে মামলা জিতে হতাশ হয়ে গেল ভূপেন।

জিতবে না কেন? আইনকে যেখানে ভাষায় বেঁধেছে, আর ভাষা যখন বহু ক্ষেত্রে প্রকাশের উপায় না হয়ে প্রকাশের বাধা, তখন সেখানে বিচার সূক্ষ্মে চলে গিয়েছে, চলে গিয়েছে কমায়-সেমিকোলনে, স্রেফ ভাষাতত্ত্বে। সত্য সূক্ষ্ম হতে জানে না, মিথ্যেরই সূক্ষ্ম হবার নৈপুণ্য। মানুষের সোজাসুজি বিচার নয়, আঁকিবুঁকি বিচার। বিচার ভাবগ্রাহী নয়, ভাষাগ্রাহী। তাই কারুকার্যের জয়, আঙ্গিকের জয়। বস্তুর জয় নয়, শিল্পের জয়। স্বাস্থ্যের জয় নয়, চাকচিক্যের জয়, পারিপাট্যের জয়। আর সে-ই হারবে যে গরিব, যে দুর্বল, যে মূর্খ। তবে আজকাল গরিবও জালসাজ, দুর্বলও দুষ্ট আর যে মূর্খ সে আসলে দুর্যোধনের মাতুল।

যতই এগুতে লাগল ততই বিতৃষ্ণা ধরল ভূপেনের। এফিডেভিট, যাকে গাঁয়ের লোকেরা বলে এপিঠ-ওপিঠ, এপিঠ-ওপিঠই মিথ্যে। উপায় কি, একটা সাক্ষীরও পুরো সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই। মামলার যেভাবে স্বরলিপি করা হয়েছে সেভাবেই তাকে তাল মান রেখে গাইতে হবে। স্বাধীন সুর দিয়েছ কি মামলা ফানুস হয়ে গেছে। হলফ দেওয়া কেন? সত্যের পাকা গোঁফে মিথ্যের কলপ দেওয়ার জন্যে।

'আইন যদি এ চালাকি করতে দেয় আপনি করবেন না কেন?' সহযোগীরা কেউ বলে : 'আমরা তো আইনেরই খিদমৎ করতে এসেছি।'

'মাহুষের জন্তে আইন, আইনের জন্তে মানুষ নয়।' ভুপেন বলে: 'চালাকির জোরে আরেকজনের স্তায্য দাবি ভণ্ডুল হয়ে যাবে তাতে আমি নেই।'

এ উকিলের পসার হয় কি করে?

'আপনি তো দোষ করেছেন, গিলটি প্লিড করুন, দোষ স্বীকার করুন।'

'বা, আমি বাঁচবার চেষ্টা করব না?'

'তার মানে আইনকে কলা দেখাবেন?'

'দেখালামই বা। আইন যদি কলা দেখাবার জন্তে বাজার বসায় আমি ছাড়ি কেন? আমার কলাই যে পণ্য।'

'ওসবের মধ্যে আমি নেই।' ভূপেন কাঠখোট্টা: 'মিথ্যে ডিফেন্স আমি নিতে পারব না।'

'কিন্তু ও পক্ষের তো প্রমাণ করতে হবে। সেইখানে আপনি লড়ুন। ওদের প্রমাণের পাহাড়ে চিড় ধরিয়ে দিন।'

'অত শত আমি বুঝি না। দোষ করেছেন যখন, তখন পরুন হাতকড়া। নয়তো অন্য উকিল দেখুন।' ভূপেন মুখ ফেরাল।

'আপনি আমাকে, ব্যক্তিটাকে দেখছেন কেন? আপনি মক্কেলকে দেখুন। আইনের ফল বিচার, অবস্থার ফল মক্কেল। বিশেষ অবস্থায় পড়ে মক্কেল যদি অনাচার কিছু করে থাকে তবে তার পক্ষে বলবার বা ধরবার কিছুই থাকবে না? সে নিজের থেকে গলা বাড়িয়ে কোপ নেবে?'

'না, কোপ নেবে কেন? গলা বাড়িয়ে মালা নেবে। রেপ কেসের আসামী, তাকে গলায় ফুলের মালা দেবে। নিয়ে যাবে মিছিল করে।'

ক্রমে ক্রমে প্র্যাকটিস আরো পড়ে গেল ভূপেনের। সংসারে দেখা দিল অনটন। পেণ্টালুন ছোট হতে শুরু করল। জ্বলে গেল কালো কোট।

যেটা সত্যি-মামলা বুঝব সেটা নেব। তেমন আর কটা? এ প্রায় শিশিরের আশায় চাষ করা। ভূপেনের যদিও সৎ উকিল বলে সুনাম, সৎ মামলার ইনাম পাবার সুনাম নেই। তা হারলে হারব, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে লড়ছি এই আমার তৃপ্তি। কারু তৃপ্তি টাকায়, কারু তৃপ্তি সাধুতায়।

'সাধু, সাধু হয়েছেন!' মৃণালিনী কত গঞ্জনা দিয়েছে। 'সত্যপীর এসেছেন চেরাগ জ্বেলে!'

উকিল উকিল, তার মধ্যে সাধু-অসাধু কি। টাকা টাকা, তার মধ্যে ভিতরি-উপরি কি। প্রেম প্রেম, তার মধ্যে বৈধ-অবৈধ কি!

কোর্টে যাওয়া ছাড়ে নি ভূপেন। তার এখন প্রধান কাজ হচ্ছে বই লেখা। গল্প-উপন্যাস নয়, গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা-ভাষ্য নয়, লিখছে আইনের বই। স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, কোর্ট-ফিজ অ্যাক্ট। সব বই-ই বাজারে চালু, নাম-দামও যথেষ্ট কিন্তু ঢালাঢালি টাকা কই? প্রকাশকরা ঠিকমত হিসেব দেয় না আর দিলেও বেশি ছাপিয়ে কম দেখায়।

হ্যাঁ, বিত্তাই তৃপ্তি; বিত্তাই সকল অভাবের ভরণপূরণ।

উন্নতির সরু ডগায় এসে উঠলেও সকল উন্নতেরই যে বুদ্ধির ডগা সরু নয় তাই তার বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ভূপেন। যারা নজির সৃষ্টি করছে তাদের নজর যে নির্ভুল নয়, বহু জায়গায় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। আর আজকাল হাকিমদের রায়ের কি ছিরি! না আছে রস না আছে গন্ধ। বলে আইনে আবার রস কি। আইন নীরস হোক, আইনে যে কাহিনীটি আছে তাকে দেখার গুণে লেখার গুণে সরস করা যায়। কাঠঠোকরা পর্যন্ত শুকনো কাঠের মধ্য থেকে চিনির বাসা আবিষ্কার করে।

বড় কর্তাদের অশুদ্ধি আর শৈথিল্য শাসন করছেন, ওঁরটা করে কে। দিবারাত্র গজগজ করে মৃণালিনী। তবু যদি বুঝতাম লিখেই, ঘর ভরা দূরে থাক, পেট ভরছে। টাকা এক দিক দিয়ে এলেই হয়, ঘোড়ায়, নয় তাসে, নয় বইয়ে। আর সে বই প্রসিদ্ধই হোক কি নিষিদ্ধই হোক। রোজগার দিয়ে কথা। হালালিতে না পারো দালালিতে। কাঁচি দিয়ে পকেট মেরে নয়তো কলম দিয়ে। এ জাতও গেল, পেটও ভরল না।

'সুকু।' ডাক দিল ভূপেন।

শনিবারে জজকোর্ট খোলা থাকে কিন্তু মুৎফরাক্কা মামলায় সেদিন তো সমস্ত আদালত বোঝাই। তিনটের মধ্যেই বাড়ি চলে আসে কে? বার-লাইব্রেরিতে দিব্যি ফরাশ আছে, গড়গড়া আছে, আড্ডা আছে, কেচ্ছা আছে, ওসব ছেড়েছুড়ে অসময়ে কে প্রত্যাবৃত্ত হয়! তারপর যা একখানা হাঁক দিয়েছেন, নিশ্চয়ই ফরমায়েশের হাঁক। কী বিপদে ফেলেন না জানি!

'কেন?' কাছে এসে দাঁড়াল সুকান্ত।

'শোন, একবার প্রেসে যাবি। এই অর্ডার প্রুফগুলি দিয়ে আসবি। আর নতুন প্রুফ যা হয়েছে নিয়ে আসবি। সাত ফর্মা পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। যদি আরো কিছু ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে নিয়ে আসবি ফাইল-কপি।'

'এ কি রকম প্রেস!' গলার কাছে বালি-বালি লাগতে লাগল সুকান্তর: 'ওদের লোক দেওয়া-নেওয়া করতে পারে না?'

'তাই তো করে। তবে এ প্রুফগুলি ভারি জরুরি। ওদের লোকের জন্যে বসে থাকলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। বইটা খুব শিগ্‌গির বার করে দেওয়া দরকার।'

'বা, আমার পড়া নেই?'

'শুধু যাবি আর আসবি। কতক্ষণের বা মামলা।' একটু যেন অপরাধী শোনাল ভূপেন: 'পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

'তারপর ফেরবার সময় বাসন্তীকে একবার দেখে আসিস।' বললে মৃণালিনী, 'কাছেই তো বাড়ি। আর যদি আসতে চায়—'

'নিয়ে আসিস—'ভেঙচে উঠল সুকান্ত।

বিজয়া এসেছে উপরে।

'কি, তোমার জন্যে ফ্ল্যাট কোথাও দেখে আসতে হবে?' সুকান্ত মুখিয়ে উঠল।

'না, তুমি যদি বলো তো তোমার সঙ্গে যাই। আমার বোনপোর ছেলেটার কি অসুখ শুনেছি।' বললে বিজয়া, 'আমাকে সেখানে রেখে প্রেসে যাবে আর ফেরবার সময় নিয়ে আসবে।'

'তোমার বোনপো থাকে তো সেই কারবালায়। ভারতবর্ষের বাইরে।'

'না, না, বাসন্তী যদি আসতে চায় তা হলে বাস-এ ট্র্যামে দু-জনকে ও সামলাবে কি করে?' বললে মৃণালিনী, 'বাসন্তী এলে তার আণ্ডাবাচ্চা কোন-না নিয়ে আসবে!'

'কেন যে তোমাদের চলনদার লাগে কাকিমা—'

'ট্র্যাম-বাস লাগবে না। ট্যাক্সি নেবে।' ঝলক দিল বিজয়া: 'এপিঠ-ওপিঠ দু পিঠেরই না হয় ভাড়া দেব।'

বন্দনা বেরুচ্ছে ঘর থেকে।

'তোমার কিছু ফরমায়েশ?' সুকান্ত তাকাল চোখ তুলে।

'আমার কথা তুমি কত শোনো।' মুখ ভার করল বন্দনা।

'তোমার কথাটা দাদার কথা বলে এলে না শোনে সাধ্য কার।'

'তোমার দাদা বলছিল—'

'ঐ তো—'

'তোমার দাদা বলছিল', হাসতে-হাসতে গম্ভীর হল বন্দনা: 'তোমার দাদা বলছিল, যদি ওঁর ওষুধটা একবার খোঁজ করো।'

'কেউ পায় না খেতে, কেউ আবার পারে না হজম করতে।' দার্শনিক হবার ভাব করল সুকান্ত: 'শুধু খাবার হলেই চলে না, আবার হজম করবার ওষুধ চাই।'

'তা তো বটেই।' বন্দনা ফোড়ন দিল: 'শুধু পরীক্ষা পাশ করলেই চলে না, তারপর আবার চাকরি চাই।'

'শুধু চাকরি পেলেই চলে না, মাসান্তে আবার মাইনে চাই। তুমি চটছ কেন?' একটু মোলায়েম হল সুকান্ত: 'তুমিই বলো কখন খোঁজ করব ওষুধ।'

'তা জানি না—' হলকা ছুটিয়ে চলে গেল বন্দনা।

'কেন, প্রেসে যাবার পথেই না হয় খোঁজ করলি।' মৃণালিনী বললে, 'একটু আগে না হয় বেরো—'

'একটা লোক আর সতেরো গণ্ডা ফরমাশ।' বিজয়ার দিকে তাকাল সুকান্ত: 'তাই তো বলি কাকিমা, যদি শান্তি চাও, একটা ফ্যালেট নাও, নয়তো হোটেলে গিয়ে ওঠো—'

'অতশত কাজের বোঝা দিও না ওকে।' ভূপেন হাঁক দিল: 'আমার প্রুফ ঠিক আনা চাই।'

নিজের ঘরে ফিরে এল সুকান্ত। এরা কী জানে কত কী কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে এই তারপরের পৃথিবীতে। আজ কি সমস্ত দুপুরটা পথে-পার্কে ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে ছোটখাট আড্ডা দিয়ে চলন্ত মানুষের মুখ দেখে-দেখে কাটাবার মতন নয়? কাকলি যেহেতু ছটার সময় দেখা করতে বলেছে, ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে পাঁচটার সময়ই সে বেরুবে ঠিক করেছিল। এমন লগ্নকেও সে আনতে চেয়েছিল হিসেবের মধ্যে, বাঁধতে চেয়েছিল ঘড়িঘণ্টায়? বেশ হয়েছে। কাজলের ঘরে থাকা মানেই গায়ে কালি লাগানো। সংসারে বসবাস করা মানেই পাঁচজনের ফরমাশ খাটা।

কত জল চলে গেল গঙ্গায়। কত হাওয়া বয়ে গেল মাঠ দিয়ে। কত মেঘ ভেসে গেল আকাশে-আকাশে।

কত মুহূর্ত তার দিনরাত্রির সবুজে ঝরে পড়ল সোনার শিশিরের মত।

তারপর?

তারপরের পাপড়ি মেলতে-মেলতে এটুকু পর্যন্ত খুলেছে। এটুকু রঙ এটুকু রস এটুকু সুগন্ধ।

'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। বিপন্নের চোখে নয়, বিস্মিতের চোখে নয়, আত্মীয়ের চোখে। আত্মীয় কথাটার মানে কমে গিয়েছে অভিধানে, তাই না?

তোমাকে বাড়িতে ডাকি সাহস নেই। কিন্তু যদি ডাকতে পারতাম, ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম দেয়াল-ঘেঁষা রাস্তার কদমগাছে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। দেখেছ কদমফুল? ছুঁয়েছ? ধরেছ? শুঁকেছ?

তাই বলছি, 'স্বাতী' সিনেমার সামনে আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে দেখা করতে এসো। আমি থাকব। এসো কিন্তু। কাকলী।'

পায়ের কদাকার কাবলিটার দিকে তাকাল সুকান্ত, স্যাণ্ডেলটা আরো রোমহর্ষক। কে তাকাবে পায়ের দিকে? ধুতি আর শার্ট একেবারেই বিদখুটে। কে দেখবে ধুতি-শার্ট? আর পকেট তো গগন-ললাট। কে উঁকি মারবে পকেটে?

সুকান্তর কত দুশ্চিন্তা কত ক্লেশ। পড়ে কিছুই মনে থাকছে না, রাত জাগতে পারছে না। কী খাতা না জানি রেখে আসে সে পরীক্ষায়। টিউশানি ছেড়ে দিয়েছে, দাড়ি কামাবার তুচ্ছ যে ব্লেড তাও ঠিক দিনে কিনতে পাচ্ছে না। তবু, এত সব সত্ত্বেও, তার সুখ কেন? তার তো এখন দেয়ালে মাথা কোটা উচিত, যাতে পরীক্ষাটা মানে-মানে উতরে যায়, যাতে একটা চলনসই চাকরি হয়, মার মেজাজটা একটু বশে আসে, বাবা একটু ছেলে নিয়ে গর্ব করতে পারেন, দাদাকে খাটতে না হয় ওভারটাইম, বউদি নিজেকে একটু কম দুঃখী বলে মনে করে, কাকিমার অহংকারটা একটু নরম হয়, সুবীরের একটা মাস্টার জোটে আর বাসন্তীর নির্যাতন-নিবারণের পথ মেলে— তার কত সমস্যা, কত অভাব, কত দায়িত্ব, কত যন্ত্রণা, কত সংগ্রামের ভূমিকা— তবু, তবু তার সুখ কেন? এত কালো বর্ষায়ও আকাশ আবার নীল কেন? কেন না চাইলেও সুখ আসে? এত এত সুখ। কেন সুখকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? কেন বলা যায় না, আমি সংগ্রামী, আমার সময় নেই, তুমি চলে যাও? বললেও যায় না কেন? মাটি চায় না তবু কেন আসে বন্যা? মরাকাঠ চায় না তবু কেন মঞ্জরীরঞ্জন?

'শোন, সতেরো-আঠারো এ দুটোর অর্ডার গেল।' ভূপেন বলছে যখন সুকান্ত বেরুচ্ছে, 'আর পরের গ্যালিপ্রুফ যেন মেক-আপ করে দেয়। উনিশ-কুড়ি যা দেয় নিয়ে আসবি। শোন, দেখে যা—'

তুমি কি এখনো গ্যালিপ্রুফ না মেক-আপ?

...৫...

কিন্তু কোথায় নীলাকাশ ?

দেখতে দেখতে মেঘ করে এল পশ্চিমে। বাস-এর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার সুকান্ত। চোখ-জুড়ানো কিন্তু হৃদয়-জ্বালানো কালো। মনে হল যেমনি আছে তেমনি লেগে থাক আকাশে, চিত্রার্পিতের মত। আর যেন না ছড়িয়ে পড়ে। যেন আর না জমাট বাঁধে।

বাস-এ একজন সোয়ারি তার পাশের বন্ধুকে বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখেছিস ? এবার ঝরবে।'

ওদিক থেকে আরেকজন টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'তাকাবেন না মশাই। নজর দেবেন না।'

'হ্যাঁ', প্রথমোক্তর বন্ধু বললে, 'নজর দিয়েছেন কি লজ্জায় সরে গেছে নববধূ।'

সুকান্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টির কি কোনো শক্তি আছে, সম্মোহনী কি উচাটনী ? সে কি ভস্মলোচন ? তার চোখের দৃষ্টিতে মেঘ কি ভস্ম হয়ে যাবে ? চলে যাবে দূরান্তরে ?

কত মেঘ তো আসে আবার চলে যায়। এও যেমনি এসেছে তেমনি চলে যেতে পারে না ? একবেলা দেরি করে ঝরলে কলকাতা কী এমন অশুদ্ধ হবে ?

'ঝরুক মশাই ঝরুক। প্রাণ ভরে ঝরুক। হাড়মাস সেদ্ধ হয়ে গেল।'

'ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে বাত ধরে গেল শরীরে।'

'কী ঘাম আর ঘামাচি রে বাবা। মশা-মাছি তো গা-সওয়া। এ রাম আর সুগ্রীব একসঙ্গে। ঘাম আর ঘামাচি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।'

সবাই খুশি। তাই যে যার মনে টীকা-টিপ্পনী কাটছে।

প্রথমোক্ত বললে, 'মাইরি যদি বৃষ্টি নামে তা হলে কাজটা হবে না। ঠিক বলবে বৃষ্টির জন্যে দেখছেন না বিক্রিবাটার অবস্থা। মাইরি দেবে না টাকা।'

'বা, তুই তো বৃষ্টির আগেই গিয়ে পড়বি।'

'জানি না পারব কিনা পৌঁছুতে যে রকম তোড়জোড় চালিয়েছে। বৃষ্টির আগে

পৌছুতে পারলেই বা কি। বলবে, দেখেই খদ্দেররা হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়েছে। মাইরি, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'তবু নামুক বৃষ্টি। সব ভণ্ডুল হয়ে যাক।'

'তোর কী—'

'কারুরই কিছু না। আকাশের খেয়াল। বৃষ্টি হলে আমি মাইরি গান ধরব।'

'আমি মশাই ভিজব গা খুলে।'

'খুব তো উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তারপর যখন খানিক ঝরার পর রাস্তাঘাট এক হাঁটু কি এক কোমর হবে, ট্র্যাম-বাস বন্ধ হবে, তখন কী করবেন?' বললে আরেকজন।

'হ্যাঁ, সে কথা কেউ ভেবে দেখে না।' বলে ফেলল সুকান্ত। 'তখন কী?'

'যে মুখে প্রশস্তি করেছি সেই মুখেই গালাগাল দেব।'

'দোষ বৃষ্টির কী মশাই। দোষ করপোরেশানের।'

'করপোরেশান নয় মশাই, পারফোরেশান। টালা থেকে টালি আর ট্যাংরা থেকে খ্যাংরা এফোঁড়-ওফোঁড়

'শহরে লহর খেলে।'

'আহাহা, তবু আসুক। মাটি ঠাণ্ডা হোক। ঘাস-পাতা সবুজ হোক।'

'বলুন না ব্যাঙ ডাকুক, সাপ বেরোক, পিঁপড়ের পাখা গজাক, বাদলা-পোকারা করফর করুক।'

চাষারা আশা করে বসে আছে।'

'তা চাষার মাঠেই ঝরুক না। কে বারণ করছে?' বললে সুকান্ত। 'কলকাতা যেখানে ঝরলেই সমুদ্র, সেখানে এ উৎপাত কেন?'

'বেশ রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমুব, ঘুম আসবার আগমুহূর্তে বৃষ্টি নামবে, থামবে ভোররাত্রে। উঠে দেখব রাস্তাঘাট জলে ডোবা। স্বপ্নের মত লাগবে।'

'আপিস দেরি করে যাব।'

'কিংবা যাবই না। বৃষ্টির অজুহাত দেব। বৃষ্টি কল্যাণকারিণী।'

'আগে বৃষ্টি নেই বৃষ্টি নেই বলে হাহাকার, পরে বেশি বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি বলে আর্তনাদ।'

'সব জিনিসেই তাই। আগে কাজী পরে পাজি।'

'তারপরেই বন্যা।' যার যা মনে আসছে বলে যাচ্ছে: 'সব মুখস্থ মশাই। তার পরেই বন্যাত্রাণ। উপশমের ঢেউ। তারপরেই ভোট। বন্যাতে তাই কারু কারু পিঠের পৌষমাস।'

'তেমনি আগুনেও।' বৃষ্টির সম্ভাবনায় সকলেই প্রায় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে। বললে আরেকজন : 'আগুন লেগে বস্তি ছাই হয়ে গেল। তার পরেই নিয়ে এস খাদ্য-বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জাম। তার পরেই ভোট।'

'দুষ্টু লোকে বলে ভোট পাবার জন্যে নিজেই নাকি আগুন লাগিয়েছিল। যাতে উপশমে ভুলিয়ে ভোট-কুসুম তুলতে পারে।'

'সব মুখস্থ মশাই, সব মুখস্থ। তারই জন্য প্রতি বছরে বন্যা, প্রতি বছরেই ধস।'

কে একজন কবি-কবি ছিল, বলে উঠল, 'নতুনত্বের মধ্যে শুধু এই নীল মেঘ।'

এক দল লোক বৃষ্টি চায়, আরেক দল লোক চায় না। বৃষ্টি আর না-বৃষ্টি কোনো দিকেই সুকান্ত নেই। তার শুধু এক ইচ্ছে, ছোট্ট এক ইচ্ছে, কাকলির সঙ্গে দেখা হোক। বৃষ্টি হলে ও আসবে কি করে? ফিরবে কি করে? ওর বাড়ি ফিরে যাবার পর বৃষ্টি হোক, যত পারুক ঢালুক আকাশ। তার এক সমুদ্র স্নেহ ঢেলে দিক পৃথিবীর হৃদয়ে। প্রলয় নামুক। কলকাতার ভদ্রতার বেশটা ঝড়ের তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক। যত ইচ্ছে তার নিজের কষ্ট হোক, অসুবিধে হোক, অসুখ হোক, শুধু যেন সাক্ষাৎটা নির্বিঘ্ন হয়।

কত সামান্য প্রার্থনা। সুকান্ত তাকাল আকাশের দিকে। নির্বোধ নিশ্ছিদ্র আকাশ। তার শুনতে তো ভারি মাথাব্যথা পড়েছে। কিন্তু কত সময় তো মেঘ শুধু জমাটই বেঁধে থাকে, বর্ষায় না। কত ব্যথা পুঞ্জিত হয়ে থাকে, বলা হয় না। কত ভাব সঞ্চিত হয়ে থাকে, লেখা হয় না। যন্ত্রে কত তারের বন্ধনের পরেও আর বাজনা নেই, কান্না নেই।

তার ক্ষুদ্র একটা অভিলাষকে ধুয়ে মুছে দেবার জন্যে নিষ্ঠুর ভাগ্য এক আকাশ অভিযানের আয়োজন করেছে। যে অল্পবল তারই উপর নিয়তির ভ্রূকুটি।

সেই মেয়ে-বাপের গল্পের কথা মনে পড়ল সুকান্তর। বাপ মুমূর্ষু, সেবামগ্ন মেয়ে রাত-দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, বাবাকে নিও না, বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই। কত কাঁদছে মেয়ে, কত মাথামুড় খুঁড়ছে, বাবাকে বাঁচাও। তবু কিছুতেই কিছু হল না, টলল না ভগবান। বাপ মারা গেল। স্বপ্নে মেয়েকে দর্শন দিল ভগবান। মেয়ে নানা কথা বলে ভগবানকে গঞ্জনা দিতে লাগল, নিষ্ঠুর, একচোখো, খামখেয়ালী ভগবান বললে, 'আমি করি কি, আমি কার প্রার্থনা শুনি? তুমি বলছ, বাবাকে বাঁচাও, আর বাবা বলছে আমাকে নাও। আর সইতে পাচ্ছি না এ ভবদাহ। নিচুকুলে জন্মেছি আমাকে উচ্চকুলে পুনর্জন্ম দাও। আমি কাকে লই, কাকে থুই?'

তেমনি কত লোক হয়তো প্রার্থনা করছে, আজ, এই লগ্নে বৃষ্টি হোক। হয়তো

কেউ তার মনের মানুষের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, বৃষ্টির জন্যে আটকে গেল, সঙ্গটা দীর্ঘতর মনোহরতর করবার সুযোগ পেল। তার প্রার্থনা শুনল অন্তরীক্ষ। হয়তো কত রুগী কষ্ট পাচ্ছে গরমে, বৃষ্টি তাদের আরাম দেবে, ঘুম দেবে। কত বিচ্ছিন্নকে তাপতৃপ্ত সান্নিধ্য দেবে। কত মনে পড়িয়ে দেবে জন্মান্তরের সুহৃদের কথা।

বৃষ্টি যারা চায় তাদেরই দল ভারি। আর, সুকান্ত দেখল তাদের প্রার্থনাই ন্যায্য।

বাস থেকে নেমেছে, অমনি ঝড় উঠল। সতর্ক-অসতর্ক সকলকে মুহূর্তে নাজেহাল করবার জন্যে এসেছে উড়নচণ্ডী। এসেছে বেহিসেবী। ঝরাপাতা, ধুলো তো বটেই, উড়তে লাগল টুপি, উড়তে লাগল ছাতা, দোকানের ঝাঁপ, চালের টিন, সাইনবোর্ড। ভাঙতে লাগল গাছের ডাল, তছনছ তছনছ—

বাবা, এত মারণমূর্তি কেন ? বৃষ্টি নামাও। শান্ত হও প্রভঞ্জন।

কি আশ্চর্য, কখন সুকান্ত বৃষ্টির জন্যেই প্রার্থনা করে বসেছে। ঝড়ের প্রেক্ষিতে বৃষ্টিই বুঝি কামনীয়। ছুটতে ছুটতে ভিজতে ভিজতে ঢুকে পড়ল সে ছাপাখানায়।

'দিন মশাই বাকি প্রুফটা দিয়ে দিন।' ম্যানেজারের সামনে টেবিলের উপর প্রুফের তাড়া রেখে মূর্তিমন্ত ঝড়ের মত দাঁড়াল সুকান্ত।

'বসুন।' বললে ম্যানেজার।

'বসবার সময় নেই। দিন তাড়াতাড়ি।'

কথাবার্তা বলে ম্যানেজার বুঝল, কিসের প্রুফ কী বৃত্তান্ত—

'না বসে উপায় কী। এত বৃষ্টিতে যাবেন কোথায় ? বৃষ্টিটা ধরবে তবে তো যাবেন।'

নিরুপায়। চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত। বৃষ্টি হচ্ছে, যেন গলানো সিসে ঢেলে দিচ্ছে। হাতঘড়ি নেই, সুকান্ত জিজ্ঞেস করলে, 'কটা বেজেছে বলতে পারেন ?'

প্রশ্ন নিরর্থক। সামনে দেয়ালেই ঘড়ি। তাকিয়ে দেখল পাঁচটা দশ।

আধ ঘণ্টা বসা যায় বোধ হয়। এখান থেকে স্বাতী সিনেমায় আধ ঘণ্টায় যাওয়া যাবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার কী অবস্থা হবে কে জানে। সঙ্গে একটা ছাতা নেই যে, মাথা ঢেকে চলে যাবে হাঁটু ডুবিয়ে। এদিকে বাস-ট্রাম কোথায় ? থাকলেও হয় মরেছে, নয় নাভিশ্বাস উঠেছে। একটা রিকশা লাগবে, কী বীভৎস ভাড়া চায় তা কে জানে। অত পয়সা কোথায় পাবে ? সবচেয়ে অনিশ্চিত, রিকশা পাবে কিনা।

'দিন না, দয়া করে বাকি প্রুফটা তুলে দিন না—'

'দিচ্ছি—ওরে—' ডাক ছাড়ল ম্যানেজার। তারপর সুকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, 'অত তাড়া কিসের? এই অঝোর বৃষ্টিতে যাবেন কি করে?'

'যেতেই হবে। আমার একটি ছাত্রীর মরণাপন্ন অসুখ।' বলে ফেলল সুকান্ত।

'খুব খারাপ অবস্থা? থাকে কোথায়?'

'এই কাছাকাছি।' বলে ফেলল সুকান্ত।

সমস্ত পাড়া নখদর্পণে, জিজ্ঞেস করলে ম্যানেজার, 'কোন বাড়ি?'

'নম্বরটম্বর জানি না।'

'কার বাড়ি?'

'তাও না। শুধু এইটুকু জানি মেয়েটির নাম আশা। ডাক-নাম আশা, পোশাকি নাম প্রতীক্ষা। আমার অদর্শনে তার যদি আজ মৃত্যু হয়—'

ত্বরান্বিত হল ম্যানেজার। ভিতরে নিজেই গেল খোঁজ নিতে। ফিরে এসে বললে, 'আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে। তা এক কাজ করুন না। আপনি চলে যান। প্রুফ কাল পাঠিয়ে দেব।'

'না, আমি যে এসেছি তার প্রুফ দেখাতে হবে বাবাকে।'

'তা হলে একটু না বসলে তো চলে না।' অপরাধীর মত মুখ করল ম্যানেজার।

'বসছি। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে ধরে যেতে পারে বৃষ্টি, কি বলেন?'

বৃষ্টি-ধরার নাম নেই। অচ্ছিন্ন ঝরে চলেছে।

ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুলে দিল প্রুফ।

'যাবেন যে, প্রুফ সব ভিজে যাবে।' বললে ম্যানেজার।

'প্রুফ ভিজলে কী হয়? তবু প্রমাণ গরম থাকবে। প্রমাণ ভিজে গেলেই মুশকিল।'

'যাবেন কী করে? একটা রিকশা ডেকে দি।' দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিল ম্যানেজার। বললে, 'বলবে ভীষণ জরুরি। একজন রুগী মরতে চলেছে—'

কোথায় দারোয়ান! কোথায় রিকশা! পৌনে ছটা প্রায় হল।

আর কি, নিজেই বসে বসে এখন প্রুফ দেখি। ভাবল সুকান্ত। 'ম'-কে কেটে দন্ত্য 'স' করি। প্রেমকে কেটে প্রেস করি।

এসেছে রিকশা। কিছু দরদস্তুর না করেই উঠে পড়ল সুকান্ত। ঘেরাটোপের মধ্যে বদ্ধ হল।

রিকশাওলা জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবেন?'

'স্বাতী সিনেমা।'

'দু টাকা লাগবে।'

এ কী জুলুমবাজি! এমনিতে পাঁচ আনা ছ আনা বড় জোর। আজ মৌকা পেয়েই হামলাদার হয়ে উঠেছে।

'বলুন দু টাকা দেবেন কিনা। নয়তো নেমে যান। কিংবা বলুন আমি গাড়ি ছেড়ে দিই। কি রকম জল!'

ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই। পকেটে কুড়িয়ে-জড়িয়ে দুটো টাকাই হয়তো আছে। নে, চল, তাই দেব।

ঝপরঝপ ঝপরঝপ চলেছে রিকশা। উপরে সমুদ্র নিচে সমুদ্র, মাঝখানে ডুবুডুবু পানসি।

কোথায় চলেছে কে জানে। সমস্ত অবাস্তব মনে হচ্ছে সুকান্তর, সমস্ত বিদেশ। যেন শহর-পসার নয়, পাথর-দেয়াল নয়, অনাচ্ছন্ন জল। জলের মরুভূমি।

গাড়িবারান্দার নিচে কতগুলি লোক দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে, তার মধ্য থেকে একটা লোক সোজা রিকশার দিকে ধাওয়া করলে।

'আমি দেখেছি রিকশায় শুধু একজন আছেন।' লোকটা বললে আকুল হয়ে, 'আমাকে দয়া করে তুলে নিন মশাই। ভীষণ জরুরি।'

সত্যি হয়তো কেউ মরতে বসেছে।

প্রায় জোর করে রিকশা নামিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক।

গাঁইগুঁই করে লাভ নেই। সুকান্ত বললে, 'কদ্দুর যাবেন?'

'ঐ বাজার পর্যন্ত। ভয় নেই আপনার ভাড়ার শেয়ার দেব। আপনি কোথায়?'

'স্বাতী সিনেমা।'

'বই দেখতে? কী হচ্ছে ওখানে?' এক মুহূর্ত চিন্তা করল আগন্তুক। বললে, 'হ্যাঁ, হাওয়া-দিয়ে-যাই। বইয়ের শেষটা মাইরি—কী প্যাথেটিক! মাঠ দিয়ে নায়িকা মাইলখানেক প্রায় ছুটছে, মাঠ পেরিয়ে এসে পলকে নায়কের বুকের উপর—ধব্‌স—'

রিকশাটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়ে। সামলেছে।

'কত ভাড়া হয়েছে?'

'দু টাকা।'

'বেশ, এক টাকা আমি দেব। আমাকে বাজারে নামিয়ে দিয়েই আপনি চলে যাবেন স্বাতীতে। ছটায় শো আরম্ভ। তা ছটা এখন বেজে গেছে। তা আজে-বাজেতে আধ ঘণ্টা। সাড়ে ছটাতে ঢুকলেই চলবে। কী বৃষ্টি মশাই, কী বৃষ্টি!'

যাক এক টাকা সুরাহা হল। স্বস্তির মুখ দেখল সুকান্ত। পকেটে একটাও টাকা না থাকলে কি রকম! যদি দেখা হয় কাকলির সঙ্গে, যদি আবার একটা রিকশা করতে হয় তাকে নিয়ে।

বাজার আসতেই নেমে গেল আগন্তুক। একটু দাঁড়ান, টাকাটা নিয়ে আসি। গেল আর এল না। গলে গেল। মিলিয়ে গেল।

চলল আবার রিকশাওলা।

নৈরাশ্যের মতই জল চারদিকে। কী হবে স্বাতীতে গিয়ে? এত বৃষ্টিতে যে কাকলি আসে নি, কোনো মেয়েই যে আসতে পারে না, আসে না, সে তো জানা কথা। আর ও তো প্রাচীনপন্থীদের মেয়ে। তবে সুকান্ত যাচ্ছে কেন? যাচ্ছে, সে যে কথা রেখেছে শুধু সেই প্রমাণের আনন্দে। সে যে তার কথা রেখেছে এইটুকুই তার তৃপ্তি, এইটুকুই তার প্রাপ্তি। বলতে পারবে চিঠিতে, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার দেখা পাই নি।

স্বাতীতে পেঁাছে দিল রিকশা। কিন্তু কাকলি কই?

শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবু লবিতে অনেক লোক। সব বৃষ্টির ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দারোয়ান হটিয়ে দিতে চাইছে, বলছে, টিকিটওলাদের ঢুকতে দিন, কিন্তু কেউই হটছে না। সকলেরই বৃষ্টির টিকিট।

'এ কী, সুকু যে! এ তোর কী চেহারা! ভিজে একেবারে ঢোল হয়েছিস যে।'

ওর কলেজের ছাত্র অনিমেষ।

'তুই এ পাড়ায় কেন? এ হাউসে বই দেখতে এসেছিস? রাবিশ বই। যৌন ছাড়া আর সবই এর গৌণ। সেন্সর কি ঘুমোয়, না কি সেন্সই ঐ রকম?'

'ভাই, চার আনা পয়সা দিতে পারিস? সত্যি বাসভাড়া নেই।'

একটা সিকি দিল অনিমেষ।

ভাগ্যিস কাকলি আসে নি। দেখে নি তার এই দৈন্যের চেহারা। এই হাত পাতা।

'যা, দেরি করিস নে। যখন পুরোপুরি ভিজেছিস তখন আর দাঁড়ানো কিসের জন্যে। সোজা বাড়ি চলে যা। নইলে অসুখ করবে। যেমন চেহারা করেছিস না বাস-এও জায়গা দিলে হয়।'

'না হয় হেঁটেই চলে যাব। কিন্তু জলে জুতোর স্ট্র্যাপটাও ছিঁড়ে গেছে দেখছি।' সুকান্ত নিচু হয়ে তাকাল জুতোর দিকে। বললে, 'খালি পায়েই মেরে দেব ঠিক।'

ভাগ্যিস কাকলি আসে নি। দেখে নি তার এই কাতরতার মূর্তি।

তবু একবার তাকাল এদিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। কোথায় কাকলি! তার তন্তুলেশও নেই। বৃষ্টির জলে তার মুখ যেন মুছে গেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না সুকান্ত। তবু যদি কেউ দেখবার থাকে, সে দেখেছে আমি এসেছি, আমি কথা রেখেছি। সত্যের মত সুখ নেই। সর্বাঙ্গে তো জল নয়, সুকান্তর মনে হল, সত্যের শান্তি।

বাড়ি ফিরে এলে সেণ্টু বলে উঠল, 'এ তুমি কী হয়ে এসেছ কাকা! কোথায় গিয়েছিলে?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' বললে সুকান্ত।

'দেখা পেলে?'

'তারও সেখানে আসবার কথা, কিন্তু জানিস', মুখে ব্যথা আঁকল সুকান্ত, 'সে এল না।'

'এল না? দেখা হল না তার সঙ্গে?'

'না, না, দেখা হল বৈ কি।'

'সে কি কথা কাকা? এল না অথচ দেখা হল?' অবাক মানল সেণ্টু।

'জানিস সেণ্টু, জীবনে এমন লোকও আছে যে আসে না অথচ তার সঙ্গে দেখা হয়।'

দুদিন পরে খামে চিঠি এল কাকলির:

'সেদিন স্বাতীতে দেখলাম আপনাকে, কী চেহারা নিয়ে নামলেন রিকশা থেকে! কাছে যেতে সাহস হল না। কে এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আপনি আমাকে দেখেন নি। না দেখে ভালোই করেছেন। দেখতে পেলেই ভিজে কাপড়ে আটকে থাকতেন অনেকক্ষণ। আপনার বন্ধুর কাছে আমিও ধরা পড়তাম। সত্যি কোথাও জায়গা নেই যে একটু নিরিবিলি দেখা হয়।

থোকা থোকা আরও কদমফুল ফুটেছে। আপনাকে যদি পারতাম দেখাতে।'

বাসাটা চিনে নিতে কতক্ষণ! এক সন্ধ্যায় ঠিক হাজির হল সুকান্ত। এই তো সেই বিস্তীর্ণশয়ান ঠিকানা।

বাইরে সদরে চাকর বসে।

'আচ্ছা, এ বাড়িতে কাকলি থাকে?'

'কে, এম-এর দিদিমণি? হ্যাঁ, থাকে।'

'কোথায় আছেন এখন?'

একবার আকাশের দিকে তাকাল চাকর। বললে, 'বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছেন।'

'বাবুরা কোথায়?'

'বড়বাবুর অসুখ, ঘরের মধ্যে শোয়া। মা তাঁর কাছে। দাদাবাবু বেরিয়ে গেলেন।'

'তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়?'

'কেন হবে না? আপনি কোনো আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, নিকট আত্মীয়।'

'তবে সোজা উঠে যান উপরে। ছাদেই হয়তো পাবেন। নয়তো বারান্দায়। সারা দিন ঘুরছেন আর পড়ছেন।'

সুকান্ত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। যাই না চলে ভিতরে। কী হবে? যা হবার তাই হবে। তবু একটা কিছু হোক। সেদিনের বৃষ্টির পর নদীর জল কি একটুও বাড়ে নি? ঘাস কি হয় নি একটুও ঘনশ্যাম? কদম অনেক উঁচুতে, মাটির কাছাকাছি কি ফোটে নি দোপাটি? লাল মেজেণ্টা শাদা সোনালি!

পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল সুকান্ত।

৬

একটু এগিয়ে আসতেই সিঁড়ি। নিচেটা ফাঁকা। কেউ নেই কি কোথাও? এ কখনো হতে পারে? এ-দিক ও-দিক একটু উঁকিঝুঁকি মারল সুকান্ত। দুটো টিকটিকি একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। ঝগড়া করছিল নাকি? কী দেখেছে বাইরে, একটা কালো বেরাল বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

কেমন যেন থমথম করছে চারদিক। নিজের নিশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে।

দরকার নেই, ফিরে যাই।

বাড়িটা, রাস্তাটা দেখে গেলাম—আজ এই পর্যন্ত থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য, কদম গাছটা তো দেখি নি। কোন দিকে গাছটা? ফুল কি গাছ ভরে ফুটে আছে, নাকি একটি দুটি? নিজের মনেই হাসল একটু সুকান্ত। গাছের চেয়েও আর কিছু জীবন্ত আর কিছু ফুলন্ত দেখবারই বুঝি তাড়া ছিল। কই তেমন তো কিছু বুঝি নি সজ্ঞানে। কে যেন টেনে এনে খোলা দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঢুকিয়ে দিয়েছে তো থামিয়ে দিচ্ছে কেন?

যাক, ফিরে যাই। যাবার সময় দেখে যাব'খন গাছটা। গলা তুলে দেখে নেব'খন কত উঁচুয় তার ফুল ধরা।

এতদূর এসে, শুধু এসে নয়, এতটা ঢুকে পড়ে, ফিরে যাবার কোনো মানে হয়? চোর হয়ে এলে বরং সহজ ছিল। এতক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হত না, দোনামনা করতে হত না। টেবলের উপর টেবল ক্লথটা আছে, তাতে ঐ কটা বাসন-কোসন আর কাপড়চোপড় জড়িয়ে নিয়ে গলির মুখে খিড়কির দরজাটা খুলে সটকান দিলেই চলে যেত। আর যদি উপরে যাবার, ছাদে যাবার দরকার হত তা হলে সিঁড়িটা লাগত না। বাইরে থেকে গাছে চড়েই, গাছ বেয়েই, পারত হাজির হতে।

বাড়িটা অবশ্য ছোট, তাই বলে নিচে, কাছে-পিঠে, একটিও লোক থাকবে না? লোক থাকলেই বা তার কী এমন সম্পদ বাড়ত? যদি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলত, ও মশাই, শুনছেন, কাকলি দেবীকে ডেকে দিন, তা হলে কি সিঁড়িটা সুগম হত? সভাস্থলে বেদীতে ওঠবার আগে লাটবেলাটদের জন্যে যে ঘাসের উপর লাল শালু পড়ে তেমনি শালু পড়ত সিঁড়িতে? যদি জিজ্ঞেস করত, কে আপনি, একটা চলনসই উত্তর না হয় দেওয়া যেত, কিন্তু যদি নিরস্ত না হয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করত, কী দরকার, তা হলেই গলার কাছে দলা পাকাত। বরং এই ভালো হয়েছে, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। খালি মাঠে বল ফাঁকায়-ফাঁকায় এগিয়ে শেষ মুহূর্তে বলটা গোল-কিপারের হাতে তুলে দেবার মত। আমি তো স্কোর করতে চাই না। ধরা পড়তেই চাই।

সিঁড়িটা যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে গেছে। হয়তো এরই একটানে নাগাড়ে উঠে যাওয়া যাবে ছাদে। পাওয়া যাবে কাকলিকে। সিক্তকে যে উপেক্ষা করতে পারে সেই শুষ্কাকে। আর, তখন, তারপর ধরা পড়ে গেলে সুকান্তকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কাকলির ডাক পড়বে। আর, কৈফিয়ৎ দিতে, বানিয়ে বলতে, বাঁচিয়ে বলতে, মেয়েদের জুড়ি নেই।

সিঁড়ির দিকে এক পা এগুলো সুকান্ত। বুকের মধ্য থেকে কে খুট করে উঠল। আবার থামল, আবার তাকাল চারপাশ। মহাশূন্যতার ইতিহাস ছাড়া দেয়ালে আর কিছুই লেখা দেখল না।

আচ্ছা, কী করা উচিত, যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে কী করা উচিত? পিছু হটে সদর পর্যন্ত ফিরে গিয়ে চাকরের শরণাপন্ন হবে, আর চাকর যদি ততক্ষণে পানের দোকানে বা তাসের আড্ডায় সরে গিয়ে থাকে, তা হলে খোলা

দরজায় কড়া নাড়বে ? কড়া কি খোলা দরজায় নাড়বার জন্যে ? খোলা দরজা মানেই তো চলে এস, তোমাকে মোকাবিলা করবার জন্যে ভিতরে লোক আছে। ঠাকুর-ঠাকুর বলে ডাকবে ? সেটা সম্ভ্রান্ত শোনাবে ? নয়কি বন্ধ কাঠের জানলার গায়ে আঙুলের গিঁট দিয়ে শালীন শব্দ করবে ? নিজের সরু সরু আঙুলগুলির জন্যে মায়া হল সুকান্তর। কাকলির হাতের আঙুল না জানি কি রকম দেখতে ? মোটাসোটা বেঁটে-বেঁটে ভোঁতা-ভোঁতা ? নাকি ছুঁচলো ধারালো খরশান ?

শুধু উঁকি মারলেই চলে না, ঝুঁকি নিতে হয়। দু ধাপ সিঁড়ি উঠে পড়ল সুকান্ত। কিন্তু সত্যি যা সে করছে, করতে চাচ্ছে বা করে ফেলেছে তা আইনের চোখে রীতিমত অপরাধ। বিনানুমতিতে ঢুকে পড়েছে এবং ঢোকার উদ্দেশ্য, সে নিজে যাই ভান বা ভাব করুক, খুব স্বচ্ছ নয়। সুতরাং—আবার থামল সুকান্ত, আঙুল না ভেবে লাঙুল ভাবুক। আঙুল না দেখে লাঙুল দেখিয়ে পালিয়ে যাক। ছোট একটা ছেলে মেয়েও বাড়িতে নেই ? কাকলি কি একশ্চন্দ্র ? হয়তো আছে ভাই-বোন, কিন্তু এ সময় ভাই গিয়েছে হয়তো খেলতে আর বোন পাড়া বেড়াতে। আর ওরা থাকলেই বা এগোত কী ? হয়তো গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠত, ও দিদি, নিচে তোমাকে কে ডাকছে দেখবে এসো। একতারার জিনিস মাটি হত ঢাকে-ঢোলে। আর, ভাই-বোন কেন, দিদিও তো এ সময়টায় একটু নিচে থাকতে পারতেন। তিনি একদম নিচে নামেন না এমন তো নয়। এবং কখনো-কখনো, এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে যখন তিনি নেমেছেন তখন তিনি একলা আর নিচেটা এমনি হা-হা করা শাদা শূন্যের দেশ।

নিচে, দোরগোড়ায় বা প্রথম উঁকিতেই, দেখা হলে লাভ হত কী! কী ধরনের আলাপ হত ?

কাকলি বলত, এই দিকে এসেছিলেন বুঝি ?

ও, হ্যাঁ, এই পাড়ায় আমার মাসিমার বাড়ি।

কদ্দূরে বলুন তো ?

ঐ যে ওখানে—হাত দিয়ে দিশেহারা একটা প্রাচ্য নাচের ভঙ্গি করে দিত।

মাঝে মাঝে আসতে হয় বুঝি এদিকে ?

কচিৎ-কদাচিৎ।

তারপরে আরো হয়তো একটু বলত কাকলি। বলত, সেদিন কী বৃষ্টি!

হ্যাঁ, বেরাল-কুকুর। মানে ক্যাটস অ্যাণ্ড ডগসের বাংলা করলাম।

আর আপনি কেমন নামলেন রিকশা থেকে। নামবার কী দরকার ছিল!

রিকশাওলা আর যেতে চাইল না। আমতা-আমতা করে বলত সুকান্ত।

আর এক পা এগিয়েই তো বাস-স্টপ। অদ্দুর পর্যন্ত নিয়ে গেলেই পারত। অত ভেজবার পর যত শিগগির সম্ভব বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। নামবার বা থামবার কোনো মানে হয় না।

না, কিছু না। ঢোঁক গিলত সুকান্ত। কিন্তু আপনি দেখলেন কোত্থেকে ?

আমি যে ছিলাম ওখানে।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি ?

না।

তবে ?

ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বৃষ্টি এসে পড়তেই আশ্রয়ের জন্যে ঢুকে পড়লাম। আমি ভিজিনি, আমার দাঁড়াবার মানে হয়। আর আপনি ডোবা জাহাজের থেকে জ্যান্ত তোলা খালাসি—আপনার ওখানে দাঁড়াবার, দেরি করবার মানে হয় না—

আমার বন্ধু অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিনা—

তাই। তবু—

আচ্ছা। আসি।

নমস্কার।

তার চেয়ে এ অনেক অনেক অনেকানেক ভালো যে কাকলি নিচে নেই, ছাদে আছে। 'তারপরে'র দেশে আছে। সিঁড়ি না ভাঙলে ছাদ কই। যা হয় তাই হবে, পিছু হটব না। একটা কিছু বাধা না থাকলে চলায় সুখ কী! পাশ করতে চাই অথচ পড়ার পাশ কাটিয়ে যাব, এ হতে পারে না। বাধা আছে বলেই তো মজা। সরকার চালাব অথচ বিরুদ্ধবাদী রাখব না, জল কাত বললে সবাই একবাক্যে ঘাড় কাত করবে, এ একটা চালানোই নয়। ব্যাট করব অথচ ফাস্ট বল দেখলে উইকেট ছেড়ে আম্পায়ারের পিছনে গিয়ে লুকোব এ ছেলেমানষি বললেও বেশি বলা হয়, এ শিশুয়ালি।

একটার পর একটা করে সুকান্ত সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। চাকরের যা বর্ণনা তাতে কোথাও ঠেকবার কথা নয়, একেবারে সোজা বন্দরে গিয়ে পৌঁছুনো। আর যদি পৌঁছবার আগেই নৌকোর তলা ফুটো হয়ে যায় তো যাবে। ভরাডুবি করে দিয়ে এসেছি বলা যাবে সেন্টুকে। হাতের দান আর ফেরৎ হয় না।

দোতলা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরেছে, পিছন থেকে কে বলে উঠল : 'এ কে !'

এ একটা ধূসর বিস্ময়ের স্বর মাত্র, স্বগতোক্তি, তাই সুকান্ত গায়ে মাখল না। উপেক্ষা করেই উঠে চলল।

এবার যে স্বরটা নির্গত হল সেটা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পরুষপ্রখর।

'কে ?'

সিঁড়ির উপরেই থামল সুকান্ত।

'কে যাচ্ছে উপরে ?'

একটা ঘুড়ি কাটা পড়ে উড়ে এসেছে ছাদে, এ যদি বলতে পারত সুকান্ত, এ বলবার যদি তার বয়স থাকত। কাটা ঘুড়ি কোথায় না নিয়ে যেতে পারে, গোঠে-মাঠে-ময়দানে বনে-জলে-জঙ্গলে, বিদেশে-বিভুঁয়ে, ছাদ তো সামান্য। আর কাটা ঘুড়ি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলে মনে-মনে হাত তুলবে না এমন মানুষও আছে নাকি পৃথিবীতে। তাই বলবে নাকি কাটা ঘুড়ি ? রঙিন ঘুড়ি ?

'এ কি, কে তুমি ? কোথায় যাচ্ছ ?' হুমকে উঠল পরুষস্বর।

ফিরল সুকান্ত। নেমে এসে দেখল স্থূলাঙ্গ প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় আধা-ইজিচেয়ারে আধশোয়াভাবে হেলে আছেন আর তাঁর পাশে মেঝের উপর বসে তাঁর দুই পায়ের পাতায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা।

এগিয়ে এল সুকান্ত। নিচু হয়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলেই চুকে যায়, থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের পা দুখানি অস্বাভাবিক ফুলো, তাতে আবার এখন তেল মাখানো। প্রণাম করতে প্রাণে রস পেল না। দু হাতে শুকনো নমস্কার সেরে বললে, 'আমি সুকান্ত বসু—'

'আমি বনবিহারী মিত্র— শুধু এটুকু বললেই পরিচয় হল ?' গর্জন ছাড়লেন ভদ্রলোক।

'আস্তে-আস্তে বলছি।' ঢোঁক গিলল সুকান্ত : 'আমার বাবার নাম—'

'তোমার বংশ পরিচয়ে আমার কৌতূহল নেই। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে তুমি কী সুবাদে এ বাড়িতে ঢুকেছ ? কী চাই তোমার ?'

যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই, সুকান্ত বললে, 'কাকলিকে চাই।'

'কে কাকলি ?' পায়ে নিশ্চয়ই ব্যাধি ও ব্যথা, একটানে ঝটকা মেরে দাঁড়াতে পারেন না ভদ্রলোক, তবু উত্তেজনায় নড়ে-চড়ে উঠলেন।

সুকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, 'কাকলি এ বাড়ি থাকে না ?'

'থাকে কি না থাকে তাতে তোমার কী ?'

'তা হলে থাকে।' অস্ফুটস্বরে বললে সুকান্ত।

'হ্যাঁ, থাকে। সে আমার মেয়ে। কিন্তু তোমার তাকে কী প্রয়োজন ?' ভদ্রলোক বললেন আবার রোখা গলায়।

এখানে আবার আরেকটা সম্ভাবনা ছিল। নত হয়ে সুকান্ত তাকাল আবার ভদ্রলোকের পায়ের দিকে। ভরসা পেল না। কে জানে পায়ে হাত ঠেকলেই হয়তো তারস্বরে চিৎকার করে উঠবেন। চাকর যে বলেছে বাবুর অসুখ তার মানে এই পায়ের অসুখ।

ঘাড়টা আস্তে-আস্তে একটু চুলকে নম্রস্বরে সুকান্ত বললে, 'তার সঙ্গে আমি পড়ি।'

'পড়ো তো এখানে কী, বাড়িতে কী? সটান উঠে যাচ্ছ সিঁড়ি দিয়ে তার মানেটা কী?' বনবিহারী আবার হুমকালেন।

'দরজাটা খোলা পেলাম—'

'দরজা খোলা পেলেই উঠে আসতে হয়? নিচে থেকে খবর দিলে না কেন?'

'লোকজন কাউকে দেখলাম না— একটা কলিং বেল নেই।'

'কলিং বেল! তোমার জন্যে কলিং বেল ফিট করতে হবে।' বনবিহারী আবার তড়পালেন: 'কেউ নেই তো নিচে ওয়েট করো।'

'সে এক ক্যাসাবিয়ানকা পেরেছিল।' সুকান্ত তাকাল আরেকবার চারপাশ। বললে, 'ভাবলাম নিচে নেই হয়তো উপরে পাব।'

'তা আমাদের লক্ষ্য না করেই তো উঠে যাচ্ছ ছাদে। ছাদে কী! আজকাল পড়াশোনা ছাদে হচ্ছে নাকি?'

'ঘরে-ছাদে কোথাও হচ্ছে না। তবে ঘরের মধ্যে তো গুমোট, ছাদে ঘুরলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে, রিক্যাপিচুলেশানটা ভালো হয়।'

'কী ভালো হয়?' বনবিহারী ছুঁড়লেন আরেক মেঘধ্বনি।

কথাটা পুনর্বার আওড়াতে সাহস পেল না সুকান্ত।

'গোবর্ধন! গোবর্ধন!' ডাকাত-পড়া আওয়াজ তুললেন বনবিহারী।

সুকান্ত বুঝল চাকরকে ডাকছেন।

'দাঁড়াও, আমি ডাকছি।' এতক্ষণে মুখ খুললেন ভদ্রমহিলা। মালিশ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

তবুও আশ্বাস নেই বনবিহারীর। এবার অন্য ডাক ডাকলেন। 'বিজন, বিজন! বিজন বাড়ি নেই?'

সুকান্ত বুঝল এবার ছেলেকে ডাকছেন।

একটা ফাটাফাটি না হয়ে আর যায় না। হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার অনুভব করল সুকান্ত। যদি খাড়া পায়ে দাঁড়াতে পারতেন তা হলে বনবিহারী নিজেই প্রমাণ করে দিতেন যে তিনি বনেই ভ্রাম্যমাণ।

কোলাহলটা এমন আর মৃদু কোথায়। যার লক্ষ্য, নিচের লোককে সন্ত্রস্ত করা, বাড়ির আনাচে-কানাচে তোলপাড় জাগানো, বিজনকে পর্যন্ত সজনে নিয়ে আসা, তা এক নিভৃতচারিণী ছাদবিহারিণীর কানে ঢুকছে না!

তাকেও আর রাখা হল না শান্তিতে। ভদ্রমহিলা উপরের দিকের সিঁড়ির ক ধাপ উঠে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে লাগলেন: 'কাকলি! কাকলি!'

এবার উনি এসে কী সুর ধরেন দেয়ালগুলিই বলতে পারে।

একদৃষ্টে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

আহা, এ কি কলিং বেল টিপে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে এলে দেখা যেত। নাকি দিনক্ষণ ঠিক করে এসে ড্রয়িং রুমের পারিপাট্যে চিত্রার্পিত করে।

দ্রুত পায়ে ধুপধুপ করে নেমে আসতে লাগল কাকলি।

সন্ধ্যার গা ধোয়া হয় নি তারই আগেকার শৈথিল্য শাড়িতে-শরীরে গুচ্ছীকৃত হয়ে আছে। চুল খোলা, খালি পা। পরনের আটপৌরে শাড়িখানি আধময়লা। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য, এই একটু নিজের সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গ হয়েও অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, হাত দুখানি খালি।

'কে এই লোক তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—' ভদ্রমহিলা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

'ও, আপনি এসেছেন! আমি ভাবলাম শুনতে পেলেন না বুঝি ডাক!' কাকলি ঝলমলিয়ে উঠল। বনবিহারীর শিলীভূত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাদের সঙ্গে পড়ে বাবা, খুব ভালো ছেলে, ফার্স্ট ক্লাশ পাবে নির্ঘাত। এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ছাদ থেকে দেখতে পেলাম।'

'দেখতে পেলে!'

'হ্যাঁ বাবা, ঝুঁকে দাঁড়ালে দেখা যায়। দেখতে পেয়ে ডাকলাম হাতছানি দিয়ে। মনে হল দেখলেন না বুঝি, বুঝলেন না বুঝি।'

'হাতছানি দিয়ে ডাকার মানে?' বনবিহারীর চোখের পাতা যেন কাঁপছে না এখনো।

'হঠাৎ দেখা কিনা। তা ছাড়া অত দূর থেকে চেঁচিয়ে কি ডাকা যায় নাম ধরে?'

'তাই ইশারায় ডাকলে?'

'বাবা, কতদিন ছোট-ছোট ক্লাশগুলি অ্যাটেণ্ড করি নি, তাই ভয় ছিল কত না জানি পিছিয়ে আছি। তাই ওঁকে ডেকে একটু দেখে-শুনে ঝালাই করে নেওয়া—'

তারপর ভদ্রমহিলার কাছে এগুল কাকলি। [illegible] আবদেরে সুর বের করে

বললে, 'জানো, মা, উনি এখনো নাকি কদমফুল দেখেন নি। বাঙালী ছেলের কী দুর্দশা। লেখাপড়ায় ওস্তাদ অথচ নিজের দেশের ফুল ফল চেনেন না। আসুন, দেখবেন আসুন,' এবার লক্ষ্য করল সুকান্তকে: 'কেমন ঝেঁপে ফুল হয়েছে ছাদের উপর।'

উঠে দাঁড়াবার ভাঙা-ভাঙা চেষ্টা করছেন দেখে কাকলি এল বাবাকে তুলতে। সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বনবিহারী স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে উঠলেন, লাঠি নিয়ে ভর দিয়ে দিয়ে এগুতে চাইলেন ঘরের দিকে। পিছন ফিরে লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে। বললেন, 'যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন? ছাদে গিয়ে কদমফুল দেখে এসো।

... ৭ ....

সত্যিই দেখে নি বুঝি কদম ফুল। কিন্তু ও ফুল কি মর্তের তরুতে ফোটে? নাকি এ ফুলেরই আরেক নাম পারিজাত?

কি জানি কি।

এর পর ছাদে না ওঠার কোনো মানে হয় না। আর কাকলিকেও আসতে হয় পিছে পিছে। ছন্দ মিলিয়ে।

'আপনার এভাবে আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি।' চোখে-মুখে বিরাগ-বিরক্তির ভাব আনল কাকলি।

'ঠিক হয় নি।' গলার স্বরকে অনুতাপের প্রায় কাছাকাছি নিয়ে এল সুকান্ত। কিন্তু পরমুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে বললে, 'কিন্তু কী সুন্দর তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে বলো তো! সিচুয়েশনটা সেভ করে দিলে। তুমি ক্রিকেট বোঝ?'

'ঝিঁঝিপোকা বুঝি।'

'না, না, ঝিল্লি নয়, ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি নয়। এ হচ্ছে এক খণ্ড লগুড় দিয়ে এক অখণ্ড গোলককে তাড়না করা।' আনন্দে টইটুম্বুর সুকান্ত: 'ক্রিকেট বুঝলে বলতাম এক ইনিংসে হেরে যেতে যেতে ড্র করে ফেললে।'

'না, ড্র নয়, কে জানে হেরেই গেলাম বুঝি পুরোপুরি।' গাম্ভীর্যে আরো স্পষ্ট হল কাকলি: 'আপনাকে বাঁচালাম হয়তো, কিন্তু নিজে মরলাম।'

'অসম্ভব! আমাকে যদি তুমি বাঁচালে, তোমাকেও আমি বাঁচাব।'

'আপনার ক্ষমতা কী?'

'ক্ষমতা?' একটা বুঝি ধাক্কা খেল সুকান্ত। বললে, 'মাটির কী ক্ষমতা তা মাটি কী জানে! ম্লান মৌন মাটি। একটা বীজ এসে পড়লে তবে বোঝে।'

তবু স্পন্দিত হয় না কাকলি। বললে, 'যাই বলুন, এভাবে আসাটা আপনার মোটেই উচিত হয় নি।'

'এভাবে না এলে তোমার এভাবে থাকাটি দেখতাম কী করে?' দু চোখে নির্মল স্নেহ নিয়ে তাকাল সুকান্ত।

যথার্থ শাসনে না থাকলেও বসন বেশ বিস্তৃত হয়েই আছে। তবু কাঁধ ও কক্ষের দিকে হাত গেল একটু অধ্যক্ষতা করতে। খোলা চুলও নিমেষে পিণ্ডীকৃত হয়ে উঠল। লঘুতাকে যেন লেশমাত্রও প্রশ্রয় দেবে না কাকলি। বললে, 'সদরে যখন চাকর ছিল তখন আপনার উচিত ছিল ওকে দিয়ে খবর পাঠানো।'

'চাকর মানে গোবর্ধনের কথা বলছ?' প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'হ্যাঁ—'

এরকম কাঠখোট্টা হলে আর 'তুমি' বলে কোন নৈকট্যে? তাই সুকান্তও দূরস্থ হল। বললে, 'গো শব্দের অর্থ জানেন?'

'না।'

'অনেক অর্থ আছে শুনেছি। এক অর্থ নাকি ইন্দ্রিয়। আর ইন্দ্রিয় মানেই যন্ত্রণা। তাই গোবর্ধনকে দিয়ে খবর পাঠানো মানেই যন্ত্রণাবৃদ্ধি। কি বলতে কী বোঝে, কাকে ডাকতে গিয়ে কাকে নিয়ে আসে বা আদৌ আসে কিনা তার ঠিক কি।' কাকলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একটি কোমল রেখা ফুটল না কোথাও, না ঠোঁটে না চিবুকে না বা চোখের কোলে। হতাশের শেষ নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত: 'তাই গিরি নিজে ধারণ না করে লঙ্ঘন করেই উঠে এলাম।'

শুধু গম্ভীর নয়, এবার যেন কঠিন হল কাকলি। বললে, 'আপনি জানেন না আমার বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রিটায়ার করেছেন। সারা জীবন ডিসিপ্লিন মেনে এসেছেন—'

'তা উনি যদি রিটায়ার করে থাকেন তবে ডিসিপ্লিনও রিটায়ার করেছে।'

'না।' শুধু কঠিন নয়, এবার যেন উদ্ধত হল কাকলি। বললে, 'দিনে দিনে আমরা যতই কেননা বদলাই, যতই কেননা চালাক হই, এমন কতকগুলি জিনিস

আছে যার মূল্যের কোনো বদল হয় না। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, যাকে বলে গিয়ে, ভদ্রতা, শালীনতা, ডিসেন্সি—' সরে দু-পা দূরে গেল কাকলি।

'তা হলে আর কথা কি!' দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুকান্ত। 'এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। একজনের ভালোবাসা অন্যজনের অভদ্রতা। যে যেমন বোঝে। আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' দু হাত যুক্ত করল সুকান্ত।

'বলি নমস্কার করতে তো খুব শিখেছ,' কাকলি হঠাৎ কাছে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। গলার স্বর অস্পষ্ট করে বললে, 'বাবাকে প্রণাম করেছিলে?'

'কী করে করি? দু পায়ে তেল মাখানো।'

মুচকে এবার একটু হাসল কাকলি। বললে, 'সারা জীবন লোকে এই পায়ে তেল দিয়েছে, তুমিও না হয় দিতে দু ফোঁটা। দুটো ঠোক্করে দু ফোঁটা প্রণাম।'

মুখ শোকার্ত করল সুকান্ত। বললে, ভুল হয়ে গিয়েছে। আর গোড়ায় ভুল হলে আগাগোড়া ভুল। তোমার বাবাকে প্রণাম করা হল না বলে তোমার মাও বাদ পড়লেন।'

'দাঁড়াও, মা ডাকছেন নিচে। শুনে আসি। যেও না কিন্তু।' কাকলি ছুট দিল সিঁড়ির দিকে। আর নামতে যেতেই চুলের পিণ্ডটা ভেঙে গিয়ে নেমে পড়ল বৃষ্টির মত।

ছাদে এতক্ষণ থাকবার কী হয়েছে! গায়ত্রী প্রায় মুখঝামটা দিয়ে উঠল। এক ডাকের মামলা, কদম ফুল দেখিয়ে দিলেই তো চলে যায়। না হয় গোটা কতক ছিঁড়ে নিক হাত বাড়িয়ে। অতক্ষণ লাগে কিসে? না হয় পাঠিয়ে দিই গোবর্ধনকে।

'আমি ভাবছিলাম চা করে দিতে ডাকলে বুঝি—'

আবার যাচ্ছিস? আর এ কী তোর ছিরিছাঁদ? বেশভূষা? বিকেলের গা ধুস নি, চুল বাঁধিস নি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোস নি। দু হাতের বালা খুলে ফেলেছিস? গলারটা আছে, না, গলাও খালি? আহা, কী অপরূপ মূর্তিই ধরেছেন শ্রীমতী! যা, বৈকালিক প্রসাধন সাঙ্গ কর, ভদ্র সাজ, ভব্যতায় শালীনতায় ফিরে আয়—

'ততক্ষণ?' কাকলি ছাদের দিকে চোখ তুলল।

ততক্ষণ ও একা-একা হাওয়া খাক, নয়তো কেটে পড়ুক।'

'তার চেয়ে সরাসরি ওকে চলে যেতে বলি। সেইটেই ভালো।'

'তার আগে শাড়িটা পালটে নে।' গায়ত্রী আবার বাধা দিল: 'ভদ্র হ।'

'একবার ধরা পড়ে যাবার পর পালটাবার মানে হয় না। কেন, এ বেশবাস মন্দ

কি! সরল শাদাসিধে থাকা কি দোষের? বাড়িতে মেয়েরা কি সর্বক্ষণ পেখম চড়িয়ে থাকে?'

'তাই বলে তোর মত হাতছানি দিয়ে অকালের কালো মেঘ কেউ ডেকে আনে না।' গায়ত্রী চোখের কটাক্ষকে কালো করল।

'বেশ তো, কালো মেঘ তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ!' কাকলি উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। মুখে ধ্বনি তুলল: 'দেখছেন, শুনুন আপনি এখন—'

পিছন থেকে গায়ত্রী বলে উঠল, 'এ আবার কোনদিশি ভদ্রতা?'

মা-ও বুঝি উঠছেন পিছু-পিছু। পা না উঠলেও কান উঠছে নিশ্চয়ই। তাই ছাদে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে চাইল কাকলি। কিন্তু কই, সুকান্ত কোথায়?

'এ কী, কোথায় গেলেন?'

এপাশ ওপাশ কাকলি তাকাল ব্যাকুল হয়ে। ছাদ এমন কিছু ঘোড়দৌড়ের মাঠ নয় যে নজরে আসবে না। কিন্তু সত্যি, গেল কোথায়? গাছটা যেখানে ডালে-ফুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে রেলিঙ ছাপিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সেদিকটাতেও নয়। এ কি আশ্চর্য, হাওয়া হয়ে গেল নাকি? নাকি লাফিয়ে পড়ল ছাদ থেকে?

কাকলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। রেলিঙে ভর রেখে ঝুঁকল নিচে।

নাকি গাছ বেয়ে নেমে গেল রাস্তায়?

তাকাল ফুলগুলির দিকে। যেন ওরা জানে। ওরাই বলতে পারবে। যেন ওদেরই একটি হয়ে রয়েছে লুকিয়ে। রয়েছে ঘুমিয়ে। সুগন্ধি হয়ে।

কী অদ্ভুত ছেলেমানুষ! জলের ট্যাঙ্কটার পিছনে লুকিয়েছিল গুড়ি মেরে ঝকঝকে দাঁতে এক ঝাঁক পাতিহাঁস উড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কালো মেঘ।

'কী সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!' ফ্যাকাশে মুখের সব জায়গায় এখনো নিশ্চিন্ত রক্ত আসে নি, কাকলি বললে ধূসর স্বরে, 'বুক এখনো কাঁপছে নিদারুণ।'

'বিশ্বাস করি না।' বললে সুকান্ত।

'কী বিশ্বাস করেন না?'

'আপনার বুক যে কাঁপছে।'

'মুখে বলছি—'

'বুকের কথা কি মুখের কথায় শ্রবণীয়? পরীক্ষা চাই।'

'পরীক্ষা! অপেনি কি ডাক্তার! সঙ্গে আপনার স্টেথিসকোপ আছে?' তুমি

চালাক হতে পারো, আমি হতে পারি না—এমনি দুরন্ত জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল কাকলি।

'কিন্তু আমার পরীক্ষা আরো নিকট, আরো নিবিষ্ট।' হাসল সুকান্ত: 'আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমারি গান—'

'আপনার ছাদ থেকে পথে যাওয়াই উচিত ছিল।

'সেটা তো মাটিতে, রাস্তায় পড়া হবে। যদি পড়ব তো এভারেস্ট থেকে পড়ব। আর পড়ব এই ছাদের উপর।'

'কেন, এই ছাদের উপর কেন?' যেন এতে বিশেষ আপত্তি বর্তমান, এমনি ভাব করল কাকলি।

'ছাদের উপর মানে তোমার কোলের কাছাকাছি।' দিব্যি বলল, বলতে পারল সুকান্ত: 'যেখানে এভার-রেস্ট। চিরন্তন বিশ্রাম।'

আশিরপদনখ গম্ভীর হয়ে গেল কাকলি! ফিল্মের রিল ঘুরিয়ে যাচ্ছে এমনি দ্রুত শেষ করবার উদ্যোগে বললে, 'যার জন্যে এসেছিলেন ছাদে, এই দেখুন সেই কদম গাছ। দেখুন কী গাঢ় পাতা আর কী নিটোল ফুল, শাদায়-সোনায় গায়ে হলুদ।

এক ফুঁয়ে সব যেন উড়িয়ে দেবার মত। সুকান্ত বললে, 'মানুষ পেলে গাছ কে দেখে!'

'মানুষ পেলে!'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া ঐ গাছ, কদম গাছ তো অশ্লীল।'

'অশ্লীল?' যেন বসে পড়ল কাকলি।

হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে যারা দেবদেবী মানে না নিরাকার মানে তারা কদম গাছকে অশ্লীল বলে। এই কদম গাছের উপরে-নীচে আমাদের কৃষ্ণ অনেক দুষ্কাণ্ড করেছেন, তারই জন্যে।'

'উপরে-নিচে?'

'নীচে থেকে বাঁশি বাজিয়ে ঘরের বউকে বার করে এনেছেন। আর', চোখে মুখে হাসির কুঙ্কুম ছড়াল সুকান্ত: 'আর, উপরের কথা শুনতে চেয়ো না। এবার কুল-চোর নয়, দুকূলচোর স্নানার্থিনীদের শাড়ি চুরি করে নিয়ে দিব্যি বসেছেন মগডালে। জলাঙ্গিনীদের কী দুর্দশা! দুর্দশা দেখেও দয়া নেই গুণমণির।'

'জানো', গলার স্বর আর্দ্র করল কাকলি: 'মা তোমাকে কালো মেঘ বলেছেন।'

'সে আমার গায়ের রঙ দেখে। আমি স্বভাবে কৃষ্ণ বলে নয়। তা ছাড়া আমার নাম তো শ্রীকান্ত নয়, আমার নাম সুকান্ত।'

'কিন্তু কালো মেঘ দেখে শ্রীমতীর কী আকুতি!' সুকান্তর চোখের মধ্যে তাকাল কাকলি।

'কলির শ্রীমতীর তো কালো মেঘকে তাড়াতে পারলেই শান্তি। বলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ুন। চম্পট দিন।'

'কিন্তু আমি কি শ্রীমতী?'

'তুমি এই কলকাতার সন্ধে। দেখ দেখি তাকিয়ে। এখনো জ্বলে নি আলো, গায়ে হাতে পরে নি একটিও গয়নার ছিটে। শুধু আভরণহীনতার আভা। রংটি মাজা-মাজা, মৃদু-মৃদু মিষ্টি। আর খুব-ভাঙা চুল, আস্তে-আস্তে পড়ছে ছড়িয়ে-গড়িয়ে; আর চোখভরা বৃষ্টির মমতা। তুমি আরেকরকম শ্রীমতী।'

'সন্ধে হয়েছে। এবার তবে বাড়ি যাও।' যেন সত্যিসত্যিই বললে কাকলি।

'যেতে ইচ্ছে করছে না।' শিশুর মত মুখ করল সুকান্ত। মুখল করল বটে কিন্তু নির্ভুল ফিরে চলল দরজার দিকে। দুর্দান্তের মত পা ফেলে।

'ও কি, এখুনি চলে যাচ্ছেন কি!' প্রায় আর্ত হাঁক দিল কাকলি: 'একটা অন্তত ফুল নিয়ে যান। যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা।'

ফিরল সুকান্ত। কাছে এল।

কাছে আসতেই কাকলি বললে, 'ফুল একটু দেখবে না? ধরবে না?'

নিষ্ঠুর নির্লিপ্তের মত সুকান্ত গাছেরই একটা ফুল ধরল মুঠোতে। বললে, 'জানো কদম খুব খাঁটি ফুল।'

'খাঁটি?' বিশেষণ শুনে আশ্চর্য হল কাকলি।

'হ্যাঁ, একনিষ্ঠ। প্রথম থেকে, উদ্গম থেকেই গোল হয়ে দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গোলই থাকে। আকার বা অবয়ব কিছুই বদলায় না একটুকু! আদিম থেকে অন্তিম এক অবস্থিতি। জীবনে প্রথম ভালোবাসার মত।'

গোবর্ধন দু কাঁধে দুই বেতের চেয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

'এ কি, চেয়ার কেন? চেয়ার দিয়ে কী হবে?' কাকলি হকচকিয়ে উঠল।

'বাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন' আপনারা পড়বেন বসে। ঘুরে ঘুরে পড়তে নাকি অসুবিধে হচ্ছে। তারপরে, যাচ্ছি, আবার সেই একটা টেবিল নিয়ে আসতে হবে।'

'টেবিল? কিন্তু এখানে আলো কই?'

'তা জানি না।' চলে গেল গোবর্ধন।

'তার মানে দু চেয়ারে হয়নি এবার অন্ধকারে টেবিল ছুঁড়ে মারা হবে। এবার পালাই।' পিছন ফিরেও তাকাল না, নেমে চলল সুকান্ত।

'সে কি, একটা ফুল নিয়ে যান :' ডেকে উঠল কাকলি।

একটা ফুল হাতে করে নিয়ে না গেলে এখানে আসার সাধুতাটা সাব্যস্ত হয় কি করে?

কিন্তু দাঁড়াল না সুকান্ত।

দোতলায় নেমেই টেবিল কাঁধে গোবর্ধনের সামনে পড়ল। কি মাথায় এল, বলে বসল, বাবু কোথায়?

ঘর দেখিয়ে দিল গোবর্ধন।

প্রণাম করবে কি, দু পা পুরু কম্বলে ঢেকে শুয়ে আছেন বনবিহারী।

'আমি এবার যাই।' বিনয়নম্র হয়ে বললে সুকান্ত।

'ও! তুমি? তুমি এখনো আছ? কি, এখন যাবে? বেশ, যাও। এরপর আবার যখন আসবে, যদি আস, বাইরে থেকে প্রথমে জানান দেবে—বুঝলে?'

'কেন, এখন তো জানাশোনা হয়ে গেল।' সুকান্ত মাথা চুলকালো : 'এখন তো সটান চলে আসতে পারব।'

'সটান? অত টানে দরকার নেই। শোনো।' বনবিহারী-থামালেন সুকান্তকে : তোমার বাবা কি করেন?'

'বাবা উকিল।'

'যে বাড়িতে থাকো সেটা নিজেদের বাড়ি?'

'না। ভাড়াটে বাড়ি।'

'কে কে, কতজন থাকে সে বাড়িতে?'

'রাবণের গুষ্টি। আমরা একান্নবর্তী কিনা—এক-এক গুলি দো-দো চিড়িয়া—' ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিচের সিঁড়ি ধরল সুকান্ত। আর বনবিহারী পায়ের কম্বলে মাথা ঢাকলেন।

সিঁড়ির মুখেই কাকলি। তার হাতে একটা কদমের ডাল। তাতে তিনটি ফুল। কী ভেবে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ডালটাকে দু-ফুল করলে। কোনো কথা বলল না। ডালটি দিয়ে দিল সুকান্তর হাতে।

নিচের তলায় নেমেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা। তার এক হাতে চায়ের কাপ আরেক হাতে খাবারের প্লেট।

'এ কি, চা করেছিলাম যে—'

'আরেকদিন এসে খাব।' দ্রুত বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

বাড়িতে এসেই ডাক দিল সেন্টুকে। ত্যাখ তোর জন্যে কী এনেছি।

'কী এনেছ কাকা ?' পড়ি-মরি করে ছুটল সেণ্টু।

'দেখবি আয়। রাধাকৃষ্ণ এনেছি।'

'খুব ভালো, খুব ভালো।' ফুলের বৃন্ত ধরে সেণ্টুর খুশি আর ধরে না।

'ভীষণ ভালো।' বললে সুকান্ত, 'বাসেও ভালো রসেও ভালো। রাতেও ভালো দিনেও ভালো। সুখেও ভালো স্মৃতিতেও ভালো। এমন ভালো আর হয় না।'

কদিন পরে এ বাড়িতে একটা হট্টগোল উঠল।

ওরে সুকু, শিগগির আয় তোর কাছে কে এসেছে। চারিদিক থেকে সমস্বরে কোলাহল উঠল।

এসেছে তো এসেছে, তায় এত ভূমিকম্প কিসের ? এসেছে তো রাস্তায় দাঁড়াক, অপেক্ষা করুক। আমি এখন দাড়ি কামাচ্ছি।

বন্দনা চোখ মুখ স্বর ঝাপসা করে বললে, 'এ তোমার সুবল সখাদের কেউ নয়। এ মেয়ে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ফুটানিকা ডিব্বা।'

...৮...

'না না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না।' মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী। অন্য বাড়ি দেখুন।'

মন-মেজাজ ভালো ছিল না মৃণালিনীর। আফিস থেকে ফিরে এসে খাবে বলে প্রশান্তর জন্যে এক বাটি মাছ মিটসেফের এক কোণে রেখেছিল লুকিয়ে, তাই বিজয়া খুঁজে পেতে বার করে খাইয়ে দিয়েছে হেমেনকে। এ নিয়ে খানিক আগে হয়ে গেছে খণ্ডপ্রলয়। স্বামীকে বেশি করে খাওয়াতে হয় আলাদা হয়ে গেলেই তো চলে। কে ধরে রাখছে ! এ বেশি করে খাওয়ানো নয় এ ন্যায্য ভাবে, ন্যায্য ভাগে খাওয়ানো। অফিস-আদালত যানেওয়ালা তিনজন—ভাসুরঠাকুর, ভাসুরপো আর উনি। তিন-জনের থালার পাশে-পাশে মাছের বাটি রেখে খুব তো চলে গেলেন উপরে, কিন্তু কী কারুকার্যটা করে গেলেন, ভাবলেন, কেউ বুঝি দেখতে পেল না। একজন তো আছেন চোখ মেলে, তিনিই দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, নিজের স্বামী-পুত্রের বাটিতে

ত্থানা করে আর দেওরের বেলায় একখানা। মনে হল এ ক্রটি নয়, এ ক্ষুদ্রতা, এ অন্যায়, একে উচিত নয় সহ্য করা। কিন্তু আছে কি কোনো প্রতিকার? চারদিকে একটু সতর্ক হয়ে তাকাতেই মিলে গেল প্রত্যুত্তর। মিটসেফের ভিতরে, প্রায় নিগূঢ়ে, লুকোনো একটা বাটি, আর, তার ঢাকা খুলতেই, সন্দেহ কি, ঝোলে-ভাসা দু টুকরো চাকা-চাকা মাছ। কী কর্তব্য স্থির করতে একচুলও সরতে-নড়তে হল না, পলকের মধ্যে বাটি দুটো বদলাবদলি করে ফেললাম!

'আমি ভাগ করে দিয়েছি, আমার উপরে আবার কথা কী।' লকলক করে উঠল মৃণালিনী : 'আমি বড় নই? আমার মান রাখবে না তুমি?'

'বড় শুধু মানে নয়, বড় প্রাণে।' পালটা জবাব দিল বিজয়া। 'আর, প্রাণ ঠিক বড় না হোক, অন্তত প্রমাণসাইজ হলেই হাতের মাপ ঠিক থাকে।'

'প্রশান্ত রুগ্ন, ওকে একটু বেশি খেতে দিলে তোমার হিংসে হয় কেন?'

'একলা ঘরে-বাইরে যত খুশি খাক না প্রশান্ত, কে দেখতে যাচ্ছে, কে বলতে যাচ্ছে? কিন্তু একসঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে ছোটকে বেশি ও বড়কে কম দেওয়ার স্বেচ্ছাচারকে শোধন করার নাম হিংসে নয়, গণতন্ত্র।'

'টাকার গরমে খুব যে বড় বড় কথা বলতে শিখেছ।'

'বড়র কথা যখন তুলছেন তখন প্রশান্তর চেয়ে তার কাকা বড় ছিল। কিন্তু এখানে বড়-ছোটর কথা নয়, সমানত্বের কথা। আর, আপনার কথামত, বড় হলেই যদি তার বেশি প্রাপ্য, তবে, সেদিক থেকে দেখলেও—'

'বেশি খেতে হলে বেশি দিতে হয়।' দু হাত মুখের কাছে তুলে কাকে বেশি বলা হয় গহ্বর রচনা করে দেখাল মৃণালিনী।

'এখানে আহরণ তো ঠিকই ছিল, বিতরণেই গোলমাল। মন্ত্রিত্বটা এবার বউয়ের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়ান না সরে।'

'কোন দুঃখে? তার চেয়ে তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে দূর হয়ে যাও।'

'কার বাড়ি কে ছাড়ে!' ধিক্কারের মত হেসে উঠল বিজয়া।

'কার বাড়ি মানে? এ বাড়ির ভাড়া কার নামে চলছে? ট্যাক্সো দেয় কে? কার নামে লাইসেন্স?' যত কিছু শুনেছে বুঝেছে, একধার থেকে বলে যাচ্ছে মৃণালিনী।

'ঐ সুখেই থাকুন।' বিজয়া তেজী ভঙ্গি করে দাঁড়াল সোজা হয়ে : 'বাড়িওলার সঙ্গে উনি দেখা করে এসেছেন। গোটা বাড়ি উনি কিনে নেবেন একলা, তখন কে কাকে তাড়ায় দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে।' থপথপ করতে করতে দোতলায় উঠে গেল মৃণালিনী।

উপরে ধোপা এসেছে, এক তাল ময়লা কাপড়ের মধ্যে বসে খাতায় হিসাব লিখছে বন্দনা। হিসাব লিখছে মানে যোগে বিয়োগে হিমসিম খাচ্ছে। ধোপার মোট গণতির সঙ্গে কিছুতেই ঘটাতে পারছে না অঙ্কের সমানত্ব। মাছ কমায় তো ঝোল বাড়ে, ঝোল কমায় তো মাছ লুকোয়। মাছে-ঝোলে-কাঁটায় ঘ্যাঁট পাকিয়ে যায়।

'তুমি কী করো? তুমি গিয়ে একটু দেখতে পারো না?' মৃণালিনী এবার বন্দনাকে নিয়ে পড়ল।

'বা, কখন থেকে তো আমি রামধরমকে নিয়ে আছি।' ভীরু চোখে তাকাল বন্দনা।

এবার রামধরমের উপর উদ্যত হল মৃণালিনী: 'তোমাকে কতদিন বলেছি না এই আফিসটাইম ঘেঁষে এসো না, বিকেলের দিকে এসো। বাবুরা সবাই অফিস-কাচারি বেরুবার সময় একগাদা ময়লা কাপড় দেখে গেল তো! কি জানি কি আছে আজ অদৃষ্টে। গোড়াতেই যা নমুনা—'

'কী হয়েছে?' মায়ের মুখের উপর প্রশ্ন করাও উচিত নয় অথচ না করাটাও কেমন, বলেই ফেলল বন্দনা।

মৃণালিনী কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বললে, 'প্রশান্তর মাছ খেয়ে নিয়ে গেছে।'

প্রশান্তর হাত না পা কাটা পড়েছে দুর্ঘটনায়, ট্র্যামের চাকা না বাস-এর চাকা খেয়ে নিয়ে গেছে এমনি যেন শুনল বন্দনা। 'কোথায়?' ফ্যাকাশে মুখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'মিটসেফে। বিকেলের জন্যে যে মাছ তুলে রেখেছিলাম ঢাকা দিয়ে তার আদ্যোপান্ত কিছুই রাখে নি।'

ধাতস্থ হল বন্দনা। আঙুলের মধ্যে ঝরনা কলমটা স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। বললে, 'কে খেয়ে গিয়েছে? বেড়াল?'

'বেড়ালের বড়দিদি। বিজয়া'

'কাকিমা খেয়েছেন?' হাসতে গিয়ে আঁতকে উঠল বন্দনা।

'ও একই কথা। সোয়ামীকে খাইয়েছে। আর সকলের দুখানা করে, ওর সোয়ামীর একখানা। এ সইল না ঠাকরুনের। মিটসেফ থেকে চুরি করে এনে সোয়ামীর পাতে ঢেলে দিল।'

'সে কি কথা? আফিস যাবার আগে খুব লাইট, হালকা খাবেন এই তো কাকার হুকুম। এক হাতা ভাত, এক চিলতে মাছ—'

'আর, এক চামচ দই! তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না, বউমা।' কান ঠিক খাড়া রেখেছিল, নিচে থেকে বিজয়া ঝংকার দিয়ে উঠল: 'কবে আবার ঐ ফরমান জারি করল তোমার কাছে? কই আমি তো শুনি নি। ভাবখানা দেখাচ্ছে যেন ঐ নির্দেশের জন্যেই ঐ সব ব্যবস্থা। তাই যদি হবে তবে দু টুকরো মাছের ভরপুর ঝোলের বাটিটা উনি 'না' করলেন না কেন? চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে যেন খেলেন চেটেপুটে? সর্দার! হালকা খাওয়াবার আর তুমি জায়গা পেলে না?'

কী বলতে যাচ্ছিল বন্দনা, চোখে-মুখে নীরব তর্জন করে দমন করল মৃণালিনী। তারা দু-জন, শাশুড়ি-বউ, এক পক্ষে, ইঙ্গিতটা তাই বিশদ করল। বললে, 'কিছু বলতে যেও না। ওরা এই বাড়ি কিনছে, কিনেই উচ্ছেদের নোটিশ দেবে আমাদের।'

'খ্যাঁদা নাকে অনেকেরই নথ পরতে সাধ যায়।' মুখ টিপে হাসল বন্দনা। 'তা স্যাকরার বাড়ি থেকে নথ আগে আসুক গড়িয়ে। যতদিন না আসে ততদিন নাক উঁচু করতে না চাওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ, ততদিন মানতে হবেই আমার কর্তাত্তি। শোনো, আমি আবার বাজার থেকে মাছ আনাচ্ছি।' ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে টাকা বের করল মৃণালিনী: 'তুমি গিয়ে রেঁধে ফেলো নতুন করে। রেঁধে মিটসেফে রেখে তালা দিয়ে বন্ধ করে এসো ভালো করে। হ্যাঁ, রুপোর মল আগে গড়িয়ে আসুক তারপর যেন গোদা পায়ের লাথি তোলে!'

বারান্দার একধারে ছোট আয়নাটাকে অনেক কায়দা কসরৎ করে দাঁড় করিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে সুকান্ত, বুকের ভিতরটা এবার ছাঁৎ করে উঠল। এবার না তাকে স্মরণ হয়! বাজারে যাবার লোকের দরকার, এবার না ঝোপ বুঝে কোপ পড়ে। মাছ খাবে অন্যে আর কাঁটা বিঁধবে তার নিজের গলায়। নতুন করে গালে সাবান ঘষতে লাগল সুকান্ত। ভাবখানা এমনি যেন কারুকার্যের এই মোটে আরম্ভ।

মৃণালিনী নিচেই নেমে গেল চাকরের খোঁজে। নিচে আবার না আরেক প্রস্থ শুরু হয়! এক দেশের বুলি তো অন্য দেশের গালি। মায়ের কাছে কাকিমা চোর, কাকিমার কাছে মা জোচ্চোর। যেমন হিটলারের কাছে চার্চিল, চার্চিলের কাছে হিটলার। অথচ কী সামান্য নিয়ে কলহ, কী অসামান্য ক্ষুদ্রতা! এ মিটবে কবে, মিটবে কিসে?

ঘন করে ফের বুরুশ করতে লাগল সুকান্ত, কিন্তু, এ কী, নিচে আবার এ কিসের গোলমাল?

হরিপদর খোঁজে মৃণালিনী সদরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাগ কাঁধে অচেনা মহিলা সামনে পড়তেই ঝাঁজিয়ে উঠল : 'না, না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না। অন্য বাড়ি দেখুন।'

'আমাকে বলছেন ?' সদরের মুখে, রাস্তার উপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কাকে ! আপনি কী এনেছেন, কিসের স্যাম্পল ?'

'স্যাম্পল ?'

'হ্যাঁ, চা, না, সাবান, না গুঁড়ো দুধ ? যাই আমুন, কিছু লাগবে না আমাদের ?' মৃণালিনী চাকরের জন্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

'না, চা হলে আমার লাগবে।' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিজয়া ; 'এজমালি চায়ে ভীষণ ঝামেলা, তাই আমার আলাদা স্টোভ জ্বলে। আলাদা টি-সেট। আসুন। আপনি কোন কোম্পানির এজেন্ট ? দার্জিলিং না আসাম না মধ্যপ্রদেশ ?'

হাসতে-হাসতে প্যাসেজটাতে উঠে এল কাকলি। বললে, 'না, আমি এজেন্ট নই, আমি প্রিন্সিপ্যাল।'

'প্রিন্সিপ্যাল ?' হাঁ হয়ে গেল মৃণালিনী।

'কোন কলেজের ?' সবিস্ময় চোখে জিজ্ঞেস করল বিজয়া। সসম্ভ্রমে বললে, 'আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ঘরে আসুন। ফ্যান আছে ঘরে।'

বাইরেই দ্বিধা করতে লাগল কাকলি। বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল মানে বলতে চাচ্ছি, আমি নিজেই নিজের কর্তা, কারু আমি প্রতিনিধি নই। গোমস্তা বা আমমোক্তার নই। তা ছাড়া অধ্যক্ষ হব কোত্থেকে ? আমি এখনো ছাত্রী।'

'এত বড় মেয়ে এখনো ছাত্রী ?' মৃণালিনী আবার প্রায় হাই তুলল : 'ঠিকমত প্রমোশন পাও না বুঝি ?'

'প্রায় তাই। এবার শেষ প্রমোশনের চেষ্টা।' কাকলি বাড়ির মধ্যে তাকাল।

'শেষ মানে ?' বিজয়া বেশি ওয়াকিবহাল, তাই গম্ভীর আন্দাজ করল : 'বি-এ দেবে বুঝি ?'

'এম-এ দেব।'

'এম-এ !' বিজয়ার কটাক্ষ মৃণালিনীর উপর। বললে, 'এইটুকু ছোট এক চিলতে মেয়ে, এম-এ দেবে ! বলো কি !'

মৃণালিনীও গম্ভীর হতে জানে। বললে, 'কেন, আমার সুকু—সুকান্ত—সেও তো এবার এম-এ দেবে।'

'ও! আপনিই তা হলে সুকান্তবাবুর মা?' অক্লেশে মৃণালিনীকে প্রণাম করল কাকলি। বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি?'

'যাই হই, ওঁকে যখন করেছ আমাকেও করতে পারো।' বিজয়া চিড়বিড় করে উঠল।

বিজয়াকেও প্রণাম করতে দেরি হল না। সহাস্য নম্রমুখে বললে, আমি আর সুকান্তবাবু একসঙ্গে পড়ি, একই বিষয়। পরীক্ষাসমুদ্রে আমরা একই জাহাজের সোয়ারি, যদিও উনি ফার্স্ট ক্লাশ কেবিনে আর আমি খোলা ডেকে। উনি বাড়ি আছেন? তাকাল মৃণালিনীর দিকে।

'কী জানি আছে কিনা! সারাক্ষণই তো আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।' মৃণালিনী পাশ কাটাতে চাইল: 'পড়ার নামে ঠনঠন। কখন বেরিয়ে গেছে টো-টো কোম্পানি হয়ে কিছু ঠিক আছে?'

'আপনি জানেন?' কাকলি তাকাল বিজয়ার দিকে।

'অনেকক্ষণ তো শুনি নি সাড়াশব্দ। বোধ হয় নেই।' মৃণালিনীর সঙ্গে চোখো-চোখি হল বিজয়ার।

'দেখুন না একটু। ওঁকে আমার দরকার।' যেন পুলিস হয়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছে এমনি শোনাল কাকলিকে।

'কেন, দরকার কেন?'

'আমার প্রোফেসর, মানে যিনি আমাকে বাড়িতে পড়ান, তিনি জানতে পেরেছেন কটা প্রশ্ন যা ঠিক আসবে পরীক্ষায়, নির্ঘাত আসবে।' ঢোঁক না গিলে দিব্যি বানাতে পারছে কাকলি: 'যতই কম পড়ুন সুকান্তবাবু ঠিক পাবেন ফার্স্ট ক্লাশ, আর যদি এ প্রশ্নগুলিও তাঁকে পৌঁছে দিতে পারি তবে আর দেখতে হবে না, একেবারে সকলের মাথার উপরে। চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা হয়ে বসবেন। তাই ওঁর জন্যেই ওঁকে দরকার, আমার জন্যে নয়!' বলতে বলতে নিজেই দু পা এগিয়ে গেল অভ্যন্তরে।

'সুকু, সুকু!' স্বর যতদূর কর্কশ করা যায় ডাক ছাড়ল মৃণালিনী: 'ছাখ এসে কে এক মেয়ে তোকে ডাকছে, কে এক ছাত্রী—'

খালি পা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, এক গালে সাবান, আরেক গাল কামানো, পড়ি-মরি ছুটে এল সুকান্ত। দেখল কাকলি দাঁড়িয়ে। অভ্যাসের দেশে আশ্চর্যের মত। যে মাধুরীর শেষ নেই, ইয়ত্তা নেই, যে মাধুরী আস্বাদ করে জীবনে কেউ বললে না আমার আশা মিটেছে, সেই নিত্য-অফুরন্ত নিত্য-অপূর্বের মত। পাষাণস্তূপের তলে অজানা নির্ঝরিণী।

'এ কী, আপনি ?' ন যযৌ ন তস্থৌর মত করে উঠল সুকান্ত।

যেন সুকান্তকে এখন দু চোখ ভরে দেখবার মত নয় এমনি উদাসীন চোখে ব্যাগ ঘাঁটতে লাগল কাকলি। বললে, 'দাঁড়ান, যার জন্যে আসা, আপনাকে কটা 'শিওর' কোশ্চেন দিই। আপনাকে কিন্তু কপি করে নিতে হবে।'

'আপনি একটু বসুন কাকিমার ঘরে। ঐ ঘরেই শুধু ফ্যান আছে এ বাড়িতে।' দিশেহারা উদভ্রান্ত হয়ে উঠল সুকান্ত : 'আমি একটু আসছি মানুষ হয়ে।'

'এখন বুঝি বনমানুষ আছেন!' স্বচ্ছ স্রোতে সারল্যের ধ্বনি তুলল কাকলি : 'আর কাগজ-কলম নিয়ে আসবেন।'

'না, আমার ঘরে অত লেখালেখির জায়গা নেই।' বিজয়া কাঠ-কাঠ গলায় বললে, 'তোমার নিজের ঘরেই নিয়ে যাও। সেখানেই ভালো জমবে।'

'তাই চলুন।' যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে এমনি কৃতজ্ঞ চোখে বিজয়ার দিকে তাকাল কাকলি! তারপরে নির্ভয়ে, যেন কতদিনের আনাগোনা, ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। যেন সুকান্ত তাকে টেনে আনছে না। কাকলিই তাকে ঠেলে তুলছে।

দুই জায়ে আর ঝগড়া নেই, তৃতীয় একটি মেয়ের বিষয়ে আলোচনার খাতিরে একত্র হয়েছে।

'কে এই মেয়ে ?' বিজয়া কোন হদিস দিতে পারে কিনা এমনি অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল মৃণালিনী।

'আর কে! সুকান্তর বন্ধু। নইলে, কী সাহস দেখলেন, সটান ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে ?' মৃণালিনীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল বিজয়া।

'বন্ধু মানে ?' হতাশপাংশু মুখ করল মৃণালিনী।

'ঐ যে নাকে দড়ি বিঁধিয়ে টানে। মানে যে বেন্ধে আর বান্ধে তাকেই বন্ধু বলে। কিন্তু যাই বলি মেয়েটা কিন্তু দেখতে মন্দ নয়।'

'আর বেশ বড়লোক, তাই না? বাপ না জানি কী করে!' মৃণালিনী বিজয়ার কাছে আবার আশ্রয় খুঁজল।

'হাতে ঘুড়িচুড়িব্যাগ জামায় ফাউণ্টেন পেনের ক্লিপ এই সরঞ্জাম থেকে আর কী বোঝা যাবে ?'

'কিন্তু হাতে চুড়ি একগাছা দুগাছা নয়, চারগাছা করে। তা বুঝি দেখিস নি ?' আরো সন্নিহিত হল মৃণালিনী।

'আরো কত দেখব কে জানে।'

এক রাজ্যের নোংরার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসছে কাকলিকে। নিচে এঁটো বাসনের পাহাড় পড়ে আছে, উপরে ময়লা কাপড়ের কুড়। সমস্ত শরীরে ছি ছি ছি করে উঠল সুকান্ত। আর তার নিজের এই রাজসজ্জা!

'আপনাকে একটা জঞ্জালের জঙ্গলে নিয়ে এলাম।' উঠতে উঠতে সুকান্ত বললে।

'আহাহা, এতে কুণ্ঠিত হবার কী! এ সব আবর্জনাই তো সংসারের শোভা।' এক কথায় জল করে দিল কাকলি।

'আর এই আমার বউদি। গোময়ে কমলমণি।' বন্দনাকে লক্ষ্য করল সুকান্ত।

প্রস্তুত হতে দিল না, ঝুপ করে বন্দনাকে প্রণাম করল কাকলি।

'আর এ কাকলি।' কী বিশেষণ দেবে একসঙ্গে এতগুলি সিঁড়ি ভাঙবার পর সুকান্তর মাথায় এল না।

একসঙ্গে ঘরে ঢুকল দু-জনে আর বন্দনা নিচে শামিল হবার জন্যে ছুট দিল! সম্মিলিত আলোচনার বৈঠকে তারও কোন না বক্তব্য পেশ করা যাবে!

'তুমি কী জাদুকরী!' বিগাঢ় চোখে তাকাল সুকান্ত।

'তার চেয়েও বেশি।' হাসতে লাগল কাকলি: 'সাবানের এজেন্ট। ওঁরা তাই আমাকে ভেবেছেন নিচে।'

'সাবানের এজেন্ট! ঠিকই ভেবেছেন তবে।'

'ঠিকই ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ, কে জানে এ সংসারে অনেক ময়লা সাফ হবার জন্যে তোমার সাবানের অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকে খবর দিয়ে আস নি কেন?'

'তুমি খবর দিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে একেবারে ধরে ফেলে দিলে স্বপ্নের মধ্যে।' চোখের মধ্যে কৌতুকের কুহক নিয়ে তাকাল কাকলি।

'আমি তার চেয়েও স্বপ্ন।' ব্র্যাকেটে হাত বাড়াল সুকান্ত: 'দাঁড়াও, জামাটা গায়ে দিই।'

'কেন, মানুষ হতে চাও? বেশ তো দেবতা হয়ে আছ। তাই আরেকটু থাকো না দেবতা হয়ে।'

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল সুকান্ত। আশেপাশে দ্রুত তাকিয়ে বললে, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

পাশের ঘর থেকে দু হাতে করে কী একটা মস্ত পুতুলের মতন কাকে নিয়ে এল সুকান্ত। বললে, 'এই আমার সেন্টু। আর, সেন্ট,' পুতুলটার দিকে তাকাল: 'এই কে জানিস?'

কোল থেকে ঘাই দিতে-দিতে নেমে পড়ল সেণ্টু। বললে, 'কে ?'

'সেই তোকে বলেছিলাম না, এমন এক লোক আছে যে আসে অথচ দেখা দেয় না, সে।'

'তুমি সেই ?' নিচু একটা তক্তপোশের উপর বসেছে কাকলি, তার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সেণ্টু।

'হ্যাঁ, সেই।' দু হাতে তার চুলের মধ্যে আনন্দে হাত ঢুকিয়ে দিল কাকলি।

'না রে, সে নয়। আরেকজন।' ব্র্যাকেট থেকে জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল সুকান্ত। বললে প্রায় বিষণ্ণ স্বরে, 'যে দেখা দেয় অথচ আসে না সে।'

...৯...................................

পড়তে-পড়তে কাকলি তাকাল জানলা দিয়ে। আবার মেঘ! সকালবেলায়ই মেঘ কেন? সেদিন তো বিকেলবেলা করেছিল।

বিকেলবেলা বৃষ্টি হলে সকালবেলা হতে পারবে না ? রাত্রে ভালবাসা এসেছিল বলে কি আসবে না ভোর হলেও ?

আসুক বৃষ্টি। নামবার আগেই ঠিক বেরিয়ে পড়বে কাকলি। ভিজবে। কৃপণ আত্মরক্ষার জন্যে ছুটোছুটি করবে না। মন ভাসিয়ে দিয়ে শুধু মাথা বাঁচাতে চাইবে না। বৃষ্টি না হলে যেমন যা করত বৃষ্টি হলেও তেমনি তাই করে যাবে। শান্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছুবে তার গন্তব্যে। সর্বাঙ্গীণ শীতলতা হয়ে দাঁড়াবে সামনে।

তারপর ?

জানি না। মনে-মনেই একটু হাসল বুঝি কাকলি।

না, জানি। সোনা-ঢালা রোদ উঠবে। গায়ে-গায়েই শুকিয়ে নেব শাড়ি জামা। ভদ্র হতে সুস্থ হতে তপ্ত হতে পালাব না বাড়ি, নিভৃতির বদ্ধ গুহায়। থাকব আকাশের নিচে। উন্মুক্তির দরবারে। যে আকাশ ভিজিয়েছে সে আকাশই শুকিয়ে দেবে।

যে প্রেম ঘরছাড়া করেছে সে প্রেমই মিলিয়ে দেবে ঘর।

সেদিন সুকান্ত কি রকম ভিজেছিল! ছি, ছি, এমন অবস্থায় কেউ আসে ? সিনেমার টিকিট কাটা থাকলেও কেউ আসে না। বাতিল করে দেয়।

কিন্তু, যাই বলো, সুকান্ত এসেছিল সত্যের টিকিট কেটেছিল বলে। কথা যখন

দিয়েছে, রেখেছে কথা। বৃষ্টি-আগুন, বজ্র-বন্যা, কিছুই গ্রাহ্য করে নি। আগাপাশতলা জলের মধ্যে সত্যের মত অপূর্বের মত এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যি, কী অদ্ভুত সুন্দর দেখতে হয়েছিল সুকান্তকে। মাথার চুলের কতকগুলি ভিজে রেখায় নেমে এসেছে কপালে, কপাল ছাপিয়ে চোখের উপর, ঠোঁটের কিনারে জল, দুই চোখের পলকে, চিবুক বেয়ে কানের লতি বেয়ে ঝরছিল ফোঁটা-ফোঁটা। জামা আর পরনের ধুতি জায়গায়-জায়গায় লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে— কী অম্লান সুন্দর দেখাচ্ছিল সুকান্তকে, কী দুর্ধর্ষ স্বাভাবিক! কাকলি যে কাছে যায় নি, দূরে ভিড়ের আড়ালে লুকিয়েছিল, সে শুধু ভয়ে। ভয়ও একটা সুখ! কিন্তু যাই বলো, অমন একটা জলজ্যান্ত সমস্যার সামনে কী মীমাংসা নিয়ে দাঁড়াতে পারত সে! কী সান্ত্বনা ছিল তার সঙ্গে, কী তাপভাণ্ড! কিন্তু এ কথা ভোলা যায় কি করে, তার জন্যেই তো ভেজা। সারারাত কী কষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে কাকলির। তারপর, কে জানে, ঠাণ্ডায় যদি অসুখ করে! কাকলি জানতেও পারবে না। যদি বাড়াবাড়ি হয়! কে বলে দেবে তার ঠিকানা। কে বা মনে করে রাখবে সেই বিদঘুটে প্লট নম্বার! কে বা লিখবে। আর লিখবেই বা কেন?

টুক করে কাছে এসে দেখা দিলে কী এমন অশুদ্ধ হত! বরং দেখা না দেওয়ার দরুন সুকান্ত কী ভাবল তাকে? মিথ্যেবাদী ভাবল, নয়তো ভাবল, অসহায়, নিরুপায়, পরাধীন অপোগণ্ড। নাবালক ভাবল। ছি ছি, কী স্বার্থপর কাকলি! নিজে কেমন অপলক চোখে দেখে নিল অপরূপকে, অথচ সুকান্তকে জানতেই দিল না জলের মরুভূমির মধ্যে কোথাও রয়েছে একটি ফসলের খেত, তার সন্ধানের অদূরেই সোনার স্বীকৃতি। কেমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল গোবেচারার মত। মা-হারা শিশুর মত। অন্তত দেখা দিয়ে ওর মুখে আনতে পারত তো একটু তৃপ্তির রং। আর কিছু না হোক, তাকে দিতে পারত তো একটু কথার উত্তাপ, একটু বা চোখের দৃষ্টির সেঁক। তাই নিয়ে রাজা হয়ে ফিরে যেতে পারত বাড়িতে। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এত ভিজল অথচ মনই ভেজাতে পারল না একটুকু। ও চলে গেলে পর, বৃষ্টি থামবার পর, বাড়ি ফিরতে কাকলিও কম কাঙালিনী সাজে নি। কাউকে বঞ্চিত করলে নিজেও বুঝি কিছু সঞ্চিত থাকে না।

সাধে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকার কথা বলেছিল সেদিন বানিয়ে? সুকান্তর কাছে সে ঋণী হয়ে আছে না? শঠের ঋণ শাঠ্য দিয়েই শোধ করা উচিত কিনা জানি না কিন্তু হঠকারীর ঋণ তো হঠ দিয়েই শোধ করতে হয়। আর, কেমন অসম্ভব সুন্দরভাবে সে এল! সেই বৃষ্টিতে আসার চেয়েও সুন্দর। কাউকে জানতে দিল না।

বুঝতে দিল না। প্রস্তুত হতে দিল না, যেমন ঘুমের মধ্যে মৃত্যু আসে, তেমনি সহজের মত অবধারিতের মত এল। কোনো বিধি কোনো নিষেধ মানল না, খাটলও না বুঝি। সবাইকে চটিয়েও কেমন পটিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। বাবা ভঙ্গ দিয়ে শুলেন গিয়ে ঘরে। মা প্লেট সাজালেন খাবারের। জলখাবার দেবার পর কোথাও তর্জন-তিরস্কার হল না। না খেয়ে গেলেও পরিবেশটি মিঠে হয়েই রইল। শুধু ছাদে নয়, ঘরে, সিঁড়িতে-বারান্দায়, কদম ফুল রেখে গেছে তার নিশ্বাসের জাদু।

কাকলিও প্রতিশোধ নিতে জানে। কেমন অসাবধানের মধ্যে ধরে ফেলেছি বলো। আফিসটাইমে কর্তাব্যক্তিদেব বেরিয়ে যাবার পর, এলোমেলো সংসারের মাঝখানে কেমন চলে এসেছি ফিরিওলা সেজে। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই তো ফেরিওয়ালা আসে। কিন্তু আমার আসা মেয়েদের কাছে নয়, আরেকজনের কাছে। আর এ ফেরি বেচবার নয়, অমনি দিয়ে দেবার।

এখন তোয়ালে দিয়ে মুখের সাবান মুছলেই বা কি, গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়ালেই বা কি, আমি দেখে নিয়েছি। কী দেখে নিয়েছ? আমার অপরিচ্ছন্নতা? আমাব দারিদ্র্য? মোটেই তা নয়। দেখে নিয়েছি তুমি ছোট একটি শিশুর মতই সরল হয়েও দুরন্ত, চঞ্চল হয়েও অসহায়। নইলে এখন তোমার মা, মৃণালিনী উপরে উঠছেন, হয়তো বা তোমাকে মোকাবিলা করতে, তাই দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলে। কি আশ্চর্য, মাকে অমন ভয়?

টেবিলের সামনে তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খাতা মেলে ধরে কলম উদ্যত করল সুকান্ত। চেঁচিয়ে বললে, 'বলুন প্রশ্নগুলো।' তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে যোগ করল: 'যা হয় কিছু বানিয়ে-টানিয়ে বলো। একটা পড়াশোনার অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করো। খবরদার, হাসি-হাসি মুখ নয়, সিরিয়স মুখ করো। মাস্টারি মুখ। পশ্চাৎ যা হবে তারই প্রাক্‌ছায়া আনো।'

'তা হলে হাসি-হাসিই রাখতে হয়।' হাসল কাকলি।

মৃণালিনী দরজার কাছে এসে থামল, ভিতরে ঢুকল না। সুকান্তকে গম্ভীর মুখে ডেকে নিল বাইরে।

কী না জানি আদেশ হয় মার। হয়তো সঙ্গচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠিয়ে বসবে। শুধু স্বর্গ থেকে বিদায় নয়, নরকে বদলি। যা, ঠোঙায় করে সিঙাড়া সন্দেশ নিয়ে আয়।

বাইরে, বারান্দায়, বেশ খানিক দূরেই মৃণালিনী টেনে নিলেন সুকান্তকে। গলা খাটো করে বললেন, 'ও কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে মানে? ভদ্রলোকের মেয়ে।' সুকান্ত অবাক হয়ে রইল।

'না, না, সে কথা নয়। বলছি ওর বাবা কী করে? কোনো বড় চাকরি? বড় ব্যবসা?' গলা খুব খাদে রাখতে পারল না মৃণালিনী।

'ওর বাবা কী করে তা দিয়ে কী হবে?' সুকান্ত বিরক্তির ধার ঘেঁষে দাঁড়াল: 'ও আমার সঙ্গে পড়ে, এক ক্লাশে, এক সঙ্গে পরীক্ষা দেবে এ বছর, এই ওর যথেষ্ট পরিচয়। ওর বাবাতে কী দরকার?'

'আহাহা সেই কথা নয়।' চোখে মুখে অস্থৈর্যের ভাব আঁকল মৃণালিনী: 'আমাদের মধ্যে একটা কথা উঠেছে, প্রায় বাজি ধারার মত। আমি আর বউমা একদিকে আর বিজয়া, তোর কাকিমা আরেক দিকে। আমরা বলছি ওর বাবা নিশ্চয়ই কেউ হোমরাচোমরা হবেন আর বিজয়া বলছে, হেঁজিপেঁজি, আজেবাজের বেশি হবে না। তুই জানিস?'

'জানি বৈকি।'

'কী? উকিল, কেরানি, মাস্টার?'

'না, না, চুনোপুঁটিদের কেউ নয়, বাঘসিংহ। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।'

উজ্জ্বল চোখ উৎফুল্ল করে নিচে নামতে গেল মৃণালিনী। সিঁড়িতে বন্দনার সঙ্গে দেখা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে জজটাই তার পছন্দ হল। যার প্রতাপে তার স্বামী পর্যন্ত তটস্থ সে-ই নিশ্চয় মহা-মহিম। বন্দনাকে বললে, 'বলো গে বিজয়াকে, জজসাহেবের মেয়ে।'

আর সেইটেই বাড়িয়ে বন্দনা বললে, 'শুনেছেন কাকিমা, যে-সে নয়, হাইকোর্টের জজের মেয়ে।'

শুয়ে শুয়ে হাই তুলছিল বিজয়া। বললে, 'হ্যাঁ, এমনি হাই-তোলা কোর্টের জজ। আর বিশ্বে ফলিও না বউমা। সত্যিকার হলে বাড়ির গাড়ি করে আসত, পায়ে হেঁটে আসত না।'

'কেন, গাড়ি তো ওদের আছে।' এমনি ভাবে বললেই কথাটা জমে তাই বললে বন্দনা।

'হ্যাঁ, জানি, আছে, কারখানায় আছে। যখনই জিজ্ঞেস করবে গাড়ি কোথায়, শুনবে কারখানায়।' খাটে ম্যাগাজিন হাতে উঠে বসল বিজয়া: 'গাড়ি না হয় হল, কিন্তু শাড়ি কোথায়? শাড়ি বুঝি শালকরের দোকানে?'

'কেন, যেটা পরে এসেছে সেটা শাড়ি নয়?'

'ওটা কাপড় নিশ্চয়ই, আর যখন চওড়া পাড় আছে রয়ে-সয়ে বলা যায় শাড়ি। কিন্তু আটপৌরেরও একটা সীমা আছে।'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, ও ছাত্রী।'

'ছাত্রীদের চিনতে আর বাকি নেই। চিকনচাকন দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। তুমি যা বললে, ওই যজন-যাজনের মেয়ে হলে দেখতে কেমন জলে ঢেউ দিত। বললাম নেহাতই গরিব-গুরবো, অল্পপুঁজি—'

প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পরেও এই কথা। অসহ্য লাগল বন্দনার অকারণে পরনিন্দা, পিতৃনিন্দা, ঝাঁজিয়ে উঠল মুখের উপর: 'যত পুঁজি আপনার। যত বিদ্যেবুদ্ধি সমস্ত আপনার একার পেটে।'

এখন আবার এই বউটার সঙ্গে ঝগড়া করো। বিজয়া বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। ম্যাগাজিন হাতে আবার হেলান দিল বালিশে।

এদিকে একটা হাতপাখা কুড়িয়ে নিয়ে মৃণালিনী সুকান্তর ঘরে ঢুকল।

সুকান্ত কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, 'হ্যাঁ, বলুন, তারপর—'

'তুই কী!' সুকান্তর উদ্দেশে শাসনের ভঙ্গি করল মৃণালিনী: 'তুই ওকে ন্যাড়া তক্তপোশে বসিয়ে নিজে চেয়ার নিয়েছিস!'

'উপায় কী! আমি যে লিখছি টেবিলে। উনি তো লিখছেন না, লেখাচ্ছেন হ্যাঁ, তারপর বলুন, কোশ্চেন নাম্বার ফোর—'

'এ ঘরটায় ফ্যান নেই।' কাকলিকে মৃণালিনী মৃদু-মৃদু হাওয়া করতে লাগল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কাকলি। 'কী সর্বনাশ!' হাত থেকে প্রায় জোর করে কেড়ে নিল পাখা। উলটে মৃণালিনীকেই হাওয়া করতে লাগল।

মৃণালিনী সরল ঘরের বাইরে। বললে, 'কী দেব তোমাকে? সরবৎ না চা?'

'যা আপনার খুশি।'

'বাতাস দিয়ে মাকে তাড়ালে।' বললে সুকান্ত, 'এবার তবে একটু আমাকে দাও। পরিশ্রম তো আর কম হচ্ছে না।'

'বয়ে গেছে। এই সুযোগে আগাম সেবা পাবার চালাকি, তা বুঝি আমি বুঝি না?' কাকলির চোখের শাদায় কালো তারা দুটি টলমল করে উঠল। 'বরং তুমি যদি দাও—'

'দেব?' উঠি-উঠি করল সুকান্ত।

'আমি তাড়ালাম মাকে, তুমি তাড়াও আমাকে।'

'রক্ষে করো। দরকার নাই পাখা। অন্ধ-বন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।' হাসল সুকান্ত: 'কিন্তু দেখলে তো আমার মা কত মিষ্টি। চা চাইলে চা, সরবৎ চাইলে সরবৎ।'

'সব মা-ই মিষ্টি। তুমি আমার মার হাত থেকে নিলে না কেন খাবারের প্লেট?'

'মুলতুবি রেখে এলাম। আর, জানো তো, ময়রার মিষ্টি নয়, আমি গাছের ফল চাই। টাটকা ফল। আর সে ফল ধৈর্যের ফল।'

'তার মানে,' চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি, 'বলতে চাও সবুরেই মেওয়া ফলে।'

চলে যাবার সময় আবার এক চালাকি করল কাকলি। বললে, 'বড় রাস্তার শর্টকাটটা বলে দিন। আসবার সময় কত যে ঘুরেছি এদিক-ওদিক তার ঠিক নেই।'

শর্টকাট বন্দনাও বলে দিতে পারে কিন্তু যদি কেউ জেগেও চোখ বুজে থাকে, সরলকে জটিল করে রেখে তা হলে কার কী সাধ্য!

মৃণালিনী বললে সুকান্তকে, 'তুই যা না, একটুখানি দে না এগিয়ে।'

বাইরে রোদের দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই রোদে বেরুলে ঠিক মাথা ধরে যাবে।' তারপর কাকলির দিকে তাকিয়ে বললে, 'যদি আসতে পারেন যেতেও পারবেন। বরং আসার চেয়ে যাওয়াটাই সোজা। চলে যান নাক ধরে—'

'তুই কী!' মৃণালিনী গঞ্জনা দিল: 'তোর জন্যে দরকারি প্রশ্ন নিয়ে এল বাড়ি বয়ে আর তোর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। দু পা এগিয়ে দিতে পারিস না?'

'মাথা ধরে যে।'

'বেশ, আমি ছাতা দিচ্ছি।' বন্দনাও কাকলির দিকে।

'থাক, এক ধরা ছিল মাথা, আরেক ধরা হবে ছাতা।' মুখভরা অনিচ্ছা নিয়ে কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'বলিহারি আপনাদের। তালুক-মুলুক চুঁড়তে পারেন একা-একা, বাড়ির রাস্তায় গাইড চাই। ঐ যে বলেছে সারা ঘর লেপে এসে দুয়ারে আছাড়—আপনাদেরও তাই হয়েছে। চলুন—'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েক পা এগুতেই কাকলি বললে, 'উঃ, তুমি কী মিথ্যে কথাই যে বলতে পারো। মুখে এতটুকু বাধে না।'

'আর তুমি? চালুনির কাছে ধুচুনি।'

'দু-জনেই সমান।' হেসে ফেলল কাকলি।

'কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ।'

'খুব পাপ হচ্ছে, তাই না?' চোখ মুখ আর্ত করল কাকলি।

'মোটেও না। এ ব্যাপারে মিথ্যে দোষের নয়।'

'কোন ব্যাপারে?'

'প্রণয় ব্যাপারে।'

'কে বলেছে ?'

'শাস্ত্র।'

'না, না, সে কথা নয়। কে বলেছে তোমাকে যে এ ব্যাপারটা প্রণয় ?'

'না, না, কেউ বলে নি। তবে তো নিঃসংশয় মিথ্যে। বিনিশ্চিত পাপ। নির্ঘাত নরকবাস।' চোখ মুখ কালো করল সুকান্ত।

'দু-জনে একসঙ্গে তো ?' হেসে ফলল কাকলি।

কতক্ষণ চলবার পর সুকান্ত বললে, 'সাত পার বেশি হাঁটলাম একসঙ্গে। সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে কী হয় ?'

'কিছুই হয় না। বড় জোর একটা স্ট্রেট লাইন হয়।'

'শাস্ত্রে যে বলে—'

'আবার শাস্ত্র! শাস্ত্রীয় কিছু হতে হলে একটা মণ্ডলের চারপাশে ঘোরা চাই।'

আবার হাসি।

জানলা দিয়ে আবার তাকাতেই কাকলি দেখল মেঘ নেই। রোদে পথঘাট দোকান-বেসাত ট্রাম-বাস লোকজন সব ঝলমল করে উঠেছে।

তোড়জোড় করে বেরুচ্ছে, বেলা প্রায় দশ, বিনতা এসে হাজির। বিনতা কাকলির এক কলেজের হলেও দু বছরের অগ্রণী, বি-টি পাশ করে চেতলার কোন মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি করছে। বয়সে কিছু বড় হলেও হৃদ্যতায় সমান-সমান। সমস্ত নির্জন-গোপনের অংশীদার।

'এ কি, বেরুচ্ছিস ? কোথায় ?' বিনতা প্রশ্ন করল ব্যস্ত হয়ে।

'ছাত্রীবন্ধুর বাড়ি।' মুখ টিপে হাসল কাকলি। বললে, 'সকালের দিকে হলে ছাত্রীবন্ধু, দুপুরের দিকে হলে লাইব্রেরি, সন্ধের দিকে হলে প্রোফেসর। তার মানে বুঝতেই পাচ্ছিস—'

'কী বুঝতে পারব ?' হাঁ হয়ে রইল বিনতা।

'তার মানেই মিট করতে যাচ্ছি।'

'কার সঙ্গে মকদ্দমা ?'

সশব্দে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'এ বাংলা মিট নয়, ঝগড়ার নিষ্পত্তি নয়, এ ইংরিজি মিট, এর মানে নিভৃত-সাক্ষাৎ—'

'কার সঙ্গে ?'

'এ জেনে তোর লাভ নাই।'

'ভেট কোথায় হবে ? কোন কুঞ্জে ?'

'এও অবান্তর।'

'তোদের পরীক্ষা কবে শুনি?'

'এক মাসও আর নেই।'

বক্তৃতা জুড়ল বিনতা। পরীক্ষাকে এত কাছে রেখে সময় নিয়ে হেলাফেলা করার কোনো মানে হয় না। আগে পরীক্ষা পরে প্রেম। আগে কেরিয়র পরে আর সব। প্রেম একটা যায় আরেকটা আসে কিন্তু কেরিয়র একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর তার সংশোধন চলে না। মনোবিলাসের জন্যে ফাঁকা মেঘ না কুড়িয়ে দৃঢ় ভূমির উপর মজবুত বাড়ি তৈরির জন্যে শক্ত ইট কাঠ লোহা লক্কড়ের দরকার।

'সব সত্যি কথা।' বললে কাকলি, 'কিন্তু তোর তো এখনো জোটে নি, তুই কী বুঝবি বল।'

'জোটে নি তো জোটে নি!' রাগ করে উঠল বিনতা: 'জোটাবার জন্যে আমি ফোটানো ফুল হয়ে মৌমাছি ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়াই না। জীবনে প্রেমই সর্বস্ব নয়। তার চেয়েও বড় জিনিস আছে। তা হচ্ছে কর্তব্য, তা হচ্ছে সংগ্রাম—'

'হবে হয়তো। কে জানে প্রেমই আবার মহত্তম কর্তব্য কিনা, সংগ্রাম কিনা। তবু প্রার্থনা করি,' বিনতার দিকে করুণ চোখে তাকাল কাকলি: 'জীবনের সে আশ্চর্য অনুগ্রহ তোর হাতে একবার অন্তত আসুক। সে প্রসাদের স্বাদ পেয়ে তারপর তুই কথা বলিস।'

কে জানে কী করে আসে! বিনতার একটা শখ হচ্ছে গণ্যমান্যদের সঙ্গে, বিশেষত সংস্কারমুক্ত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে চিঠি লিখে-লিখে আলাপ করা, এবং দৈবী কৃপা যদি ঘটে কারু সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, শেষ পর্যন্ত বা সর্বাধিক হওয়া।

তরুণতম ভাবের তীব্রতম কবি, বর্তমানে, 'অনিরুদ্ধ'। চিঠি লিখে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল বিনতা। দেখল বাইরের ঘরে একটি সুদর্শন যুবক ইজিচেয়ারে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

'আপনিই কি অনিরুদ্ধ?' রক্তের মধ্যে আনন্দের রুনুঝুনু তুলে জিজ্ঞেস করল বিনতা।

সাতাশ-আটাশ বছরের যুবকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'বসুন। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।' যুবক চলে গেল ভিতরে।

বিনতা প্রায় ধুলোর উপর বসে পড়ল।

'যেমন ধর রসবোধ। সাহিত্যে-শিল্পে রসবোধ। যে কি সকলেরই আসে? কিন্তু কেন যে কার আসে কেউ বলতে পারে না।' বলতে লাগল কাকলি। 'কিন্তু

যার আছে ঐ রসবোধ সে কি জীবনকে বেশি করে উপভোগ করে না ? তেমনি যার জীবনে এসেছে সেই দুর্গমের ডাক—সেই অজ্ঞেয়ের স্পর্শ—তুইই বল সে কি জীবনকে একটু বেশি করে পায় না ? আর বাঁচতে এসে কার না বেশির প্রতি লালসা ?'

বনবিহারীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি।

'কোথায়, যাচ্ছিস ?'

'একটি ছাত্রীর বাড়িতে বাবা।'

'তোর দাদার খোঁজ পেলি ?'

'পেয়েছি। মা তোমাকে বলে নি ?'

'কই, না তো। কোথায় দেবনাথ ?'

'শ্রীরামপুর স্টেশনে ধরা পড়েছে। ডবলিউ-টি, উইদাউট টিকেটে ট্র্যাভেল করছিল। ধরা পড়তে ফাইন হয়েছে বিচারে। জরিমানা দিতে পারে নি। জামিন দাঁড়াবারও লোক পায় নি কোথাও। তাই সাত দিনের জেল। নরুকাকাকে মা পাঠিয়েছেন শ্রীরামপুর।'

উত্তেজনায় উঠে বসেছিলেন বনবিহারী, আবার শুয়ে পড়লেন।

কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে বিনতাও বাইরে এল।

'তুই তো অন্য দিকে।' রুক্ষ মুখে বলল বিনতা।

'হ্যাঁ', স্মিতস্নিগ্ধ মুখে বলল কাকলি, 'প্রেমের দিকে। আর তুই কর্তব্যের দিকে, বিধেয়ের দিকে। যার যেমন বুঝ। যার যেমন মতি। আর যদি ডাক্তারি কথায় বলিস, যার যাতে এলার্জি।'

...১০...............................

কী সেই দুর্জ্ঞেয় গহন শক্তি যে এমনি করে রোদে-বৃষ্টিতে ঘরের বার করে আনে। অসাধ্যকে সাধ্য করার মন্ত্র শেখায়। আশ্চর্যের চোখে অসম্ভবকে দেখতে বলে। অণু থেকে অণিষ্ঠ গুরু থেকে গরিষ্ঠ সে-শক্তির নাম কী! কোনখানে তার বাসা! কী চায় সে আমাদের কাছে ?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটকের সামনে দেখা হল দু-জনের।

কাকলিই পরে এল।

'ভাবলাম এলেই না বুঝি।' এক পা এগিয়ে এল সুকান্ত।

'ওরকম সকলকেই ভাবতে হয়।' কাকলি হাসল: 'আমিও ভাবছিলাম গিয়ে হয়তো দেখতে পাব না। তবু ছেলে দাঁড়িয়ে থাকলে বড় জোর বোকা-বোকা দেখায়, কিন্তু মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে—ও, হোপলেস—চলো কোথাও একটু বসি।'

'এখানে নয়।' চলতে চলতে সুকান্ত বললে।

'এলাম এখানে অথচ এখানে নয় কেন?' দুই কালো চোখে এক ঝলক আনন্দের রোদ নিয়ে তাকাল কাকলি: 'চারদিক বেশ ফাঁকা—'

'কিন্তু খুব সেকেলে-সেকেলে ঠেকছে না?'

'সেকেলে?'

'লোকে বলতেই বলে লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইডেন গার্ডেন। কোনো একটা নতুন জায়গা ভাবা যাক। তা ছাড়া এখানটা কেমন একটা বাড়ি-বাড়ি গম্বুজ-গম্বুজ ভাব—চারদিকে আবার দেয়ালের বন্ধন—'

'ওর চেয়ে ভালো জায়গা কোথায়?' অসহায় চোখে অন্তদ্দেশে তাকাল কাকলি।

'আছে ভালো জায়গা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না।'

'কোথায়?'

'বাইরের ঐ মাঠ। গড়ের মাঠ। ঐ অঢেল মুক্তি। বৃষ্টির পরে কী ঘনসবুজ ঘাস হয়েছে দেখেছ!'

'মাঠে গিয়ে বসব!' হাঁ হয়ে রইল কাকলি।

'প্রায় পথে বসার মত মুখ করছ দেখছি। কিন্তু কী সুন্দর মাঠ বলো তো। জগতে আর কোথাও আছে বলে শুনি নি। এত বড় মাঠ, কিন্তু আশ্চর্য, কারু মাথায় আসে না।'

'রাত্রে মাঝে মাঝে পুলিসের মাথায় আসে বলে শুনি।' কটাক্ষে হাসল কাকলি।

'কিন্তু আমরা তো অন্ধকারে আসি নি, দিনে এসেছি, রোদ্দুরে এসেছি। পালিয়ে-এড়িয়ে নয়, সকলের চোখের উপর দিয়ে। জানিয়ে-শুনিয়ে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

কথাটা তিরস্কারের মত শোনাল না, মমতার মত শোনাল।

'তা একটু যে না হয়েছে তা বলি কি করে? কিন্তু', মমতার চোখে সুকান্তও তাকাতে জানে: 'তোমার মাথাও খুব সুস্থ নেই।'

গম্ভীর হল কাকলি। বললে, 'কিন্তু সব কিছুরই মাত্রা আছে।'

'আনন্দের মাত্রা নেই, ভালোবাসার মাত্রা নেই। চলো রেসকোর্সটার পাশে

চলো, নয় তো চলো ওদিকে, গাছের নিচে কেমন আঁচল-ছড়ানো ছায়া, দু-জনে বসি গিয়ে সেখানে—'

'এখন ভরা আফিসটাইম। রাজ্যের গাড়ি যাচ্ছে রেড রোড দিয়ে। তারা সব দেখুক।'

'দেখুক। শিখুক।'

'শিখুক?' চমকে উঠল কাকলি : 'কী শিখবে?'

'কেমন করে দেখাতে হয়। সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য তো দেখাবার জন্যে। সূর্য থেকে ঘাস সকলেরই সেই এক চেষ্টা, এক পাগলামো। তেমনি কোথাও যদি ঠিক-ঠিক ভালোবাসা জন্মায়, তা হলে তাকে রাখতে হবে লুকিয়ে? পারা যাবে রাখতে? কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে আগুন? ঢাকা যাবে যৌবন? জগজ্জনে দেখুক না একটা ছবি। শুনুক না একটা গান।'

'পুলিসে খবর না দিক', হাসল কাকলি : 'খবরের কাগজের অফিসে খবর দেবে। চলে আসবে স্টাফ রিপোর্টার।'

'আসুক। এসে দেশের দুরবস্থাটা দেখে যাক স্বচক্ষে।'

'দুরবস্থা?'

'হ্যাঁ, দেখে যাক, বাঙালি পরিবারের ঘরে ছাত্রছাত্রীদের কী নিদারুণ স্থানাভাব। পড়বার জন্যে সূচ্যগ্র জায়গা পাচ্ছে না, পাচ্ছে না তিলার্ধ নিরিবিলি। তারই মধ্যে যারা অধ্যবসায়ী, শ্রমনিষ্ঠ, তারা কেমন দুপুরবেলায় গড়ের মাঠে চলে এসেছে, গাছের ছায়ার নিরিবিলিতে বসে পড়ছে একমনে—'

'তবু যদি সঙ্গে একখানা বই থাকত!'

'সে কি?' চলতে চলতে দাঁড়াল সুকান্ত : 'সঙ্গে যে একটা ঝোলা এনেছ তার মধ্যে একখানাও বই নেই?'

'আমার কী আছে না আছে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলি, তোমার তো কিচ্ছু নেই। তুমি তো রিক্ত।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে। আমি রিক্ত।' স্বর দৃঢ় করল সুকান্ত : 'রিক্ততাই আমার শক্তি।'

'কিন্তু আমার যদি থাকে তা হলে তোমারও আছে।' স্বর গাঢ় করল কাকলি। পরে লঘু হবার চেষ্টায় বললে, 'কেন, এক বই পড়ে না দুই জনে? এক বই লেখে না? এক নৌকোয় একজন হাল ধরলে আরেকজন টানে না দাঁড়?'

'তবে চলো, হাঁটি। বসে দরকার নেই। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি।'

দু-জনে হাঁটতে লাগল।

'তোমার ঝোলাটা আমাকে দেবে নাকি?' হাত বাড়াল সুকান্ত।

'এত সামান্য ভার নিয়ে তুমি কী করবে? তোমার শক্তি আরো গুরুতরের জন্যে প্রস্তুত।' চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি।

'হ্যাঁ, প্রস্তুত।'

গল্পই করছে দু-জনে। আজেবাজে কথার ভুরভুরি তুলছে। কিন্তু দু-জনেই কান পেতে আছে গল্প কখন সংবাদ হয়ে ওঠে, কল্পনা কখন ইতিহাসের মাটি ধরে।

খনির সোনা কখন যায় বাজার দরে যাচাই হতে।

কত কথা বলার পর, কোন কথার পিঠে, কত পথ হেঁটে এসে, কোন ভঙ্গিতে শ্রান্ত প্রাণকে বিশ্রাম দিতে বলা হবে সে কথা, আদিম আহুতির কথা। কে পাড়বে, কাকলি না সুকান্ত! কী ভাবে পাড়বে! কী রকম প্রথম লাগবে না জানি শুনলে!

আমার কী স্পর্ধা, আমি কী করে বলি, কথার ধার দিয়েও কেউ ঘেঁষছে না। তবু এক সময় তো কথাটা উঠবেই, ফসল পাকলে ফসল তোলবার কথা, সেই আশায় বসে আছে দু-জনে। কে না জানি আগে বলে! আর না জানি, কখন!

সজ্ঞানে কে না জানি আগে ছোঁয়। আমার কী দরকার, কী না জানি ভেবে বসবে, নিজের চৌকাঠের বাইরে একটি আঙুলও বাড়ায় না কেউ। যার যেই কোট তাতে নিটুট হয়ে বসে থাকে। তবু সজাগ রেখেছে চোখ, কখন না জানি শাদা কাগজে স্বাক্ষর পড়ে, কে না প্রথম উসখুস করে দাগ দিতে।

চোখ আর কানের পাহারায় সাহারা জাগিয়ে রেখে কথা বলে চলেছে দু-জন।

আর হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্তহীন পথ যেন চলে যেতে পারে অতন্দ্র। রোদে এতটুকু কষ্ট নেই, চলায় নেই ক্লান্তি। চেতনার কোন গভীরতম ধামে এসে উপস্থিত হবে প্রতি পদে তার প্রত্যাশা। যেন কাছেই আছে কোনো মৌনী সমুদ্র, প্রতি নিশ্বাসে শুনছে তার নৈঃশব্দ্য।

'এই বোধ হয় ঠিক জায়গায় এলাম এতক্ষণে।' উৎসাহী স্বরে বললে সুকান্ত।

'ও মা, এ তো জু। চিড়িয়াখানা।' কাকলিও কম চঞ্চল হল না। বললে, 'দাঁড়াও, কিছু কলা আর বাদাম কিনি।'

'বাদাম আবার কার জন্যে?'

'হরিণের জন্যে। কী সুন্দর ছলছল বড় বড় চোখ হরিণের!'

কেনাকাটা করে এগিয়ে এসে জানোয়ারের এলাকার দিকে যাচ্ছিল কাকলি,

সুকান্ত বাধা দিল। বললে, 'ওদিকে গিয়ে আর কী লাভ? এসো ঐ জলের ধারে ছায়াতে বসি।'

'বা, এগুলো কী হবে?' হাতের ঠোঙার দিকে লক্ষ্য করল কাকলি।

'যা খিদে পেয়েছে, এগুলো আমরা নিজেরাই সদ্ব্যবহার করতে পারব।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, বাদামটা না হয় তুমিই খেয়ো, আর কলা— বুঝতেই পারছ—ও আমার প্রাপ্য। অসংকোচ সারল্যে হাসল সুকান্ত।

দু-জনে বসল ঘাসের উপর।

বাদাম ছাড়িয়ে খেতে খেতে কাকলি বললে, 'ওদের খাদ্য খাচ্ছি দেখে লোকেরা না আমাদের ভুল করে।'

'লোকেরা ভুল করবে না। যেরকম ব্যগ্রব্যস্ত হয়ে দেখছে আমাদের, ঠিক ঠিক মৃগমর্কটই ভাবছে। আমার ভয় হচ্ছে জু-র কর্তাব্যক্তিদের—'

'কেন, ভয় কেন? পাছে জঙ্গুলে মনে করে খাঁচায় পুরে ফেলে?'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু এমন আসান কি হবে যে দু-জনকে এক খাঁচায় পুরবে?'

'ওরা না পুরুক কিন্তু সংসার তো পুরতে পারে।' বলেই চমকে উঠল কাকলি। এ কি, অগোচরে কাকলিই প্রথম কথা পাড়ল নাকি? নিত্যতরুণায়মান তৃষ্ণার ইঙ্গিত সেই আনল প্রথম?

যাক, বেঁচেছে, কথাটা ঘুরিয়ে নিল সুকান্ত। মুখ গম্ভীর করে বললে, 'আমি খুব খেলো হয়ে যাচ্ছি তাই তোমার মনে হচ্ছে না? খুব হালকা, লঘু—যাকে বলে অর্বাচীন।'

জলে ছায়া দেখতে দেখতে কাকলি বললে, 'তাই তো ভালো। গভীর কথা গম্ভীর করে বলতে গেলে মানে পায় না। হালকা হাসির পাখায় উড়িয়ে দিলে ঠিক প্রজাপতির মত হৃদয়ের উপরে এসে বসে।'

'কিছুতেই শালীন হতে পারি না।' মুখভাব কাতর করল সুকান্ত।

'শাল গায়ে না দিলে শালীন হওয়া যায় না।' কাকলি হেসে উঠল।

'খালি গায়ে থাকি— দেখেছ তো— তাই খেলো চলি খেলো বলি—'

'তাই ভালো, খোলাখুলিই ভালো। কপাট না রাখাই অকপট হওয়া!'

'তার মানে, বলতে চাও অকপাটই অকপট।'

কী সুন্দর কথা বলতে, কী সুন্দর কথা না বলতে! কথা বানাতে, কথা ভুলে যেতে। রোদ দেখতে, জল দেখতে, জলের ছায়া দেখতে। উপস্থিতি দিয়ে অস্তিত্বকে

মুছে ফেলতে। সময়ের কারবারে দেউলে হয়ে যেতে। নানা জাতের পাখির কলরব শুনতে। গাছের উপর থেকে একটা উল্লুক যে উকু-উকু করছে—তাও কত আনন্দের!

জীবনে কেন এত উচ্চারিত আনন্দ, কেন এত অব্যক্ত আরাম!

কে একজন এদিকে আসছে। সঙ্গে কটি ছেলে-মেয়ে।

'আরে, দীপঙ্কর যে। কতদিন তোমাকে খুঁজছি। কোথায় আছ আজকাল? এরা কারা?' উঠে দাঁড়াল সুকান্ত।

'মেস ছেড়ে দিয়েছি। বাসা নিয়েছি আলাদা। বাসা মানে একতলার একটা এঁদো ছোট কুঠুরি। পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছি মা-ভাই-বোনদের। আমার চাকরি হয়েছে জানো বোধ হয়।'

'জানি। বরেনদের ওখানে তো?'

'হ্যাঁ, তোমার সেই স্কুলের পুরোনো বন্ধু, স্থায়ী বন্ধু বরেন। কিন্তু ভাই চাকরিটা অস্থায়ী, টেম্পরারি।' শীর্ণ মুখে হতাশার রেখা ফোটাল দীপঙ্কর।

'সমস্ত কিছুই অস্থায়ী।' এই প্রসঙ্গে উচিত ছিল না, তবু কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই জীবনটাই স্বল্প মেয়াদের ইজারা। ইজারা শেষ কি বিনা নুটিসে উৎখাত।

'অত সহজ নয়।' হাসল বটে দীপঙ্কর কিন্তু চোয়ালের হাড় দুটো যেন কঠিন দেখাল।

'আমি বলব বরেনকে।'

'বোলো।' নরম হল চোয়ালের হাড়।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি শ্রীমতী কাকলি, আর ইনি আমার বন্ধু দীপঙ্কর। দীপঙ্কর মানেই ইস্পাতের ফলা। যে ইস্পাত শুধু অস্ত্র নয়, যন্ত্রও। তলোয়ার যেমন লাঙলও তেমনি।'

'ঠিক বলেছ। শুধু জঙ্গলই কাটি না, ফসলও ফলাই।' হাসল দীপঙ্কর।

'ইস্পাত ইচ্ছে হলে কঠিন, ইচ্ছে হলে নরম। এই দেখ-না, সকলকে নিয়ে থাকবে বলে বাসা করেছে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে এসেছে চিড়িয়াখানায়।'

যাই বলো, পাকতেড়ে লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না কাকলির।

ঠিকানা দিল দীপঙ্কর। দু-জনকে বললে একদিন বেড়াতে যেতে। স্বচক্ষে দেখে আসতে মানুষ কীভাবে থাকে, কীভাবে রাস্তাকে বাড়ির শামিল করে নেয়, নিতে হয়, কীভাবে বাড়ির লোক রাস্তার লোক হয়ে যায়।

'যাব একদিন।' চলে যাচ্ছে দীপঙ্কর, হেঁকে বললে সুকান্ত।

'এবার তবে আমরাও উঠি।' কাকলি উদ্যোগ করতে চাইল: 'এ কি, তুমি আবার বসছ যে!

'বসছি মানে? শুয়ে না পড়ি।'

'কেন, কী হল?'

'ভীষণ মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরেছে তো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। বাইরে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাব।'

তবু চঞ্চল হয় না সুকান্ত। বললে, 'সাবিত্রীর সঙ্গে বনে কাঠ কাটতে এসে সত্যবানের এমনি মাথা ধরেছিল—'

'এমনি?'

'মাথা ধরতেই সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সত্যবান।'

'পড়ুক। কিন্তু এটা বন নয়, আর আমরা কেউ এখানে কাঠ কাটতেও আসি নি।'

'কিন্তু যাই বলো', ঘাসের উপর গা এলিয়ে দেবার ভঙ্গি করল সুকান্ত, 'সাবিত্রী খুব ভালো মেয়ে। অন্তত খুব ভালো উকিল।'

'জানো পাশ করে আমি ল পড়ব, উকিল হব।' মুখে-চোখে দীপ্ত হয়ে উঠল কাকলি: 'কী সুন্দর দেখতে হয় মেয়ে-উকিলদের! মাথায় খোঁপা, কালো শাড়ির উপরে কালো গাউন, গলায় শাদা ব্যাণ্ড ঝোলানো। যেন কৃষ্ণকলঙ্কসায়রে শ্রীরাধিকা। মাথায় খোঁপা, মুখে চোপা—সে এক দেবতাদের দেখবার মত। দেখো আমি ঠিক উকিল হব।'

'কিন্তু সাবিত্রীর মত হতে পারবে না। সওয়ালজবাবে কেমন ঘায়েল করল যমকে। মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আনল।'

'ফিরিয়ে আনল সে সাবিত্রীর ওকালতির জোরে নয়, যম নিতান্ত ভালোমানুষ ছিল বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। একটার পর একটা বর দিয়ে যাচ্ছে যম। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বললে, আমার এক শো পুত্র হোক। যম বললে, তথাস্তু।'

'তথাস্তু। তাতে কী?'

'তখন সাবিত্রী প্যাঁচ কষতে গেল। বললে, আমার স্বামী ছাড়া আমার শতপুত্রতা বর সিদ্ধ হয় কি করে? সুতরাং আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। যম হাবাগোবার মত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে, তথাস্তু।'

'এ ছাড়া আর কী বলতে পারত যম ?' অজ্ঞানের মত মুখ করে তাকাল স্থকান্ত।

'যম যদি টেকনিক্যাল হত, বলতে পারত, তুমি শতপুত্র চেয়েছ নাও শতপুত্র। তাতেই পর্যাপ্ততৃপ্ত হও। ঐ বরের সিদ্ধির জন্যে সত্যবানকে না হলেও চলবে।'

'যমটা বোকা।'

'অন্তত উকিল হিসেবে আনাড়ি।' খিলখিল করে হাসল কাকলি। বললে, 'স্থতরাং যমকে ভয় নেই। আমি কি যমেরে ডরাই, যে বলেছে সে ঠিকই বলেছে।'

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিল দু-জনে।

মাঝামাঝি একটা মোড়ে এসে দু-জনে ছাড়াছাড়ি হবে।

তার আগেই প্রায় হয়ে উঠেছিল। পাশ থেকে একটা ছুটন্ত জিপ হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ছিল ট্যাক্সির উপর। ভাঙা সেকেণ্ডের ডগায় ব্রেকটা সজোরে কষতেই বেঁচে গেল ট্যাক্সি।

নিজের সিটের সীমার মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে স্থকান্ত বললে, 'কী কেলেঙ্কারিটাই হত বলো তো অ্যাকসিডেণ্ট হলে ?'

অনুরূপ সমতায় কাকলিকেও প্রত্যাবৃত্ত হতে হল। বললে, 'অ্যাকসিডেণ্টের চেয়েও কেলেঙ্কার।'

'এবার ঠিক আসত স্টাফ রিপোর্টার। খবরের কাগজে ঠিক দু-জনের ছবি বেরুত।' স্থকান্ত তাকাল কাকলির দিকে: 'আর আমাদের জন্যে তো যম নয়, যমদূত আসত, তখন তোমার শত তর্কেও কিছু হত না।'

'দু-জনে একসঙ্গে সাবাড় হয়ে গেলে কে মিছিমিছি তর্ক তুলত।' এততেও কাকলি হাসছে: 'জখম হয়ে নিস্পন্দ পড়ে থাকলেই বিপদ। তখন ননদিনি বলো নগরে ডুবেছে রাই-রাজনন্দিনী—' মাথার চুলটা ঠিক করল কাকলি।

তারপর, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, দু-জনে সন্ধ্যার শোতে এল এক সিনেমা-ঘরের দরজায়। একটা বাজে ঘর, আর একটা পচা ছবি।

'এ তোমার মামুলি হয়ে যাচ্ছে না ?' আপত্তিভরা চোখে তাকাল কাকলি।

'বোধ হয় নয়। একটু আশ্চর্যের আলো জ্বলবে হয়তো কোথাও।'

উপরে, ব্যালকনির দুটো টিকিট নিয়েছে। শেষ লাইনে কোণের দুটো চেয়ার। উপরে আর জনমনিষ্যি নেই। ঢালা শূন্যতায় অঢেল অন্ধকার।

'এ কি, আর একটাও লোক নেই ?' কাকলি কলধ্বনিত হয়ে উঠল।

'যারা পাশে দেখে তারাও আজ পাশ কাটিয়েছে। হাউসের ঐ টর্চওলা লোকটা যদি বিরক্ত না করে, শান্তিতেই দেখতে পাব ছবি।'

'অন্ধকার দেখ।'

'অন্ধকার ?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যের আলো।'

শানানো ক্ষুরের ধারের উপরে বসে আছে পাশাপাশি। যে নড়বে সেই কাট: পড়বে।

কে আগে নড়ে।

কে প্রথম হয়।

·১১

'আমাদের যারা দেখছে তারা আমাদের কী ভাবছে বলো তো।' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'এসকেপিস্ট ভাবছে।' বললে সুকান্ত।

ফল বেরিয়ে গেছে পরীক্ষার। এখন তাই আরো ফলের দিকে, স্কুলের দিকে যাত্রা।

'না, আমি এসকেপিস্ট নই। যুদ্ধ থেকে আমি পালাব না।' ছুরিবেঁধা মাংসের টুকরোটা মুখে তুলল সুকান্ত। বললে, 'নিধিরামও যুদ্ধ-পলাতক ছিল না।'

'কে নিধিরাম ?' প্লেটের আলুটাকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করছিল কাকলি, তার আগে চোখই সে আলু করে তুলল।

'সে কি, নিধিরামকে চেনো না ?'

'তোমার সব বন্ধুকেই কি আমি চিনি ?'

'আহা, শুধু আমার বন্ধু হতে যাবে কেন ? সকলের বন্ধু। জগজ্জনের বন্ধু।'

'সে আবার কে ?' আলুটা মুখে পুরল কাকলি।

'আমাদের সেই নিধিরাম সর্দার। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। অথচ ইয়া গালপাট্টা ইয়া শুঁড়তোলা নাগরা ইয়া কোমরবন্ধ।' ছুরিতেকাঁটায় টুং-টং শব্দ তুলল সুকান্ত: 'সাজসজ্জার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিসমিল্লায় গলদ। ঢাল-তলোয়ারই নেই।'

'তুমি কি নিধিরাম ?'

'তা ছাড়া আর কী !'

'তুমি কি নিরস্ত্র? নিরন্ন? প্রতিশ্রুতিশূন্য?' কোল থেকে ন্যাপকিন তুলে ঠোঁটের প্রান্ত দুটো মুছল কাকলি।

'কিন্তু বর্তমানটা তো দেখবে। রূঢ় বাস্তব বর্তমান।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্তমানই দেখছি।'

'দেখছ?' কাকলির চোখের মধ্যে চোখ ফেলতে চাইল সুকান্ত।

দু চোখের পাতা সবলে বন্ধ করে কাকলি বললে, 'আদ্যোপান্ত দেখছি।'

'অতক্ষণ চোখ বুজে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' হেসে ফেলল সুকান্ত: 'বর্তমান দেখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎও না দেখে ফেলো সেই সঙ্গে।'

'ভবিষ্যৎ থাক ভবিষ্যতের জায়গায়।' চোখ খুলল কাকলি : 'আমার এই বর্তমানই সুন্দর।'

'সুন্দর? আমার চাকরি নেই—এখনো হয় নি, আর ঐ আমাদের বাসা। তুমি সুন্দর বলো?'

'বলি।' চিবোতে চিবোতে থামল কাকলি। রসাল মুখে বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই আমার সুন্দর।'

'এটা কোনো কাজের কথাই নয়।' গম্ভীর হল সুকান্ত: 'মনে রেখো কাব্যের কথা ছেড়ে আমরা এখন কাজের কথায় নেমেছি।'

'তার মানেই হৃদয় থেকে উদরে নেমেছি।' নিটোল হাঁ করে দিব্যি এক গ্রাস মুখে তুলল কাকলি: 'নামলামই বা। দিব্যি পেট ভরবে। হিসেবে ভুল হবে না।'

'হবে না?' কাকলি কি দয়া করে বলছে এমনি করুণ জিজ্ঞাসায় তাকাল সুকান্ত।

'না। যা হোক তোমার কিছু একটা আয় আছে, আয়ের পথ আছে—এম·এ হবার পর তোমার টিউশানির বাজার তেজী হবে নির্ঘাত—'

'তুমি কী বলছ? এ একটা আয়?'

'চরিত্র যাই হোক চেহারাটা আয়ের মতই। আর কে না জানে, তিল কুড়িয়েই তাল, হাঁটি-হাঁটি করেই হাওয়াগাড়ি—'

'হাওয়াগাড়ির মধ্যে নয়, হাওয়াগাড়ির তলায়।' হাসল সুকান্ত।

'আজ্ঞে নয়, অত পঙ্গুতা দেখিয়ো না।' সস্নেহ শাসনের চোখে তাকাল কাকলি: 'তা ছাড়া তুমি একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছ। দু-জনের পক্ষে বেশ একটা মোটা টাকা দিয়ে দিতে পারবে সংসারে।'

'তু-জনের পক্ষে।' কথাটা মৃত্যুগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করল সুকান্ত। একটু বুঝি. বা চিন্তাকুল শোনাল।

'যখন বর্তমান নিয়ে কথা বলছ, আপাতত তো তু-জনই।' হাড়টা শেষ পর্যন্ত ছুরির অধীন থাকবে, না, হাতে করে ধরতে হবে, কাকলি বললে চোখ নামিয়ে।

'কত টাকাই বা স্কলারশিপ। সবটা দিয়ে দিলেও মোটা টাকা হয় না। তবে, যখন তু-জন, তু-জনের ব্যাপার, তখন তুমিও যদি হাত লাগাও—'

'তার মানে?' হাড়টা হাতে করেই তুলল কাকলি: 'আমাকেও চাকরি করতে বলছ?'

'মন্দ কি।'

'ওসব হবে না।' চুলভরা সুন্দর মাথাটা মৃত্যু মৃত্যু নাড়তে লাগল কাকলি: 'ওসব মনের কোণেও স্থান দিও না। বিয়ের পর চাকরি করতে পারব না বলে রাখছি। এক জীবন জ্বলেছি পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে, আরেক জীবন জ্বলতে পারব না চাকরি নিয়ে। জানো পেটপুরে খেতে পারি নি এ পর্যন্ত। এই স্কুলের বাস, ঐ কলেজের ঘণ্টা, এই ক্লাশের রুটিন, ঐ পরীক্ষার নুটিস—দিন-রাত চড়কে চড়িয়ে রেখেছে। বিয়ের পর আবার আফিস নিয়ে, ট্রামে-বাসে ওঠা-নামা নিয়ে, পাগল হতে রাজি নই। বিয়ে মানেই বিশ্রাম। বিয়ের পরে স্রেফ বিশ্রাম করব।'

'বিশ্রাম করবে?'

'জানো, বাড়ির সমস্ত রান্না শেষ হয়ে যাবার পর কোনোদিন খাই নি। এবার খাব।' হাসতে লাগল কাকলি: 'চচ্চড়ির ডাঁটা খাব চিবিয়ে চিবিয়ে। মাছ-পাতুরির ল্যাজা খাব চুষে চুষে। কত চাটনি আচার, কত কুলচুর আমচুর। পান খাব গাল পুরে। তারপর গা ঢেলে ঘুমুব তুপুরবেলা। উঃ, কতদিন ঘুমুই নি নিশ্চিন্ত হয়ে। আর খারাপ হবার ভয় নেই, এর-ওর-তার এন্তার উপন্যাস পড়ব। বিকেলবেলা আলতাউলি আসবে,—শোনো, আর নাপতেনি বলা চলবে না—ঝামা দিয়ে পা ঘষে মোটা করে আলতা পরিয়ে দেবে। সিনেমায় যাব।'

'জীবন সার্থক করবে।' গদগদ হবার ভাব করল সুকান্ত।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করব। নইলে শুধু শুধু এত পরিশ্রম কেন?'

'পরিশ্রম?'

'প্রেম প্রচণ্ড এক পরিশ্রম ছাড়া আর কি।' ইতিমধ্যে বয় চা দিয়ে গিয়েছে, নিজের কাপে চামচ নাড়তে লাগল কাকলি: 'মজুরি ছিল বলেই মেহনত, তেমনি

য়ে ছিল বলেই প্রেম। বিয়েই হচ্ছে প্রেমের রোজগার। বিয়ে হবে না অথচ প্রম করো, এ যেন ঘোড়া নেই তবু চাবুক হাঁকড়াও। ওসব ফাকা আওয়াজে মি নেই মশাই। আমার কাছে সাফ কথা, ফেলো কড়ি মাখো তেল। য়ে করতে রাজি আছ তো এসো প্রেম করতে। নচেৎ দূর হও, অর্থাৎ দূরে াকো।'

কী সুন্দর কথা বলছে কাকলি, যেন একটা ফোয়ারা খুলে গিয়েছে, সানন্দ চাখে তাই দেখছে সুকান্ত। দেখতে দেখতে বললে, 'তুমিই ঠিক বুঝেছ।'

'আর এও বুঝেছি যিনি প্রেম করছেন অর্থাৎ যিনি স্বামী হবেন তাঁরই রোপুরি দায়িত্ব স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেবার, ঘরবাড়ি দেবার। স্ত্রীর দায়িত্ব নই যে, স্বামীকে খাওয়াবে, পরাবে, বসবাসের সুবিধে করে দেবে। ঘুরে ঘুরে দখে এসো দেশবিদেশ। সর্বত্র এক বিধি এক ব্যবস্থা। স্বামীর ঘাড়েই স্ত্রীর পড়া। সুতরাং আমার মুখের দিকে দীন নয়নে তাকিয়ো না। তোমাকেই একা-একা সমস্ত বহন করতে হবে, পালন করতে হবে—পালিয়ে যাবার, এসকেপিস্ট হবার আর উপায় নেই।'

'কিন্তু বাড়িতে যে ঘরে তুমি থাকবে, তা তুমি দেখেছ?' ভয়ে ভয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল সুকান্ত।

'আমি থাকব মানে? আমার দু-জনে থাকব।' কাকলি প্রায় বিজয়িনীর ঙ্গি করল।

'ঐ হল। দু-জনের ঘর। দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। ঘরটা ছোট। দু ভায়ের পক্ষে না হলেও স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে ছোট। তা ছাড়া সুবীরকে সরতে হবে। যেতে হবে আর কোথাও, তোমার মায়ের ঘরে, নচেৎ ঢাকা বারান্দায়। উপায় নেই। কিন্তু,' কাকলি পেয়ালার উপর ঠোঁট নামাল; 'এবার এতদিনে, তোমার কাকা-কাকিমা সরবেন না?'

'সরা তো উচিত।'

'সরলে ঐ ঘরটা আমরা নিয়ে নেব। স-আসবাব আমাদের কুলিয়ে যাবে।'

'কিন্তু যদি না সরেন?'

'সরাবার চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ।'

'তবু যদি না পারি?'

'থাকবে। থেকে যাবে। আমাদের এই ব্যবস্থাটাই বা কদিনের জন্যে! দিন তোমার না একটা চাকরি হয়। একটা আস্ত-সুস্থ চাকরি পাওয়া মানেই

বড় একটা অধিকারের মালিক হওয়া। তখন ইচ্ছে হলে বেশি দামের টিকিট কেটে সংসারের প্রথম লাইনের উঁচু আসনে বোসো গ্যাঁট হয়ে, নয়তো একান্ত বিতাড়িত হলে কেটে পড়ো, তাঁবু ফেলো অন্যত্র।'

'সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ একটি শাঁসালো মজবুত চাকরি দরকার।' নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'সেটা কে না বুঝছে? কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়টাতে কী হবে সেইটেই প্রশ্ন।'

বিল এনেছে বয়। দু-জনে একসঙ্গে হাত রাখল—সুকান্ত তার মনিব্যাগে কাকলি তার বটুয়ায়।

শাসনরুষ্ট চোখে তাকাল সুকান্ত।

'ও, হ্যাঁ, তুমিই তো দেবে। তোমারই তো একার দায়িত্ব।' হাত সংবৃত করল কাকলি। দু-জনে বেরিয়ে এল রেস্টুর‍্যান্ট থেকে। হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। খানিকক্ষণ কথা কইল না কেউ। আবছায়ায় চুপচাপ হাঁটতেই শান্তি মনে হল।

'চলো জলের ধারে গিয়ে একটু বসি।' বললে সুকান্ত। 'মনে যখন কোনো আলোড়ন আসে তখন জল দেখতে খুব ভালো লাগে।'

'সম্প্রতি যে আলোড়ন এসেছে এতে জল-মাটি আলো-আঁধার লোকজন ইট-পাথর ট্রাম-বাস ট্যাক্সি-রিকশা সমস্ত ভালো লাগছে। যেন রহস্যের দেশে অপূর্বের পোশাক পরে দাঁড়িয়েছে সকলে। স্বয়ং নিধিরামকেও মনে হচ্ছে ক্ষুদিরাম।' হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'রাত বেশি হয় নি তো? চলো তবে। আরেকটু বসি।'

'কথাটা শেষ করি।'

অনেক খুঁজে পেতে জলের কাছাকাছি ঘাসের উপর বসল দূরে-দূরে। যেন সহসা সন্দেহের না ছায়া পড়ে। কিন্তু দূরে বসলেও মনে হয় কত কাছে, কাছে বসলেও মনে হয় কত দূর। এ যেন বিরহের পর মিলন বা মিলনের পর বিরহ নয়, এ যেন মিলন-বিরহ একত্র গাঁথা।

কারু মুখে কোনো কথা নেই।

কৌতূহলে কত সজাগ ছিল কাকলি, সে দেখবে কুঁড়ি কি করে ফুল হয়ে ফোটে। কুণ্ঠার কপাট খুলে কি করে প্রথমে কথা আসে। কি করে ইচ্ছা তার আঙুল বাড়ায়। মাঝখানে কাকলি ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল টের পেল না। সহসা চোখ চেয়ে দেখল এক বাগান গোলাপ, এক

াছ পাখি, এক হৃদয় জলতরঙ্গের শব্দ। আর বাসনা রক্তের ছোঁয়া পেয়ে সোনার ঙ-ধরা

আর সুকান্তকে কে বিশ্বভুবনের আনন্দের খনির মালিক করে দিয়েছিল এক হূর্ত। বলেছিল, যত পারো, যত ধরে, যত ভরে, তুলে নাও দু হাতে। সুকান্তও ত পেরেছে উন্মাদের মত তুলে নিয়েছে বুকে করে। সেই একস্তূপ সুখকেই খন সে বসিয়েছে ঐ ঘাসের উপর, তার চোখের সামনে, তার আকাঙ্ক্ষার লেকায়।

'তোমার কথা তো বললে, কিন্তু আমারও একটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল।' নতুন রে কথা পাড়ে সুকান্ত।

'তোমার আবার কোন বিষয়ে প্রস্তাব?' লঘু করতে চাইল কাকলি।

'ঐ একই বিষয়ে। অন্তর্বর্তী সময়টা কীভাবে যাবে সেই সম্পর্কে।'

'তোমার প্রস্তাব তো জানা।'

'জানা?'

'হ্যাঁ, মান্ধাতার আমলের সেই মামুলি প্রস্তাব। ধৈর্যের প্রস্তাব। এ কে না জানে?' লানো ভঙ্গি ঋজু করল কাকলি: 'তার মানে যতদিন তোমার সুস্থ-সমর্থ চাকরি না জোটে ততদিন আমি বাপের বাড়িতে ভাত মারি আর তা-না-না-না করে দিন াটাই। তুমি চাকরির জন্যে ঘোরো.আর আমি ঘুরি তুমি চাকরি পেলে কিনা সেই বাদের জন্যে। দিনের পর দিন দিনমণি অস্ত যাক।'

'মন্দ কি।'

'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বের কাছে খেলো করে দিতে চাও?'

'বা, খেলো করে দিতে চাইব কেন?'

'তা ছাড়া আর কি। জগৎ সমক্ষে তুমি এই প্রমাণ করতে চাও যে আমি একটি াঙালি মেয়ে যতই কেননা ভালোবাসি আমার পুরুষকে, যেহেতু সেই পুরুষ রোজগারে মজোর, যেহেতু তার জোটে নি এখনো হৃষ্টপুষ্ট চাকরি, খোলামেলা বাড়িঘর, আমি াকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নই। যেন আমার সম্মতির শর্তই এই যে, তুমি আমাকে ারাম দেবে, প্রাচুর্য দেবে, বিলাসের জীবন দেবে। আর যতদিন তা না দেবে তদিন আমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকব। আমার সাধের যৌবন ভেসে যাবে। ানো, আমি অত সস্তায় বিকিয়ে যেতে আসি নি।'

'কিন্তু পুরুষের চালচুলোটা দেখবে তো।' হাসল সুকান্ত: 'পুরুষ যখন, তখন, হি নয়, পুরু করেই দেখতে হবে। যে পুরু নয় সে এখনো পুরুষ নয়।'

'থাক। দেখেছি। কিন্তু ধরো, বসে আছি, এক বছর গেল দু বছর গেল, তোমার তেমন চাকরি কিছু জুটল না, পারলে না পুরু হতে, তখন কী হবে? মিনি হতে হতে মিইয়ে যাব আমি, মিলিয়ে যাব আমি? আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে চলে যেতে বলবে?' যেন কথায় একটু কান্নার ছোঁয়াচ লাগল কাকলির।

'অত সোজা নয়। শোনো, সরে এসো।' চোখের ইশারা করল সুকান্ত।

'কেন, এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি।'

সুকান্তই এগিয়ে গিয়ে বসল। বলল, 'আমার প্রস্তাবটা, তুমি যেমন বলছ, অ সেকেলে নয়?'

'কিছু নতুনত্ব আছে?'

'নিশ্চয়ই। নইলে অসংলগ্ন তুমি গালে হাত দিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকবে আর আমি পথে-পথে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াব—ব্যাপারটা মোটেই সুখেরও হবে না গৌরবেরও হবে না। তা ছাড়া গালে হাত আর কদিন থাকবে? গালের হাত শেষে কপালে এসে উঠবে। আমাকে ফ্যা-ফ্যা করতে দেখে শতমুখে ছ্যা-ছ্যা করে থাকবে। আর, ফিকির বুঝে সটকান দেবে খিড়কি দিয়ে।'

'আমি?' নিজের বুকের উপর হাত রাখল কাকলি।

'ভয় শুধু আমার দিক থেকে নয়, দু দিক থেকেই। ভয় ভয়—সময় কেবল রাখাই ভয়। সময় বয়ে যেতে দেব না। দু দিক থেকেই তার পথ আটকাব।'

'তার মানে?'

'এক্ষুনি-এক্ষুনি বিয়ে করব।'

'মানে, এই মুহূর্তে? অন দিস্ স্পট?' কাকলির উল্লাসের মধ্যে আত এসে মিশল।

'মানে যৎপরোনাস্তি শিগগির। তোড়জোড়ে অন্তত মাসখানেক তো লাগবেই আশ্বস্ত করল সুকান্ত। বললে, 'বিয়ে করব কিন্তু ইনটেরিম পিরিয়ডটা, মানে অন্তর্বর্তী সময়টা—আমার চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত—আমরা আলাদা-আলাদা থাকব তুমি তোমার বাপের বাড়িতে আমি আমার মায়ের হাঁড়িতে।'

'আলাদা-আলাদা?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল কাকলি: 'বিয়ে হবে অথ একত্র হব না? মানুষে বলবে কী!'

'মানুষে জানতেই পারবে না।'

'জানতেই পারবে না? সে কী কথা!'

'বিয়েটা গোপনে হবে। রেজেস্ট্রি করে হবে।'

'গোপনের কী দরকার!' গম্ভীর হল কাকলি: 'তাতে কী সুবিধে?'

'সুবিধে অনেক। তোমার-আমার বাড়ি দুইই সন্দেহের বাইরে বসে ঘুমুবে, আমরা যে যার মনে থাকতে পারব, চলতে পারব এদিক-ওদিক। আমি কাজের চেষ্টায়, তুমি না হয় আরো পড়ার চেষ্টায়। দু-জনের ঘন-ঘন দেখা হবারও কোনো দরকার পড়বে না। তেমন কোনো অসুবিধের জায়গায় যদি দেখা হয় এমন ভাব করলে চলবে যেন আমাদের মুখ চেনা। নির্ঝঞ্ঝাটে দিন যাবে। পাকা দলিল হয়ে থাকবে, কারু ফরকে বা ফসকে যাবার পথ থাকবে না। আর এ দলিল শুধু বিয়ের দলিল নয়, আমার গৌরবের দলিল—আমাকে অকৃতী জেনেও তুমি আমাকে দিয়েছ বরমাল্য। জগৎ সমক্ষে সেই বাঙালি মেয়েটিকে আমি খেলো হতে দিই নি, তার হাত থেকে নিয়েছি রাজটীকা। তারপর যখন চাকরি পাব, আসবে সে প্রার্থিত মুহূর্ত, ছদ্মবেশ খুলে ফেলব, সগর্বে নিয়ে যাব তোমাকে, স্থানে-মানে দেব অনেক স্বাচ্ছন্দ্য। কোথাও কোনো হৈ-চৈ হবে না, সব সুন্দরে শেষ হবে।'

করুণ করে তাকাল কাকলি। বললে, 'তোমার কষ্ট হবে না ছেড়ে থাকতে?'

এক মুহূর্ত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল সুকান্ত। পরে বললে, 'কিন্তু এখুনি যদি তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আসো এই আয়হীন স্থানহীন সংকীর্ণতার মধ্যে, সে কষ্ট আরো কঠিন হবে।'

'হোক। তবু বিয়ের পর, স্বামী বর্তমানে থাকতে পারব না বিধবার মত।' সশব্দে হেসে উঠল কাকলি: 'কী অপরূপ ব্যবস্থা, সর্বাঙ্গে দগ্ধ হয়ে বসে থাকো সমুদ্রের পারে কিন্তু খবরদার, স্নান করে স্নিগ্ধ হতে পারবে না। এতে আমি রাজি নই। আর এ সমুদ্র আমার অস্তিত্বের সমুদ্র, অমৃতের সমুদ্র। আর স্নানে শুধু স্নিগ্ধ হওয়া নয়, শুদ্ধ হওয়া, স্নানান্তে জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করা—'

দু-জনে উঠে পড়ল।

'চলো, একটা ট্যাক্সি পাই কিনা দেখি।' সুকান্ত বললে।

'তুমি রেজেস্ট্রি করার কথা ভাবছিলে কেন? আমরা কি আলাদা জাত, আলাদা দেশ, আলাদা ধর্ম?'

'না, না, তার জন্যে নয়। যেখানে কোনো বাধা নেই তেমনি সাধারণ বিয়েও রেজেস্ট্রি করে করা যায়। রেজেস্ট্রি করায় হাঙ্গামা কম। খরচ কম। নেমন্তন্নপত্রও ছাপতে হয় না। তারপর যদি একটু গোপন করে রাখতে হয় রেজেস্ট্রিই প্রশস্ত।'

'না, অন্যায় তো কিছু হচ্ছে না, কোনো অর্থেই নয়।' চলতে-চলতে বললে কাকলি, 'তবে কেন গোপন করতে যাব? তারপর সাজব-গুজব না, লোকজন আসবে

না, আলো জ্বলবে না, সানাই বাজবে না, আসর-বাসর বসবে না—সে আবার একটা বিয়ে কী! বাপ জানে না মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে—তাতে আমি রাজি নই।'

'বাবা-মাকে বলবে?'

'নিশ্চয় বলব। বাজনা যখন বাজিয়েছি, তখন মিউজিক ফেস করব।'

অন্ধকারেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে কাকলির মুখ। সুকান্ত বললে, 'যদি অনুমতি না পাও?'

যেন হোঁচট খেল কাকলি। বললে, 'তখন দেখা যাবে। কিন্তু তুমি? তুমি যদি না পাও।'

'আমার ভয় কি! আমি তো এসকেপিস্ট নই।' মুঠো করে কাকলির ডান মণিবন্ধটা ধরল সুকান্ত: 'আমি রণমুখো সেপাই।'

ট্যাক্সি ডাকতে হল না। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অপেক্ষায়। উঠল দু-জনে।

কাকলি বললে, 'হ্যাঁ, লড়ব, দাঁড়াব, তৈরি করব। আমি তোমার চিত্রাঙ্গদা।'

১২

'তোমার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখে এলাম, কাকিমা।' যতদূর সম্ভব চোখে ও গলায় ফুটন্ত উৎসাহ নিয়ে বললে সুকান্ত।

যেমন পড়ছে, বিজয়া তেমনি পড়তে লাগল ম্যাগাজিন।

'বেশ বড়-বড় দুখানা ঘর, সামনে বারান্দা—'

গ্রাহ্যও করছে না। চোখ ডুবিয়ে পড়ছে তন্ময় হয়ে। কী একটা উৎকট উৎকণ্ঠার মুহূর্তে এসেছে না জানি।

'দক্ষিণ খোলা—' টেবিলের ওপর এটা-ওটা নাড়তে লাগল সুকান্ত: 'নিতে হলে এখুনি গিয়ে ধরতে হয়।'

এত তাড়া কিসের, এখুনিই ঘর ছাড়ব কেন, সরাসরি এমন সুখের প্রশ্নটা করবে এ অবশ্যি সুকান্ত আশা করে নি। কিন্তু ফ্ল্যাটটা কোথায়, কোন পাড়ায়, একতলা না দোতলা, তা ছাড়া শেলের মধ্যে শক্তিশেল, প্রশ্নের মধ্যে মূল প্রশ্ন, ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত, তা অন্তত তো জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই বিজয়ার। চোখ দুটো এতদূর খুলেছে যে মুখ খুলতে পারছে না।

অথচ কথা বলাতে না পারলে অলি-গলি করে সে-কথায় আসে কী করে। আর বাড়ির কথা বলতে-বলতেই তো বিয়ের কথা বলা সহজ।

'বড় রাস্তার উপরেই ফ্ল্যাটটা—হ্যাঁ, দোতলায়, আর ভাড়া—' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সুকান্ত।

পত্রিকার থেকে চোখ না তুলেই বিজয়া বললে, 'আমরা আর ফ্ল্যাট ভাড়া নেব না ঠিক করেছি।'

'নেবে না?' চক্ষে অন্ধকার দেখল সুকান্ত।

'না।'

'কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধে ছিল।' প্রায় যেন মিনতির সুর বেরুল সুকান্তর: 'ভাড়াও বেশ সস্তা বলতে হবে।'

'হোক গে।' মুখ তুলল বিজয়া, চোখ ফেরাল। গম্ভীরস্বরে বললে, 'ভাড়াটাড়া আর নেব না, গোটা বাড়ি কিনব।'

'বাড়ি কিনবে? খুব ভালো, খুব ভালো।' লাফিয়ে উঠল সুকান্ত: 'আমি আজই দালাল ধরি। ক হাজারের মধ্যে? কম পক্ষে কখানা ঘর চাই? উপরে-নিচে ছ'খানা তো বটেই, ছুটো অন্তত বাথরুম। আর সামনে একটু জমি, একটু ফুলটুল লতাপাতা—কী বলো?'

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।' বিজয়া পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাল: 'দালাল অলরেডি লাগানো হয়েছে।'

'হয়েছে? তবে এত দেরি করছে কেন? একটা ডিল হতে সাত দিন, বড় জোর ছু সপ্তাহ—'

'পছন্দসই বাড়ি চাই তো—'

'তা তো এক শো বার। কিন্তু যাই বলো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব।' সাঁতরে যেন প্রায় পাড় ধরল সুকান্ত: 'বাড়ির বড় ছুই ছেলে—দাদা থাকবে মার কাছে, আমি তোমার কাছে। আমি ছাড়া, আমরা ছাড়া, কে দেখবে তোমাকে? অত বড় ফাঁকা বাড়িতে ছুপুর-সন্ধে একা তোমার কাটবে কী করে?'

একটা সন্দেহের দৃষ্টিও ফেলল না বিজয়া। তোলা বিছানায় হেলান দিয়ে খাটের উপর আধশোয়া ভঙ্গিটা মেরামত করে খাড়া করে তুলল। বললে, 'আমার বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজনের স্থান হবে না।'

'হবে না?' সুকান্তর বুকে যেন কে ছুরি বসাল, অন্তিম নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে বললে, 'যদি বাড়তি ঘর থাকে—'

'তা হলেও না।' রস করে গল্পটা পড়া যাচ্ছে না, মেজাজ তাই সমে নেই বিজয়ার। বললে, 'তাই দালালকে বলে দিয়েছি ছিমছাম বাড়ি না পেলে সোজাসুজি জমি দেখতে।'

'জমি!' সে না জানি আরো কত দূরের পাল্লা। চারদিক ধু-ধু দেখল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, কেনা বাড়িতে বাড়তি কটা ঘর কোন না থাকবে! আর বাড়তি ঘর দেখলেই কাঁথাকম্বল নিয়ে ঢুকে পড়বে আত্মীয়ের দল। আর, দেখছি তো, একবার ঢুকলে কারু বেরুবার নাম নেই। আজকাল লাঠিই ভাঙে, ধনঞ্জয় নড়ে না। তাই ভাবছি,' পাশ ফিরল বিজয়া : 'গোড়াতেই পথ বন্ধ করে দেব।'

'কী করে?' যদি এখনো মরীচিকা দেখা যায় সুকান্ত প্রার্থনার চোখে তাকাল মরুভূমির দিকে।

'জমি যাই পাই, বাড়িটা ছোট করে তুলব। ঠিক দু-জনের আন্দাজ। কোথাও এক ফালি ফালতু রাখব না। যাতে এক বেলার জন্যেও অতিথি না মাথা পাততে পারে!'

কী বিপদের মধ্যেই ফেলল কাকলি! বিয়ে করে ফেলেছি, ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে, এ বলা কত সোজা। এই দেখ আমার বউ, কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াও কিছু দুরূহ ছিল না। কিন্তু, ওগো, আমি বিয়ে করব, আমার বিয়ের জোগাড় করে দাও, নাপিত-পুরুত ডাকো, গ্যাস-ব্যাণ্ড বায়না করো, আমাকে কনের বাড়িতে নিয়ে চলো মিছিল করে, কই আমার টোপর কই, এ একটা আস্ত-সুস্থ পুরুষ হয়ে কেউ বলতে পারে? ভূ-ভারতে বলেছে কেউ কোনোদিন? রব তুলেছে?

কী জেদী মেয়ে! যত জেদ তত যদি থাকত যুক্তি।

কাকলি বলে, তার দিকে যুক্তি আছে বলেই তো তার জেদ। কেন, কিছু অপরাধ করছি যে লুকিয়ে-চুরিয়ে করব? গোপন রাখব? গায়ে চোর-চোর গন্ধ মেখে বেড়াব? সমুদ্রের পারে বসে ঘটি করে জল তুলে মাথায় ঢালব? সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে ভিজিয়ে স্নান করতে পারব না?

কিন্তু কত নিশ্চিন্ত হওয়া যেত যদি সুকান্তর পরামর্শটা শোনা হত। রেজেস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে থাকত, শুধু বর্তমান থাকা-খাওয়ার অসুবিধের জন্যে ফুলশয্যাটি থাকত কিছুকাল পিছিয়ে। এ একটা এমন অসাধ্য কী! কত অদর্শনই লোকে সহ্য করে, এ তো শুধু একটু অস্পর্শন। আগুন পোয়াতে বসে আগুনে হাত না দেওয়া। আর কটা দিনেরই বা এ কৃচ্ছ্র। দেখতে-দেখতে শীত যেতে-না-যেতেই, একটা চাকরি জোটাতে পারবে না? পারবে না ঘরেদোরে প্রশস্ত হতে?

যদি না পারো? যদি চাকরি জুটলেও বলো, এটা অভাব ঠেঙাবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নয়? অর্থাৎ যদি ঝোপ বুঝলেও কোপ না মারো? পাশ কাটাও? প্রতীক্ষার দিন খালি লম্বা করো? আমি শুকিয়ে মরব? এ কাকলির কথা। যাতে কেউই পালাতে না পারি তারই জন্যে যখন বাঁধা পড়ছি, তখন যাতে বাঁধা না পড়তে পারি তার জন্যে পালিয়ে বেড়ানো কেন?

'আর শোনো, অনেস্ট সাধু হওয়া ভালো।' চোখ মুখ গম্ভীর করল কাকলি।

'সাধুরা কি বিয়ে করে?'

'সাধুরাই তো বিয়ে করে। এবং সেটা প্রকাশ করে। বলতে চাচ্ছি সত্যের আশ্রয়ে থাকাই শান্তি। বিয়ে যখন করছি পুরোপুরিই করছি। না, ওসব ভাবিনী ভাবের দেহী হতে পারব না। সিনান করব অথচ কেশ ভিজবে না, নীর ছোঁব না, এ অসম্ভব।'

'তার মানে ঔষধার্থে সুরাপানের মধ্যে তুমি নেই।'

হেসে উঠল দু-জনে।

কিন্তু যাই বলো, ছলনাটুকু থাকলে মন্দ হত না। যাই বলো, মন্দের একটু গন্ধ না থাকলে কোনো ভালোই বুঝি আলো দেয় না।

হয়তো কোনো মেলায় বা সভায়, ভিড়ে-ভাড়ে কোথাও তাদের দেখা হয়েছে। পরস্পর এমন মুখ করে থাকবে যে চক্ষের ঘুণাক্ষরেও কেউ কাউকে চেনে না। দেখতে কুমারী শুনতে মাধুরী, কত যুবক, গাঢ় ও প্রৌঢ়, সপ্রতিভ হয়ে ঘুরবে আশেপাশে, ঝিলিক দেবে। আর প্রতিধ্বনিতে কত রকম ঢেউ তুলবে কাকলি। কোথাও মৃদু কোথাও প্রগল্‌ভ। কোথাও বা কঠিন কোথাও বা ধূর্ত। কোথাও কুন্দলতা কোথাও বা লজ্জাবতী। কিন্তু এক কলার ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু নিচ্ছ কুড়িয়ে, আর আমি যে দূরে, আমি যে ঘুমিয়ে, আমারই সে ষোলকলা, আমারই সে পূর্ণিমার পরমা প্রতিমা। কী গৌরব সে ভাবনায়! কী অপূর্ব সে স্বাদগন্ধ। অন্যের হতে-হতে-না-হয়ে সে আমার। আকাশে অনেক কিছুই ওঠে-ফোটে, কিন্তু আকাশ জানে সে শুধু সূর্যের। কারা সব তপস্যা ভাঙাবার উদ্দেশ্যে ঘুরঘুর করছে, ঐ ক্ষামমধ্যা অপর্ণার আমিই সেই মহাদেব।

দিব্যি ল পড়ত কাকলি, অন্তত দু-তিন বছরের গড়িমসি, আর মক্কেল-মক্কেল চেহারায় সুকান্ত ঘুরতে পারত আশেপাশে।

হঠাৎ সমস্ত ভিড়ের থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে একটু নিরালায়, রাস্তায় বা দোকানে, তার বুকের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াত কাকলি, দ্রুত তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন আছ?'

সুকান্ত বলত, 'ভালো। তুমি?'

হেসে উত্তর দিত কাকলি, 'তোমার মত।' তারপর দ্রুত পায়ে চলে যেত আঁচল উড়িয়ে।

এমন আশ্চর্য সম্ভাষণ কেউ আর কোথাও শুনেছে? যারা সমস্ত বাক্য ও ব্যবহারের আবরণ নিমেষে দূর করে দিতে পারে তাদের এ কী করুণ কার্পণ্য! যার উপর যে কোনো মুহূর্তে খাসদখল জারি করতে পারে তাকে অবলীলায় চলে যেতে দিচ্ছে সুকান্ত, পিছন থেকে একবার ডাকছে না পর্যন্ত। ও খানিকদূরে গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকায় কিনা তা দেখতেও একবিন্দু প্রতীক্ষা করছে না।

সেবার কী হল জানো না বুঝি? স্বপ্ন দেখছে সুকান্ত। সেবার একটা টুরিস্ট পার্টির সঙ্গে জুটে গিয়েছিল তারা। মুখ্যত ছাত্রছাত্রীর দল, বয়স্কেরাও কেউ আছেন অবধায়কের পর্যায়ে। ট্রেনের কামরা থেকে শুরু করে আস্তানায় খাওয়া-শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত আলাদা। প্রবীরেরা এক দিকে, প্রমীলারা আরেক দিকে। শুধু বেড়াতে বেরুবার সময়, মাঠে পড়লেই, একাকার হতে পারত, দাগ-দড়ির বা দলাদলির বালাই থাকত না। তেমনি একবার মাঠে পড়ে সুকান্ত আর কাকলি হঠাৎ মাঠছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা পাহাড়ের টিলার আড়ালে বসেছিল ঘন হয়ে। কী ললাটের গ্রন্থি, ওষ্ঠাধরে একটু অসাবধান হতে চেয়েছিল। চরচক্ষু পাহাড়কেও ভেদ করে। পাখার বাতাস খেতে-খেতে আগুন লেগে গেল ক্যাম্পে, অবধায়কদের কানে উঠল। কী প্রতিকার এবং কিসে, কানের সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতে বসল মাথারা।

শান্তভাবে বাক্স থেকে দলিল বের করল সুকান্ত। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট। কাকলি বনে-ওড়া পক্ষীর কাকলি নয়, পাঁজর-ভাঙা বক্ষের কাকলি।

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

সেবার যা ঘটেছিল, তা আরো মারাত্মক। রাত্রে গঙ্গায় জাহাজ দেখতে গিয়েছিল দু-জনে। জাহাজ দেখে ফিরে স্ট্র্যাণ্ডে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। জল আর জাহাজ দেখলে, দেখে আবার স্থলে ফিরে এলে কার মন না উচাটন হয়! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সার্জেণ্ট এসে ধরবে এ কে পেরেছিল কল্পনা করতে? কোনো কথাই শুনলে না, একেবারে থানায় এনে উপস্থিত করলে। তখন, পকেটেই ছিল, ঘরের প্রত্যক্ষ আলোতে দলিলটা বার করে দিল সুকান্ত।

দেখে পুলিস বোকা বনে গেল।

একটা বাকতাল্লা মারছে এই এতক্ষণ ভেবেছিল পুলিস কিন্তু কুণ্ডলকবচ সঙ্গেই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এ স্বপ্নের অতীত।

তখন ক্ষমা চাইতে পথ পায় না কর্তারা। নিজেদের গাড়িতে যার-যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে সসম্মানে।

এসব স্বপ্ন একটুও দেখতে দিল না কাকলি। একেবারে গোড়াতেই সিঁদুরে-গয়নায় ন্যাতাজোবড়া হয়ে এসে দাঁড়াল। কুমারী-কুমারী থাকল না, থাকতে পেল না, একেবারে প্রথম থেকেই সধবা। অহল্যা মাটিতে দিল না একটু হাওয়া খেতে। মাথায় কোটেশন-চিহ্ন ও পায়ে ফুটনোট দেওয়া থাকলে কি পড়ে সুখ হয়? সিঁদুর আর আলতাতে কি আবিল হবে না সেই শুভ্রতা? যে নিদাগ অবাধ মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে কি আর থাকবে? লালে-নীলে সর্বাঙ্গে আণ্ডারলাইনড্ হলে সে কি অপাঠ্য হয়ে উঠবে না? সুকান্তকে কি কেউ কৌমারহর বলবে? না। বলবে, বিবাহিত ভদ্রলোক।

'ওসব বাহ্য। অন্য কথা বলো।' চপল চোখে হাসতে গিয়ে কাকলি নিষ্পলকে চেয়ে থাকে।

দুই চোখে শ্যামলসুন্দর স্নেহ, প্রশ্নহীন প্রার্থনা।

আমি কি শুধু নৈবেদ্যের থালা? এক স্তূপ বসনভূষণ? শুধু অন্নজলের পাত্র?

না, তুমি এক আনন্দের চিঠি। কোন এক অচেনা পোস্টাপিস থেকে তোমাকে কে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার ঠিকানা লিখে। নির্জনে বসে সেই চিঠিটি পড়ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সেই যে তোমার প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম, খুলেছিলাম, পড়েছিলাম—তেমনি।

না, না, দাগে কি মানে কমে?

তবে এবার বউদিকে ধরতে হয়। সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে যেমন অবতার তেমনি দেওরদের পরিত্রাণের জন্যে বউদি।

ছন্নছাড়ার মত চেহারা করে উপরে উঠছে বন্দনা, সুকান্ত বললে, 'তোমার এত কষ্ট আর দেখতে পারি না।'

এত কষ্টেও হাসল বন্দনা। বললে, 'দেখতে তো পাচ্ছ না কিন্তু ব্যবস্থাটা কী করছ শুনতে পাই?'

'ভাবছি তোমাকে একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দি।'

প্রস্তাবটা একবাক্যে ভূপাতিত করলে বন্দনা। বললে, 'রক্ষে করো। একা জ্বলছি জ্বলছি, আরেকজনকে জ্বলতে দিতে পারব না।'

ব্যস, হয়ে গেল।

কাটা সুতো ধরবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত। বললে, 'কিন্তু জ্বালার প্রতিকারটা তো ভাববে।'

'জ্বালার প্রতিকার ঠাকুরানী নয়, ঠাকুর, একটি বামুন ঠাকুর। যে বাঁচাবে দু বেলার এই আগুনের, উনুনের তাপ থেকে।'

'বা, ঠাকুর আমি আগামী মাস থেকেই রেখে দিচ্ছি।' কথায় অন্য মানে পুরল সুকান্ত : 'কিন্তু মানুষের অন্য তাপও তো ছিল, যাকে বলে, সন্তাপ—'

'ছিল বৈকি। তার জন্যে ঘরে ফ্যান দাও, কিনতে না পারো ভাড়া করো।'

'বা, ফ্যানও দেব বৈকি। আজ-কালই যাচ্ছি আমি দোকানে, খোঁজ নিচ্ছি!' কানের কাছটা চুলকোবার উদ্যোগ করল সুকান্ত : 'কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গিনীর কথাটা—'

'রাখো।' ধমক দিয়ে উঠল বন্দনা : 'যে কুঁজো সে যেন কাত হয়েই শোয়। চিৎ হয়ে শোবার সাধ না করে। ঘর নেই বারান্দা নেই চাকরি নেই বাকরি নেই, তার আবার সঙ্গিনী। গিন্নি ধরে এনে তাকে আর সঙ বানিয়ো না।' হাতের কাছে মুখ ঘোরাল বন্দনা : 'সঙ্গিনী না সঙ-গিন্নি!'

দু হাত যুক্ত করল সুকান্ত। বললে, 'তোমাকে বন্দনা করি বউদি, ক্ষেমা দাও। ও নাম আর উত্থাপন করব না।'

কী অনর্থক ঝামেলার মধ্যেই না ফেলেছে কাকলি। যদি সঙ্গিনী হতে না চেয়ে শুধু রঙ্গিণী হয়ে থাকত বড় জোর দুই বসন্ত, তা হলে বউদির এই ঝংকারটা শুনতে হত না। মেয়েরা সকলেই এত কম বোঝে।

ও ভাবে হলে চলবে না। পাত্রকে স্পষ্ট করতে হবে।

সেণ্টুর শরণ নিল সুকান্ত।

'সেণ্টু, একটা কাজ করবি?'

কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছিল সেণ্টু, গম্ভীর মুখে বললে, 'কাজ-টাজ আমি করতে পারি না।'

শোনো কথা! নক্ষত্র বিরূপ হলে সেণ্টুও বিরুদ্ধে যায়!

'শোন, কাজ করতে হবে না তোকে। শুধু একটা কথা বলবি।'

'আমার সময় কই?' তৎপর হয়ে ছবির সঙ্গে কাঠের টুকরো মেলাতে লাগল সেণ্টু।

'শোন, তোকে সেই একটা পিস্তল দিয়েছিলাম না—'

কাঠের টুকরোগুলো সেণ্টুর হাত থেকে খসে পড়ল অনায়াসে। বললে, 'জানো, আমার আর ক্যাপ নেই।'

'আর পিস্তল নয়। পিস্তল পুরোনো হয়ে গেছে। তোকে এবার একটা মেশিনগান কিনে দেব।'

'দেবে?' উঠে এল সেণ্টু। ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের উপর। চোখ বড় করে বললে, 'সেটা কী জিনিস কাকা?'

'বন্দুকের ঘোড়া টিপবি আর ঘটাঘট ঘটাঘট গুলির আওয়াজ হতে থাকবে। আর সঙ্গে সঙ্গে গুলির ঘরে-ঘরে জ্বলবে আগুনের চোখ—'

'কবে দেবে বলো?' সুকান্তর বুকের মধ্যে মুখ রাখল সেণ্টু।

'তার আগে একটা কথা শুনবি বল?'

'শুনব।' ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ল সেণ্টু: 'কিন্তু কী কাজ বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, কাজ, ঠিক বলেছিস। ভারি লক্ষ্মী ছেলে তুই—'

'কি, পিঠ চুলকে দেব? দাঁড়াব পায়ের উপর?'

'না, ওসব নয়। কথা আর কাজ এক সঙ্গে।' চোখের উপর চোখ রেখে গলা নামাল সুকান্ত, 'তোর ঠাকমার গলা জড়িয়ে ধরবি আর কানে কানে বলবি, জানো, সেই যে একটা মেয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি, যাকে সবাই সাবানের ফিরিউলি ভেবেছিল, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। কী, পারবি বলতে?'

'বিয়ে হলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়, তাই না কাকা? তবে আমার বিয়ে কবে হবে?' কান্নার সুর বের করল সেণ্টু।

'আগে আমারটা হোক। তারপর তোর।' দু হাতের মধ্যে সেণ্টুর দু গাল চেপে ধরল সুকান্ত: 'বল তো কী বলবি ঠাকমাকে?'

আবৃত্তি করিয়ে করিয়ে দোরস্ত করে দিল।

মৃণালিনীর অত সোহাগ করবার সময় নেই। কোল থেকে জোর করে নামিয়ে দিল সেণ্টুকে। সেণ্টুর হাতে আজ মেশিনগান, সহজে সে নিরস্ত হবার পাত্র নয়! তড়বড় তড়বড় করে ছোটাল সে গুলির ঝড়। হ্যাঁ, সাবানের ফিরিউলি, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। কাকার সঙ্গে সাবানের ফিরিউলির।

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল।

ধমকে কি মেশিনগান থামে?

'আমি কী জানি। কাকাই তো বললে বলতে।' ভারিক্কি চাল ঝাড়ল সেণ্টু: 'আর কাকার পরেই আমার বিয়ে। আমার বউ সাবান নয়, ঘটাঘট মেশিনগান। দেখো সব ঘরে কেমন আগুনের চোখ জ্বলে, আগুনের জিভ নড়ে—'

'দেখ তো বউমা, খোকন কী সব বলছে—'

'বারে, আমি বলব কেন, কাকা বলছে।'

সুতোর পর সুতোর জট খুলে রহস্য-উদ্ভেদ করল বন্দনা। সঙ্গিনী মানে যে এই সঙিন অবস্থা তা কে বুঝেছে।

'সেই যে কাকলি বলে একটি মেয়ে এসেছিল, হাইকোর্ট না ছাইকোর্টের জজের মেয়ে, সে ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে বসতে চাচ্ছে। ঠাকুরপোও নিমরাজি। জাত-গোত্রের বাধা নেই। এখন আমাদের মত হলেই নৌকোতে বাদাম দেয়।'

চোখেমুখে ঝলমল করে উঠল মৃণালিনী। বললে, 'বেশ হয়। দেখতে-শুনতে বেশ মেয়ে। তারপরে এম-এ পাশ। চারটিখানি কথা নয়। যেখানে মেয়েরা একখানা খবরের কাগজ উলটে দেখে না, সেখানে এত রাজ্যের পড়া—'

এ কটাক্ষ বন্দনাকে। কিন্তু কাকলির কৃতিত্বকে কে অস্বীকার করবে? বন্দনা তাই চুপ করে রইল।

'তারপরে কত বড় বাপ। কত দেওয়া-থোওয়া করবে না জানি।' মৃণালিনী স্বপ্নের রামধনু দেখল।

মানেটা সেণ্টু বুঝতে পেরেছে আন্দাজে। বললে, 'হ্যাঁ, বিয়ে করলেই অনেক পাওয়া যায় জিনিস। আমার জন্মদিন হয়ে গিয়েছে, এখন আছে শুধু বিয়ের দিন। কাকা বলেছে তার আর বেশি দেরি নেই। কাকারটা চুকে গেলেই আমারটা।'

বৈঠকখানার নিরিবিলিতে ভূপেনবাবুর কাছে কথাটা ভাঙল মৃণালিনী।

লেখার থেকে চোখ তোলবারও প্রয়োজন মনে করল না ভূপেন। বললে, 'বাবুর বেটা গাড়োয়ান, ও বিয়ে করবে কী!'

'কিন্তু সম্বন্ধটা তো ভালো।'

'এই সম্বন্ধ ভালো করতে গিয়েই ঘোরাঘুরিতে ফার্স্ট ক্লাশটা পেল না।'

'তিন নম্বরের জন্য মিস করেছে।'

'যারা পায় না দু-এক নম্বরের জন্যেই মিস করে।'

'কিন্তু রিসার্চ স্কলারশিপ তো পেয়েছে।'

'চাল নেই তার ভাতে ভাত। সামান্য দু শো টাকা আয়। তাও কত দিন?'

'কেন ও কি অক্ষম?' ঝামটা দিল মৃণালিনী: 'ও কি পাকাপোক্ত একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না?'

'সেইটি বন্দোবস্ত করে সম্বন্ধের দিকে গেলেই তো বুদ্ধিমানের কাজ হত।'

'আজকালকার ছেলে অঘোরে-বিঘোরে কত কী কাণ্ড করে বসছে। বেজাত-বেহাত ধরে এনে ঘরে পুরছে। সেইদিক থেকে স্বকু কত ভালো, কত সৎ। অসামাজিক কিছু করে নি, চায় নি করতে। ধর্ম-কর্ম বজায় রাখতে চেয়েছে। আর

ত বড় বাপের মেয়ে। তুমি আর বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না। তুমি হলে কেমন উ আনতে, কেমন বউ এনেছ—' ভিতরের দিকে জ্বলন্ত চাউনি ছুঁড়তেই তক্ষুনি ংহরণ করলে মৃণালিনী। বললে, 'এ সম্বন্ধে খুব ভালো। এ সম্বন্ধই হবে।'

'বেশ তো, হবে।' এতক্ষণে চোখ তুলল ভূপেন: 'কিন্তু সম্বন্ধের প্রস্তাবটা আগে াসুক। মেয়েপক্ষ থেকে প্রস্তাবটা আগে আসবে তো। সামাজিক ব্যাপার, প্রথামত য়ের বাপ তো একটা চিঠি লিখবে অন্তত—'

'তা তো লিখবেই।'

'নয়তো বাড়িতে এসে মৌখিক বলবে। একটা সরকারি প্রস্তাব তো চাই।'

'তা চাই বৈকি।'

এ আবার আরেক ঝামেলা। আরেক কণ্টক।

এ লগ্নে বিয়ে বুঝি আর হল না। ক্ষণ গেলে ক্ষণ আসে, কিন্তু লগ্ন গেলে আর ফরে কই।

১৩

ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে এতক্ষণ ক্যারম খেলছিল কাকলি, এখন খেলা ফেলে রেখে, আবার এসে শুয়েছে তার খাটে। একটা উপন্যাস পড়ছিল, ভাবল সেটা আবার ধরবে কিনা। আলস্যে হাত বাড়াল সেদিকে। তক্ষুনি আবার হাতটা গুটিয়ে নিল। বইটার শেষ কী হবে তা যেন এখুনি, মাঝপথেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষই বোঝা যায় তা হলে আর পথ চলে, জীবনের পৃষ্ঠা উলটিয়ে, সুখ কই?

মরবে তো একদিন। তা কে না জানে। কাল সূর্য উঠবে হয়তো, তারই মত অবধারিত। কিন্তু সে তো একটা অবস্থার শেষ, অস্তিত্বের শেষ কই? আধার ভেঙে গেল বলে কি আধেয়ও উড়ে গেল? প্রিয় চলে গেলে কি প্রেমও চলে যায়? অন্ধ হলে কি আর থাকেই না দৃষ্টিশক্তি?

দেহে, দিনে-রাত্রে প্রতি মুহূর্তে আমরা মরছি। সামর্থ্য ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই, আকাঙ্ক্ষা তো ক্ষয় হচ্ছে না। ভাসতে-ভাসতে চরে এসে উঠছি, কিন্তু পার পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে মৃত্যুর পরেও আছে আরো পরিচ্ছেদ। আরো কামনা করবার সহর্ষ যন্ত্রণা। কিন্তু আরো যে আছে তার প্রমাণ কী! কাল সূর্য যে উঠবে

তারই বা প্রমাণ কী! আর, সুকান্ত যে সুন্দর, বরণীয়, তাই বা আমি প্রমাণ করি কী দিয়ে?

মৃত্যুই যদি শেষ হয়, বেশ, হোক। কিন্তু কিসে মরব, কবে মরব, কোথায় মরব, স্থলে না জলে, স্ববাসে কি প্রবাসে, এ জানতে দিচ্ছে না। জানতে দিচ্ছে না বলেই জাগিয়ে রাখছে, বাঁচিয়ে রাখছে। শুধু ঋণ করে ঘি খাবার কথা বলেই সরে পড়তে চাইছে না। চার্বাক এখন একবার এলে পারে। মনে-মনে হাসল কাকলি। মহাজনী আইন হয়ে যাবার পর এখন আর ঋণ কই? আর কায়ক্লেশে ঋণ যদি বা মেলে ঘি কই বাজারে? ঘৃতই তো মৃত। সে ঘি খেয়ে যাবজ্জীবন সুখে থাকা সুদূরের কথা। শুধু খাওয়া, খেতে পাওয়াই কি সমস্ত? জীবনে নেই কি সে এক শাণিত আস্পৃহা যা কোনোদিন বারিত হয় না, ব্যাহত হয় না? সব খেয়ে-পেয়েও যে সমানে পায় নি বলে মাথা কোটে?

ধরবার নয়, তবু ধরবার জন্যে হাত বাড়ানো। বাঁধবার নয়, তবু বাঁধবার জন্যে বাজার থেকে দড়ি কেনা। জানবার নয়, তবু নিরালায় নগ্ন হৃদয়ের উপরে কান পাতা।

তাই বা মন্দ কী! মরণের ঘাটের দিকে যেতে-যেতে জীবনের গাছতলায় বসে এই একটু চড়ুইভাতি করে নেওয়া।

ভালোবাসা এলেই বুঝি মরণকে মনে পড়ে। ভালোবাসাই বুঝি সেই এক সুখ, একান্ত সুখ, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর অর্থই থাকতে নেই। সেই এক ডাক যা বুঝি মৃত্যুর মতই অন্ধকার।

'কি রে, শুয়ে আছিস কেন?' গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'এমনি।'

'শরীর খারাপ?' সন্দিগ্ধ পায়ে গায়ত্রী কাছে এগুল।

'না।' বাহু দিয়ে চোখ ঢাকল কাকলি।

'দেখ তো কী হল মেয়ের।' নিজের মনে বলছে না কাউকে সম্ভাষণ করছে দেখবার জন্য কাকলি চোখ খুলল না। দিবারাত্র শুনছে, এখনো না হয় আরো কিছু বার হবে কানের পোকা। 'সব তাতেই অরুচি, সব তাতেই অনিচ্ছা। এম-এটা খারাপ হয়েছে বলে এত কী মন খারাপ করা! ফেল তো আর করিস নি।'

'এম-এ এম-এ। থার্ড ক্লাশ না কোন ক্লাশ কে জানতে আসছে! এত যে সব ডক্টর-ফক্টর দেখি তাদের কে কোত্থেকে কী ভাবে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিনেকেটে এনেছে কে খোঁজ নেয়! আর যারা গালভরা উপাধি ঝাড়ে? কাব্য-বিনোদ না ভক্তিবিনোদ!

কে জিজ্ঞেস করে, কে মশাই আপনাকে বিনোদ করল? কিংবা কাকে আপনি বিনোদ করলেন?'

নরনাথ—নরুকাকা এসেছে। বুঝতে পারল কাকলি। তার শোকটা যে কত ভয়াবহ তা বোঝাবার জন্যে আঁচলটা মুখের উপরে টেনে নিল। এ কালোমুখ কি কাউকে দেখানো চলে?

'বেশ তো, আরেক গ্রুপ নিয়ে পরীক্ষা দে।' গায়ত্রী রাগ-রাগ ভাব করে বললে, নইলে বি-টিতে গিয়ে ঢোক। ল পড়বি বলে এত তড়পেছিলি তাতে গিয়ে ভর্তি হ।'

'না, না, ওসব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।' নরনাথও এগিয়ে এল খাটের দিকে: দেখছ না, ওর ভঙ্গিটা দেখছ না, ও এখন আরাম চায়। আলস্য চায়।'

'ও ওরকম মেয়ে নয়।'

'সব মেয়েই ওরকম।' পকেট হাটকে কি একটা বের করে সহসা গায়ত্রীর কাছে নরনাথ বললে, 'এই দেখ কী এনেছি। বলো কেমন দেখতে?'

সানন্দ কৌতুহলে চোখ বড় করল গায়ত্রী: 'কে এ?'

'আমাদের কোম্পানিতে নতুন জয়েন করেছে। স্টার্টিং-এই পাঁচ শো টাকা। তারপর কোম্পানি থেকেই পাঠাবে 'ফরেনে'। বিয়ে করে একেবারে বউ নিয়ে যেতে পারবে।' ফোটোটা চশমার কাছে বাগিয়ে ধরল নরনাথ: 'কেমন স্মার্ট দেখেছ?'

কাকলি কি নড়ে-চড়ে উঠল? পাশ-ফেরানো মুখটা সোজা করল? মুখের আচল কি এল শিথিল হয়ে?

'স্মার্ট তো বটেই।' দূর থেকেই আরেকবার চোখ বুলোল গায়ত্রী; 'স্মার্ট না হলে সাহেব কোম্পানিতে নেবে কেন? বয়েসও তো বেশি নয়।'

'না, না, সাতাশ-আটাশ। সুন্দর মানাবে। খাসা। আইডিয়াল।' প্রায় স্বর্গে গলা তুলল নরনাথ।

'পাশ-টাশ কদ্দুর?' মায়ের প্রাণ তো, জিজ্ঞেস না করে পারল না গায়ত্রী।

'জাতে-গোত্রে যুগ্যি, নিটোল-নিটুট চাকরি, অল্প-বয়স, সুস্থ, সুদর্শন—আবার তি পালকে দরকার কী!' উড়িয়ে দিতে চাইল নরনাথ।

'তবু মেয়ে তো আমার এম-এ।'

'এম-এ দিয়ে তো ধুয়ে খাবে। ঐ কে এম-এ পাশ, জহরলালকে বলেছিল দোকানদার পান্নালালের বড় ভাই, ভাবে-কে বলেছিল বাঙলা ভাবার প্রেজেন্ট টেন্স, আর হর্মোনকে বলেছিল—কী যেন বলেছিল রে?' কাকলিকে লক্ষ্য করল নরনাথ।

এ অবস্থায়, মেয়ের সামনে গুরুজনদের মধ্যে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কথা উঠলে, মেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, হ্যাংলার মত বসে থাকে না। আর যদি কিছু শোনবার লালসাও হয়, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে উল বুনতে-বুনতে আড়ি পাতে। কিন্তু নরুকাকা কী অদ্ভুত ভালো, প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত। কেমন সুন্দর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছে। বাড়িতে একটা বিয়ের কথা উঠুক এই এতদিন চাইছিল কাকলি। তারই জন্যে ভাবে-অভাবে আবহাওয়া তৈরি করে চলেছিল। এরা সব ভাবছিল শূন্যতার কথা। পূর্ণতার খবর নিয়ে এই প্রথম এল নরুকাকা। প্রসঙ্গটা উঠলেই তো তবে আসঙ্গের কথাটা বলা যায়।

খুশিতে ঝলমল করতে-করতে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'হর্মোনকে বলেছিল হার্মোনিয়ামের আবিষ্কর্তা।'

'দেখলে তো বউদি, কেমন বেজে উঠল্ হার্মোনিয়ম। সবগুলো দাঁত দেখা গেল, তাই না?' কাকলির দিকে তাকাল নরনাথ: 'একসঙ্গে সবগুলো রিড!'

অগত্যা গম্ভীর হল কাকলি। উপায় নেই, বইটা তুলে নিতে হল। অপেক্ষা করে রইল।

'জানি বাজবেই, উঠবেই বেজে। যখন যেমন গান—'

'কিন্তু কতদূর পাশ-টাশ করেছে বললে না তো—' গায়ত্রী বাকিটুকুর জন্যে উসখুস করতে লাগল।

'ক পাশ নয়, ধ—পাস।' কাকলি টিপ্পনী না কেটে পারল না।

হাসল নরনাথ। গায়ত্রীকে বললে, 'তোমার শিক্ষার খবরে দরকার কী? তুমি মা, তুমি শুধু বিত্ত দেখবে। ছেলের মাইনে ভালো, উন্নতি যতদূর চোখ যায়। আফিসের গাড়ি পাবে, আর যা আফিসের তাই গৃহের, গৃহ মানেই গৃহিণীর, মানে স্ত্রীর,—আর স্ত্রীর হলেই শাশুড়ির। বাড়ি আছে দর্জিপাড়ায়, আর যা চাকরি বাগিয়েছে, বুঝতেই পারছ, মুরুব্বির জোর কত। আজকাল যার মুরুব্বি তারই মোরব্বা।'

'তবু শিক্ষাদীক্ষার কথাটা জানতে হয়।' গায়ত্রী বললে, 'আর তা জানবার মাপকাঠিই হচ্ছে কী পাশ, কটা—'

বইয়ে মুখ ঢাকল কাকলি। শুধু দুরন্ত দুটি চোখ বাইরে রেখে বললে, 'শুধু এপাশ ওপাশই করেছে বোধ হয়—'

'তুই মেয়ে, তোর ও খোঁজে কী দরকার? তুই শুধু রূপ দেখবি।' পকেট থেকে ফোটোটা ফের বার করল নরনাথ: 'দেখবি? ত্যাখ না। দেখতে কী দোষ!'

কাকলি মুখ ফিরিয়ে নিল। বললে, 'বিদ্যা ছাড়া বুঝি রূপ হয়? আর যে পুরুষ বিয়ের অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে নিজের ফোটো এনক্লোজ করে দেয় সে যে কতখানি শিক্ষিত তা আর বলতে হবে না।'

'মোটেই তা নয়। আবেদনটা আমাদের, আর আমরা এনক্লোজ না করে ডিসক্লোজ করব, তাই উনি দেখতে আসবেন স্বচক্ষে। কে উনি আসছেন তারই পূর্বাভাসের জন্যে এই ছবিটা তার অ্যালবাম থেকে তুলে এনেছি। দিতে কী চায়! অনেক পিড়াপিড়ি ধস্তাধস্তির পর দিল। সিনিয়র অফিসার, আমাকে কি আর চটাতে পারে! বললাম, কে তুমি যাচ্ছ তাদের একটা আইডিয়া তো দিতে হয়। অন্তত, অন দি ফেস অফ ইট, তুমি যে প্রত্যাখ্যেয় নও, বরং তুমি যে নির্বাচনের, নিয়ন্ত্রণের, এ সম্বন্ধে তো তাদের নিঃসংশয় হওয়া চাই। ফাইন্যালের আগে একটা হিট হতে দোষ কী! ঘটনা তার ছায়া ফেলে শোনো নি? এও ঘটনার আগে একটু ছায়া দেখানো। কই, দাদা কই, কেমন আছেন?' অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াল নরনাথ।

মহাভারতের এখনো অনেক পর্বই বাকি, গায়ত্রী পিছু নিল। কাকলি আবার শুল। উপরের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কতক্ষণ পরে ব্যস্ত পায়ে ছুটে এল গায়ত্রী। ঘনিষ্ঠ ষড়যন্ত্রীর স্বরে বললে, শুনছিস, শুধু মুরুব্বির জোরেই চাকরি পায় নি, ছেলের গুণ আছে।'

মায়ের ভর-ভর মুখের দিকে তাকাল কাকলি, কোনো কথা বলল না।

'ছেলে এম-কম, তার উপর আবার ল পাশ। শুধু নুনেই কি হয়, স্বাদের জন্যে মিষ্টিও লাগে।' ডগমগ হয়ে বলল গায়ত্রী, 'ছেলের নিজের লিষ্টি আর মুরুব্বিদের তদবিরের নুন। চৌকস ছেলে। এখন আমাদের অদৃষ্ট। তা ছেলের চোখে নরুঠাকুরপো মধুর ছিটে দিয়ে দিয়েছে—তবু একবার দেখুক, দেখে যাক—'

'আমাকে দেখবে?' আঁতকে উঠল কাকলি।

'আহা, এ কি সেই সরাসরি দেখা, না চুল খুলে পিঠ দেখিয়ে দাঁড়ানো? সে একটা ডিসেণ্ট কিছু হবেই। ঠাকুরপো যখন আছে তখন আর ভাবতে হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য', গায়ত্রী আবার ছুটল ব্যস্ত পায়ে: 'ছেলের নামটাই তো জানা হয় নি। যখন সব ভালো, নামটাই বা না কোন ভালো হবে। আর নামে কী আসে যায়—'

'লেখক তো নয়, যে নাম চলল না বলে বইও চলল না—'

'আর আজকাল তো আফিসে-বাজারে উপাধি ধরে ডাকার রেওয়াজ—চক্রবর্তী না দাশগুপ্ত—' চলে গেল গায়ত্রী।

কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নরনাথ। পিছনে বনবিহারী। ঘর থেকে বাইরে, সিঁড়ির মুখে বারান্দার কাছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে কাকলি। কী আশ্চর্য, লাঠি ছাড়াই বাবা হাঁটতে পাচ্ছেন। তাঁর পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ কম বলে মনে করছেন। যেন কী একটা কাঁটা ফুটে ছিল, খসে গিয়েছে। মুখে আর সেই ভার-ভার অবসাদের ভাব নেই। আর মা তো মুহূর্তে বয়স অনেক কমিয়ে ফেলেছেন হালকা হয়ে গিয়েছেন।

বাঁ হাতের তালুর উপরে ডান হাতের কিল মেরে নরনাথ বললে, 'এ সম্বন্ধ হবেই। আমি জানি আমার কথা ও ফেলতে পারবে না।'

মেয়ের জন্যে অগাধ মমতা, তাই বুঝি নৈরাশ্যকেও হিসেবের মধ্যে রাখছেন বনবিহারী। বললেন, 'এখন পছন্দ হলে হয়!'

'পছন্দ হবে না কী!' নরনাথ চশমার কাঁচ মুছতে লাগল: 'এমন মেয়ে কটা পাবে কলকাতায়? যদি ঝাপসা কিছু দেখে, তা মেয়ের দোষ নয়, ওর চোখের দোষ। তাই ঠিক পাওয়ারের চশমা পরিয়ে নিয়ে আসব।'

'কিন্তু মেয়ে আমার গৃহস্থ টাইপ—' বনবিহারী আবার মমতা ঝরালেন।

'আর উনিই বা কোন গৃহহীন। যেমন সাজাবে তেমনি সাজবে। বউ সাজালে বউ, বিবি সাজালে বিবি। মেয়েদের কি, ছন্দ ধরে থাকলেই পছন্দ হয় শ্বেতপাথরের গ্লাস নয়তো ডিকেণ্টার। যা বলো। চীনেমাটির প্লেট নয় কলাপাতা—'

'আমার ভয় হচ্ছে, বেশি কিছু দাবি-দাওয়া না করে বসে।' গায়ত্রী মুখ শুকনো করল।

'দাবি-দাওয়া না হাতি! দিলে দেবে, না দিলে না দেবে—যা তোমাদের সাধ।'

'না, না, দেব।' বললেন বনবিহারী, 'কাকলির জন্যে আলাদা টাকা রেখেছি।'

'তবে সেই কথাই রইল।' নরনাথ গায়ত্রীকে মনে করিয়ে দিল: 'আগামী শনিবার দুপুর দুটোয় এসে আমি তোমাকে আর কাকলিকে নিয়ে যাব। ইন্দিরাও যাবে।'

'ও পক্ষে?'

'ছেলে আর তার দিদি আর ভগ্নীপতি। মা তো নেইই বলেছি—'

'ছোট বোনটোন?'

'যদ্দুর জানি, তাও নেই।'

আরো হালকা হল গায়ত্রী। শাশুড়ি থাকবে না, অঙ্গনে নেমেই ষোল আনা কর্ত্রী হতে পারবে, আর, ননদ-ফনদের বিয়ের জন্যে টাকা জমাতে হবে না মাস-মাস, কত বড় উপশম সংসারে। চোখে ইঙ্গিত পুরে গায়ত্রী তাকাল নরনাথের দিকে। বললে, 'কাকলিকে ভালো করে বলে যাও।'

বনবিহারী টলতে-টলতে আরো কয়েক পা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ফাংশনটা কী ?'

'দেখি কী দাঁড়ায়! হয় কোনো হোটেলে চা, নয়, গঙ্গার পারে কোথাও পিকনিক। ডিটেলস পরে জানাব। হ্যাঁ, কী জানি কথাটা? খবরের কাগজে বিশেষণ হিসেবে খুব চলে। হ্যাঁ, মনোজ্ঞ—ব্যাপারটা যতদূর মনোজ্ঞ করা যায়—'

ভয়ানক কথা, হাসলেন বনবিহারী। 'আজ মঙ্গলবার—' গুনলেন হয়তো শনিবারের দেরি কত।

নামবার আগে নরনাথ ঢুকল কাকলির ঘরে। নিমন্ত্রণের বিষয়টা বিশদ করতে চাইল।

হার্মোনিয়ামের সমস্তগুলি রিড খুলে বেজে উঠল কাকলি: 'কিন্তু চা যেন হাই-টি হয় নরুকাকা। বেশ হেভি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে—'

এবার কাকলি নীরবে হাসল। প্রায় আধ্যাত্মিক হাসি। এ হাসিই বলে, প্রভু, এদের তুমি ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কী করছে।

গায়ত্রী নরনাথকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। বনবিহারী অসাহায্যে হেঁটে-হেঁটে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

গায়ত্রী এল কাকলির কাছে। কতদিন তার স্বাস্থ্য-লাবণ্যের সরজমিন তদন্ত করে নি ভেবে অনুতাপ হল। মাথাভরা কত সুন্দর চুল ছিল, অযত্নে-আলস্যে উঠে যেতে বসেছে। চুলগুলি দু হাতে তুলে নিয়ে আদরে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল গায়ত্রী।

কাকলি ডাকল: 'মা।'

কি রকম অদ্ভুত লাগল গায়ত্রীর। কী কথা আছে সরলভাবে সরাসরি বলেই ফেল না। সম্বোধন করবার কী দরকার। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

ডেকেছিস তো কথা বলছিস না কেন ?

'মা!'

'কী ?'

গায়ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না এই যা শান্তি। বললে, কাকলি, 'নরুকাকাকে বলে দাও শনিবারের ফাংশন বন্ধ করে দিক।'

'কেন ?' গায়ত্রীর দু-হাতে কাকলির চুল অচল হয়ে রইল।

'ওখানে হবে না।'

'কী হবে না ?'

ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ে লাভ নেই, স্পষ্ট কণ্ঠেই বললে কাকলি, 'বিয়ে।'

গায়ত্রী ভাবল, প্রত্যেক চাকরির উমেদারই যেমন সন্দেহ করে, তার বৈগুণ্য বেশি, সম্ভাবনা কম, তেমনি একটা অলস সন্দেহই কাকলিকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। প্রত্যেক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর যেমন হয়।

'তা না হোক। তার জন্যে দেখাতে বা দেখে আসতে দোষ কী! না হয় তা ঠাকুরপো বুঝবে। আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার!'

'কথাটার মানে তা নয়।'

'তা নয় মানে ?'

'তা নয় মানে,' একটুও ঢোঁক গিলল না কাকলি, 'আমার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে আছে।'

গায়ত্রীর হাত থেকে চুলের গোছা আলগোছে খসে পড়ল। বিবর্ণ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'কী হয়ে আছে ?'

'ঠিক হয়ে আছে। মানে স্থির হয়ে আছে।'

'এখনো হয় নি তো ?' সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে গায়ত্রীর।

'না, হয় নি।'

'তবে জেনে রাখো, আর হবে না।' চুলের গোছা আবার তুলে নিল গায়ত্রী।

সুকান্ত যা বলেছিল তাই করলেই ভালো হত। এত কথা কইতে-সইতে হত না। সোজাসুজি বলে দিলেই হত, হয়ে গিয়েছে, চুকে-বুকে গিয়েছে—এই দেখ সরকারি দলিল। সিলমোহর মারা। এ আর নাকচ হবার নয়। আমি নাবালক নই, আইনের কোনো বাধানিষেধের মধ্যে আমরা পড়ি না। এখন পারো তো ভোজ ডাকো।

'কেন হবে না ?' কাকলি ঘাড় ফেরাল মার দিকে।

'না, হবে না।' গায়ত্রী চুল ধরে টান মারল সজোরে; 'আমরা যাকে মনোনীত করব তাকেই তোমার নিতে হবে।'

'তবে এতদিন কর নি কেন ? দাও নি কেন গছিয়ে ? সাবালক করে, সাবালকের স্বাধীনতা দিয়ে এখন কেন আর তর্জনগর্জন করবে ?'

'এক শো বার করব।' চুলের উপর আবার হামলা চালাল গায়ত্রী : 'কিন্তু জিজ্ঞেস করি কাকে তোর নির্বাচন ?'

'তোমরা তাকে চেনো।'

বুকের ভিতর যেন তীর ছুঁড়ে মারল গায়ত্রীর। 'সেই জুতোকান্ত ভেড়াকান্ত ছেলেটা ?'

'না।'

'সুকান্ত না ?'

'হ্যাঁ, সুকান্ত।'

'ঐ ওয়ার্থলেস অপদার্থ অকর্মণ্য ছেলেটা ? ফাজিল ফক্কড় বাউণ্ডুলে লোফার—' বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছে না গায়ত্রী।

'মৃগাঙ্কশেখর শিবকেও সকলে ঐ কথা বলত। সুকান্ত একটা সুস্থসবল চাকরি পেয়ে গেলেই এসব বিশেষণ বিপরীত মূর্তি ধরবে।'

'এখনো পায় নি তো।' দাঁতে দাঁত লাগলো গায়ত্রীর ; 'শুনেছিলাম কী জেল্লাদার ছেলে—ব্রিলিয়্যাণ্ট—কই, ফার্স্ট ক্লাশ তো জুটল না—'

'না জুটুক। সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে। রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে। পরে ডক্টরেট পাবে। পরে নির্ঘাত প্রোফেসরি। এমন কী অসার জিজ্ঞেস করি !'

'কিন্তু যে পাত্র নরু-ঠাকুরপো এনেছে—'

'সে ফুটো পাত্র, মা।' চুলের উপর অত্যাচার অসহ্য হবে জেনেও কিছুতেই না বলে পারল না কাকলি।

'চুপ কর। কিসে আর কিসে, তামায় আর সিসে। চাঁদের কাছে জোনাকি !' চুল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল গায়ত্রী। শাসনের সুরে বললে, 'তোকে বলে রাখছি, সুকান্ত-ফুকান্ত কিছুতেই চলবে না, না, চলবে না,—চলবে না—'

'তুমি যে প্রায় রাস্তার আওয়াজ তুললে।' কাকলি বললে পিছন থেকে, একটু বা রূঢ়স্বরে ; 'আমারও একটা উলটো আওয়াজ ছিল। আমার দাবি মানতে হবে। দুটো আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। যা চলবে না তাই হবে, যা হবে তাই চলবে না—' কাকলিও উঠে পড়ল।

ভেবেছিল মা বুঝি সটান বাবার কাছে গিয়ে পড়বেন ; না, অন্য দিকে গেলেন।

বোধ হয় এখনো নিচ্ছেন না মোটা করে। কিংবা কে জানে, হয়তো শনিবারের অপেক্ষা করছেন।

শনিবারের সকালে বেরুচ্ছে, নিচে, পথ আটকাল গায়ত্রী।

'সাত সকালে চলেছিস কোথায় ?'

'নরুকাকার বাড়ি।' কাকলি এক পা দাঁড়াল।

'সেখানে কী ?'

'নরুকাকাকে বলতে আজকের দুপুরের ফাংশনটা যেন বাতিল করে দেয়।' বলতে-বলতেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

'কাকলি !' রাস্তায় আর্তনাদ ছুঁড়ে মারল গায়ত্রী, একটা কণিকাও কাকলিকে স্পর্শ করল না।

তখন গায়ত্রী দ্রুত পায়ে চলে এল [illegible] কাছে। বললে ইতিবৃত্ত। নদীতে বান ছিল, এবার তুফান উঠল।

চুপিচুপি পায়ে পরদা সরিয়ে নরনাথের ঘরে এসে ঢুকল কাকলি। বাবার মামাতো ভাই এই নারুকাকা। সাহেবি ফার্মের বড়বাবু। সবচেয়ে বড় পরিচয়, মেজাজ সাহেবি নয়, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মেশেন সমান হয়ে, সকলের ভালো দেখেন, ভালো করে বেড়ান।

'কি রে, ফাংশনের গন্ধে একেবারে ভোরে উঠেছিস, 'ভোরে ছুটেছিস ?' আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল নরনাথ ; দাঁড়া, সকলকে, তোর কাকিমাকে ডাকি—'

'কাউকে ডাকতে হবে না।' স্বর স্তিমিত করল কাকলি : 'তোমার সঙ্গে গোপনে জরুরি কথা আছে আমার।'

'কি রে, কী কথা ?' নরনাথও স্বর নিয়ে এল ধূসরে ; 'বোস। এই কাছের চেয়ারটায় বোস।'

'আজকের দুপুরের ফাংশনটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

'কেন বল তো ? শরীর খারাপ ? নয় তো অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ?'

'না, ওসব কিছু না।'

'তবে ?'

'ওখানে আমার বিয়ে হবে না।' চোখ নামাল কাকলি।

'তবে কোথায় হবে ?'

'আমার জায়গা ঠিক করা আছে।'

'ঠিক করা আছে ! ভালোবাসার জায়গা ?'

'হ্যাঁ—'দুরু-দুরু ভয়ে মৃদু-মৃদু তাকাল কাকলি।

'তবে আর কথা কী! ভালোবাসার কাছে কিসের ফাংশন কিসের স্যাংশন! কিসের কভেনেন্টেড অফিসর! চুক্তি নেই যুক্তি নেই, হিসেবের অঙ্ক কষা নেই। এ তো খুব ভালো কথা রে, সুখের কথা। কজনের ভাগ্যে জোটে এই আশীর্বাদ! ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে বৈকি, এক ফুঁয়ে বাতিল হয়ে যাবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ; 'সকলকে ডাকি। সুখের সংবাদটা চাউর করে দি—'

'না, না, এখন নয়।' ভিতরের দরজা বন্ধ করল কাকলি; 'আগে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও, তারপর—'

কাকলি বাড়ি ফিরল প্রায় দুপুরের গা ঘেঁষে। সে বাড়ি এসেছে শুনতে পেয়েই বনবিহারী তুমুল হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। ডাকো তাকে।

নীরবে কাকলি বনবিহারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুই কোন ছোঁড়াটাকে বিয়ে করতে চাস?'

কাকলি চুপ করে রইল।

'সেই যে ইডিয়েটটা কদম ফুল দেখে নি, তাকে?'

কাকলি কথা কইল না।

'কদম ফুল মানে কে ড্যাম ফুল—সেই নিনকোমপুপটাকে?'

কাকলি চলে গেল আস্তে আস্তে।

...১৪

এতক্ষণ গর্জন গেছে, এখন বর্ষণ শুরু হল। রাগের পরে দুঃখের সুর ধরলেন বনবিহারী।

'ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে—'

কাছেই একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে কাকলি। ভাগ্যিস চেয়ারে হাতল ছিল তাই তার উপরে রাখতে পেরেছে কনুই, আর সেই সূত্রে করতলে রাখতে পেরেছে চিবুক। সমস্ত ভঙ্গিতে আনতে পেরেছে বাধ্যতা ও নম্রতার লাবণ্য।

'বড় ছেলে দেবনাথ, তোমার দাদা, অমানুষ হয়ে গেল।' কতকটা বা আত্মগত হলেন বনবিহারী: 'ছেলেবেলায় কী যে এক অসুখ করল, ব্রেন নষ্ট হয়ে গেল।

কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না। সামান্য ম্যাট্রিকটাই পারলাম না পাশ করাতে। মাস্টারে-ডাক্তারে কম ঢাললাম না, সব ভস্মে ঘি হল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামলেন বনবিহারী। যেমনি বসে ছিল তেমনি বিরলে-বিরসে বসে রইল কাকলি।

'বোকা হয়েছিস তো বোকা হয়ে থাক। মাথাখারাপ তো থাক ঘরের কোণে বন্দী হয়ে। কিন্তু তুই বদ হতে যাস কোন সুবাদে?' আবার হতাশার সুর ধরলেন বনবিহারী; 'মিশল গিয়ে কিনা গুণ্ডার দলে। কত কিছু ধরবে-করবে বলে কত-কত টাকা নিয়েছে আগে-আগে—পরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমার নাম করে নিয়েছে ধার, আমার দুর্নাম করে ভিক্ষে—শেষে, শেষকালে শুরু করল বাক্স ভাঙতে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হল, দেবনাথ যদিও আমার ছেলে, ওকে যেন কেউ ধার না দেয়, ভিক্ষে না দেয়, এমন-কি বাড়িতে ঢুকতে না দেয়—' আবার থামলেন, সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন বনবিহারী। বললেন, 'যখন বিজ্ঞাপনটা দেখলাম কাগজে, মনে হল কালো কালির কাগজে ঐ বিজ্ঞাপনটাই শুধু লাল কালিতে ছাপা হয়েছে। লজ্জার লাল কালি।'

'দাদার সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।' মুখ তুলল কাকলি।

'আগাগোড়াই ভুল। শুধু দেবনাথের সম্পর্কে নয়, তোমার সম্পর্কেও।'

'দাদার কথা উঠেছে, দাদার কথাই হোক। কী হয়েছে ওর বেলায়?' বনবিহারীর মুখের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকলি: 'তুমি বারে-বারে তাকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছ আর মা তাকে বারে-বারে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছে। তুমি ওকে জেলে পাঠাতে চেয়েছ আর মা ওর হয়ে দিয়ে দিয়েছে জরিমানা।'

'তেমনিধারা তোমাকে যখন এ বাড়ির বার করে দেব তখন,' চোখ বুজলেন বনবিহারী: 'কে জানে, তোমার মা-ই হয়তো আবার তোমাকে টেনে নেবেন কোলের মধ্যে।'

'ককখনো না।' পাশের বারান্দায় কাকে চিঠি লিখছিল গায়ত্রী, চোখ আর হাত কাগজে কিন্তু মন আর কান ঘরের মধ্যে, সহসা ঝংকার করে উঠল: 'ককখনো না, যদি সুকান্তকে ও বিয়ে করে। তখন একবার যে ও যাবে চিরদিনের মত যাবে।'

কথাটা গায়ে মাখল না কাকলি। আগের খেই ধরে বললে, 'দাদার সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্থ চিন্তা ছিল না। একটা সৎ সস্নেহ পরিবেশে ওকে কিছু একটা আমরা গড়ে তোলবার সুযোগ দিই নি। কেবল এক দিকে তাড়ন আর পীড়ন, আরেক

দিকে প্রশ্রয় আর ক্ষমা। অমানুষের অ-টা আর ঘোচাতে পারল না। আমরাই দিলাম না ঘোচাতে।'

'তাই তো তোমার উপরে নির্ভর। দেবনাথের পরেই তুমি, তুমিই বাড়ির দ্বিতীয়। তোমাকে তাই উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি বড় হবে, সংসারকে শ্রীমন্ত করবে। ফেরাবে দেবনাথকে। তোমার ছোট ভাইবোনগুলির কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে। আমি জাঁক করে বেড়াব। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকব না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাকাব চারদিকে।'

কষ্টে হাসল কাকলি। চোখ নামিয়ে বললে, 'আমি মেয়ে। আমার কী সাধ্য!'

'তোমার সাধ্য নয়? মেয়ে—মেয়েরা আজকাল কী না করছে! সমুদ্র পেরোচ্ছে, পাহাড় ডিঙোচ্ছে, মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে পায়ে হেঁটে—' বনবিহারী পিঠ খাড়া করলেন।

'সবাই-ই কি সব কিছু করতে পারে? হতে পারে? সকলে কি হতে পারে ঝাঁসির রানী? মীরাবাঈ?'

'তোমার জীবনে কোনো উচ্চাশা ছিল না?'

'উচ্চাশা!' কষ্টে আবার হাসল কাকলি: 'তোমাদেরই বা কী ছিল আমাকে দিয়ে! মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য এম-এ পাশ মেয়ে—কী তার ক্ষমতা! বড় জোর একটা টিচারি নয়তো মুরুব্বির জোর থাকলে কোনো আফিসে ক্লার্ক, বা শুদ্ধ করে বলতে গেলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। একটা সাধারণ মেয়ের পক্ষে এর বেশি আর কি। এর বেশি ভাবতে গেলেই উপন্যাস, আকাশকুসুম।' একটু সাহস নেবার জন্যে বাইরের গাছ, আকাশ, বাড়িঘর, লোকজনের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, 'তা ছাড়া মেয়েরা রয়েছে পরের ঘরে চলে যাবার জন্যে, তাদের ভায়ের ঘরকে শ্রীমন্ত করবার জন্যে নয়।'

'তাই, সেই পরের ঘরেই তোকে আমি পাঠাতুম নিজের হাতে।' বনবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'তুই সাধারণ হয়েই থাকতিস। সব দেশ ঘুরে তোর জন্যে আমি অসাধারণ বর নিয়ে আসতুম। রাজরাজেশ্বর বর। সবাই চোখ উঁচু করে তাকাত। আমার ছাদ ভরে প্যাণ্ডেল উঠত। আলোয় আলোময় হয়ে যেত বাড়িঘর, নবত বসত, থেকে-থেকে সানাই বাজত দিন-রাত। পাড়ার লোকেরা জিজ্ঞেস করত, কী হচ্ছে এ বাড়িতে? রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বর কে? সে কোন এক কৃতকৃত্য— দেখবি চল। চারদিকে পড়ে যাবে ঠেলাঠেলি। দেখতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি স্বাস্থ্যে-শীলে বিত্তে-বিদ্যায় অগ্রগণ্য। যেসব আত্মীয় দেবনাথের বেলায় ঘৃণায় নাক কুঁচকে ছিল এবার তারা হিংসেয় নাক ফোলাবে। তুই

তোর বাপকে তো উপভোগ করতে দিবি নে? এবারও তারা নাক সরু করে চলে যাবে? ছেলে মানুষ হয়েছে, মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করেছি এইটুকু ছাড়া আর আমাদের কী মান আছে? আমার এই মধ্যবিত্ত মানটুকু তুই রাখবি নে? আমার মুখ উজ্জ্বল করবি নে?'

কতক্ষণ কথা কইতে পারল না কাকলি। তার দু চোখ ছলছল করে উঠল। শান্ত সিক্ত স্বরে বললে, 'আমার মুখ উজ্জ্বল হলেই কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা?' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, বারান্দা এড়িয়ে চলল আরেক দিকে।

'শোন—' হাঁকার ছাড়লেন বনবিহারী: 'শুনে যা—'

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাকলি।

'শোন। তবু যদি তুই ঐ অপদার্থ টাকে বিয়ে করিস তবে জানবি আমাদের সঙ্গে তোর আর সম্পর্ক থাকবে না, আর, কোনো দিন পথ ভুলেও আসবি না এ বাড়িতে। কি, মনে থাকবে?'

কাকলিকে দেখা গেল না। শোনা গেল না হাঁ-না কোনো শব্দ।

'ঠাকুরপোকে ডাকো।' ঘরের মধ্যে চলে এল গায়ত্রী।

কলিং বেল আর কোথায়, ইজিচেয়ারের হাতলে হাতের চড় মারলেন বনবিহারী। সংক্ষেপে ব্যেরা বলে আর ডাকতে পারেন না এ যন্ত্রণা চোখে মুখে ফুটে উঠল, সঙ্গে চাকরের নামটা মনে না আনতে পারার যন্ত্রণা। বললেন, 'কি, কী না জানি নাম তোমার চাকরের।'

'ওকে নয়, বিজনকে পাঠাচ্ছি।'

তড়িঘড়ি চলে এল নরনাথ। ব্যাপার কী?

'আমার একতলাটার জন্যে ভাড়াটে দেখ।' মুখের উপর প্রায় ছুঁড়ে মারলেন বনবিহারী।

'সে কি?' নরনাথ থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, একতলাটা ভাড়া দেব। আরো একজন সরেছে। এত জায়গা দিয়ে আমাদের কী হবে? উপরে যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাব আমরা।'

'নিচেটা ভাড়া দেবেন বলে তো এ বাড়ি তৈরি হয় নি—' কী-একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ল নরনাথ, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'তখন হয় নি, এখন হবে। একজন কনট্র্যাকটার ডাকো। তার আগেই ভাড়াটে দরকার। ভাড়াটে এসে গেলেই এ বাড়িতে হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুত হতে পারবে না। তারা নির্ঘাত ঠেকাবে। বলবে, নতুন ঢুকেছি, ছাড়তে পারব না ঘর।'

'কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।' নরনাথ মুখ-চোখ হতাশ করল: 'কে সরল? কেনই বা হাঙ্গামা-হুজ্জুতের ভয়?'

'কাকলির কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। বিয়ে করতে চায়। সে তো খুব ভালো কথা।' সুস্থ হয়ে এতক্ষণে বসল নরনাথ।

'ভালো কথা! কাকে চায় তা শুনেছ?'

'শুনিছি।'

'ও কি একটা পাত্র?'

হাসল নরনাথ। বললে, 'এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইররেলেভেন্ট, অবান্তর। হয়তো বা আমাদের একতিয়ার, জুরিসডিকশানই নেই।'

'নেই? না, আছে।' ইজিচেয়ারের হাতলটা মুঠি করে ধরলেন বনবিহারী: 'গায়ের জোরের কাছে আবার আইন কী! তুমি যে করে পারো এ বিয়ে ঠেকাও। কিছুতেই হতে দিও না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল নরনাথ। পরে বললে, 'কেন, হতে দেব না কেন? হতে দিলে দোষ কী। কোথায় বাধছে? কোথাও না। না ধর্মে, না সমাজে, না কোনো আচারে-বিচারে।'

'সেন্টিমেন্টে।' মুঠো করা ডান হাতটা কাঁপতে লাগল বনবিহারীর।

'আইনের কাছে সেন্টিমেন্টের দাম কী!' পায়ের উপর পা তুলে ভঙ্গিটা শিথিল করল নরনাথ: 'আপনি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সাবালক হবার সুযোগ দিয়েছেন, আর আইন তাকে তার গণ্ডির মধ্যে যাকে খুশি বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। যা বেআইনী নয় তাকে আপনি বাধা দেবেন কী করে? আর বাধা দেওয়ার মধ্যে নীতিই বা কোথায়? ওরা ইচ্ছে করলে আইনমত রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করে এসে বলতে পারত, অনুপায়, এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করে এসেছি, তখন কী করতে পারতেন? আর এখনও যত বাধাই দিই ওদের রেজেষ্ট্রি আটকাতে পারি এমন আমাদের কেস নেই। সুতরাং যার বোঝা সে বুঝবে। যার নির্বাচন সে জানবে কেমন মন্ত্রী এনে বসিয়েছে গদিতে। আমাদের কথা এখানে বিকোবে না। পাঠার কথায় ঝোল রান্না হয় না কোনো দিন।'

'কিন্তু পাত্র—লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, পাত্র কে, বলতে পারবে, একটা কে ড্যাম ফুল, সমবয়সী এক কলেজের ছাত্র, বেকার—ছি, ছি, ছি।'

'বা, পাত্র এমন খাস্তা কী! নিদেন একটা লেকচারার তো হবেই—'

'তা হওয়ার পর করলেই হত। এত হস্তদস্ত হবার কী হয়েছিল ?'

এখানে নরনাথের একটা ব্রেন-ওয়েভ—মস্তিষ্ক-তরঙ্গ—এল। সব সংক্ষেপ করে দেওয়া দরকার। অনিবার্য করে দেওয়া দরকার। এত কলহ-কোলাহলের দরকার কী! বিয়েই তো করতে চাইছে—আর কিছু তো নয়। সবচেয়ে যা সভ্য, সবচেয়ে যা শাস্ত্রীয়। আর বিয়েই তো সব রাখে, সব ঢাকে, সব সংশোধন করে; তবে আর কী ভাবনা!

'হ্যাঁ, এই তাড়াতাড়িটাই জানি কি রকম!' গাল চুলকোল নরনাথ: 'মনে হচ্ছে কোথায় ডিফিকালটি আছে—'

'ডিফিকালটি আছে!' ইঙ্গিতটা যেন আনায়াসেই বুঝতে পারলেন বনবিহারী। খাড়া পিঠ এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারে। শাদা শূন্য দৃষ্টি মেলে বললেন, 'তাই!'

'হ্যাঁ, আর গত্যন্তর নেই।' তোলা পা মেঝের উপর নামিয়ে আনল নরনাথ: 'তা, পাঁঠা যখন রান্নাই হচ্ছে তখন তাকে ঘাড়ের দিকেই কাটুক বা লেজের দিকেই কাটুক কিছু এসে যায় না।' কোঁচায় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ: 'এখন শুভস্য—'

'শুভস্য?'

'যদি বলতে চান, অশুভ, তবে অশুভস্য।' নরনাথ হাসল: 'কিন্তু শীঘ্রত্ব সর্বাবস্থায়। তাই অশুভস্য শীঘ্রং।'

'তুমি যা করে পারো, নমো-নমো করে উদ্ধার করে দাও।' এক পাশে দেয়ালের দিকে ঘাড় কাত করলেন বনবিহারী; 'বিয়ে যদি হয়, আর এখন না হয়ে উপায় কি, তোমার ওখানেই বন্দোবস্ত করো। টিমটিম করে, নেহাত যেটুকু না হলে নয়, ততটুকুতে দায় সারো। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।'

'তার জন্যে ভাববেন না। কিন্তু আপনার প্রথম মেয়ে, আপনার প্রথম কাজ—আপনার নিজের বাড়িতে হলেই তো ভালো ছিল। লোকে ভিতরের কথা আর কী জানবে, তারা দেখবে আপনাকে—'

'না, আমার বাড়িতে নয়, আমার সামনেতে নয়। আমার সামনেতে হলে আমার প্রেসার বাড়বে, আমি টলে পড়ে যাব মাটিতে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে ভাড়াটে বসবে, ছাদ এজমালি হবে, তারা বরদাস্ত করবে না এসব হট্টগোল। না, আমিও করব না।' নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় থরথর করতে লাগলেন বনবিহারী: 'এ বিয়ে, এমন বিয়ে আমি মানি না। কাকলিকে বলে দিয়েছি এ বাড়িতে তার স্থান নেই। তুমিও আরেকবার তাকে মনে করিয়ে দিও।' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় ভেঙে পড়ে চেয়ারে ছড়িয়ে পড়লেন বনবিহারী।

'বউদিকে ডেকে দিচ্ছি, আপনি বসুন।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল নরনাথ, আর কাকলির ছোট বোন পত্রালির কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ওদিককার ছোট ঘরে ধরলে কাকলিকে।

'এ কি, বেরুচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল নরনাথ।

'হ্যাঁ, এই একটু—' ম্লান রেখায় হাসল কাকলি।

'বুঝেছি—' জ্ঞানীর মত দুই চোখে জ্যোতি আনল নরনাথ। বললে, 'এদিকে অনেকটা বাগিয়েছি।'

'সত্যি?' এ যেন প্রায় আশাতীতকে শুনছে কাকলি।

'হ্যাঁ, বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে আর কিছু খরচও উনি দেবেন।'

'তা হলে আলো জ্বলবে, সানাই বাজবে?' ফ্রক পরা ছোট্ট খুকির মত ঝলমল করে উঠল কাকলি: 'সেজেগুজে আসবে সব লোকজন?'

'দেখি কতদূর কী করতে পারি।' যেন অনেক দূরই করতে পারে এমনি ভাব করল নরনাথ।

'এখন তোমাকে আরেক কাজ করতে হয়।' কাকলি দরজার কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'ও পক্ষে গিয়ে যথাবিধি কথাটা পাড়তে হয়। মানে কথাটা ক্লোজ করতে হয়।'

'হ্যাঁ, আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি।' নরনাথ তার ভুরুতে কুঞ্চনের খেলা খেলল। বললে, 'আর, সব সংক্ষেপ করে দিয়ে আসছি। এমন এক প্যাঁচ কষব যে বাছাধনরা ট্যাফো করতে পারবেন না, সুড়সুড় করে বিয়ের আসরে এসে হাজির হবেন।'

কিছুই বুঝল না কাকলি, তবু সরল প্রাণে হাসল। বাধাবিপদ সব বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। পথঘাট সুগম, এই যেন তার শীতের দিনে আরামের রোদ।

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল বনবিহারীর কাছে। স্নানের তোড়জোড় করতে হয় এখন।

বনবিহারী বললেন, 'নরু কাকলি সম্বন্ধে কী একটা ইঙ্গিত করে গেল—'

সর্বশরীরে শিউরে উঠল গায়ত্রী: 'কী ইঙ্গিত?'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করলেন বনবিহারী।

'ছি ছি ছি', শতকণ্ঠে না-না-না করে উঠল গায়ত্রী: 'ও কী কথা! আমি মা, আমার লক্ষ্য নেই?'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' বনবিহারী আশ্বস্ত হলেন: 'কাকলি কি এত বোকা এত হালকা এত লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে? তবে নরু ওরকম করে বললে কেন?'

'ও বললেই তো হবে না।' বিরক্ত-আরক্ত মুখ গায়ত্রীর : 'যে বেশি কথা বলে সে অমনি বানিয়ে-বাড়িয়েই বলে। ও ভেবেছে অমনি করে বললেই হয়তো তোমাকে সহজেই রাজি করাতে পারবে। কিন্তু ও জানে না আমি আছি।'

'তুমি আছ।' মাথার চুলে গায়ত্রীর তৈলাক্ত হাতটা নড়াচাড়া করছিল, সেটা সবল স্নেহে আঁকড়ে ধরলেন বনবিহারী। চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কার দলে ?'

'তোমার।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুলে আবার বিলি কাটতে লাগল গায়ত্রী। বললে, 'কাকলি ভেবেছে ওর জেদই জয়ী হবে। কিন্তু ও জানে না ওর ঐ জেদ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার কাছ থেকেই পাওয়া।'

বনবিহারী বললেন, 'কিন্তু তুমি বলতে পারো ও ঐ দুঃস্থ ছন্নছাড়া ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্য খেপেছে কেন ?'

'স্পর্ধা। স্রেফ অহংকার। ও বলতে চায় প্রেমের মূল্য সম্পদে নয় কৃতিত্বে নয়, প্রেমের মূল্য প্রেমে। আর যে দুঃস্থ তাকে যদি ভালোবাসাই যায়, তবে তার সঙ্গে ঘর করতে দুঃখ নেই। যদি অবস্থা সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে সেটা সচ্ছলতাকেই ভালোবাসা হল, ব্যক্তিটাকে নয়।'

'চাইল্ডিস !'

'ও বলে, যদি ধরো, অপেক্ষা করা সত্ত্বেও লোকটার অবস্থা ফিরল না, তা হলে কি আমি ফিরে যাব, আমার ভালোবাসাও ফিরে যাবে ? গরিব কত কিছু থেকেই তো বঞ্চিত, শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হবে ? গরিব্ বলে অকৃতী বলে কেউ তার সঙ্গে ঘর করবে না ?'

দুঃস্থ অপরিচিতের জন্যে তার এত দয়া, দুঃস্থ বাপের প্রতি তার দয়া হবে না ? মেয়ের জন্যে মন আবার হঠাৎ নরম হয়ে গেল বনবিহারীর। তিনি গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন কাকলিকে।

পত্রালি এসে বললে, 'দিদি বাড়ি নেই।'

'বেরিয়ে গেছে ?' স্ত্রীর দিকে নালিশের চোখে তাকালেন বনবিহারী : 'যখন তখন বেরিয়ে গেলেই হল ? এটা বেরুবার সময় ? কাউকে বলে যাবে না ?'

'তুমিই তো বলেছ এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।' বললে গায়ত্রী।

'সে তো ঐখানে বিয়ে হলে। তা বিয়ে তো এখনো হয় নি। যখন সত্যি কোনো ডিফিকালটি নেই, বাধ্যবাধকতা নেই, তখন বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে।' পত্রালির উপর মুখিয়ে উঠলেন বনবিহারী : 'কোথায় গেছে এ অসময় ?

'তা আমি কী জানি।' পালিয়ে গেল পত্রালি।

গেছে আর কোথায়। গেছে মার্কেটে, গোল চত্বরে।

একটা ওজন নেবার যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে সুকান্ত। হাসতে-হাসতে পাশ থেকে কাকলি এসে হাজির। বললে, 'হঠাৎ ওজন নেবার দরকার হল কেন?'

'দেখি বাড়ল কিনা।'

'বাড়বে? তুমি তাই আশা করো?' কাকলি অবাক হয়ে বললে।

'ফাঁসিকাঠে লটকাবার আগে কারু কারু নাকি বেড়েছিল শুনেছি।' ফোকরে পানি দিল সুকান্ত।

'ফাঁসিকাঠ!' চোখ কপালস্থ করল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কি। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানেই ফাঁসিকাঠে লটকানো।' কার্ডটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুলোল সুকান্ত। বললে, 'হ্যাঁ, যা, বলেছি, ঠিক বেড়েছে। বাড়তেই হবে। এবার তুমি ওঠো।'

কুণ্ঠিত হয়ে সরে গেল কাকলি। বললে, 'আমার দরকার নেই।'

'দরকার আবার কার আছে!' নেমে এল সুকান্ত।

'সেই একবার একপক্ষের দরকার হয়েছিল।' হাসিমুখে বলতে লাগল কাকলি সেও এই বিয়ের ব্যাপারেই। মেয়ে দেখতে রোগা, বলছিল বরপক্ষ। রোগা বলছেন কেন, বলুন কৃশ, এ সাফাই কন্যাপক্ষের। বেশ, ওজন করাবেন চলুন। চলুন, ঠিক স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েটের মেয়ে আমাদের। মেয়েকে নিয়ে আসা হল মার্কেটে, এইখানে। ব্লাউজের মধ্যে গুচ্ছের টিল নিয়ে মেয়ে দাঁড়াল ওজন নিতে। একেবারে স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েট, কাঁটায়-কাঁটায়।'

'পুরোনো গল্প। কিন্তু তোমার ভয় কী! তোমাকে টিল নিতেও হবে না টিপ দিতেও হবে না। যেমনটি আছ তেমনি—'

'তোমার ওজনেই আমার ওজন। তোমার ঐ কার্ডে আমাদের দু-জনের ওজনই একত্র যোগ করে লেখা হয়েছে।' কাকলি চলতে শুরু করল: 'এসব কথা থাক। কাজের কথা—'

'হ্যাঁ, কাজের কথা। তারই জন্যে তো ডেকেছি তোমাকে। কই, তোমাদের বাড়ি থেকে সরকারি প্রস্তাব এল কই?' সুকান্তও পা মেলাল।

'নরুকাকা আজকালের মধ্যেই যাবেন।'

'নরুকাকা?'

'হ্যাঁ, বাবা খড়্গহস্তের চেয়েও বেশি, পিস্তলহস্ত। নরুকাকার বাড়িতেই হবে।'

'কী হবে ?'

'আহা, যেন বলতে পারি না ! বিয়ে হবে।'

'শুধু ঐটুকু ?'

'না। মুখচন্দ্রিকা। মালাবদল। সম্প্রদান। মন্ত্র। যজ্ঞ। সপ্তপদী। অগ্নি-সাক্ষী—শিলাসাক্ষী। শঙ্খধ্বনি, হুলুরব। আমি কি সব জানি ?' হেসে ফেলল কাকলি।

'জানো না ? আমি সব জানি।'

'কী জানো ?'

'তুমি ভয়ানক সেকেলে। আর তারই জন্যে যত গোলমাল।'

'শোনো, সবচেয়ে গোলমালের যে ভয় করছি তা হচ্ছে প্রস্তাবের পর তোমাদের বাড়ি কোনো দাবি করে না বসে।'

'তা করতেই তো পারে।' সুকান্ত বললে নিশ্চিন্ত স্বরে, 'নগদ টাকা না হোক, ফার্নিচার, বাসনকোসন, রেডিও, সেলায়ের কল, সাইকেল—'

'থামো।'

'অন্তত সোনার বোতাম না হোক, একটা ঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন তো দেবে আমাকে।'

'কাঁচকলা দেবে।'

'কিন্তু মার নমস্কারী শাড়ি খান তিরিশ—এ ঠেকানো অসম্ভব।' মুখ গম্ভীর করল সুকান্ত।

'এ তুমি, মার ছেলে, তুমিই ম্যানেজ কোরো।'

'দেখি কদ্দূর কী পারি। তুমি তোমার নরুকাকাকে শুধু নেমন্তন্নপত্রটা ছাপতে বোলো। তারপর একটা শুধু শামিয়ানা খাটানো আর একটু রোশনাই। কি গো, সানাই একটু বাজবে, কর়তব করবে ?'

'করবে। কিন্তু তার আগে তোমার কেরামতিটাও দেখিও। তোমাদের দিকের সব শান্ত স্তব্ধ সংযত রাখার কেরামতি।' করুণ চোখে তাকাল কাকলি।

কিন্তু আসল কেরামতি নরনাথের। মূলকথা বলার পর যখন অবান্তর কথা প্রায় ওঠে-ওঠে, তখন নরনাথ ভূপেনবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'এ বিয়ে না হতে দিয়ে আর উপায় নেই।'

ভূপেন হাঁ হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, ডিফিকালটি হয়েছে। এখন দেয়ার ইজ নো গেটিং এওয়ে। একটা কুমারী

মেয়ের মান। আর আপনার ছেলে,' নরনাথ সাহস করে চাইল সুকান্তের দিকে : 'পার্ফেক্ট জেণ্টলম্যান—খাঁটি ভদ্রছেলে। হি হ্যাজ অউনড ইট আপ।'

কেউ একটা শব্দ করতে পারল না। হাসবে না কাঁদবে বুঝতে না পেরে সুকান্ত মাথা হেঁট করে চলে গেল ঘর থেকে।

'তবেই বুঝতে পারছেন, যেমন তেমন করে নমো নমো করে এ বিয়ে এক্ষুনি সেরে ফেলা দরকার।' উঠে দাঁড়াল নরনাথ : 'এ বিয়েতে দাবি-দাওয়াই কি, লোক-লৌকিকতাই বা কি।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোনো রকমে মান রাখা, প্রাণ রাখা।' যথারীতি আবার লেখালেখির মধ্যে ডুবে গেল ভূপেন : 'তাড়াতাড়ি দিন ঠিক করে শুভকাজটা সম্পন্ন করান।'

'আমরা আছি।' হেমেন বললে।

এবার নরনাথকে গায়ত্রী ডেকে পাঠাল।

তুমি আমার মেয়ের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাচ্ছ কেন? কোথায় রাগবে, কেঁদে ফেলল গায়ত্রী।

দু হাত জোড় করে নমস্কার করল নরনাথ। বললে, 'এ কলঙ্ক নয় বউদি, এ কৌশল। এ কৌশলের উদ্দেশ্য বিয়েটাকে অনিবার্য করা, নির্বিঘ্ন করা, নিরুপদ্রব করা। এ কৌশলে কাকলির লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। যে কৌশলে ঈপ্সিত ধন পাওয়া যায় তাকে কি কলঙ্ক বলে? তাকে অলংকার বলে।'

১৫

'কাগজ-কলম নিয়ে এসো।' বনবিহারী গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন কাকলিকে

কাকলি থমকে গেল। কিছু লিখে দিতে হবে নিশ্চয়ই। কী না জানি লিখে দিতে হবে। কোনো দাসখত? ইস্তফানামা? কোনো সম্মতিপত্র?

কী না জানি কী। ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল কাকলির।

যদি লিখে দিতে হয় এ-বাড়ির সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, লিখে দেবে স্বচ্ছন্দে। মনে মনে হাসল কাকলি। যা স্বয়ংসিদ্ধ তাকে শুধু কলমের আঁচড়ে নাকচ করা যায়? কলমের কালিতে কালো করা যায় গায়ের রক্ত, বংশের রক্ত?

যাই না, কাগজ-কলম নিয়ে বসি না গিয়ে। দেখি না কী লেখান। তেমন কিছু হয়, লিখব না। সব ছুঁড়ে ফেলে সোজা ছুট দেব। ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারো না।

কলমে কালি ভরে নিল। একটা একসারসাইজ খাতার পেটের কাগজটা ছিঁড়ে নিল একটানে। ধীর পায়ে কাছে এসে বসল মেঝের উপর।

ঝিমুচ্ছেন বনবিহারী। তাঁর দিকে চেয়ে কাকলির মন মায়ায় ভরে গেল ভালো ঘুমুতে পাচ্ছেন না, মুখের রুচি চলে গিয়ে হজমে গোলমাল শুরু হয়েছে, গায়ে হাত দিলেই বোধ হয় জ্বর-জ্বর বলে মনে হবে। যেন শেষ ট্রেন মিস করে শূন্য প্ল্যাটফর্মে একা এক যাত্রী নৈরাশ্যকে শিয়র করে শুয়ে আছে ক্লান্তির ধূলিতে।

রিটায়ার করে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে, আর কোথাও ঢুকতে পেলেন না। কত লোক গাছের শাখা থেকে নেমে গেলেও কেমন ঝুরি ধরে এখনো ঝুলছে—বাবা সামান্য একটা এক্সটেনশানও পেলেন না। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই বাড়িখানা শুধু তুলেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাড়ি এর চেয়েও বড় ছিল। দাদার তো ঐ অবস্থা, আর আমি তো পথে ভেসেছি। ছোট ভাইবোনগুলি কত দিনে কী হবে, কেমন চেহারা নেবে, কে জানে। না, বাবা যা বলেন, তাই করব। যা চান, তাই লিখে দেব স্বচ্ছন্দে। যদি তাঁর একটু শান্তি হয়।

'কিছু লিখতে হবে?' উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল কাকলি।

'হ্যাঁ। এনেছ কাগজ-কলম?' বনবিহারী ইজিচেয়ারে নড়ে-চড়ে উঠলেন: 'হ্যাঁ, লেখো।' ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলেন জামার পকেট: 'এই যে, পেয়েছি।' একটা কাগজের টুকরো বের করে তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ চোখে: 'হ্যাঁ, এই—এই নম্বরগুলো—'

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কাকলি।

'কই, লিখছ না যে?' ধমক দিয়ে উঠলেন বনবিহারী: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একের পর এক দশটা নম্বর, দশ নম্বরের দশখানা। তারিখ আলাদা। আফিসও বোধ হয় সমান নয়। কী, লিখছ? হাত গুটিয়ে বসে আছ কী করতে?'

'বিষয়টা কী, তা তো বলবে।' কাকলি তাকাল করুণ চোখে।

'লেখো, আই ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার—'

এটুকুন লিখতে আপত্তি কি, কাকলি লিখল। কিন্তু সত্যি সত্যি ঘোষণাটা কী তা ঠিক-ঠিক না জানা পর্যন্ত আর কলম চালানো অনুচিত। অসম্ভব।

'কী লিখলি?' আবার দাবড়ি মারলেন বনবিহারী।

'লিখেছি। কিন্তু লেখবার আগে ব্যাপারটা মোটামুটি আমাকে একটু বুঝতে দেবে না ?' দু চোখে বিষণ্ন কুণ্ঠা নিয়ে তাকাল কাকলি।

'এর আর বোঝাবুঝি কী!' বনবিহারী উঠি-উঠি করেও শুয়েই থাকলেন চেয়ারে: 'তোমার জন্যে, তোমার বিয়ের বাবদ, দশ হাজার টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছিলাম। সেই টাকাটা তুমি আবার আমাকে লিখে দেবে। বলবে, ঐ ঐ নম্বর সার্টিফিকেটে তোমার কোনো অধিকার নেই; যেহেতু ওগুলো আমার টাকায় কেনা হয়েছিল, সেহেতু ওগুলো আমার।'

'এই কথা ? তা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।' কাকলি লেখার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। বললে, 'বলো, কিরকম হবে বয়ানটা—'

বনবিহারীর মুখে কথা নেই। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন নাকি ?

সোজা হয়ে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'শুধু একটা ডিক্লেরেশান করলেই হবে, না, একটা ক্লিয়ার এসাইনমেণ্ট দরকার ? ঠিক কী ফর্মটা হওয়া উচিত, আমি বলি কি, নরুকাকাকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়া ভালো।'

বনবিহারী তবু নিঃশব্দ।

'লেখালেখিতেই বা কাজ কি।' কাকলি মুক্তকণ্ঠে বললে, 'সোজাসুজি সার্টিফিকেটগুলো ক্যাশ করে টাকাটা তোমার অ্যাকাউণ্টে জমা দিয়ে দিলেই তো চুকে যায়—'

'ক্যাশ করব মানে ?' চমকে উঠলেন বনবিহারী: 'কে ক্যাশ করবে ? ক্যাশ করবে তো তুমি—তোমার নামে যখন সার্টিফিকেট। তার মানে, সার্টিফিকেটগুলো ভাঙিয়ে টাকাটা দিব্যি হাতিয়ে তুমি ভেগে পড়ো, চম্পট দাও, তাই না ?'

কাকলির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধরিত্রী ছি-ছি করে উঠল।

'চলবে না ওসব মতলব।' বনবিহারী বসলেন খাড়া হয়ে: 'যা বলছি তাই লেখো। আইনের চোখে কী দাঁড়ায় না দাঁড়ায় তার জন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে একটা স্বত্বের দলিল লিখে দাও—একটা মুক্তিপত্র। লিখে দাও, ঐ টাকা তুমি ছোঁবে না, ঐ টাকায় তোমার স্বত্ব নেই, দাবি নেই এক তন্তু।'

যা বললেন, মনের বিস্তীর্ণ আনন্দে তাই লিখে দিল কাকলি।

নরনাথ এলে বললে, 'যাই বলুন, এ আপনার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

'বাড়াবাড়ি ?' চেয়ারের হাতল চেপে ধরলেন বনবিহারী: 'কোন আইনে ? খুব তো তুমি আইন দেখাও, এবার বলো কোন অ্যাক্ট, কোন সেকশান, কোন প্রোভাইসো ?'

শীর্ণ রেখায় হাসল নরনাথ। বললে, 'যা একবার দিয়েছেন, তা আবার ফেরত নেবেন কেন?'

'এবার আইন ছেড়ে যে ধর্মকথা ধরলে। দিয়েছি মানে?' বনবিহারী ভঙ্গি আরো উদ্ধত করলেন: 'সার্টিফিকেটগুলো সমস্ত আমার কাস্টডিতে। এ দান হল? এ শুধু একটা বেনামী কাণ্ড। এর বেশি নয় কিছুতেই। আইনমত টাকা যখন আমার, তখন আমার খুশিমত ব্যয় করবার অধিকারও আমার।'

'কিন্তু এত কী অপরাধ কাকলির?'

'অপরাধ নয়? এক শো বার অপরাধ। ও ডিসিপ্লিন ভেঙেছে।'

'সব জিনিসেরই সীমা আছে। তেমনি, যাকে ডিসিপ্লিন বলছেন, হয়তো তারও।'

'না, নেই।' হুঙ্কার ছাড়লেন বনবিহারী: 'আমার দেওয়া টাকা শেষ পর্যন্ত ঐ লোফারটার হাতে গিয়ে পড়বে, তা দিয়ে ওর সংসারের সুসার হবে— এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।'

'তবেই দেখুন কেমন ভালো বর বেছেছে কাকলি।' শব্দ করে হেসে উঠল নরনাথ: 'কেমন আপনার দশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল অনায়াসে।'

'আমার কি টাকা খরচ করতে অসাধ, নরনাথ?' বনবিহারী চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'আমার কত দিনের স্বপ্ন, একটি অখণ্ড মুক্তোর মালার মত করে মাকে সাজাই। কিন্তু', দু হাতে চোখ ঢাকলেন বনবিহারী: 'কিন্তু সে মালা আজ কার গলায় গিয়ে উঠছে?'

'তুমি কী ছেলেমানুষ, মালা নিয়ে এসেছো কেন?' আধ-আধ সোহাগের ভঙ্গিতে বললে কাকলি।

'তোমার এই ছেলেমানুষ ভাবটি দেখব বলে।' বললে সুকান্ত।

'কী হবে আমার মুক্তোর মালায়, আমার ফুলের মালাই ভালো।'

'তোমার মুখে এই নতুন কথাটি শুনব বলে।'

সন্ধের দিকে ভিক্টোরিয়া স্কোয়ারে দেখা হয়েছে দু-জনের। এদিকটায় তত ভিড় নেই। উঁকিঝুঁকি নেই। শান্তিতে একটা কোণ পেয়েছে নিরিবিলি।

'জানো আমরা এখনো জানি না আমাদের মধ্যে কত রহস্য, কত চন্দ্র-সূর্য, কত ওঠা আর অস্ত যাওয়া।' বলতে লাগল সুকান্ত, 'কত ভাব রস দীপ্তি কান্তি, কত অন্ধকার। কিছুই জানি না। জানতেও পারি না যদি প্রেম না জাগে। একমাত্র প্রেমই নানা কোণে আলো ফেলে আমাদের মধ্যে নতুনকে দেখতে চায়। বিচিত্রকে

দেখতে চায়। আশা করে আমরাও চিরন্তন নতুন থাকি। তাই তো প্রবৃত্তি পুরানী হলেও বাসনার কারুকলার আর শেষ নেই। যদি আর নতুনকে খুঁজে না পায়, তা হলেই প্রেম বিষণ্ণ। তাই, দেখছ না,' ফুলের মালাটা সুকান্ত নিজেই কাকলির খোঁপায় পরিয়ে দিল : 'ফুলের মালায় তোমাকে একটু নতুন করলাম। দেখলাম নতুন করে। দেখি।' কাকলির চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সুকান্ত।

'আর তোমাকে নতুন দেখলাম কথার মালায়।' টলটলে চোখে বললে কাকলি।

'এবার বিষয়জ্বালায় আসি।' হাসল সুকান্ত : 'তোমার নরুকাকা দিনক্ষণ ঠিক করেছেন ?'

'সব ঠিক। এমন-কি নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। আর জানো, নিমন্ত্রণপত্র বাবার নামে।'

'আয়োজন সব সংক্ষেপ তো ?'

'অতিশয়। বাবার সেন্টিমেন্টের মান রাখছেন নরুকাকা। যে কটি নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের না বললে নয়, শুধু তাদেরকেই চিঠি দিচ্ছেন। বলছেন, বাবার প্রেসার ভীষণ বেড়ে গিয়েছে, হৈ-চৈ, গোলমাল সইতে পারবেন না বলেই কাণ্ডটা ওবাড়িতে না হয়ে এ-বাড়িতে হচ্ছে—'

'আসল কথা কারুরই বুঝতে আর বাকি থাকবে না।'

'বুঝুকগে।'

'তারপর বিয়েটাকে অনিবার্য করবার জন্যে মানে অনিবার্যরূপে নগ্ন-নিঃস্ব করবার জন্যে নরুকাকা যা একখানা গুল ছেড়েছেন তা এখন ইতি-গজ বা ইতি-গাঁজা বলে চালালেও লোকে চাচ্ছে না নিতে। কেমন কুটিল-কুটিল চোখে দেখছে আমাকে।'

'তোমাকে দেখছে ?' খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : 'তোমাকে দেখে কী হবে ?'

এই হাসিটি নতুন। কটাক্ষটি নতুন। মধুরের এই টানটি আর কোনো দিন দেখে নি চিবুকে।

'তোমাকে এখন পাচ্ছে কোথায় ? যখন পাবে—'

'মুগ্ধ দেখবে।' আঁচলে একটা ঘূর্ণি দিল কাকলি। বললে, 'এদিকে কী হয়েছে জানো ? একটা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে এসেছি।'

'সে আবার কী !'

ব্যাপারটা বিশদ করল কাকলি।

খুব একটা গৌরবের কাজ করেছে সুকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তা মনে হল না। বরং প্রায় বেদনার সুর বার করল সুকান্ত, বললে, 'ঈস! তুমি কী বোকা!'

'বোকা!' ঘাড় ফেরাল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কী! নইলে অতগুলো টাকা কেউ ছেড়ে দেয় এক কথায়?'

'বা, ঐ টাকা কি আমার?'

'তোমার নয় তো কার! যখনি তোমার নামে সার্টিফিকেটগুলো কেনা হয়েছে, তুমি অ্যাডাল্ট হয়েছ, টাকা তোমার ছাড়া আর কারু নয়। তুমিই তার একমাত্র মালিক— যাকে বলে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান। এখন যদি তুমি তা সাধ করে বিলিয়ে দাও, নেপোকে দাও দই মারতে, তা হলে আর কী করা যাবে।'

কি রকম বিশ্রী লাগছে কাকলির। কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে চলতে গিয়ে তাকেও এখন একটু গম্ভীর না হলেই নয়। মুখও মেঘলা হয়ে এল সহজেই। বললে, 'কিন্তু আসল জিনিসে চোখ ঠারলে তো চলবে না। যে যাই বলুক, আসলে টাকাটা তো বাবার— তিনি যদি—'

'না, নয়, আর নয়, কখনোই নয়।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুকান্ত: 'তাঁর হাত থেকে দান পড়ে গিয়েছে। ছিলা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে তীর। দি ট্র্যানজ্যাকশান হ্যাজ বিন ক্লোজড, কনক্লুডেড। আর চারা নেই, ফিরে যাওয়া নেই, আউট হবার পর আর ব্যাট করা নেই। কিন্তু তুমি যদি আবার ডেকে আনো, মাঠ সাজাও, হাতে ব্যাট তুলে দাও, লোফা লোফা বল দাও দুদ্দাড় পেটাতে— ছি-ছি-ছি—'

হাসির কথার মত করে বলছে বটে, কিন্তু মোটেই হাসির কথা নয়। কাজে কাজেই কাকলির স্বরেও নম্রতার রেখা ফুটল না। বললে, 'কিন্তু করতাম কী শুনি? বাবা যদি সার্টিফিকেটগুলো হাতছাড়া না করতেন, যদি বন্ধ করে রেখে দিতেন তাঁর কাছে! কী করতে পারতাম!'

'কী করতে পারতাম মানে? মামলা করতাম।'

কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে সুকান্তকে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল কাকলি। কিন্তু কথাটা আগে শেষ করা দরকার।

'মামলা! আমি বাবার বিরুদ্ধে মামলা করব?'

'কেন করবে না? এখানে মামলা বাবার বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে, যে পরের সম্পত্তি জোর করে ভোগ করতে চাইছে, বলতে পারো, পরস্বাপহারীর বিরুদ্ধে। এরই জন্যে তো আদালত। বঞ্চিতকে তার ন্যায্য, তার প্রাপ্য উপশম দেবার জন্যে।

নইলে, বলো তো, দশ হাজার টাকা কি কম! টু স্টার্ট উইথ, আমাদের জীবনে কত বড় একটা সুযোগ!'

'আমাদের জীবনে মানে?'

কি রকম লাগল সুকান্তর কানে। বললে, 'কেন, মানেটা কঠিন কি! আমাদের জীবনে মানে আমাদের সংযুক্ত ভবিষ্যৎ জীবনে—'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মানে কী?' কি রকম কঠিন শোনাল কাকলিকে।

'আমাদের মানে আমার আর তোমার।' সুকান্ত মিনমিনে গলায় বললে।

'শুধু আমার বলো, তোমার নয়। টাকাটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, আমাদের দু-জনকে নয়।' পাথুরে গলা বের করল কাকলি: 'সুতরাং টাকাটা যখন আমার একলার, যখন ওটার উপর আমার একার কর্তৃত্ব, তখন আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দিয়ে দিয়েছি আমার বাবাকে।' এবার গ্রীবায় যে রেখা ফুটল, তা প্রায় কর্কশের কাছাকাছি।

'তা বেশ করেছ।' নিমেষে লঘু হয়ে গেল সুকান্ত, একটু বা ঘন হয়ে বসতে চাইল বেঞ্চিতে। বললে, 'কিন্তু তুমি-আমি কি আলাদা? যদি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হতে পারে, সতীর অর্থে কেন পতির অর্থ হবে না? আর শাস্ত্রে তো বলেইছে, স্ত্রীভাগ্যে ধন—'

'আমার স্বামীভাগ্যে?' অলসে-বিলাসে তাকাল কাকলি।

'ইতি-গজঃ।' হেসে উঠল সুকান্ত।

'গজ না হাতি!'

'গজ আর হাতি একই কথা।'

'হোকগে। আমার কথা শোনো। স্বামীভাগ্যে এই ফুলের মালা।' ঘাড় নিচু করে খোঁপার উপরে মালাটা ছুঁল কাকলি। ছুঁতে দিল সুকান্তকে। বললে, 'এই মালার দাম দশ হাজার টাকারও বেশি। যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কী করব?'

পরস্পর বাঁচিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে। একটা ঝড়ের মুখে পড়েছিল এসে নৌকো, হালী আর দাঁড়ী দুয়ে মিলেই সামলেছে। নিয়ে এসেছে শান্ত জলে, নিরাপদের ঘাটে। তারা কৃতজ্ঞ তাই পরস্পর। দু-জনের চোখে সেই তৃপ্তি, সেই প্রার্থনা।

'তোমার সাধের সানাই বাজবে তো সেদিন?'

'নিশ্চয়ই। নরুকাকা বলেছে জোগাড় করবে।' মুচকে হাসল কাকলি: কানাই ছাড়া গান নেই, তেমনি সানাই ছাড়া বিয়ে নেই।'

'সানাইটা যেন কেমন!' বললে সুকান্ত, 'আনন্দের সুর, কিন্তু কেমন কান্না-কান্না কথা।'

'তাই তো অত সুন্দর। প্রেমের মধ্যে যদি ভয় না থাকে, যদি সুখের মধ্যে না থাকে একটু সন্দেহ, জীবনের মধ্যে না থাকে সংগ্রামের অবকাশ, তা হলে স্বাদে কম পড়ে। কি বলো, পড়ে না?'

'পড়ে হয়তো।' পাশ কাটাল সুকান্ত। বললে 'তোমার বন্ধুদের কাকে বলবে?'

'বিনতাকে তো বলবই।' আপনমনে হাসল কাকলি: 'জানো, একেক সময় সুখটাকে নেহাত গ্রাম্য বলে মনে হয়। ঐ যে গাঁ থেকে শহর দেখতে আসে রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরে, তেমনি। দেখতে আসা মানে কতকটা বা দেখাতে আসা। যদি ফলাও করে দেখানো না যায়, কেউ ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এই আরামটা যদি না থাকে, তবে, এমন পোড়াকপাল, সুখেরও সুখ হয় না। তাই সকলের আগে বিনতাকে মনে পড়ছে।'

'কিন্তু এমন লোকও হয়তো আছে যে সুখকে অনুকম্পা করে। মনে-মনে বলে, আহা, কী মোহেই আছে এরা, এক শ্বাসের তাসের প্রাসাদে। গোকুলে যে কে বাড়ছে, তার খেয়াল নেই।'

'তুমি বলবে কাকে?'

'দীপঙ্করকে তো নিশ্চয়ই—'

'এখুনি তবে বেরুতে হয় বলতে। আর কটা দিন!' লজ্জার ডৌলে লাস্যের তুলি বুলোল কাকলি।

'না, চলো আজই বেরুই। ধরি গিয়ে দীপঙ্করকে। ও তো তোমারও চেনা।'

দু-জনে উঠে পড়ল। চলল উত্তরে।

'হাঁটবে?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'উপায় কি। রাস্তার নাম যদিও উড, কিন্তু অরণ্যের নামগন্ধও নেই।'

'উড মানে এখানে কাষ্ঠ। যানবাহনের লতাপাতা পাবে না কোথাও। শুধু একটানা পায়ে হাঁটার কাঠ।'

'ঐ একটা কাষ্ঠ যাচ্ছে ঠুনঠুনিয়ে। ডাকি রিকশাটাকে।' হাত তুলল সুকান্ত।

'না, না, রিকশা নয়।'

'কেন, মানুষে মানুষ টানে? সুকান্তের গলায় অজানতেই বুঝি একটু ঝাঁজ এসে গেল: 'মানুষটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করো না, এই মুহূর্তে ও সোয়ারি চায়, না! খালি

হাতে চলে যেতে চায় ঘণ্টা বাজিয়ে? আরো জিজ্ঞেস করো, যদি ওর বরাদ্দ ভাড়ার পর ওকে কিছু বকশিশ দিই, ওর কেমন লাগে?'

'মোটেও ওর জন্যে নয়।' শাসন-ভরা চোখে তাকাল কাকলি: 'আমাদের নিজেদের সোয়াস্তির জন্যে।'

'ও! ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের তো এখন অসিধারাব্রত।'

'হ্যাঁ, আমরা এখন অশেষের দেশের দিকে চলেছি। ধৈর্য তো আমাদেরই মানায়।'

'মন্দ বলো নি, অশেষের দেশ।'

'হ্যাঁ, মন্দের শেষ আছে, ভালোর শেষ নেই।' চলতে চলতে বললে কাকলি, 'দুঃখের শেষ আছে, আনন্দের শেষ নেই। ঘৃণা দ্বেষ কলহ-বিরোধের শেষ আছে, ভালোবাসার শেষ নেই।'

মনের অঙ্গনে গভীরের ছায়া পড়ল। অনেকটা পথ কাটল চুপচাপ।

'আর কতদূর হাঁটাবে? এ যে প্রায় পার্ক স্ট্রীট।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত: 'যন্ত্রের শেষ আছে, যন্ত্রণার শেষ নেই।'

ট্র্যামে-বাসেই আসতে পারল দীপঙ্করের আস্তানায়।

কিন্তু এ যে একটা অকৃত্রিম বস্তি। খোলার চালে একসার ঘিঞ্জি জাঁতিকল। ছত্রিশ জাতের সদাব্রত। ধোপা আছে, ভুজাওয়ালা আছে, ঝি আছে, শিশিবোতল-ওয়ালাও আছে। ওদিকে বুঝি এক হিন্দুস্থানি গয়লানির এলাকা। চালের উপরে ফুটবলের ব্লাডার আর সাইকেলের টিউব দেখে সহজেই বোঝা যায়, মদ চোলাইয়ের কারবার চলেছে ওখানে। গরুর গোয়ালও কি ওরই মধ্যে নাকি? না। গরুর বসবাস রাজপথে। সে কি? পুলিসে দেখে না? দেখে বৈকি। দেখে, শোঁকে, শোনে। মাতালদের সে কী হল্লা! কখনো বা কী মারামারি! পুলিস এসে রাস্তায় লাঠি ঠোকে। কি হে? তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও সুখে থাকি। তোমরাও যদি সিক্ত হয়েছ, আমাদেরও আর্দ্র করো। রুধিরাক্ত হয়েছ তো তৈলাক্ত করো। আর গয়লানির সঙ্গে তো পরিপাটি ব্যবস্থা। ভাটিও জ্বলবে, গরুও হাঁটবে।

সেই অকৃত্রিম বস্তির রাস্তাঘেঁষা খোপের মধ্যে দীপঙ্কর চাক বেঁধেছে। তার মা বাবা দিদি আর কতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ঘর ছেড়ে বাইরে উপচে এসেছে দীপঙ্কর, তার খাটিয়া ফুটপাতে।

'দীপঙ্কর আছে?' বাইরে থেকে হাঁক দিল সুকান্ত।

'না, এখনো ফেরে নি।' বাইরে বেরিয়ে এলেন দুর্গাবালা, দীপঙ্করের মা।

'ফিরতে দেরি হয়। আপনি কে? কী বলব ও ফিরে এলে?' লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে।

'আমি ওর বন্ধু। বলবেন, সুকান্ত এসেছিল।'

'আহাহা, বন্ধু। এ নিষ্ঠুর শহরে এমন কথা আর কে বলে? বলে, বন্ধু। বোসো বাবা, বোসো।' ভিতর থেকে একটা ময়লা সুজনি নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতল দুর্গাবালা। তারপর নজরে আনল কাকলিকে: 'আর তুমি?'

দুর্গাবালা ভাবছিল, সুকান্তেরই কেউ হবে হয়তো। আর সুকান্তেরও সেই আশা, তার মধ্য দিয়েই কাকলি পরিচিত হবে!

'আমরা দু-জনেই ওর বন্ধু।' বললে কাকলি।

'বোসো মা, বোসো। এই রাস্তাই আমাদের উঠোন, আমাদের বারবাড়ি। কোনোরকমে কষ্টেস্টে বোসো দুটিতে পাশাপাশি। বন্ধুর প্রাণে আবার কষ্ট কী! আহাহা, আমি দেখি, আমি শুনি, আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।'

'না, আজ আর বসব না। আরেকদিন আসব।' সুকান্ত বললে।

চলে যাচ্ছিল, দু-তিনটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল কাকলিকে: 'তুমিই সেদিন গিয়েছিলে চিড়িয়াখানায়। চীনেবাদাম খাচ্ছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তোমরাও গিয়েছিলে। কিন্তু ও—ঐ ছেলেটি কে?' ঘরের মধ্যে চোখ পাঠাল কাকলি: 'ও যায় নি?'

'না, ও কি করে যাবে?' ছোটদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'ওর একটা পা নেই। জ্বরে খসে গিয়েছে। যে পা-টা আছে, সেটাও নন্নড়ে।'

'আর ও কে?' আরো ভিতরে কৌতূহলকে সজাগ করল কাকলি।

'ও বিষ্টুরই ঠিক আগে। বিষ্টু নয়, আভা এগারো।' এবার দুর্গাবালাই এগুলেন।

'কী করছে?'

'রাঁধছে। ফেন গালছে।'

বিষ্টু জ্বলজ্বলে চোখে মুখভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে, যেন কিছুই তার হয় নি, আর ফেন গেলে আভা যখন উঠে দাঁড়াল, গায়ের উপর ছেঁড়া আঁচলটি মেলা, মনে হল একেও খোঁড়া করবার জন্যে আরেক দুর্মর জ্বর আসন্ন। আর, তখন যেন তারও কিছুই হবে না।

গলির থেকে বাইরে আসতে আসতে কাকলি বললে, 'এরা কি করে বাঁচবে? কি করে দাঁড়াবে?'

'তোমার এ জিজ্ঞাসা মহাশূন্যের শোকে মহাশূন্যের বিলাপ।' সুকান্তর কথাটা প্রায় হাসির মত শোনাল : 'ফাঁকা কথা আর কতদূর হতে পারে?'

'যা বলেছ।' কাকলিও হাসল স্বচ্ছন্দে : 'সত্যি, কোথায় নিয়ে এসেছিলে তুমি? বাবাঃ, বুকে হাঁপ ধরে। তুমি দিব্যি বললে কিনা আরেকদিন আসবে।'

'পাগল! আর কে এমুখো হয়? দীপঙ্করকে আমি তার আফিসে গিয়ে ধরব।'

১৬

দীপঙ্করকে আফিসে গিয়েই ধরল সুকান্ত।

'কাল তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম।' সুকান্ত বললে, 'বাবাঃ, কোথায় এসে বাসা নিয়েছ।'

মুখের দিকে তাকাল দীপঙ্কর। না, ঘৃণা নয়, অনুকম্পা নয়, প্রচ্ছন্নে আছে বা একটু বন্ধুতার স্বর। বললে, 'রেলস্টেশন দেখেছ? টিনের কৌটো আর কাঁচের শিশি দিয়ে এলাকা ভাগ করে শুয়েছে। কখনো কখনো আবার এই শিশিকৌটোকেই অস্ত্র করে রাজ্যে-রাজ্যে বেধেছে যুদ্ধ। তার চেয়ে ভালো আছি।'

'না, না, মোটেই ভালো নয়।' সুকান্ত প্রতিবাদ করল। বললে, 'যখন সবাইকে আনলেই দেশ থেকে—'

'না এনে উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তই তখন বাঘের চোখ। দেখেছ তো বোনটাকে?'

'তবু এর চেয়ে একটা ভালো আস্তানা জোগাড় করা যেত।' বলতে আর কী, বললে সুকান্ত।

'চট করে হাতের কাছে আর পেলাম কই? জানো এরই জন্যে সেলামি দিতে হয়েছে গয়লানিকে।'

'অসম্ভব। না, না, তুমি একটা ভদ্র বাসা দেখ। এখানে বাঘের চোখ না থাকলেও হায়েনার চোখ আছে।'

'দেখছি তো, দেয় কে।' হাসল দীপঙ্কর : 'মাইনেটা যদি বেশি হত!'

'কত মাইনে?'

'শ দেড়েক।'

চারদিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'আফিসটা তো ছোট। আমি ভেবেছিলাম—'

দোতলায় একটা হল-মতন ঘর কাঠের পার্টিশন দিয়ে তিন টুকরো করা। আর ও-পাশে একটা ফালতু। চার কামরার আফিসে কী বা জেল্লাজমক হবে। কী বা দেবে থোবে অন্যকে। লোকজনও তো বিশেষ দেখছি না। সুকান্তের মুখে হতাশার ছায়া পড়ল।

'আফিসের আয়তন দিয়ে ব্যবসার আয়তন বোঝা যাবে না। মারোয়াড়ির গদি এর চেয়েও ছোট হয়।' দীপঙ্কর স্বর বদলাল: 'অবশ্যি আমাকে যা দিচ্ছে তা একনজরে খুব খারাপ বলা যায় না। আজকালকার বাজারে সাধারণ বি-এ পাশের দাম কী! আমার চলে না বলেই মাইনে বাড়াতে হবে এটা যুক্তি নয়, কিন্তু চুক্তির বাইরে যদি আমার কাজ বাড়াও সেই সঙ্গে চুক্তির বাইরে মাইনেও বাড়াবে না এটা অযুক্তি।'

'কেন, বেড়েছে নাকি কাজ?'

'প্রথমে যখন ঢুকি তখন কথা ছিল খাতা লেখার, এটা-ওটা স্টেটমেণ্ট তৈরি করার কাজ। দু-চারটে চিঠি লিখতে দাও তাও না হয় করলাম। এখন বলছে গোডাউন ইনস্পেকশনে যাও। আর সেসব গুদোম কোথায়! পৃথিবী ছাড়িয়ে। পাতিপুকুর, ঠাকুরপুকুর, ঢাকুরে। আগে আগে সন্ধে ঘেঁষেই বাসায় ফিরতাম, এখন কত রাত যে হয়ে যায় ফিরতে!'

'আলাদা ইনস্পেক্টর নেই?'

'বরেনই আগে ঘোরাঘুরি করত। গাড়ি আছে, গায়ে-পায়ে লাগত না। এখন প্রায়ই তাকে টুরে যেতে হয় বাইরে, পার্টির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। তাই আমার উপর ভার পড়ে। বলে, একজন হোলটাইম সুপারভাইজার রাখবে। কী দরকার! আমার মাইনেটা ভদ্র ও সুস্থ করে দিক, আমিই খেটে দিচ্ছি একস্ট্রা। শুধু একটা গালভরা নাম দিয়ে কী হবে। তা ছাড়া, সেই বাড়তি খাটনিটা তো খাটছিই—'

'এদের কিসের এত ব্যবসা?' সুকান্ত তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে।

'ওরে বাবা, বিরাট ইমপোর্টের কারবার।' দীপঙ্কর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'বিদেশ থেকে নানারকম র-মেটিরিয়েলস নিয়ে এসে বিক্রি করে এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের কাছে। দিশি ফার্মের প্রোডাকশান বন্ধ যদি ওসব মেটিরিয়েলস না পায়। আর বিদেশেই জন্মায় ওসব উপাদান। আর এরা, এ কোম্পানি, ঐ বিদেশী

কোম্পানিদের সোল এজেন্ট। সুতরাং, বুঝতে পারছ, ঢালাও ব্যবসা। এই তো কত্তা সেদিন ঘুরে এল টোকিও থেকে। শিগগির আবার যাবে নাকি হংকং—'

'কে কত্তা? বরেনের বাবা?'

'হ্যাঁ, ঐ তো রয়েছে ঐ ঘরে।' ফালতু ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর, আর, সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেরও অজানতে কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর সরল করে নিয়ে বললে, 'বেশ আছে আনন্দে। এই মালয়, ঐ কানাডা। হাওয়ায় পাখা মেলে দিলেই হল। নিচে রুপোর চাকা আর উপরে স্বপ্নের পাখা।'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সুকান্ত, 'বরেন আছে?'

'আছে। ঐ ঘরে।' প্রান্তের সুইং-ডোরটা ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর: 'যাবে? দেখা করবে ওর সঙ্গে!' শুধু মামুলি জিজ্ঞাসা নয়, যেন বা আশায় ভরা উৎসাহের স্পর্শ।

'মন্দ কি। যাই না। কিন্তু, কী আশ্চর্য', পকেটে হাত ঢোকাল সুকান্ত, 'আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি এতক্ষণ। আমার বিয়ে। সেই যে মেয়েটিকে দেখেছিলে জু-তে, তার সঙ্গে। কী সব বাজে কথায় কাজের কথাটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল।' একটা চিঠি বার করে বাড়িয়ে ধরল দীপঙ্করের দিকে। বললে, 'যেয়ো কিন্তু। দেখে রাখো তারিখ। আর শোনো, দু দিনই যাওয়া চাই—'

কাষ্ঠহাসি হাসল দীপঙ্কর। চিঠিটা প্রায় অজ্ঞানেই রেখে দিল পকেটে, তাকিয়েও দেখল না। বললে, 'বরেনকেও বলো না।' এগুচ্ছিল সুকান্ত, জামা ধরে টানল পিছন থেকে: 'আর সেই সঙ্গে আমার কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'তোমার আবার কোন কথা!'

'বা, এতক্ষণ বলছিলাম কী তোমাকে!' পীড়িত মুখ করল দীপঙ্কর: 'বিয়ে তো লোকে আকছার করছে, তাই বলে দরকারি কথা কে ভুলে থাকে?'

'মানে, তুমি বলছ, তোমার ঐ গোডাউন ইনস্পেক্ট করার কথা?' সুকান্ত মাথা চুলকোল: 'গোডাউনগুলো কার?'

'ব্যাঙ্কের। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়।'

'ব্যাঙ্কের গোডাউন? কেন, এদের নিজেদের নেই?'

'কী দরকার করে? করলেই তো ঝামেলা, খরচান্ত। এ দিব্যি ব্যাঙ্কের গুদোমে এসে জমছে, সময় মত খালাস করে নিচ্ছে পার্টি। তারপর সরকার একজন আছে, ঘুরে-ঘুরে লেন-দেন দেখছে, মালের হিসেব রাখছে, কিন্তু বাড়তি এক পয়সা তার আসান নেই—'

'ও! তুমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা বলতে বলছ? তাই না?'

এবার আর কাষ্ঠ নয়, পুষ্পহাসি হাসল দীপঙ্কর। বললে, 'বুঝেছ এতক্ষণে?'

'বা, এ তো তুমি নিজেও বলতে পারো।'

'আমি বললে হবে না।' মুখ নিচু করল দীপঙ্কর।

'আমি বললে হবে?'

'হবে। তুমি ওর বন্ধু। তোমার কথা ও পারবে না ঠেলতে।'

'বা, ওর বন্ধু তো তুমিও। আমি তো জানি সেই সুবাদেই তোমার চাকরি হয়েছে এখানে।'

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' ম্লান একটু হাসল দীপঙ্কর। বললে, 'আমি ওর মুখ-চেনা, আর তুমি ওর হৃদয়-চেনা। স্কুল পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম তিনজন। পাশ করে তুমি ওকে টেনে নিয়ে গেলে স্কটিশে, আমি হলাম বঙ্গবাসী। সেই থেকে তোমার সঙ্গে না হলেও ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর, বলো, ওর ঘনিষ্ঠই বা আমি ছিলাম কবে! স্কুলে কোনো দিন বসিও নি পাশাপাশি।'

'স্কটিশেই বা কদিন ছিল আমার সঙ্গে!'

'নাই বা থাকল। তুমি এগিয়ে গেলে আর ও দু-দুবার আই-এতে ফেল করে কেটে পড়ল। কেটে পড়ল তো নয়, ফেটে পড়ল। নিজে ব্যবসাতে নামল, বাপের কিছু হচ্ছিল না এদিক-সেদিক, তাকেও নামাল। দেখতে-দেখতে দশদিক পয়মন্ত করে তুলল। ছোকরা বয়সের মাথায় রক্ত এসে উঠলেও মনে মনে এখনো কিছু সবুজ আছে। অন্তত কারু কারু কাছে আছে। আর তাদের মধ্যে তুমি যে একজন তাতে সন্দেহ কি। তোমাদের কত একদিন ভালোবাসা ছিল!'

'ছিল!' সুকান্ত হাসল।

'যতই এখন উপেক্ষার ধুলো পড়ুক, ধৈর্য ধরে কিছুটা বালি খুঁড়লেই পাওয়া যাবে ভালোবাসার জল।' দীপঙ্কর বললে, 'আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাশে উঠে ওকে ধরি, ও তার আগে দু-দুবার এলাউড হয় নি টেস্টে। মনে আছে, তুমিই ওকে নিজের কাছে বসিয়ে পড়িয়ে-পড়িয়ে তরিয়ে দিলে। আর মনে নেই সেই খেলার মাঠের কথা?'

'সে আবার কবে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'সেই খেলার মধ্যে কালবোশেখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠল, দশদিক আঁধার করে নামল অঘোর বর্ষণ, আমরা যে যার দিকে ছুটলাম আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ লক্ষ্যও করি নি কখন একটা গাছের ভাঙা ডাল এসে বরেনের উপর পড়েছিল। তুমি কাছে ছিলে,

তুমি দেখলে। দেখলে, বরেন মাটিতে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। সাহায্যের জন্যে কত নাম ধরে ডাকলে আমাদের, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে কে তা শোনে। শুনলেও কে তার জবাব দেয়! তখন তুমি কী করলে? তুমিও ছুটলে।'

'বলো কি, আমিও ছুটলাম!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ছুটলে নিজেকে বাঁচাতে নয়, বন্ধুকে বাঁচাতে। ঝড়জলের মধ্যেই লোকজন নিয়ে এলে, গাড়ি নিয়ে এলে, খবর পাঠালে বাড়িতে। ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে এলে এক ডাক্তারখানায়। বাঁচিয়ে দিলে ওকে, ভালো করে তুললে। কি, মনে নেই?'

'আমার মনে থাকায় লাভ কী! বরেনের মনে আছে কিনা সেইটেই জিজ্ঞাস্য।'

'নিশ্চয়ই আছে। সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে? ঝড়জল মাথায় করে অন্ধকার মাঠ দিয়ে তোমার সেদিনের ছোটাটা জলন্ত রেখায় এখনো আঁকা আছে চোখের সামনে!'

'কিন্তু কে জানে সেদিনের সেই অন্ধকার আর কারু মনে হয়তো অন্ধকারই হয়ে আছে।' বললে সুকান্ত, 'জলের ঝাপটায় একটি রেখাও হয়তো আর জেগে নাই।'

'আছে, আছে।' জোর দিল দীপঙ্কর: 'একটা পশুরও স্মরণশক্তি থাকে। আর এ তো বন্ধু—এক ইস্কুলের ছাত্র।'

'এক সার্কাসের জানোয়ার।' হাসল সুকান্ত।

'তাই তুমি বললেই হবে। তুমি যদি বলো আমার হয়ে—'

'বলব, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আমি ভাবছি, বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি মাইনের দাবি এ তো বিধিমত তোমারই করা চলে। এ তো ন্যাচারেল জাস্টিসের কথা। তা ছাড়া, তুমি স্কুল-ফ্রেণ্ড, পুরোনো পরিচিত, তোমার কথামত অন্তত মুখ-চেনা তো নিশ্চয়ই—'

'মুখ-চেনা!' অধররেখাটা বঙ্কিম করল দীপঙ্কর: 'ভাবে ভঙ্গিতে সেই পুরোনো দিনের গন্ধ এতটুকুও ভেসে আসে না কোনো দিন। আমি তো ওর এমপ্লয়ী, ওর চাকুরে। আগের সুরে আমাকে আর ভুলেও তুমি বলে না—আপনি বলে।'

'বা, তাই তো বলবে। তাই তো আজকালকার কোড অফ কনডাক্ট, ব্যবহার-নীতি। নিম্নপদস্থকেও আপনি বলতে হবে। বাস-ট্র্যাম কণ্ডাক্টর তো দূরের কথা, আফিসের চাপরাশি, পোস্টম্যান, এমন-কি হোটেল-রেস্তর্াঁর বয়কেও তুমি বলা চলবে না। চাকরদের জন্যে যে বিল আসছে তাতেও একটা ক্লজ থাকবে, তাদের

আপনি বলা চাই। রেল-ষ্টিমারের কুলিদেরও সেই আওয়াজ।' সুকান্ত প্রায় বক্তৃতা দিয়ে উঠল।

'তুলুক আওয়াজ, আপত্তি নেই। কিন্তু কাজকর্মের বাইরে, আফিসের বাইরে, একেবারে আলাদা পরিবেশে যখন দেখা হয়, তখনো সেই 'আপনি'। কিছুতেই পুরোনো চোখে চায় না চিনতে। প্রভুত্বের চেয়ারটা সব সময়েই পিছনে লাগিয়ে চলেছে।'

'আর যেই তোমার সামনে বসছে গ্যাঁট হয়ে, তুমিও বাধ্য ছেলের মত দাঁড়াচ্ছ হেঁট হয়ে।' সুকান্ত ঝাঁজ আনল গলায়।

'উপায় কী তা ছাড়া। প্রভুর কাছে ভৃত্য সব সময়েই ভৃত্য। নিত্যভৃত্য।'

'তবে দেখা করে কাজ নেই।' সুকান্ত পিছু হটল: 'হয়তো আমাকেও চিনবে না, আপনি করে বলবে।'

'না, না, তুমি তো ওর এমপ্লয়ী নও—'

'রক্ষে করো।'

'তোমাকে তাই ঠিক চিনবে। কথা কইবে আগের স্বরে।'

'তা হলে যেতে বলছ? যাব?'

'অন্তত আমার জন্যে যাও। আমার বিশ্বাস তুমি বললেই আমার সুরাহা হবে। তুমি বললেই জাস্টিসটা স্পষ্ট হবে ওর কাছে। নইলে, মানুষের জাস্টিস আর কী! যার যেখানে স্বার্থ তার সেখানে জাস্টিস! সেই জজই খুব জাস্ট যে আমার মামলাতে ডিক্রি দেয়। আমি ডিসমিস খেলেও বিচারকে বিশুদ্ধ বলব, প্রশংসা করব জজকে, এ কথা শাস্ত্রে পুরাণে ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই।' কষ্টে হাসল দীপঙ্কর: 'সব জানি। কিন্তু আমার অবস্থাটা তো স্বচক্ষে দেখে এসেছ। কিংবা দেখ নি হয়তো পুরোপুরি। আমার বাবাকে দেখ নি।'

'তোমার বাবা!'

'হ্যাঁ, লোকে কাঁদে ভাতের জন্যে, ছাদের জন্যে, আর আমার বাবার কান্না আফিঙের জন্যে। আমি এক দিকে কমাই উনি আরেক দিকে বাড়ান। কিছুতেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারি না তাঁর সঙ্গে।'

'কী কমাও-বাড়াও?' সুকান্ত কৌতূহলী হল।

'আমি ভার কমাই, উনি ধার বাড়ান। আর ধার অত বেশি হলে তাতে সব কিছুই কাটা পড়ে। পেটের ভাত পরনের কাপড় ইস্কুলের বই তো বটেই, ঝি-চাকর, মাস্টার-ডাক্তার, এমন-কি মান-সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা-ভক্তি—সমস্ত।' বারান্দা দিয়ে সুকান্তকে

এক পা এগিয়ে দিল দীপঙ্কর। গলা নামিয়ে বললে, 'বলের আগে কৌশল ভালো। যদি ধরাধরি করেই হয় তবে আর লড়ালড়ির দরকার কি। মীমাংসা একান্ত না হলেই তবে বংশ সিংকে ডাকা যাবে।' একটু থামল দীপঙ্কর: 'তবে তুমি যখন আছ তখন বংশীতেই কাজ হবে হয়তো।'

'ঢুকব যে কার্ড লাগবে না তো?' পারে এসেও সুকান্তর দ্বিধা নাকি?

'তোমার আবার কার্ড!'

সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল সুকান্ত।

ব্র্যাকেটে কোট ঝুলছে হ্যাঙ্গারে, শার্টে-টাইয়ে-ট্রাউজার্সে দক্ষতাযোগ্যতার প্রতিচ্ছবি, বরেন বসে আছে নিখুঁত মনোযোগে। বিরক্ত-সন্দিগ্ধ চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল সূচ্যগ্র স্তব্ধতায়। ক্ষণপরেই উঠল উত্তাল হয়ে: 'আরে, সুকু, সুকু যে। কী মনে করে? আয় আয়, বোস।' ভঙ্গির সমস্ত তীক্ষ্ণতা মুহূর্তে ভোঁতা করে দিল। শৈথিল্যে ডুবে গিয়ে বললে, 'কতদিন পরে দেখা বল তো।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সুকান্ত। মুখময় মিষ্টি হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছিস?'

'তুই কেমন আছিস? চেহারাটা তো বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে।'

'তোর চেয়েও?'

'আমার সব পোশাক। মলাট।'

'ললাট বল।' সস্নেহে তাকাল সুকান্ত।

'ললাট মানে কপাল, তাই না?' যন্ত্রচালিতের মত কপালে একবার হাত বুলোল বরেন। বললে, 'কিছু নেই, খা-খা করছে। বিদ্যার জাহাজ তোরা, এক কথায় তোরাই তো বিদ্যাপতি। আমরা তো কুলিমজুর। নে, সিগারেট খা।' সুকান্তকে একটা দিয়ে নিজে ধরাল আরেকটা: 'তারপর কী করছিস? এম-এ হয়ে গিয়েছে? বাঃ, কোথাও ঠেকালি না একটুও। তারপর? এখন?'

'রিসার্চ করছি।'

সুকান্তর দিকে করুণার চোখে তাকাল বরেন। বললে, 'তোর ছাত্রত্ব আর ঘুচল না।'

'কিন্তু পাত্রত্ব ঘুচছে।'

'তার মানে?' টেবিলের উপর দু কনুই রেখে ভঙ্গিটা ধারালো করল বরেন।

'তার মানে আর পাত্র থাকছি না। ফুটোপাত্তর হয়ে যাচ্ছি। বুঝলি না?'

'না।' বোকা-বোকা মুখ করল বরেন।

'তার মানে বিয়ে করছি। এ জীবনে আর বিয়ের পাত্র বলে চিহ্নিত হব না তারই দুঃখে হাহাকার করছি।' চোখে মুখে আনন্দ নিয়ে জ্বলে উঠল সুকান্ত।

বরেন গলা ছেড়ে হেসে উঠল হো হো করে। বললে, 'তাই। তাই তোর চেহারাটা এত চেকনাই মারছে।'

'সত্যি ?'

'কিন্তু এখুনি ? এরি মধ্যে বিয়ে ?' অনুকম্পার স্বর আনল বরেন: 'শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল, সম্বন্ধ করে বাবা-মা পাত্রী বেছে দিলেন আর অমনি রাজি হয়ে গেলি ? এই উঠতি বয়সেই ক্লান্তি এসে গেল ? এখন রাত কত ?'

'রাত জন্মায় নি এখনো।'

'বাবা-মা ডাল-ভাত মেখে গরস পাকিয়ে দিলেন আর তাই নির্বিবাদে গালে পুরলি ? বিয়েটা একটা হাতের মোয়া ? ক্রিকেটের ডলি ক্যাচ ? কি রে, মুখ টিপে হাসছিস কী!' শাসনবিলাসী বিজ্ঞের মত মুখ করল বরেন: 'একটু দুর্গমের পথে যাবি না ? একটু কঠিন করে জটিল করে নিবি না ? হাত বাড়িয়েই যে ফল পাড়া যায় তার চেয়ে গাছে চড়ে তার মগডাল থেকে ছিনিয়ে আনা ফল কি বেশি মিষ্টি নয় ? কঠিন না হলে কি দামি হয় ? জটিল না হলে কি আনন্দ আছে ? রোমাঞ্চ আছে ? তার মানে ? মাথা নাড়ছিস কেন ? খুব দাঁও মেরেছিস বুঝি ?'

'একটা কলাই যথেষ্ট, এখানে একেবারে আটটা। অষ্টরম্ভা।'

'তবে আকর্ষণটা কিসে ?' চোখ দুটো একটু সরু করতে চাইল বরেন: 'মানে, জিনিস খুব ভালো ?'

শব্দ করে হেসে উঠল সুকান্ত। বললে, 'তা এখুনি কী করে বলি! ফিনিশ না হলে কি জিনিস বোঝা যায় ?'

'তা হলে রহস্যটা কোথায় ?'

'তুই এত বুঝিস আর এটুকু বুঝলি না ? ভালোবাসার নাম শুনেছিস ?'

'স্কার্লেট ফিভারের নাম শুনেছি।'

'ঐ, হ্যাঁ, ঐ লাল জ্বর। যাকে বলে, রুধিরে যন্ত্রণা। সেই ভালোবাসা হয়েছে।'

'ভালোবাসা হয়েছে!' ঠাট্টা করে উঠল বরেন: 'তুই একটা মেয়েকে ভালোবাসিস এ সহজেই আন্দাজ করতে পারি। এককালে যাকে দেখতিস তাকেই ভালোবাসতিস —সে কথা নয়। কিন্তু তোকে কোনো মেয়ে গায়ে পড়ে ভালোবাসবে এ অবিশ্বাস্য। বলি, কে, মেয়েটা কে ?'

'আমার সঙ্গে পড়ত। আমার সঙ্গেই পাশ করেছে এম-এ।'

'বলিস কি ! একটা এম-এ পাশ মেয়ে তোর প্রেমে পড়েছে !'

'সেইটেই তো আশ্চর্যের দেশে মহাশ্চর্য। তুই তো আমাদের সব জানিস—কত ত্রুটি কত দৈন্য নিয়ে বড় হয়েছি। চাল নেই, চুলো নেই, বিত্ত নেই, বেসাত নেই—অধম-অধনদের একজন, তবু ছাখ কী অদ্ভুত, তাকেই কিনা একজন ভালোবাসে, আর শুধু ঠুনকো এক রাত্রির জন্যে নয়, জীবনভোর দিনরাত্রির জন্যে তাকে পেতে চায়! পৃথিবীর ধুলোতে আশ্চর্যের ঋতু এখনো শেষ হয় নি। সূর্য উঠুক আর অস্ত যাক, আশ্চর্যের উদয়াস্ত নেই।

বরেনের মনে হল আবার সে হারল, মার খেল সুকান্তের কাছে। চেয়ারের আলস্যে ঢলে পড়ল।

পাড়ায় তাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই যেদিন সুকান্তরা ভাড়াটে আসে সেদিন স্পষ্ট মনে আছে বরেনের। দূর মফস্বল থেকে এসেছে, বাঙাল-বাঙাল দেখতে, মোটেই তার উপর সদয় ছিল না বরেন। আর কী স্পর্ধা, তাদের ইস্কুলে এসে ভর্তি হল, শুধু ইস্কুলে নয়, ঠিক তার ক্লাশে, তারই সেকশনে, আর বলিহারি, উকিল-বাপের ছোট-হয়ে-আসা আলপাকার কোট গায়ে দিয়ে বসল তার পাশটিতে। প্রথম-প্রথম মনে হত বরেনের, যেন কে-এক অস্পৃশ্য ঢুকে সমস্ত মন্দিরকে অশুচি করে দিচ্ছে। কথা কইতেও চাইত না, নাক সিঁটকে থাকত। কিন্তু একটা লোক যদি সর্বক্ষণ কারণে-অকারণে স্তবস্তুতি করে, উপকার করবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে তবে তার প্রতি ক্রমে-ক্রমে নরম না হয়ে উপায় কি। ও কেন উড়ে এসে মোড়লি করবে, শুধু লেখায়-পড়ায় নয়, এমন-কি খেলার মাঠে, বাঙাল হয়েও কেন চিরকালের কাঙাল হয়ে থাকবে না, বরং আশেপাশে সবাইকে কাঙাল করে রাখবে, এ বরেনের অসহ্য ছিল। তবে যে লোক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অন্ধকার ঝড়ের থেকে অজ্ঞানকে বাঁচায়, নিজের শত-শত অসুবিধে ঘটিয়েও পড়িয়ে পাশ করায়, তার প্রতি সুপ্রসন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখে যাই বলুক, সর্বক্ষেত্রেই সুকান্তের হার হোক, তার গ্রাম্য উদ্ধত স্পর্ধা লুণ্ঠিত হোক ধুলোতে, এ বরেনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ। তাই বিদ্যায় না পারলেও যখন তাকে ব্যবসায় মারল, বরেনের গর্বের অবধি ছিল না। সাধ্য নেই টাকায় সুকান্ত তার নাগাল পায়। ঝকঝকে কটা ডিগ্রি পেতে পারে, কিছুটা হয়তো নাম, কিন্তু টাকার কাছে ওসব সোনার কাছে রাংতা। টাকা দিয়েই নাম-কাম রাম-শ্যাম কিনতে পারে সমস্ত। এমন-কি, যদি সুকান্ত হাত পাতে, কিছু তাকে দিয়েই দিতে পারে অকাতরে।

খুব স্বস্তিতে ছিল বরেন, গৌরবের স্বস্তিতে। কিন্তু এ আজ সে কী শুনল? একটি

মেয়ে ভালোবেসেছে সুকান্তকে, তাকে তার হৃদয় দিয়েছে। আর এ মেয়ে স্রোতের শ্যাওলা নয়, স্থির জলের পদ্ম। শুধু রূপসী নয়, বিদুষী। আর, একটা হৃদয় পাওয়া মানে একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি পাওয়া। তার চেয়ে ঢের ঢের বড় ধনী আজ সুকান্ত।

কতদিন ধরে একটা ভালোবাসার জন্যে বসে আছে বরেন। টাকার শব্দ দিয়ে তার নূপুরের ধ্বনি তৈরি হয় না। বসে আছি তো থাকব, আরো থাকব। কিন্তু এরই মধ্যে এক ফাঁকে সুকান্ত জয় করে নেবে অভাবনীয়কে—এ ধারণার অতীত।

'তোকে একটু দেখি ভালো করে।' বরেন তেরছা করে নিল চেয়ারটাকে। 'যে দৈব তোকে কৃপা করল দেখি সেই দৈবকে।'

'যুগলে দেখিস। তা হলেই ঠিক দেখা হবে, করুণাটা সমান-সমান না বেশি-কম।' উঠে পড়ল সুকান্ত। বললে, 'তোকে চিঠি দিচ্ছি। যাস কিন্তু। দু জায়গায়ই যাস দু দিন।'

'বা, যাব না? নিশ্চয়ই যাব।' বরেনও উঠে পড়ল: 'তোর সেই শাশ্বতের প্রার্থনাকে দেখে আসব।'

'তোর বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করলাম না বলে যেন কিছু মনে করিস নে।'

'ছি ছি, তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?' আবার একটা সিগারেট ধরাল বরেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সুকান্ত।

ওত পেতে ছিল, দীপঙ্কর তাকে ঠিক ধরেছে। বললে, 'বরেন কী বললে আমার কথা?'

'বললে, হ্যাঁ, দেবে, দেবে তোমাকে একটা এলাউয়েন্স—'

'দেবে?' সিঁড়ির মুখে দীপঙ্কর আটকাল সুকান্তকে: 'বলো তো কী আরাম! তুমি তদবির করলে বলেই তো এটুকু হল। বরেন যখন একবার কথা দিয়েছে তখন আর তার খেলাপ হবে না। তারপর তুমি আছ।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

*

আর, এদিকে, কাকলি এসেছে বিনতাদের হস্টেলে।

কতগুলি মেয়ে একটা চুটকি সিনেমা-কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করে নিচ্ছে। কে কোন ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামায়, টেলিফোনের রিসিভর তুলে ধরে কোন কানে আগে পাতে, কোন কাত হয়ে শুতে ভালোবাসে, রাত্রে কেউ ঘুমের মধ্যে হাঁটে কিনা এবং হাঁটতে-হাঁটতে গেট পেরিয়ে চলে আসে কিনা রাস্তায়—

'এই, কাকলিদি।' ইউনিভার্সিটিতে যারা চিনত, ফিফ্‌থ ইয়ারের মেয়েরা, সমীহ করতে চাইল।

কিন্তু অন্যান্যদের সেই মেজাজ নয়। তাদের বয়ে গেছে যাকে চেনে না তাকে মান দিতে।

'খোল না বইটা। ছাখ না পরেরটা কী মজার প্রশ্ন! এঁরা কোত্থেকে সাবান-তোয়ালে কেনেন এবং সাবান-তোয়ালে কোন কোম্পানির?'

'বিনতা আছে?'

'তাঁর ওপাশে ঘর। আছে কিনা দেখুন।'

দেখল, আছে। তার হাতে চিঠি দিল কাকলি। বললে, 'বিশেষ কাউকে বলছি না। তুই কিন্তু যাস। কেউ একদম না থাকলে ভালো লাগবে না।'

'যাব।' তৃষিত চোখে কাকলিকে সর্বাঙ্গে লেহন করল বিনতা। বললে, 'কিন্তু এক কথা। বিয়ের পরেই শিগগির তুই আমার কাছে একদিন আসবি।'

'বা, তাতে কি, আসব।'

'আর আমাকে সব বলবি—কী হল-টল।'

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'সে কি বলা যায়, না বোঝানো যায়? তুই ঘি দিয়ে ভাত খেয়ে এলে বলতে পারবি এ কেমন ঘি?'

১৭

ভূপেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গেল, বাড়তে দিল না প্রেসার। যা অখণ্ডনীয়, তার সঙ্গে লড়তে যাওয়া বৃথা। কালস্রোতের সামনে সামান্য খড়কুটো হয়ে লাভ নেই। দূরে থাকা, সরে থাকাই সুন্দর।

কিন্তু মৃণালিনী হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ কার উপরে যে রাগবে পাচ্ছে না প্রতিপক্ষ, প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ। শুধু ধোঁয়াচ্ছে আর থেকে থেকে দমকা রাগে ফেটে ফেটে পড়ছে।

'এ কি রকম হল! এ কেমন বউ এল সুকান্তর!'

ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল প্রশান্ত, কথার সুরটা ভালো লাগল না। মার কাছে সুকান্ত যেন কী, ওড়া-ঘোড়া-চড়া রাজপুত্র, আর তার বউ ডানাকাটা পরী না হলে

সমস্ত রূপকথার রাজ্যটাই যেন ভিত্তিহীন। মার ছেলে সুকান্ত, যখন-তখন অঘটন কিছু ঘটবে, সাপের মাথার মানিক আসবে হাতের মুঠোয়। তুলনায় সুকান্তের চেয়ে প্রশান্তকে মা কম মনোযোগ দিয়েছে, এই অভিমান থেকে মুক্ত ছিল না প্রশান্ত। সকলের দিনই একবার অন্তত ফিরে আসে। তেমনি বুঝি এসেছে আজ পাঁজির পৃষ্ঠায়। মা বুঝুন, শুধু বয়সেই নয়, আরো অন্যান্য ব্যাপারেও সুকান্তের চেয়ে প্রশান্ত বড় ছিল। বিদ্যায় না হোক, বুদ্ধিতে। অন্তত চরিত্রে তো বটেই।

অঘটন না ঘটুক, অ-রটন তো রটেছে।

চোয়ালের নিচে মোটা-করা গলার ভাঁজে জোরে ব্লেড ঘষতে ঘষতে প্রশান্ত বললে, 'এখনো তো কই আসে নি। আগে মাঠে নামুক, তারপরেই তো আসল খেলা শুরু হবে।'

দিন শুধু প্রশান্তের নয়, বন্দনারও ফিরে এসেছে। সে ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'বা, এম-এ পাশ!'

'প্রেমে পাশ।'

'শুধু পাশ নয়, ডবল প্রমোশন।' স্বামীর দিকে চেয়ে কুটিল হাসি হেসে বন্দনা চাপা গলায় বললে।

কম খোঁটা সইতে হয় নি বন্দনাকে। লেখাপড়ায় সেই মামুলি ম্যাট্রিক পর্যন্ত, রূপেও তেমন কিছু আহা-মরি নয়। বাইরে যে সবাইকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে সন্তোষ পাবে, তার উপায় নেই মৃণালিনীর। বাইরের জন্যে যাই হোক, ঘরের জন্যেই বা কী আনল? নগদ দু হাজার টাকা, তাতে তো বিয়ের খরচাই কুলোল না। উলটে ধার। আর ফার্নিচারের কী রোগা-ভোগা চেহারা! লরি থেকে নামাতে গিয়ে খাটের ছতরি ভেঙে গেল, আর আলনাটা আগে থেকেই দ হয়ে রয়েছে। বাঁচবার মধ্যে বেঁচেছে ড্রেসিং-টেবলটা, আর তাতে যা একখানা আয়না ফিট করা, তাকালেই মনে হবে যেন মুখচ্ছায়া নয়, চিরন্তন একটি পক্ষীকে দেখছি, যে পক্ষী লক্ষ্মীর বাহন। আর কানে এক তিল, গলায় এক সুতো, হাতে এক চিলতে, আর আঙুলে এক ফোঁটা যা দিয়ে সব দিয়েছে সাজিয়ে, তাকে গয়না বলে না, বলে গয়নার উপহাস। ক্ষুদ্র মনের দন্তবিকাশও বলা যায়।

দেখ, তোমার মা এত খোঁটা দেন, এক সময় কিন্তু পালটা জবাব দিয়ে ফেলব। বন্দনা আগে একবার বলেছিল প্রশান্তকে।

কী জবাব দেবে? সরল কৌতূহলে তাকিয়েছিল প্রশান্ত।

বলব, কী আপনার আই-এ পাশ ছেলে—

বি-এ ফেলটা বলবে না বুঝি ?

যদি অনুমতি করো তো তাই বলব। কী আপনার বি-এ ফেল ছেলে, মার্চেন্ট আফিসের লো-গ্রেড ক্লার্ক, তার জন্যে আর যাই জুটুক, অর্ধেক রাজত্বওলা রাজকন্যা জোটে না। যেমন হাঁড়ি, তেমনি তো সরা বসবে মুখ মিলিয়ে।

আমার উপর দিয়ে বলবে তো ? তা তুমি যত খুশি বলো। যত খুশি ঢালো। শুধু মা-বাবার উপর সরাসরি কটাক্ষ কোরো না।

না, না, তা করব কেন ?

শুধু আমার উপর দিয়েই যখন বলবে, প্রশান্ত তাকিয়েছিল সস্নেহে, তখন তোমাকে আরো একটা জিনিস শিখিয়ে দি। শুধু বি-এ ফেল আর কম মাইনে বলেই ক্ষান্ত হবে না, বলবে, আপনার ছেলের তো অসুখ, পেটে ঘা, পুতুপুতু করে থাকে, তার আবার দর কী বাজারে! তা ছাড়া বিয়ের আগে থেকেই অসুখ, এ কথা বলেছিলেন আমাদের ? তা হলে কে গলা বাড়াত! বিয়েই হত না। যেখানে বিয়েই নেই, সেখানে আবার লেনদেন। ঘোড়াই নেই, তার আবার চাবুকের ধুম!

কি রকম মায়াভরা চোখে তাকিয়েছিল বন্দনা। পালটা জবাব আর দেয় নি শাশুড়িকে। কোনো দিনই দেয় নি। মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে। প্রতিশোধের দিন প্রতীক্ষা করেছে একমনে।

আর মৃণালিনী প্রতীক্ষা করেছে প্রশান্তের বিয়ের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবে সুকান্তকে দিয়ে। শুধু পাত্রীতে নয়, জিনিসপত্রে। কিন্তু এ কী প্রহসন!

ঘরের মধ্যে ছেলে-বউয়ের কথা, ঝাপসায় হলেও, শুনতে পেয়েছে মৃণালিনী। বারান্দায় এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে-করতে এগিয়ে এল দরজার দিকে। বললে, 'যাই হোক, বিয়েই তো হচ্ছে, সামাজিক বিয়ে। বাপ একেবারেই দেবে না, থোবে না, এমন কী কথা! শত হলেও তো মেয়ে।'

'মেয়েকে তো বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।' আয়নায় চোখ রেখেই বললে প্রশান্ত।

'তাই তো কাকার বাড়িতে আয়োজন।' দিন পড়েছে বন্দনার, অনায়াসে সে-ও টিপ্পনী ঝাড়ল।

'যত সব বাজে কথা।' মৃণালিনী ঝাঁজিয়ে উঠল : 'বাপের বাড়িতে জায়গা কম, তাই কাকার বাড়িতে হচ্ছে। মানুষ তো বিয়ের ব্যাপারে ইস্কুল বাড়িও ভাড়া নেয়। তাই বলে সেটা কি মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়া হল? না কি তাই বলে মেয়েকে সালংকারা করে দান করে না বাপ-মা ?'

জিভের ঠেলায় নিচের ঠোঁটের নিচে টিপলি পাকিয়ে তাতে সযত্নে ব্লেড ঘষতে লাগল প্রশান্ত। বললে, 'তা উনি তো সালংকারা হয়েই আসছেন।'

'মিথ্যে কথা।' ইঙ্গিতটা কোথায় মুহূর্তে বুঝে নিয়ে জ্বলে উঠল মৃণালিনী। বললে, 'যাতে কিছু দিতে-থুতে না হয়, তারই জন্যে বাপ-খুড়োর এই কারসাজি। এখন শুনতে পাচ্ছি, উচ্চ আদালতের জজ নয়, নিচু আদালতের। মফস্বলি হাকিম, ধড়িবাজ, সংক্ষেপে কাজ বাগাবার মতলব। নবিস্থি না দিয়েই পুজো হাসিল।'

'জজ নয় মা, ম্যাজিস্ট্রর।'

'বটে? তা হলে তো শুধু-ঘুঘু নয়, রাম-ঘুঘু। নইলে আমি মা, আমি জানি না সুকুকে?'

এবার গরম লাগল বন্দনার গায়ে। ফোস্কার মত ফুলে উঠে বললে, 'বেশ তো ঠাকুরপো গিয়ে তার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা দাবি করুক না, আর শাসিয়ে আসুক, যদি তা না দেয়, এ বিয়ে ভেঙে দেবে।'

'ভেঙে দেবে!' এবার নাকের নিচে কসরৎ দেখাচ্ছে প্রশান্ত: 'তা হলে কোমরে দড়ি পড়বে। বিয়ে করলে নাকে দড়ি হত, না করলে কোমরে দড়ি।'

'এমনিতে বিয়ে না করলে পুলিস জোর করে বিয়ে দেওয়াতে পারে?' স্বামীর থেকে এসব ব্যাপারে আইনকানুন জানা না-জানি তার কত দরকার, এমনি একখানা ছাত্রী-ছাত্রী মুখ করলে বন্দনা।

'পুলিসে কী না পারে!' গালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রশান্ত দেখতে লাগল কাঁটা-খোঁচা কোথাও আছে কিনা লুকিয়ে। বললে, 'বিয়ে হোক বা না হোক, খোরপোষের দায় থেকে আর রেহাই নেই।'

বন্দনা খুশি-খুশি চোখে তাকাল স্বামীর দিকে। বললে, 'ডবল খোরপোষ!'

'আহা কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছে।' মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল। বললে, 'মুখ ফুটে দাবি-দাওয়া নাই বা করল, তাই বলে নিজের থেকে বাপ মেয়েকে কিছু দেয় না? দেবে না?'

'অমন মেয়েকে কোনো বাপেরই দিতে ইচ্ছে করে না।' বন্দনা সংসারের হালে এতদিনে পানি পেয়েছে।

'অমন মেয়েকে মানে?' ক্রুদ্ধ না শুনিয়ে আর্ত শোনাল মৃণালিনী।

'আর বর্ণনা করে বলতে হবে না। দু দিন পরেই দেখতে পাব সকলে। বৃদ্ধের কথা ফলই কইবে ভালো।'

এমন সময়ে বিজয়া এসে সেখানে দাঁড়াল। বললে, 'ওরা কিছু দিক বা না দিক,

আমাদের ছেলের বিয়ে, আমরাই সব দেব বর-কনেকে। ওদের তোয়াক্কা করব না। ওরা না করুক, আমরা উৎসব করব।'

মুহূর্তে কী হল কে বলবে, মৃণালিনী ঘি-পড়া আগুনের মত দাউ-দাউ করে উঠল। বললে, 'অমন ঘর জুড়ে থাকলে উৎসব হবে কি করে? উৎসব! বউ নিয়ে এসে সুকু ঐ কোণের ছোট্ট ঘরটাতে থাকবে আর উনি নিচের বড় ঘরটাতে বহাল তবিয়তে আমিরি করবেন, এই বুঝি উৎসবের চেহারা?'

'কী কথা বললাম আর তার কী উত্তর হল!' বিজয়া মূঢ়ের মত তাকাল বন্দনার দিকে। সংসার-রণাঙ্গনে কে যে কখন কার পক্ষ নেয় বলা কঠিন। কিন্তু বিজয়া স্পষ্ট অনুভব করল, বন্দনা আজ তার দলে। তার বহুদিনের ক্ষতের স্তব্ধতা থেকে সরে গিয়েছে ব্যাণ্ডেজ।

'এই উত্তর হবে না তো হবে কী।' চড়া সুর নরম করল না মৃণালিনী: 'তোমাদের ক্ষমতা আছে, তোমরা কেন আলাদা বাড়ি দেখে উঠে যাবে না? কেন এখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকবে? তোমাদের ছেলেপুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা, তোমাদের কেন কৃপণ-স্বভাব? এদিকে আমার ছেলেপিলের ঘর, ক্রমশই বাড়বে, বড় হবে—নাতি-নাতনি—'

খুঁকখুঁক করে হেসে উঠল বন্দনা।

কান যখন পক্ষে, তখন মাথাও পক্ষে। তাই বলে উঠল প্রশান্ত, 'কেন, যে ঘর পাচ্ছে তা জেলখানার আন্দাজে মন্দ কি। তা ছাড়া কাকিমা যখন বলছে আরো এমিনিটিস, আরাম-উপশম জোগাড় করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, পাচ্ছে এক্সক্লুসিভ ইণ্টারভিয়ু—'

'সেটা আবার কী?' উথলে উঠল বন্দনা।

'আজকাল জেলে চোরেদের খুব আদর। তাদের জন্যে বিড়ি, বড়-তামাক, দাড়ি কামানো, চুলছাঁট, খেলাধুলো, জলসা, চোরদের মনোমত প্রোগ্রাম, মনোমত সব অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেস। সে-এক আনন্দের লহরী। সর্বক্ষণ তাদের বলা হচ্ছে, ভাই সব, আবার ফিরে এসো জেলে। এমন সোহাগ আর পাবে না। যার আবার গুড কণ্ডাক্ট, তাকে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ইণ্টারভিয়ু।' স্ত্রীর দিকে তাকাল প্রশান্ত: 'তার মানে একা ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা। ধারে-কাছে কোনো ওয়াচার থাকবে না, একেবারে নিজের বাড়ির মত ব্যবস্থা।'

'স্ত্রী যে, সব সময়ে সনাক্ত করবে কে?' দিন পড়েছে বন্দনার, হেসে নিল মুখ টিপে।

'আহা-হা, স্ত্রীলোক হলেই হল। স্ত্রীও তো স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয়।'

ক্ষৌরান্তিক পরিষ্করণটা রোজ প্রশান্ত নিজেই করে, আজ ব্লেড-ব্রাশ-বাটি সব বন্দনার দিকে চোখের ইশারায় ঠেলে দিল আর বন্দনাও প্রসন্নদৃষ্টির ইঙ্গিতে সায় দিল সেই সব ধুয়ে-মুছে তুলে রাখবে।

বিজয়া মৃণালিনীকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনার কি তবে তাই ইচ্ছে যে, সুকুর বিয়ে হবার আগেই আমরা চলে যাই ?'

'বিয়ে না ইয়ে !' মৃণালিনীও পরাভূতের চেহারা করল : 'এ শুধু একটা বউ নিয়ে আসা। সঙ্গে না এক টুকরো আসবাব, না এক টুকরো গয়না। নগদ টাকা তো দিনের বেলার স্বপ্ন। সুবীরের কতদিনের সাধ, ছোড়দার বিয়েতে রেডিও পাবে। বাড়া ভাতে ছাই পড়ল সকলের। এ অবস্থায় যদি একখানা ঘর পাওয়া যেত, ফাঁকা ঘর, তা হলেও কিছুটা আসান হত। ভরাডুবিতে অন্তত মুঠো লাভ হত।'

এই ফ্রণ্টে মৃণালিনী-বন্দনা একদিকে। আর যেদিকে কান, সেদিকেই আপাতত মাথা।

সত্যি কাকা-কাকিমা যেন কী ! মোটা মাইনে পায় কাকা, কাকিমাও বাপের বাড়ি থেকে এনেছে ব্যাঙ্ক বোঝাই করে, অথচ কী কঞ্জুসের মত থাকে দেখ না। বিবরের মধ্যে ছুটো ইঁদুরের মত খুঁটে-খুঁটে জীবনধারণ করে। আর, কত রাজ্যের জিনিস একটা ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছে। নিজেদের দম বন্ধ হয়ে যায় না? আমার তো মনে হয়, ঘরটাই বুঝি মারা গেল। আচ্ছা, তোদের ভাবনাটা কী, টাকা জমাচ্ছিস কার জন্যে? পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই তো পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। তার চেয়ে নিজেরা খেয়ে যা না, খাইয়ে যা না! উড়িয়ে-পুড়িয়ে যা না। একটু ভালো ভাবে থাকতে ইচ্ছা করে না, একটু মেলে-ঢেলে, ছড়িয়ে-গড়িয়ে? ঢাউস একটা বাড়ি না করিস, ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট নে না। এজমালি সংসারে নিত্যি বাথরুম নিয়ে ঠেলাঠেলি ভালো লাগে? খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি? ভিজে কাপড় শুকোবার জন্যে রেলিঙ নিয়ে ভাগাভাগি ? আর গল্পের বই আর ম্যাগাজিন— যা কিনা কাকিমার খাদ্য—তা জায়গারটা কোনোদিন পাওয়া গিয়েছে জায়গায়? আর জনে-জনে জিজ্ঞেস করো, সবাই ঘুরে-ঘুরে বলবে একবাক্যে, আমি কী জানি ? ভালো লাগে এসব লোয়াজিমা ? কত জন্মের তপস্যায় ঠিক সময়ে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় রাস্তায়। ইচ্ছে করে না একটা গাড়ি কিনতে, অ্যাশট্রে-ওয়ালা গাড়ি ? আর সিগারেট খেয়ে তার ছাই জানলা দিয়ে বাইরে না ফেলে ভিতরে ট্রেতে ফেলতে? টাকা কি অব্যয়, না শুধু বিস্ময়ের চিহ্ন! টাকা হচ্ছে শুধু ক্রিয়া অসমাপিকা। এবং বলতে লজ্জা কি, আত্মনেপদী। নইলে শুধু কোনো রকমে থাকা, যেমন-তেমন করে

থাকা, মাথা গুঁজে থাকা, টাকাতে লোকের কলঙ্ক। ইচ্ছে করে না গ্যাসের রান্না খেতে? খাবার টেবিলে ফর্সা চাদরের উপর প্লেট রাখতে? সোফায় বসে কার্পেটে জুতো ঘসতে? রেডিওতে খেলা শুনতে? রেফ্রিজেরেটারে আইসক্রিম বানাতে? কলিং বেলে আগন্তুক পেতে? ডিভানে শুয়ে নিওন লাইটে বই পড়তে? কি রকম যেন কাকা-কাকিমারা! এত ঠেকেও শেখে না। ছি-ছি, দিব্যি মানিয়ে-বাঁচিয়ে থাকে। টাকা যার আছে, তার কিসের অত কিন্তু-কিন্তু?

এবার যদি যায়!

ঝটপট ঝটপট করতে করতে বিজয়া নিচে তার ঘরে নেমে এল। হেমেনকে বললে, 'দিদি বলেছে স্বকুর বিয়ের আগেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে।'

দরজার বাইরে ডেকরেটারের সঙ্গে কথা বলছিল হেমেন। বিজয়ার কথা কানে নিল না। বললে, 'হ্যাঁ, একটা মাইক দেবেন। যে যাই বলুক, মাইক না থাকলে গমগম করে না, উৎসব-উৎসব লাগে না। আর, বলছেন, ফুটপাথ ঘেরবার জন্যে থানায় লিখতে হবে। তা লিখে দিচ্ছি। বিয়ের রাত্রে বেকার যুবক আর ঘুঁটে-গোবরের ফুটপাথ রাজোদ্যান।'

ডেকরেটারকে বিদায় দিয়ে ঘরের মধ্যে পুরো স্ফুটিত হতেই বিজয়া আবার তেরিয়া হয়ে উঠল: 'অপমানের একটা সীমা আছে। দু দিন বাদে ছেলের বিয়ে, বলছে কিনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যা, তোর ঘরে থাকবে ছেলে-বউ। আর কিছু না পাই ঘর পেয়ে বুক ভরবে—'

'মাথা খারাপ হলে ওরকম অনেক কথাই বলে থাকে অনেকে। গায়ে মাখতে হয় না। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়।' চেয়ারে বসে মউজ করে এক টিপ নস্যি নিল হেমেন: 'অপমান ভাবলে যন্ত্রণা, পাগলামি ভাবলেই মহাশান্তি।'

'তোমার তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।' মুখচোখ আগুন হয়ে আছে বিজয়ার। বললে, 'আজকেই যে করে পারো একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করো। যত ভাড়া চায়, যত সেলামি। নয়তো সেই যে কে মেমসাহেব পেয়িং গেস্ট রাখে সেখানে গিয়ে উঠব। যাও, খোঁজ করো। নিদেন একটা হোটেলে ঘর নাও। দিশি-বিদেশী যেখানে হোক, যত টাকা লাগুক—'

'দাঁড়াও, হালুইকরের ফর্দটা দেখি।' কী একটা কাগজের টুকরো গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল হেমেন। বললে, 'আমি এখন সরি কি করে? আমার হাতে এখন কত বড় কাজ!'

'কাজ— তোমার কাজ?' মুখ ভেংচে উঠল বিজয়া: 'তোমাকে সকলে কত পোঁছে!'

'পুঁছুক না পুঁছুক, কাজটা তো নির্বাহ করতে হবে। দাদার কাছে গেলুম, দাদা বললেন, তিনি কিছু জানেন না, যে এ কাজ করেছে সে এর ব্যবস্থা করুক।'

'ঠিকই তো বলেছেন।' খাটের উপরে গ্যাঁট হয়ে বসল বিজয়া।

'মোটেই ঠিক বলেন নি। ওটা ক্ষোভের কথা, অভিমানের কথা। নইলে স্বকু ছেলেমানুষ, ও এর কী ব্যবস্থা করবে?'

'তাই তোমাকে মাতব্বরি করতে হবে! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! এতে তোমার কী?'

'আমার কী মানে? দাদার মান, পরিবারের প্রতিষ্ঠা— এ আমি দেখব না? আমি থাকতে সব হেঁটমুখ হয়ে দাঁড়াবে? বাড়ির ছেলের বিয়ে হবে, বউ আসবে ঘরে, আর সমস্ত বাড়ি শোকের চেহারা করে থাকবে?'

'তাই তো উচিত। কী কীর্তি করেছেন ছেলে তা তো আর জানো না।'

'রাখো।' ধমকে উঠল হেমেন। 'বিয়ের মন্ত্রটা চলতি বাঙলায় না কি মৃত সংস্কৃতে, কদিন আগে না পরে, এ নিয়ে বুদ্ধিমানে মাথা ঘামায় না। আমার পাঁঠা আমি যেদিকেই কাটি তাতে লোকের কী বলবার? বই লিখছি আমি, তাতে আমি যদি শেষ পরিচ্ছেদ আগে লিখে প্রথম-দ্বিতীয় পরে লিখি, তা হলে বই কি অশুদ্ধ হবে? বাজারে চলবে না?'

'বাজারেই চলবে।' দাঁতে দাঁত রাখল বুঝি বিজয়া।

'না, সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক করতে হবে, সম্ভ্রান্ত করতে হবে। এমনিতে যেমন জাঁকজমক হওয়া উচিত কোনো অংশে তার ত্রুটি করা চলবে না। ম্যারাপ বাঁধা হবে, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে বাড়িঘর। তুমি নেমন্তন্নের লিস্টিটা দেখ নি বুঝি?'

'তুমি আজ আফিসে যাবে না?'

'না, ছুটি নিয়েছি কদিন। ছুটি না নিয়ে চলবে কি করে? হাত বাড়িয়ে শার্টটা দাও তো, প্রেসে গিয়ে নেমন্তন্নের চিঠিগুলি ডেলিভারি নিতে হবে। তারপর লিস্টি ধরে বেরোতে হবে বিলোতে। দাদা বলেন, যার বিয়ে সে সব ব্যবস্থা করুক। স্বকু সেদিনের ছেলে—ও সব পারবে? কাকে বলতে কাকে বাদ দেবে তার কিছু ঠিক আছে? আমরা যখন মাথার উপর আছি তখন ঝক্কি আমাদের—'

'কত তোমাকে মাথায় করে রেখেছে! এত বড় কাকা, বলে কিনা ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাও বাইরে!'

'কথাটা খুব খারাপ বলে না।' হাসল হেমেন। বললে, 'আমাদের এ ঘরটা পেলে ওদের বেশ ভালো হত, তাতে আর সন্দেহ কি।'

'তবে চলো না, এখুনি চলো না ঘর ছেড়ে।' খাট থেকে উৎসাহে নেমে পড়ল বিজয়া : 'ফেরবার সময় সব ঠিক করে একেবারে একটা লরি নিয়ে এসো।'

'আস্তে। অত উতলা হোয়ো না। যাব, কদিন পরে যাব। গোলমালটা চুকুক, আর একটা বাড়ি-টাড়িও দেখে ফেলি এর মধ্যে। কদিন ওদের কষ্ট।' শার্টটা নিজেই টেনে নিয়ে পরল হেমেন : 'সত্যি উপরের ঐ ছোট ঘরটায় বেঞ্চিমাফিক দুটো চিলতে তক্তপোশ সরিয়ে দিলেও বড়সড় একটা খাট পড়ে না। তা কি আর করা, যেমন পড়ে তেমনি মাপেরই অর্ডার দিয়ে দিলাম।'

'আর বিছানা?'

'উপায় কি, ও-বাড়ি থেকে যখন কিছুই দেবে না তখন আমাদেরই দিতে হবে। কিন্তু, সত্যি, দোকান থেকে কেনা নতুন ওয়াড়-দেওয়া লেপ বালিশ বিছানা মশারির কী অপূর্ব গন্ধ বলো তো! তার কাছে ফুলের গন্ধ লাগে না।' চৌকাঠের বাইরে গিয়েছিল, আবার ফিরল হেমেন। বললে, 'আচ্ছা, তোমার জন্যে কী আনব বলো? তুমি কী দেবে বউকে?'

'এই কলা দেবে।' এবার একটা ম্যাগাজিন নিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল

'ছি, তুমি কেন নিষ্ঠুর হবে? নতুন বউ—ভাবো তো সে কেমন এক পবিত্র মূর্তি—তাকে তুমি একটু অভ্যর্থনা করবে না? সেই তুমি যে প্রথম এসেছিলে নতুন বউ সেজে, তুমি চাও নি সকলে তোমাকে আদর করুক, কেউ কেউ দিক কিছু সোনাদানা, আর বাকি সব শাড়ি আর শাড়ি, বই আর বই—'

চোখের কোণ থেকে কি রকম করে তাকাল বিজয়া।

'আমি বলি কি, তোমার নামে একটা নেকলেস কিনে আনি। আর সেটা তুমি—আহা, কী জানি নাম, তুমি ওকে পরিয়ে দাও নিজের হাতে।'

'জানি না। তোমার যা খুশি তাই করো।' খাটের উপর পা টান করে দিল বিজয়া।

'তোমার যা খুশি তাই করো।' এ কথা বনবিহারীও বললেন নরনাথকে, যখন নরনাথ বললে, কাকলিকে দু দিন আগেই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কাকলি এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চুপ করে রইলেন বনবিহারী।

'আপনি এমন একটা কাণ্ড করছেন, যে শুনবে সেই টিটকিরি দেবে। কী সাংঘাতিক সেকেলে আপনি! কাকলির অপরাধ সে নিজে পাত্র বেছেছে, সেটা অপরাধই নয়, আর সে পাত্র সম্প্রতি বিত্তহীন, সেটা তার নিজের রুচি, নিজের নির্বাচন।'

'এসব কথা অনেক হয়ে গিয়েছে।' বিরক্তমুখে বনবিহারী বললেন, 'আমি সেজন্যে চুপ করে থাকি নি। আমি ভাবছিলাম আশীর্বাদ করবার আমার অধিকার আছে কিনা—'

'সে কী কথা? আপনি বাপ—'

'ভাবছিলাম মানুষেরই আছে কিনা। নেই। মানুষ আবার কী আশীর্বাদ করবে! শুধু ভগবান করবেন।'

'বেশ তো তাই বলুন না, ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন।'

নরনাথের কথার পুনরুক্তি করলেন বনবিহারী।

ইন্দিরাও এসেছে। নরনাথের সঙ্গে সেও পিড়াপিড়ি করতে লাগল গায়ত্রীকে।

গায়ত্রী বললে, 'মেয়ের বিয়ে মা দেখে না।'

'সম্প্রদান হয়ে যাবার পর দেখে।'

'কোনো সময়েই দেখে না। চোখ বুজে থাকে।' প্রাণপণে চোখ বুজল গায়ত্রী।

কাকলি মাকে প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'আশীর্বাদ করুন।'

'মুখ ফুটে পারব না বলতে।' চোখ খুলল না গায়ত্রী: 'তবে অন্তর্যামী মনের কথা কিভাবে বুঝে নেবেন তা তিনিই জানেন।'

কাকলিকে নিয়ে সস্ত্রীক চলে যাচ্ছে নরনাথ, বনবিহারী চেঁচিয়ে উঠলেন: 'সম্প্রদান করবে কে?'

'দেবু, দেবনাথ। তাকে অনেক করে পটিয়েছি।'

১৮

বিনতা সাজাচ্ছে কাকলিকে। পুঙ্খপুঙ্খ করে।

'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করল কাকলি।

'এর আর বেশি নেই।' বললে বিনতা, 'যতই চড়াচ্ছি ততই কম পড়ছে মনে হচ্ছে।'

'বউ-বউ লাগছে তো?' হাসল কাকলি: 'না কি অ্যাকট্রেস-অ্যাকট্রেস?'

'লক্ষ্মী-লক্ষ্মী লাগছে।' কাকলির চিবুকের নিচে হাত রেখে মুখখানি উঁচু করে তুলে ধরল বিনতা।

'সে কি? খুব ন্যাকা-ন্যাকা দেখাচ্ছে বোধ হয়? না, তা হবে না। বেশ একটা তেজী-তেজী কালী-কালী ভাব এনে দে।'

'কালীর ভাব ধরতে কতক্ষণ?' হাসল বিনতা: 'ঠোঁটে রঙ বা রক্ত তো আছেই। গায়ের আভাটি শুদ্ধ করে বলতে গেলে শ্যামাই। এখন উপর-পাটি দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেই একেবারে চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।'

'নিচের ঠোঁট কেন, জিভ বের করে জিভ কামড়ে ধরব।' সংশোধন করতে চাইল কাকলি।

'না, না, সে একটা ঘোরতর লজ্জার অবস্থা।' দুই চোখে বিদ্যুৎগর্ভ ইঙ্গিত পুরে বিনতা বললে, 'তা হলে সুকান্তকে এসে তোর পায়ের তলায় শুতে হয়। আর, তোর গায়ে এসব সাজসজ্জাও এক তন্তু রাখা চলে না।'

বিনতার হাতে মিষ্টি করে চিমটি কাটল কাকলি। বললে, 'দরকার নেই কালী সেজে। কালীকে যে কি করে আবার ভদ্রকালী বলে বোঝা কঠিন। দরকার নেই, কৃতার্থ-কৃতার্থ মুখ করেই বসে থাকি।'

'আয়নায় দেখবি একবার?' উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল বিনতা। বললে, 'তুই নিজেও জানতিস না তোর মুখে কত শ্রী ছিল কত আনন্দ—'

'সত্যি?'

'এমনি একটা দিনের ছোঁয়াচ না লাগলে সে প্রচ্ছন্ন বিকশিত হয় না।' ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল বিনতা। বললে, 'যাই, একটা আয়না নিয়ে আসি।'

'না, না, যেতে হবে না, আয়না এখানেই আছে।' বাধা দিল কাকলি।

'বা, কই, এখানে আয়না কোথায় ?'

নিবিষ্ট চোখে বিনতার দিকে তাকাল কাকলি। বললে, 'তোর মুখই আমার আয়না। তোর মুখেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিজেকে।'

স্থির হল বিনতা। তার মুখে কি তৃপ্তির লাবণ্য আঁকা, প্রাপ্তির সৌভাগ্য ? তার মুখ কি বিজয়িনীর ? আনন্দিনীর ? কাকলি কি তাই দেখল ? না কি বুঝে-সুঝেও ইচ্ছে করেই বিদ্রূপ করল তাকে ?

বিষাদের মেঘ উড়ে এসে প্রায় ঢেকে দিচ্ছিল বিনতাকে। এমন সময় নিচে রব উঠল, বর এসেছে, বর এসেছে। সাধ্য কি কেউ স্তিমিত থাকে, শিথিল থাকে, উচ্চকিত না হয় ! ক্ষিপ্র হাতে একটা শঙ্খ কুড়িয়ে নিয়ে বিনতা ফুঁ দিল।

আওয়াজটা বেরুল না নিটোল হয়ে। কেমন বিকৃত হয়ে গেল। কে একটি আগন্তুক মেয়ে বিনতার হাত থেকে শঙ্খটা কেড়ে নিয়ে তুলল নির্মল ধ্বনি। ফুঁ দিতে-দিতে নিচে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। যেন ধিক্কার দিয়ে গেল বিনতাকে।

খান তিন ট্যাক্সি করে এসেছে বর আর জন দশ বরযাত্রী। নরনাথ যে অনুরোধ করেছিল সংক্ষেপে সারতে, তা, ওরা লোক ভালো, অগ্রাহ্য করে নি। নিজেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে বনবিহারীর অভিলাষ। কোনোরকমে দায় সারা।

'হ্যাঁ, ডিস খাইয়ে দেবে।' বলেছিল বনবিহারী : 'যা না বিয়ে তার আবার খাওয়া।'

'তবু বরযাত্রী যারা আসবে তাদের ভরপেট না খেতে দিলে কি রকম দেখায় !' নরনাথ আপত্তি করলে।

'কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।' বনবিহারী বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলেন : 'তবে তোমার শখ হয় ভাণ্ডারা বসাও। গায়ে পড়ে নিজের উপর ঝক্কি নিয়েছ, নিজেই নেমন্তন্ন করে ডেকে আনছ লোকজন, নিজেই ঠেলাটা সামলাও এবার। নিজের থলের মুখ খুলে দাও। জন পঞ্চাশ লোকের ডিসের খরচ যা পড়তে পারে আমি তাই দেব।'

'কিন্তু', মাথা নিচু করে কানের পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে নরনাথ বললে, 'বিয়ের কনের গায়ে দু একখানা নতুন গয়না না উঠলে কেমন দেখায় ! সোনা অল্প হোক, তবু কগাছ চুড়ি, এক ছড়া হার আর এক জোড়া বালা—আর কানে—'

গর্জে উঠলেন বনবিহারী : 'মাথায় মুকুট দেবে না, পায়ে পঞ্চম ? তোমার যা খুশি তাই করো। আমাকে কিছু বলতে এসো না। গয়না-ফয়না হবে না।'

'সে কি ? খালি হাতে-গায়ে বিয়ে হবে ? কখনো হয় ?'

'যেমন খালি হাত ছেলে তেমনি খালি হাত বউ।' চেয়ারের পিঠে ঢলে পড়লেন বনবিহারী : 'তোমার দরদ হয় তুমি কিনে দাও।'

'আমার কথা আমার কাছে থাক। আপনি বলেছিলেন, নমো নমো করে ব্যাপারটা সেরে দিতে, আর সে বাবদ সামান্য যা খরচ লাগে তা দিয়ে দেবেন।'

'নমো নমো করে সারা মানে কি গয়না, না ভোজ, না ছাদজোড়া প্যাণ্ডেল, না আলো-বাজনার ধুমধাড়াক্কা ?' হুমকে উঠলেন বনবিহারী : 'নমো নমো করে সারা মানে বিয়ে ও সেই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি বিধিমত সম্পন্ন করা। কী বলেছি আমি ? বলেছি যৎসামান্য যা খরচ লাগে তা পিতৃপুরুষদের খাতিরে দিয়ে দেব।'

'তাই তো দেবেন।' দ্বিধাহীন সায় দিল নরনাথ। বললে, 'তবে কী যে কার সামান্য তার কোনো স্থির মাপ নেই।'

'না, না, আছে। আমি সবসুদ্ধ শো দুই টাকা তোমাকে দেব। এর এক আধলাও বেশি নয়। তাই দিয়েই তুমি ম্যানেজ করবে।'

'করব।'

'তবে তুমি যদি এখন বাজি পোড়াও, জলসা বসাও, ম্যাজিক লাগাও, বাইজি নাচাও, সে খরচা তোমার।'

'তা তো বটেই।'

'মোট কথা, দু শোর চেয়ে বাড়তি যদি খরচ হয় সে দায়িত্ব আমার নয়।'

'বলছি তো, নয়, দায়িত্ব আমার।'

'তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কি, এক্ষুনি—এক্ষুনি টাকা চাই ? দাঁড়াও, দিয়ে দিচ্ছি।' হাতের কাছেই টেবিল, টানার থেকে চেক বই বার করলেন বনবিহারী।

'না, টাকার জন্যে তাড়া কিসের ?' নরনাথ কণ্ঠস্বর আর্দ্র করল : 'আমি বলছিলাম কি, গায়ে যদি ছিটেফোঁটা গয়না না থাকে তবে কেমন অশুভ-অশুভ দেখায়।'

'অশুভই তো, অশুভই তো দেখাবে। কিন্তু', ধীরে-ধীরে আবার পিঠ তুললেন বনবিহারী, বললেন, 'কিন্তু, কেন, ওর আগে যেসব গয়না ছিল তার কী হল ? তাইতেই একটু পালিশ দিয়ে দিতে বলো না স্যাকরাকে।'

'ওসব গয়না নেই।'

'নেই ? কী হল ? গেল কোথায় ? ঐ ছোঁড়াটা পাচার করেছে বুঝি ?'

'না। কাকলি যখন যায় আমাদের বাড়ি, তখন বউদি বললেন, গায়ের গয়নাগুলি খুলে দিয়ে যেতে। এক-এক করে তাই খুলে দিয়ে গেল কাকলি।'

'খুলে দিয়ে গেল? তা ভালোই করল।' সোনাদানা থাকা মানেই ছোঁড়াটার পকেটখরচার সুবিধে করে দেওয়া। তুমি বরং কাঁচ বা প্লাস্টিক বা সেলুলয়েডের কিছু কিনে দিও।'

'তা না হয় দিলাম। কিন্তু অন্তত একখানা বেনারসি শাড়ি চাই তো।'

'কী শাড়ি?'

'বেনারসি। যা পরে বিয়ে হবে।'

'রাখো। বেনারসি না হরিদ্বারি! অত ঠাটে কাজ নেই। চলতি যা শাড়ি আছে তাই, কাচাবার সময় না থাকে, ইস্ত্রি করে নিতে বলো।'

'সেই সব সাবেকি আটপৌরে শাড়িই বা কোথায়? একবস্ত্রে তো বেরিয়ে গেল কাকলি।'

'বেশ বলেছ। রাস্তায় বেরুবার সময় কয় বস্ত্র আবার পরে নেয় লোকে?'

'ইন্দিরাকে পাঠিয়েছিলাম ওর পুরোনো কাপড়জামাগুলো নিয়ে যেতে। বউদি দিলেন না কিছুতেই।'

"ঠিকই করলেন। বিয়ের পরে পুরানো বস্ত্র আবার কে পরে? তারপর আবার জুতো চাই না?'

'চাই-ই তো! স্ট্র্যাপ-আলগা সামান্য স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জুতোর দাম তো বেশি নয়। কিন্তু শাড়ি—' ঢোঁক গিললেন নরনাথ: 'তা ছাড়া একটা বাক্সও তো দরকার।'

'বাক্স?'

'ট্রাঙ্ক নয়, সুটকেস। না হলে জিনিসপত্র রাখবে কোথায়?'

'যে বাঁদরটাকে বিয়ে করছে তার মাথায়।' বনবিহারী কলম কুড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। দু শো টাকা দেব বলেছি তাই দেব এরই মধ্যে যা পারো কিনে-কেটে দাও। না পারো, হবে না, দেবে না। মেয়ের আমার শখ কত! গায়ে গয়না দিয়ে বেনারসি পরে বিয়ে করতে বসবেন।'

লিখে সই করে চেকটা দিয়ে দিলেন নরনাথকে।

কাঁপা-কাঁপা হাত, চোখও ঝাপসা, কোথাও আবার ভুলত্রুটি থাকল কিনা খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে চেকটা নরনাথ মেলে ধরল চোখের সামনে।

যা ভেবেছিল, তাই। মারাত্মক ভুল করেছেন বনবিহারী। নামে তারিখে দস্তখতে ভুল নয়, মূলেই ভুল, মানে অঙ্কেই ভুল। দু শো লিখতে দু হাজার লিখে ফেলেছেন।

এ করছেন কী, এমনিতর একটা বিস্ময়ের আওয়াজ বার হতে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে, নরনাথ তাকাল বনবিহারীর দিকে। দেখল যুক্ত ঠোঁটের উপর বনবিহারী তাঁর ডান হাতের তর্জনীটি রেখেছেন খাড়া করে। কথা বোলো না। চেপে যাও। পাশের ঘর যেন না পায় শুনতে।

'আর', নরনাথের কানে-কানে বলার মত করে বললেন, 'কাকলি যেন বোঝে যা কিছু হচ্ছে সব তোমার খরচে। তোমার বদান্যতায়।'

কিন্তু দু হাজার টাকায়ই বা কতদূর কী হবে! তিন পদ গয়না আর শাড়ি ইত্যাদিতেই তার নাভিশ্বাস। সানাই এসেছে বটে কিন্তু নবত হয় নি, রোয়াকের এক কোণে বসেছে কোনোমতে। ম্যারাপ উঠেছে বটে কিন্তু দোতলার খোলা ছাদটুকু ঘিরে। আলো জ্বলেছে বটে, কিন্তু তার রঙ-চঙ নেই, জেল্লা-জমক নেই। খেতে দিতে কলাপাতা নয়, মাটির থালা। ঝাল-ঝোল নয়, শুকনো। নমো-নমো।

এরই মধ্যে নরনাথের ইচ্ছে ছিল একটু চড়া স্বর বাঁধে। না হয় কিছু খরচই হল তার পকেট থেকে। কিন্তু, চিরন্তন কণ্টক, তারও আছে পাশের ঘর। তোমার নিজের মেয়ের বেলায় এমন খরচ-ভাগাভাগির বদান্য লোক যদি না পাও? তখন যদি তোমাকেই সমস্ত টানতে হয়? তা ছাড়া, ভাস্বরঠাকুরের মান রাখতে এই উৎসব স্তিমিত রাখা দরকার তা তুমি ভোলো কি করে? ইন্দিরাও কম যায় না।

তাই বলে চেয়ারে-টেবিলে কি বাসর হয়? প্রশস্ত একটা শয্যা দরকার। বরাদ্দ বাজেটে না কুলোলেও নরনাথ নিজের পয়সায় কিনে এনেছে বিছানা। বিছানা ছাড়া আবার বিয়ে কি! পেইস্ট ছাড়া টুথব্রাশ কি!

এ নিয়ে কম তড়পায় নি ইন্দিরা: 'কার্পেটের উপর একটা ফর্সা চাদর পেতে দিলেই হত! নয়তো অত দামি শাড়ি কেনবার কী হয়েছিল? গয়নার মধ্যেও তো এদিক-সেদিক করা যেত অনায়াসে। তোমার কী মাথাব্যথা? তুমি কেন জরিমানা দিয়ে মরো?'

নরনাথ বললে, 'কাল সকালে যখন বরের বাড়ির লোক আসবে তার থেকে শয্যাতুলুনি বাবদ মোটা টাকা আদায় করে নিও। বিছানার দাম উশুল হয়ে যাবে।'

'এ তো খোলা শয্যা, এর আবার তুলুনি কী!' ইন্দিরাও দলের বুলি ধরল: 'কেউ আসবেও না, টাকাও দেবে না। সুতরাং এ বিছানাটা থাকবে বাড়িতে, সংসারে, যাবে না ওদের সঙ্গে।'

'ভালোই তো। তুমি তোমার সান্ত্বনা পেলেই হল।'

নরনাথও পাচ্ছে তার সান্ত্বনা। আহা, ওরা মিলুক। ওদের কটি দিন-রাত্রি সুখের হোক।

সকলের সঙ্গে বিনতাও দেখতে গেল বর। এমনি ভদ্রলোক শুনলে, অমুকবাবু শুনলে কি যেত? বর শুনলেই সকল নারীর মন কিশোরী হয়ে যায়। তুমি ধাড়ি ধিঙ্গি, বুড়ি, তুমি কেন দেখতে এসেছ, এ কেউই প্রশ্ন করে না, আর সকলেই চোখে বেশ একটু আবেশ নিয়ে দেখে। বিনতাও দেখল।

ফিরে এসে কাকলির পাশ ঘেঁষে বসল বিনতা। বললে, 'কে আরেকজন নতুন লোক দেখলাম।'

'নতুন লোকই তো দেখবি।' সুন্দর করে হাসল কাকলি।

'মনে হচ্ছে সুকান্তই নয়।'

'ওকে তুই কখনো দেখেছিস?'

'বা, দেখেছি বৈকি।'

'কবে দেখলি?'

'ওর পাড়ায় ঘুরে ওর বাড়ির সামনে রাস্তায় ওকে দেখে নিয়েছি একদিন। যাকে তুই ভালোবাসলি, সম্রাট করলি, তাকে একবার দেখব না চর্মচোখে?'

'তবে এখন যাকে দেখলি তাকে সেই সম্রাট-সম্রাট লাগছে না?'

'মোটেও না। সম্রাটের চেয়েও সুপুরুষ লাগছে।'

চিন্তিত হবার মত মুখ করল কাকলি। বললে, 'তবে, কে জানে, কে-না-কে এসেছে। বর, না, চোর?'

'যেই আসুক, সুকান্ত নয়। আরেক পুরুষ।'

'তবে ডাকাত? ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস যে।'

'সত্যি বলছি। আরেক রকম চেহারা।'

'শুভদৃষ্টির সময় চোখ বড় করে দেখব ভালো করে। যদি সুকান্ত না হয় মালা দেব না। নেমে যাব পিঁড়ি থেকে।'

শুভদৃষ্টির সময় চোখ বড় করে চেয়ে দেখল কাকলি। বর দাঁড়িয়ে, আর কাকলি পিঁড়িতে বসা, তাকে দু-জন জোয়ান ছেলে—এমন সময় জুটে যায় নওজোয়ান—পিঁড়ি সুদ্ধ ঠেলে তুলেছে বরের মুখোমুখি। বর-কনের মাথার উপর নিভৃতির আচ্ছাদন। বিনতা ঠিকই বলেছে, এ আরেক সুকান্ত। সুকান্তের আরেক উচ্চারণ, আরেক উদ্ঘাটন। আরেক উপস্থিতি। সুকান্তের চেয়েও সুন্দরতর সুকান্ত।

রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করলে এ সুকান্তকে সে কোথায় পেত, দেখত কবে? তখন

তার পোশাকই বা কি এমনি হত কোনো দিন ? তখন নিশ্চয়ই তার পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে হাফ-হাতা বুশ-শার্ট, পায়ে কাবলি। সে এক নচ্ছার চেহারা। এখন তার পরনে কোঁচানো লম্বা ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের বিন্দু—আহা, কে না জানি তাকে সাজিয়ে দিয়েছে— দেখাচ্ছে জীবনের সে এক বরদ ও শিবদ মূর্তি, আনন্দের অনন্ত নিলয় ! উল্লাস-বিলাসের উদ্বেল সমুদ্র !

মৃদু রেখায় হাসল কাকলি। সেই যে প্রথম প্রশ্ন করেছিল চিঠিতে এ যেন সেই হাসি। তারপর ?

সত্যি কী সুন্দর সেজেছে কাকলি, কী সুন্দর বসেছে কোল পেতে ! এমন গহন গভীর হাসিটি সে হাসতে পারত এ কে ভেবেছিল ? রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করলে কে পেত এই অগাধের স্বাদ, এই প্রশান্তির সুষমা ? সমস্ত দিন কাকলি উপোস করে আছে নিশ্চয়। তাই শরীরে এই ক্লান্তির পবিত্রতা। কী সুন্দর লজ্জা ফুটেছে চোখে ! কোন রূপসাগরে ডুব দিয়ে এই অরূপরতন সে কুড়িয়ে পেত ! একটি কণাও যেখানে হারায় না সেই আনন্দের অব্যয় ধাম হয়ে বসে আছে। এই বসে থাকাটি আর দেখত কে !

তারপর ? তারপর কী জানতে চাও ?

তারপর রহস্যসিন্ধুপারে বসে উপলখণ্ড কুড়োনো। উপলখণ্ড, পাথরের টুকরো ? না, না, মুক্তো কুড়োনো। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তোর জন্ম, সেই মুক্তো। স্নিগ্ধকান্ত অমল মুক্তো !

সত্যি, আজ রাত্রিও ঘন হবে ? স্তব্ধ হবে ? নিবিড় হবে রুদ্ধশ্বাস নিভৃতি ? আর পরমের সীমানায় যে ভাষা শোনা যায় না সেই ভাষাতেই কথা কইবে অন্ধকার ?

সম্প্রদান হয়ে গিয়েছে, বিয়ের আসরে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত।

'কখন এলে ?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'এই তো—'

'সোজা এখানে !'

'তা ছাড়া আবার কি !'

'তা হলে তুমি বরপক্ষের নও, তুমি কন্যাপক্ষের।'

কাকলি তাকাল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে, 'যে পক্ষেরই হই আমরা ইতরজন, আমাদের মিষ্টান্নে সন্তোষ।'

'বরেন এসেছে ?'

'কই, দেখি নি তো।'

'এখানে আসবে না। বউভাতে আসবে।' নিজেই জল্পনা করল সুকান্ত।

'তাই সম্ভব। কিন্তু জানো এখনো বাড়তি অ্যালাউয়েন্স কিছু দিল না।' দীপঙ্কর বিষাদের সুর আনল : 'তুমি এত করে বললে তবু কান পাতল না।'

'তবেই তো বুঝছ আমার কত বড় বন্ধু!'

'না, তুমি জানো না, যদি হয়, তোমার কথাতেই হবে। বউভাতে যখন সে আসবে তোমাদের বাড়ি তখন তাকে একবার রিমাইণ্ড করে দিও।'

এসব কথা বলার সময় ও স্থান বেশ বেছে নিয়েছ তোমরা। এমনি তিরস্কার পুরে কাকলি তাকাতেই দীপঙ্কর চুপ করল।

কিন্তু বউভাতের দিন সুকান্তদের বাড়িতেও বরেন অনুপস্থিত।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করল দীপঙ্করকে, 'বরেন আছে তো কলকাতায়? না কি বাইরে যাবার কথা আছে?'

'না, না, এখানেই আছে, আফিস করেছে। বাইরে যেতে হলে আমাকেই তো সব টিকিট-ফিকিট বন্দোবস্ত করতে হত। যায় নি কোথাও।'

'বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করি নি বলেই হয়তো আসে নি।'

'তাই হবে।'

'তবেই দেখছ কত বড় বন্ধু! কত বড় মুরুব্বি ধরেছ আমাকে।' কষ্টে হাসল সুকান্ত।

'আমি যা ধরেছি ঠিকই ধরেছি।' দীপঙ্কর বিজ্ঞের মত মুখ করল : 'নিশ্চয়ই না-আসার গ্রহণযোগ্য কারণ আছে।'

'থাকলে আছে না থাকলে নেই।' সুকান্ত বিরক্ত হয়ে বললে।

'তাই আবার যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে, কথা হবে, আমাকে ভুলে যেও না। ভুলো না আমার বস্তির চেহারা!'

বউভাতের তিন দিন পর নিচে, রান্নাঘরে, সকালে, বন্দনার সঙ্গে রান্না করতে গেছে কাকলি, হঠাৎ শুনতে পেল উপরে কে কাকে মারছে।

ভয় পেল কাকলি। জিজ্ঞেস করলে, 'কী হচ্ছে দিদি?'

এক নিশ্বাসে বুঝতে পেরেছে বন্দনা। বললে, 'ঠাকুরপো সুবীরকে মারছে।'

কেন মারছে কাকে জিজ্ঞেস করবে! দুরুদুরু বুকে উন্মনা হয়ে রইল কাকলি। ভাবল নিজেই একবার উপরে যাবে নাকি, সব জেনে-বুঝে দেবে নাকি মিটিয়ে! নতুন বউয়ের পক্ষে সেটা সুষ্ঠু হবে কিনা কে বলবে! এ নিয়ে সংসারে আর কোথাও চাঞ্চল্য নেই। এমন ঘটনা যেন মোটেই আকস্মিক নয়।

নিত্যিকার পড়ার ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছে সুবীর। সুকান্ত বলে দিয়েছে, খবরদার, তোর বইখাতার জঞ্জাল নিয়ে আর ঢুকতে পাবি না এ ঘরে। ঢুকবি তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।

সেই আদেশ পালন করে নি সুবীর। সুকান্তের চেয়ারটেবিলে বসে বইখাতার ভুর নিয়ে দিব্যি পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

'এখানে এসেছিস যে? বারণ করি নি?'

কথা কানেও তুলছে না সুবীর। একটা খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী লিখছে তো লিখছেই। তার মাথা ধরে নেড়ে দিয়ে সুকান্ত বললে, 'এ তোর টেবিলচেয়ার?'

'আমার টেবিলচেয়ারও তো এই ঘরে ছিল। কে এক নতুন লোক এসে সব ওলটপালট করে দিল।'

'মুখ সামলে কথা বল বলছি।' সুবীরের মাথায় গাঁট্টা মারল সুকান্ত: 'যা এ ঘর থেকে।'

মুখ তুলে সুবীর বললে, 'আমাকে কোথাও পড়তে হবে তো?'

'যে ঘরে তোর শোবার জায়গা হয়েছে, সেই মার ঘরে পড়বি। ওঠ, ওঠ বলছি শিগগির—'

'মার ঘরে টেবিলচেয়ার ফেলবার জায়গা নেই।' আবার লেখায় মন দিল সুবীর।

'জায়গা নেই তো মাটিতে বসে পড়বি।'

'তুমি পড়ো গে।'

আর কথা নেই, সুকান্ত সুবীরের মাথায় প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসল। এক হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। শেষ পর্যন্ত আরেক হাতে সুবীর তার বইখাতাগুলো গুটিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হেঁচকা টানে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

'মুখের উপর কথা! পাজি, অবাধ্য ছেলে!'

'মার ঘরে পড়তে গেলে ছোড়দি চেঁচিয়ে ওঠে।' কান্নাভরা গলায় ফুলে-ফুলে উঠল সুবীর: 'বলে চেঁচিয়ে পড়লে তার ডিস্টার্ব হয়।'

'আহা, কী না মেয়ের পড়া, তার আবার ডিস্টার্ব!'

'কেন, মেয়ের পড়া বুঝি পড়া নয়?' যে প্রতিপক্ষ সেই ছোড়দির হয়েই কথা বললে সুবীর: 'কেন, ছোড়দির বুঝি আর বি-এ এম-এ হতে নেই? যত পাশ তুমি ঐ একজনকেই দেখেছ?'

আরেক পশলা চড় মারল সুবীরের উপর। সুকান্ত বললে, 'যা, দাদার ঘরে যা না।'

'দাদার ঘরের বিছানাই এখনো তোলা হয় নি। মশারির নিচে ঝণ্টু-সেন্টু ঘুমুচ্ছে—'

'তবে নিচে যা, গোল্লায় যা—'

'তুমি যেমন গিয়েছ।'

এমন সময় মৃণালিনী এল। বললে, 'নিচে কাকার ঘরে পড়বি। সেখানে অনেক জায়গা। কোণের দিকে দিব্যি তোর টেবিল পড়বে।'

মা যে তার দিকে, অর্থাৎ সুকান্তের ঘরেই যে সুবীরকে পাঠাচ্ছেন না আশ্বস্ত হল সুকান্ত। দীপ্ত স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। সকলকেই একটু-আধটু ত্যাগ না করলে চলবে কেন?'

অতএব বইখাতা কুড়িয়ে নিয়ে সুবীর নিচেই নেমে চললে। আর সে নির্বিবাদ প্রবেশ পায় তা দেখবার জন্যে পিছু নিল সুকান্ত। অদূরে মৃণালিনী।

সিঁড়ির উপর থেকে মৃণালিনী বললে, 'হাঁ, ঐ ঘরটাই সবচেয়ে ফাঁকা। ছেলেপিলের ঝামেলা নেই, নেই পড়াশোনার গোলমাল। তা একজনের পড়া তো শুধু নভেল পড়া, ম্যাগাজিন পড়া। তার ক্লাশ তো আসলে দুপুরে গড়ানোর আগে। এখন কি! মর্নিং ক্লাশের জন্যে ঘর তাই খালি পেতে পারে সুবীর।'

বাহিনী নিচে এসে পৌছুবার আগেই মুখের উপর ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিল বিজয়া।

১৯

সুকান্ত যে সুবীরকে মারল নিচে থেকে দৃশ্যটা দেখে নি কাকলি। তবু বেশ ভেবে নিতে পারছে তার মুখের চেহারা কিরকম আরেকরকম হয়ে গিয়েছিল। যে-রকমটি কোনোদিন সে দেখে নি, হয়তো বা কল্পনাও করে নি। হয়তো চোয়ালের হাড় বেঁকে গিয়েছিল শক্ত হয়ে, দাঁতের উপর বসেছিল এসে দাঁত আর চোখের তারা দুটোও স্বস্থানে সুস্থির ছিল না। ভাগ্যিস দেখে নি সে মুখ। যেন না হয় দেখতে।

আহা! নিজেকেই নিজে আবার শাসন করল কাকলি। একটা আস্ত, জ্যান্ত পুরুষমানুষ সময়বিশেষে ক্রুদ্ধ হবে না? সব সময়েই প্রশান্ত-প্রসন্ন হয়ে থাকবে? মাঝে-মাঝে খেপে উঠবে না, জ্বলে উঠবে না? না, না, রাগ চাই বৈকি। যে পুরুষে রাগ নেই সে পুরুষে স্বাদও নেই। কামার্ত মুখ যদি সুন্দর, ক্রুদ্ধ মুখও সুন্দর।

কিন্তু, তাই বলে, ছেলেটাকে মারলে কেন নির্মমের মত? ও পড়বে কোথায়? এতদিন ঐ ঘরেই তো পড়ে এসেছে, পরিচিত পরিবেশে। আজ যদি ওকে উৎখাত করে দিয়ে থাকো, ওকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে তো! তা নয়, উলটে অর্ধচন্দ্র। কেন, বাপু-বাছা লক্ষ্মী-সোনা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠানো যেত না অন্যত্র? স্বার্থের কাছে হৃদয় নেই, তাই বলে সত্যের কাছেও কি বিচার নেই?

তা ছাড়া, উৎখাত তো রাত্রে। দিনের বেলায়, সকালবেলায়, পড়তে দিতে আপত্তি কী! টেবিলচেয়ারে এখুনি কী দরকার সুকান্তর! কতক্ষণ পরেই তো বেরিয়ে যাবে টিউশানিতে। ও, হ্যাঁ, সপ্তাহে তিন দিন সকাল, আজকে বুঝি অফ—ছুটি। তা, বেশ তো, আজ সকালে সুকান্ত থাকলই না হয় বাড়ি, সুবীরেরও বা কতক্ষণের জন্যে পড়া! এক ঘণ্টা? দু ঘণ্টা? এই দু ঘণ্টা ঘর ফাঁকা না রাখতে পেলে কী এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হত! ছি ছি, কিরকম বলছিল মায়ের কাছে: 'নতুন বিয়ে হয়েছে, বউয়ের একটা প্রাইভেসি থাকবে না?' ছি ছি, কী প্রসঙ্গে কেমন কথা! ঘরের দরজায় মোটা করে পর্দা ঝুলিয়েছে সুকান্ত, তা বেশ করেছে, কিন্তু সকালে-বিকালে কখনো সে পর্দা গুটোনো যাবে না, অর্ধায়িত শীর্ণায়িত করা যাবে না, এ কী অত্যাচার! ঘুম থেকে উঠে বেলা না বাড়তে এখুনিই আবার প্রাইভেসি কী! সুকান্ত বোধ হয় ভেবেছে রান্নাঘরে খানিকক্ষণ থেকেই ঘরে আসবে কাকলি, অনভ্যস্ত শরীরকে আরাম দেবার জন্যে, আর সেই শৈথিল্যের সুযোগে সুকান্তও একটু অসাবধান হবে। পারে তো বারে-বারেই হবে। সুকান্ত যেন কী! মুখে গম্ভীর থাকলেও মনে-মনে না হেসে পারল না কাকলি। অবোলা শিশুর যেমন হয়, ওরও যেন তেমনি। ও-ও যেন একটা রঙিন ঝুমঝুমি পেয়েছে। কখনো দেখবে, কখনো ধরবে, কখনো বাজাবে। কিন্তু ঝুমঝুমিও চালাক হতে জানে হাতের থেকে আলগোছে দূরে সরে থেকে। ও দু ঘণ্টা কাকলি কক্‌খনো যেত না উপরে, থাকত নিশ্চয়ই সংসারের কাছে-কাছে। এটা পাচ্ছি না, ওটা কোথায় গেল, সুকান্তের শত হাঁকাহাঁকিতেও কান পাতত না।

'কাকিমা, দরজা খুলে দাও, আমি পড়ব।' সুবীর ঘন-ঘন ধাক্কা দিতে লাগল দুয়ারে।

যদিও কথাটা মায়ের, মৃণালিনীর শেখানো, তবু সুবীরের দিক থেকে তার ব্যবহারের যা হোক একটা সমর্থন ছিল। সে তার কাকিমার কাছে করতে পারে, তাই অনুনয় করছে, আবদার করছে, আখ্‌খুটেপনা করছে। তার কাকিমা বুঝবে তার মিনতি রাখবে কিনা, খুলবে কিনা দরজা। কিন্তু তুমি সুকান্ত, তুমি কোন

ভিত্তিতে দুম-দাম কিল মারো। কী যুক্তিতে বলো চেঁচিয়ে, 'ভালো চান তো খুলুন দরজা, বেরিয়ে আসুন, নইলে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যান—'

ছি ছি ছি! রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। বসে ভালো উপভোগ হচ্ছে না বলে উঠে দাঁড়াল বন্দনা। ভয়ে-ভয়ে তার গা ঘেঁষে কাকলি।

পিছনে শক্তি দিচ্ছে মৃণালিনী। তা হোক, কিন্তু যদি একবার এখন এদিকে চোখ ফেলত সুকান্ত, তাকে শতকটাক্ষে কণ্টকিত করে নিষেধ করত, নির্বিষনির্জীব করে দিত। এত বড় কাকা, তার সম্পর্কে কিনা এই মনোভাব! আর যে কিনা তোমার জন্যে এত করল, এত হট্টগোল, এত স্বস্ত্যয়ন। একবার ইচ্ছে হল হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে আসে সুকান্তকে। কিন্তু শাশুড়ির সামনে এই হঠকারিতা নতুন বউকে মানাবে না, শাশুড়ির প্ররোচনার বিরুদ্ধে এই আচরণ স্পষ্ট নিরস্ত্রীকরণের মত দেখাবে, তাই ভেবে নিরস্ত থাকল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল নিষ্পলক।

'কী গোঁয়ার! কী গোঁয়ার!' বলে উঠল বন্দনা। 'এখুনি তার দেখেছ কী?'

বন্ধ দরজা যে খুলছে না, ঈশ্বর করুন, এখন অন্তত এইটুকু তো দেখি। চোখ বুজল কাকলি।

'বাড়ির একটা ছেলে পড়ার জন্যে জায়গা পাচ্ছে না, আর এঁরা, এঁদের একটাও বাচ্চাকাচ্চা নেই, দিব্যি একটা আস্ত ঘর দখল করে বসে আছেন!' আশ্চর্য, বলতে পারল সুকান্ত। এতেই থামল না, আরো একটু যোগ করল: 'বলি নিজেদের একটা থাকলে কী করতেন? ঘরের কোণে পড়ার জায়গা করে দিতেন না?' বলেই আরো কটা করাঘাত।

হেমেনের মতে ঘুমুনো একটা পরিশ্রমের ব্যাপার, এবং ঘুম ভাঙার পর এই যে আরো খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা, এটা হচ্ছে ঘুমোনোর ক্লান্তি দূর করার জন্যে বিশ্রাম। সেই বিশ্রামে বুঝি ছেদ পড়ল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিজয়ার দিকে।

'কি, এখনো উঠবে না?' উড়ন তুবড়ির মত হলকা ছোটাল বিজয়া: 'পড়ে-পড়ে অপমান সইবে?'

'তোমাকে বলেছি না অপমান ভাবলে যন্ত্রণা, পাগলামি ভাবলে মহাশান্তি।' পাশ ফিরল হেমেন: 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। স্তব্ধতাই প্রচণ্ড উত্তর। আর বন্ধ দরজার উত্তর প্রচণ্ডতর।'

'যে অকর্মণ্য কাপুরুষ সে তো এ কথা বলবেই।' দরজা বন্ধ করলে কি হয় জিভ বন্ধ করতে পারছে না বিজয়া: 'তোমাকে এত সব কঠিন কথা বলছে আর তুমি বাইরে মুখোমুখি একটাও প্রতিবাদ করবে না?'

'প্রতিবাদ ? বাইরে বেরিয়ে অর্বাচীনটার মুখে সটান এক চড় বসিয়ে দিতে পারি।'

'পারো ?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়া।

'গায়ের জোরে পারি। সম্পর্কের জোরে পারি।' স্বস্তিতে হাই তুলল হেমেন: 'কিন্তু স্বকুকে মারতে গেলেই, আর তো কিছু নয়, বউটার অপমান।'

'আহাহা, কী আমার দরদের দোকানদার !'

'আচ্ছা, তুমিই বলো না, নতুন বউ এসেছে সংসারে, এরই মধ্যে তার সামনে একটা শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘটে গেলে কী ভাববে বলো তো ! কারু প্রতি তার আর শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকবে ?'

'ও'র শ্রদ্ধাভক্তির জন্যেই দেখছি বেশি ভাবনা। নিজের স্ত্রীর শ্রদ্ধাভক্তি—'

'সে তো কবেই খুইয়েছি। তার জন্যে আর ভাবি না। নতুন একজন যে এসেছে সংসারে, সুন্দরকে দেখতে ভদ্রকে দেখতে, তারই কাছে এক নিমেষে সবাই দেউলে হয়ে যাই কেন ?' মাথার বালিশটাকে বুকের নিচে টেনে এনে হেমেন বিশ্রামে আরো প্রসারিত হল: 'কথায় বলে, বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম। ভুল বলে। আমি বলি নির্বলীর ঘাম, বলবানের ঘুম।'

গুম হয়ে বসে রইল বিজয়া।

'কে, কে পড়বে ? কার পড়ার জায়গা হয় না ?' বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভূপেনবাবু। সুবীরকে লক্ষ্য করে বললে, 'নিয়ে আয় তোর বই, ইংরিজি আর বাঙলা, দেখি কেমন পড়েছিস, কেমন তোর পড়ার জায়গা দরকার।'

সুবীর শুকনো মুখে মার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল আর সুকান্ত নিস্পৃহের মত উপরে উঠতে-উঠতে দাঁড়াল সিঁড়ির উপর।

'আহা, কী চমৎকার ওকালতি !' মৃণালিনী টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'পড়ার ঘর নিয়ে কথা হচ্ছে আর উনি এলেন পড়ার বই নিয়ে কথা কইতে ! জায়গা নেই তো পড়া তৈরির কথা ওঠে কী করে ? এমনিধারা উকিল হওয়ার জন্যেই তো এই দশা।'

'অ্যাদ্দিন পড়ছিল কোথায় ?' শূন্য চোখে তাকাল ভূপেন।

'ন্যাকা ! জানে না কিছু। কেন, উপরের কোণে ছোট ঘরটাতে—দু ভাই যেটাতে ছিল একসঙ্গে।'

'বা, সেইখানে পড়লেই তো হয়।'

'সেইখানে পড়লেই তো হয় ? গা জ্বলে যায় কথা শুনে।' মৃণালিনীর মুখে মমতার রেখামাত্র নেই: 'বাড়িতে নতুন বউ এসেছে না ?'

'এলেই বা। তাই বলে ঘর তো আর উড়ে যায় নি।'

'কী বুদ্ধি! কী বিদ্যে! এই না হলে আর্গুমেন্ট!' বাঁকা মুখ আর সিধে হচ্ছে না মৃণালিনীর: 'বলি নতুন বউ সংসারে একটা আলাদা ঘর পাবে না?'

'আলাদা ঘর!' এতেও যেন বিস্ময় ভূপেনের।

'সাধে কী আর মক্কেল ছেড়েছে! বাহাত্তর না হতেই ধরেছে ভীমরতি। বিবাহিত ছেলে-বউয়ের যে একত্রে একটা আলাদা ঘর দরকার সেটুকুও খেলে না বুদ্ধিতে?'

'খেলে। সেটুকু খেলে।' মাথায় একবার হাত বুলোল ভূপেন। বললে, 'কিন্তু আমি ভাবছি শাস্ত্রে যে স্ত্রীকে দারা বলেছে ঠিকই বলেছে। ভায়ে-ভায়ে দীর্ণ না করে তার শান্তি নেই।'

'আর সোয়ামীকে কী বলেছে?'

কিছু বলেছে নাকি? অতটা শাস্ত্রজ্ঞান হয় নি এমনি নির্লিপ্ত মুখ করল ভূপেন।

'মেড়া বলেছে। মাকালের ঢিপি। অকর্মণ্য।'

তা বলেছে হয়তো। নীরবে সায় দিল ভূপেন।

'বড়-সড় দেখে একটা বাড়ি করতে পারে না, ছেলে-মেয়েকে পড়বার জন্যে ঘর দিতে পারে না, তার আবার বড়ফট্টাই! আগন্তুক নতুন বউ, তার দোষ ধরতে এসেছে! লজ্জা নেই একটুও?' মানুষের নয়, কেউটের জিভ মুখে ধরেছে মৃণালিনী।

হাত বাড়িয়ে ভূপেন ধরল সুবীরকে। বললে, 'আমার বৈঠকখানায় বসে পড়বি।'

ভয়-ভয় লাগছে তবু নাকে কেঁদে উঠল সুবীর। বললে, 'ও ঘরে সব লোকজন আসবে, সারাক্ষণ আজে-বাজে কথা কইবে, একটুও মন বসবে না পড়াতে।'

ভূপেনের ইচ্ছে হল বাগিয়ে একটা চড় কষায় সুবীরের উপর। কিন্তু না, প্রেসার বাড়তে দিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া, মৃণালিনী বুঝতে পারবে সহজেই, এ চড়ের লক্ষ্য সুবীর নয়, আর কেউ। তুমুল শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং চেপে যাওয়াই সমীচীন। হাত ছেড়ে দিল ভূপেন। বললে, 'না, একটুও গোলমাল নেই বৈঠকখানায়। তোর মা বলে, আমার ধড়ে আক্কেল নেই, ঘরে মক্কেল নেই। তাই বেশ পড়তে পারবি নিরিবিলিতে। যা, বই নিয়ে আয়।'

তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না সুবীর। বললে, 'কখন কে কী পরামর্শ নিতে আসবে, শুরু হবে ক্যাঁচকেঁচি—'

'যা, নিয়ে আয় বই।' গর্জে উঠল মৃণালিনী: 'বৈঠকখানাতেই পড়বি এখন থেকে। আর, শোন, খবরদার, ছোড়দার ঘরে কখ্‌খনো গোলমাল করতে ঢুকতে পাবি না। মনে থাকে যেন।'

নাকে কাঁদতে-কাঁদতে সুবীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করল।

সুকান্ত-কাকলির ঘর মাঝে-মাঝে মৃণালিনী নিজেই গুছিয়ে দিয়ে আসে। কীভাবে কোন জিনিস রাখলে না-রাখলে এই ঘরের মধ্যেও একটু বেশি অবকাশ আসবে তারই হিসেব করে। এ ঘরটাতে আলো যদিও বা আসে হাওয়া যে ঢোকে না, এ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান হতে ছটফট করে বেড়ায়। জানলার ওপারে ঐ যে একটা নিমগাছ ডালপালা মেলে রয়েছে—হলই বা না শুভ গাছ—কাটিয়ে-ছাঁটিয়ে দিয়েছে। এইবার দেখ কেমন আরো শাদা হয়েছে ঘর। কেমন আরো ফাঁকা হয়েছে আকাশ। আলোর পথ ধরে হাওয়া বা কোন-না একটু আসবে এখন অলক্ষ্যে। রেন-পাইপ ধরে এখন এই মালতীর লতাটা তুলে দিই না জানলার দিকে। বেশ হবে। বেশ মানাবে।

সংসারের হাওয়া এখন উত্তাল কাকলির দিকে। কাকলি প্রমাণ করে দিয়েছে, যে অকথা রটেছিল তার সম্পর্কে তা নিতান্ত নিরর্থক। সে বয়ে-যাওয়া ঢিলে-আলগা মেয়ে নয়। আর সুকান্তও নয় কিছু অপরিচ্ছন্ন। না বা অসহিষ্ণু।

মূল্যমানের পারা খুব উঁচুতে উঠে গিয়েছে দু-জনের।

মৃণালিনীর যত রাগ বন্দনার উপর। 'বলেছিলে কেমন বৃক্ষ ফলই তা ভালো কইবে। কই, কওয়াও এবার। বৃক্ষ থেকে পেড়ে আনো ফল!' দাঁতে-দাঁতে কিড়মিড় করে উঠল মৃণালিনী।

'ওমা, আমি আবার কখন ওসব বললাম?' বন্দনা ফোঁস করে উঠল।

'কখন বললে! তখন সকলের কত গুজগাজ, কত ফিসফাস। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কত লুকিয়ে-লুকিয়ে হাসা। টেরিয়ে-টেরিয়ে তাকানো! যত ছোট মনের ছোট কথা। উনিও কম যান না।' বিজয়ার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল মৃণালিনী: 'কেমন বৃক্ষের ফল তোমরা তা আর বলে কাজ নেই।'

'বা, আমি তো বরাবর উলটো কথা বলেছি।' বিজয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'উলটো কথা বলেছ? এখন সাধু সাজছ সকলে। বলো নি, আপনার কীর্তিমান ছেলে, কত বড় কীর্তি রাখল ভারতে—বলো নি?'

'সে তো ভালো অর্থে বলেছি।'

'ভালো অর্থে বলেছ! এখন কালো অর্থ হয় নি কিনা তাই ভালো অর্থ।'

'মোটেও তা নয়। আমরা বরং বলেছি, সুকু এক বেকার ছেলে—'

'বেকার ছেলে!' ঝলসে উঠল মৃণালিনী।

'না, ভুল হয়েছে। টিউশানি-করা ছেলে। হরে-দরে সে একই কথা।

সেই সুকু কেমন দিব্যি এক বড়লোকের এম-এ পাশ মেয়ে সজ্ঞানে বিয়ে করে আনল।'

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ।' লকলক করে উঠল মৃণালিনী: 'তোমাদের মত কোনো-রকমে মুখস্থ-করে-ইস্কুল-সারা মেয়ে নয়।'

'তবেই বুঝুন কত প্রশংসা করেছি। বরং বলেছি, আমার পিল, আমার যেমন করে খুশি তেমনি করে খাব। গুলে খাই কি গিলে খাই, চুষে না চিবিয়ে—তাতে কার কী মাথাব্যথা!'

বিজয়া-বন্দনা এখন এক দিকে, তাই তাক বুঝে বন্দনা টিপ্পনী ঝাড়ল: 'আর ঢোঁক গিলতে গলায় যদি আটকায় তো আমার আটকাবে!'

'তবে যে বলছিলে জেলে যাবার কথা, কোমরে দড়ি পরাবার কথা'—মৃণালিনী আবার বন্দনার উপর উদ্যত হল।

'সেসব প্রশান্ত বলেছে।' গম্ভীরমুখে বিজয়া বললে।

'প্রশান্ত বলেছে!' তবু সমস্ত দোষ বন্দনার এমনিভাবে বন্দনার দিকেই আক্রোশে তাকিয়ে রইল মৃণালিনী। বললে, 'ভাই হয়ে ভাইকে জেলে পাঠাতে পারলেই খুশি।'

'তবেই বুঝুন', যেন একটা তুরুপের তাস তক্ষুনি হাতে পেল বন্দনা, ঝলসে উঠল: 'তবেই বুঝুন, কেমন বৃক্ষের কেমন ফল।'

এ একেবারে মৃণালিনীকেই ছুঁড়ে মারা। প্রশান্ত ক্ষুদ্রাত্মা কেন? যেহেতু মৃণালিনী ক্ষুদ্রাত্মা।

'মুখ সামলে কথা বলতে শেখো বড় বউ।' মৃণালিনী চেঁচিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা আর বেশি গড়াতে দিল না বিজয়া। বন্দনা আর সে এখন এক দল, এক পার্টি, তাই বন্দনাকে অনায়াসে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আর, সমস্ত কলহের মীমাংসা, দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মৃণালিনীর ইচ্ছে হল ঘর দুটো এখুনি বদলাবদলি করে দেয়। প্রশান্তদের বড় ঘরটা সুকান্তদের দিয়ে সুকান্তদের ছোট ঘরটাতে প্রশান্তদের পুরে রাখে। মাথা নিশ্চয়ই ঠিক নেই, মৃণালিনী সেই মতলবেই উঠল উপরে। ঠাট করে বন্দনা এখন বিজয়ার শামিল হয়েছে, এই সুযোগেই নয়-ছয় করে ফেলবে। দুপুরবেলা, ধারে-পারে কেউ নেই, অন্তত বন্দনা এখন ঠাঁইনাড়া—এই তো সোনার সুযোগ।

বন্দনার ঘরে ঢুকতেই মৃণালিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী আশ্চর্য, ক্রোধের ক্ষণকালের চূড়ায় উঠে ঝণ্টু-সেণ্টুকে সে আর দেখতেই পায় নি। একেবারে মুছে দিয়েছিল মন থেকে।

দেখল, আজ বুঝি ঝণ্টুর স্কুলের ছুটি, ঝণ্টু পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর। যা গরম, বিছানা ছেড়ে মেঝেকে সম্বল করেছে। কিন্তু সেণ্টু, সেণ্টু কোথায়?

পাশের ঘরে, কাকলির ঘরে, দু আঙুল পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল মৃণালিনী। সুকান্ত কলেজে নয় লাইব্রেরিতে গেছে। খাটে পাতা বেডকভারের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি, নিরীহ ছোট্টটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার বাহুর কাছে তালগোল পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সেণ্টু। কদিনেই কেমন আপন হয়ে গেছে ছেলেটা। কিছুতেই ছাড়বে না বুকের আঁচল। মার জন্যে অপেক্ষা না করে কাকিমার গায়ের গরমেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোমরের কাছে ছোট্ট এক টুকরো জাঙিয়া ছাড়া আগাগোড়া উলঙ্গ সেণ্টু, কিন্তু অব্যাহত আবৃত কাকলি। এত গরমেও, দুপুরের নিভৃতি সত্ত্বেও, বেশেবাসে একটুকু লঘুতা নেই। ঘামে ভিজে গেছে তবু কেমন ঘুমুচ্ছে দেখ না। হাত-পাখা করছিল, সেটা হাতের মুঠি থেকে শিথিল হয়ে খসে রয়েছে এক পাশে। কেমন দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। কিন্তু, যাই দেখাক, অন্তরে তৃপ্তি না থাকলে বাইরের এত সব ক্লেশ-কষ্ট উপেক্ষা করে পারে কেউ ঘুমুতে? তবু, বাবা-মা বর্জন করল, একবার ডাকল না, নিয়ে গেল না বাড়ি, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন কেউ একবার দেখা করতে এল না—এতে মন বুঝি কারু ভালো থাকে? একটা কান্না-কান্না ভাব সব সময়েই বুঝি চোখে-মুখে লেগে থাকে না? তবু সব সময়ে হাসছে মেয়েটা, কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে বালতি-ঝাঁটা নিয়ে রান্নাঘর ধোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজে হাত দিচ্ছে অম্লানে। তার অপরাধের মধ্যে তো এই যে, সে এমন পাত্র বেছেছে যে ওদের বাপের বাড়ির মতে হরিজন। কেন, সুকু এমন কী অপাঙ্‌ক্তেয়? পাকাপাকি না হোক, দু শো টাকার একটা স্কলারশিপ তো পাচ্ছে। তারপর রিসার্চের খাতিরে তার টিউশানির বাজারও না কোন তেজী হবে আজকাল। শাঁসালো তো একটা জুটিয়েওছে এরই মধ্যে। একটা গাড়ি-বাড়ি হাঁকড়ানো বিলিতি কেতার অফিসার না হতে পারলে বুঝি আর মানুষ বলে গণ্য হবে না? ওদের সমাজ না পারুক, কাকলি যে তার ছেলের মর্যাদা বুঝেছে, তাকে দিয়েছে সবচেয়ে উঁচু দাম—তার জন্যে মায়ায় ভরে গেল মৃণালিনী।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকে পাখাখানা কুড়িয়ে নিল আলগোছে। পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু একটু পাখা করলে দু-জনকে। আহা, বড় ভালো মেয়ে, আরো একটু ঘুমুক। কিন্তু, কে জানে, হাওয়া পেয়ে ঘুম না ভেঙে যায় অকালে। পাখা আবার নামিয়ে রেখে আস্তে-আস্তে চলে গেল মৃণালিনী।

না, ঝণ্টু-সেণ্টুকে এ ঘরে ঠেলা যাবে না, তবে যেমন বোঝা যাচ্ছে, বিজয়ারাই

চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। এ ফ্ল্যাট না ও ফ্ল্যাট, বাছাবাছি করতে প্রায়ই ওরা বেরুচ্ছে এক সঙ্গে। একেবারে বেরিয়ে যায়, আর না ফেরে, শান্তি হয় সংসারে। আহা, বড় ঘরে কাকলি-স্বকান্ত একটু থাকতে পারে হেসে-খেলে, ফেলাছড়া করে। পাশের বাড়ির দেয়াল পড়ে না বলে কেমন আপনা থেকেই হাওয়া আসে জানলা দিয়ে। আহা, দগ্ধ-ভস্ম মেয়েটার একটু গা জুড়োবে, দু দণ্ড বসে একটু বা করতে পারবে পড়াশুনো। কী এমন অস্থবিধে হবে যদি হেমেনের টাকাটা মাস-মাস না আসে? স্বকান্তই তা পূরণ করে দিতে পারবে। আর, স্বকান্ত কি একা? তার সহায়-সঙ্গী নেই? কাকলি নেই?

ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই গায়ের জামাটা খুলে ফেলল স্বকান্ত। 'আমার আর ভয় কী!' বলে গেঞ্জিটাও উৎখাত করল সবলে।

'বোসো। হাওয়া করি।' হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললে কাকলি।

'পাখা তো আমি করব। এবং তোমাকে।' পাখাটা কেড়ে নিল স্বকান্ত। বললে, 'তুমি আমার মত এমন বিদ্রোহী হতে পারো না?'

'বিদ্রোহী?'

'হ্যাঁ, আমার মত এমনি আদিম-অকৃত্রিম।' কাকলিকে লক্ষ্য করে জোরে হাওয়া করতে লাগল স্বকান্ত: 'এমনি নির্ভার-নিশ্চিন্ত।'

'পাগল না মাথাখারাপ!' হাওয়ার ঢেউয়ের বাইরে চলে গেল কাকলি।

'এমন লোহাগলানো গরম, অথচ সাধ্যি নেই নিরঙ্কুশ হও। একটা পার্পিচ্যুয়াল হ্যাণ্ডিক্যাপ থেকে ভুগছ। তোমরা আবার পুরুষের সমান হবে।' করুণায় উদ্বেল শোনাল স্বকান্তকে: 'এমন যে বিধাতার হাওয়া তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত রইলে চিরদিন। গা ভরে স্নান-পান কিছুই করতে পারলে না। একটা ছাত্রীজীবন শাসন-বসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রইলে। উঃ, কী ভয়ানক! এখন তো আর সেই ছাত্রীজীবন নেই, এখন তো পত্নীজীবন—এখন আর তবে ভয় কী!'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাকলি বললে, 'বোধ হয় বৃষ্টি আসবে।'

'ছাই আসবে! তুমি যে এই মাঠফাটা গরমেও ধোপার পিঠের আস্ত একটা বস্তা হয়ে থাকবে এ আর আমার সহ্য হয় না। তোমার কাপড়ের গরম আমাকে হাঁপিয়ে মারে। কেন, হালকা হতে পারো না?'

'চলো, আজ সন্ধ্যায় একটু কোথায় ঘুরে আসি।'

'তা চলো। কিন্তু বাইরেটা তো ভীষণ সভ্য, ভীষণ সাধু। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আমি আর তুমি, স্বামী-স্ত্রী, ধারে-কাছে কেউ নেই—'

'আমরাই বা পরস্পরের কাছে কম সভ্য আর সাধু নাকি ?'

'রাখো। আমরা পরস্পরের কাছে নিঃস্ব, অনাবৃত। তবে কিসের তোমার কুসংস্কার ?' সুকান্ত উঠে কাকলিকে ধরতে গেল।

কাকলি ছুট করে সরে এল দরজার কাছে। বললে, 'সব কিছুরই একটা প্রস্তাব আছে, প্রসঙ্গ আছে। ক্ষেত্র-পাত্র আছে।'

'আছেই তো।'

'যদি এই গ্রীষ্ম সম্পর্কে কিছু থেকে থাকে, তা হলে আর কিছু নয়, একটা শুধু ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান কিনে আনো।' কাকলি ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বললে, 'দাঁড়াও, আমি গা-টা ধুয়ে আসি। পরে দু-জনে বেরুব একসঙ্গে। সেই আমাদের ময়দান, নয়তো সেই ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার। সেই ঠুনঠুন রিক্‌শা। এখন আর রিক্‌শাতে চড়তে ভয় নেই।'

কাকলি চলে গেল বাথরুমে। অঢেল জলে স্নান করতে লাগল।

বাথরুমটা এত বড় নয় যে, সেইখানে বসেই পরিপাটি সাজগোজ করবে। তাই স্নানান্তে শাড়ি-সেমিজের একটা এলোমেলো হিজিবিজি হয়ে নিজের ঘরের দিকেই ছুট দিল কাকলি।

ঘরে গিয়ে দেখল সুকান্ত বসে আছে চুপ করে। পাখা নাড়ছে।

'দয়া করে একটু বাইরে যাও', মিনতির সুরে বললে কাকলি, 'আমি ঠিকঠাক হয়ে নিই।'

'আমি কোথায় যাব !'

'বা, তা কী জানি ! বারান্দায় যাও, নয়তো ছাদে যাও। নয়তো বাথরুমে গিয়েই ঢোকো।'

নড়ল না সুকান্ত। বললে, 'আমার যাবার জায়গা নেই।'

'সে কী কথা ! ড্রেস করবার যখন আলাদা ঘর নেই, আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দেবে তো ?'

'আমার কাছে তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।'

'এ সংকোচের কথা নয়, এ শ্লীলতার কথা।' ঝলসে উঠল কাকলি : 'ওঠো, সরো, এ কী অন্যায়, আমাকে খানিকক্ষণ একলা থাকতে দাও।'

যেমন-কে-তেমন বসে রইল সুকান্ত। চোখ বুজে হাওয়া খেতে লাগল।

সেই একস্তূপ বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে কাকলি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ছোটলোক !'

মাসিক কিস্তিতে একটা সিলিঙ ফ্যান কিনেছে সুকান্ত। শাদা পাখা মেলা একটা উড়ন্ত রাজহাঁস।

'টাকা? টাকা কোত্থেকে দিলে?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'এবারেরটা ম্যানেজ করেছি।' এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বললে সুকান্ত।

'কী ভাবে করলে?' কাকলির ইচ্ছে, কিছু না গোপন থাকে তার কাছে। আয়ের বা আনন্দের কোথায় কী উৎস থাকতে পারে পুরুষের, সেটি তার রমণীর কাছে, রমণীয়ার কাছে, স্পষ্ট থাক, মুক্ত থাক। তার হিসেবের খাতার শাদা-কালো দুই পৃষ্ঠাই খোলা থাক তার চোখের সামনে।

কাকলির মনের ইচ্ছেটা বুঝে নিয়ে সুকান্ত বললে, 'ছাত্রের কাছ থেকে আগাম নিয়েছি।'

'কেন, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিলেই তো পারতে।' হয়তো চায় নি, কিন্তু অজানতেই কাকলির গলায় ঝাঁজ এসে গেল।

করুণ করে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'হাতখরচের দুটো-চারটে টাকা হয়, সহজেই চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু যেখানে এক থোকে বেশ মোটা একটা টাকা, তখন কেমন বাধো-বাধো ঠেকে।'

'বা, তোমার নিজের টাকাই তো চেয়ে নিচ্ছ।' যদিও টাকার কথা, টাকা নিয়ে কথা, বলতে গেলেই কেমন একটু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শোনায়, তবু না বলে পারল না কাকলি। গলা না খাঁকরেই বললে, 'বাহাদুরি করে রোজগারের সমস্ত টাকাটাই মার হাতে তুলে দেবার কী হয়েছিল!'

সুকান্ত হাসল। বললে, 'সংসারের কাছে পপুলারিটি কেনবার ঐটেই প্রথম স্টার্ট।'

প্রত্যুত্তরে হাসল না কাকলি। বললে, 'সংসার বলতে শুধু মা, বেচারা স্ত্রী নয়? স্ত্রীর কাছে আর পপুলার হবার দরকার নেই?'

মানে, একটু কি থমকাল সুকান্ত, কাকলিরও নিজের এক্তিয়ারে এক থোকে একটা টাকা চাই? সুকান্তর উপার্জনের এক অংশ, অধিকাংশ যদি সংসার বা মৃণালিনী গ্রাস

করে নেয়, আরেক অংশ, অন্তত একটা ক্ষীণ অংশ, কাকলি রাখবে তার নিজের আয়ত্তে। সমস্ত টাকা সংসারের কাছে গচ্ছিত রেখে তার থেকে কালেভদ্রে ভিক্ষে চেয়ে নেওয়ার কোনো মানে নেই। শ্রী নেই সেই দীনতায়। বরং সে টাকা থাকবে কাকলির চাবির অধীনে, তার ক্ষয়-ব্যয়ের মধ্যে থাকবে একটা স্বাধীনতার সম্পদ। আর, স্বাধীনতার মত স্বাদ কী! যার কাছে ফিরতি টাকা চাইতে গেলেই যেন ব্যাখ্যার একটা বাধ্যতা থাকবে, কিন্তু কাকলির টাকায় নেই কোনো জবাবদিহির যন্ত্রণা। চলো আজ সিনেমায় যাই, সার্কাসে যাই, গঙ্গায় যাই হাওয়া খেতে, এ কি মার টাকায় বলা চলবে? কিংবা লাঞ্চ খেয়ে আসি হোটেলে? বড় জোর বলা চলবে, চুল ছাঁটাই, জুতো সেলাই, ডাইং-ক্লিনিং, শালকর, ট্রাম-বাস, নয় তো স্ট্যাম্প-পোস্টকার্ড। যন্ত্রপাতি দূরের কথা, সামান্য ওষুধ-বিষুধের কথাও বলা যাবে না। মার কাছের টাকায় সুখ কই। স্ত্রীর কাছের টাকায়ই সুখ।

বুঝেও গভীরে গেল না সুকান্ত। তরলকণ্ঠে বললে, 'তোমার কাছে আমি পপুলার— পপুলার কথাটা তো চলবে না, কেননা, অনেকগুলি তো স্ত্রী নেই—তোমার কাছে আমি প্রীজিং, প্রেমে।'

'আর আমরা প্রেমে নেই। অনেক নেমে এসেছি।'

'অনেক নেমে এসেছি? বলো কি?' অবাক হবার মুখ করল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, আমরা এখন চলে এসেছি উদরে। স্থূল করে বলতে পারো, পেটে। আর শুকনো পেটে যদি ভগবান নেই, তা হলে প্রেমও নেই। সুতরাং—'

'সুতরাং-এ দরকার নেই।' আদর করবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত। বললে, 'বলো তোমার কী চাই? স্নো-পাউডার, তেল-সাবান— স্যাপকিন?'

সরে গেল কাকলি। বললে, 'নিজের হাতখরচের টাকার মধ্যে আমার এসব খুচরো প্রয়োজন না-হয় ম্যানেজ করলে, কিন্তু আমার যদি হঠাৎ কোনো সময় এক থোকে একটা মোটা টাকার দরকার হয়—'

'যথা, আচ্ছাদন? শাড়ি?'

'শুধু শাড়ি কেন, কত কিছুই তো দরকার হতে পারে। শখ হতে পারে।'

'যথা, আভরণ? কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?'

'নয়ই বা কেন? লজ্জা কিসের? অপরাধ কোথায়? তখন পাবে কোথায়? তখন কী বলবে?'

অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল সুকান্ত। বললে, 'বলব, ফিজিশিয়ান, হিল দাইসেল্ফ।'

'তার মানে?' কর্কশ রেখায় ভুরু কুঁচকোল কাকলি।

'তার মানে, বাঙলা করে বলব, হে সবলা, হে সক্ষমা, তুমিই তোমার মেধা-মজ্জা খাটিয়ে নিজের ব্যবস্থাটা নিজেই করে নাও।'

'মানে, আমাকে চাকরি করতে বলবে?' চোখ প্রায় গোল করল কাকলি: 'মানে নিজে খেটে নিজের আচ্ছাদন-আভরণ সংগ্রহ করতে হবে? মশাইকে তবে বিয়ে করলুম কেন?'

'ও, হ্যাঁ, বিয়ে করেছি।' চিন্তান্বিতের মত চিবুকে হাত বুলোল সুকান্ত: 'মাঝে-মাঝে কিরকম ভুল হয়ে যায়। মনে হয় যেন তেমনিই আছি দু-জনে।'

'তেমনিই আছি! তেমনিই রেখেছ! আমার কপালে-মাথায় এ অকীর্তি কিসের? কার? সিঁদুর কি অহংকারের, না কি কলঙ্কের চিহ্ন?'

'আহা, কলঙ্কই তো অহংকার।'

'কাব্য করতে তো পয়সা লাগে না।' মুখ বেঁকাল কাকলি: 'কিন্তু এ কলঙ্কের শর্ত ছিল কী? কী শর্তে বিয়ে করেছি শ্রীমানকে? মনে নেই?'

'আছে।'

'কী?'

'আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটব, চাকরি করব, আর তুমি পড়ে-পড়ে ঘুমোবে।'

'হ্যাঁ, ঘুমুব।'

'আর, ঘুম যাতে ভালো হয়, যাতে গায়ে মাথায় ঘামতে না হয় তারই জন্যে ফ্যান কিনে এনেছি।'

'আরো অনেক কিছুই হতে পারে কিনতে।' শাদাসিধে গদ্যের ভাষায় কাকলি বললে, 'সুতরাং সব টাকাই সংসারে গুঁজো না। রিসার্চের টাকাটা মাকে দাও, আর টিউশানির টাকাটা আমার হাতে রাখো।'

'তাও তো মোটে এক শো। খরচ করতে চাইলে এক টিপ নস্যি।'

'আহা, তাই বা মন্দ কী! নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।'

'কিন্তু, তুমি তো চটবে, নইলে সবিনয়ে বলতাম, কানা-মামাকে কি সুস্থ করা যায় না, দু-চোখো করা যায় না?' ইঙ্গিতটা কাকলি এখনো স্পষ্ট করে বুঝতে পারে নি বুঝে সুকান্তর সাহস হল। বললে, 'আমার এক হাতে ঢাল আরেক হাতে তলোয়ার, আমি লড়ি কিসে? তাই তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, তুমিও যদি লড়ো—'

'দেখ, আমাকে খেপিও না।' আবার সেই পুরোনো কথা, বুঝতে পেরেছে

কাকলি। তাই আবার সে জ্বলে উঠল। বললে, 'আমাকে শাস্ত থাকতে দাও। বিবাহিত মেয়েদের সনাতন যে অধিকার, সংসারের খাটা-খাটনির পরে দুপুরবেলায় লম্বা ঘুমুনো, যা এ বাড়ির আর সবাই উপভোগ করছে, তাতে আমাকেও মশগুল হতে দাও। নইলে স্ত্রীর চাকরিতে স্বামী সচ্ছল হবে এর মধ্যে স্বামীর আর যাই থাক, তেজ-বীর্য নেই। দয়া-মায়া তো নেই-ই।'

শুকনো রেখায় হাসল সুকান্ত। বললে, 'এরকম করে দেখা আজকের দিনে আছে নাকি?'

'সব সময়েই আছে।' ধমকে উঠল কাকলি। 'স্বামী আনবে, আর স্ত্রী বুনবে। উপার্জন করে টাকা আনবে স্বামী আর তাই দিয়ে সংসারে শ্রীর আলপনা আঁকবে স্ত্রী। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার যা কথা—' কাকলি বুঝি আবার ফণা তোলে!

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি ফ্যানের হাওয়া খাও, আর অঢেল ঘুমোও। আর আমি সারাদিন টো-টো করে ঘুরি।'

'তাই তো ঘুরবে।'

'আর স্ত্রী?'

'সেও ঘুরবে বোঁ-বোঁ করে সংসারের ঘানিতে।' হাসিমুখে সুকান্তের এক পা কাছে এল কাকলি। বললে, 'শোনো। একটা সত্ত এম-এ পাশ ছেলে তিন শো টাকা কামাচ্ছে, এ দেখতে-শুনতে কিছু খারাপ নয়। সে যদি সংসারে দু শো টাকা দিয়ে এক শো টাকা নিজের জন্যে—'

'নিজের জন্যে মানে?'

'নিজের জন্যে মানে, তোমার আর আমার জন্যে।' পুরোনো দিনের একটা কথার সুর বুঝি বেখাপ্পা হয়ে কানে লাগল। হাসির ঝাপটায় স্বচ্ছন্দে সেটা উড়িয়ে দিল কাকলি। বললে, 'যদি এক শো টাকা নিজের জন্যে রাখা যায়—যুক্তিযুক্তই দেখাবে।'

'তাই রাখব এবার থেকে।' হেসে সায় দিল সুকান্ত।

কলেজ যাচ্ছে, মনিব্যাগ প্রায় খালি, হন্তদন্ত হয়ে মৃণালিনীর কাছে হাত পাতল সুকান্ত। বললে, 'মা, একটা টাকা দাও।' তখুনি-তখুনি দিতে হল কৈফিয়ত: 'বাস ভাড়া নেই।'

মৃণালিনী বললে, 'আমার হাত জোড়া, তোর কাকিমার কাছ থেকে চেয়ে নে গে।'

চকিতে কাকলির সঙ্গে চোখাচোখি হল সুকান্তর। কাকলির চোখ বললে, 'বেশ হয়েছে। সুপুত্রের মত সব টাকা মার জিম্মায় রাখো! আহা, সুকান্ত আমার কেমন হীরের টুকরো ছেলে। রোজগারের সমস্ত টাকা মার হাতে তুলে দেয়। বউয়ের আঁচলে গোঁজে না। বেশ, এখন ঠেলা সামলাও। কিছু টাকা স্বাধীনমত নিজের হাতে, মানে স্ত্রীর হাতে থাকলে, ঠেকতে হত না, দাঁড়াতে হত না কাকিমার কাছে। হলই বা না ধার, ক্ষণকালের ধার, তাই বা কে চায়। যে মানী, সে আপনজনের কাছেও হাত পাতে না।'

কাকলি নিচেই ছিল, সুকান্ত তাকে বললে মিনতির সুরে, 'তুমি গিয়ে চেয়ে আনো।'

'আমি পারব না।' স্বচ্ছন্দে বললে কাকলি। প্রায় ধর্ম-দেখার ভঙ্গিতে।

অসুবিধেটা বুঝল মৃণালিনী। তাই নিজেই সে অন্তরঙ্গ সুর খেলিয়ে ডাকল বিজয়াকে। বললে, 'বিজয়া, সুকুকে একটা টাকা দে তো।' আমি মাছ ভাগ করছি, আমার হাত জোড়া, পরে গিয়ে তোকে দিয়ে দেব।'

বিজয়া, ডিমওয়ালার টাকাটা দিয়ে দে তো। সবাই খেতে বসেছে, পাঁচ খুরি দই আনা তো চাকরকে দিয়ে। জয়ন্তীর কী পেইন্টিং বক্স কিনতে হবে দিয়ে দে তো এখনকার মত। আর সুবীরের কী গেম ফি না ম্যাগাজিন ফি। জমাদার কী বকশিশ চায় ছাখ তো। ওমা, রিক্‌শা ভাড়া কবে আবার বাকি ছিল? আচ্ছা, তুই দে তো এখন মিটিয়ে।

এমনি থেকে-থেকেই খুচরো খরচের টাকা বিজয়ার কাছ থেকে চেয়ে নেয় মৃণালিনী। সব সময়েই ফেরত দেবার কথাটা মনে রাখে না। বিজয়া অবশ্যি ফেরত চায় না মুখ ফুটে কিন্তু কবে ও কোথায় কত টাকা বাকি পড়েছে, দিব্যি মনে করে রাখে।

দিদির ভালোবাসায় আবার বান ডাকল বুঝি। ভালোবাসার বান ডাকলে দিদি অমনি তুই বলে, ডাকে নাম ধরে।

বিজয়া ঘরের বাইরে এসে বললে, 'আমার কাছে দশ টাকার নোট আছে। ভাঙানি নেই।'

ঠকে না হোক, ঠেকে শিখেছে বিজয়া। মৃণালিনীর যেমন 'হাত জোড়া', বিজয়ারও তেমনি 'নোটের ভাঙানি নেই।'

আবার সুকান্তর দিকে কৌতুকগর্ভ চাউনি ছুঁড়ল কাকলি। কেমন, হল? পূর্ণ হল আকাঙ্ক্ষা?

অগত্যা হাত ধুয়ে উপরে উঠতে হল মৃণালিনীকে। সুকান্তকে একটা টাকা দিতে হল আলমারি খুলে।

একটা টাকার জন্যে দশ মিনিট দেরি। কাকলির নীরব দৃষ্টির কাঁটা পিঠে যেন বিঁধল সুকান্তর।

আলমারি খুলে টাকা গুনছে মৃণালিনী, সুকান্ত বললে, 'কিছু টাকা নিজের হাতে রেখে দেব ভাবছি।'

শুনেও শুনল না মৃণালিনী।

এক টাকার নোটটা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরতে-পুরতে সুকান্ত বললে, 'তোমাকে, সংসারকে, দু শো টাকা দেব আর এক শো টাকা রাখব নিজের কাছে।'

'নিজের কাছে মানে বউয়ের কাছে।'

এই নাও! এই আবার আরেক প্যাঁচ!

যেতে-যেতে থামল সুকান্ত। বললে, 'কেন, দাদাও তো তাই করছে। খানিক দিচ্ছে, খানিক রাখছে।'

'তার কতই বা মাইনে!' যুক্তি ধরে কথা বলার তো দায় নেই, ফট করে বলে বসল মৃণালিনী। আর তা বন্দনাকে শুনিয়ে।

'কত মাইনে তা নিয়ে কথা হচ্ছে না।' বললে সুকান্ত, 'কথা হচ্ছে যতই মাইনে হোক, কিছু টাকা রাখতে হচ্ছে হাতখরচের জন্যে।'

'তার ছেলেমেয়ে আছে।' আবার এক যুক্তি-ছুট কথা বলল মৃণালিনী।

'ছেলেমেয়ে না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচের জন্যে আলাদা একটা টাকা দরকার।' সিঁড়ির মুখে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে সুকান্ত।

কথা বলার কী দরকার! কাকলি উপস্থিত না থাকলেও তার অনুযোগভরা কাতর চোখ যেন দেয়ালে ফুটে রয়েছে। যেন বলছে, কথাই বিষ, কথাই শত্রু। কথা না বলে পরের মাসে আলগোছে এক শো টাকা কম দিলেই চলে যেত। মা কিছুই বলতে আসতেন না।

কিন্তু এখন জলে ঢেউ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মৃণালিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'তা যখন-তখন এটা-সেটা বলে আকছারই তো নিচ্ছিস—'

'হ্যাঁ, বারে-বারে তোমাকে শুধু বিরক্ত করা। নিজেরও সময় নষ্ট। সেদিন টাকার দরকার, শুনলুম তুমি বাড়ি নেই। কালীঘাট গিয়েছ।'

'কবে আবার কেওড়াতলা যাব! তার চেয়ে এবার থেকে সব টাকা বউয়ের হাতেই তুলে দিস।'

'কী কথায় কী কথা! শুধু-শুধু সময় নষ্ট।'

'সময় নষ্ট করতে গেলি কেন? বউয়ের কাছ থেকে টাকা একটা চেয়ে নিলেই হত!'

'বউ? বউ টাকা পাবে কোথায়?'

'এমনই বাউণ্ডুলে বউ, একটাও তার টাকা নেই? বাপের বাড়ি থেকে কিছুই এদিক-সেদিক আনতে পারে নি, এ কখনো হতে পারে?'

'ঐ একটা মাত্র স্যুটকেস নিয়ে তো এসেছে। আর তোমরা কাস্টমসের পুলিসের মত তা তন্নতন্ন করে দেখেছ, একটা ফুটো আধলাও পাও নি।'

'কিন্তু অদৃশ্য হয়ে তো থাকতে পারে।'

'অদৃশ্য হয়ে?' এক সিঁড়ি থামল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে-পোস্টাফিসে। বাবা কি মেয়ের জন্যে কোনো প্রভিশনই করে নি বলতে চাস?'

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত। কাকলির দূরত্বটা অনুমান করে কণ্ঠস্বর স্তিমিত করল। বললে, 'সে দুঃখের কথা শুনো আরেক দিন।'

'কিন্তু তার হাতে একেবারে টাকা নেই, এ আমাকে তুই বিশ্বাস করতে বলিস? টাকা নেই তো ফ্যান কিনল কী দিয়ে?'

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না সুকান্ত। নামতে-নামতে বললে, 'ফ্যান কেনবার টাকা ছাত্রের কাছ থেকে আগাম নিয়েছি।' তারপর কাকলি যাতে শুনতে পায়, তেমনি বুঝে গলা উত্তেজিত করল: 'আর বউয়ের যদি নিজস্ব টাকাও থাকে, আমি তা নিতে যাব কেন? আমি নিজে রোজগার করি না? আমার দুই হাত আর মাথা নেই?'

পাখা শুধু কেনাই হয়েছে, এখনো টাঙানো হয় নি। মিস্ত্রি এসেছে টাঙাতে।

'কোন ঘরে ফিট হবে?' জিজ্ঞেস করল মিস্ত্রি।

কাকলি এগিয়ে এল। শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর দেখিয়ে দিল।

মৃণালিনী অস্থির হয়ে বললে, 'সে কী কথা? আমাদের ঘরে কী!'

'হ্যাঁ, আপনাদের ঘরের জন্যেই তো—'সরল জোরের সঙ্গে কাকলি বললে।

'বলো কী! সুকু জানে?'

'বা, জানে বৈকি। ওই তো বলে গেল।'

তবু যেন বিশ্বাস করা যায় না। মৃণালিনী ভয়ে-বিস্ময়ে, দ্বিধায়-আনন্দে তালগোল পাকিয়ে গেল। বললে, 'না, সুকু আগে আসুক। আগে বলুক। পরে দেখা যাবে।'

'কতক্ষণে ফিরবে তার ঠিক নেই। ততক্ষণ থাকবে না মিস্ত্রি।' কাকলি হাসল : 'ফ্যান থাকতে এক রাত্রির কষ্টই বা সওয়া কেন?'

ভূপেন-মৃণালিনীর ঘরেই খাটানো হল পাখা। রেগুলেটার বসল। বন্দী, অথচ উড়তে লাগল রাজহাঁস। চুল আর আঁচল একসঙ্গে সামলাতে না পেরে মৃণালিনী বিহ্বল হয়ে শিশুর মত হাসতে লাগল।

সবচেয়ে বেশি খুশি জয়ন্তী আর সুবীর। কমাও, বাড়াও, ফুল ফোর্স দাও, ইচ্ছে করে তো বন্ধ করে রাখো। দেখ দেখ একেবারে নট-কিচ্ছু।

'কি, সুবীরকে এবার পড়তে দেবে তো এ ঘরে?' জয়ন্তীর চিবুক ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'বা, আমি কখন বারণ করেছি? তবে জানো ছোট বউদি, ও ভারি চেঁচায়। তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে—' জয়ন্তী পাখার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে রইল।

'তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে চেঁচাবার দরকার হবে না।' সুবীর বললে, 'আর ঐ চেঁচানো কি পড়া নাকি? ওটা হচ্ছে প্রতিবাদ। গরমের বিরুদ্ধে, ছোট ঘরের বিরুদ্ধে, কিছু মনে রাখতে না পারার বিরুদ্ধে। তাই না?' কাকলির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল সানন্দে।

'কিন্তু যাই বলিস সুবীর, কাগজচাপা লাগবে।' বললে জয়ন্তী, 'নইলে শান্তিতে খাতা-বই মেলে বসতে পারবি নে।'

'তুই তো কাকিমার মেয়ে। তবে কাকিমার থেকে কিছু নিয়ে আয় না চেয়ে। কাঁচের নয় পেতলের আনিস। কাকাকে বললেই নিয়ে আসবে ঠিক আফিস থেকে।' সবজান্তার মত ভঙ্গি করল সুবীর।

জয়ন্তী ভার-ভার গলায় বললে, 'কাকিমারা চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—'

তাতে সুবীরের কিছু যায় আসে না। কিন্তু অন্য দিক থেকে ভয় আছে ভেবে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তখন ছোড়দারা নিচে যাবে, আর তুই তোর সাধের ঘরে, একা ঘরে, পড়বি চেঁচিয়ে।' হাসল জয়ন্তী : 'মানে ফের তোর প্রতিবাদের ঝড় তুলবি।'

'আমি আর নড়ছি না।'

'দেখি তখন কে নড়ে।' নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বললে জয়ন্তী।

'তখনকার কথা তখন। আজ তো আচ্ছা করে খেয়ে নিই হাওয়া।' কাঁটা পুরো ঘুরিয়ে দিল সুবীর। পরে বললে, 'তবে কাকিমাদের যাওয়া যদি না হয়। তুই তো পরীক্ষা ছাড়াও ভগবানকে ডাকিস। একবার ডেকে বল না তাঁকে।

কাকিমারা যেন না যায়। সুবীরের মাথার উপরে পাখাটা যেন বহাল থাকে।'

'না রে, ফ্ল্যাট ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে লরি আসবে মালপত্র নিতে।'

জয়ন্তীর চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল: 'একটুও ভালো লাগে না। জানিস, আর সেই বাড়িটা এখান থেকে অনেক দূরে। হেঁটে যাওয়া যাবে না ইচ্ছেমত। পাখা হল বটে, কিন্তু ভারি মন কেমন করবে কাকিমার জন্যে। তোর করবে না?'

'যা-যাঃ!' শেষ গেঞ্জিটাও গা থেকে খুলে ফেলল সুবীর। বললে, 'আমার মন খারাপ হবে যদি সত্যি ঐ কোণের ঘরটাতে সরতে হয়।'

কিন্তু সেণ্টুর কথা অন্য ধরনের। সে কাকলির কোলে চড়ে বলছে, 'পাখাটা তোমার ঘরে নিলে না কেন কাম্মা?'

বাপ-মা বা নিজের ঘর ভাবছে না সে, ভাবছে কাম্মার ঘর।

কাকলি বলল, 'এই তো ভালো হল। তুমি একদম ঠাকুমার কাছে যাও না। এখন ঠাকুমার ঘরে পাখা হল, তুমি ঠাকুমার কাছে শুয়ে ঘুমুতে পারবে।'

'ভালো হবে না কিন্তু—' কাকলির একগুচ্ছ চুল মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সেণ্টু।

'কে বললে ভালো হবে না?' শাসনের মাত্রাটা আরো বেশি হোক এমনি সরস আশা করতে-করতে কাকলি বললে, 'ভালোই তো হল। দুপুরে ছটফট করতে আমার কাছে, পাখার বাড়ি খেতে, এখন ফ্যানের হাওয়ায় এ ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমুবে।'

'না, না, আমি ককখনো থাকব না এ ঘরে।' শাসন-পীড়ন না করে দু হাতে সেণ্টু কাকলির গলা জড়িয়ে ধরল। বললে, 'তুমি আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। হোক গরম, দুপুরে আমি তোমার কাছে ঘুমুব। জানো কাম্মা, তোমার পাখার বাড়ি আমার একটুও লাগে না।'

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরলে ভূপেনের আগে ঘরে ঢুকল মৃণালিনী। সগর্বে বললে, 'নিজে যা কোনোদিন পারো নি, পারতে না, তাই দেখ একবার চোখ তুলে।'

ভূপেন দেখল। বললে, 'কে দিল?'

'সুকু।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ভূপেন।

'তোমার গুণধর যে ভাই সেও দেয় নি তার দাদাকে। উদার হতে পারে নি। নিজে যখন ফ্যান কিনে আনল নিজের ঘরেই শামিল করল। দাদার কথা আর ভেবে দেখল না। সুকু সেরকম নয়। স্বার্থপর নয়।'

'না, না, নিজের ঘরে না টাঙিয়ে এখানে, এ ঘরে, দিয়েছে কেন?' তড়পাতে

লাগল ভূপেন: 'আমার ফ্যানের দরকার নেই। ওর ফ্যান ওকে ফিরিয়ে নিতে বলো।'

'ভীমরতি আর কাকে বলে।' মৃণালিনী বসে গেল কাপড় কাচতে: 'ঘরের একটা ছেলে সংসারের উন্নতি করবে তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে না। এ ঘরে তুমি একলা থাকো না। আমি থাকি, আমার ছেলে-মেয়ে থাকে। আমাদের ফ্যান চাই। আর মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যান্টেড। কাজেই দন্তস্ফুট কোরো না। চুপ করে হাওয়া খেয়ে যাও। নয়তো কম্বল জড়াও। সুকুর ঘরে যে ফ্যান দরকার, তা তুমি কুয়োর ব্যাঙ, তুমি বুঝবে কী! সেই ফ্যান আমি বন্দোবস্ত করে দেব।' পরে নিচের তলাকে শোনাবার জন্যে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল: 'ভাই যে কিছুই করল না সংসারের জন্যে তার জন্যে নালিশ নেই আর ছেলে সমর্থ হয়ে আরাম দিচ্ছে সেবা দিচ্ছে, তাতেই যত অকথা!'

অন্ধকারে ঘরে ঢুকে পরিচিত সুইচ টিপে আলো জ্বালাল সুকান্ত। এ কি, পাখা কই? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সরোষে: 'ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসে নি?'

জয়ন্তীদের ঘরে ছিল কাকলি, গল্পে-গোলমালে শুনতে পায় নি সুকান্তর পায়ের শব্দ। এখন হাঁক শুনে বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে সুকান্তও বারান্দায় এসে দেখতে পেল কাণ্ডটা। বললে, 'এ কি, মিস্ত্রি ঘর ভুল করল নাকি?'

মৃণালিনী নিচে, পূজার ঘরে। তাকে শুনিয়ে, জগজ্জনকে শুনিয়ে কাকলি বললে, 'না। ভুল করবে কেন? তুমি যেমন বলে দিয়েছিলে মা-বাবার ঘরে হবে তেমনি হয়েছে।' বলে সুকান্তর প্রায় হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে এল কাকলি। গম্ভীর স্বরে বললে, 'মা-বাবার ঘর খালি রেখে নিজেদের ঘরে ফ্যান টাঙানো অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত দোষের। তুমিও সেটা বুঝবে। তাই প্রথমটা ওঁদের ওখানে চালান দিয়েছি। পরে যদি আবার আসে তখন দেখা যাবে।'

'কিন্তু কী দুঃসহ গরম এই ঘরে! সুকান্ত আপত্তি তুলল: 'ওদের ঘরের দক্ষিণ খোলা, হাওয়া থাকলে কার্পণ্য করে না।'

ওসব কথা কানেও তুলল না কাকলি। সারা শরীরে লাস্যের হাসি ঢেলে বললে, 'পাখা নয়, তোমার জন্যে নতুন একটা জিনিস করেছি।'

'কী?' সমুদ্রের পারে পথহারা শিশু, এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

'আলোটা নেবাও।' খাটে উঠতে-উঠতে শুতে-শুতে বললে কাকলি।'

কী যেন অন্ধ আকস্মিকতায় সমস্ত অস্তিত্ব ঝংকৃত হয়ে উঠবে তারই উদগ্র আশায় সুকান্ত আলো নিবিয়ে দিল।

আর তক্ষুনি বেডস্থইচ টিপে ঘরে একটি নীলাভ মৃদু আলোর নীরব মোহ-সৃষ্টি করল কাকলি। বললে, 'তোমার জন্যে এই বেডস্থইচটা করেছি। কি, পছন্দ?'

লালসে-বিলাসে অপূর্ব দেখাচ্ছে কাকলিকে। কাকলিকে মানে কাকলির শরীরময়তাকে। যেন ও আগুনে-ভরা শমীলতা। ডালে ফল কাঠে আগুন। উমা আর অমা একসঙ্গে। শুক্ল আর কৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তার করে যেন ঢাকবে সুকান্তকে। দুই শক্তিতে বাঁধবে নিটুট করে। এক শক্তি আবরণ, আরেক শক্তি উন্মোচন। ব্যক্ত আর অব্যক্ত। সত্য আর রহস্য, কুণ্ঠা আর কৃতার্থতা।

সেই বন্ধনে-আচ্ছাদনেই সুকান্ত শান্তি পাবে, আরোগ্য পাবে, পাবে তার আত্মার উপশম। তার সমস্ত দৈন্যের মোচন হবে এখানে, সমস্ত ন্যূনতার পরিপূর্তি। এইখানেই সুকান্তের সমস্ত জিজ্ঞাসার সমস্ত আকূতির উত্তর। সমস্ত জীবনের জয়ধ্বনি।

পরদিন সকালে তৃপ্তমুখে সুকান্ত বললে, 'তোমার বেডস্থইচ ভালো দিনের সূচনা করেছে। কাকারা আজ চলে যাচ্ছে। এসে গেছে লরি। আমরা এবার বিস্তৃত স্থান পাব।' জানলায় দাঁড়াল সুকান্ত। কাকলি নেমে গেল নিচে।

দুটো কুলি মাল তুলছে লরিতে। সব খবরই ভূপেন দেরিতে পায়, এও জানতে পারল যখন লরি প্রায় অর্ধেক বোঝাই হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ চড়কগাছ করে তাকাল হেমেনের দিকে। বললে, 'এ কী হচ্ছে?'

'একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি। সেখানে উঠে যাচ্ছি।'

'কেন, সেখানে কেন?'

'এখানে সুকু আর তার বউয়ের অসুবিধে হচ্ছে, খোলামেলা ঘর পাচ্ছে না—'

'যাদের অসুবিধে হচ্ছে তারা চলে যাক। তুই কেন?' ভূপেন গর্জন করে উঠল।

দাদার মুখের দিকে এক পলক তাকাল হেমেন। পরে একটু আড়াল করে নিয়ে বললে, 'আরো একটু কথা আছে। ছোট বউ ফ্ল্যাট-ফ্ল্যাট করে। ওকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি কাকে বলে ফ্ল্যাট হওয়া। শূন্য বাড়িতে একলা থাকার আনন্দ!'

'না, কাউকে দেব না আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে। কাউকে না। লরি থেকে শিগগির জিনিস নামা বলছি। কে আসতে বলেছিল লরি? কুলিরা গেল কোথায়?' নিজেই মাল নামাতে লাগল ভূপেন।

'সেলামি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল—' হেমেন নিরস্ত্রের মত বললে।

'যাক সেলামি। তার চেয়ে মান বড়, আদর্শ বড়।' ভূপেন ফিরে এল ঘরের দিকে : 'সেলামিই বা যাবে কেন ? আর কাউকে বন্দোবস্ত করে দেয়া যাবে। আর যেই ডুবুক, আমরা নয়, আমাদের দু ভায়ের কেউ নয়। কেউ নয়। কি রে, নামালি ?'

'নামাচ্ছি।' বললে হেমেন।

·২১

'বাবা কী বললেন, শুনলে ?' জিজ্ঞেস করলে সুকান্ত।

'কী বললেন ?' কাপড় কুঁচোচ্ছিল কাকলি, চোখ তুলে তাকাল।

'শোনো নি ?'

'না।' যতদূর সাধ্য চোখমুখ সরল করল কাকলি।

'নিচে এত গোলমাল চেঁচামেচি কানে ঢুকল না তোমার ?'

'গোলমালের জন্যেই হয়তো ঢোকে নি। বলো না কী বললেন ?' কাকলি দাঁড়াল স্থির হয়ে।

'বললেন যাদের এ বাড়িতে অসুবিধে হচ্ছে তারাই চলে যাক বাড়ি ছেড়ে—'

'মানে ?'

'মানে আমাদেরই চলে যেতে বললেন।' টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসল সুকান্ত।

'তোমার মুখের উপর বললেন ? স্পষ্ট হুকুম করলেন ?' কাকলি খাটটা ধরল।

'না, তেমন করে নয়। বাপ হয়ে তেমন করে পারেন নাকি বলতে ?'

'পারেন নি। কেউ-কেউ পারেন। মনে করলেই পারেন।' কাকলি চোখ নামাল।

কথার সুরটা ঘুরিয়ে দিল সুকান্ত। বললে, 'ঠিক তেমনি করে না বললেও পরোক্ষ এখানে প্রত্যক্ষের মতই কাজ করছে।'

'তা হলে কী করবে ?' হাতের কাজ ফেলে খাটের উপর বসল কাকলি।

'চলে যাব।'

মৃদুরেখায় হাসল কাকলি। 'তা হলে কাকা যে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলেন, নিলেন না, সেটা গিয়ে ধরো।'

'ওরে বাবাঃ! সেটা ধরব কী! সেটার ভাড়া দু শো টাকা।' সুকান্ত প্রায় হতাশের মত মুখ করল।

'তোমার রোজগারের আদ্ধেকেরও বেশি বেরিয়ে যাবে শুধু বাড়ি-ভাড়াতেই। তারপরে খাবে কী? খাওয়াবে কী?'

'হ্যাঁ, সমস্যা কি একটা?' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল সুকান্ত। 'এখন আর শুধু খাওয়া নয়, খাওয়ানো। আর কে জানে, হয়তো বা একাধিক।'

শব্দ করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'দয়া করে যে মনে রেখেছ কর্তব্যটা!'

চুপ করে ধোঁয়া ওড়াতে লাগল সুকান্ত।

দুষ্টু-দুষ্টু মুখে কাকলি বললে, 'তা হলে কী হবে?'

'এক শো টাকার মতন একটা ছোটখাট ফ্ল্যাট দেখে চলে যাব। আজ থেকেই বেরুব খুঁজতে। সকলকে বলব। দরকার হলে দালাল লাগাব।'

'ছোটখাট ফ্ল্যাটে কী আর অমন সুসার হবে? এখন যেমন এখানে আছি তার চেয়ে আর কী উন্নতি হল?' কাকলি দু হাত টান করে সোজা হয়ে বসল। 'ছোট-ছোট দুখানা ঘর, এক চিলতে বারান্দা, আলাদা একটু রান্না আর স্নানের জায়গা—সহজেই অনুমান করতে পারি এক শো টাকায় এর চেয়ে আর কতদূর কী হবে! তা হলে আর কী জিতলাম! এখন থাকবার ঘরটা ছোট হলেও সমস্ত উপর-নিচ, ছাদ-বারান্দা, এ-ঘর ও-ঘর সব ঘরেই আমাদের আনাগোনা—'

'তবু ওখানে গিয়ে আমরা স্বাধীন হব।'

'একা-একা থাকাই বুঝি স্বাধীন হওয়া?' বাঁকা করে তাকাল কাকলি।

'নিশ্চয়ই। এক শো বার। কাপড় বুঝে নিজের কোট কাটা। নিজের কাঁচিতে নিজের কাটছাঁট।' আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সুকান্ত: 'তোমার জেলখানার সমস্ত উপর-নিচ ছাদ-বারান্দার চেয়ে ছোট ঘরের স্বাধীনতা ঢের ঢের লোভনীয়।'

'কিন্তু', লঘু করতে চাইল কাকলি: 'পরে যদি কিছু একটা আমাদের হয়-টয়?'

'হবে না।' চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত।

'ভীষ্ম বুদ্ধিমান ছিল।' হাসতে হাসতে কাকলি বললে, 'সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ের আগে করেছিল, বিয়ের পরে নয়। বিয়ের পরে হলে আর তার সাহস হত না।'

'যদি হয় তো হবে।' হেরে গিয়ে সুকান্ত ফের চেয়ারে বসল। বললে, 'যারা একা-একা থাকে তাদের শিশু কি আর মানুষ হয় না?'

'হয়। ঝি-এর হাতে হয়।' ব্যঙ্গের সুর আনল কাকলি।

'তা হলে সেখানেও তাই হবে।' বলে ফেলল সুকান্ত।

'কোন দুঃখে? এ শিশুর ঠাকুমা থাকবে না? এরই জন্যেই তো সংসারে ঠাকুমার দরকার।' মুখ হাসি-হাসি করেই রাখছে কাকলি: 'ঠাকুমা থাকতে শিশুকে আমরা একটা ঝি-এর হাতে সঁপে দেব না। আর ঠাকুরদা থাকতে যে শিশু তার নাতির আদর পেল না তার মত হতভাগ্য আর কে আছে!'

'মূর্খের মত কথা বোলো না।' সিগারেটের শেষ টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুকান্ত: 'তোমার সেই শিশু কোথায়?'

'শরীরে এখনো না আসুক কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় তো আছে। আর বলতে এখন বাধা কী, তার জন্যেই তো বিয়ে। যেমন প্রণামের জন্যেই পুজো।' কাকলি ধরতে চাইল সুকান্তর চোখ। বললে, 'সুতরাং ভাবনা থেকে তাকে বাদ দিলে চলবে না। বরং সকলের আগে তার কথাটাই—'

'ইডিয়ট!' ঘৃণায় ঝাঁজিয়ে উঠল সুকান্ত।

'ইডিয়ট আমি না তুমি?' কাকলিও পালটা ঝাপটা হানল।

'তুমি।' সুকান্ত ফের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, 'নইলে আজকের দিনে কোনো শিক্ষিত লোক পচা পুরোনো দিনের শ্বশুরশাশুড়িওলা সংসারকে আদর্শ ভাবে?'

'দিন পুরোনো হলেই পচা এ তোমার কুসংস্কার।' কাকলি নামল খাট থেকে: 'নচেৎ তুমি যে ভাবছ তুমি শিক্ষিত সেটা তোমার ভুল।'

'ভুল?' সুকান্তর ইচ্ছে হল কাকলির গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'এ তো কম করে বলেছি। রোজগেরে উপযুক্ত ছেলে বাপ-মাকে ফেলে বউ নিয়ে আলাদা সংসার করছে এ খুব একটা আদর্শের কথা?'

'কিন্তু বাপ-মা যদি তাড়িয়ে দেয়?' মুখিয়ে উঠল সুকান্ত।

'দেয় নি তাড়িয়ে।'

'দিয়েছে। যে ভাবে বলেছে তাতে তাড়িয়ে দিয়েছেই একমাত্র মানে।'

'না, ককখনো না।' কাকলিও জোর আনতে জানে: 'তা ছাড়া কারু একটা রাগের কথাই তার সমগ্র কথা নয়। শেষকালে বাবা কী বললেন শোনো নি? ঢোকে নি কানে? বললেন, পারতপক্ষে আমাদের এই একান্নবর্তী পরিবার আমরা ভাঙতে দেব না।'

'একটা ফসিলের মত কথা।'

'ফসিল আবার কথা কইল কবে?' গাম্ভীর্যের মধ্যে চাপল্যের সুর আনল কাকলি।

'না, কথা নেই। উত্তাল কালস্রোতের কাছে দাঁড়াবে না কারু কান্না বা কোলাহল, চাক বা প্রতিবাদের স্পর্ধা। সমস্ত মধ্যবিত্ত ইমারত ধ্বসে ভেসে গলে যাবে।'

'বেশি বাহাদুরি কোরো না।' কাকলি জানলার দিকে এগিয়ে গেল : 'স্রোত যা নেয় তাই আবার ফিরিয়ে দেয়। ভাঙন নদীতে আবার চর জাগে। একটা জিনিস ভেঙে যাচ্ছে বলেই সেটা মন্দ?'

'নিশ্চয়ই। মন্দ বলেই তো ভেঙে যাচ্ছে, দাঁড়াতে পারছে না, থাকছে না টিঁকে।'

'কী যুক্তি! জীবন যেহেতু টিঁকছে না, গোটা জীবনটাই খারাপ।' কাকলি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'আর যা দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত স্বার্থপরতার মত ঘোলাটে অহং-বুদ্ধির মত তাই একেবারে ভালোর অবতার!'

এত তিক্তও কাকলি হতে পারে নাকি? সুকান্তর মনে হল যেন এক তাল কাদা তার মুখের উপর পড়ল ছিটিয়ে। অবতার কথাটার মধ্যে পরিহাস নয়, তীক্ষ্মমুখ ঘৃণার দংশন।

যে দৃঢ় সে তপ্ত হবে কেন? সুকান্ত তাই গম্ভীর গলায় বললে, 'নীতির কথা হচ্ছে না, পরিস্থিতির কথা হচ্ছে।'

'পরিস্থিতি এমন কিছু খারাপ হয় নি।' পিঠ-পিঠ জবাব দিল কাকলি।

'যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কাকা উঠে যাবে ঠিক করেছে, দস্তুরমত ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, ট্রাক এসেছে মাল নিতে, এমন সময় বাড়ির কর্তা বাবা গদগদ হয়ে বললেন, তুই আমার ভাই, তুই যাস নে। ঐ ছোঁড়া যে নতুন বউ নিয়ে এসেছে, হলই বা সে পুত্র, সে ব্যাটা বেরিয়ে যাক—'

'যদি তার অসুবিধে হয়!' সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ে দিল কাকলি।

'অসুবিধে হয়!' সুকান্ত ভেঙচে উঠল : 'অসুবিধে হচ্ছে না বলতে চাও?'

'হচ্ছে।' চোখমুখ স্নিগ্ধ করল কাকলি : 'কিন্তু মোটমাট অসুবিধের চেয়ে সুবিধেই বেশি হচ্ছে। ঢের ঢের বেশি।'

'বেশি?' সাধ্য কি তুমি তপ্ত না হয়ে পারো? সুকান্ত তাই খিঁচিয়ে উঠল : 'নিজের রোজগারের টাকায় নিজের কর্তৃত্ব ফলানো চলবে না, সর্বকর্ত্রী মার হাতে তুলে দিয়ে ভালো মানুষ সাজতে হবে, মার সুপুত্র সাজতে হবে— এ কী ঝকমারি! তার উপরে একটা এজমালি বাড়ির খাওয়া আর পরিবেশন একজনের মর্জির উপরে নির্ভর। তিনি যেদিন ইচ্ছে করবেন সেদিন বাটিচচ্চড়ি, যেদিন ইচ্ছে করবেন সেদিন ঘ্যাঁট। বাড়ির আর কারু রুচি চলবে? আর কারু ফরমায়েশ?'

'তুমি—তুমি মার সম্পর্কে এ কথা বলছ?' মুখ ঘুরিয়ে গালে হাত রাখল কাকলি : 'তুমি মার লাট ছেলে, তোমার জন্যে সব লাটী বাটি। স্পেশ্যাল ডিশ, আলাদা মেনু।

কোনোদিন স্টু, কোনোদিন মোগলাই। তোমার জন্যে তো এলাহি ব্যবস্থা। সংসারে আর কেউ নয়, তুমি— তুমি বলছ এ কথা?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি। আমি তো বলব।' সুকান্ত অসহায়ের মত আরেকটা সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল: 'একজনকে বেশি আরেকজনকে কম, একজনকে স্পেশ্যাল আরেকজনকে অর্ডিনারি— এইটেই তো একান্নবর্তী পরিবারের দোষ। কড়া থেকে দু হাতা দুধ তুলে নিজের ছেলেদের খাইয়ে দেওরের ছেলেদের জন্যে দু হাতা জল ঢেলে রাখা। আমার স্পেশালের সামনে বসে আরেকজন অর্ডিনারি খাবে এটা আমার পক্ষে কম অস্বস্তিকর? আমার নিজের সংসার হলে এসব তারতম্যের কোনো ভয়ও নেই, অশান্তিও নেই। স্পেশ্যাল হলে স্পেশ্যাল, অর্ডিনারি হলে অর্ডিনারি।'

'উঃ, তুমি কী সাংঘাতিক লোক।' উলটো গালে হাত রাখল কাকলি: 'বেশি খেয়েও তোমার অসুবিধে!'

'হ্যাঁ, বেশিতেও অসুবিধে, যদি আরেকটা লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। আর, বেশি হলেই বা কী! খুশি মতন আছে কিছু? যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন ফাউল খেতে পারো? খেতে পারো চিংড়ি মাছ?'

ও-হো-হো করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'চিংড়ি আবার মাছ নাকি? ও তো পোকা, ইনসেক্ট। যার মধ্যে রক্ত নেই সে মাছ হয় কী করে? তবে তো টিকটিকিও খেতে পারো। আর যা সব পুরুষ্টু টিকটিকি ঘোরে তোমার দেয়ালে! নয়তো ফড়িং ধরে। উচ্চিংড়ে। চীনাদের মত আরশুলা।'

'বোকা নিয়ে যাদের ঘর করতে হয় তাদের পোকা না খেয়ে উপায় কি।' কথার মধ্যে যে হাসি না ফুটে জ্বালা ফুটছে সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি সুর পালটাল সুকান্ত। বললে, 'চিংড়ি মাছ খেলে দাদার এলার্জি হয় বলে বাজার থেকে আসতেই পারবে না এ কী জুলুম! একেই বলে একান্নবর্তিতার অত্যাচার। তুমি হাঁচবে বলে আমরা বাঁচব না! তুমি— তুমি এত চিংড়ি মাছ ভালোবাসো।'

'আহা, কী ভালোবাসা! থাক, আমার জন্যে তোমার সোনাদিদি হতে হবে না।' অনেক গভীরে, চিবুকে টোল ফেলে হাসল কাকলি: 'সোনাদিদির আদরে সর্ব শরীর বিদরে।'

'তা একটু বিদীর্ণ হলে ক্ষতি কী! তবু, যাই বলো, আপরুচি খানা, আপরুচি গানার মত সুখ নেই।'

'আপরুচি গানা মানে?'

'নিজের ইচ্ছেমত গান গেয়ে ওঠা। সাধ্য আছে এ বাড়িতে তুমি বাবা-কাকার সামনে গলা ছেড়ে গান গাও, কালোয়াতি সুর ভাঁজো? বেয়াদবি, স্রেফ বেয়াদবি! দেখ দেখি ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে কত বড় হস্তক্ষেপ!'

কথার সুরটা লঘুতার দিকে যাচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হল কাকলি। বললে, 'তার মানে নিজের সংসারে ভীষ্মলোচন শর্মা হয়ে দিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত আওয়াজ ছুঁড়বে!'

'ছুঁড়ব। যাকে বলে স্বাধীনতার জয়োল্লাস। যখন খুশি গান যেমন খুশি বাজনা। আনন্দের আর এর চেয়ে বড় প্রকাশ কী আছে?' কাকলিকে দলে পেয়েছে ভেবে সুকান্তও হালকা হল: 'যেদিন ইচ্ছে চিংড়ি, যেদিন ইচ্ছে ভেটকি। যেদিন ইচ্ছে ইলিশ। খুশি হলে টাটকা, খুশি হলে বাসি।'

'সঙ্গে-সঙ্গেই কলেরা। মাপ করো,' অজানতে একটু গভীর হল কাকলি: 'যদি ধরো, ঈশ্বর না করুন, তোমার কোনো অসুখ হয়?'

'হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।'

'আমার অসুখ হলে?'

'মেটারনিটি হোম।'

'ইয়ার্কির কথা নয়।' কাকলিই লঘুতার সুর কেটে ফেলল: 'যদি কারু অসুখ হয়, আর তা বাড়াবাড়ি হয়, তখন নিদারুণ বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। উপায় নেই তোমার বাবা-মাকে গিয়ে না খবর দিই। যদি আসতে না চান হাতে-পায়ে ধরে না রাজি করি। যদি বলেন, বাড়ি ফিরে চলো, তাই না কোন গিয়ে হাজির হই। সেই যদি লোকই হাসাব তবে মিছিমিছি মল খসাই কেন?'

'তবু তুমি এ সংসারে ছোট মনের নিত্যিকার ঝগড়াঝাটির মধ্যেই থাকবে?' রুখে দাঁড়াল সুকান্ত।

'এ হাঁড়িকুঁড়ির ঠোকাঠুকি, নড়ে চড়ে সরে বসে এরাই আবার এদের সাম্য ও স্থিতি বজায় রাখে। এ দু-জনের ঝগড়া ও দু-জনে মেটায়। ও দু-জনের ঝগড়া এ দু-জন। আর কাল যারা ঝগড়া করেছিল, আজ তারা একত্র বসে হাসে, আর আজ যারা ঝগড়া করছে দেখছ, কাল তারা পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখবে। কিন্তু তোমার ঐ একলার সংসারে যখন ঝগড়া হবে?'

'ঝগড়া হবে মানে, আমাতে-তোমাতে ঝগড়া হবে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'তা তো হতেই পারে। ও আর এমন অসম্ভব কী!'

'তুমি যে এমন ঝগড়াটে তা তো জানতাম না।'

'আর তুমি যে অমন গোঁয়ার, তাই বা কি আমি জানতাম ?' তবু কষ্ট করে মুখে হাসি আনল কাকলি। বলল, 'শোনো। কথাটা তা নয়। স্বামী-স্ত্রী থাকলেই ঝগড়া হবে, আর সে ঝগড়ার ক্রিয়া কী, তাও শাস্ত্রে বলা আছে। ক্রিয়াটা লঘু হওয়া তখনই সম্ভব, যদি সংসারটা এজমালি হয়। মা, কাকিমা, দিদি থাকতে তুমি কত আর হামলা করবে আমার উপর ? আর শ্বশুর-ভাসুর থাকতে আমিই বা কত অশালীন হতে পারব ? তখন এজমালি সংসারই মিটিয়ে দেবে, মিলিয়ে দেবে আমাদের। তখন আবার ঘরের শাদা আলোটা নিবে গিয়ে বেডস্যুইচের নীল আলোটা জ্বলে উঠবে দেখো।'

শেষ দিকে হাসিটা প্রাঞ্জল হয়ে উঠলেও সুকান্তকে পারল না স্পর্শ করতে। সুকান্ত কাঠখোট্টার মত বললে, 'আর ঐ একক সংসার হলে ?'

'ওরে বাবাঃ, তখন তো খোলা মাঠে খোলা অস্ত্রে যুদ্ধ।' কাকলি হাসির জের টেনে বললে, 'তখন তো তুম ভি এম-এ পাশ হাম ভি এম-এ পাশ !'

'তুমি আমাকে এমনি অবিশ্বাস করো ?' থমথমে মুখ করল সুকান্ত।

'এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কী ! এ একটা সম্ভাবনার কথা। যদি-র কথা। যদিও,' আবার হাসল কাকলি : 'যদিও যদি-র কথা নদীর পার।'

'তার মানে, তোমার আর আমাদের ভালোবাসায় আস্থা নেই।' সুকান্ত মুখ ফিরিয়ে বললে, 'তুমি আর বিশ্বাস করো না যে, ভালোবাসাই সমস্ত বিরোধের থেকে আমাদের রাখতে পারে বাঁচিয়ে। তার মানে তুমি বলতে চাও, একা হতে গেলেই আমাদের ঝগড়া আমাদের ভালোবাসার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে।'

'কি জানি কী হবে ! এখনো তো হই নি একা-একা, শুধু তুমি আর আমি !'

'সেই পরীক্ষার জন্যেই একা হওয়া দরকার !' সুকান্ত একটা ঘাই মারল : 'আমি আজ থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দেব।'

'গরু খোঁজা করে বাড়ি খোঁজা !' কাকলিও মুখ এবার থমথমে করল : 'কিন্তু আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এখুনি-এখুনি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ? তুমি ভাবছ, একা বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করার লোকের তোমার অভাব হবে ? পাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী, হয়তো বা বাড়িওলা স্বয়ং। চলন-বলন পাড়ার ছেলেদের পছন্দ না হলে তারাই পিছনে লাগতে পারবে সদলে। একা ফ্ল্যাটে দেখতে পাবে বা চাকরের দুষ্কাণ্ড। একদিন হয়তো বা ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখবে, চাকর উধাও, আমি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় খুন হয়ে পড়ে আছি—'

'তুমি বাড়ি থাকবে কেন ? তুমিও বেরুবে।'

'কী বুদ্ধি! আমিও বেরুব? তোমার সঙ্গে, না? আর ফিরবও একত্র? বেশ, তাই। তা হলে একত্র ফিরে এসে দেখব ঘরের তালা ভাঙা, সমস্ত লোপাট।'

'ডোণ্ট বি সিলি! আর কি কেউ স্বামী-স্ত্রী থাকে না ফ্ল্যাটে?' সুকান্ত দাঁতে দাঁত ঠেকাল।

'থাক। কিন্তু এ কে না বলবে যে এজমালি পরিবারে সিকিউরিটি, নিরাপত্তা, বেশি। বাইরে বেরুবার ফ্রিডমও বেশি। তুমি যখন খুশি বেরোতে পারো এ বাড়ি থেকে, তুমি জানো, কেউ-না-কেউ দেখবে তোমার ঘর-দোর। তোমার জিনিসপত্র। ফ্ল্যাট বাড়িতে এ নিশ্চিন্ততা হবে কখনো? একার সংসারে? তারপর ধরো একদিন রাতে তোমার ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে, আমি কোথায় যাই, কাকে বলি, কাকে পাঠাই খোঁজ করতে। এজমালি সংসারে আমার চিন্তা হলেও আমার চিন্তার ভাগীদার আছে জেনে আমি অনেক আরামে থাকব। যেখানে মনের আরাম নেই, সিকিউরিটি নেই, যেখানে সব সময়ে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, সেখানে যায় কে, থাকে কে!'

'তুমি থাকো তোমার সিকিউরিটি নিয়ে, আরাম নিয়ে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।' সুকান্ত দরজার দিকে এগোতে চাইল।

কাকলি দরজা আগলাল। বললে, 'না, তোমার এখুনি চলে যাবার কোনো কারণ হয় নি।'

'বেশ তো, তুমি থাকো এজমালি সংসার আলো করে, আমি যাই।'

'ডোণ্ট বি সিলি!' এবার পালটা হানবার সুযোগ পেল কাকলি। বললে, 'তুমি জানো তুমি যেখানে যাবে, আমাকেও সেখানে যেতে হবে। আমাকে এখানে রেখে তোমার একা সরে পড়বার কোনো মানে হয় না, কোনো শাস্ত্রে লেখে না। কিন্তু শোনো, একটা কথা তবু বলি। আমার এক গৃহ গেছে,' কাকলির গলা ছলছল হয়ে উঠল: 'আরেক গৃহ আমি সহজে খোয়াতে প্রস্তুত নই।'

'সহজে প্রস্তুত কি আমিই ছিলাম?' সুকান্ত সরল না দরজা থেকে . 'কিন্তু যে চলে যাবার জন্যে ইচ্ছুক, তাকে আটকে রেখে যারা অনিচ্ছুক-আগন্তুক, তাদের চলে যেতে বলাটা অসহ্য।'

'মোটেই অসহ্য নয়। মোটেই সেভাবে বলা হয় নি। কিন্তু,' ডান হাত মেলে দরজা ধরে প্রত্যক্ষ বাধা বিস্তার করল কাকলি। বললে, 'এত যে আস্ফালন করছ, বলি তোমার টিউশানির টাকার জোর কত?'

যেন বিষ ঢেলে বলল কথাটা। তোমার আয় বা উপার্জন কত, তা নয়, তোমার টিউশানির টাকা!

'কেন, তুমি জানো না ?'

'জানি বলেই তো বলছি এত উল্লম্ফন আসে কিসে ? বেশ তো, এক শো টাকাতেই না-হয় ফ্ল্যাট নিলে, তারপর ? চাকরে-মেথরে-ইলেকট্রিকে-ধোপায় আরো ধরো পঞ্চাশ। কি, বাকি টাকার থেকে কিছুই তো দেবে না বাবা-মাকে—নইলে আর পুত্ররত্ন বলবে কেন—সবই ঢালবে নিজের উদরে। কিন্তু বাকি দেড় শো টাকাতে চলবে তোমার সংসার ?'

'কেন, তুমি রোজগার করতে পারবে না ?' প্রায় মুখের উপর তেড়ে এল সুকান্ত।

'আবার, আবার আমাকে টানছ ?'

'কেন টানব না ? উদরে যে ঢালব, সে উদর কি শুধু আমার একার ? সংসার চলতে কি শুধু একা আমি ? তারপর যদি একটা হয়-টয়, তার দায়িত্বও কি একা আমি বইব ? সব সমান-সমান। এক হাতে তালি বাজে না, বাজে নি। সুতরাং তোমাকেও লাগতে হবে। আনতে হবে। হাত মেলাতে হবে।'

'আমার বয়ে গেছে !' দরজার থেকে হাত নামিয়ে এনে কলা দেখাল কাকলি।

'তবে এম-এ পাশ করেছিলে কেন ?'

'এম-এ পাশ করেছিলাম কি চাকরি করব বলে ?' কাকলি ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল।

'তবে চিৎপাত হয়ে ঘুমুবে বলে ? একটা আধুনিক মেয়ে—লজ্জা করে না বলতে ?' সুকান্তও মুখটাকে শীর্ণ করল : 'একটা ডিগ্রি পেয়েছ, সেটা কাজে লাগাবে না ? নিজে ইউজফুল হবে না ? মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয় হয়ে যাবে ?'

'ইউজফুল হবার অর্থ বুঝি চাকরি করে তোমার পেট ভরানো ?'

'আমার নয়, তোমার নিজের পেট ভরানো।'

'এমন কোনো কথা ছিল না।'

'কী আবার কথা থাকবে ! এ কি কনট্র্যাক্ট সই করে বিয়ে হয়েছে যে, শর্তগুলি স্বচ্ছ ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকবে ? এ তো কমনসেন্সের কথা। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, সে ততটুকু প্রয়োগ করে আয় করে। সব ঝিনুককে মুক্তো হয় না, কিন্তু ঝিনুকেরও তো কিছু দাম আছে, চাকচিক্য আছে। এম-এ পাশ যখন, তখন একটা মেয়ে-ইস্কুলে ষাট-সত্তর টাকা না কোন আয় করা যায়। বাড়তি ঐ টাকাটা পেলে বাবা-মাকে দেওয়া যায় কিছু-কিছু।'

'কী আমার আহ্লাদের চাঁদ !' কথার গরমে কাকলির চোখমুখ ঝলসে উঠেছে, আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে বললে, 'ষাট-সত্তর টাকার জন্যে আমি এখন গিয়ে ইস্কুল করি। নিজে টিউটর কিনা, তায় মাস্টারনীর বেশি ভাবতে পাচ্ছে না। আর কী বিবেচক

ছেলে! সংসারে থেকে খোদ দু শো টাকা যেখানে দিতে পারত, সাধ করে বার হয়ে গিয়ে ষাট-সত্তর পাঠাচ্ছে! হাউ মিন!'

'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি দরজা।' কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়ল সুকান্ত।

একচুল নড়ল না কাকলি। লকলক করে উঠল: 'সব ঝিনুকে মুক্তো হয় না, এ সকলেই জানে, কিন্তু সব নুড়িই যে শালগ্রাম হয় না, এটাও জানা দরকার।'

প্রায় ধাক্কা দিয়েই চলে যাচ্ছিল সুকান্ত, হঠাৎ ছুটতে ছুটতে সুবীর এসে খবর দিল, ছোড়দা, নিচে তোমাকে কে ডাকছে।

দরজা থেকে আস্তে সরে গেল কাকলি, আর সুকান্ত ভদ্রভাবে নিষ্ক্রান্ত হল।

আরে, বরেন যে। সুকান্ত উথলে উঠল উচ্ছ্বাসে।

বাইরের ঘরে বসাল সসম্ভ্রমে। বরেন বললে, 'ভাই, মাপ কর। সত্যি-সত্যি বলছি, তোর দুটো তারিখই স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম। তারপরেও কি সময় পাই যে, প্রায়শ্চিত্ত করি। শোন, তোর স্ত্রীকে ডাক। আসছে রবিবার গ্রেট ইস্টার্নে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবি দু-জনে। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ঠিক সময়ে গাড়ি আসবে এখানে, তোদের নিয়ে যাবে। কই, খবর দে ভিতরে। তাঁকেও বলে যাই।'

সুকান্ত নিজেই গেল। খাটে যথারীতি গা ঢেলে শুয়ে ছিল কাকলি, তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ আরেক রকম সুরে সুকান্ত বললে, 'ওঠো, নিচে চলো, বরেন এসেছে আমাদের দু-জনকে নিমন্ত্রণ করতে।'

তড়াক করে উঠে পড়ল কাকলি। নেমে পড়ে উজ্জ্বল মুখে বললে, 'এমনি যাব, না একটু সাজগোজ করব?'

'এই একটু ফিটফাট হয়ে এসো।' দুই চোখে আরেক রকম আলো নিয়ে তাকাল সুকান্ত: 'এই চুলটা মুখটা একটু ঠিক করো—আর জামাটা না-হয় বদলাও। সাজা পান আছে নাকি বাড়িতে? থাকলে একটা খেয়ে নাও।'

বিহ্বল চোখে তাকাল কাকলি। চোখে বুঝি বা সেই বেডসুইচের নীল-নীল আলো জ্বেলে।

সুকান্ত আগে নামল আর বেশ খানিকটা পরে কাকলি।

'এই যে নমস্কার। মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বরেন। প্রার্থনাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'যাবেন কিন্তু দয়া করে। আমার গাড়ি এসে নিয়ে যাবে আপনাদের। সুকু আমার কতদিনের বন্ধু। সু আর কু একসঙ্গে।'

'আমি তো জানতাম উত্তমরূপে, উৎকটরূপে কু।' সপ্রতিভের মত বললে কাকলি।

সকলে হেসে উঠল।

এখানে আসতে আসতে বরেন ভাবছিল শুধু নিমন্ত্রণ খাওয়ানো নয়, একটা উপহারও দেওয়া উচিত নববধূকে। ফুল, বই, প্রসাধনের বাক্স, একটা টি-সেট বা অমনি কিছু। এখন ফিরে যেতে-যেতে ভাবল সোনার স্পর্শ ছাড়া আর কিছু কি মানাবে কাকলিকে ?

. . . ২২

একখানা বাঙলা, একখানা ইংরিজি—দুখানা খবরের কাগজ আসে। সকালবেলা বাইরের ঘরে চায়ের আগে, পরে, মাঝখানে সবাই টানাটানি, কাড়াকাড়ি, ভাগাভাগি করে পড়ে নেয়। সবাই মানে বাড়ির ছেলেরা—পুরুষেরা। তারপর তারা যে-যার কাজে বেরিয়ে গেলে বন্দনা কাগজগুলি কুড়িয়ে ভাঁজ করে উপরে শাশুড়ির ঘরে নিয়ে আসে। ইংরিজি বাঙলার সের-করা দাম আলাদা বলে তাকের উপর দু ভাগ করে সাজিয়ে রাখে। শেষ সাজিয়ে রাখবার আগে বাঙলা কাগজটা উলটে-পালটে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়, তেমন কোনো পাশবিক বা উত্তেজক সংবাদ আছে কিনা। যদি থাকে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলে। যদি না থাকে—বেশির দিনই থাকে না—বাসি খবরের কাগজের মত মুখ করে রেখে দেয় এক পাশে।

ভোজনান্তে মৃণালিনী বাঙলাটা নিয়ে বসে বিস্তৃত হয়ে। বসে, মানে, বসতে না বসতেই শুয়ে পড়ে। বুদ্ধির আয়ত্তে আসুক না-আসুক, যতক্ষণ ঘুম না আসে, খেলার পৃষ্ঠাটা ছাড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে আগাগোড়া। অবশ্য পাত্র-পাত্রী, নিরুদ্দেশ, জমি-বিক্রি, বাড়ি-ভাড়া, শোক-সংবাদ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—এগুলিই তাকে বেশি টানে, বেশি আটকায়, নয়তো সিনেমার বিজ্ঞাপন, নয়তো কাছাকাছি আজ কোথায় পাঠকীর্তনের বৈঠক। কেলেঙ্কারি কিছু থাকলে সে তো সোনায় সোহাগা—ষোলর উপর আরো দুই।

পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে মৃণালিনী, খবরের কাগজ তখন বিছানার চাদর হয়ে যায়। এখন ফ্যান হবার পর পতাকা হয়ে উড়ছে এখানে-ওখানে।

ইস্কুল থেকে জয়ন্তী আসুক, সে এসে আরেক প্রস্থ গুছিয়ে তুলবে।

ঘুম পাড়াবার জন্যে বিজয়ার খবরের কাগজের দরকার হয় না, তার গল্প-উপন্যাসের সচিত্র-বিচিত্র পত্রিকা আছে। নামের দরকার নেই, লেখকের দরকার নেই, কী

ভাবে লিখছে তার দরকার নেই, একটা কিছু ঘটনা আর খানিকটা কথা-কাটাকাটি থাকলেই যথেষ্ট। কী গল্প কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করতে এসো না। ঘুমুতে পারা দিয়ে কথা। গল্পের ভালো-মন্দ নেই, ভালো হলেও ঘুম, না হলেও ঘুম, কোনোটা ঘুম পাড়িয়ে দেবে কোনোটা বা ঘুম পাইয়ে দেবে।

'খবরের কাগজ কি তুমিও পড়ো না নাকি?' মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল কাকলিকে।

কাকলি প্রথমটা হকচকিয়ে গেল।

'কি, পড়ো?'

'পড়ি বৈকি।'

'কই, একদিনও তো দেখি না নাড়তে চাড়তে।' মৃণালিনী প্রায় তিরস্কারের স্বর আনল: 'এতদিন ধরে এসেছ, মুখে নিয়ে দু দণ্ড বসা দূরের কথা, একদিনও তো একনজর উঁকিঝুঁকি মারতেও দেখলাম না।'

'হাতাহাতি হতে হতে কাগজ যে শেষ পর্যন্ত কোথায় চলে যায়—' দুর্বল স্বরে কাকলি বললে।

'যাক না চলে। তোমার যদি সত্যিকার পিপাসা থাকে কাগজ তুমি নিজেই খুঁজে বার করবে। কাগজ ছাড়া তোমার ঘুম হবে না, মুখে খাওয়া রুচবে না, সর্বক্ষণ কেমন খালি-খালি মনে হবে।'

'তারপর আবার কাগজের জন্যে পিপাসা!' বলে ফেলল কাকলি।

'হ্যাঁ, খবরের জন্যে, জ্ঞানের জন্যে।' মৃণালিনী জোর দিয়ে বললে, 'তুমি শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, তোমার এ আগ্রহ তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক না হোক উচিত তো এক শো বার। পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে তা তুমি জানবে না? বাড়ির আর-আররা উদাসীন, বুঝি, ওরা অশিক্ষিত, অসমর্থ। কিন্তু তুমি তো ওদের দলের নও। তুমি বিদ্যালয়, শুধু বিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে এসেছ। তুমি তো হেঁজিপেঁজি নও, তোমার কেন অরুচি হবে? তা হলে কী লাভ হল লেখাপড়া শিখে?'

নাও, এখন আবার দেখিয়ে-দেখিয়ে নিত্যি খবরের কাগজ পড়ো। এ আবার আরেক ফ্যাচাং। কী হয় খবরের কাগজ না পড়লে? এ বাড়িতে এসে এতদিন যে পড়ে নি, জানে নি খবরাখবর, তাতে জগৎসংসারে কার কী অসুবিধে হয়েছে? নিজেই বা সে ঠকেছে কতটুকু? ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হয়েছে এ খবরের কাগজ পড়ে না জানলে কী এমন ক্ষতি হত?

পরদিন খুঁজে পেতে বাঙলাখানা সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল কাকলি।

মৃণালিনী দেখুক এ নিশ্চয়ই তার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নেবে এ কল্পনাও করতে পারত না।

'এ কী পড়ছ?' মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী।

'কেন, খবরের কাগজ—'

'খবরের কাগজ। বাঙলাটা তোমাকে কে পড়তে বলছে? তুমি এম-এ পাশ না? তুমি ইংরিজি পড়বে।' মৃণালিনী নিজেই বাঙলার বদলে ইংরিজিটা এনে দিল কাকলিকে।

কোনটা আনতে কোনটা এনেছে। মৃদু হেসে কাকলি বললে, 'এটা কালকের মা।'

ইংরিজি জানে বলেই তো ভুলটা ধরতে পেরেছে কাকলি। তাই মৃণালিনী খুশিই হল। বললে, 'খুঁজে পেতে তুমিই দেখ না আজকের তারিখের ইংরিজিটা কোথায়! তুমি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারু দাঁত ফোটাবার কেরামতি নেই। আর সকলে তো অঘাচণ্ডি। তুমি তো আর ওদের খাতায় নাম লেখাও নি। তুমি ডিগ্রিধারী। তুমি কত পড়বে, জানবে, বলবে, বোঝাবে আমাদের, বক্তৃতা দেবে, দাবড়ে বেড়াবে সবাইকে—'

ইংরিজি কাগজের আড়ালে সলজ্জ মুখে হাসতে লাগল কাকলি।

মৃণালিনী সেদিন জিজ্ঞেস করল সুকান্তকে, 'সত্যি বলছিস ছোট বউমা এম-এ পাশ করেছে?'

'তাই তো শুনেছি।' বোকা-বোকা মুখ করল সুকান্ত।

'তোর সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত না বলেছিলি?'

'সেইরকমই তো দেখতাম ছায়া-ছায়া।'

'আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও ধোঁকা আছে।'

'কেন বলো তো?' চমকে ওঠবার ভাব করল সুকান্ত।

'নইলে এম-এ পাশ করেছে মেয়ে, কথায়-বার্তায় একটাও ইংরিজি বলবে না? একটুও তার দাব নেই, দাবাট নেই এ কখনো হতে পারে?' মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল: 'লোকে বউ দেখতে আসে, কেউ এম-এ পাশ বলে বিশ্বাস করে না। নিরীহ, নিস্তেজ, এতটুকু জেল্লাজমক নেই, উঁচু-নিচু কথা নেই একটাও। ঘরে ঢুকে এমন একটাও মোটাসোটা ইংরিজি নভেল-টভেল খুঁজে পাই না যে বলতে পারি ছোট

বউমা পড়ছিল! লোকে যে বিশ্বাস করতে চায় না দোষ কী। আমি প্রমাণ করি কী করে? ছোট বউমাই বা কী করে প্রমাণ করে? এই যদি দশা তবে বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী?'

'সব সমান।' নিস্পৃহের মত মুখ করল সুকান্ত: 'হরে দরে হাঁটুজল।'

'কার সাধ্য তফাত করে।' অনুতপ্ত মৃণালিনীর কণ্ঠ: 'এমন জানলে বড় বউয়ের বেলায় বলে দিতাম বি-এ পাশ।'

তবু যা হোক একটু কম করে বলত। মনে মনে হাসল সুকান্ত।

'তুমি যদি সেই বড় বউয়ের মতই হেঁশেল ঠেলো, কালিঝুলি মেখে থাকো আর ছত্রাকার হয়ে ঘুমোও, কী দরকার ছিল বিদ্যের জাহাজ হয়ে?'

এই কথাটাই সেদিন সাড়ম্বরে বলছিল আবার সুকান্ত।

'মা বলছিলেন, তুমি যে এম-এ পাশ করেছ তার কোনো প্রমাণ নেই।'

'কেন?' তরলস্বরেই প্রশ্ন করল কাকলি।

'তুমি কথায়-কথায় ইংরিজি বুকনি দাও না—'

'ইংরিজি বুকনি দিলে এম-এ বোঝা যেত কী করে? আই-এ বি-এও তো হতে পারত।'

'তবু কিছু একটা অনুমান করা যেত সহজে।'

'আর?'

'মোটাসোটা দেখে ইংরিজি নভেল-টভেল পড়ো না।'

'সে তো অনেকে পাশ-টাশ না করেও পড়ে। তাতে আর কী প্রমাণ হত?'

'তবু কিছুটা মান বাড়ত সংসারের। কেমন দেখ এম-এ পাশ বউ সব সময়ে বই, আউট-বই নিয়ে মশগুল। কেমন সুন্দর সংসারকর্মে উদাসীন!'

'সুন্দর?' কাকলি হাসবে না গম্ভীর হবে ভেবে পেল না।

'নইলে, মা বলছিলেন, বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী! ছোট বউ যদি সেই হাঁড়িই ঠেলে, বাসনই মাজে, কাপড়ই কাচে, ঝাঁটপাটই দেয়, তা হলে এম-এ পাশে আর কী এগুল?'

'তুমি কী বললে?'

'আমি আর কী বলব! আমি বললাম, সব সুবোধের এক গোয়াল।'

'তার মানে যে মেয়ে এম-এ পাশ করেছে সে সংসারের কাজকর্ম করবে না?' কাকলি প্রায় কোমর বাঁধল এবার।

'করবে কিন্তু অমন করে দু হাতে নয়। অষ্টাঙ্গে নয়।'

'তার মানে, এম-এ পাশ বলে হাঁ করে খাব না?'

'খাবে কিন্তু হাঁ-টা একটু ছোট করবে।'

'কোন দুঃখে? আমার খিদে কি কম রাক্ষুসে? আমার কি পাখির ঠোঁট?' কাকলি ঘুরে দাঁড়াল: 'বেশ, আমি খাব না, রাঁধব না, চুল বাঁধব না—'

'চুল বাঁধবার দরকারই হবে না।'

'কেন?'

'চুল ঘাড়কাটা করে ফেলবে। মানে বব করবে। শ্যাম্পু করে ফাঁপিয়ে রাখবে। বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাবে না।' সুকান্ত কাকলির চুলে হাত রাখতে গেল, কাকলি সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিল মাথা। হাসতে লাগল সুকান্ত। 'এমনি করে বারে-বারে মাথা ঝাঁকাবে, ঢেউ খেলাবে ঝাঁকড়া চুলে। বারে বারে কানের পিঠে তুলে দেবে আঙুলে করে।'

'তা হলেই প্রমাণ হবে আমি এম-এ পাশ?'

'জানি না। তবে এটুকু বুঝছি, প্রমাণ একটা দেওয়া দরকার। সংসার চাইছে, মা চাইছেন। আত্মীয়-প্রতিবেশী যাঁরা দেখতে আসছেন তাঁরা চাইছেন।'

'তবে ডিপ্লোমাটা তাঁদের দেখাও গে।'

'তা হলে তো কনস্টিটিউশন দেখিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রমাণ করতে হয়।'

'তা নইলে কী করে হবে?'

'কাজ দিয়ে হবে। নইলে যদি জল শুকিয়ে যায়, গাছে ফুল-ফল না ধরে, হাওয়া বিষিয়ে ওঠে ব্যাধিতে, শস্যের জমি বন্ধ্যা হয়, তা হলে আর দেশকে স্বাধীন বলি কি করে, বা, বলেই বা প্রবোধ কোথায়?' অন্য দিকে মুখ করল সুকান্ত।

'তার মানে?' কথাটা আবার কোন দিকে যাচ্ছে, যেন আঁচ করতে পেরেছে কাকলি।

'তার মানে ডিপ্লোমার কাকলি কোন কাকলি তার সাব্যস্ত হবে কিসে?'

'কিসে?'

'এমন একটা কাজে যা একমাত্র এম-এ পাশ মেয়েই করতে পারে। যা বউদি পারে না, কাকিমা পারে না, মা পারে না।'

'মানে এমনি একটা চাকরি যা শুধু এম-এ ডিপ্লোমাধারীর পক্ষেই করা সম্ভব।'

'এই তো, এই তো প্রমাণ তুমি এম-এ পাশ!' উল্লসিত হয়ে ওঠবার ভাব করল সুকান্ত: 'অনেক বিদ্যা না হলে কি এতটুকু বুদ্ধি হয়?'

ঘৃণার চোখে তাকাল কাকলি। অনবরত খোঁচাচ্ছে, নানাভাবে কোণঠাসা করছে,

ঠেলে দিতে চাইছে টাকা রোজগারের রাস্তায়। দু দণ্ড ঠাণ্ডায় থাকতে দিচ্ছে না। একটা শুধু যন্ত্র বানাতে চাইছে, এখন উপার্জনের যন্ত্র।

'তা হলেই খালে-বিলে জল আসবে, ফল ধরবে গাছে, হাওয়া রোগমুক্ত হবে আর জমিতে ফলবে ফসলের স্বপ্ন?' কাকলি ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়াল।

'তখন তোমাকে অন্য এক মূর্তিতে দেখব।' হাত বাড়িয়ে আদর করতে চাইল সুকান্ত, নাগালে পেল না, তবু বললে গাঢ়স্বরে, 'নিশ্চয়ই। তুমিই তো আমার ফসলের স্বপ্ন।'

'আর এই যে সংসারের কাজকর্ম করছি, রাঁধছি-বাড়ছি, বাটনা বাটছি, কুটনো কুটছি এ আমার অন্য এক মূর্তি নয়? বাপের বাড়িতে কোনোদিন রেঁধেছি আমি, না বসেছি বঁটি পেতে? না কি উনুন ধরিয়েছি?'

'নিশ্চয়ই এ অন্য মূর্তি। কিন্তু নতুন-নতুন অন্য মূর্তি চাই।

'নতুন-নতুন?'

'হ্যাঁ, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। এম-এ পাশ মেয়ে সংসারের হাঁড়ি ঠেলছে, নিশ্চয়ই এ নতুন মূর্তি, মধুর মূর্তি। কিন্তু ঐখানেই ঠেকে থাকলে চলবে না। আবার আরেক মূর্তি ধরো। এবার রান্নাঘর ছেড়ে ধরো অফিস-ঘর। হাতা-খুন্তি ছেড়ে খাতা কলম। আরেকরকম সাজসজ্জা। বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে হিল-উঁচু জুতোয় খুট্ খুট্ করে হেঁটে চলো ফুটপাতে।'

এত সহজে হাসে কাকলি, এখন এক ফোঁটা হাসল না। বললে, 'সেখান থেকে আবার আরেক মূর্তি ধরতে হবে না?'

'যদি পারো তো জগৎসংসার অভিনন্দন দেবে। হয়তো সেই আফিসের কর্মীসংসদের তুমি অধিনেত্রী হলে, ব্যক্তিত্বে আনলে একটু রাজনীতির ঝাঁজ, সেখান থেকে আবার আরেক শাখায় হাত বাড়ালে। বিস্তৃত হলে দেশসেবার কাজে। জননায়িকা হলে। ভোটে দাঁড়ালে। মন্ত্রী হলে।'

'কেন, সিনেমা স্টার হলাম না?'

'হায়, তত সুকৃতি কি আছে সিনেমা স্টারের স্বামী হব! তার মোটরগাড়ীর ড্রাইভার হব!' সুকান্ত কলেজে বেরুচ্ছিল, পাঞ্জাবির উপর কাঁধে একটা ভাঁজ-করা চাদর জড়িয়ে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'শোনো। আমাদের সত্তার পদ্মের অনেকগুলি পাপড়ি। একটা-একটা করে যতই তার পাপড়ি খুলবে ততই তার গন্ধ বাড়বে, বর্ণ বাড়বে, শোভা বাড়বে। বাড়তে-বাড়াতে কে না চায়! দেহের স্বাদ যেমন ভঙ্গির নতুনত্বে, জীবনের স্বাদ তেমনি ব্যক্তিত্বের নতুনত্বে। বলো তাই

নয়? একঘেয়ে হয়েছ কি পোকায় ধরেছে। সেই বেঁচে থাকে যে নতুন হয়ে থাকে। নতুনই ফুরোয় না, হারায় না—'

'খুব তো বক্তৃতা মারছ কিন্তু তোমার নিজের কই নতুন হওয়া?' খেঁকিয়ে উঠল কাকলি।

'আগে শুধু পাঞ্জাবি পরতাম, এখন একটু পৃথক, সম্ভ্রান্ত হয়েছি বলে কাঁধে চাদর নিয়েছি।' ম্লানমুখে হাসল সুকান্ত।

'কেন, স্যুট নয় কেন, ফুল-স্যুট?' প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে মারল কাকলি: 'পাঞ্জাবি-চাদরেই কেন ঠেকে থাকবে? সত্তার আর একটা পাপড়ি খোলো। প্রাইভেট টিউটর থেকে মার্কেণ্টাইল ফার্মের অফিসর হয়ে যাও। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি। একটু দেখি তোমার ব্যক্তিত্বের ঝিলিক, চক্ষু সার্থক করি। আমাকে তো বব করিয়ে হিল-উঁচু জুতোয় খুট্ খুট্ করে হাঁটাচ্ছ ফুটপাতে, তুমিও ফুল-স্যুটে ট্রিম্‌ড্ হয়ে গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটো না আমার পাশে-পাশে। নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি। আমাকে তো মন্ত্রী বানাচ্ছ, তুমি নিজে কেন রাজা হও না? এক রাখাল তো হয়েছিল রাজা—'

মানে তুমি রাখালেরও অধম। তুমি এক সামান্য প্রাইভেট টিউটর। এমনি করেই শুনল যেন সুকান্ত। যেতে-যেতে থামল। বললে, 'এ স্বপ্নের কথা হচ্ছে না, সাধ্যের কথা হচ্ছে। যদি কারু সাধ্য থাকে, প্রশ্ন হচ্ছে, সে থাকবে কিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে। যদি গুণ থাকে সে থাকবে কেন মুখ বুজে?'

কাকলি বললে, 'কখনো-কখনো মুখ বুজে থাকাটাই গুণ। নিষ্ক্রিয়তাই প্রকাণ্ড শক্তি।'

আশ্চর্য, ছেলের সঙ্গে মা মিলেছে।

সকালবেলা বন্দনার সাহায্যে রান্নাঘরে এসেছে কাকলি, দেখল, ঠাকুর রাখা হয়েছে।

'বা, ভেবেছিলাম আমি আজ রাঁধব—' কাকলি করুণ মুখ করে বললে।

'না, না, তোমাকে রাঁধতে হবে না। ধোঁয়ার গরমে কষ্ট করতে হবে না।' ঠেস দিয়ে নয়, অশেষ সান্ত্বনার সুরে বলল মৃণালিনী, 'তুমি যোগ্য মেয়ে, বিদুষী মেয়ে, তোমার ফিল্‌ড্ রান্নাঘরে নয়—'

'দিদির কাছ থেকে দু একটা করে বেশ রান্না শিখছিলাম—' কাকলি অস্ফুট আপত্তি করতে চাইল।

'অনেক শিখেছ, কত বই পড়েই না পরীক্ষার ঐ শেষ চুড়োটা পার হতে হয়েছে—

এ থোড়-বড়ি-খাড়া না শিখলেও চলবে।' সন্দেহ কি, সম্ভ্রমের সুরেই কথা বলছে মৃণালিনী: 'এম-এ পাশ মেয়ে হাঁড়ি ঠেলবে কী! তার অন্যরকম কাজ, বড়রকম কাজ। ফেন গালতে হাত-পা পোড়ানো তাকে সাজে না। তাই ঠাকুর রাখলাম।'

সহ্য হচ্ছিল না বন্দনার। বললে, 'তবু যা হোক এম-এ পাশ বউ এসেছিল বলে তার খাতিরে ঠাকুর হল।'

'এম-এ পাশ বউ একটা কথার কথা?' ধমকে উঠল মৃণালিনী: 'তুমি একটা ম্যাট্রিক পাশই হয়ে দেখাও না। সে আর তুমি, আর, যারা সব আছে, সব এক ক্লাশ, এক নমুনা? যদি ঠাকুর আসে, যে কারণেই আসুক, তোমারও তো উপকার হল। তবে হিংসেয় বুক অত চচ্চড় করছে কেন? এরই জন্যে লেখা-পড়ার দরকার।'

ভূপেনের আপত্তি অন্য কারণে। সে বললে, 'দিব্যি এক-আধটু ভালোমন্দ খাচ্ছিলাম, কোত্থেকে এক ভূত চালান করে আনলে। এত হঠাৎ বড়লোকি দেখাবার শখ হল কেন?'

'না, তোমার মত চিরকাল গরিবি চালেই চলতে হবে!' হাত থেকে মেঝেতে একটা কাঁসার বাসন পড়ার মত করে চেঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী: 'সংসারের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে না? এ বড়লোকি তোমার টাকায় নয়, ছেলের টাকায়, সুকুর টাকায়। তোমার সাধ্য ছিল হেঁশেলের খিটকেল থেকে তোমার স্ত্রীকে মুক্তি দাও? সুকু যখন টাকা দিচ্ছে, বেশ মোটা টাকা—আগে পুরোপুরি তিন শোই দিত—আমিই বলে-কয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি, বলেছি, ওটা ছোট বউমাকে দে, ওরও তো নিজের খরচ বলে কিছু আছে—সেই মোটা টাকা থেকে সামান্য একটা ঠাকুর হবে না সংসারে? যার এতখানি দান তার স্ত্রীকে রিলিফ দেব না, তাকে ঝলসাপোড়া করে মারব? তাইতে আরেকজনের লেগেছে। প্রশান্ত তো মোটে ষাট টাকা দেয়। তার কবে কী মাইনে বাড়ল জানতেও পারি না, ষাটের উপর একষট্টি হল না কোনোদিন। বড় বউ যে বড় চিমটি কেটে কথা কইল, প্রশান্ত একটা দিয়ে রাখত একটা ঠাকুর, কবেই তবে তার বউকে রান্নাঘর থেকে উইথড্র করে দিতাম। নিজের মুরোদ নেই, পরের দেখে দোহাই পাড়া।'

ভূপেন দেখল, ক্রমে-ক্রমেই ঘরদোরের ভোল ফিরছে। ঘরে শুধু পাখা হয় নি, দরজা-জানলায় পর্দা হয়েছে, দরজার বাইরে ওয়েলকাম লেখা পাপোশ হয়েছে, টেবলক্লথ হয়েছে, বসেছে ফুলদানি। কেউ বেড়াতে এলে মেঝের উপর মাদুরের উপরে পাতা যাচ্ছে কার্পেট। নতুন বাসন-কোসন হচ্ছে, পিরিচ-পেয়ালা। মেঝেতে

আসন পেতে না বসে টেবিলে চেয়ারে বসে খাওয়া যায় কিনা তাই এখন ভাবছে মৃণালিনী।

ভূপেন বিরক্ত হয়ে বললে, 'তুমি সুকুর টাকাটা সব এমনি নয়-ছয় করছ নাকি ?'

'নয়-ছয় মানে ?' দপ করে জলে উঠল মৃণালিনী : 'সংসারের একটু শ্রী ফেরানো মানে টাকা নয়-ছয় করা ? নিজের আমলে হল না, যদি ছেলের আমলে হয়, লোকে খুশি হয় ! এর আবার বিপরীত, সব তাতেই বাদ সাধা।'

'সে কথা হচ্ছে না।' ভূপেন বললে, 'সুকুর এটা এমন কোনো থাকিয়ে রোজগার নয়। তাই সমস্তই সাজনে-ভোজনে বার করে না দিয়ে কিছু-কিছু জমানো উচিত। কখন কোন উৎপাত এসে চিৎপাত করে দেয় তার ঠিক নেই।'

'তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তার জমার ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।'

'সে আবার কী !' চোখ কপালে তুলল ভূপেন।

'তার বউ। ইচ্ছে করলে সেই কত পারবে আনতে-থুতে। এ তোমার পছন্দ করে আনা নয়। তোমার পছন্দে চললে লক্ষ্মীর বদলে পক্ষী আসত।'

শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল ভূপেন। মুখে খড়কে নিয়ে উঠে গেল উপরে।

লক্ষ্মীকে ফ্যান কিনে দিয়েছে মৃণালিনী।

'দেখলে সংসার তোমার উপর কত প্রসন্ন।' গর্বের মুখে বললে সুকান্ত। 'তোমাকে কত প্রশ্রয় দিচ্ছে, কত আনুকূল্য। কত সম্মান।'

'আহা', উড়িয়ে দিতে চাইল কাকলি : 'এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। আমাদেরই টাকায় আমাদেরই জিনিস কেনা।'

'একান্নবর্তী সংসারে এটুকু ঘটানোতেই কত বিঘ্ন।' সুস্থ সহজ নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত : 'দেখ দেখি কেমন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ঘুরছে এখন পাখাটা। এখন এই হাওয়া কত আরামের, কত শান্তির।'

নতুন আরেকটা পাখা ঘুরছে বাড়িতে, জয়ন্তী সুবীর দেখতে এসেছে উদ্দীপ্ত হয়ে। সেণ্টুও এসেছে।

সুবীর সেণ্টুকে বললে, 'ছাখ সব ঘরে পাখা, শুধু তোদের ঘরই ফাঁকা।'

সেণ্টুর মুখখানি ম্লান। করুণ স্বরে বললে, 'কী করে হবে ? মা বলেছে আমার বাবা খুব গরিব।'

'দেখ এ খুব অন্যায় হল।' ঘর ফাঁকা হতে সুকান্তকে বললে কাকলি, 'এ পাখা দিদিদের ঘরে যাওয়া উচিত।'

কথাটা সুকান্ত কানেও তুলল না।

'তুমিই বলো না, তাই ঠিক ছিল না? ওঁদের ছেলেপুলের ঘর—সেন্টু এত ফ্যান ভালোবাসে—'

'তা মাকে গিয়ে বলো না।' ধমকে উঠল সুকান্ত।

'আমার কাছে যদি টাকা থাকত আমি ওদের একটা কিনে দিতাম।'

'বেশ তো, টাকা থাকালেই হয়। নিজে করলেই হয় রোজগার। আটকাচ্ছে কে?' সুকান্ত দাঁড়াল মুখোমুখি।

'আচ্ছা, তুমি কী! মোটে পঞ্চাশ টাকা রাখছ!'

'পঞ্চাশ টাকা কম কী হাতখরচ!'

'হাতখরচ? বারে-বারেই তো নিজে এসে আবার হাত পাতছ! মাকে কাছে না পেলেই আমার আঁচল চেপে ধরছ। তুমি কী!'

'এক হিসেবে ওও তো আমারই টাকা। এ-কাউণ্টার থেকে না নিয়ে ও-কাউণ্টার থেকে নেওয়া।'

'তবে আমার হাতখরচ বলছ কেন? বললাম এক শো টাকা রাখো। একটু সচ্ছল বলে অনুভব করি।'

'একটু দান-খয়রাত করি দু পাঁচজনকে!' ব্যঙ্গের স্বর আনল সুকান্ত।

'মন্দ কি যদি পারা যায়।'

'বেশ তো করো না, রাখো না। নিজে একটা কাজ-টাজ নিয়ে শক্ত থাবায় মোটা রোজগার করো না। কে বারণ করছে? তারপর নিজের টাকা বিলোও স্বচ্ছন্দে। পঞ্চাশ-এক শো কেন, ঢের ঢের অনেক—'

'রোজগার করা যেন কত সোজা—' চোখ নামাল কাকলি।

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! যদি রাজি থাকো তো আমিও খুঁজতে পারি, বলতে পারি এদিক সেদিক—'

না—তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারল না কাকলি। সে কি হেরে যাচ্ছে? সরে যাচ্ছে কোণের দিকে? চাপে পড়ে দুর্বল, নির্বাক হয়ে যাচ্ছে? দুপুরের ঘুম ছেড়ে, নিভৃতি ছেড়ে সে কি চলে আসছে রাস্তায়, ধুলোমাখা রোদ্দুরে, মানুষের ধুলোমাখা কৌতূহলের সামনে? না, সে ঘুমুচ্ছে তার ঘরে, ঘুরন্ত পাখার নিচে, সেন্টুকে বুকে নিয়ে। এখনো ঘুমুচ্ছে।

পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে বন্দনা।

সেও মেনে নেয় নি অপমান, শূন্যতার অপমান। প্রশান্তকে দিয়ে পাখা করিয়েছে। কেনাতে পারে নি, ভাড়া করিয়েছে। আর তাই এখন ঘুরিয়েছে সতেজে।

সেণ্টুও কম যায় না। যে কদিন মার ঘরে পাখা হয় নি কাকলির কাছে আসে নি শুতে। তানানানা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। মার ঘরে পাখা হতেই আবার আঁকড়েছে কাকলিকে। তার মা ঠিক থাকলেই কাকিমার কাছে তার ঠিক থাকা।

দরজা ঠেলে মৃণালিনী ঘুমন্ত দুই ঘর একবার দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে ঢুকে বন্দনার ঘরের সুইচটা অফ করে দিল। অফ করে দিয়ে আবার সরে গেল ধীরে ধীরে।

কতক্ষণ পরেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল বন্দনা। এ কি, পাখা বন্ধ কেন ? কে বন্ধ করল ?

উঠে পাশের ঘরটা দেখে নিল উঁকি মেরে। সে ঘরে দিব্যি পাখা ঘুরছে। সে ঘরের পাখা কেউ বন্ধ করে নি।

'এ আমার নিজের পাখা, এ আমি যত ইচ্ছে ঘোরাব।' জ্বলন্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল বন্দনা। সুইচটা ফের অন করে দিয়ে বললে, 'অন্যের ঘরে ঘুরতে পেলে আমার ঘরেই বা পারবে না কেন ?'

'এ শুধু পাখা ঘোরানো নয়, এ কারেণ্ট খরচ হওয়া।' রাগে গরগর করতে করতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল মৃণালিনী। বললে, 'এ পয়সা ওড়ানো। যাদের যাট কখনো একষট্টি হবে না তাদের আবার কিসের ফুটুনি !'

২৩

আবার কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ। আবার বৃষ্টি নামবে ঝমঝম করে। পথঘাট ভেসে যাবে। অস্ফুটে থরথর করে কাঁপবে বুঝি কদমগাছটা। সারা গায়ে কুঁড়ি ধরি-ধরি করবে।

মেঘ দেখলেই মন কেমন উড়ু-উড়ু করতে থাকে। ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাই। দূরে, নিরালায়, নাম-না-জানা নির্জনে। কিংবা অন্তত বিয়ের আগের পুরোনো বাড়িটা একবার একটু ঘুরে আসি।

কাকলি টের পেল তার চোখের পাতা অজানতে ভিজে উঠেছে।

লুকিয়ে লাভ কি, সত্যি ভারি মন কেমন করে বাবা-মার জন্যে। কত দিন দেখি না। কত দিন শুনি না। কী সুরে না জানি ডাকতেন নাম ধরে। কী না জানি

ফাই-ফরমাশ করতেন। কিংবা কে জানে করতেনই না বোধ হয়। আহা, পড়ছে পড়ুক, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক একটু শান্তিতে। মা কী করে বুঝতেন, থেকে থেকে এসে মুখে খাবার পুরে দিতেন, খাব না বললেও শুনতেন না। বলতেন, না খেলে গায়ে জোর থাকবে কি করে, গায়ে জোর না থাকলে পড়াগুলিকে স্মৃতিশক্তির দড়ি দিয়ে কি করে বেঁধে রাখবি? আশ্চর্য, মার একবারও এখন জানতে ইচ্ছে করে না তার গায়ের জোরের খবর কী, এখনো সে তেমনি ঘুমকাতুরে কিনা, অকারণে খিদে পায় কিনা আগের মত। মা না খোঁজ নিন, পত্রালিও তো একটা চিঠি লিখতে পারে। নরুকাকা তো বলেই দিয়েছেন, আমি শুধু বিপদের দিনেই স্মরণীয়, আর, ঈশ্বর করুন, তোদের সম্পদের সব কটা পা-ই যেন বজায় থাকে। নরুকাকা না আসুন, কিন্তু ভাইয়েরা? তারা তো কত রাজ্য টহল দিয়ে বেড়ায়, পথ ভুলেও একবার আসতে পারে না এদিকে?

একদিন বাইরে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার আগে সুকান্ত বলেছিল, 'চলো না তোমার বাপের বাড়িতে।'

মুহূর্তে একটা সমুদ্র বুঝি দুলে উঠেছিল বুকের মধ্যে। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল কাকলি। পরে বললে, 'না।'

'তুমি একা গেলে বরং কথা ছিল।' প্রবোধের সুরে সুকান্ত বললে, 'দু-জনে একত্রে গিয়ে সবিনয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালে ভোজবাজি হয়ে যেতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এমনি হয়েছে বলে শুনেছি। এখন আর অস্বীকার করবার মানে হবে না। ঘটানোকে কি করে আর খণ্ডানো যাবে? ইট ইজ নো ইউজ ক্রাইঙ ওভার—চলো।'

'না।' কাকলি আবার বলল সংক্ষেপে।

বাবা-মাকে সে পরাভূত করে এসেছে। এখন যদি সে যায় তাকে নিশ্চয়ই তাঁরা জয়ীর চেহারায় দেখবেন না। হয়তো দেখবেন কাকলি নিজেই কেমন স্তিমিত, নীরস, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। হয়তো প্রচ্ছন্নে শুনবেন তার একটি নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস। হয়তো বা অনুমান করবেন খাবার পরেও তার খিদে থাকে, ঘুমুবার পরেও তার ক্লান্তি যায় না। হয়তো বা আবিষ্কার করবেন তার সাজগোজ গরিব, চলাবলা নিরীহ। মুখচোখ কাঙাল-কাঙাল।

দরকার নেই। ধরা পড়ে যাবে। সবাই বুঝবে, যে পরাভব করেছিল সেই আসলে পরাভূত।

যখন দিন হবে তাদের, মোটর গাড়ি হবে, অত না হোক, যখন সুকান্তর একটা

সুশ্রী চাকরি হবে তখন নিজের থেকেই একদিন যুগলে উপস্থিত হবে না-হয়। কাকলির তখনই হবে ঠিক উজ্জয়িনীর চেহারা, তখনই মানাবে তার উদার অবতরণ।

মুখে বললে সে অন্য কথা। বললে, 'যারা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে সেধে তাদের সোহাগ কুড়োতে যাবে না। দরকার হয় তারা ডাকুক। তারা নিমন্ত্রণ করুক।'

হ্যাঁ, আমরাও নিষ্ঠুর হতে জানি। প্রিয়তাতে যেমন ছিলাম তেমনি শত্রুতাতেও আছি। কাকলির দৃপ্ত ভঙ্গিটা যেন তাই আরো বলল সুকান্তকে।

সুকান্ত বললে, 'তা হলে নরুকাকার বাড়িতে চলো। তাঁরা তো আর লাঠিমারা নন।'

কাকলি হাসল। বললে, 'কিন্তু আমরা তো এখনো সম্পদেই আছি।'

'সম্পদে আছি মানে?'

'নরুকাকা বলে দিয়েছিলেন শুধু বিপদেই তিনি স্মরণীয়। 'আমাদের এখন যখন কোনো বিপদ নেই তখন তাঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না।'

'আমাদের বিপদ নেই কে বললে?'

ভয়ে-ভয়ে সুকান্তর মুখের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, আমাদের আবার কী বিপদ?'

কেমন করে কথাটা বলবে বুঝতে পারছিল না প্রথমে। খানিকটা আমতা-আমতা করে বললে, 'এই আমাদের অসচ্ছল অবস্থা—'

'অসচ্ছল অবস্থা মানে?'

'একেবারে নির্বাত গ্রীষ্ম হয়তো নয় কিন্তু দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যই বা কোথায়?'

'তা নরুকাকা কী করবে?'

'নিজে কিছুই করবে না। শুধু তোমার বাবাকে ধরবে। ধরে একটু নাড়াচাড়া করবে। তা হলেই—'

'তা হলেই—'

'হঠাৎ গুমোট ভেঙে হাওয়া ছুটবে হু-হু করে।' হু-হু করেই সুকান্ত বলে ফেলল কথাটা: 'উড়িয়ে নিয়ে আসবে তোমার দশ হাজার টাকার সার্টিফিকেট কখানা। এক গাছি পারিজাতের মালা।'

কাকলির কানের মধ্যে যেন কে গলানো সিসে ঢেলে দিল। সুকান্তের মুখের থেকে ফিরিয়ে নিল চোখ। দৃঢ়স্বরে বললে, 'বাড়ি ফিরে চলো।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু আত্মীয়ক্ষেত্রে ঝগড়া জিইয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

বিশেষত সে আত্মীয় যখন দমে ভারি।' কিরকম করে হাসল সুকান্ত: 'একটু জপতপ করলেই হয়তো মিলে যায় যোগসিদ্ধি। একটু পূজন-ভজন, একটু স্তবস্তুতি।'

মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেও তাকাল কাকলি। কেমন বেনে-বেনে দেখাচ্ছে সুকান্তকে। আর তার হাসিটা ঠিক প্রতারকের হাসি।

কিন্তু আকাশে আজ নতুন মেঘ দেখেও সুকান্ত সেই টাকার কথাই ভাববে, বলবে, ভাবতে পারত না কাকলি।

উপরে আসতেই কাকলি বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ!'

জানলায় কোথায় একটু কাকলির পাশ ঘেঁষে দাঁড়াবে, তাকাবে বাইরে—সুকান্ত গ্রাহ্যও করল না। আকাশে মেঘ করেছে, তা আবার দেখবার কী! হয় ঝরবে নয় উড়ে চলে যাবে নভান্তরে।

'তোমার আর কি।' বললে দিব্যি সুকান্ত, 'তোমাকে তো আর বেরুতে হয় না, ঘুরতে হয় না টাকা রোজগারের ফিকিরে। বৃষ্টি হলে দিব্যি গোল হয়ে ঘুমুবে দুপুরবেলায়। আর আমি? আমার না আছে ছাতা না আছে ওয়াটার প্রুফ। আমার খাড়া ধারাস্নান।'

'বেশ তো, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না, আমিও ভিজব।' ছোট মেয়ের মত প্রায় নেচে উঠল কাকলি।

এ কিরকম সুর, সন্দেহের চোখে তাকাল সুকান্ত। এ তো তার সঙ্গে রোজগারের রুক্ষ রাজপথে বেরুনো নয়, এ প্রায় শূন্যে ওড়া!

'তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব?' থমকে দাঁড়াল সুকান্ত।

'চলো না দু-জনে কদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। সমুদ্রের পারে নয়তো কোনো পাহাড়ের দেশে।' চুলে-আঁচলে যেন সেই দূরের চাঞ্চল্য নিয়ে এল কাকলি: 'নয়তো কাছাকাছি এমন কোনো একটা সুন্দর জায়গায় যেখানে অখ্যাত বলে সভ্য মানুষেরা কেউ যায় না। তোমার আর কী ভাবনা, তুমি ছুটি করলেই তোমার ছুটি। সত্যি, চলো না লক্ষ্মীটি—'

চলো—মুখে এটুকু বলতে কী হয়েছিল! ক্ষণকালের জন্যে হলেও ভঙ্গুর একটি কল্পনার মান রাখা যেত না? লোকে কি সব সময় ট্রেনেই যায়, মনে-মনে যায় না?

গম্ভীর হল সুকান্ত। বললে, 'টাকা নেই।' পরে হঠাৎ হাত পাতল কাকলির কাছে: 'দেবে কিছু টাকা?'

'কোন দুঃখে?'

'একবার তা হলে বিলেত যেতাম। দুঃখ ফেরাতাম।'

'টাকা থাকলে আমি তো নিজেই যেতে পারি, একটা অপদার্থকে দিতে যাই কেন?'

'আমি অপদার্থ?'

'যে টাকার জন্যে স্ত্রীর কাছে হাত পাতে তাকে আর কী বলে!' কাকলি নিজেকে আর সংবরণ করল না।

হঠাৎ সুকান্ত হরিপদকে তারস্বরে ডাকতে লাগল কিন্তু হরিপদর সাড়াশব্দ নেই। কী কাজে ওকে বাইরে পাঠিয়েছে, তাই বলতে এল মৃণালিনী। এমন গাঁক গাঁক করে চিৎকার করছিস কেন? ঘরে ডাকাত পড়েছে, না কি এ-সি কারেণ্টে আটকে গেছিস কেউ? কী ব্যাপার?

'আমার জুতোতে কালি দেয় নি কেন?' খেঁকিয়ে উঠল সুকান্ত।

'দেয় নি তো নিজে দিয়ে নে।' মৃণালিনী পালটা বললে, 'সংসারে একটা মাত্র চাকর কত দিক সামলাবে। নিজেদের হাত-পা নেই?'

'সেই হাতে কলম পিষব, না জুতো ঘষব? বলি, আমার সময় কই?'

'বা, আমাকে বলো নি কেন?' কাকলি উঠে পড়ল। জুতো কালি বুরুশ নিয়ে দিব্যি বসল মেঝের উপর। বললে, 'যা বৃষ্টি আসছে তাতে জুতোতে কালি লাগানো বৃথা। এমনিতেও ঢোল অমনিতেও ঢোল।'

'বটেই তো।' সুকান্ত ব্যঙ্গের টান দিল। 'শিক্ষার প্রসাধনে আর দরকার কী! এমনিতেও মেয়ে অমনিতেও মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু জুতোয় কালি দেবার জন্যে বাড়িতে কেউ এমনি হামলাদার হয় না। আজকাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে জুতোবুরুশ পাওয়া যায়—'

'পয়সা লাগে, পয়সা।'

'কটা বা পয়সা!' তাচ্ছিল্যে ঠোঁট ওলটাল কাকলি।

'রোজগার তো করতে হয় না, তাই লাগে না বলতে। কটা পয়সাই বা আমাকে দেয় কে।'

'শোনো।' গম্ভীর হল কাকলি: 'পয়সার কথা যখন উঠেছে তখন এখনই বলি—'

'কি?' মুখচোখ সন্দিগ্ধ করল সুকান্ত।

'আমাকে পাঁচটা টাকা দাও।' কাকলি চোখ নামাল।

'কী হবে?'

'কিছু কেনাকাটা আছে।'

'কী কেনাকাটা ?'

ভেবেছিল, বলে, হুকার্স কর্নার থেকে দুটো ব্লাউজ কিনবে। কিন্তু সুকান্তর জিজ্ঞাসার খোঁচাটা কোথায় যেন গিয়ে বিঁধল। বললে, 'অত শত বলতে পারি না। টাকার ন্যায্য দরকার হয়েছে, বলেছি, তুমি এখন তার ব্যবস্থা করবে।'

'করব। কিন্তু তোমার হাতে যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিলাম গোড়াতে—'

'ঐ দেখ তার হিসেব।' টেবিলের উপর বাঁধানো একটা নোটবইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল কাকলি : 'কড়ায়-ক্রান্তিতে বিতং দেওয়া আছে। একটা আধলাও নেই আর তবিলে।'

'সব গেছে ?'

'যাবে না তো কী! ঐ টাকার থেকেই তো নিজে আবার নিচ্ছ নানা কায়দা করে! বিশ্বাস না হয় দেখ না খাতা খুলে।'

সত্যিই খাতাটা খুলল সুকান্ত। বললে, 'আহা, হাতের লেখাটি কী সযত্ন!'

'তোমার কীর্তিই তো লিখেছি, যত্ন না করে উপায় কী!' সংস্কৃত জুতো পায়ের কাছে পাশাপাশি রেখে উঠে পড়ল কাকলি। এগুল টেবিলের কাছে। বললে, 'দেখ, একবার দিয়ে পরে আবার নিয়ে যাবার মতলবে তোমার থাবাগুলো দেখ। একটা টাকা শান্তিতে খরচ করার মত সামান্য যে একটু স্বাধীনতা তাতেও তোমার হিংসে।'

'তাই তো দেখছি।' পায়ে জুতো গলিয়ে চলে যাবার উদাসীন ভঙ্গি করল সুকান্ত।

'সে কি, টাকাটা দিয়ে যাও।'

'মার থেকে চেয়ে নিও।'

'বা, মার থেকে চাইব কেন ? আমি—আমি তোমার থেকে চাইব।'

'আমার হাত তোমার ঐ ললাটের মতই শূন্য।' যেতে যেতে থামল সুকান্ত : 'শাখাপ্রশাখা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন মূল কাণ্ড—মূল কাণ্ডের কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে। সুতরাং মার কাছে হাত না পেতে উপায় নেই।'

'আমি তা জানি না। আমি স্ত্রী, আমি শুধু তোমার কাছে হাত পাতব। তখন তুমি জানো তুমি কোত্থেকে এনে দেবে। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে, না সমুদ্র সেঁচে ?'

'তুমি শুধু স্ত্রী ? তুমি আবার কন্যা না ? তবে বাপ-মার কাছে চাইতেই বা তোমার লজ্জা কিসের ?'

মনের মধ্যে কোন ঘা নিয়ে এই কথাটা বলছে অনায়াসে বুঝতে পেরেছে কাকলি।

তবু সে হাসল। বললে, 'বাবা-মা কী দেবে, কত দেবে? যে যা দেবে তাই পরিমিত। একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দিতে পারে স্ত্রীকে। তোমার কাছে তাই আমার আকাঙ্ক্ষাও নির্লজ্জ, তোমার দানও অফুরন্ত।'

'দাঁড়াও, মাকে বলে যাচ্ছি। কত বললে? পাঁচ? আচ্ছা—'দিব্যি পাশ কাটিয়ে পিছলে চলে গেল সুকান্ত।

নিচে মৃণালিনী তাকে ধরল। বললে, 'তুই একটা কী বল তো!'

'কেন?' হাঁ হয়ে গেল সুকান্ত।

'তুই বউকে দিয়ে জুতো-বুরুশ করাচ্ছিস?'

'কেন, তাতে দোষের কী! বউ যদি জামায় বোতাম লাগাতে পারে, ছেঁড়া জায়গাটা টেঁকে দিতে পারে, জুতোয় একটু কালি বুলোলে এমন অধর্ম কিসের?'

'নিশ্চয়ই অধর্ম।' মৃণালিনী কণ্ঠস্বর তপ্ত করল: 'একটা এম-এ পাশ মেয়ে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই হেসে উঠল সুকান্ত। বললে, 'দেখ না এম-এ পাশ মেয়ে—কেমন নিখুঁত হিসেব রেখেছে, আর কেমন পরিপাটি হস্তাক্ষর। চুলের ফিতে চৌদ্দ পয়সা। তেলেভাজা দু আনা। শীতলার থালা পাঁচ পয়সা—'

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল: 'না। নিজের জুতো নিজে বুরুশ করবি। আগে করতিস কী?'

ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত। বললে, 'আগে স্বাধীন ছিলাম, জুতোও তাই স্বাধীন ছিল, মানে স্যাণ্ডেল ছিল। তার স্নো-পমেটমের দরকার হত না। এখন বন্ধন মেনেছি, জুতোও তাই হাঁ করে গিলে ধরেছে। সম্ভ্রান্ত হবার যন্ত্রণাই ঐ। এখন পায়ে-মাথায় দু জায়গায় অ্যালবার্ট—'

'তুই সম্ভ্রান্ত—তোর বউ সম্ভ্রান্ত না?' মৃণালিনী আবার ধমকাল।

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ। মাঝে-মাঝে কেমন ভুলে যাই। তুমি যদি মনে করিয়ে না দিতে, কে বলত তার ঐ নবনীত চেহারা দেখে! মেঝের উপর কেমন লেপটে বসে তালে-তালে বুরুশ ঠুকছে। বুরুশ ঠুকছে তো নয়, গীটার বাজাচ্ছে।' সদরের দিকে ছুটল সুকান্ত।

মৃণালিনী পিছু ডাকল। বললে, 'ভীষণ মেঘ করেছে। একটু দাঁড়িয়ে যা।'

'ও মেঘ ছলনা, মা। যত দর্শায় তত বর্ষায় না।' সদর পেরিয়ে আবার ফিরল সুকান্ত। বললে, 'কাকলিকে পাঁচটা টাকা দিও তো, মা। ও চাইছিল। ওর কী যেন দরকার—' দ্রুত বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কতক্ষণ পরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বৃষ্টি। উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে খুশি

হয়ে উঠল কাকলি। নিশ্চয়ই পৌঁছয় নি বাস-স্টপে। নিশ্চয়ই ভিজেছে। নয়তো কোথাও আটকা পড়েছে। হয় কোনো মুদি-দোকানে, নয় সেই খড়-বিচালির আড়তটায়, নয়তো বা গাড়ি-বারান্দার নিচে। গাড়ি-বারান্দার নিচে হলে কটা দড়িছুট গরুও নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। কিংবা ভনভনে মাছিওড়ানো কটা আঢাকা খাবারের ফিরিওলা। আগে-আগে, মনে আছে, সুকান্ত বৃষ্টিতে পড়লে কত দুর্ভাবনায় পুড়েছে কাকলি, ওর যেন অসুখ না করে, ওর যেন অসুবিধে না হয়। নিজে ইচ্ছে করে ভিজে রাত্রিতে শিয়রের জানলা খুলে রেখেছে গোপনে, যেন ওর গায়ের ঠাণ্ডা নিজের গায়ে এসে জড়ো হয়। কিন্তু আজ, এখন, কেন কে জানে, মন সর্বক্ষণ উলটো চাওয়া চাইছে। ও জব্দ হোক, ও অসুবিধেয় পড়ুক, হ্যাঁ, মন্দ কি, বিপদেই পড়ুক। ওর কষ্ট হোক, জ্বর হোক, ওর সম্ভ্রান্ততার জুতোর কালি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

কাকলিকে টাকা দেবার কথা মৃণালিনী অবশ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু কদিন পরে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা বাঙালি চাকর সে সুকান্তর ঘরে ঢুকিয়ে দিল। নে, ঐ তোর ঘর। ঐ তোর সাম্রাজ্য।

'কে তুই ?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

ঝাঁটা হাতে কালো ছেলেটা ঝকঝকে দাঁতে হেসে উঠল। বললে, 'আমি এ ঘরের চাকর।' বলেই মেঝেতে ঝাঁটা বুলোতে লাগল।

'এ ঘরের চাকর মানে ? এ বাড়ির চাকর নয় ?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'বাড়ির চাকর তো হরিপদই আছে। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।'

'শুধু এ ঘরের ?' কথাটা যেন তখনো কাকলির কানে অবিশ্বাস্য লাগছে।

'উপায় কী তা ছাড়া। মাইনে যে মোটে দশ টাকা।'

'তোর নাম কী ?' খুশি মনে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'ভগলু। আদর করে ভগু বলে ডাকতে পারেন—'

'আর রাগ হলে ভগা—'

আকর্ণ বিস্তার করে হাসল ভগলু। বললে, 'আমার কাছে এমন কাজ পাবেন, রাগ কাকে বলে মনেও থাকবে না।'

'বটে ? কিন্তু তোর কাজটা কী ?'

'যা করতে বলবেন তাই। বুড়ি-মা তাই হুকুম দিলেন চালাও।'

'যদি কিছু করতে না বলি ?' প্রশ্ন করল কাকলি।

'তা হলেও কিছু কাজ আমার থাকবেই। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঝাড়াপোঁছা, বিছানা

পাতা, জুতো বুরুশ করা, কাপড়চোপড় কাচা—আর', সুকান্তর চোখের দিকে চেয়ে হাসির ঝিলিক দিল ভগলু: 'আর এমন গা-হাত পা মাথা টিপতে পারি—গঙ্গার ঘাটের নাপিতও দেখবেন হার মানবে।'

'বলিস কী!' উৎফুল্ল দুই পা প্রসারিত করে দিল সুকান্ত: 'ঝাঁটা গাছটা তা হলে রাখ হাত থেকে। গঙ্গার ঘাটের নাপিতদের একবার হারিয়ে দে দেখি।'

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে সুকান্তর পা টিপতে লাগল ভগলু।

'লাভলি!' আরামে চোখ বুজল সুকান্ত। বললে, 'তোর নাম যে ভগলু এই এখন আমার ভয়।'

'কেন বাবু?' ভগলুর হাত স্তব্ধ হল ক্ষণকাল।

'ভগলু মানেই তো তুই কেবল ভাগিস, পালিয়ে যাস। তুই যদি পালিয়ে যাস তা হলে বাঁচব কেমন করে?'

'না, না, পালাব না, ছাড়ব না আপনাদের। আপনি আর ঐ বউদিদি। আর মাথার উপরে খোদ বড়বাবু। বড়বাবুর ভাত আর আপনাদের মাইনে। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি।' আবার টিপতে লাগল ভগলু: 'এ তো কিছু নয়, তার উপর যখন আবার কোমর টিপব—'

'সত্যি?' উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সুকান্ত।

'কী কুৎসিত!' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

'শোনো!' চেঁচিয়ে ডেকে উঠল সুকান্ত। বললে, 'কোথায় যাচ্ছ আর ঘরের বাইরে? এ সংসারে তোমার আর কাজ নেই। রান্নাঘরে ঠাকুর, শোবার ঘরে চাকর, নিজস্ব চাকর। কুটোটিও আর দুখানা করতে হবে না। যদি এখন কাজ থাকে তো ঘরের বাইরে নয়, বাড়ির বাইরে।'

ফিরল না কাকলি। দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

'এত আরাম এত আলস্য নিয়ে করবে কী! সামান্য বিছানাটা পর্যন্ত তোমাকে আর পাততে হবে না।' দলাই-মলাই খেতে-খেতে বলতে লাগল সুকান্ত, 'আরাম কুৎসিত সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু পুরুষের বেলায় নয়, স্ত্রীলোকেরও।'

সুকান্তর ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছিল ভগলু। ভূপেন জিজ্ঞেস করল, 'কে ও?'

মৃণালিনী বললে, 'সুকুর জন্যে চাকর রেখে দিলাম।'

'শুধু সুকুর জন্যে?'

'না, না, আপনারও আমি সেবা করব।' ছুটে এসে ভগলু ভূপেনের পায়ের কাছে বসে পড়ল। শুরু করল পা টিপতে।

চমকে উঠে পা সরিয়ে নিল ভূপেন। সশব্দে ধমকে উঠল : 'ভাগ, আমার সেবা করতে হবে না।'

'তুমি না নাও আমার নিতে হবে। কত সময়ে কত রকমের ঠেকা, হাতের লক্ষ্য একটা লোক নেই।' বললে মৃণালিনী, 'কাছেপিঠে কোথাও যেতে হলে চলনদার খুঁজে পাই না। সেদিন জর্দা ফুরিয়ে গেছে, উঃ সে কী যন্ত্রণা, একটা কেউ নেই আপনার লোক ছুটে চলে যায় দোকানে, উদ্ধার করে আমাকে।'

'তুমি সংসারে এ কী বিলাসের বন্যা আনছ বলো তো—'

'চুপ করো। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বিলাসের স্রোত!' লকলক করে উঠল মৃণালিনী : 'ঠাকুর-চাকর রাখা বিলাস। বলিহারি আর্গুমেণ্ট। মানুষ তার অবস্থার উন্নতি করবে না, এম-এ পাশ বউকে দিয়ে হাঁড়ি ঠেলাবে, জুতো বুরুশ করাবে? এই না হলে আপিলের গ্রাউণ্ড! তা তোমার লাগে কেন? এ তোমার টাকা নয়, আমার ছেলের টাকা। স্বকু কী আন্দাজ সংসারে দিচ্ছে তার খেয়াল আছে? বিনিময়ে সে একটু আরাম নেবে না, দেবে না তার স্ত্রীকে, তার মাকে? মানে, তোমার কথা হচ্ছে একবার যখন গামছা পরেছ চিরকালই গামছা পরো। মাঝে যদি টাকা কিছু রোজগার হয়ও তা হলে সেটা উদরস্থ না করে কবরস্থ করো। মানে, হাড়কিপ্পনের মত শুধু জমাও, জমিয়ে যাও। যক দাও। এই না হলে এই দশা!'

বৈঠকখানায় গিয়ে চুপচাপ বসে আছে ভূপেন, একটা হাত-পাখা নিয়ে ভগলু এসে উপস্থিত। বড়বাবুকে সেবা সে করবেই। টেপা না নিন হাওয়া নিন একটু।

'আমার হাওয়া লাগবে না।' বললে ভূপেন।

তবু ভগলু কথা শোনে না।

তেড়ে গেল ভূপেন। বললে, 'যদি হাওয়া করবি তো পাখাটা কেড়ে নিয়ে দু ঘা বসিয়ে দেব।'

কিন্তু প্রশান্ত লম্বা হাতে সটান দুটো চড় বসিয়ে দিল।

বারান্দায় বসে স্বকান্তের জুতো বুরুশ করছিল ভগলু, বন্দনা প্রশান্তের শু-জোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এ জোড়াও করে রেখো।'

'পারব না।' ভগলু কাঠখোট্টার মতন বললে।

'পারবে না?' থ হয়ে রইল বন্দনা।

'না। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।' সুকান্তের ঘর দেখিয়ে দিল ভগলু: 'আমার দশ টাকা মাইনে। দশ বাড়িয়ে পনেরো করুন, উপর-নিচ সব ঘরেরই আমি চাকর বনে যাচ্ছি।'

'অতশত আমি জানি না।' বন্দনার অন্যরকম যুক্তি: 'তুমি যদি ও ঘরের জুতো সাফ করতে পারো এ ঘরেরও পারবে।'

'তেমন কোনো কথা নেই।' প্রায় কলা দেখাল ভগলু।

বন্দনা গিয়ে প্রশান্তর কাছে নালিশ করল।

কোমর বেঁধে মুখিয়ে এল প্রশান্ত। হুকুম করল ভগলুকে। ভগলু কানেও তুলল না। তুমি মুনিব নও, তুমি বলবার কে? হুকুম প্রত্যাখ্যান করলে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই মার।

ছি ছি, সুকান্ত এল ঝগড়া করতে। লড়তে চাকরের হয়ে।

'ওকে মারছ কেন? ওর দোষ কী? মা ওকে শুধু আমার ঘরের জন্যে রেখেছেন।'

'তোর ঘরের জন্যে রেখেছেন তো বারান্দায় বসে কাজ করছে কেন?' রাগের মাথায় মুখে যা এল বলে ফেলল প্রশান্ত।

'বারান্দা কারু একলার জায়গা নয়। জায়গা যদি তোমার হয় তো আমারও।' সুকান্ত বললে, 'আসল কথাটা হচ্ছে ওর মাইনে কে দিচ্ছে—ওর মাইনে আমি দিচ্ছি। সুতরাং ভুল নেই, ও আমার একলার চাকর।' ওকে আরো দাও না পাঁচটা টাকা। তারপরে নাও না কাজ আদায় করে।'

'বয়ে গেছে।'

ঘরে এসে ঢুকলে সুকান্তকে নগ্নকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠল কাকলি: 'ছি ছি, তুমি ওসব কথা বললে? বললে তোমার দাদাকে?'

'কেন, অন্যায় কী বলেছি!'

'জঘন্যতম অন্যায়। ভগলুকে তোমার বলা উচিত ছিল, দাদার জুতো আমারই জুতো।'

'যা সত্য নয় তা আমি বলি না।'

'কেন, তোমার দু জোড়া জুতো থাকতে পারত না? থাকলে দু জোড়াতেই কালি দিত না চাকর?' প্রায় মরীয়ার মত কাকলি বললে, তুমি—তুমি কেন দাদার থেকে নিজেকে আলাদা করলে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুকান্ত বললে, 'বেশ তো, দাদা ওর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেই পারেন।'

'আমি বাড়িয়ে দেব মাইনে। তুমি দাও আমাকে পাঁচ টাকা।' দাবির ভঙ্গিতে হাত পাতল কাকলি।

'আমি পাব কোথায়?'

'সেদিন যে চেয়েছিলাম, তুমি তোমার মাকে বলবে বলেছিলে, অন্তত দাও সেই টাকাটা।'

'কেন, মা তোমাকে দেন নি?'

'না।'

'তা আমি কী জানি। তুমি তবে মার কাছ থেকে চাও গে।'

কাকলি গুম হয়ে রইল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সুকান্ত দেখল ভগলু প্রশান্তের জুতোতে নির্বিঘ্নে কালি দিচ্ছে : ঝণ্টু-সেণ্টুরগুলোও বসেছে সারি সারি। আর ওটা কি বউদির?

'এ কী রে!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল সুকান্ত : 'এত মারধোরের পর?'

ঝকঝকে দাঁতে আকর্ণ হাসল ভগলু। বললে, 'ছোট বউদিদিমণি পাঁচটি টাকা দিয়েছেন।'

'দিয়েছেন?'

'অন্তত এক মাসের মতন তো হল। এক মাস তো খেটে দিই।'

'ছোট বউদিদিমণি গেল কোথায়?'

'তা আমি কী করে বলব?'

মৃণালিনীর কাছে গেল সুকান্ত।

'মা, তুমি কাকলিকে পাঁচ টাকা দিয়েছ?' একান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল গোপনে।

'না তো।'

'ও চেয়েছিল তোমার কাছে?'

'কই? কখন?'

'তবে ও যে ভগলুকে পাঁচ টাকা বাড়তি দিলে, ভগলু বলছে দিয়েছে, ও সে টাকা পেল কোথায়?'

মুহূর্তে মায়ে-ছেলেয় তীক্ষ্ণ চোখাচোখি হল : পেল কোথায়?

মৃণালিনীর ব্রত সাঙ্গ হয়েছে, কজন ব্রাহ্মণভোজন করাবে। একটু বিস্তৃত বাজার দরকার। সেইজন্তেই দরকার একজন কর্ণধারের।

রবিবারটাই বাছা হয়েছে। বাড়িভর্তি থাকবে সবাই উপস্থিত। স্বামী-সন্তান নিয়ে বাসন্তীও আসবে নিমন্ত্রণে।

'তুই বাজারে যা না।' প্রশান্তকে বললে মৃণালিনী।

ছুটির দিন হলে কী হবে, খবরের কাগজের আছকৃত্য শেষ করে যেমন-কে-তেমন দাড়ি কামাতে বসেছে প্রশান্ত। আয়নার থেকে চোখ তুলে মার দিকে তাকাল সবিস্ময়ে। বললে, 'আমি আবার বাজার করলাম কবে?'

'সে তো আফিস থাকে বলে। আজ যখন তোর ছুটি—'

যে কথাটা কর্কখোলা ওষুধের ঝাঁজের মত প্রথমেই বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা চাপা দিল প্রশান্ত। আয়নার শান্তিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার সংসারে এখন দু-দুটো চাকর, তাদের পাঠাও না।'

'ওরে ব্বাবা, ওদের একটা খর আরেকটা দূষণ। ওরা দামে-ওজনে তো খাবেই, জিনিসও খারাপ আনবে।' মৃণালিনী ঘরের মধ্যে আরো একটু ঘনিয়ে এল: 'আফিস-ডের বাজার করে, সে প্রায় বাঁধাধরা বরাদ্দ বাজার। আজ যখন বিশেষ উৎসব, তখন কারু একটু দেখাশোনা করা দরকার। তোর আর কাজ কী—'

উদ্গত কথাটা আর চাপা দিতে পারল না প্রশান্ত। আয়নাতে দৃষ্টি স্থির রেখে বললে, 'তোমার স্বকুকে বলো না।'

স্বরও শান্ত রাখবে ভেবেছিল, কিন্তু অলক্ষ্যে ঝাঁজ এসে গেল। যেন শোনাল মাকেই সে উলটো হুকুম করছে।

'কেন, তোকে বলতে পারি না?' ঝামটে উঠল মৃণালিনী।

'আমাকে বলে লাভ কী! আমি কি স্মরণীয় অতীতে বাজার করেছি কোনো দিন? বরং তোমার স্বকুই কিছুদিন আগে পর্যন্ত করেছে। ছুটি তো আজ ওরও।'

'ও কোথায় যেন বেরুচ্ছে—' বললে বটে কিন্তু বলেই মৃণালিনী বুঝল কথার স্বরে যেন সত্যের টান লাগল না।

'আমিও বেরুব এক্ষুনি।' সজোরে ব্লেড ঘষতে লাগল প্রশান্ত।

'তোর কতক্ষণই বা লাগবে।' মৃণালিনী প্রায় একটু অনুনয় মেশাল।

'সুকুর তো আরো কম। ও অনেক ওয়াকিবহাল। ওই দরদাম ফিকিরফন্দি ভালো জানে। ওই পারবে জিতে আসতে। আমার অদৃষ্টে তো শুধু ঠকা।' বন্দনা ঘরেই ছিল—ঠাকুর রাখার পর সে আর নিচে তত মোতায়েন নয়—মুখ তুলে প্রশান্ত তার দিকে তাকাল করুণ চোখে।

'বলছি জরুরি কাজে সুকু বাইরে বেরুচ্ছে—'সত্যের টান আনবার জন্যে কথায় মিথ্যে জোর দিল মৃণালিনী।

'আচ্ছা আমি দেখছি কেমন ওর জরুরি কাজ। দাঁড়াও, আমিই বলছি ওকে।' নড়ে-চড়ে উঠল প্রশান্ত।

'থাক, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।' ঘরের ওপাশ থেকে চাপা নিশ্বাস ছেড়ে ফোঁস করে উঠল বন্দনা: 'এম-এ পাশ করা বউয়ের স্বামী, কি কথা বলতে কী কথা বলে অপমান করে বসবে তার ঠিক নেই।'

'মায়ে-পোয়ে কথা হচ্ছে, তুমি বউ, তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে আসো কেন?' দপ করে জ্বলে উঠল মৃণালিনী। মুখে-চোখে আগুন নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এম-এ পাশ করা বউয়ের স্বামী, তার পক্ষে র‍্যাশন-ব্যাগ হাতে নিয়ে মাছতরকারির বাজার করা চলে না।'

'সে চলে আমাদের পক্ষে।' আবার নতুন করে গালে বুরুশ ঘষতে লাগল প্রশান্ত: 'যাদের বউয়েরা নন-ম্যাট্রিক আর যারা নিজেরা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট।'

ছেলে কী বলছে তার দিকে নজর না দিয়ে বউ কী বলেছে তাতেই জ্বলছে মৃণালিনী, 'হ্যাঁ, এম-এ পাশ স্বপ্নেও কোনো দিন হতে পাবে না।'

'বাস্তবেই বা এ কী হয়েছে!' বন্দনা পারল না চুপ করে থাকতে: 'শিংও বেরোয় নি, ল্যাজও গজায় নি। হাত-পাও চারখানা করে নয়।'

'থামো। মুখের উপর কথা বলতে এসো না। তোমার মধ্যে কী আছে? ঐ তো কাঠামোর ছিরি।' মৃণালিনী মুখ বেঁকাল। তারপর থমথমে গলায় বললে, 'তবু ছোট বউয়ের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে, ফিউচার আছে। তোমার? তোমার তো আয় নেই, শুধু ব্যয়ের বাহার।'

মৃণালিনী সুকুর ঘরের দিকেই গেল না, নিচে নামতে লাগল অবাধে।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে বন্দনা কাঁদতে লাগল।

সেণ্টু প্রশান্তর কাছে এসে ভীতু-ভীতু চোখে জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা, মা কাঁদছে কেন?'

'তোমার মায়ের নাকটা কাটা গেছে।'

'না, না, নাক কাটবে কেন?' সেণ্টু তো ঘরের মধ্যেই ছিল। কই দেখে নি তো তেমন আক্রমণ। সেণ্টু প্রথমটা চাইল না বিশ্বাস করতে।

'নাক কাটা না গেলে কি অমনি নাকি সুরে কাঁদে কেউ?' প্রশান্ত উঠে পড়তে চাইল: 'দেখছ না মা কেমন আঁচল দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরে আছে।'

এবার যেন প্রায় বিশ্বাস্য হল ব্যাপারটা। সেণ্টু প্রশান্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, 'কে কাটল, বাবা? ঠাকুমা?'

'না। একটা টুনটুনি।'

'টুনটুনি? পাখি?' চোখ দুটো বড়-বড় করে তাকাল সেণ্টু।

'হ্যা, শোনো নি সেই টুনটুনির গল্প?' প্রশান্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিল: 'সেই যে 'এক টুনিতে টুনটুনাল, সাত-ও রানীর নাক কাটাল'—সেই টুনি পাখি। মনে নেই সেই গল্পটা?'

কত জনের কত গল্প শুনেছে সেণ্টু, বয়ে গেছে তার সব মনে করে রাখতে। তার শৈশব কৌতূহলে যেটা সমূহ অস্বস্তি তারই থেকে সে প্রথম প্রশ্ন করল: 'সেই পাখিটা কোথায়, বাবা?'

'তার তো উড়ে যাবার কথা। কিন্তু যায় নি এখনো। আনাচে-কানাচে ঘুরছে। সকলের নাক কাটিয়ে দিয়ে তবে যাবে।' প্রশান্ত ছেলেকে দু বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

'বা, সবাই মিলে আমরা সেই পাখিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না?' বাহুর মধ্যে ছটফট করে উঠল সেণ্টু: 'ছেড়ে দাও, নিচে থেকে দাদুর লাঠিটা নিয়ে আসি। আর তুমি—তুমি নাও তোমার ছাতাটা।' জোর করে নেমে পড়ল কোল থেকে: 'তারপরে দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।'

প্রশান্ত বললে, 'এ টুনিকে তাড়ানো খুব শক্ত। জানিস, এ শিক্ষিত টুনি। এর প্রকাণ্ড ল্যাজ। এর জন্য বাড়িতে ফ্যান আসে, লাল-নীল আলো আসে, পর্দা আসে, কার্পেট আসে। ঠাকুর আসে, চাকর আসে, ডিনারের টেবিল-চেয়ার আসে—ক্রমে ক্রমে আরো কত আসবে তার ঠিক কী! একে তাড়ানো কি আমাদের সাধ্যি?'

বাবার এ যুক্তি মানতে রাজি নয় সেণ্টু, কিন্তু সে কথায় কান দেবার আগে তার গিয়ে পড়ল মায়ের উপর। নাক-মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়েছে বন্দনা।

'দেখ, দেখ,' উৎফুল্ল হয়ে উঠল সেণ্টু : 'আছে, আছে, মার নাক আছে।'

'ও, আছে নাকি ?' প্রশান্ত নির্লিপ্ত মুখ করল : 'কিন্তু ফিউচার নেই।'

সে আবার কী জিনিস জানতে ব্যস্ত নয় সেণ্টু। মার নাক যে রক্ষা পেয়েছে, তাতেই সে আপাতত খুশি। টুনি তো রানীদের নাক কাটিয়েছিল। আমরা তো গরিব। আমার মা তো আর রানী নয়।

মার দিকেই এগুচ্ছিল, প্রশান্ত তাকে টেনে ধরল। বললে, 'না, ফিউচার নেই এ ঠিক নয়। তুমি যাও, মাকে গিয়ে বলো, মা, আমিই তোমার ফিউচার।'

অনাবশ্যক একটা দুর্বোধ্যের সামনে এসে পড়েছে—সলজ্জ করুণ মুখে হাসল সেণ্টু। বাবার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে কথাটার অর্থ প্রার্থনা করল। অর্থ না বুঝলে যোগ্য সান্ত্বনা মাকে সে দেয় কী করে ?

প্রশান্ত বুঝল সেণ্টুর যন্ত্রণা। বললে, 'মাকে গিয়ে বলো, আমাকে দিয়ে যখন তুমি বউ আনবে, শাশুড়ি হবে, তখন এর প্রতিশোধ নেবে।'

সেণ্টু গিয়ে পৌঁছুবার আগেই বন্দনা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই, আমি এক্ষুনি-এক্ষুনি এর বিহিত চাই।'

'আমিও। কিন্তু কী বিহিত বলো ?'

'আমাকে কয়েক মাস বাপের বাড়িতে রেখে এসো।'

'তাতে লাভ কী ? সেখানেও নো ফিউচার।' বললে প্রশান্ত, 'সেই যদি ফের ফিরেই আসতে হয়, তা হলে ঐ যাওয়ায় তেজ কী ?'

'তা ছাড়া তুমি প্রায় নিত্যরুগী,' আশ্চর্য সায় দিল আবার বন্দনা : 'তোমাকে একলা ফেলে বেশিদিন দূরে থাকাও চলবে না।'

'আর তোমারই যেন খুব স্বাস্থ্য।' চোখে মমতা আনল প্রশান্ত : 'সেই তো সেদিন বলছিলে তোমার পেটে চিনচিনে একটা ব্যথা।'

'সে তোমার প্রতি সহানুভূতিতে।' একটু হাসল বুঝি বন্দনা। তারপর সব মেয়ে যেমন বলে তেমনি বিস্বাদ মুখে বললে, 'কিন্তু আমার এমন অদৃষ্ট কী হবে যে ঐ ব্যথাতেই—এই অপমানের ব্যথাতে নয়—শিগগির-শিগগির মরে যাব। আর তোমার সামনে, তোমার কোলে মাথা রেখে।'

জোরে হেসে উঠল প্রশান্ত। বললে, 'সে আশা বৃথা। তোমার চেয়ে আমার বয়েস যেহেতু বেশি, আমারই আগে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু মরা-টরা কোনো কাজের কথা নয়। কাজের কথা হচ্ছে লড়া। বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই সমস্ত যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মহৎ প্রতিবাদ।'

'তা হলে তুমি কী ভাবছ?' উৎসাহে দু পা এগিয়ে এল বন্দনা।

'ভাবছি না, ভেবে ঠিক করে ফেলেছি!'

'কী?'

'এই বাড়ি, এই সংসার ছেড়ে দেব। অন্যত্র ঘর ভাড়া নেব।'

ঠিক মনের মত কথা। বন্দনার মুখ চোখ ঠোঁট সমস্ত শরীর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'যারা গরিব তাদের গরিবের মত থাকতে অমর্যাদা কী!'

'কিছুমাত্র না। দুখের ভাত সুখের করে খাব।'

'আমাদের চেয়েও কম মাইনের লোক কত থাকে দেখেছি আলাদা বাড়ি করে।' বললে বন্দনা, 'আমরাও থাকব। দড়ির দু প্রান্ত একত্র করতে যদি ক্লান্ত হয়েও পড়ি, ভগবান কৃপা করবেন।'

'ভগবান-টগবান বুঝি না।' উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত: 'এই যে সসম্মানে বাঁচবার পণ নিয়েছি এইটেই সমস্ত। মাকে বলেছিলাম আমিও এক্ষুনি বেরুব, ঠিকই বলেছিলাম। এখুনি বেরুব বাড়ি খুঁজতে। এক্ষুনি।'

'কিন্তু বেরুনোমাত্রই যদি বাড়ি না পাও—' কী যেন আরো বলবে তার আভাস দিয়ে এগিয়ে এল বন্দনা।

'ঐ যে কার নাম বললে— টগবান না কী— সে যদি জুটিয়ে দেয়—'

'রসিকতাও তো করতে পারে।' হাসল বন্দনা: 'এক্ষুনি-এক্ষুনি না দিয়ে যদি ক'দিন পরে জোটায়? তা হলে কী হবে?'

'তাও আমি ঠিক করে ফেলেছি।' প্রশান্ত জামার জন্যে হাত বাড়াল। 'তোমার বাবা মফস্বলে— সেটা খরচের রাস্তা। ওখানে গিয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। সেটা মামুলি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবার মত দেখায়। কলকাতায় তোমার বাপের বাড়ির দিকের যেসব আত্মীয় আছে—তোমার দিদি, মাসি, খুড়তুতো কাকা—তাদের বাড়িতে, দফায় দফায়, ধর্মশালার মত, তোমাদের রেখে আসব, যতদিন না ঘর পাই সুবিধেমত। সে থাকাটাই বরং খানিক বিদ্রোহের মত দেখাবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' জামাটা এগিয়ে দিল বন্দনা: 'কিন্তু তুমি?'

'সম্প্রতি এখানেই থাকব। মাসকাবারি দরমাহা তো দেওয়াই আছে। এখানে থেকেই খবরাখবর করব তোমাদের। তুমিও নিত্যি দেখাতে পাবে চোখের উপর।'

'খুব ভালো হবে। খুব ভালো হবে।' প্রশান্তর পরা জামায় বুকের বোতামগুলি একে একে পরিয়ে দিল বন্দনা।

খবর নিয়ে সেন্টু আগেই ছুটেছে, প্রশান্ত এবার বাইরে বেরুল।

'তোমার কিন্তু বাজারে যাওয়া উচিত।' কাকলি বললে সুকান্তকে।

'তোমার কথায়?' খাটে শুয়ে বই পড়ছিল সুকান্ত, চট করে চটে উঠল।

'আমার কথায় হবে কেন? তোমার মার কথায়।'

'কই, মা বলল আমাকে? এল এ ঘরে? বলল, যা বাজার করে নিয়ে আয়?'

'বলা উচিত ছিল।' গম্ভীর হল কাকলি।

'কী বলা উচিত না-উচিত তুমি মোড়লি করতে এসো না।' পাশ ফিরল সুকান্ত: 'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছ তাই দাও গে।'

কোথায় বিঁধছে সুকান্তকে তা যেন বুঝতে পেরেছে কাকলি। কিন্তু কথাটা সরাসরি না-ওঠা পর্যন্ত সেদিকে যাচ্ছে না কিছুতেই। সরলতা থাকে তো তোলো কথাটা। খোলাখুলি জিজ্ঞেস করো।

'তোমার মায়ের এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করা যায় না।' বললে কাকলি, 'তোমারই উচিত ছিল নিজে থেকে এগিয়ে আসা। কেমন শোভন হত বলো তো!'

'ছাই হত।'

'মা না বলুন, দাদা তো চেয়েছিলেন বলতে—'

উত্তেজিত কথাবার্তা। সব শোনা গেছে এ ঘর থেকে। তাই মুখের উপর বলতে পারল সুকান্ত: 'কই, বলল কই? বউদিই তো মুখ চেপে ধরল। দাদাই বা শুনল কেন বউদির কথা? ছোট ভাইকে হুকুম করলেই পারত।'

'কী আমার ছোট ভাই। এক পায়ে খাড়া। একেবারে ধরো-লক্ষ্মণ!'

'তুমি অত তড়পাচ্ছ কেন! দাদাকে তো আর যেতে হল না!'

'না। তোমাকেও না। এই অবস্থায় কাকে এখন যেতে হবে বুঝতে পাচ্ছ?'

'খুব পাচ্ছি। বাবাকে।' নিশ্চিন্তে আবার পাশ ফিরল সুকান্ত: 'তাই তো মা সটান বলতে গেল নিচে।'

'আর তারই জন্যে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছি। কী উপযুক্ত পুত্র! তাকে কি কিছু আদেশ করা যায়? তার চেয়ে স্বামীকে, গৃহস্বামীকে বিরক্ত করা সোজা। ছি ছি।' জিভের ডগাটা ছুঁচলো করল কাকলি।

সুকান্ত চোখ বুজে রইল। কথা কইল না।

যা অবধারিত, নিচে গিয়ে ভূপেনকে ধরল মৃণালিনী: 'ওঠো, রাখো এসব জঞ্জাল।'

প্রুফ দেখছিল ভূপেন, চমকে উঠল। তবু অস্ফুট প্রতিবাদ না করে পারল না, 'জঞ্জাল!'

'আদালতের প্রুফ তো নেই, ছাপাখানার প্রুফ। জঞ্জাল ছাড়া আর কি। ওঠো, বাজারে যাও। ছেলেদের একজন নবাব আরেকজন বাদশা। তারা পাদমেকং ভূমিও নড়বে না—'

'অগত্যা আমিই নড়ছি। কিন্তু একটা কথা—' ভূপেন জড়তা কাটিয়ে উঠতে চাইল: 'আমি ভাবছিলাম কী—'

'কী ?'

'সমাজ-সংসার কত এগিয়ে গিয়েছে। ঘরে-ঘরে শিক্ষিত শাশুড়ি, শিক্ষিত বউ। কোথাও কোথাও বউয়েরা আবার এম-এ পাশ। বাসে-ট্রামে ভিড়েভাড়ে হাটেমাঠে কত তাদের অগ্রগতি। তা ছাড়া ঠাকুর-চাকর হওয়াতে তারা তো এখন প্রায় কাজছুট—বিছানা পাতা দূরের কথা, মশারিটা পর্যন্ত তাদের খাটাতে হয় না—'

'মোদ্দা কথাটা কী ?' হুমকে উঠল মৃণালিনী : 'মোদ্দা কথাটা তো বলবে।'

'বলছি। বলছি, তোমরা মেয়েরাই তো পারো এখন দৈনিক বাজার করতে। তোমাদের হাতে আর এখন কাজ কই। সেদিন দেখলাম উঠোনের তুলসীমঞ্চের প্রদীপটাও চাকর জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। একটা কিছু তোমরা করবে তো! কোনো ভারি কাজ শক্ত কাজ আর না থাকে, অন্তত বাজারটা করো। কি, পারো না করতে ?'

'খুব পারি।' মৃণালিনী বজ্রনির্ঘোষে বললে।

'আমার মা কিন্তু পারবে না।' কখন অগোচরে বৈঠকখানায় চলে এসেছিল সেণ্টু, গম্ভীর স্বরে বললে।

'না, তোমার মা পারবে না।' সেণ্টুকে হাত বাড়িয়ে ধরল ভূপেন। মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু, ছোট বউমা তো পারেন। প্রথমে শাশুড়ি-বউয়ে দু-জনে একসঙ্গে গেলে, শেষে রপ্ত হয়ে গেলে এক দিন বউ আরেক দিন শাশুড়ি। সঙ্গে চাকর নিলে তো নিলে, নয়তো রিকশা।'

'আমি এক শো বার রাজি। কিন্তু তোমার ছোট বউ একটি আলস্যের স্তূপ, কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, কী বলে না জানি কথাটা—অ্যাডভেঞ্চার নেই।' মৃণালিনী যেমন-কে-তেমন বলতে লাগল অনর্গল, 'কে বলবে এম-এ পাশ। এম-এ পাশ না ঘেমে পাশ! আমি যে সেকেলে মানুষ, রেগুলার ইস্কুল-কলেজে পড়ি নি, আমি বরং কথায়-কথায় ইংরিজি বলতে পারি, শুনে শুনে শিখেছি, আর আমার এম-এ-ওয়ালীর মুখে একটাও ইংরিজি ওয়ার্ড নেই গা! একেবারে শাদামাটা। হাবাগোবা।'

'তোর মা কেন পারবে না রে দাদু ?' সেণ্টুর চিবুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

সেণ্টু বললে, 'আমি আর দিদি আর মা আর বাবা, আমরা অন্য বাড়িতে উঠে যাব।'

ভূপেন শুনল, অন্য বাড়িতে বেড়াতে যাব। মৃণালিনীকে বললে, 'দেখলে তো, বড় বউমার হাতে কাজ নেই, তাই আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে চলেছে।'

'কাজ নেই কী? আমি কত বলি ছেলেটাকে সকালবেলাকার কোনো ইস্কুলে-টিস্কুলে—ঐ যে কী কে-জি না হেজি বলে—অমনি একটা কোনো হিজিবিজিতে ভর্তি করে দাও। তারপর রোজ ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে এসো আর ছুটি হলে ইস্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে এসো। আজকাল তো ছেলেকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই আধুনিক মায়েদের কাজ হয়েছে। তা এ বাড়িকে কি আধুনিক করবার জো আছে? সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো হয়েই থাকা চিরকাল—'

'সেই বাবাই গেলেন শেষ পর্যন্ত।' উপরে নিজের ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেল কাকলি: 'আর তাঁর উপযুক্ত পুত্র নির্জীবের মত শুয়ে রইল।'

'শুধু পুত্র উপযুক্ত নয়, পুত্রবধূও উপযুক্ত।' বললে সুকান্ত, 'আর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকাটাই জীবনের লক্ষণ নয় পুরোপুরি।'

'হ্যাঁ, চলা, এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষণ। চরণযুগলের আকৃতিও সেই প্রতীকে তৈরি। কিন্তু,' ঘুরে দাঁড়াল কাকলি: 'দেবে, দেবে আমাকে বাজারে যেতে?'

'বাজারে যেতে নয়, বাজার করতে।' সুকান্ত সংশোধন করতে চাইল।

'ও একই কথা। বাজারে না গেলে যায় না বাজার করা। কিন্তু দেবে অনুমতি?'

'যেন তোমার সব যাওয়া সব করাই আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে।' কোন দূরে সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ একটা ইঙ্গিতের বাণ ছুঁড়ল সুকান্ত।

'রাখা উচিতও নয়। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিতে চেয়ে এ তুমি আশাও করতে পারো না।' আজকাল কথা বলতে গেলেই কেমন একটা ঝগড়া-ঝগড়া সুর এসে যায়, সেই সুরটাকে শাসন করল কাকলি। বললে, 'কিন্তু কতগুলি নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে, সেখানে স্বামীর মানে সংসারের মত নেওয়া দরকার। বিশেষত যেগুলির সঙ্গে সংসারের, পরিবারের সম্মান জড়ানো। যেগুলি বিশেষরূপে ব্যক্তিগত নয়—'

'তার অর্থ?' ভুরুর কুঞ্চনে সেই একটা ঝগড়ার টান আঁকল সুকান্ত।

'অর্থ সোজা।' মনে মনে হাসল কাকলি: 'অর্থ, আমি যদি সংসারের দৈনিক সওদা করতে বাজারে যাই, তুমি, তোমার বাবা-মা তাতে মত দেবে?'

'কেন দেবে না? বেকার বসে আছ, নড়ে-চড়ে সংসারের যদি একটা উপকার করলে তো মন্দ কি।'

'উপকার ?'

'তা ছাড়া আবার কী ! চাকরের চুরি বন্ধ হবে সেইটেই মস্ত লাভ।'

'আর এদিকে আমি যে কত ঠকব, তার খেয়াল আছে ?'

'ঠকতে-ঠকতে শিখবে।' প্রায় বাণী দেওয়ার মত করে বলল সুকান্ত।

'আমার ঠকাটা সংসার মানবে কেন ? ক্ষতিটা কেন ক্ষমা করবে ? বলবে, এক টাকা সেরের জিনিস তুমি পাঁচ সিকে হারে আনবে কেন ?' তরল হবার আশায় হাসল কাকলি : 'তখন ঐ চার আনা পয়সা আমাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। বারে-বারেই হয়তো নানা জায়গায় ভরতে-পুরতে হবে। উলটা বুঝিলি রাম করে ছাড়বে।'

'ছাড়লেই বা। দেবে ক্ষতিপূরণ।' চিৎ হয়ে শুয়ে বইয়ে হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সুকান্ত। গায়ে লাগল না এমনিভাবে বললে।

'দেব ? কোত্থেকে দেব ?' নিরীহ মুখ করে হাসতে চাইল কাকলি।

'তোমার হাতে তো টাকা আছে। বাড়তি টাকা।'

'বাড়তি টাকা ?'

'হ্যাঁ, গোপন উপার্জনের উৎস।'

'কথাটাকে প্রাঞ্জল করতে গিয়ে বুঝি অমনি করে বললে !' ঝগড়া করবে না তখনও কাকলির প্রতিজ্ঞা।

'তা ছাড়া আবার কী !' খাটের উপর উঠে বসল সুকান্ত : 'ভেবেছিলাম শ্বশুর মশায়ের দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে এসেছ, তুমি শূন্য ছাড়া কিছু নও। এখন দেখছি ও ছাড়াও তোমার আরো অনেক লুকোনো তবিল আছে।'

'লুকোনো তবিল ?' ঘাড় কান মুখ গলা একসঙ্গে গরম হয়ে উঠল কাকলির।

'নইলে ভগুর বাড়তি মাইনের টাকাটা তুমি দিলে কোত্থেকে ?' বইটা ফেলে রেখে খাট থেকে নেমে পড়ল সুকান্ত : 'মা সেদিন আমার জন্যে একটা ওভালটিন কিনে আনল, তুমি সর্দারি করে আরেক কৌটো কিনে আনলে দাদার জন্যে।'

'ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছিল। চায়ের টেবিলে মা তোমার দুধের পেয়ালায় দু-দু ভর্তি চামচ ওভালটিন মিশিয়ে দিলেন আর দাদার বেলায় কণিকামাত্র না—অথচ তিনি সামনে বসে—এ আমার কিছুতে সহ্য হচ্ছিল না।'

'ওভালটিন যে দাদার পছন্দ নয় তা জানো ?'

'কী করে জানব। যখন কিনে এনে দিলাম তখন তো দিব্যি নিলেন হাত পেতে। পরদিন থেকে দিব্যি খেতে লাগলেন দুধের সঙ্গে।'

'তা লাগুন। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কই? বাড়তি টাকাটা পেলে কোথায়?'

'বরেনবাবু যে ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলেন তার সোনার ব্যাণ্ডটা বেচে দিয়েছি।' স্পষ্ট, সরল মুখে কাকলি বললে।

'আমাকে বলো নি কেন?' জবাবদিহি চাইবার মত করে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'কখন বলব? বেচবার আগে, না বেচবার পরে?'

'বেচবার আগে।'

'এ এমন একটা কিছু ব্যাপার নয় যে, তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে।'

'নয়?'

'না। এ আমার একলার জিনিস, আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ঘটেছে, আমি বেচে দিয়েছি।'

কীরকম জ্বালা করে উঠল সুকান্তর। বললে, 'বেচবার পরেও তো বলো নি।'

'কথা ওঠে নি বলি নি। আজ কথা উঠল বললাম। নইলে ঐ তো ঘড়িটা পড়ে আছে টেবিলে। গায়ে সেই সোনার ব্যাণ্ডটা নেই, একটা সাধারণ লেডিস ব্যাণ্ড লাগানো, দেখলেই বোঝা যায়।'

'দেখলেই বোঝা যায় ওটা বিক্রি হয়ে গেছে? ওটা থেকে মোটা হাতে মুনাফা কুড়িয়েছ?'

তবুও চটবে না, চটল না কাকলি। বললে, 'ন্যাড়া ঘড়িতে প্রশ্নটা সব সময়েই প্রকট হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ব্যাণ্ডটা গেল কোথায়? ব্যাণ্ডটা হারিয়েও ফেলতে পারতাম, কাউকে পারতামও বা দিয়ে দিতে। আজ ঠিক-ঠিক প্রশ্ন তুললে, ঠিক-ঠিক উত্তর দিলাম, নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ভগুর মাইনে, ওভালটিনের কৌটো—নিশ্চয়ই নিজের প্রয়োজন।'

একটা কিছু ঘা মারতে খুব ইচ্ছে করছে সুকান্তর। বললে, 'অঙ্গে তো দু-এক খণ্ড আভরণ আছে, দয়া করে তা বেচলে না কেন?'

আমার খুশি—এভাবে গেল না কাকলি। বললে, 'যেটা অবান্তর, অনাবশ্যক—বোতামের চেন বা হাতের আংটির মতই ঘড়ির ব্যাণ্ডটাও অশালীন—সেটাই আগে বিদায় করলাম।'

'শুধু সেই কারণে? না কি ওটার মধ্যে একটা জ্বালা মাখানো ছিল?'

'জ্বালা? জ্বালা কিসের!'

'একজনের করস্পর্শের জ্বালা।'

আপাদমস্তক পাথর হয়ে গেল কাকলি। নিরেট স্তব্ধতার পাথর।

লাঞ্চের টেবিলে পকেট থেকে ঘড়ির কেসটা বের করল বরেন। খুলে দেখাল, ঘড়িটা কত সুন্দর কত কুলীন কত দামী, আর তার বন্ধনীটা নিটোল নিখুঁত সোনার।

কাকলি হাত বাড়িয়েই নিতে চেয়েছিল কেসটা।

'না, না, তা কি হয়? আমি নিজের হাতে পরিয়ে দেব।' বরেন বললে দৃঢ়স্বরে।

কাকলি তবু আড়ষ্ট হয়েছিল। স্বামীর দিকে তাকাল আশ্রয়ের জন্যে।

সুকান্ত উদার ভঙ্গিতে বললে, 'তাতে কি? ঘড়ি তো পরিয়েই দিতে হয়। দেবেই তো পরিয়ে।' তারপর আরো একটু টিপ্পনী জুড়লে: 'গলায় মালা দিতে এলে কি হাতে করে নেয়? যার মালা সে গলায়ই ঝুলিয়ে দেয়।'

বরেন হাসিতে ফেটে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতের মধ্যে কাকলির বাঁ হাত টেনে নিল।

কালীঘাটের শাঁখারিরাও এত সময় নেয় না বা পরিশ্রম করে না শাঁখা পরাতে।

'নিন, ছাড়ুন, আমিই পরছি নিজে-নিজে।' ব্যস্ত হয়ে উঠল কাকলি।

'ধৈর্য ধরতে শিখুন—' যাক এতক্ষণে পেরেছে বরেন। বললে, 'ঘড়ির জন্যে হাত নয়, সন্দেহ কি, হাতের জন্যেই ঘড়ি। দেখবেন ব্যবহার করবেন। বাক্সে তুলে রাখবেন না।'

'কী যে বলেন! ঘড়ির কত দরকার।' মামুলি শোনালেও কথার পিঠে বলতে হল কাকলিকে।

'হাঁ, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখবেন।'

'কিন্তু ঘড়ি দেখবার কত যে সময় হবে বলতে পারি না।' কাকলি স্মিতস্নিগ্ধ চোখে তাকাল সুকান্তর দিকে: 'কেননা সময় এখন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে। সাধ্যি কি ঘড়ি তার সঙ্গে পাল্লা দেয়।'

দার্শনিক বরেনও কিঞ্চিৎ হতে জানে। বললে, 'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াই শেষে একদিন ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া হয়ে যাবে। তখন ঘড়ি দেখবার সময় পাবেন।'

'তখন সময় বুঝি আর কাটতে চাইবে না।' কাকলিকেই বেশি কথা কইবার আশকারা দিচ্ছে সুকান্ত, তাই কাকলিই বললে।

হোটেলে যাবার সময় কাকলির ইচ্ছে ছিল না পস্টাপষ্টি কিছু সাজ করে। কিন্তু উপায় কী সুকান্তকে তুমি সম্পূর্ণ হতাশ করো। ধনী-মানী বন্ধুর কাছে একটু উজ্জ্বল হয়ে দেখা দাও এ কোন স্বামী না চায়। আর যদি বন্ধুর একটু সুনজরে পড়ে, আর

তার ফলে স্বামীর যদি একটা সুরাহা হয়, তা হলে তা তো পরম পাতিব্রত্য। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড। তার বইয়ের প্রচ্ছদপট। ইংরেজ আমলে দিল্লির দরবারে সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়ে অনেকেই আগে-আগে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন আমল বদল হলেও দিল্লির দরবার উঠে যায় নি। এখনো অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর রূপই স্বামীর রুপোর নির্ণায়ক। স্ত্রী যদি পাতে দেবার মত, তা হলে স্বামীও জাতে ওঠবার।

কিন্তু কী তোমার আছে যে সাজবে! অনেকখানি বাহু দেখানো ও একচিলতে পেট-পিঠ দেখানো আঁটসাঁট জামা নেই, নেই বা দেখা-না-দেখায় মেশা ফিনফিনে একটা নাইলন। তবে কি দিয়ে কী হবে। দরকার নেই, যা আছে তাই এদিক-ওদিক উড়িয়ে-ঘুরিয়ে পরে নাও। অন্তত চোখের কোলে কোণ বরাবর রেফ মেরে সুর্মাটা তো আঁকো আর লিপস্টিক তো একটু বুলোও আলগোছে। ব্যক্তিত্বের আসল জাদু চোখে, চোখের কটাক্ষে, আর সেই ভ্রূ-র কথা মনে আছে? তোমার নাম রেখেছিলাম মৃগশাবকলোচনা।

কাকলি হেসে বললে, 'সাজগোজে ত্রুটি থাকা ভালো। বিজ্ঞাপনের বানান ভুল থাকলেই বেশি আকর্ষণীয় হয়।'

'হ্যাঁ, আকৃষ্ট করা নয়, আকর্ষণীয় থাকাই বড় কথা।'

এত সব হিতকথা সেদিন যে বলেছিল, সেই সুকান্তরই এখন কিনা এই ভাষ্য। চোরকে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে এখন আবার চোরের উপরেই রাগ।

যে কথাটা চলছিল তার ফের খেই ধরল সুকান্ত। বললে, 'তা হলে ঘড়ির ব্যাণ্ডটা যখন বেচেছ তখন একে একে গায়ের দু-একখানা গয়না যা আছে, তাও বেচে দিতে পারো।'

'অনায়াসে। দরকার পড়লেই।' কাকলি বললে দৃঢ়স্বরে।

'কারুর অনুমতির অপেক্ষাও করবে না?'

'কেন করব? আমার নিজের জিনিস বেচব তাতে কার কী মাথাব্যথা?'

'স্ত্রী তার গায়ের গয়না বেচবে স্বামী জানবে না?'

'তুমি বুঝি ভেবেছ স্ত্রীর গয়না চিরকাল শুধু স্বামীর প্রয়োজনেই যাবে, স্ত্রীর নিজের প্রয়োজনে যাবে না? যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় দই মারবে।'

'তা হলে তো দেখছি তোমার নিজের টাকা আছে।'

'আছেই তো।'

'তা হলে আর আমার কাছে হাত পাতবার তোমার দরকার নেই।'

'এক বিন্দু নেই।'

'তুমি নিজেই তা হলে নিজেরটা চালাতে পারবে।'

'এক শো বার।'

সুবীর গিয়েছিল বাসন্তীকে আনতে। বাসন্তী আসে নি। মাকে একটা চিঠিও দেয় নি, কেন গেল না। মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল সুবীরকে,' কেন এল না?'

সুবীর বললে, 'জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমুল ঝগড়া।'

২৫

সেণ্টু এবার এসেছে ছোড়দাদুর ঘরে খবর দিতে।

'জানো বিজু, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' বিজয়াকে বিজু বলে সেণ্টু।

'কোথায় যাচ্ছিস রে? মামার বাড়ি?' হাত বাড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিল বিজয়া: 'ঝিকঝিক ট্রেনে করে?'

'না, না, তুমি কিচ্ছু বোঝো না।' খুব গম্ভীর মুখ করল সেণ্টু: 'আমার বাবা যে খুব গরিব। অত রেলভাড়া দেবার পয়সা কোথায়? দুটো ফুল্ আবার দুটো হাফ্! ওরে বাবাঃ!' ঘাড়টা ছোট করে মুখ ভেঙচিয়ে অসম্ভবের ভঙ্গি করলে সেণ্টু।

'তবে কোথায়? শ্যামবাজার? মাসির বাড়ি?'

'তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই।' সরাসরি রায় দিল সেণ্টু: 'মাসির বাড়িতে তো মোটে দুখানা ঘর। সেখানে গুষ্টি-গাষ্টি নিয়ে থাকব কি করে? আর মাসির ছেলেটা যা বিচ্ছু না, দাদা বলে একটুও মানতে চায় না আমাকে। তা মারামারি করতে চাস তো কর, দেখি তোর কত জোর। তা বুঝলে, ওকে কিছু বলা যাবে না—মাসি উলটে তেড়ে আসবে আমাকে। ছেলেটা আহ্লাদের নাড়ুগোপাল।'

'আর তুই? তুই কী?' ছুরি দিয়ে নখ কাটছিল হেমেন, জিজ্ঞেস করল।

'আমি শুধু গোপাল। আমার হাতে নাড়ু কই? আমার বাবা যে গরিব।'

'আমি তোকে নাড়ু দেব। ক্ষীরকদম্ব দেব।'

'আগে দাও।'

এনামেলের কৌটোয় মিষ্টি মজুত করে রাখে বিজয়া। কেউ আদর করে ডেকে খাওয়াবার নেই, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। মন প্রসন্ন থাকলে,

যখন যে তার পক্ষ নেয়, তাকে বিতরণও করে। নচেৎ নিজে খায় বা স্বামীকে খাওয়ায়।

সেণ্টুকে দিল একটা মিষ্টি। বললে, 'এখন বল কোথায় যাচ্ছিস ?'

'যেখানে যাচ্ছি সেখানে এমন মিষ্টি পাব না।' লুব্ধ জিভে আঙুল চাটতে লাগল সেণ্টু : 'তা হলে আরেকটা দাও।'

কৌটো থেকে বিজয়া আরেকটা মিষ্টি দিল। বললে, 'এবার বল।'

আর পাবার নিশ্চয়ই সম্ভাবনা নেই। তবু কৌটোর দিকে তাকিয়ে হতাশ মুখে সেণ্টু বললে, 'আমার বাবা আলাদা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে—এখানে আর আমরা থাকব না।'

'কেন রে, কেন ?' যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়া।

'ঠাকুমা কেবল মাকে বকে।'

'কে বকে ?' সূক্ষ্ম চোখে নখ কাটতে ব্যস্ত, যেন শুনতে পায় নি হেমেন।

'ঐ যে ঝগড়াটে বুড়ি আছে একটা, ডাকাত-গিন্নি—'

'কী বললি ?' হো-হো করে হেসে সেণ্টুকে বুকে নিয়ে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ল বিজয়া। সেণ্টু বুকের মধ্যে খলবলিয়ে উঠল।

'দেখছ না কিরকম থপথপ মোটা হচ্ছে দিন-দিন—'

'কী হচ্ছে ?' বিজয়ার আবার প্রমত্ত হাসি। হাসতে-হাসতে চোখে প্রায় জল আসার জোগাড়।

'হাসছ মানে ?' ছুরির ধারটা কণ্ঠে আনল হেমেন।

'বা, মজার কথায় হাসব না ?' বিজয়া উঠে বসল, সেণ্টুকে নামিয়ে দিল খাট থেকে।

'মজার কথা! এসব কথা ঐটুকু ছেলে শিখল কোথায় ?'

'বলো আমি শিখিয়েছি।' বিজয়া ফোঁস করে উঠল।

'কেউ কি আর শেখাব বলে শেখায়! ওরে শেখ, ঠাকুমাকে ডাকাত-গিন্নি বলবি, ঝগড়াটে বুড়ি বলবি। কখন কে রাগের মাথায় বেফাঁস স্বগতোক্তি করে তাই ছেলেটার কানে যায়। সেই থেকেই শিখে নেয়, কুড়িয়ে নেয়—'

'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন ? ওর মাও তো বলতে পারে।'

'পারে। কিন্তু তোমার অমনি হেসে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নি। একটু শাসন করা উচিত ছিল—'

'তোমাদের বংশের ছেলে, তুমি করো না।' বিজয়া নেমে পড়ল খাট থেকে : 'খারাপ কথা কিছু নয়, একটা মজার কথা বলেছে তাই একেবারে শাসনের হুমকি।'

'হ্যাঁ, তাই, এসব কারণেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে না ছেলেদের—'

'ঠিক বলেছ ছোড়দাদু, ঠাকুরমাটার শ্রাদ্ধ হচ্ছে না—' বললে সেণ্টু, 'কেন যে দেরি হচ্ছে ?'

আবার হেসে উঠল বিজয়া। আবার ছেলেটাকে বুকে নিয়ে থলবল করে উঠল। আবার গড়িয়ে পড়ল খাটে। বললে, 'ছেলেটা কী সুন্দর! যাই বলুক, কিন্তু কী সুন্দর করে বলে!'

'আর তুমি কী সুন্দর করে হাসো!' নখ কাটতে-কাটতে বললে হেমেন।

'হাসব না ?' মারমুখো ভঙ্গি করে উঠে বসল বিজয়া: 'হাসবার কথা হলেই হাসব।'

'প্রশান্ত আলাদা বাড়িভাড়া করে চলে যাবে এটা খুব সুখের কথা ?' ছুরির দিকেই চোখ রাখল হেমেন।

'নিশ্চয়ই সুখের কথা। এ বাড়ির একটা ছেলের যে তবু আত্মসম্মানের বোধ আছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংকল্প করার যে সৎসাহস আছে—তার জন্যে সে অভিনন্দনের যোগ্য।' বিজয়া নেমে দাঁড়াল: 'সে ছেলেকে নিয়ে গৌরব করতে হয়, আনন্দ করতে হয়।'

এখন ডান হাতের নখ ধরতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটাটা অপারেশানের মত কঠিন। পাঁচ-পাঁচটা নখ পাঁচ-পাঁচটা অপারেশান। সেই দুরূহ কাজেই মন দিল হেমেন। সুতরাং প্রশ্নটাও একটু দুরূহ শোনাল। বললে, 'সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বুঝি খুব সম্মানের কাজ ?'

'নিশ্চয়ই। এক শো বার। যে সংসারে নিত্য ঠোকাঠুকি, মারামারি, প্রতি পদে ছোট মনের পরিচয় সেখানে থাকাটা ঘোর—ঘোর অসম্মান। সবাই তো আর তোমার মত ঠুঁটো জগন্নাথ নয়—'

'তার মানে তুমি বলতে চাও বিজয়া-দশমীর পর প্রশান্ত আর বড় বউমা এ বাড়িতে আমাদের প্রণাম করতে আসবে ?'

'এ আবার কী প্রশ্ন! তবু, কথার পিঠে উত্তর, সরাসরি বললে বিজয়া: 'নিশ্চয়ই আসবে।'

'আর কোনো কারণে যদি আসতে দু দিন দেরী হয় আমরা ওদের ত্রুটি ধরব!'

'ধরলামই বা।'

'আর ওরাও আশা করবে যেহেতু জয়ন্তী-সুবীর ছোট, তারা ওদের বাড়ি যাবে প্রণাম করতে ?'

'আশা তো করতেই পারে

'আর যদি কোনো কারণে সুবীর-জয়ন্তীর যেতে দু দিন দেরি হয় ওরা ত্রুটি ধরবে?'

'ধরুক। ধরলে কী হয়?'

'কী হয় মানে?' এবার ছুরির থেকে চোখ তুলে বিজয়ার চোখের দিকে তাকাল হেমেন: 'তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা বিজয়াদশমীর পর এসে এক থালা মিষ্টি খেত তারা দু বাড়ি গিয়ে দু থালা মিষ্টি খাবে?'

হাসি পেলেও হাসল না বিজয়া। বললে, 'খেলেই বা! তাতে তোমার কী! আমাদের কী?'

'আমাদের কী মানে! আর সেই মিষ্টি ঝণ্টু-সেণ্টু কিনে আনবে ঠোঙা করে? বাড়ির থেকে কত দূরে ময়রার দোকান হয় তা কে বলবে।'

'বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে এমনিধারা ছোটখাট বাজার করেই থাকে।'

'ওরা ঠোঙায় পুরে যা আনবে তা ওরা নিজেরা খেতে পাবে না, কোন রাক্ষস এসে খেয়ে নেবে। রাক্ষসটা খাবে আর ওরা দুই ভাই-বোন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।'

'চেয়ে থাকবে কেন? ওরাও খাবে।'

সেণ্টুর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, খাবে? জোটাতে পারবে প্রশান্ত? অতিথিকে খাওয়াতে গিয়ে নিজের সন্তানদের একেবারে অনশনে না হোক, রাখবে ক্ষীণাশনে। তাতে খুব সুখ, খুব হাসি?'

'অমন অতিথি-আপ্যায়নে দরকার নেই।' সজোরে মাথা ঝাঁকাল বিজয়া: 'অতিথিকে দেবে না মিষ্টির থালা।'

'দেবে না?' আবার ছুরিতে মনোনিবেশ করল হেমেন: 'ঐ যে, কী না জানি বললে কথাটা? সম্মান। মধ্যবিত্ত সম্মান। পথে কুড়োনো শালপাতা, সেই শালপাতার ঠোঙায় করে আনা দেখন-মিষ্টি। মানে, বাইরে থেকে দেখতেই মিষ্টি, কিন্তু ভিতরে—' একটা ভয়াবহ দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেমেন।

'কী ভিতরে?'

'ভিতরে সন্তানের উপবাস, স্ত্রীর হাহাকার।'

'রাখো। আর কেউ অল্পবিত্ত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করে না? যার যেমন অবস্থা তার তেমনি ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলের দুধ অতিথির চায়ে যাবে এ অসম্ভব।'

'বললে তো অসম্ভব, কিন্তু তাই যাচ্ছে, যাবে। ঝণ্টু-সেণ্টুর দুধ জুটবে না। ক্ষীরকদম্ব দূরের কথা, খুরিতে পড়ে থাকা রসগোল্লার সিরেটুকুও পারবে না ধরতে। ওদের মা তাই উনুনের উপরে তরকারির কড়াতে ঢেলে দিয়েছে। ব্যবস্থা?' একটা নথ সেরে দ্বিতীয় নথে যাবার আগে চোখ তুলল হেমেন: 'ধান বাঁচাবার জন্যে অনেক ব্যবস্থা করেছিল চাষা, কিন্তু বুলবুলির ঝাঁককে রুখতে পারে নি। তবুও সেই চাষার আশা ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল, মাঠে তার রশুন বোনা ছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রশান্ত-বন্দনার কিছু নেই। শুধু একটা ফাঁকা স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে।'

'দুঃস্বপ্ন দেখতেও।' জুড়ে দিল হেমেন।

'এ জাগ্রত দুঃস্বপ্নের চেয়ে সে কল্পিত দুঃস্বপ্ন অনেক সহনীয়।'

'বটে? তবে তুমি দয়া করে একটা স্বপ্ন দেখ না।' অনুরোধে স্বরটা সিক্ত করল হেমেন।

'আমি স্বপ্ন দেখব?'

'ক্ষতি কী! দেখ না। তুমিই বা কম সাহসী কী! স্বপ্ন দেখ এ বাড়িতে এ ছেলেটা, সেণ্টুটা নেই। আর তার কথা শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না তার হাসির খিলখিল। তার দৌড়ঝাঁপ, হৈ-চৈ, উপরে-নিচে দাপাদাপি। কথায় কথায় তার নালিশ করে ওঠা। রান্নাঘর থেকে পড়ার ঘর—সকলের কাজেকর্মে ব্যাঘাত হওয়া। এখানে-ওখানে লুকিয়ে থেকে সমস্ত সংসারকে সন্ত্রস্ত করা। তারপর নিজের থেকেই বার হয়ে ধরা পড়ে বিজুর ঘর থেকে ক্ষীরকদম্ব খাওয়া। দেখ, দেখ, দুষ্টুর শিরোমণিটা কেমন হাসছে দেখ—'

তার শেষ দিকের বর্ণনাটায় সেণ্টু বিশেষ খুশি হয়েছে, তাই মৃদু মৃদু হাসছে, মৃদু মৃদু হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

প্রশ্রয়ভরা চোখে তাকে দেখছে হেমেন; কিন্তু বিজয়া চোখ তুলে যে তাকাবে, তার সামর্থ্য নেই। ইতিমধ্যে একটি বই তুলে নিয়েছে, তারই পৃষ্ঠায় দৃষ্টিকে সে আশ্রয় দিল।

'কই দেখ, দেখ স্বপ্নটা। যে ছেলেটা সমস্ত ঘর-দোর ছাদ-বারান্দা সদর-খিড়কি ওতপ্রোত করে জড়িয়ে ছিল, স্বপ্ন দেখ, তার আর বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই। সকালে নেই, দুপুরে নেই, রাত্রে নেই। কী, দেখছ? আজ নেই। কাল নেই। তাকে দুটো ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে।'

সেণ্টুর হাসি-হাসি মুখটা চকিতে উড়ে গেল। ফ্যাকাশে স্বরে বললে, 'ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেল কী বলছ?'

হ্যাঁ। একটা নয়, দু দুটো ছেলেধরা। একটা তার বাবা আরেকটা তার মা।'

আশ্বস্ত হল সেণ্টু। আবার স্নিগ্ধ-স্মিত বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখ করল। বিজুর কষ্ট হচ্ছে বলেই যে বিজু চুপ করে আছে, এটুকু বুঝতে পেরে নিঃশব্দ সহানুভূতিতে তার পাশ ঘেঁষে শুল।

বিজয়া ঘেঁষল না, ঝুঁকল না এতটুকু। নির্লিপ্ত স্বরে বললে, 'তা কী করা যাবে। যাদের ছেলে তারা যদি নিয়ে যায় তুমি কী করতে পারো?'

'যাদের ছেলে মানে?'

বিস্ময়ও কম নয় বিজয়ার : 'ওদের ছেলে নয় তো কাদের ছেলে?'

'সমস্ত সংসারের ছেলে।' তৃতীয় নখ ধরল হেমেন : 'বউ যখন একটা ঘরে আসে তখন সে কার বউ?'

'আহা, কী প্রশ্ন! যে বিয়ে করে এনেছে তার।'

'না। সে ব্যক্তিবিশেষের স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সমস্ত সংসারের বউ।' নখটা একটু বেশি কেটে গেল কিনা তাই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল হেমেন। বললে, 'তাকে একটা ব্যক্তি বিয়ে করে নি, একটা প্রতিষ্ঠান বিয়ে করেছে। সে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবার।'

'কী সর্বনাশের কথা! দ্রৌপদীর বেলায় শুধু পাঁচ ভাই ছিল, আর তুমি একেবারে পঞ্চজন বানিয়ে ফেললে।' হাসতে লাগল বিজয়া।

আর নির্মল ছেলেটা শুধু বিজুর মুখের হাসি বুঝল; তার অতিরিক্ত কোনো ইঙ্গিত নয়, কোনো ব্যঞ্জনা নয়, আর তাই হাসল নিরর্গল। হাসল নিরর্থক।

'স্বপ্ন দেখ, তুমি এই হাসিটা আর শুনতে পাচ্ছ না।' হেমেন আবার মনে করিয়ে দিল।

'তুমি কী বলছ ছোড়দাদু!' বিজয়ার গায়ে ভর দিয়ে উঁচু হল সেণ্টু। বললে, 'আমি তো প্রায়ই আসব এ বাড়ি। আর তোমরা, তুমি আর বিজু, তোমরাও তো যাবে আমাদের ওখানে।'

'হ্যাঁ, জানি। আর তোমার দুধটুকু দিয়ে দু-জনে দু বাটি চা খেয়ে আসব।'

এটার মধ্যেও বা হাসবার কী ছিল, শিশুটা দুর্বার আনন্দে নির্বারিত হল।

'সংসারে এই একটা শুধু কলকণ্ঠ ছিল তাও নিয়ে যাবে প্রশান্ত?' যেন নখ কাটার চেয়েও সহজ তেমনি নিটোল গলায় হেমেন বললে, 'কই, এতদিনে ছোট একটা ভাই আসবে সেণ্টুর— তা নয়—'

সহসা মুখ-চোখ কাঁদো-কাঁদো গম্ভীর করে তুলল সেন্টু। বললে, 'ভালো হচ্ছে
া কিন্তু ছোড়দাদু—'

ভাইয়েতে সেন্টুর ঘোরতর আপত্তি। ভাই এলে তার আদর কমে যাবে এই তার
ভয়। তাই হেমেনের প্রতি তার এই ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি।

'তোমার আদর কে কাড়ে।' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল হেমেন: 'তবু একটা
ছোট্ট ভাই হলে দেখবে তোমার নিজেরই কত ইচ্ছে করবে আদর করতে। এখন
জামাগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে পরতে চাও না, তখন কত ভালোবেসে দিয়ে দেবে
ছোট ভাইকে। বলবে, তোর আর মুরোদ কী। তুই তো তোর দাদার জামা
পরেছিস।'

'ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।' স্ফীত নাক-ঠোঁট প্রকৃতিস্থ করল না সেন্টু।
বললে, 'আবার কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেডিওটা ভেঙে দেব।'

'তুমি যদি চলে যাও তবে শুধু এই ভূতের রেডিও নয় সমস্ত অদ্ভুতের রেডিওই বন্ধ
হয়ে যাবে।'

'হঠাৎ তোমার আবার আরেকটা শিশুর জন্যে বাসনা কেন?' চোখ চোয়াল
কথা— সব একসঙ্গে বাঁকা করল বিজয়া।

তর্জনীর নখটা বুঝি কিছুতেই বাগানো যাবে না। এদিক-ওদিক ছুরি ঘুরিয়ে
অবশেষে কায়দা করতে পেরেছে ভেবে হেমেন বললে, 'আমার নিজের জন্যে নয়,
সংসারের জন্যেই আমার বাসনা। আরেকটা নতুন শিশু এলে বেশ হত, নতুন শ্রী
হত ঘরদোরের। চিৎ হয়ে ফোকলা দাঁতে হাসত আর রঙিন বল ঝুলতে দেখে
হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করত—'

'দাঁড়াও, ছুরি দিয়ে তোমার আঙুল কেটে দিচ্ছি এখুনি—' ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খাট
থেকে নেমে পড়ল সেন্টু।

'কেটে দেবে কী— কেটে গিয়েছে।'

'কই, দেখি। দাঁড়াও, আইডিন দিয়ে দি।' টেবিলের কোন কোণে আইডিনের
শিশি আছে, সর্দার ছেলে তাই নিয়ে এল কুড়িয়ে।

শিশির ছিপিটা আইডিনে ডুবিয়ে হেমেন সেন্টুর হাতে দিল। ছুঁই-কি-না-ছুঁই
করে কাটা জায়গাটায় ছিপিটা লাগাল সেন্টু। আর যত না সত্যি জ্বলল তার চেয়ে
বেশি তড়পাল হেমেন। আর সেই তড়পানি দেখে সেন্টুর মহা আনন্দ।

'আর বলব না, বলব না তোর ছোট ভাইয়ের কথা।' সেন্টুকে আরো খুশি
করার জন্যে তড়পানির মধ্যেই অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললে হেমেন।

'নিজের আর কি। গায়ে তো লাগে না। ঝামেলা তো পোয়াতে হবে ন
এক কড়া। উনি শুধু আদর করবেন।' আরো যেন অনেক দূর কেটেছে
বিজয়ার গলায় যেন আরো বেশি আইডিন : 'উনি আদর করবেন বলে পেটে
ধরতে হবে!'

'পেটে বাচ্চা এসেছে শুনলে প্রথমটা খুব বিরক্ত লাগে, কিন্তু বাচ্চাটা সত্যি
জন্মায়, তখন সেটা কী অপরূপ বস্তু বলো তো!' বললে হেমেন।

'তা ওর নিজের ভাই না চেয়ে ওর একটা খুড়তুতো ভাই চাইলেই তো পারে'
বিজয়া হেমেনের দিকে না তাকিয়ে তাকাল সেণ্টুর দিকে।

'ভালো হবে না বলছি, বিজু। তোমাকেও তা হলে আইডিন লাগাব।'
ভাইয়েতেও সেণ্টুর আপত্তি।

'তা তোমরা তো বিয়ের আগে থেকেই তার জন্যে বরণডালা নিয়ে বসে আছ;
এবার পায়ের দিকে নজর দিল হেমেন: 'তোমাদের ভয়েই সে আসে নি
তড়িঘড়ি যখন আসে নি তখন আদৌ আসে কিনা তার ঠিক কি।'

'আহা, কথার কী নমুনা!'

'এমনি সুখে-শান্তিতে থাকতে দিলে হয়তো আসত। কিন্তু স্বকু আর তার
যেসব কাণ্ড করে ছোট বউমাকে চাকরি করতে পাঠাচ্ছে তাতে আর সে অসাবধ
হতে চাইবে না।'

'তুমি তো কত বোঝো!'

'তা ঠিক। এ শাস্ত্র বুঝেছি এ কথা দেবতারাও বলতে পারে না। তবু সম্ভাবনা
একটা চেহারা আঁচ করছি মাত্র। ছোট বউমা চান বা না চান, তার আফি
চাইবে না।'

'আফিস কী চাইবে না?'

'বারে-বারে মেটারনিটি লিভ গ্র্যাণ্ট করতে।'

বইয়ে মন দিল বিজয়া।

পদচর্চায় নিবিষ্ট অবস্থায় হেমেন বললে, 'আর তোমার তো ইটারনিটি লিভ
বলেই চট করে অন্য কথায় লাফ দিল: 'কাজে কাজেই আরেকটা ছোট্ট শিশুর
সম্ভাবনা নেই—'

আবার শিশুর কথা উঠেছে এবং নিশ্চয়ই তা হলে সেটা সেণ্টুর প্রতিকূলে
তাই সে ফের আইডিনের শিশি কুড়িয়ে এনে হেমেনকে তাড়া করল। নতুন
না কাটুক, ঐ পুরোনো কাটার জায়গায়ই লাগাব আবার।

'আরে কী মুশকিল, আমি তো তোর পক্ষেই বলছি।' হেমেন সেণ্টুকে নিরস্ত করতে চাইল। বললে, 'তুই তো পুরুষমানুষ, সমস্ত কথাটা তো আগে শুনবি। নাকি আদ্ধেক শুনেই, কথা শেষ না হতেই, মেয়েদের মত তেড়েফুঁড়ে আসবি ঝগড়া করতে? কথাটা কী বলছি আমি? বলছি সেণ্টুই আমাদের সর্বস্ব। সেণ্টু ছাড়া আমাদের জীবনে আর কেউ নেই, আর কেউ আসবেও না, আসতেও পারবে না, তখন সেণ্টুকে আমরা ছাড়তে পারব না কিছুতেই। কী, কথাটা কি ভালো, না মন্দ?'

সলজ্জ মুখে হাসতে হাসতে সেণ্টু হেমেনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'সারা বাড়িতে একটা শিশু থাকবে না, তার কলকণ্ঠ শোনা যাবে না।' বললে হেমেন, 'তাকে সংসার বলে না, মরুভূমি বলে।'

তক্ষুনি, সহসা, উপরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

লাফিয়ে উঠল বিজয়া: 'শোনো, শোনো তোমার সংসারের কলকণ্ঠ।'

দরজার সামনে পর্দা ধরে দাঁড়াল। একসঙ্গে, কখনো বা একের পরে আরেক, শুনতে পাচ্ছে চারজনকে। প্রশান্ত আর বন্দনা, সুকান্ত আর কাকলি।

আর কাঁদছে কে?

কাঁদছে ভগলু। নেমে আসতে আসতে কাঁদছে।

ভয় পেয়ে হেমেনের আরো নিবিড়ে এসেছে সেণ্টু। আর হেমেন ভাবছে, মুনে কেন নখ কাটার ব্যবস্থা নেই? থাকলে, সকালের দিকেও থাকতে পারত রে—এ প্রভাতী আরত্রিক শুনতে হত না।

ভগলু কাঁদতে কাঁদতে নামছে সিঁড়ি দিয়ে: 'আগে কাজ করলাম না বলে মার খেলাম। এখন কাজ করলাম বলে মার খেলাম। আমাকে রামেও মারে রাবণেও মারে। এখন আমি যাই কোথায়?'

'কী হয়েছে?' ভগলুকে কাছে ডাকল বিজয়া।

'তুমি ব্যাপারটা শেষকালে চাকরের কাছ থেকে শুনবে?'

'কেন, ও তো উৎপীড়িত। ওর নিজস্ব একটা ভার্সন আছে। আর কে না জানে এ ক্ষেত্রে ও-ই নিরপেক্ষ।'

ভগলু বললে ঘটনাটা। সকালে উঠেই, মানে বাবুরা বিছানা ছাড়লে, বউমারা তো আগেই ছেড়েছেন, প্রশান্ত সুকান্ত দু ভায়েরই ঘরে ঢুকে ঝাঁটপাট দিয়েছে নির্বিবাদে। ঝণ্টু-সেণ্টু উঠে গেলে বিছানাও তুলেছে পরিপাটি। প্রশান্ত তখন নিচে চায়ে-খবরের কাগজে মশগুল, তাই জানে না কিছু। এখন বেলা হয়েছে, বালতিতে জল আর ন্যাকড়া নিয়ে ঘর মুছতে গিয়েছে ভগলু, আর দেখুন, পা ছুঁয়ে

বলছি, প্রথমেই ঢুকেছি বড় দাদাবাবুর ঘরে। তা তিনি আমাকে দেখেই খেপে
উঠলেন। বললেন, এ ঘরে ঢুকবি তো ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।

'তুই কী বললি?' জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'আমি বললাম, আমি তো চোর নই, কেন আমার ঠ্যাঙ ভাঙবেন? আমি
সংসারের চাকর।'

'সংসারের চাকর?' শূন্যে ছোঁড়া বর্শার ফলার মত লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত: 'তোর
মাইনে কে দেয়?'

ভগলু বললে, 'এস্টেট দেয়।'

'এস্টেট দেয়! মিথ্যেবাদী। সব টাকা তুই মার কাছ থেকে পেয়েছিস
হতচ্ছাড়া?'

'যেখান থেকে পাই আমার হিসেব মিটলেই হল।' ভগলু অবাক হবার ভান
করল।

'দশ টাকা মার কাছ থেকে আর পাঁচ টাকা ও ঘর থেকে পাস নি?' প্রশান্তর
গর্জন।

'ও ঘর বলে অস্পষ্ট রেখে লাভ কী?' এটা বন্দনার টীকা: 'পাঁচ টাকা এম-এ
ওয়ালীর নিজের রোজগারের থেকে দেওয়া।'

'সুতরাং তুই পুরোপুরি এজমালি চাকর নস। ওঠ, বেরো ঘর থেকে—' প্রশান্ত
লাথি ওঁচাল।

বন্দনাকে ঘরের বাইরে আসতে দেখে কাকলিও বেরিয়ে এল। বললে, 'টাকার
মধ্যে কারু নাম লেখা থাকে না। বাড়তি পাঁচটা টাকা আমি দিয়েছি, মা দেয় নি
এর মধ্যে মহাভারতটা অশুদ্ধ কোথায়? টাকাটা মার হাত দিয়ে এলেই সংসারের
টাকা, আমার হাত দিয়ে এলে সেটা সংসারের টাকা নয় এ তারতম্য কোনো উর্বর
মস্তিষ্কে ঢুকবে না সহজে।'

বন্দনা তখন অন্য পথে গেল। ভাসুর গুরুজন, সে চাকরকে শাসাচ্ছে, তার
মধ্যে তুমি, ভাদ্রবউ, তুমি ফোড়ন দাও কেন? একটু হায়া নেই গা? তার উপর
গুরুজনকে বোকা বলে ঠেস মারা।

এবার সুকান্ত এল। যা কোনোদিন করে নি, দাদার পক্ষ নিল! কাকলিকে
অভদ্র বলল। বলল, 'নিশ্চয়ই ও এজমালি চাকর নয়। দাদা ঠিকই বলেছে।
ভগলুকে এজমালি করতে হলে তোমার উচিত ছিল ঐ পাঁচ টাকা মার হাতে দেওয়া।
মার হাতে দিয়েই ওটাকে সংসারের টাকা করে তোলা। তারপরে মা দিতে

ভগলুকে, সংসারের দেওয়া হত। ভদ্রতার ধার ধারলে না তুমি। তারপর এসেছ দাদা-বউদির সঙ্গে ঝগড়া করতে—'

'কি রে, উঠলি? ছাড়লি ঘর?' ভগলুর দিকে মুখিয়ে এল প্রশান্ত।

'কী আশ্চর্য, কাজটা আগে সারতে দিন না। কাজটা শেষ না হলে ঘর ছাড়ি কী করে? কেউ ছাড়ে?'

বলা-কওয়া নেই দমাদ্দম মার শুরু করল প্রশান্ত।

এতটা আবার সহ্য হল না সুকান্তর। সে প্রশান্তকে ছাড়িয়ে নিল। বললে, 'এখন যদি চাকরটা তোমাকে মারে? আর যার দিক থেকেই হোক, ওর দিক থেকে তো কোনো ত্রুটি হয় নি, কোনো অন্যায় নয়। তবে ও মার খাবে কেন? কেনই বা এখন ও প্রতিশোধ নেবে না?'

'তার মানে তুই চাকরের সঙ্গে একজোট হয়ে আমাকে এখন মারবি, আমার উপরে প্রতিশোধ নিবি?' প্রশান্ত উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

এই নিয়েই তারপরে বিতণ্ডা।

হু-হু শ্বাসে নিচে নেমে এল প্রশান্ত আর হনহনিয়ে এগোল সদরের দিকে।

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উঠে হেমেন তাকে নিরস্ত করল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাড়ি খুঁজতে।'

'দাঁড়া, আমিও যাব তোর সঙ্গে।' সেন্টুকে বিজয়ার জিম্মায় দিয়ে দু মিনিটে তৈরি হয়ে নিল হেমেন: 'দেখি, আমিও খুঁজব।' ভগলুকে বললে, 'তুই থাক। যেতে পারবি নে। তোর সমস্ত মাইনে আমি দেব।'

স্বামীর পিছু-পিছু ব্যস্ত পায়ে নেমে এসেছিল বন্দনা, এখন এ কথা শুনে মনে-মনে বললে, 'তা হলে কাকিমাই তো সমস্তটা গ্রাস করবে। চাকরের টিকিটাও জুটবে না আমাদের।' কিন্তু মুখ ফুটে পারল না উচ্চারণ করতে।

২৬

'কদ্দূর যাবি?' বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

প্রশান্ত আমতা-আমতা করতে লাগল: 'এই এদিক-সেদিক।'

'এদিক না সেদিক একটা ঠিক করবি তো? ডাইনে না বাঁয়ে? উত্তরে না দক্ষিণে?' বাধা দিল হেমেন: 'তুই তো আর লাট্টু নস, উত্তর-দক্ষিণ তো আর একসঙ্গে ঘুরতে পারবি নে।'

অন্যমনস্কের মত ডাইনের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত। হেমেন পিছু নিল। কয়েক পা গিয়েই প্রশান্ত থেমে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি চলেছ কোথায়?'

'কেন, কোনো অন্যায় জায়গায় যাচ্ছিস যে আমি সঙ্গে গেলে সংকোচের কারণ হবে?' আচমকা হেমেনও থেমে পড়ল।

প্রশান্তর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সত্যি কোনো অন্যায় জায়গাতেই চলেছে বোধ হয়। পায়ে নইলে কেন জোর পাচ্ছে না, গায়েই বা লাগছে না কেন স্ফূর্তির বাতাস? অপরাধীর মত ভঙ্গি করে বললে, 'গাবতলার ঐ বস্তিটার দিকে যাচ্ছি।'

'মানে ডাবতলার দিকে না গিয়ে গাবতলার দিকে যাচ্ছিস।' প্রশান্তর চোখের উপর চোখ রেখে হেমেন বললে।

'তার মানে?'

'ডাব গাবের চেয়ে বড় তো? আর উপকারীও? তার মানে, বড় ছেড়ে ছোটয় যাচ্ছিস, উঁচু ছেড়ে নিচুতে।' হেমেন আরো স্পষ্ট হল: 'কোঠাবাড়ি ছেড়ে বস্তি!'

'তার কী করা যাবে।' প্রশান্ত ঝংকার দিয়ে উঠল: 'ডাবও অনেকের সহ্য হয় না। কী উপকারী তা কে জানে! তাই লোকে হাত বাড়িয়ে প্রথমে উপাদেয়কেই গ্রহণ করে।'

'কী উপাদেয় শুনি?' কোমরে হাত রেখে প্রায় রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল হেমেন।

'উপাদেয় সম্মান। উপাদেয় স্বাধীনতা।'

'সেই সম্মান আর স্বাধীনতা শুধু ঐ গাবতলার বস্তিতেই গ্যারান্টি দেওয়া? বলি কদিনের ক-বেলার গ্যারান্টি?' মুখোমুখি দু পা এগিয়ে এল হেমেন: 'আইনের জোর

দেখিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই স্বাধীনতা, আর সংসারটাকে টেনে নোংরা বস্তিতে নামিয়ে নিয়ে আসাই সম্মান? কেন, কেন, ছোট নজর কেন? বস্তি আর ভাগাড় আর আঁস্তাকুড়? কেন, বাড়িটাকে বড় করতে পারিস নে? প্রাণটাকে বড় করতে পারিস নে?'

প্রশান্ত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

'একজনের প্রাণ একটু বড় হলেই আর সকলের মনও একটু একটু করে বড় হতে থাকে।'

'কিন্তু কি করি, আয়ই যে অল্প।' হেঁট মাথা চুলকোতে লাগল প্রশান্ত।

'সেটা লজ্জা নয়? আয় যেহেতু কম সেহেতু থাকব গিয়ে নর্দমায়, সেটা খুব বাহাদুরি। খুব বুক-ফোলানো। আর আয় বাড়াবার চেষ্টা দেখাটাই লজ্জা, লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া—'

'আয়ের আর পথ কোথায়?' প্রায় যেন দিগন্তের দিকে তাকাল প্রশান্ত: 'কোথায় আর আয় বাড়ানো?'

'কোথায়?' প্রশান্তর হাত কঠিন মুঠোয় চেপে ধরল হেমেন। বললে, 'এই একসঙ্গে একত্রে হাত মেলানোয়। এজমালি সংসারে থেকে কত তোর আয় বেড়েছে তার হিসেব রাখিস? শুধু তোর নয়, তোর স্ত্রীর, তোর ছেলেমেয়ের। আর আয় কি শুধু টাকা? আয় মানে কি আরাম নয়? সহমর্মিতা নয়?'

'কিন্তু এজমালি সংসারে জায়গা কই?' পাশ কাটাতে চাইল প্রশান্ত।

'যত জায়গা তোমার বস্তিতে, কলকাতার ভূস্বর্গে!' হেমেন ধিক্কার দিয়ে উঠল: 'শোন, যদি তোর বুকের মধ্যে জায়গা না থাকে, রাজপ্রাসাদেও জায়গা নেই। আর যদি থাকে, তবে বড় বাড়ির ছোট ঘরই রাজপ্রাসাদ। ঘর ছোট কি নয়, এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে বাড়ির সেটা ঘর সে বাড়িটা বড় কিনা।'

'কিন্তু বড় বাক্যযন্ত্রণা।' প্রশান্ত প্রায় নাক সিঁটকাল।

'আর তুই যেখানে যাচ্ছিস সেখানে নিরন্তর কাব্য ঝরে পড়ছে। আর সেই কাব্যযন্ত্রণা যে কী ভয়ানক, দু দিন পরেই বুঝবি যখন ঝণ্টু-সেণ্টু গালাগাল শিখবে। কান ভরে যাবে, প্রাণ গলে যাবে। সংসারে থেকে অন্তত যে গালিগালাজটা শিখছে না—সেটাও তো তোর একটা আয়—'

'তা আর কী করা!'

'কী করা মানে?' লাফিয়ে উঠল হেমেন: 'তুই ভেবেছিস ও ছেলেমেয়ে তোর নাকি?'

প্রশ্ন শুনে প্রশান্ত তো অবাক।

'বউ তোর একার হতে পারে, কিন্তু ঝণ্টু-সেণ্টু তোর একার নয়। ঝণ্টু-সেণ্টু সংসারের। সাধ্যি কি তুই ওদেরকে সংসারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাস? সাধ্যি কি তুই ওদেরকে নষ্ট করিস? নিজেরা তোরা দু-জনে যত খুশি বয়ে যা, কিন্তু ওদেরকে কিছুতেই বয়ে যেতে দেব না। না, দেব না। কি করবি, কী করতে পারিস তুই? থানায় যাবি? কোর্টে? তোর যেখানে খুশি সেখানে যা। আমরা ছাড়ব না ছেলেমেয়ে। তোর মনের শান্তি উকিলে-পুলিসে কুরে-কুরে খাবে।' বাড়ির দিকে পা চালাল হেমেন।

দেখল প্রশান্তও গুটিগুটি আসছে পিছু-পিছু।

বেরুনো মাত্রই বাড়ি পাওয়া যাবে এ অবশ্য আশাতীত কিন্তু প্রশান্ত যে তার দুঃখ বুঝেছে এবং তার প্রতিবিধানে যে লেগেছে কোমর বেঁধে তাইতেই বন্দনা খুশি। আশাতীত খুশি। বললে, 'তুমি একনাগাড়ে বেশি হেঁটো না, অসুস্থ হয়ে পড়বে—'

'না, আমি হাঁটব না। আমি দালাল লাগাব।'

'তাই ভালো।' আশ্বস্ত হল বন্দনা।

'আফিসে বন্ধুবান্ধব আছে তারা কোন না সাহায্য করবে—'

'নিশ্চয়ই করবে। তারাও আমাদের মত গরিব। গরিবের দুঃখ গরিবের অপমান গরিব ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমরা গরিবেরা থাকব একসঙ্গে। একে-অন্যেরটা দেখব একে-অন্যে। একজোট হব।'

প্রশান্তর কানে কিরকম অদ্ভুত শোনাল কথাগুলো। বললে, 'তেমনটি পেতে হয়তো একটু দেরি হবে।'

'তা হোক। তবু মন যা চায় তা পায়।' বন্দনা প্রেরণা দেবার মত করে দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'তুমি যখন অপমানের প্রতিকার চেয়েছ তখন আসবেই প্রতিকার। ধৈর্য ধরেছি, আরো না হয় ধরব।'

'হ্যাঁ, ঝণ্টু-সেণ্টু বড় হোক।' অস্ফুট কণ্ঠে, প্রায় নিজের মনে-মনে প্রশান্ত বললে।

হেমেন খুঁজছে মৃণালিনীকে।

'তোমার বড় ছেলের কাণ্ড শোনো, বউদি।' হাঁক পাড়ল হেমেন।

'কি?' ভয় পেয়ে মৃণালিনী চোখ প্রায় কপালে তুলল।

'বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।'

'তা যাবে বৈকি! বাঁদরের আর কী কাজ!'

ছেলেকে মা বাঁদর বলবে এতে আর আপত্তি কী! তবু তার কাজটা কী জানতে দোষ নেই। হেমেন তাই কান বাড়াল: 'কী কাজ?'

'বাঁদরের কাজ হচ্ছে ফলা ক্ষেত তছরুপ করা। আর বউদের কাজ হচ্ছে ভরা ঘর ছারেখারে দেওয়া।'

তা হলে বাঁদরের এখানে অন্য ব্যাকরণ। হেমেন চাইল নৈর্ব্যক্তিক হতে, বললে, 'সেই তো যন্ত্রণা। বউ ছাড়া ঘর ভরে না আবার বউ ছাড়া ঘর ভাঙে না। ভরতেও বউ, ভাঙতেও বউ।'

আরো দূরে-দূরে দৃষ্টি ফেলল মৃণালিনী: 'যারা ঢেউনাচানি ঘরভাঙানি তারা যাক বেরিয়ে, কেউ তাদের না করবে না, কানি পরে পথে-পথে কাঁদলেও না। চুনোপুঁটির ফরফরানি সার। ঘরে ঘটিবাটি নেই, কোমরে চাবিকাঠি ঝুলিয়েছে!'

'কিন্তু দোষ তো প্রশান্তর। ও ওর সংসারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বস্তিতে, খাটালে, কাঁচা নর্দমায়। তোমার দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখেও শিখল না কিছু—'

'আমার দৃষ্টান্ত?' তলিয়ে বোঝবার দরকার নেই, নিজের প্রসঙ্গ উঠতেই খারাপ ভেবে নিয়ে তেখিয়া হয়ে উঠল মৃণালিনী।

'ভালো কথা বলছি—'

'আমার কথা তোমাদের কাছে আবার ভালো হল কবে?' তবু কথাটা না শুনে স্বস্তি পাচ্ছে না মৃণালিনী। মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কিন্তু কথাটা কী শুনি?'

'তুমি কেমন সংসারকে তোলবার চেষ্টা করছ, আর ছেলেরা উলটো, তাকে নামাবার চেষ্টা করছে—' হেমেন মিটমিট করে তাকাল।

'তোলবার চেষ্টা করছি মানে?' ক্রিয়াপদের মানেটা যেন পুরোপুরি স্পষ্ট হয় নি, মৃণালিনী ভঙ্গিটা তাই নিস্তেজ করল না।

'মানে, উন্নত করবার চেষ্টা করছ। চাইছ আধুনিক করতে। জঙ্গল থেকে নিয়ে আসতে শহরে, রাজধানীতে।' কণ্ঠস্বর প্রায় গদগদ করে তুলল হেমেন: 'কার্পেট, পর্দা, ফ্যান, ফ্লুরুসেণ্ট, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং টেবল, এম-এ পাশ বউ—তুমি চাচ্ছ ভোল ফেরাতে, রঙচঙে করতে—আর ছেলেরা—'

'দিচ্ছে না হতে।' মৃণালিনী বুঝল তাকে প্রশংসাই করা হচ্ছে। তাই গর্বিত আনন্দে বললে, 'আমার সাধনার তুই কণ্টক। তুই শত্রু।'

'হ্যাঁ, তুই মূর্তিমান। প্রশান্ত আর সুকান্ত।'

'মোটেই ছেলেরা নয়। তুই মূর্তিমান মানে তুমি আর তোমার দাদা।' মুখিয়ে এল মৃণালিনী।

'আমি আর দাদা!' হেমেন প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসল।

'হ্যাঁ, তুই শত্রু। একজন অথর্ব, আরেকজন কঞ্জুস।' বললে মৃণালিনী, 'তোমরা দু-জনেই বাদ সাধছ। তোমরাই কিছু হতে দিচ্ছ না। বড় হতে দিচ্ছ না বাড়ি-ঘর, আলো জ্বালতে দিচ্ছ না সব ঘরে। মধ্যবিত্তের মধ্য ধরেই কোনোরকমে আঁকড়ে থাকতে চাইছ। মাথায় উঠে আসবার চেষ্টা নেই। ছেলেরা তো তোমাদের থেকেই শিখবে। তারা পায়ের দিকে নেমে আসতে চাইবে তার বিচিত্র কী!'

'শেষকালে আমাদের দোষ ধরলে!' যেন চড় খেয়েছে এমনিভাবে গালে হাত বুলুতে লাগল হেমেন।

'নিশ্চয়ই তোমাদের। একজন অক্ষম, আরেকজন কৃপণ।' মৃণালিনী আবার চড় ছুঁড়ল।

তাড়াতাড়ি লেজ গুটিয়ে হেমেন ফিরে এল নিজের ঘরে।

বিজয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা হচ্ছিল দিদির সঙ্গে?'

'ওরে বাবাঃ, সে কথা বলি আর আবার একটা প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাক। যদি আমার দিকে হও তা হলে দিদিকে ধুনবে আর যদি দিদির দিকে হও তা হলে আমাকে ধোলাই। তার চেয়ে পালাই, স্নান করি, মাথায় জল ঢালি—' হেমেন বাথরুমের দিকে ছুটল।

কিন্তু সেদিন দুপুরবেলা এ কী শুরু হল প্রলয়কাণ্ড!

মৃণালিনী আতঙ্কিত কান্নার রোল তুলল: 'চলল, বউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলল, চলল একা-একা—'

ঘুমুচ্ছিল বিজয়া, চোখ খুলে কান খাড়া করে রইল।

'ওরে সকলকে ডাক, আমার লক্ষ্মীপ্রতিমা বুঝি বিসর্জনে যেতে বসেছে!'

এপাশে ওপাশে খান তিন-চার বই-পত্রিকা চেপে তুমড়ে উঠে পড়ল বিজয়া। উপরে প্রশান্তের ঘরে এসে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে খোলা চুলে কাতরাচ্ছে বন্দনা—কাটা পাখির মত ঝটপট করছে, যন্ত্রণা এত ভীষণ, কথা কইতে পারছে না। জ্ঞানও ঠিক আছে কি না বোঝা কঠিন।

শীত-শীত বলে ফ্যানটা চলছে না, কিন্তু মায়ের জন্যে কিছু একটা করা উচিত এই ভেবে বন্দনার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছোট কৃশ হাতে একটা হাতপাখা নাড়ছে ঝণ্টু, আর পাশে মেঝের উপর দু হাতে মাথা ধরে একটা 'কী হল' 'কী হল' মুখ করে বসে আছে মৃণালিনী।

'কী খেয়েছে?' অভিজ্ঞ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'কিচ্ছু খায় নি।' কান্নায় ছুটে-পড়া মুখে ঝণ্টু বললে, 'খেয়ে-দেয়ে শুয়েছিল মা। ঘুমিয়েও ছিল। তারই মধ্যে পেটে ব্যথা উঠেছে।'

'বমি করেছে?'

'তা একবার করেছে বাথরুমে গিয়ে।' বললে ঝণ্টু, 'বাথরুম থেকে ফিরেই এই অবস্থা।'

'ওরে আমার কী হল', মৃণালিনী আবার ঢেউ তুলল: 'আমার সোনার প্রতিমা কালী হয়ে গেল। ওরে তোরা সব কোথায়? বাড়ি আয়—'

'চেঁচাচ্ছেন কী! থামুন।' বিজয়া ধমক দিয়ে উঠল: 'হয়তো বিষ খেয়েছে। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে আর এখন কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না।'

গাঢ় একটা গোঙানি বের করে মৃণালিনী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বিজয়ার চোখের উপর চোখ রেখে নিম্নতম স্বরে বললে, 'বিষ? তাই হবে। বিষই খেয়েছে। বড় বাড়ি বদল করবার শখ ছিল, অভিমানে মা আমার নতুন বাড়িতে চলেছে—একা একা চলেছে—'

'কাকলি কোথায়?'

'তার তো এখন পৌষ মাস, সে ঘুমুচ্ছে আরামে।' মৃণালিনী বললে।

'বাড়িতে এত বড় বিপদ, আর সে ঘুমুচ্ছে?' বিজয়া ছটফট করে উঠল।

'সেই তো সমস্ত বিবাদের মূল। কালনাগিনী হয়ে সেই তো ছুবলেছে আমার মাকে।' দিব্যি বলতে পারল মৃণালিনী: 'সেই তো অশান্তির ঝড় নিয়ে এসেছে বাড়িতে। আগে যখন আমরা ছিলাম, স্কু ধরে নিয়ে আসে নি এই বনবেড়াল, সংসারে কোথাও একটা আঁচড় পড়ে নি। তারপরে কী যে হল, কে যে এল—'

পাশের খাটে শুয়ে সেণ্টু ঘুমুচ্ছে, এ বেশ বোঝা যায়, দূরের ঘরে জয়ন্তী ঘুমুচ্ছে, এও বেশ ধারণায় আসে, কিন্তু তুমি, কাকলি, সমর্থ আর শিক্ষিত, তোমার কর্তব্যজ্ঞান না থাক, সাধারণ একটু দয়ামায়া নেই? বন্দনার উপর তোমার যত রাগ বা বিরাগ থাক, শত হলেও সে তো সেণ্টুর মা, যে সেণ্টু তোমাকে এত ভালোবাসে। বন্দনা মরে গেলে সেণ্টু কাঁদবে, অন্তত এটুকু কল্পনা করেও কি তোমার একটুও দুঃখ হয় না? লেখাপড়া কি মানুষকে এমনি উদ্ধত করে, স্বার্থপর করে?

কাকলির ঘরের দিকে এগুচ্ছিল বিজয়া, ঝণ্টু বললে, 'কাম্মা নিচে গেছে উনুন ধরিয়ে জল গরম করে আনতে।'

থামল বিজয়া। মুখ-চোখ গম্ভীর করে বললে, 'এ জল-গরমের কেস নয়। এ পাম্পিং-এর কেস। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পাম্প করাতে পারলে হয়তো—'

'কী সর্বনাশ হবে! মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে! আবার সেখান থেকে না-জানি কোথায়! আবার সেখান থেকে—' আরেকটা চাপা কান্নায় ভুরভুরি তুলল মৃণালিনী।

'চুপ করুন।' সময় পড়েছে, বিজয়া মনের সুখে ধমকাল মৃণালিনীকে: 'বেশি চেঁচাবেন তো পুলিস এসে পড়বে। তখন কেঁচো খুঁড়তে কোন গর্ত থেকে সাপ বেরুবে বলা যায় না।'

কিন্তু তেমন পুলিস-পুলিস বলেও তো মনে হচ্ছে না। তাই যদি হবে, তবে চরম যা খেয়েছে, তার শিশি কই? অবশিষ্ট একটু রেখে যাবে না প্রমাণস্বরূপ? একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে না? আর কাউকে না হোক, অন্তত স্বামীর উদ্দেশে? পুলিসের উদ্দেশে?

'হ্যাঁ রে, তোর মা কোনো চিঠি লিখে গেছে?' ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'কই দেখি নি তো।'

তবু, বালিশের তলা, তক্তপোশের তলা, ঘরের আগা-পাশ-তলা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে বিজয়া। খুঁজেছে, এমন-কি, বাথরুম-পায়খানা। না পেয়েছে একটা টাটকা ভাঙা শিশি, না বা ছেঁড়া একটা চিঠির টুকরো।

পুরোনো ব্যাধি বলে প্রশান্তের নিজেরই ছিল একটা হট-ওয়াটার ব্যাগ, সেটাতে গরম জল ভর্তি করে নিয়ে এল কাকলি। বন্দনার পেটের উপর রাখতে যাচ্ছে, মৃণালিনী তার হাত থেকে ছোঁ মেরে ব্যাগটা কেড়ে নিল। বললে, 'থাক, তোমাকে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।' বলে নিজে বিছানার পাশে বসে পেটের উপরে আঁচলের ভুর রেখে ব্যাগ চেপে ধরল। বললে, 'যা জানো না, তা এসো না করতে।'

গরমের ছোঁয়া পেয়ে মুচড়ে-মুচড়ে উঠল বন্দনা।

ব্যাগটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে মৃণালিনী বললে, 'কে জানে গরম জলে উলটে অপকার হবে কিনা। যদি কিছু খেয়ে-টেয়ে থাকে—'

কথাটা গ্রাহ্য করল না কাকলি। বন্দনার পায়ে হাত দিয়ে দেখল পা এখনো ঠাণ্ডা। হাত দিয়েই বসল শুকনো মালিশ করতে।

'জয়ন্তী! জয়ন্তী!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী।

কতক্ষণ পরে ধড়মড় করে উঠে আসতেই তার উপরে শতধা হয়ে পড়ল: 'ধাড়ি মেয়ে, এখনো তুই ঘুমুচ্ছিস কী করে? এদিকে তোর বউদি যে ঠাণ্ডা হতে চলেছে। বোস, হাত দিয়ে ঘষে বউদির পা দুটো গরম করে দে।'

কাকলি জয়ন্তীকে ছেড়ে দিল জায়গা। শিয়রের দিকে গিয়ে ঝণ্টুর কাছ থেকে

পাখাটা চাইল। যদিও বুঝেছে, পায়ের বা মাথার হাওয়ায় কিছু উপশম নেই, তবু রুগীর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, তারই জন্যে মাথার দিকে এগুল কাকলি। কিন্তু বিজয়া হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল ঝণ্টুর দিকে, বললে, 'দে পাখাটা আমাকে। তুই ছেলেমানুষ, তুই কতক্ষণ হাওয়া করবি?'

আর যদিও কাকলি আগে এসে পৌঁছেছিল, ঝণ্টু পাখাটা বিজয়াকেই দিল। সেও যেন বুঝেছে, কাকলিই এই বাড়িতে বিদেশী, প্রক্ষিপ্ত, তার মায়ের এই বিকৃতির মূলেও সেই।

রুগীর যন্ত্রণার এমন নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না, তাই কাকলি বললে, 'কোথাও একজন ডাক্তার পাই কিনা দেখব?'

'তুমি কোত্থেকে দেখবে?' মৃণালিনী ধমকে উঠল।

'এই রাস্তায় বেরিয়ে।'

'চেনা নেই, অচেনা নেই, তুমি ডাক্তারের কী বোঝো!' মৃণালিনী বললে, 'শেষকালে হিতে বিপরীত হোক। যা-ও আশা ছিল, তোমার ডাক্তার এসে ফাঁসিয়ে দিক।'

'তা ছাড়া কী হয়েছে—খেয়েছে একটা কিছু, স্পষ্ট আন্দাজ না করে ডাক্তার ডাকাও মুশকিল।' বিজয়া টিপ্পনী ছুঁড়ল: 'তেমন কিছু হলে ফ্রেণ্ডলি ডাক্তার দরকার। যে রেখে-ঢেকে, সব গুছিয়ে-বাঁচিয়ে চলতে পারবে। তুমি সর্দারি করে কোত্থেকে এক উড়ো ডাক্তার ধরে নিয়ে এলে, সে এক হুলস্থূল বাধিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতাল, থানায় খবর দিলে—সে এক মহাকেলেঙ্কার!'

'না, না, বাড়ির কর্তারা আগে আসুক।' বললে মৃণালিনী।

'তাঁদের আসাটা যাতে দ্রুত করা যায়, অন্তত তার চেষ্টা করি।' অস্থির মিনতি নিয়ে তাকাল কাকলি: 'দাদার আফিসের ফোন নম্বর জানেন?'

'যা না আফিস, তার ফোন নম্বর!' বন্দনা তখন ব্যথায় মুহ্যমান, তাই অনায়াসে বলতে পারল বিজয়া।

'কাকার আফিসে নিশ্চয়ই আছে—' কাকলি বিজয়াকে উদ্দেশ করল।

'আছে মানে? একেবারে তার নিজের টেবলের উপর আছে।'

'দিন না নম্বরটা।'

'আমার এ প্রান্তে কি ফোন আছে যে, তার নম্বরটা মনে রাখব?'

'বেশ, তাঁর আফিসটার নাম বলুন, আর যদি শুনে থাকেন, তবে ঠিকানাটা।'

ঠেকে-ঠেকে ভাঙা-ভাঙা ঝাপসা কী কতগুলো বললে বিজয়া। তাই সই।

দেখি, ধরতে পারি কিনা। একটা নিপতিত মানুষের যন্ত্রণার লাঘব ত্বরান্বিত করতে পারি কিনা।

নেমে যাচ্ছিল, মৃণালিনী বললে, 'বার-লাইব্রেরিতেও তো ফোন করতে পারো। সেই বরং সোজা।'

'না, না, বাবাকে ব্যস্ত করতে চাই না।'

'তার আবার ব্যস্ত! লাইব্রেরিতে বসে এখন তাস পিটছে নয়তো পাশা চালছে। আমি বলি কি, যদি জানাতে হয়, উনি যখন বাড়ির কর্তা, তখন ওঁকেই সর্বপ্রথম জানানো উচিত।'

আবার এই নিয়ে মানসম্মান! তালিকায় অনুক্রম।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি। কোথায়, কোন বাড়িতে টেলিফোন, কোন বাড়িতে বা এই দুপুরে তার পক্ষে ঢোকা সহজ হবে, শালীন হবে, ভাবতে-ভাবতে, দেখতে-দেখতে এগুতে লাগল। একটা রিকশা ডেকে নিল। সটান বড় রাস্তায় এসে একটা ওষুধের দোকানে এসে ঢুকল। ফোন করতে পারি? পয়সা লাগবে। তা জানি। তা দিচ্ছি। কত?

বিজয়ার ভুল কেটে-কেটে তিন-তিনবার ডায়ালিং করে হেমেনকে ধরতে পেল কাকলি।

'হ্যালো। কে?'

'আমি ছোট বউমা। কাকলি।'

'কী ব্যাপার?' হেমেন তো বিমূঢ়।

'দিদি, বন্দনা, হঠাৎ পেটে একটা তীব্র ব্যথা হয়ে প্রায় কোল্যাপস করেছে। আপনারা শিগগির বাড়ি আসুন। দাদার আফিসে খবর দিন। যদি সম্ভব হয় একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবেন। দেরি করাটা ঠিক হবে না বোধ হয়।'

'যাচ্ছি। এখুনি।' আর কথা বাড়াল না হেমেন। উঠে পড়ল।

ব্যথার তাড়সে আর্তনাদ করে উঠল বন্দনা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল চারদিকে। জানলার বাইরে রোদের দিকে, আকাশের দিকে। আগাগোড়া বিরাট এক অর্থহীনতার দিকে।

তাকে জাগতে দেখে হতাশ হল বিজয়া।

মুখের কাছে মুখ এনে অস্ফুট অন্তরঙ্গতায় বললে, 'কিছু খেয়েছিলে?'

শূন্য, অসার চোখে তাকিয়ে রইল বন্দনা।

'বলি, কিছু বিষ-টিষ?' আরো একান্ত হল বিজয়া।

'আছে? আছে তোমাদের কাছে? থাকলে তাই একটু দাও না। আর পাচ্ছি না সহ্য করতে।' বন্দনা কাতরাতে লাগল।

বিদ্যুৎগতিতে চলে এল হেমেন। চলে এল ট্যাক্সিতে। সঙ্গে প্রশান্ত। উন্নত-দর্শন এক ডাক্তার।

একটু দেখে কি না দেখে ডাক্তার বললে, 'এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠান।'

হাসপাতাল শুনেই মৃণালিনী ঘাবড়ে গেল। পাংশুমুখে প্রশান্তকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, 'কি, পুলিস-টুলিস আসবে নাকি ?'

'কী যে মাথামুণ্ডু বলো তার ঠিক নেই।' প্রশান্ত খিঁচিয়ে উঠল: 'একটা লোকের অসুখ করেছে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে, এখানে পুলিস আসবে কী ভাবে ?'

'না, আসতে পারত, যদি আপনারা ডাক্তার ডাকতে বা রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে আরো দেরি করতেন।' প্রসন্নমুখে বললে ডাক্তার, 'তখন সেটা ক্রিমিন্যাল হয়ে পড়ত। ঠিক-ঠিক সময়ে ব্যবস্থা হচ্ছে বলে খুব আশা হচ্ছে বেঁচে যাবে রুগী।'

'এর সমস্ত ক্রেডিট আমাদের ছোট বউমার।' সপ্রশংস মুখে বললে হেমেন, 'উনি ঠিক সময়ে আমাকে ফোন করেছিলেন বলেই সব হল। নইলে, উঃ, আরো দেরি হলে কী সর্বনাশ যে হত, ভাবা যায় না। কই গো ছোট বউমা ?'

বাড়ি ফিরেই জাগন্ত সেণ্টুকে দু হাতে জাপটে ধরেছে কাকলি। মা কোথায় যাচ্ছে ও কেন, বোঝাচ্ছে হালকা করে। তোমার ভাবনা কী, তুমি আমার কাছে, কাম্মার কাছে থাকবে। আমরা মাকে দেখতে যাব। তারপর মা ভালো হয়ে, সুন্দর হয়ে, মোটাসোটা হয়ে বাড়ি ফিরবে। যেই ডাকবে সেণ্টু, টু শোনবার আগেই কাম্মার কোল ফেলে পড়ি-মরি মায়ের কোলের দিকে ছুট দেবে।

হেমেনের ডাকে ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি। বললে, 'ওপেন না করলেই নয় ?'

'নয়। আর যদি বা তা যায়,' ডাক্তার বললে, 'তা, যা শুনলাম, আপনার উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে।'

অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। মোটা হাতে ডাক্তারকে টাকা দিল হেমেন। হ্যাঁ, ক্যাবিন চাই। আর নার্স চব্বিশ ঘণ্টা। দিনে-রাত্রে ফালতু অ্যাটেণ্ডেণ্ট। যত দিন লাগে। যত টাকার দরকার। সেণ্টুর মাকে ভালো করে আনতে হবে। সেণ্টুকে যেন কাঁদতে না হয়।

বন্দনার চুলে হাত বুলিয়ে প্রশান্ত বললে, 'কোথায় আমি যাব, না, তুমি চললে! ম্যাকরার ঠুকঠুক কামারের এক ঘা। কে জানে হয়তো আমার অসুখই চলে গেছে, তুমি টেনে নিয়েছ তোমার মধ্যে। আর তুমি যখন ভালো হবে তখন আমরা দু'জনেই ভালো হব।'

'আর তখনই নতুন উদ্যমে ছুটব বাড়ি দেখতে।' হেমেন টিটকারি দিয়ে উঠল: 'দেখ না কেমন সুন্দর বাড়ি বদল! বস্তির চেয়ে অনেক সুন্দর হাসপাতালের ক্যাবিন।'

দুর্বল হাত বাড়িয়ে বিজয়ার হাত ধরল বন্দনা। আজকে, এই মুহূর্তে, বিজয়াকেই তার সবচেয়ে আপনার মনে হচ্ছে। কান্নাগলা স্বরে বললে, 'আমি আর বাঁচব না।'

'আহা, সে কী কথা! আমারো তো পেট কেটেছে, আর দেখছ, এখনো কেমন বেঁচে আছি, দুর্দাম বেঁচে আছি। আর জানো তো,' কানের কাছে মুখ নামাল বিজয়া: 'সেইজন্যেই কিছু হল না, এল না পেটে।'

শুনতে পেয়েছে হেমেন। সুর করে বলে উঠল, 'এ পেট সে পেট নয়।'

ভূপেন বন্দনার মাথায় হাত রেখে নীরবে জপ করল। ছেড়ে দিল অ্যাম্বুলেন্স।

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল সুকান্ত। বললে, 'শুনলাম তুমি নাকি আজ খুব এফিসিয়েন্সির পরিচয় দিয়েছ?'

'যে যা সে তো তাই পরিচয় দেবে।' প্রথম থেকেই বাঁকা ধরল কাকলি। বাঁকা ধরবে না তো কী। কী এমন কাণ্ডটা কাকলি করেছে যে অমন চিপটেন ঝাড়ো।

'কাকিমার ভুল সত্ত্বেও ঠিক আফিসটা বের করলে গাইড থেকে। দোকানে দাঁড়িয়ে ফোন করলে। এক্সটেনসন জানো না, তাও খুঁজে নিলে। আর খুঁজে নিতে পারলে বলেই একটা প্রাণ বেঁচে গেল।' মুখে-চোখে আভা ফোটাবার চেষ্টা করল সুকান্ত: 'তবে বলো, তোমাকে এফিসিয়েন্ট বলব না? শুধু আমার বেলাতেই তুমি কি না—'

'না। তোমার বেলাতেও এফিসিয়েন্সি দেখাব।' বললে কাকলি।

'দেখাবে? কী ভাবে?'

'তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।'

'আমার মনোবাঞ্ছা?'

'আর তোমার মার। তোমার সংসারের।'

'কী করবে?'

'একটা চাকরি নেব।'

'নেবে? পাবে? সত্যি?' যেন শতকণ্ঠে ইউরেকা করে উঠল সুকান্ত।

'সত্যি। কিন্তু একটা কথা শোনো—' কাকলি তাকাল মাটির দিকে।

'বলো।'

'আমি কদিন চাকরির বাজারে ঘুরে দেখছি—'

'ঘুরছ নাকি?'

'না ঘুরলে মিলবে কোথায়?' এবার চোখ তুলল কাকলি: 'এ কি ইউনিভার্সিটির লিফ্‌ট যে যেটা এসে পড়বে হুমড়ি খেয়ে সেইটেকেই তুলে নিতে হবে? মাঝে মাঝে তাই ঘুরছি দুপুরবেলা।'

'কী দেখছ?'

'দেখছি চাকরির বাজারে বিবাহিত স্ত্রীর চান্স খুব কম, অবিবাহিত কুমারীর চান্সই বেশি। সুতরাং—'

'সুতরাং?'

'আমি দরখাস্তের ফর্মে নিজের নাম, কুমারী নাম, কাকলি মিত্র লিখেছি। 'ডটার অফ' লিখেছি, 'ওয়াইফ অফ' লিখি নি।

'বেশ করেছ।' শতকণ্ঠে সায় দিল সুকান্ত।

'নাম কাকলি বসু, ওয়াইফ অফ সুকান্ত বসু লিখতে গেলেই ভরাডুবি হত।'

'হত!' মুখ-চোখ অসহায় করল সুকান্ত।

'নিশ্চয়ই। ওয়াইফ অফ তো চাকরি করে কেন? স্বামী থাকতে কেন এই ঝকমারি? স্বামীটা কি তা হলে গাধা, না গরিব?' কাকলি প্রায় ঝাঁজিয়ে উঠল: 'বাপ গরিব এ ইঙ্গিত না হয় সহ্য হয়, কিন্তু স্বামী গরিব এ ইঙ্গিত সহ্য হয় না।'

'তা খুব ভালো করেছ।'

'কুমারী-কুমারী গন্ধ থাকলে অফিস-বসেরা চঞ্চল হয়।' হাসল কাকলি, 'আর স্ত্রী-স্ত্রী গন্ধ থাকলে নিচু হয়ে ফাইল দেখে। সুতরাং—'

'সুতরাং—'

'আমার যদি ইণ্টারভিয়্যুর চিঠি আসে আমি কিন্তু কুমারী সাজব।'

'খুব সুন্দর হবে।' দৃষ্টি মদির করল সুকান্ত: 'তারপর আমার সঙ্গে যখন তোমার ইণ্টারভিয়্যু হবে তখনো তুমি কুমারী। সেই দেখেছিলাম তোমাদের বাড়ির ছাদে, মাথা কপাল শূন্য, হাত দুখানি খালি, সারা গায়ে আভরণহীনতার আভা—'

'সিলি! সাধ্য কি তুমি আর চাকুরে কুমারীর কাছে এগোও।' প্রায় ধিক্কারের মত করে বললে কাকলি, 'তার কেরিয়র নষ্ট করো। তার স্বাস্থ্য, শান্তি ও অব্যাহতিতে হাত দাও। যাও, হটো, সরে দাঁড়াও শত হস্ত।'

২৭

এ কী এক নতুন যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়ল কাকলি। এমনটি সে চায় নি, দুপুরের রোদে এমনি টই-টই করে ঘোরা পথে-পথে, আফিসে-আফিসে। পাঁকের মধ্যে থেকে গায়ে পাঁক না লাগানো। ভিড়ের মধ্যে থেকে গা-বাঁচানো সরে-সরে। যন্ত্রণা কি শুধু ঐটুকু? শুধু রোদ আর ভিড় আর ক্লান্তি? শুধু খিদে-তেষ্টা? যন্ত্রণা আবার মনোভঙ্গ। যন্ত্রণা আবার এক ঝুড়ি মিথ্যে কথার পসরা নিয়ে ফিরি করা।

তবু তুমি শিক্ষিত, তুমি উপযুক্ত, তোমাকে কি আলস্য করা শোভা পায়? নাকি সেই শোভাটাই সভ্যতা? লোকে কি এম-এ পাশ করে ঘুমুবার জন্যে? সন্ন্যেসী হয় ভালো খাবে-দাবে বলে? যুদ্ধে যায় খবরের কাগজ পড়তে? সমাজ তোমাকে এতদিন যা দিয়েছে, উপযুক্ত হয়ে এখন তার কিছু অংশ ফিরিয়ে দাও। তোমাকে শিক্ষিত করেছে, অন্তত তুমি এখন কজনকে শিক্ষিত করো। বেশ, মাস্টারি না পোষায়, অন্য কোনো কাজ নাও। কাজ যত শাঁসালো ততই তো ভালো সমাজের। মোটা আয় করে মোটা ইনকাম ট্যাক্স দাও। সমাজের খরচের টাকা তুমি কুড়োও ঘুরে-ঘুরে।

প্রথম-প্রথম, যে-যে আফিসে চেনাশোনা মেয়ে আছে, তাদের গোয়ালেই ঢুঁ মারতে লাগল কাকলি। যে শেয়ালের ল্যাজ কাটা গিয়েছে সেই শেয়ালের মনের কথা, ও-ও নিষ্পুচ্ছ হোক। যার নষ্ট বলে নাম হয়েছে তার প্রার্থনা হয় ওরও গায়ে একটু কাদার ছিটে লাগুক। পিছলে পড়েই লোকে কর্দমাক্ত হয় না, পাশ দিয়ে চলা অন্যের গাড়ির চাকায় ছিটোনো আকস্মিক কাদাও নিরীহ পথিকের গায়ে লাগে।

'তা বেরিয়েছিস বেশ করেছিস।' বললে চিত্রা!

'এখনো বেরুলাম কোথায়?' মুখ টিপে হাসল কাকলি।

'তার মানেই তাই। ঘুর-ঘুর করতে শিখেছিস যখন, তখন বেরুনোর আর দেরি নাই।'

'যেন ফুরফুর করতে শিখলেই ওড়া যায়!' আবার হাসল কাকলি।

'পসিবিলিটি হয়।' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল চিত্রা: 'যে ফ্রক পরেছে যতই কেননা সে দেরি করুক, একদিন শাড়ি তাকে ধরতেই হবে। তাই যখন একবার

দরখাস্ত লিখতে শুরু করেছিস, তখন দাসখৎ লিখে দিতে পারবিই। একটা কিছু না কোন জুটে যাবে শেষ পর্যন্ত।

কাজ কি এতই সোজা? পথ কি এতই ঘাসে-ফুলে মনোরম?

হতাশায় নিশ্বাস ফেলল কাকলি। বললে, 'তুলো শুনতে নরম, কিন্তু ধুনতে কঠিন!'

শকুন্তলা বললে, 'দিব্যি বিয়ে করে গেরস্থ বনেছিলি, তোকে আবার এই ঘোরা-রোগ ধরল কেন? ভুল শুনিস নি আশা করি। ঘোড়া-রোগ নয়, ঘোরা-রোগ।'

'আহা, স্বামী যদি দুর্বল হয়, কম-রোজগেরে হয়, তা হলে স্ত্রী কি তাকে সাপ্লিমেণ্ট করবে না?' পাশের চেয়ার থেকে বলে উঠল মীনাক্ষী।

কিরকম অস্বস্তি করে উঠল কাকলির। ঠিক সুকান্তর জন্যে নয়, স্বামী—এই কথাটার জন্যে। দ্রুতকণ্ঠে বললে, 'না, না, তার জন্যে নয়। স্বামী যদি প্রবলও হয়, তবু সক্ষম স্ত্রী কেন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে? টাকা কি কখনো কারু বেশি হয়? আরামের কি সন্তোষ আছে?'

টিফিন-টাইমে আফিস-পাড়ায় ক্যান্টিনে না কাফেটরিয়ায় মিলেছে মেয়েরা, মেয়ে-কেরানিরা। সকলে এক গাছের নাই বা হল, পাশাপাশি গাছের থেকেই নেমে এসেছে মাঠে। শালিক-চড়ুই, যাতে যার খুশি, একত্র হয়ে বসেছে কোণে-অ-কোণে। কাফেটরিয়ায় না হয় তো অলি-গলির রেস্তরাঁয়। পর্দার ঘেরাটোপে।

'আচ্ছা, আমাদের কি আর কেরানি বলা উচিত?' জিজ্ঞেস করল শকুন্তলা।

'কে বলেছে? সরকারি পরিভাষায় আমরা এখন করণিকা।' মীনাক্ষী বললে।

'মালবিকা-মদনিকার ছোট বোন।' চিত্রা টিটকিরি দিয়ে উঠল।

কাকলি বললে, 'কেরানি তো পুরুষ। তাই ওর স্ত্রীলিঙ্গে হওয়া উচিত কে-রাজা। মেয়ে-কেরানিটা শুনতে বিশেষ সম্ভ্রান্ত নয়।'

'অনেকটা শী-গোট শী-ক্যাট-এর মত।' শকুন্তলা ফোড়ন দিল।

'কে-রাজাটাই সব দিক থেকে শুদ্ধ!' মীনাক্ষী বললে, 'আমরা যারা কুমারীরা আফিসে চাকরি করছি, আসলে কে-রাজা কে-রাজাই করছি।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

'তুই হাসছিস কেন?' শকুন্তলা ঠেলা মারল কাকলিকে: 'তোর রাজা তো জুটেই গিয়েছে।'

'কিন্তু রাজা-জোটানোর আহ্লাদটা সিঁথিতে-কপালে অমন ডগডগে করে রাখলে চাকরি জুটবে না।' চিত্রা মুখ-চোখ ভার-ভার করল: 'বিবাহিত মেয়ের আবার চাকরি কী। তার স্বামীই তো চাকরি।'

'বা, তাই বলে তার জীবনে আর প্রসপেক্ট থাকবে না ?' কাকলি প্রতিবাদ করতে চাইল।

'কিন্তু তাকে চাকরি দিয়ে বস্-এর প্রসপেক্ট কী ?' পেয়ালায় মুখ লুকিয়ে হাসল মীনাক্ষী।

'তবে যদি ত্যাগ-করা স্ত্রী সাজতে পারিস, ডিসকার্ডেড ওয়াইফ, তা হলে কিছুটা আশা আছে।' শকুন্তলা ভাষ্য জুড়ল।

'আর ত্যাগ-করা স্ত্রীরও কুমারী-কুমারী চেহারা।' মীনাক্ষী তাকাল কাকলির দিকে : 'কিন্তু তুই যেমন পরিপাটি দেখতে, নতুন ফোটা ফুলের মত, কিছুতেই তোকে পরিত্যক্ত বলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাই সোজাসুজি কুমারী সাজাই ভালো।'

'তোর ভাবনা কী।' বললে শকুন্তলা, 'দিন তো শাদাই থাকে, সকাল-সন্ধেটাই লাল হয়। তুই তোর সকালের সিঁদুর স্নানের সময় তুলে ফেলবি। শাদা থেকে চাকরি করে যাবি সারা দিন। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিয়ে সিঁদুর পরবি টকটকে করে। কিন্তু গোড়াগুড়ি এমনি লাল হয়েই যদি আসতে চাস দেখবি চাকরির বাজার চারদিকে লালবাতি জ্বলছে।'

'সত্যি, তোর ভাবনা কী !' চিত্রা বললে, 'চাকরিতে বাহাল হবার পর, সুবিধে বুঝে বলবি বিয়ে হয়েছে। কে তোকে ঠেকায়, নিশান তুলবি সিঁথিতে। বিয়ে হবার জন্যে প্রসিডিং হতে পারবে না—আইন নেই।'

'বিয়ে হবার জন্যেও নয়।' জুড়ল মীনাক্ষী।

'তবে কুমারী সাজবার একটা ঝামেলা।' চিত্রা বললে।

'কী ?' কাকলির প্রশ্ন।

'কতগুলি উৎসাহী নির্লজ্জ পিছু নেয়, ফলো করে। সেদিন কী হয়েছিল জানিস না বুঝি ?' রাগবে না হাসবে ঠিক করতে পারছে না চিত্রা : 'আফিস থেকে বেরিয়েছি, কোত্থেকে একটা ছেলে—হ্যাঁ, লোক নয়, ছেলে—পিছু নিয়েছে।'

'তোর নিজের আফিসের কেউ ?' আনাড়ির মত জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'নিজের আফিসের লোকের অতটা সাহস হবে না। যদি হেড-অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দিই। শত হলেও চক্ষুলজ্জা তো আছে। এ নিশ্চয়ই কোনো এক প্রতিবেশী আফিসের রত্ন। যেখানেই যাই, যে পথেই এগুই, পিছনে ঠিক সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা। বুঝলাম আমার সিঁথিটা শাদা দেখেই বেচারা এমন লেগেছে আদাজল খেয়ে। তখন কী করলাম জানিস ? একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগের থেকে লিপস্টিকটা বের করলাম। ব্যাগের আয়নায় মুখ দেখে লিপস্টিকটা ঠোঁটে না বুলিয়ে ঘষলাম সিঁথিতে—

আগুন করে তুললাম। পরে নিজেই একটু চেষ্টা করে ঘেঁষলাম ওর দিকে, স্পষ্ট হলাম। ও বুঝল, আমি বিবাহিত, আমার সিঁথিতে সিঁদুর—অমনি চম্পট দিল।' বিজয়িনীর মত হাসতে লাগল চিত্রা : 'লোকে স্টিক দিয়ে তাড়ায়, আমি লিপস্টিক দিয়ে তাড়ালাম।'

হাসির ঝড় উঠল। কাকলি বললে, 'কিন্তু সাজ-সজ্জাটা তো পরের কথা। প্রথম কথা হচ্ছে ভেকেন্সি।'

'তুই এখনো অনেক পিছিয়ে আছিস।' শকুন্তলা চোখ নাচাল : 'সব সময়েই ভেকেন্সি ঘটে না, কখনো-কখনো ভেকেন্সির সৃষ্টি হয়।'

'মানে বায়ুকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে—'

চিত্রাকে থামিয়ে ভাষ্য জুড়ে দিল মীনাক্ষী : 'বায়ুকে মানে বায়ু-দেবতাকে।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে,' কথাটা শেষ করল চিত্রা : 'মাঝে মাঝে অন্তরীক্ষে শূন্যতা জন্মায়। বিজ্ঞানে ভ্যাকাম বলে, চাকরিতে বলে ভেকেন্সি। আর জানিস তো, নেচার অ্যাবহরস্ এ ভ্যাকাম।'

'এখানে নেচার মানে বস্, দি পার্সন ইন অথরিটি।' টিপ্পনীতে শকুন্তলাও ওস্তাদ।

'সোজা কথা, তার চোখে যদি একটা ভেকেণ্ট স্টেয়ার আনতে পারিস, কখনো-সখনো তা হলেও ভেকেন্সি।' হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল চিত্রা।

'তা হলে বলতে চাস দরখাস্ত করা লাগবে না, ফর্ম ফিল-আপ করা ?' কাকলি করুণ মুখে বললে।

'লাগবে। লেফাফা রাখতে হবে।' পুঁচকে রুমালে ঠোঁট মুছল শকুন্তলা। তারপর জ্ঞানীর মত মুখ করে বললে, 'কিন্তু লেফাফাটাই মায়া।'

'প্রপঞ্চ !' ভাষ্য জুড়ল মীনাক্ষী।

'তোরা কি অমনি লেফাফা ফাঁপিয়েই চাকরি জুটিয়েছিস নাকি ?' কাকলির প্রশ্নে হঠাৎ ঝাঁজ এসে গেল।

'আমরা তো সদর দিয়ে ঢুকেছি, কত কাঠখড় কুড়িয়ে-পুড়িয়ে, লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ সাধনাকে অঙ্গীকার করে। আর আমাদের কী সব মাইনে।' বললে চিত্রা, 'কী বা গুণপনা। শকুন্তলাটাই যা আমাদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট। আর আমরা, বাকিরা, সংসারের ঠেলায় কবে থেকেই কলেজ-ছাড়া। তুই বিদ্যার মগডালের পাকা ফল, শুধু স্বাদে সুন্দর নয়, রঙে-গন্ধেও সুন্দর। তুই আমাদের মত ঝুড়িতে করে চালান হবি কেন, তুই টুপ করে খসে পড়বি কোলের উপর—'

সকলে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

'মোট কথা, তুই যখন দ্রুত সিদ্ধির জন্যে ব্যস্ত, তখন তুই সদর দিয়ে ঢুকতে যাবি কেন,' আরো ব্যস্ত হল মীনাক্ষী, 'তুই ঢুকবি খিড়কি দিয়ে। তোর সেই ধারও আছে, জেল্লাও আছে।'

'আর আমরা সব মসী আর ভুষি।' সর্বহারার মত মুখ করল শকুন্তলা।

তবু, ওরা যাই বলুক, প্রথম প্রথম ওদের মানতে চায় নি কাকলি। শরীরেসাজে করে নি কোনো ঝাড়া-পোঁছা। কপালটা চুনকাম করলেও সিঁথিতে দিতে পারে নি পোঁচড়া। দু পাশে চুল ঝুলিয়ে রাখলেও সিঁথির রক্তিমাটা লক্ষণীয়।

'সেন্টু আমার ঘরে ঘুমুচ্ছে। ওদিকে একটু নজর রাখবেন।' মৃণালিনীর ঘরের দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কাকলি: 'আমি একটু বেরুচ্ছি।'

কখনো-সখনো যা বেরোয়, শাশুড়িকে বলে যায় কবে? শাশুড়ির মনঃপূত হবে না বলেই বুঝি বলে না। আজ ঘটা করে জানাবার দরকার কী! শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, মুখের থেকে কাগজ সরিয়ে নিয়ে চশমার দু-ভাগ কাঁচের এক-ভাগের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে তাকাল মৃণালিনী। কিরকম যেন নতুন-নতুন লাগল কাকলিকে, ঝরঝরে সাজগোজ, হাতের ব্যাগটাও যেন নতুন।

'কোথায় বেরুচ্ছ?'

'চাকরির খোঁজে।'

'বা ভালো কথা।' শোয়া ছেড়ে উঠি-উঠি করে উঠল মৃণালিনী।

'মানে এই একটু আফিস-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে।' প্রথম কথাটা বোধ হয় একটু রাগ-রাগ শুনিয়েছিল, এবার একটু নরম করল কাকলি। বললে, 'কিন্তু ঘোরাঘুরি করলেই কি আর জোটে?' একটু বুঝি বা হাসল ঠোঁটের কোণে।

'ঘোরাঘুরি করলেই জোটে।' মৃণালিনী জোর দিয়ে বললে, 'শুয়ে বসে ঘুমিয়ে থাকলে জোটে না। তুমি যাও। আমি দেখব সেন্টুকে।'

সিঁড়ির দিকে কাকলি এগিয়ে যেতেই নিজের মনে বলে উঠল মৃণালিনী: 'অযোগ্য হলে বরং কথা ছিল। যে যোগ্য তার চেষ্টার অসাধ্য কী! জুটুক, না-জুটুক, তবু চেষ্টা করাটা, ঘোরাঘুরি করাটা ভালো। নইলে উচ্চশিক্ষিত মেয়ে দুপুরবেলায় পড়ে পড়ে ঘুমুবে, নাক ডাকাবে, এ অসহ্য। শোনো।' কাকলির উদ্দেশে মৃণালিনী নিচে কণ্ঠস্বর পাঠাল: 'বিজয়াকে বলে যাও। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ও যেন সেন্টুকে নিয়ে যায় নামিয়ে।'

সংবাদটা বহন করবার দরকার নেই, শুনতে পেয়েছে বিজয়া।

তবু পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল কাকলি। ডাকল: 'কাকিমা।'

কোনটা পড়ে বা না পড়ে মেঝেয় বসে বই বাছছিল বিজয়া। বললে, 'শুনেছি। বেরুচ্ছ বুঝি? চাকরির খোঁজে?'

'হ্যাঁ, খুঁজতে আর দোষ কী।'

'না, দোষ কী! লোকে ভগবানও খোঁজে—'

'আপনি সদরটা বন্ধ করে দিন। চাকররা কেউ নেই।' সদর খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বন্দনার অপারেশন হয়েছে হাসপাতালে। এখনো ছাড়া পায় নি। বাড়িতে থাকলে এখন এ নিয়ে দু-জনে একটু গুজগুজ করতে পারত, একটু বা গা-টেপাটেপি। এখন অন্যরকম দল পাকানো হত। শাশুড়ি আর ছোট বউ এক দিকে, বিজয়া আর বন্দনা আরেক দিকে। আহা, ভালো বউটা কত কষ্ট পেল খামোকা। কিছু দোষ করে নি, শাদামাঠা ঠাণ্ডা বউটা, অথচ তার কত শাস্তি। মরেই যাবে ভয় পেয়েছিল, কী আকুল কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! ব্যাধির চেয়েও বড় যন্ত্রণা, আর বুঝি চোখ মেলবে না পৃথিবীতে। অপারেশনে ভালো হল, তারপরেও কত টানাহেঁচড়া। উপসর্গগুলির উপশম হল, কথা বলতে না দিক, কিন্তু কত দিন ছেলেমেয়ে দুটোকে চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে দিল না। সে আবার আরেক কষ্ট। যে নিরীহ নম্র সে কষ্ট পায়, আর যে উদ্ধত অহংকারী সে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে ঘোরে।

শুধু তাই! আগে জানতাম, কেউ বেরুলে বউই দরজা দেয়; এখন বউ বেরুলে শাশুড়িকে উঠে দরজা দিতে হবে।

দিন কতক ঘুরল কাকলি। সমক্ষ সংস্পর্শই কার্যকর, তাই স্লিপ পাঠিয়ে সুইং-ডোর ঠেলে-ঠেলে আফিসের কর্ণধারদের সঙ্গে দেখা করল। যে দেখে, সত্যিই বলেছে, প্রথমে মাথার দিকে দেখে, আর যেন একটা সাপের জিভ দেখেছে, এমনিভাবে মুষড়ে যায়। কেউ-কেউ বা একটু-আধটু আশার কথা বলে, ইশারা-হদিসের পথ বাতলায়, কোন ডিপার্টমেণ্টে কখন কী হতে পারে ফর্ম-টর্ম সই করিয়ে নেয়। কেউ-কেউ বা নিশ্ছিদ্র বধির হয়ে থাকে। আর কেউ-কেউ বা অনেক মিথ্যে কথায় অভ্যস্ত, মসৃণ মধুর কণ্ঠস্বরে বলে, আরেক দিন আসবেন। দেখি কী করতে পারি।

কেউ উদ্যোগে উত্তপ্ত হয় না।

সেদিন টিফিন-টাইমে ক্যান্টিনে ধরল শকুন্তলাকে।

বললে, 'কিছু সুবিধে হচ্ছে না ভাই।'

'ঐ মেক-আপে হবে না। সিঁথিটা শাদা করতে হবে। মফস্বল শহরের লাল

সুরকির রাস্তা নয়, একেবারে গাঁয়ের হালট।' শকুন্তলা হাসল : 'সব জানবি ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।'

কাকলি চিন্তিত মুখে প্লেট থেকে তুলে-তুলে বাদাম খেতে লাগল।

'কেন, তোর স্বামী কি কনজারভেটিভ? বেশ তো, তাকে বলবি, সন্ধে থেকে যখন তোমার রাজত্বের শুরু তখন ফের সতী সাজব—'

প্লেট থেকে একটা বাদাম তুলে শকুন্তলার দিকে ছুঁড়ে মারল কাকলি। বললে, 'আমার স্বামী খুব উদার।'

'তা হলে আর ভাবনা কী। শাশুড়ী?'

'না। ঐ আসুরীও আমার দিকে।'

'তবে তো কেল্লা ফতে!' উল্লসিত হয়ে উঠল শকুন্তলা।

'কেল্লার দেখা নেই তুই একেবারে নিশান নিয়ে দাঁড়ালি।' কাকলি ক্লান্ত স্বরে বললে, 'প্রতিমা একমেটে করা দূরের কথা কোথাও স্থূল মাটি পেলাম না। বিশেষ কোনো একটা আফিসে বিশেষ কোনো একটা লোকের সন্ধান হল না আজো। তুই আমাকে দে না একটা লিস্টি।'

'দেব, দিচ্ছি।' ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম তুলে নিল শকুন্তলা : 'কিন্তু তার আগে তোকে আরেকটা কথা বলি। দুপুরের দিকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে-চিবিয়ে খোঁজাখুঁজি করলে হবে না।'

'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মানে?'

'ঐ আর কি—আলস্যের ঢেউ তুলে। খুব একটা ত্রস্ত-ব্যস্ত ভাব থাকা চাই। প্রাণ যায়-যায় ভাব। তুই যদি এখন অফিসারদের লাঞ্চ-টাইমে আসিস, তারা স্বভাবতই বুঝবে, তাড়া নেই। আর যেখানে তাড়া নেই, সেখানে সাড়া কোথায়?'

'তুই তা হলে কী করতে বলিস?'

'একেবারে ফার্স্ট-আওয়ারে আসবি। খুনচাপা পাগলের মত আসবি।' কাগজের টুকরোয় নাম লিখতে লাগল শকুন্তলা।

ভয় পেলেও মৃদু-মৃদু হাসল কাকলি। ওরও হাতে ঘড়ি আছে, তাকাল তার দিকে। বললে, 'ভরা আফিস-টাইমে আসতে বলিস?'

'নিশ্চয়ই। পড়ি-মরি ভাব না করলে হবে না। এমন জরুরি যে ভরাকোটাল পার হয়ে এসেছি সাঁতরে। পরিপাটি পোশাকে ছিমছাম থাকলে চলবে না। একটা ছন্নছাড়া ছন্নছাড়া ভাব রাখতে হবে। হন্যে হলেই মিলবে ঠিক মাংসের টুকরো।'

ফর্দটা শকুন্তলা পৌঁছে দিল কাকলিকে : 'ছাখ চেষ্টা করে, হলেও হতে পারে। না হোক, অভিজ্ঞতা তো হবে।'

তবু ঠিক তুঙ্গ আফিস-টাইমে বেরুতে পারে না কাকলি। পুরুষদের, অন্তত ভূপেন-হেমেনের হয়ে যাবার পরেই বাথরুম নেয়। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে রাখতে পারে বটে, কিন্তু ভোর থেকেই শূন্য সীমন্তে থাকাটা প্রশস্ত মনে হয় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছি এমনি একটা ভাব আনা যায় না তা হলে। আধ ঘণ্টা পরেই না হয় বেরুবে। আধ ঘণ্টায় ভরাকোটাল মরাকোটাল হয়ে যাবে না।

'মা, আমি এখন থেকে একটু সকাল-সকাল বেরুব।' মৃণালিনীকে বললে কাকলি।

'বেশ তো, ভালো কথা। রান্নাঘরে বসে তা হলে খেয়ে নাও।' আদর ঢেলে কথা কইল মৃণালিনী। তারপর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল : 'কিছু সুবিধে-টুবিধে হল ?'

একেবারে বিরক্ত বা হতাশের মত মুখ করল না কাকলি। বললে, 'হবে হয়তো।'

'হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হবে। লেগে থেকে এতগুলি পাশ করতে পেরেছ, আর লেগে থেকে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না ?' আশীর্বাদে ঝরে পড়ল মৃণালিনী।

ছন্নছাড়া চেহারা করতে হলেও অবহিত হয়ে অনেক ছন্দ-বন্ধ মানতে হয়। ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখাতে হলেও দরকার অনেক মন্থরতার, সতর্কতার।

পরনে আটপৌরে শাড়ি, গায়ে হাতে-কাচা সাধারণ ব্লাউজ, পায়ে রঙ-চটা স্যাণ্ডেল, হাতে-গলায় গয়নার ছিটেফোঁটা নেই, সিঁথিটা একটা দীর্ঘ হাহাকারের মত শাদা, কাকলি বেরুবার মুখে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সামনে বাধার মত সুকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

'সরো।' গম্ভীর স্বরে বললে কাকলি।

'চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু সত্যি। অনাঘ্রাতার মত।' লোলুপ শিশুর মত প্রায় ধরি-ধরি করে উঠল সুকান্ত।

ক্ষিপ্র পায়ে পিছু হটল কাকলি। বললে, 'যেতে দাও।'

'তারপর ফিরে এসে যখন রঙ চড়াবে, তখন চলে যাবে এই শুচিতা। রক্তিম হওয়াই বুঝি কলুষিত হওয়া।' সুকান্ত চোরের মত হাত বাড়াল।

'আমি এখন কাজে বেরুচ্ছি।' প্রায় একটা বেত তুলল কাকলি: 'এগারোটার সময় আমার আজ এক জায়গায় দেখা করবার কথা।'

সংবৃত হল সুকান্ত। টেবিলের কাছে সরে গিয়ে বললে, 'দাঁড়াও। তোমাকে কটা টাকা দিই।'

'কী বললে?' যেন শুনতে পায় নি, উদ্যত পদক্ষেপ স্থগিত করল কাকলি।

'কটা টাকা—'

'খবরদার।' কাকলি স্পষ্ট ধমকে উঠল: 'ও কথা মুখেও এনো না।'

'বেশ, মুখে নাই আনলাম। হাতখানি বাড়িয়ে দাও, গুঁজে দিই।'

'তোমার টাকা আমি ছুঁই না।

'নাই বা ছুঁলে। ব্যাগটা দাও, ফেলে দিই ভিতরে।' সহানুভূতির স্বরে সুকান্ত বললে, 'কতদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছ, কত না জানি খরচ হচ্ছে রোজরোজ। জানিও না, জানতে দিচ্ছও না। নিশ্চয়ই তোমার টাকার টানাটানি হচ্ছে। হওয়াই সম্ভব। বাইরে ঘোরাঘুরি করলে খিদে পায়, এক-আধটু টিফিনই বা খাচ্ছ কিনা তা কে জানে! এই যে এগারোটায় দেখা করবার কথা, একটা ট্যাক্সি করে যেতে পারলে কত ভালো হয়। দৈবক্রমে যদি পাও-ও, তবু হয়তো, কে জানে, নেবার মত তোমার সংগতি নেই। না, রাগ কোরো না, নাও, নাও কটা টাকা—'

'কত?' মাথা তুলে তবু একবার জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'সামান্যই। সম্প্রতি কুড়িটা টাকা দিচ্ছি। তোমার এক্সক্লুসিভ হাত খরচ—' বলে সুকান্ত এক-মুহূর্ত অসতর্ক কাকলির শিথিল হাতের মধ্যে দুখানি নোট গুঁজে দিল।

'তুমি এর চেয়ে বেশি আর কী দেবে।' কাকলি নোট দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের উপর: 'তোমার আর মুরোদ কত? শত হলেও তুমি তো একটা ছাত্র বৈ কিছু নও। যে টাকাটা পাচ্ছ সেটা কোনো স্থায়ী চাকরির বেতন নয়, ছাত্র হিসেবে একটা সাময়িক বৃত্তি। তাই তোমাকে স্পর্ধা না দেখালেও চলবে। কিছুকাল অপেক্ষা করো আমি এর চেয়ে ঢের বেশি আনতে পারব আশা করি। তখন হাত পেতো, দিয়ে দেব দশ-বিশ।' ঘরের দরজা কখন আলগা হয়ে গিয়েছিল, তরতর করে চলে গেল কাকলি।

এমনিই তো চেয়েছিল সুকান্ত। উপযুক্ত স্ত্রী রোজগার করবে আর তাকে দেবে-থোবে, সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু এ যেন সেই চাওয়ার চেহারা নয়। কেমন যেন খালি-খালি লাগল ঘরদোর!

না, তবু যে করে হোক, ও নিজের পায়ে দাঁড়াক। শিক্ষিত হবার মান রাখুক। স্বতন্ত্র হবার স্থান খুঁজে পাক জীবনে।

সুকান্তর সঙ্গে চটাচটি কিছু হয় নি বোঝাবার জন্যে প্রসন্ন স্বরে সেন্টুকে কাছে ডাকল কাকলি। বললে, 'আমি এখন কাজে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। তুমি আজ তোমার বিজুর কাছে ঘুমিয়ো।'

'আমি আজ আর ঘুমুব না।' ভারিক্কি গলায় সেন্টু বললে।

'কেন?'

'বা, জানো না বুঝি? হাসপাতাল থেকে আজ আমার মা আসবে। বাবা আফিস ছুটি হবার আগেই নিয়ে আসবে মাকে। কী মজা!' সেন্টু নাচতে লাগল।

'কী মজা!' নাচুনে পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বন্দনা বাড়ি ফিরলেও বিছানায় শোয়া। আর তার তদারকি করতে বিজয়া উঠে এসেছে উপরে। এতদিন গুমোট হয়ে ছিল, এবার কথার চালাচালিতে হাওয়া খেলবে।

'বাবুদের সঙ্গেই বসেছেন শ্রীমতী।' বন্দনার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললে বিজয়া।

'বসেছেন—কী করতে?'

'খেতে। ভাত খেতে।'

'এক লাইনে?'

'না। বাবুরা তাদের খাবার জায়গায়, আর উনি রান্নাঘরে।'

'আফিসের ভাত খাচ্ছে কেন? চাকরি পেয়েছে?' পেটের যন্ত্রণা গেছে, বুকের যন্ত্রণা নিয়ে জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

'না গো।' হেসে কুটপাট বিজয়া: 'একটা চাকরির ইনটারভিয়ুর চিঠি এসেছে। আজ বেলা সাড়ে দশটায় দেখা করতে হবে। ইনটারভিয়ুর চিঠিতেই এই—কর্ত্রী নিজের হাতে মাছ ভেজে খাওয়াচ্ছেন—সত্যিকার চাকরির চিঠি এলে না জানি কী করবেন!'

'সত্যিকার চাকরির চিঠি এলে ব্যাঙ ভেজে খাওয়াবেন।' এখন আর হাসতে-কাশতে বারণ নেই, হাসল-কাশল বন্দনা।

'যা বলেছ। ব্যাঙ ভেজে খাওয়াবেন।' সায় দিল বিজয়া।

'এবং খাওয়াবেন ছেলেকে।'

এবার দু-জনের সম্মিলিত হাসি।

কিন্তু সেদিন আফিস-টাইমে প্রত্যক্ষ সংসারে সকলের সামনেই সুকান্তে-কাকলিতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

'না, ককখনো না।' গলা তুলে স্পষ্ট বললে কাকলি, 'আমি কিছুতেই নেব না এ চাকরি।'

'নেবে না—এ তোমার ক্ষুদ্র মনের প্রেজুডিস।' বললে সুকান্ত, 'হীনতম অন্যায়।'

'তুমি যেটা বলবে সেইটেই ঠিক হবে? আর আমি যেটা অনুভব করব সেটা ঠিক হবে না?' কাকলির চোখে আগুন জ্বলল।

'অনুভব!' ব্যঙ্গ করে উঠল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, এখানে আমার অনুভবই প্রধান হবে। তোমার বিচার নয়।' কাকলিও ব্যঙ্গ করতে জানে আর সে ব্যঙ্গের ধারও কম নয়: 'আর তোমার বিচার তো শুধু টাকার বিচার। তোমার কাছে যে কোনো দামেই হোক, টাকাই শেষ কথা।'

'কার কাছে নয়? কিন্তু তাই বলে একজনকে তুমি অকারণে মন্দ বলতে পারো না।'

'চরম ভালো-মন্দ কে বিচার করে? কিন্তু আমার পছন্দ নয় এইটেই আসল কথা। আর যাই হোক, মন্দ-মন্দ গন্ধ লোকটাতে।'

'আর তুমি একেবারে স্বর্গের কুসুম।'

'নিশ্চয়ই, এক শো বার। সে কুসুমে তুমি একটা কীট ঢুকেছ, আর কীট আমদানি কোরো না।'

ব্যাপার কী, মৃণালিনী চাইল মাথা গলাতে।

একটা চাকরি পেয়েছে কাকলি, কেরানির চাকরি। দেড় শো টাকা মাইনে, সব মিলিয়ে প্রায় দু শোর কাছাকাছি। কিন্তু কাকলি বলছে সে চাকরি নেবে না, যেহেতু তার মতে চাকরি যে দিচ্ছে, যার অধীনে ও কাজ করবে, মানে যে বস, তার চাউনিটা ভালো নয়।

'চাউনিটা ভালো নয়!' চাউনি প্রায় কপালে তুলল মৃণালিনী: 'সে আবার কী কথা?'

'যার মনের মধ্যে পাপ সেই চাউনি খারাপ দেখে।' সুকান্ত বললে।

'যার মনের মধ্যে শুধু টাকা সে সমস্ত পাপকেও বুঝি প্রশ্রয় দেয়।' পালটা বললে কাকলি।

'চাউনি খারাপ, কিন্তু লোকটা করেছে কী!' মৃণালিনীর চাউনি তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নি।

'কিছু করে নি।' বললে সুকান্ত, 'শুধু বলেছে, দুপুরবেলা আমার সঙ্গে খাবেন চলুন হোটেলে। আর আফিসের পর যখন বাড়ি ফিরবেন, আমার গাড়িতে আসবেন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব—'

'আহা, এতে আবার অন্যায় কী!' নাবালিকা খুকির সারল্যে উথলে উঠল মৃণালিনী।

'তা তুমি একবার খেয়ে দেখ, চড়ে দেখ, আর কতদূর যায়, কী করে। তা নয়, শুধু শুধু একটা ভঙ্গিতে একটা চাউনিতে, একটা শুধু মৌখিক নিমন্ত্রণেই তুমি খড়্গ তুলবে?'

'তুলব।' কাকলি দৃঢ় স্বরে বললে, 'যেখানে আমি সম্মান পাব না, স্বাচ্ছন্দ্য পাব না, প্রতি পদে নিজেকে আমার অপদস্থ বলে বোধ হবে, সে চাকরি আমি করব না, করতে পারব না কিছুতেই।'

'যে নাচতে নেমেছে তার আর ঘোমটা দেওয়া কেন?' সুকান্ত গর্জে উঠল।

'ঘোমটাই সে ফেলতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কোনো আবরণ নয়।' কাকলি দৃঢ়তর হল: 'তা ছাড়া এ আমার ব্যাপার, আমার চাকরি। আমার খুশি হত নিতাম, খুশি হয় নি নেব না। এর উপরে আর কথা কী!'

'না, আছে কথা—' কী বলতে যাচ্ছিল মৃণালিনী, ওপার থেকে ভূপেন তাকে ডাকতে লাগল চেঁচিয়ে: 'ওগো শুনছ, কোথায় তুমি, কোথায় গেলে?'

মৃণালিনী ছুটে এল। 'কী, তোমার আবার কী হল?'

'কিছু হয় নি। আমি বলছি কী, ওরা স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে, তুমি তার মধ্যে নাক ঢোকাচ্ছ কেন? ওরা ঝগড়া করছে ওরাই আবার মিটিয়ে নেবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকলেই গোলমাল, আরো গোলমাল—শোনো—'

শোনবার পাত্রী নয় মৃণালিনী। তাই স্বামীর উপদেশে কর্ণপাত না করে আবার গেল অকুস্থলে। কাকলির উপরে সব কটা দাঁতে মুখিয়ে উঠল: 'তুমি সুকুর আর কত ক্ষতি করবে শুনি?'

'ক্ষতি!' কাকলি থমকে দাঁড়াল।

'তোমার বাবা বিয়ের যৌতুক বাবদ দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল সুকুকে, তুমি তা কায়দা করে ফিরিয়ে দিলে বাবাকে, স্বামীকে বঞ্চিত করলে। এখন আবার এই দেড় শো দু শো টাকার চাকরিটা ফিরিয়ে দিচ্ছ! যাতে সুকুর একটু সুরাহা হয়, সুবিধে হয়—তুমি চাও না কিছুতেই। এ তুমি কেমনধারা স্ত্রী জিজ্ঞেস করি?'

প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হয়ে গেল কাকলি। সেই দশ হাজার টাকার গল্পটা এখানেও ফলাও করে বলা হয়েছে! টীকা জুড়েছে নিজের ইচ্ছেমত। ছোটলোক কোথাকার!

'হ্যাঁ দেব, সব ফিরিয়ে দেব। কিছু রাখব না। শোধ করে দেব সমস্ত।' টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত, দীপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

·২৮

কাগজের টুকরোতে প্রথমে নাম লিখল: কাকলি মিত্র। পরে ভাবল, চিনতে তো পারবেই, তবে আর ছলনা কেন? মিত্র কেটে বসু করল। না, ছলনা কোথায়? কুমারী নামে চাকরি করতে নেমেছে এ তো ঘরে-বাইরে সকলের জানা। এ পর্যন্ত যত দরখাস্ত ছেড়েছে সব ঐ কুমারী নামে। যে চাকরিটা পেয়েও ছেড়ে দিয়ে এসেছে তাদের খাতায়ও ঐ নাম। এখান থেকেও যদি কিছু সুবিধে নিতে হয় মিত্র হয়েই নিতে হবে। তাই আবার বসু কেটে মিত্র করল।

কিরকম কাটাকুটি হয়ে গেল কাজগটা। নতুন আরেকটা স্লিপ নিয়ে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল: কাকলি মিত্র।

পরিচ্ছন্ন দেখানোটাই সুন্দর, সুস্থ।

দারোয়ান দিয়ে স্লিপ পাঠাল ভিতরে।

স্লিপ দেখে বরেন প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গেল। মহিলা-মহিলা শোনাচ্ছে। তবে, যেমন অদৃষ্ট, ঘরে ঢোকালে হয়তো দেখবে মধাপদলোপী পুরুষ—নাম আসলে কাকলিকূজন বা কাকলিভূষণ মিত্র। ডাঁট দেখাবার জন্য নামে ছাঁটকাট করে এসেছে।

তবু একবার অস্বচ্ছে জিজ্ঞেস করলে দারোয়ানকে, 'কে!'

'একজন ভদ্রমহিলা।'

নিজের মনে নিজেই অবাক হল বরেন। এ আবার কে কবে শুনেছে।

শুনতেই বা দোষ কী! বরেন কি কোনো অর্থেই আরাধনীয় নয়, তার কি বয়স নেই বা সামর্থ্য নেই? সে কি কুরূপ বা বিকলাঙ্গ? তার কি নির্ধনের অবস্থা, না কি নিষ্প্রতাপের? না কি সে কারু উপকারেই আসতে পারে না?

না, তবু, অহংকার করা ভালো নয়। ধীর-স্থির থাকা ভালো। নম্র হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকা ভালো।

উদ্বেগে-উদ্যোগে থেকো না। যা আপনা থেকে আসে আসতে দাও!

দারোয়ানকে বললে, 'ডাকো।'

তরল-টলটল চোখে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল কাকলি। কোনো কথা না বলে দুটি সুধীর হাতে নমস্কার করলে।

কী আশ্চর্য! আমি কি নাম-ধাম গোত্র-পদবী মুখস্থ করে রেখেছি? আমি ভাবলাম, কে না কে। কোথাকার কে অজানা-অচেনা!

'কী আশ্চর্য! আপনি?' চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল বরেন: 'আপনি কোত্থেকে?'

বলেই বুঝল এ একেবারে অবান্তর প্রশ্ন। কিছুটা উৎসাহ টের পাওয়া যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। যেখান থেকেই আসুক, কিছু আসে যায় না। এসেছে যে, এটাই বড় কথা। একমাত্র কথা।

নিজেকে সহসা গুটিয়ে নিল বরেন। বললে, 'বসুন।'

কাকলি বসল।

বরেন দাঁড়িয়েই থাকল। বললে, 'আপনার নামটা আমার মনে ছিল না—'

'বিচ্ছিরি নাম। মনে থাকবার কথা নয়। কাক দিয়ে আরম্ভ—'

কিন্তু কলি দিয়ে শেষ—কথাটা পিঠ-পিঠ তখুনি মনে এল না বরেনের। পরে এল—তখন অনুতাপের একশেষ। এই প্রথম নয়, আরো অনেকবার হয়েছে। লাগসই কথা ছিল, জানা ছিল, কিন্তু তর্কের তপ্ত মুহূর্তে মনে পড়ে নি, তাই পারে নি বলতে। সুযোগ ফসকে গিয়েছে।

কিন্তু কথাই সব নয়। স্তব্ধতাও কিছু।

দাঁড়িয়ে থেকেই দরজার দিকে গলা বাড়াল বরেন। বললে, 'সঙ্গে আর কেউ আছে? না, একা?'

এ আবার কী প্রশ্ন! একা না দোকা দেখতেই তো পাচ্ছ চোখের উপর। যা এখনো দেখা যাচ্ছে না বা যা নেপথ্যে আছে, তার জন্যে চাঞ্চল্য কেন?

'একা।' গম্ভীর হয়ে কাকলি বললে।

সত্যি, কি রকম অদ্ভুত তাকে দেখাচ্ছে! বাঁ হাতে সেই ঘড়িটা ছাড়া আর কোনো তার অলংকরণ নেই। কপাল তো শূন্যই, সিঁথিটাও শাদা। রক্তিম আতঙ্কের ক্ষীণ একটু আভাসও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেদিন, যতদূর বরেন মনে করতে

পারছে, মাথায় গোল খোঁপা ছিল, আর আজ পিঠে লম্বা বেণী। সেদিনের তুলনায় আজকের শাড়িটা অনেক বেশি এলোমেলো। চলাবলা অনেক বেশি স্বাধীন।

কী ব্যাপার? বুক ঠেলে প্রশ্ন এল বরেনের: 'সুকান্ত কেমন আছে?'

আহা, কী প্রাণ জুড়ানো প্রশ্ন! সুকান্ত তোমার কত বড় বন্ধু, তার মঙ্গল সংবাদ না পেলে তোমার ঘুম আসে না, রুচি হয় না আহারে।' সে বেঁচে থাকলে তোমার কত লাভ, মরে গেলে তোমারই যত ক্ষতি! এখন উত্তরটা শোনো কান পেতে। উনি ভালো আছেন। আমরা দু-জনই খুব ভালো আছি। শোনো।

'জানি না।' চোখ নামাল কাকলি।

হ্যাঁ, তেমন কিছু শোকাবহ নয়। শোকাবহ হলে প্রথমে ঢুকেই হাসত না। রসিকতা করবার ভাব করত না। দেখাবার জন্যে হলেও চোখে জল আনত। আপনি তার কত বড় বন্ধু ছিলেন—এমনিধারা বলত দুচারটে স্তবস্তুতির কথা।

'তবে?' কৌতূহলের তবু কি শেষ আছে বরেনের?

'আমি কুমারী সেজেছি।' অগাধ শান্তিতে কাকলি হাসল।

ব্যস, আর প্রশ্ন কোরো না। নিজেকে শাসন করল বরেন, কেন কুমারী সেজেছে চেয়ো না জানতে। শুধু দেখ। দেখে যাও।

আমি অসম্পৃক্ত হয়ে গেছি। ছিঁড়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি অতীতকে। দুর্বহকে। তার মানেই সুকান্তকে।

এ তো আশার কথা। তৃপ্তির কথা।

এতে তোমার আবার আশা কী! তৃপ্তি কিসের!

পৃথিবীর সমস্ত কুমারীই আমার আশা—বরেন মনকে প্রবোধ দিল। কথাটা অন্য দিক থেকেও মোলায়েম। কুমারী হয়েছি মানেই সুকান্তর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, বিচ্ছেদ না হলেও সংঘর্ষ হয়েছে। অর্থাৎ গোড়ায় যে মূল্য সুকান্তকে দিয়েছিল সে মূল্য থেকে সে নেমে এসেছে। তার মানেই সুকান্ত খেলো হয়ে গিয়েছে, চড় খেয়েছে গালের উপর। মনের কথা বাইরের লোক আর কী করে জানবে, কিন্তু এক স্পর্ধিত বন্ধুর, প্রতিযোগী বন্ধুর হার হয়েছে জীবনে এ নিশ্চয়ই একটা উপভোগের জিনিস। তৃপ্তি তো শুধু লুকোনো জিভে মনের বিষকে মধুর মত চেটে-চেটে খাওয়া।

তবু চোখে-কানে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে বরেন। কুমারী সেজেছে মানে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহছেদের মামলা রুজু করেছে? না কি আপোসে ছাড়াছাড়ি? একত্র বসবাস নেই আর তা হলে? এখন তা হলে কোথায় আছে? ঠিকানা?

পাগল! যে সভ্য যে ভদ্র সে উত্তেজিত হয় না। সে তো শিল্পীও। মনের

ভাব সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখে মুখে অজ্ঞান প্রশান্তি আনে। বিষয়ের বাইরে যায় না, সর্বাবস্থায় সায় দেয়, সহানুভূতি জানায়। যে মার খেয়েছে তাকেও, যে মেরেছে তাকেও। হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা, প্রতিবাদও করে না। বরং সাহায্য করে। চোরকেও করে, গৃহস্থকেও করে। এখন চোরে-গৃহস্থে বোঝো গে। আমাকে কেউ দোষী করতে পারবে না।

তবু আরো কিছু শুনবে, নিজেরই অগোচরে ভঙ্গিটা ঈষৎ উৎসুক করে রইল বরেন।

কাকলি নিজেই বললে। অস্বস্তির মেঘটা উড়িয়ে দিলে : 'কুমারী সেজেছি মানে চাকরি করতে বেরিয়েছি—'

'বাঃ, ভালো কথা। কোথায় চাকরি করছেন ?'

'চাকরি পাই নি এখনো।' চোখ-মুখ লজ্জিত করল কাকলি : 'খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'বাঃ, ভালো কথা।' টেবিলের উপর সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল বরেন। সমস্ত লুব্ধ কৌতুহলের মত প্রসারিত হাতও সংযত করল।

'যাই হোক, নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা সব সময়েই ভালো।'

'এক শো বার। আনন্দের তো বটেই, সম্মানের। তার উপর আপনি যখন কৃতী—'

'কৃতী !' কাকলি লজ্জার ভাব করল আবার।

'যে কৃতী তার মুক্তি নেই। সংসার তাকে ছুটি দেবে না, খাটিয়ে মারবে। বললে, নইলে তোমাকে কৃতী করলুম কেন ?' আবার সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল, আবার হাত গুটোল বরেন : 'তাই আফিসে-আদালতেও দেখি বেশির ভাগ কেরানিই ফাঁকি দেয়, পালায়, কিন্তু দু-একজন কৃতী লোক থেকে যায় কোণে-কানাচে। নাকের ডগায় চশমা রেখে ভুরু পাকিয়ে যারা কাজ করে। যেহেতু তুমি কৃতী হয়েছ সমস্ত বাড়তি কাজ তুমি একা সারো, আর সকলের গাফিলতির জরিমানা দাও।' বরেন হেসে উঠল।

তাতে কাকলিরও শব্দ করে হেসে ওঠবার সুবিধে হল। বললে, 'চাকরির বাজারে বেরিয়ে দেখলাম কুমারীর সাজসজ্জাটাই ভালো কাটে।'

'তাই বুঝি ?' যেন কিছুই জানে না এমনি আনাড়ি-আনাড়ি মুখ করল বরেন।

'কেন, আপনারও তাই মনে হয় না ?'

'না, না, নিশ্চয়। কুমারী অনেক ক্লীন, অনেক আশাপ্রদ। দেখছেন না

কুমারীকেই লোকে পুজো করে, সধবা-বিধবাকে করে না।' এবার হো-হো করে হাসতে পারল বরেন : 'যতদিন কুমারী আছেন ততদিনই ভবিষ্যৎ আছে, প্রমোশন আছে।'

'বলেন কী! যারা ওল্ড মেড, বুড়ো বয়স পর্যন্তও যাদের বিয়ে হয় নি তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে?'

'তারা আর কুমারী কোথায়! তারা মহামারী।'

দু-জন এবার যুক্ত হয়ে হাসতে পারল।

কিন্তু হাসির মধ্যেই চট করে বরেনের মনে পড়ে গেল, খুব হাসির ব্যাপার হয়তো নয়। আসলে এই কুমারীর সাজগোজটা ইচ্ছাকৃত ছদ্মবেশ। সুকান্তরই কারসাজি। তাই এটা পণ্ডের ইশারা নয়, ভণ্ডের নমুনা। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোনো-কোনো স্বামী স্ত্রীকে বিধবা সাজায়, সুকান্ত কুমারী সাজিয়েছে।

আহা সাজুক। সাজতে দাও। ভেক যে ধরেছে তার গায়ে ভস্ম একটু লাগবেই। আর তুমি বরেন, তুমি ছাইভস্ম ছাড়া আর কী। সুতরাং ধৈর্য হারাবার কিছু নেই। শোনো। দেখ। কথার পিঠে মেপেজুকে কথা বলো।

আর যে সাহায্য চায়, যদি চায়, সাহায্য করো।

'কুমারী সেজে ঘুরে কোথাও পারলেন সুরাহা করতে?' বরেন জিজ্ঞেস করল।

'এক জায়গায় পেরেছিলাম। দুনীচাঁদ-গুলজারিলাল ফার্মে পেয়েছিলাম চাকরি বেশ ভালো চাকরি। স্টার্টিং দেড় শো—'

'করলেন না?'

'না, ম্যানেজারটা স্থুল, অভদ্র। চাউনিটা ভালো নয়, কেমন মাংস-মাংস গন্ধ—'

কে ম্যানেজার, কী করেছে, কী বলেছে, কিছুই জানতে চাইল না বরেন। চুপ করে রইল। জানে চুপ করে থাকলে বাকি কথাটুকু কাকলিই বলবে নিজের থেকে। উত্তরটা সম্পূর্ণ না হলে কখনো-কখনো সেটা শ্রোতার চেয়ে বক্তাকেই বেশি বিরক্ত করে।

'জয়েন করার দিনই বলে কিনা চলুন আমার সঙ্গে লাঞ্চে', কোথায় একটা ভয়ের ভাব করবে মুখে-চোখে, না মুচকে হাসছে কাকলি : 'আর বলে কিনা, ছুটির পর ট্র্যাম-বাসের দিকে যাবেন না, আমি তো ওদিকেই থাকি, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব।' হঠাৎ মুখ-চোখ গম্ভীর করল : 'দেখুন দেখি কী কদাকার!'

'ক্যাড। ভালগার।' মুখে তাই বললে বরেন কিন্তু অন্তরে বললে, শিল্পী। কিন্তু তুই যে ওকে খেতে ডাকছিস ওর খিদে পেয়েছে কিনা খবর না করেই। আগে ওর একটা খিদে-খিদে ভাব করে তোল, তারপরে খেতে ডাক। আগে থেকেই তুই ওকে

লিফ্‌ট দিতে চাচ্ছিস কোন সাহসে? গাড়ি কি তোর একারই আছে, না তোর গাড়িই শুধু ওদিকে যায়? তুই গায়ে পড়ে বলতে যাস কেন? ওকে দিয়ে বলা, স্যার, আপনার গাড়িতে একটা লিফ্‌ট দেবেন, আপনি তো ওদিকেই যাচ্ছেন। যাতে বলে, তেমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি কর। যদি তাও না পারিস, ধৈর্য ধরে বসে থাক। কখন একটা মিছিল বের হয় ও অঞ্চলে। শুরু হয় হামলা-হামলি। ট্র্যাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়।

'বলুন ঠিক করি নি?' চোখ তুলল কাকলি।

'এক শো বার ঠিক।'

'তাই, এখন, আপনার কাছে এসেছি—' আঙুল দিয়ে টেবিলের প্রান্তে রেখা টানতে লাগল কাকলি।

হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ—আপনার জন্যে কী করতে পারি, এরকম জোলো বিরস প্রশ্ন করতে মন চাইল না। সিগারেটের জন্যে আবার হাত বাড়াল, আবার নিরস্ত করল হাত। শাদামাঠা গদ্যের গলাতেই বরেন বললে, 'বলুন, কী করব?'

'আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন।'

'এখানে?' এটা বরেনের কী স্বর, আনন্দের না বিস্ময়ের, অবিশ্বাসের না অসম্ভবের, যেন নিজেই সে বুঝতে পারল না।

আবার গা বুঝি ছমছম করে উঠল কাকলির। পাশ কাটাবার জন্যে বললে, 'আপনাদের এখানে লেডি-এমপ্লয়ির কি স্কোপ আছে? এখানে নাই বা হল। অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত আফিসে। আপনি আছেন, আপনার বাবা আছেন—আপনারা চেষ্টা করলে—'

'আর আমার মেসোমশাইও আছেন। তাঁকে জানেন না বোধ হয়। তিনি বাটারওয়ার্থের ম্যানেজার।'

'বিদেশী ফার্ম হলে তো আরো ভালো। যোগ্য মাইনে যা দেয় তাই নেব, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু পরিবেশটা ভালো হওয়া দরকার।' ভালো কাকে বলে চোখের নির্মল আলোতে তাই বোঝাতে চাইল কাকলি।

'নিশ্চয়।' সায় দিতে এতটুকু দেরি হল না বরেনের।

'কটা সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে।' ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল কাকলি: 'গুটি কয় প্রোফেসরের দেওয়া আর এম-এর ডিপ্লোমাটা—'

'লাগবে না কিছু। আপনি যে চাকরি চাচ্ছেন এইটেই যথেষ্ট সার্টিফিকেট।' সিগারেটের দিকে হাত বাড়াই-বাড়াই করেও বাড়াল না বরেন। বললে, 'বলব মেসোমশাইকে। বাটারওয়ার্থ মস্ত আফিস।'

চোখের কালো ফোঁটা দুটো জলজল করে উঠল কাকলির। বললে, 'একটা দরখাস্ত রেখে যাব ?'

'কোনো দরকার নেই।'

'তা হলে ফলাফল জানব কী করে ?'

'এর আবার ফলাফল কী! চাকরি চেয়েছেন, পাবেন। আপনার বাড়িতে চিঠি যাবে।'

'না, না, চিঠি নয়, বাড়িতে নয়।' আপত্তিতে প্রখর হয়ে উঠল কাকলি : 'আমি এখান থেকে আপনার কাছ থেকে খবর নেব। বলুন কবে আসব, কত দিন পরে—'

অনেক নিশ্চিন্ত হল বরেন। স্বকান্তের ভাবনাটা অনবরতই বিঁধছিল পাঁজরে, এখন অনেক খোলসা হল। তোর বউকে তো আমি এখানে, আমার আফিসেই চাকরি দিচ্ছি না যে তোকে জানাতে হবে। বা, কী ব্যাপার, কেন চাকরি করতে আসে, তোর সত্যি মত আছে কিনা জানতে হবে তোর থেকে। আমার কী মাথাব্যথা! আমার কাছে চাকরির ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছে আমি সদ্ভাবে একটা রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছি। যদি সেখানে না হয়, আরো না হয় দেব অন্যত্র। যদি কোনোখানে হয়, হয়ে যায়, তবে যারা চাকরি দেবে তারা, আর যে চাকরি করবে সে, মানে তোর বউ, এ দু পক্ষ বুঝবে। এর মধ্যে আমি কোথাও আসি না, আমার কিছু জানবারও নেই, জানাবারও নেই। আমি শুধু একটা পোস্টাফিস। যদি আমার এখানে চাকরি দিতাম, তোকে না জানিয়ে, তা হলে বলতে পারতিস বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তা যখন নয় তখন আর কথা নেই।

তা ছাড়া ভাবনারও কিছু নেই হয়তো। বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিতে যখন বারণ করছে তখন স্বকান্তের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘোর অবনিবনা হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তার আমি কী করব! আমি কেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ি? কাকলি যদি নিজের থেকেই আসে আমি তাকে কী করে আটকাই? যে আটকাবার সে কী করছে ?

তবু আরো একটু গভীরে পরীক্ষা করতে চাইল বরেন। দেখতে চাইল অবনিবনাটা কত দূর গিয়েছে। পরিষ্কার মুখে দিব্যি এক ভাঁওতা মারলে। বললে, 'বাটারওয়ার্থ শুনেছি তার লেডি-এমপ্লয়িদের জন্যে থাকবার বাড়ি তুলছে—এখানে লেডি-এমপ্লয়ি মানে যারা আনম্যারেড, অবিবাহিত। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে কামরা। আপনি যখন কুমারী সেজেছেন তখন আপনাকে ঐ একঘরী কোয়ার্টারে থাকতে বাধ্য করতে পারে—'

'বা, এর আবার বাধ্যতা কী! সানন্দে যাব সেই কোয়ার্টারে।' কাকলি চঞ্চল হয়ে উঠল: 'কবে শুরু হচ্ছে কনস্ট্রাকশন?'

'আগে চাকরিটা হোক।'

'ঠিকই তো।' হেসে উঠল কাকলি: 'আমি ভেবেছিলাম চাকরিটা হয়ে গিয়েছে বুঝি।' উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে: 'কবে আসব খবর নিতে?'

'তিন চার দিন বাদ দিয়ে যেদিন আপনার খুশি।' সিগারেটের জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত হাত বাড়াল বরেন!

'আচ্ছা আসি আজ। নমস্কার।'

'কটা বেজেছে আপনার ঘড়িতে?' নিজের হাতেও ঘড়ি আছে তবু বরেন জিজ্ঞেস করে বসল।

'আমার ঘড়িতে?' সুন্দর করে হেসে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল কাকলি। বললে, 'দুটো কুড়ি।' একটু থেমে অপাঙ্গে লক্ষ্মী-কটাক্ষ ফুটিয়ে বললে, 'চিনতে পারছেন একে?'

শুধু যেন ঘড়ি নয়, ঘড়ির অতিরিক্ত আর কোনো ইতিহাসের ইঙ্গিত।

'কী করে চিনব? ঘড়ির ব্যাণ্ডটা কই?'

'ব্যাণ্ডটা, ল্যাজটা খসে গিয়েছে।'

'খসে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ঘড়িও কুমারী সেজেছে।'

বেরিয়ে গেল কাকলি। আর বরেন হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে ধরল সিগারেটের টিন।

দীপঙ্কর, খাতা-পত্র হাতে, উঠছে সিঁড়ি দিয়ে আর নামছে কাকলি। মাঝপথে দেখা। এ কী অভাবনীয়, দীপঙ্কর প্রায় উদ্বেল হয়ে উঠল: 'এ কী আশ্চর্য, আপনি এখানে?'

সুন্দর গোপন করল কাকলি। বললে, 'এই বরেনবাবুর কাছে এসেছিলাম একটা কাজে।'

'তা তো দেখছিই। কিন্তু কাজ, আপনার কী কাজ—'

'আমার আবার কী কাজ! আপনার বন্ধু সুকান্তর কাজ।' আরো কয়েকটা সিঁড়ি দ্রুত নেমে গেল কাকলি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নামতে নামতে দীপঙ্কর বললে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার যে একটা জরুরি কাজ ছিল।'

সিঁড়ির নিচে এসে এক মুহূর্ত থামল কাকলি। কিন্তু দীপঙ্কর তার কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই উপর থেকে দারোয়ান হেঁকে উঠল: 'সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

এ আদেশ কাকে, বুঝতে দেরি হল না দীপঙ্করের। নিমেষে সে জুড়িয়ে গেল, আড়ষ্ট হয়ে গেল। শিথিল খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে উঠতে লাগল উপরে। কাকলি আর দাঁড়াল না। যেন আবার কী এক ঘূর্ণির মধ্যে পড়ছিল, ভাগ্য বাঁচিয়ে দিল।

কিন্তু যতই পথ চলতে লাগল ততই মনে পড়তে লাগল বিন্টুর কথা। দীপঙ্করের সেই পঙ্গু ছোট ভাইটার কথা। যে সেদিন যেতে পারে নি জু-তে, বাড়িতে বন্দী হয়ে ছিল। আর এক পায় কী করুণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল চোখের উপর। যে পায়ে দাঁড়িয়েছে সেটাও যে শীর্ণ অক্ষম তা তার খেয়াল নেই। দাঁড়াতে যে পেরেছে সেই আনন্দে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত করে রেখেছে। এই বুঝি পড়ল, পড়ে গেল, ভেঙে গেল টুকরো টুকরো। প্রতি মুহূর্তে সেই ভয়-জাগিয়ে-রাখা দাঁড়িয়ে থাকা। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরি, পড়তে না দিই, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি জোগাই। আর সে কী হাঁপধরা নিচু চালের বস্তি। অভ্যাস-আবিল পরিবেশ।

কিন্তু আমাকে ওর কী দরকার থাকতে পারে? কাজ নয়, বলে কিনা, জরুরি কাজ, আর সেই জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায়? যদি দৈবাৎ দেখা না হত তা হলে জরুরি কাজটাও জন্মাত না। মনে মনে হাসতে চাইল কাকলি, কিন্তু পুরোপুরি পারল না হাসতে। আপনার সঙ্গে জরুরি কাজ ছিল—কথাটার মধ্যে স্ফূর্তি নয়, প্রচ্ছন্ন আকূতির সুর। শ্বাস-হারানো কোন এক বিপন্নের ডাক।

আবার তো আসছিই এদিকে। মনকে প্রবোধ দিল কাকলি। তখন দেখা করব। শুনব। করব যা আমার সাধ্য।

'এতক্ষণ দেরি করলেন কেন?' কঠোর স্বরে বললে বরেন। খাতাপত্রের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

খাতাপত্রগুলো এগিয়ে দিতে দিতে দীপঙ্কর বললে, 'আপনি এতক্ষণ কার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।'

জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বরেন বললে, 'কিন্তু গল্প শুরু করবার অনেক আগেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তখন চটপট চলে আসেন নি কেন?'

'খাতাপত্র গুছোতে তো সময় লাগে।'

'হুঁ।' প্রসুপ্ত গর্জন করল বরেন। নিচু চোখে খাতা দেখতে দেখতে বরেন বললে, 'কতগুলি এনট্রি তো সদ্য সদ্য করেছেন দেখছি। কালি এখনো কাঁচা আছে।'

টেবিলের পাশ থেকে দীপঙ্কর বললে, 'আপনার দেখবার আগে এনট্রিগুলো আপ-টু-ডেট পেলেই তো হল—'

'না। আপনাকে বলা আছে না যেদিন যা ট্র্যানজ্যাকশান সেদিনই তা পাকা খাতায় তোলা চাই?'

'তোলা না থাকলে কী হত? বলতেন, যাও, তুলে নিয়ে এসো। আপনার দেখার পর তোলার চেয়ে আপনার দেখার আগেই দিব্যি তুলে নিয়ে এসেছি।'

'হুঁ।' ঘুমন্ত হিংসায় আবার গর্জন করল বরেন। বললে, 'যার সঙ্গে গল্প করছিলাম বলছেন সে আপনার চেনা নাকি?'

হঠাৎ থমকাল দীপঙ্কর। সংক্ষেপে বললে, হ্যাঁ, চেনা।'

'কী করে চিনলেন?'

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দীপঙ্কর বাধ্য নাকি? তবু যতদূর পাশ কাটানো যায়, অথচ সত্যের ধার ঘেঁষেও থাকে, দীপঙ্কর বললে, 'ওঁর বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল।'

মূর্তিমান কালসাপ। বাঁকা চোখে একবার তাকাল বরেন। মানে, দরকার হলে, লাগাবে সুকান্তের কাছে। বলবে তোমার স্ত্রী আমাদের ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে আড্ডা মারেন এবং এমন একটা সাজ করে আসেন যাতে তুমি নেই, তুমি উৎখাত, তুমি উদ্বাস্তু। মানে, সরলকে গরল করে ছাড়বে। ফুটপাতের চারা-গাছটাকে গরু দিয়ে খাওয়াবে।

'কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার আবার কী জরুরি কাজ?'

কথাটা তখন অতি উৎসাহে জোরেই বুঝি বলে ফেলেছিল দীপঙ্কর। তাই বলে তুমি তাই শুনবে, মনে করে রাখবে? শুনে যদি মনে করেও রাখো, জবাবদিহি চাইবে? গা জ্বলতে লাগল দীপঙ্করের। বললে, 'সে আমার প্রাইভেট কাজ, তা জেনে আপনার কাজ কী?'

'হুম। কিন্তু এ কী? কী এটা?' প্রায় ফেটে পড়ল বরেন: 'ষোলো তারিখের খালাসী মালের হিসেবটা পাকা খাতায় তুলেছেন কই? আপনার খসড়ায় আছে, ব্যাঙ্কের অ্যাডভাইসে আছে কিন্তু আসল খাতায় ঢু-ঢু?'

নিচু হয়ে দেখতে দেখতে দীপঙ্কর বললে, 'ওটা মিস হয়ে গেছে।'

'সবাই আজকাল মিস হয়ে যাচ্ছে। কেউ মিসেস থাকছে না।' টেবিলের উপর একটা চড় মারল বরেন: 'কিন্তু এরকম মিস হয় কেন?'

'মানুষমাত্রেরই ভুল হয়।' হাত বাড়াল দীপঙ্কর: 'দিন, সেরে দিচ্ছি।'

'সেরে দেবেন, না কি মেরে দেবেন?' বরেন ঝাঁজিয়ে উঠল: 'আপনার কাজকর্ম আজকাল একটুও ভালো হচ্ছে না—'

'যাকে দিয়ে ইনস্পেকশান করান তাকে দিয়েই আবার খাতা লেখান—কী খাটনিটা একবার দেখুন। আর যা মাইনে—'

'মাইনে?' সিগারেটের শেষ প্রান্তটা চিপে পিষে শেষ করে দিল বরেন। বললে, 'মাইনে না পোষায় ছেড়ে দিন চাকরি।'

'চাকরি ছেড়ে দিলে চলবে কী করে?' খাতাপত্রগুলো গুছোতে লাগল দীপঙ্কর।

'খুব চলবে। আপনার প্রাইভেট কাজ করুন গে যান—' বরেন উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

'তুমি তোমার প্রাইভেট টিউশানি করো গে যাও।' কাকলি অনুকম্পার স্বরে বললে, 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর জানতে এসো না।'

রাত্রে টিউশানি সেরে ঘরে ফেরবার পর, ঘরে দেখা হবার পর সুকান্ত জিজ্ঞেস করেছিল, 'আজ কোথায়-কোথায় চেষ্টা করলে?' তারই উত্তরে ঐ বিষ ঢালল কাকলি।

'কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তাও জানতে পাব না?'

'না। পথ তোমার নয়, পথ আমার। তোমার শুধু প্রাপ্তি। শুধু টাকা।' ঘৃণায় কাকলির চিবুকটাকে ধারালো দেখাল: 'তোমাকে গুচ্ছের টাকা এনে দিলেই হল। তা যে কোনো চাকরি করে হোক, যে কোনো ব্যবসা—'

'হ্যাঁ, শুধু ইস্কুল মাস্টারিটা বাদ দিয়ে।'

'কেন, ইস্কুল মাস্টারিই বা বাদ দেব কেন? তেমন যদি পাই চলে যাব মফস্বল।'

'বা, তা হলে আমার লাভ কী?'

'খুব লাভ। মাস মাস পাঠাব তোমাকে টাকা।' আবার ঝাঁজিয়ে উঠল কাকলি: 'কিছু টাকা পেলেই তো তোমার ক্ষুদ্র মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে।'

'আমার অভিলাষ মোটেই অত ক্ষুদ্র নয়।'

'নয়?' হাতের কাছে কিছু একটা পেলে ছুঁড়ে মারে প্রায় এমনি ভঙ্গি করল কাকলি।

'না। আমার অভিলাষ, আমরা কায়ে আর আয়ে দুয়েতেই যুক্ত থাকব।'

'মুণ্ডু থাকব।' নিচে, মেঝেতে, বিছানা করছে,—কদিন থেকেই করছে, গম্ভীর হল কাকলি : 'অবশ্যি মাস্টারি আমি করব না, কলকাতায় হলেও না—'

'করবে না তো ?' যেন আরাম পেল, টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত।

'না, কারণ মাস্টারনী হলে তোমার সমান-সমানই থাকব, তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারব না।'

'তার মানে ?'

'মানেটা বোধ হয় মাস্টার ছাড়া আর সকলের কাছেই স্পষ্ট। তার মানে, মোল্লা তবু খানিকদূর ছুটেছিল, তোমার দৌড় তো ধারে-কাছে কোনো একটা প্রাইভেট কলেজে লেকচারশিপ পর্যন্ত। লেকচারারের মাস্টারনী বউ, দুয়েরই প্রায় এক স্টেটাস। আমি তোমার ঊর্ধ্বে থাকব। আমি বিলিতি ফার্মে অফিসর হব। পে আর গ্ল্যামারে তুমি তখন আমার নাগালও পাবে না। তুমি তখন তোমার ঠিক-ঠিক আসন নেবে। আসন নেবে আমার পায়ের নিচে। আর প্রার্থী-প্রার্থী ভক্ত-ভক্ত মুখ করে বলবে, রূপং দেহি, রুপেয়াং দেহি—'

'বিলিতি ফার্মে কোনো আশা পেয়েছ নাকি ?'

'এখনো চাকরি পাই নি কিনা, অপদস্থ আছি কিনা, তাই গায়ে কিচ্ছু বিঁধছে না। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন পাব তখন এই কাঁচকলাং দেহি—'

'বিলিতি গাছের হলে কাঁচকলাও দামী।' একটা মোটা বই খুলে পড়তে বসল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দামী। যদি ওখানে হয়, শুনেছি আলাদা কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।' মশারির দড়ি টাঙাতে টাঙাতে কাকলি বললে।

'সত্যি ?' আরামেও মানুষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তেমনি এক তৃপ্তির নিটোল শব্দ করল সুকান্ত। বললে, 'তা হলে তো আমার সেই আদিম ইচ্ছেটাই পূর্ণ হবে। সেই আমাদের আলাদা ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকা—'

'আমাদের থাকা মানে ? তুমি থাকবে কী! ও তো আমার একার ফ্ল্যাট।'

'তোমার একার ফ্ল্যাট ?'

'নিশ্চয়। যারা কুমারী মেয়ে, সিঙ্গল, আনম্যারেড, তাদের জন্যেই কোয়ার্টার্স।'

'হোক। তবু তুমি যদি অনুগ্রহ করো, একদিন অনুকূল লগ্ন বুঝে আমাকে খুলে দিলে দরজা!' বইয়ের দিকে মুখ রেখেই বললে সুকান্ত।

'নির্লজ্জ।'

'এ বিশেষণে আর আমার লজ্জা কী! বরং বিবাহিতা নারীর স্বামী হওয়াটাই তো সেকেলে। আমার কতদিনের সাধ কৌমারহর হব—'

'কৌমারহর হবে? অশ্লীলতার একটা সীমা থাকা উচিত।'

'বা, তুমি যদি কুমারী হও, আমার কৌমারহর হতে দোষ কী।'

'যেয়ো একদিন ওদিকে, ঝুড়ো খাও কিনা দেখো।'

'কিন্তু কুমারী মেয়ে চাকরি পাবার পর তো বিয়ে করতে পারে—'

'বিয়ে করলেই তো কোয়ার্টার্স হারাবে। একটা অকর্মণ্য স্বামীর চেয়ে একটা স্বাধীন ঘর ও সমর্থ চাকরি ঢের ঢের কামনীয়।'

'তেমনি তুমিও তো বিয়ে করতে পারো। আর, সত্যি করে বলতে, আমি তো ঠিক অকর্মণ্য নই। সুতরাং আমাকে বিয়ে করতে বাধা কী!'

'তোমাকে বিয়ে?' কপালে হাত ঠেকাল কাকলি: 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।'

মশারির চতুর্থ কোণটা লাগাতে গিয়ে সুকান্তের টেবিলের কাছে এসে পড়ল কাকলি। হঠাৎ সুকান্ত তার হাত ধরে ফেলল। বললে, 'তোমাকে কুমারী অবস্থায় কী সুন্দর যে লাগে—সত্যি—' দুই চোখ উচ্ছল করল সুকান্ত।

'লজ্জা করে না বলতে?' কাকলি সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, 'যার মনে অঙ্গস্পর্শের শুচিতার বোধ নেই, যে আফিস-বসের পাশ ঘেঁষে বসতে বলে মোটরে, কটা বাড়তি টাকার জন্যে, তার আবার সুন্দরের জ্ঞান? তা ছাড়া রাত্রে, বাড়িতে, আমি আর কুমারী কই? আমি এখন সধবা, সিন্দুর-কলঙ্কিতা—' মাথাটা ঝুঁকিয়ে দগদগে লাল ঘা-টা স্পষ্ট করে দেখাল কাকলি।

চোখ ফিরিয়ে নিল সুকান্ত।

মেঝেয় পাতা বিছানার মধ্যে গিয়ে কাকলি বললে, 'শুধু বিছানা আলাদা নয়, ঘর আলাদা করতে পারলে শান্তি হত। যদি বাটারওয়ার্থের চাকরিটা পাই—'

'আপনার সেই বাটারওয়ার্থের চাকরিটা হয়ে গিয়েছে।' কদিন পরে কাকলি দেখা করতে এলে তাকে বললে বরেন, 'এই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। শ্রীমতী কাকলি মিত্র, এম-এ। স্টার্টিঙে দু শো টাকা। আর যদি কাজে ইমপ্রেস করতে পারেন, সম্ভাবনা অফুরন্ত—'

এ কী ইন্দ্রজাল? দুই চোখ বিশাল করে তাকিয়ে রইল কাকলি! চিঠিটা হাতে করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'একটা ইনটারভিয়ুও লাগল না?'

'বা, ইনটারভিয়ু তো হয়েছে।'

'সে কী ? কোথায়, কার সঙ্গে ?'

'এই যে সেদিন হল এখানে, আমার সঙ্গে।' হাসতে লাগল বরেন। বললে, 'আমি স্যাটিসফাইড হয়েছি, তাই মেসোমশাইকে বলে এলাম। ব্যস, তাই যথেষ্ট। বললেন মেসোমশাই। সুতরাং যত শিগগির পারেন জয়েন করুন। হোয়াই নট টু-মরো ? এনকোয়ারিতে গিয়ে প্রথমে সেক্রেটারির খোঁজ নিন। সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করলেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। কী নিজে-নিজে পারবেন তো গিয়ে পৌঁছুতে, না সঙ্গে লোক দেব ? লোক দিতে হলে তো সেই এক—' একটু থামল বরেন, পরে স্বরে উল্লাস এনে বললে, 'নইলে বলেন তো কাল আমিই নিয়ে যেতে পারি আপনাকে।'

'না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' মমতাঘন চোখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল কাকলি : 'আমি নিজেই সব খুঁজে-পেতে বার করতে পারব।'

'হ্যাঁ, নিজের রুটি নিজেরই সেঁকে নেওয়া ভালো। লোক লাগা উচিত নয়। যে লোকের কথা ভাবছিলাম—আচ্ছা, আপনি দীপঙ্করকে চেনেন ?'

'চিনি।'

'আপনার সঙ্গে কী জরুরি কাজ আছে সেদিন বলছিল—'

'হ্যাঁ, কিন্তু কী যে কাজ তা বলে নি। বলতে পারে নি। আজ জেনে নেব।' উৎসুক হয়ে এদিক-ওদিক দেখল কাকলি : 'আছে আফিসে ?'

'আছে।' গলা নামাল বরেন : 'কিন্তু কী সে জরুরি কাজ, জানাবেন তো আমাকে ?'

'নিশ্চয়ই জানাব। আপনার মত পরোপকারী বন্ধুবৎসল আর কজন আছে ? এখন তবে উঠি। দীপঙ্করবাবুকে ধরি।' চিঠিটা ব্যাগে পুরে কাকলি উঠি-উঠি করল।

'একটু চা খাবেন না ?'

'পরে আরেকদিন খাব। আরো অনেকদিন খাব।' কাকলি উঠে পড়ল : 'আগে জরুরি কাজটা জেনে নিই।'

কাকলি আফিস থেকে বেরুতেই দীপঙ্কর তার শামিল হল। বললে, 'চলুন একটু হাঁটি। অন্তত ট্র্যামস্টপ পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিই।'

'চলুন।'

কিরকম নতুন-নতুন লাগছে! কিরকম দূর-দূর! একটু দূর-দূর থাকলেই বুঝি নতুন-নতুন। একটু বিচ্ছেদ-বিরহের স্বর লাগলেই বুঝি ভালোবাসায় ধার আসে। তাই বুঝি মেয়েদের বাপের বাড়িটা এত প্রশস্ত। বাপের বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে চক্ষের আড় হলেই বুঝি চোখে জমে আবার মমতা, নতুন মমতা। বাহুতে জাগে আবার পিপাসা, নতুন উত্তাপের পিপাসা। দূরে-দূরে চিঠি লেখালেখি হয়। তার ভাষা নতুন, বলবার বিষয় নতুন। চিঠি যদি শাদামাঠাও রাখে, তবে তার আবেগশূন্যতার মধ্যেই নতুন এক আবেগের আস্বাদ।

নতুন হও, নতুন থাকো। অভ্যাসে অব্যবহিত হয়েছ কি, তোমার মৃত্যু ঘটেছে। স্বাদের বাইরে সাধের বাইরে চলে যাওয়াও মৃত্যু।

কাকলির বাপের বাড়ি নেই। তাই সে ব্যবধান তৈরি করেছে তার মনে, তার বৈমুখ্যে। হয়তো বা স্থানেও। কেমন মেঝেতে বিছানা করে মশারি ফেলে শুয়েছে নতুন হয়ে। আশ্চর্য নতুন। দৈন্যে নতুন, দৃঢ়তায় নতুন।

শুধু স্থানে-মনেই নয়, রূপেও। চাকরি খুঁজতে গিয়ে নতুন এক চেহারা নিয়েছে, কুমারী সেজেছে। চলায়-বলায় এনেছে অনেক দ্রুততার দীপ্তি। আবার যখন চাকরি পাবে, তখন না-জানি ধরবে আবার কোন সাজ। সম্ভ্রমের কোন কেয়ূরকিরীট।

তবু তাই, নতুন হোক, নতুনতর হোক কাকলি। তার সম্ভাব্যতার শতশত পাপড়ি খুলতে থাকুক একে-একে।

সে নতুন থাকলেই তো তাকে অর্চনা করতে ইচ্ছে হয়। সন্ধান করতে সাধ যায়। ভালোবাসা খুঁজে পায় তার আদিম সার্থকতা।

কিন্তু সে নিজে? সে নিজে কি নতুন? সুকান্ত একবার তাকাল তার চার-পাশে। খোলা মোটা বইটা বন্ধ করল শব্দ করে।

কাকলি একবার বলে উঠেছিল, 'চোখের উপর আলো জ্বালা থাকলে কী করে ঘুম আসে মানুষের?'

এটাও কি নতুনের স্বর?

কোনোদিন বলে নি এরকম করে। কত রাত কাকলিকে আগে শুতে পাঠিয়ে

নিজে আলো জ্বেলে লেখাপড়া করেছে। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে কোনোদিন নালিশ করে নি। মধ্যরাত্রি পার করে দিয়ে পড়াশেষে যখন সুকান্ত শুতে গিয়েছে, দেখেছে তখনো কাকলি বিভোর! যে জেগে আছে, তাকে জাগানোর চেয়ে যে ঘুমিয়ে আছে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটি কী অপূর্ব!

'সকালে মুখে যদি একটা রাত-জাগা রাত-জাগা ভাব থাকে, তা হলে কিরকম হবে ইনটারভিয়ু।' পাশ ফিরল কাকলি।

সত্যিই কি তবে এটা নতুনের সুর, নতুনের ডাক? কাকলি কি তবে এই কথাই বলছে, বলতে চাইছে যে, এই সব দড়িদড়া, ন্যাতাকাতা ছিঁড়ে ফেলো, দূর করে দাও। মশারির ব্যূহ থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমাকে এই একাকিত্ব থেকে মৃত্তিতল থেকে উদ্ধার করো। তোমার বলবান দুই বাহুতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও তোমার খাটে। আমার ঔদ্ধত্যকে বিধ্বস্ত করো। ধূলিধূসর করে দাও।

আশ্চর্য, এতটুকুও জোর পেল না সুকান্ত। চোরের মত চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে যেতেও লজ্জা করল। মর্মঘাতী কী কঠিন কথা বলে না-জানি প্রত্যাখ্যান করবে! আর কোথাও ভিক্ষে পেলে না, শেষকালে একটা ঘুমন্ত দেহের দুয়ারে এসে হাত পাতো? গলায় দড়ি জোটে না তোমার? ছোটলোক চাষা কোথাকার! ঘৃণায় না-জানি কী বীভৎস নতুন হবে কাকলি! দাঁতগুলি না-জানি কী বন্য দেখাবে! আর জিভ তো নয়, খা-খা আগুনে পোড়া রক্তলোহার ছ্যাঁকা।

সুইচটা অফ করে দিল সুকান্ত।

অন্ধকারে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল চেয়ারে। খোলা জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই আসছিল হাওয়া, যেন টের পায়নি। এখন ঘর অন্ধকার করতেই হাওয়ার অনুভবটি মুখে-চোখে সর্বাঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

কেউ একটা বাড়ি করলে তার পাশেই যদি সুবিধেমত জমি পায়, তা হলে তাতে একটা পুকুর করে। সুকান্তও একটা পুকুর কাটতে চেয়েছিল। সে পুকুর কেটেছে সে নিজ হাতে। এখন হয়তো তাতে জল আসবে, স্বাদু জল, স্নিগ্ধ জল। আর সেই স্বখাত সলিলে ডুববে সুকান্ত।

তার আর উপায় কী! তাই বলে বাড়তি জমি পুকুর হবে না? অপচয়ে যাবে? না, না, পুকুর হোক। সুকান্ত ডুবুক বা মরুক, কিছু আসে যায় না। ও পূর্ণ হোক, স্নিগ্ধ হোক, ও খুঁজে পাক ওর সম্ভাবনার গভীরতা!

সুইচটা অন করল সুকান্ত। দেখল নিখুঁত, নিটুট শৃঙ্খলায় ঘুমুচ্ছে কাকলি।

শ্রীতে নয়, শক্তিতে। বিপদের দেশে একাকী লোক যেমন অস্ত্র নিয়ে ঘুমোয়, তেমনি ও ঘুমুচ্ছে কঠিনতর প্রত্যাখ্যান নিয়ে।

নিজের খাটের দিকে তাকাল। সে সরকারি বিছানা ভগলু তো কখনই করে দিয়ে গেছে। মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে গেছে পরিপাটি। নিচের এই ছোট বাড়তি মশারিটা কাকলি আজ নিজে কিনে এনেছে। কিন্তু লেপ-তোশক-বিছানার চাদর? শতরঞ্চির উপর আধ-ময়লা একটা শাড়ি বিছিয়ে তার তোশক-চাদর, আর কার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে আনা একটা আলোয়ানে তার লেপ। অনেক, অনেক জোর বেশি আজ কাকলির।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে নিজের বিছানায় ঢুকল সুকান্ত।

সেও নতুন হতে জানে।

সম্ভ্রমে নতুন, গাম্ভীর্যে নতুন, উপেক্ষায় নতুন।

'আপনার অনেক জোর।' এ কথাটা দীপঙ্করও বললে, কাকলিকে নিয়ে পথে এসে।

'জোর? কার উপর?' কাকলি হাসল।

'বরেনের উপর। আপনি বললেই আমার মাইনে ও নিশ্চয় কিছু বাড়িয়ে দেয়।'

'আমি বললে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। আমি সুকুকে বলেছিলাম বলতে—'

'বলেছিলেন? তা উনি—'

'আমার মনে হয় বলে নি। হয় ভুলে গিয়েছে, নয় চেপে গিয়েছে।'

'কিংবা এমনও হতে পারে, বলেছিলেন, কোনো ফল হয় নি।'

দীপঙ্কর ঢোঁক গিলল। বললে, 'যাই হোক, ওর দিকে আর যাচ্ছি না, এখন আসল ধরেছি। ওকে দিয়ে ফল না হোক, আপনাকে দিয়ে হবেই।'

'বা, সুকান্তই তো ওঁর বন্ধু। আমি কেউ নই।' ভীতু-ভীতু অসহায় মুখ করল কাকলি।

'না, বন্ধুর চেয়ে আপনি বেশি। আপনি তার বান্ধবী।'

'তেমন বান্ধবী তো আমি আপনারও।' মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে গেল কাকলির।

'তাই তো এক বান্ধবের দুঃখের কথা জানাবেন আরেক বান্ধবকে। আর অধস্তনের জন্যে উর্ধ্বতনের হাত থেকে আরাম ছিনিয়ে আনবেন—'

আর যেন ফিরে যাবার পথ নেই, কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে কাকলি। বললে, 'বেশ তো, আমার বলায় যদি হয়, নিশ্চয় বলব। কেন বলব না?'

'বলায় যদি হয়—ওরকম নয়। হতেই হবে। আর তারই জন্যে বলবেন।' চলতি ট্র্যামকে হাতের ইশারায় থামতে বললে দীপঙ্কর, 'আমি বললাম, তবু হবে না? হবেই হবে। এরকম দাবির ভাব দেখিয়ে বলবেন।'

'বেশ তো, তার আগে চলুন, বিষ্টু-আভাকে দেখে আসি।'

'বিষ্টু-আভাকে দেখতে হলে আশেপাশে আরো অনেক কিছুই দেখতে হবে। চলুন, ঘ্রাণ প্রাণ সার্থক করবেন চলুন।'

যেন বান্ধবীকে কোন প্রমোদোদ্যানে নিয়ে যাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে কাকলিকে পাশে নিয়ে ট্র্যামে উঠল দীপঙ্কর। যেন কোন রঙিন কার্নিভ্যালে।

নেমে খাবারের দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ কিনল কাকলি। খালি হাতে শিশুগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না—অন্তত আজ তো নয়ই। আজ তার মন মিষ্টি, চোখ মিষ্টি, হাতভরা মিষ্টি আশার পসরা।

বস্তি ও তার পরিবেশের যে চেহারাটা আগে একদিন দেখে গিয়েছিল, আজ যেন মনে হল, আরো কঠিন, আরো কদর্য। ফুটপাথের যে অংশটুকু বাড়ির শামিল করে নিয়েছিল, তার ঠিক সামনেই একস্তূপ আবর্জনা।

সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই চলে গিয়েছিল মনে আছে, আজ ভিতরে এসে বসল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো হৈ-চৈ করে উঠল, ঘিরে ধরল কাকলিকে। নড়বড়ে পায়ে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল বিষ্টু। শীর্ণ বুকে ছেঁড়া আঁচল মেলে ম্লান হাসি হেসে সামনে এল আভা।

সেদিন যেন চোখগুলিকে তবু জলজলে দেখেছিল, গায়ে মুখে তাজা আনাজের লাবণ্য। আজ মনে হল অনেক শুকিয়ে-শিটিয়ে গিয়েছে, গলার কাছে এসে কোনো রকমে ধুকধুক করছে প্রাণপিণ্ড। চোখের চাউনিগুলো শূন্য, অর্থহীন। যা ধরে ওরা জীবনসমুদ্রে ভাসছে, ওরাও যেন বুঝতে পেরেছে তা তুচ্ছ একখণ্ড খড় ছাড়া কিছু নয়।

'কী এনেছ আমাদের জন্যে? চিনেবাদাম?' ছেলেমেয়েগুলো আরো ঘন হয়ে এল।

'না, সন্দেশ। হাত পাতো।'

একসঙ্গে অনেকগুলি হাত লকলক করে উঠল। যত হাত তত সন্দেশ যদি হয়, কেউ কেউ দু হাত মেলে ধরল।

সবাইকে বিলোতে লাগল কাকলি। এক মুহূর্তের জন্যে ওদের চোখে-মুখে এল বুঝি-বা অভিনবের আলো। কিন্তু তা আর কতক্ষণ থাকবে? জলটুকু খেয়ে নিলেই

চলে যাবে এই মধুরের গন্ধ। তারপরেও যদি এককণা লেগে থাকে দাঁতের ফাঁকে, ক্ষণকালের জন্যে একটা স্মৃতি এসে দংশন করে যাবে। কাকলির মনে হল, এর চেয়ে ঐ ছোটটার জন্যে যদি একটা জামা এনে দিত তা হলে আস্ত একটা কাজ হত। আর, জামা কি শুধু ছোটটারই জন্যে? এখনো সন্ধে হয়নি, কিন্তু এখুনি কী ঠাণ্ডা এখানটায়! সবাই কেমন কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে রয়েছে। শোয় তো বুঝি মাটিতেই। উপরে-নিচে গায়ে না জানি কী দেয় রাত্তিরে। রাত্তিরের কথা ভেবে শিউরে উঠে কাজ নেই, এখন যদি ছেলে দুটোর গায়ে থাকত দুটো শার্ট আর মেয়ে দুটোর দুটো লম্বা ঝুলের ফ্রক। ছেলে দুটোর দুটো হাফ-প্যান্টই বা নয় কেন? আর আভার শাড়িটাই বা এমন কী অঢেল?

'এসো, তুমি নেবে না?' বিষ্টুকে লক্ষ্য করল কাকলি।

দিব্যি দেয়াল ধরে ধরে এগুতে লাগল বিষ্টু। লোভ তাকে সামনে ঠেলছে—লজ্জা চাইছে পিছিয়ে রাখতে। লোভই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে নিশ্চয়। লোভের বস্তু যদি আরো প্রবল হত, হঠাৎ মনে হল কাকলির, বিষ্টুকে আর দেয়াল ধরতে হত না। এক পায়েই হয়তো আসতে পারত লাফিয়ে। কিন্তু হায়, সামান্য একটা ক্রাচ পর্যন্ত তার নেই।

তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল কাকলি। দেয়াল ছেড়ে দিয়ে বিষ্টু কাকলির হাত ধরল। শুধু বিষ্টুর নয়, সমস্ত খোঁড়া সংসারের দাঁড়াবার লাঠিই যেন এই কাকলির হাত।

'সেই যে সেদিন বলে গিয়েছিলে, আমি বন্ধু, সেদিন থেকে আশাপথ চেয়ে বসে আছি।' দুর্গাবালা প্রথম থেকেই উচ্ছ্বসিত: 'চারদিক যতই নিষ্ঠুর হোক, অনাত্মীয় হোক, এখানে এখনো আছে একজন বন্ধু। তার দেরি হতে পারে কিন্তু তার ভুল হবে না। পথ চিনে একদিন যখন সে এসেছিল আবার আসবে। আলো করে আসবে।'

'আমার সাধ্য কী!' কাকলি মুখ নিচু করে বলেছিল প্রথমে।

'সাধ্যের কথা নয় মা, হৃদয়ের কথা। হাত অনেক কিছুই করতে পারে না হয়তো কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে বাধা কোথায়? সেই অনুভূতিটুকুও খুঁজে পাই না, সেও বোধ হয় পাথর হয়ে গিয়েছে।'

নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হল কাকলির।

'আজ বাইরে থেকে ফিরে যাওয়া চলবে না। আজ ভিতরে এসে বসতে হবে।' প্রায় হাতে ধরেই টেনে আনল দুর্গাবালা। পুরু করে একটা চট বিছিয়ে দিল মেঝের উপর। বললে, 'ভিতরের লোক কি বাইরে দাঁড়ায়?'

স্বচ্ছন্দে আলস্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল কাকলি।

সমস্ত দৃশ্যটি মুগ্ধ চোখে দেখছে দুর্গাবালা। এখনো আছে এখানে স্নেহ, অকারণ করুণা। কাকলির বাক্সে কি সন্দেশ না ইন্দ্রজাল?

'তুমিও এসো।' আভাকে ডাকল কাকলি। 'আর আপনি?' দীপঙ্করের দিকে চোখ তুলল।

'আমি খাব কী!' দীপঙ্কর সরে যেতে চাইল।

'না, নিন। মিষ্টিমুখ করুন।' কাকলি হাসল।

'সেই আপনার বিয়েতেই তো মিষ্টিমুখ করেছি। আবার নতুন কারণ ঘটুক, সুকান্তর পর সুতকান্ত আসুক, আবার মিষ্টিমুখ করব।'

হঠাৎ স্মৃতির একটা শেল দুর্গাবালাকে দ্রুত বিদ্ধ করল। নিঃস্বের কণ্ঠে হাহাকার করে উঠল: 'তোমার তবে এ কী চেহারা? হাত-গলা খালি, কপাল-মাথা শাদা—'

'কিছু হয় নি মা। ও একটা ছলনা।' খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'একটা নাটকে প্লে করতে গিয়ে এইরকম সাজতে হয়েছে।'

হেঁয়ালির মত লাগছে দুর্গাবালার। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'তোমার সেই—সেই বন্ধু ভালো আছে?'

'আমার স্বামীর কথা বলছেন? দিব্যি সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট আছে। কিন্তু স্বামী আবার বন্ধু কবে? ও তো শত্রু।'

'সে শত্রু আমার। ঐ দেখ—মরেও না তরেও না, পড়ে আছে চৌকাঠের ওপর।'

একটা হাড়-পাঁজর বার করা রিক্তগাত্র বুড়ো উঠোনের ধার ঘেঁষে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। ধুঁকছে। নখ নিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

'ওঁর অসুখ?'

'কিছুমাত্র না। আফিং পায় নি তাই ককাচ্ছে-কাতরাচ্ছে। দীপু কি মাছ-তরকারি কিনবে, না আফিং কিনবে? আর আফিং একবার পেটে পড়লেই সেই সুজ্জের ষাঁড়। ধার করতে ছুটবে। ধার যদি না জোটে তো অন্য কেলেঙ্কারি। বলে, আফিং দিয়েছিস, রাবড়ি দিবি না? তখন আবার জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে আনো। কত ছাড়াবে? দফায়-দফায় পাওনাদার। কেউ ধরে-বেঁধে জেলে নিয়ে যেতে পারে না? কিংবা ভাগাড়ে? কেউ দু-ঘা জখম পর্যন্ত করে না? বলে, কী দরকার! দীপুর মতন যখন ছেলে আছে তখন কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা সব উশুল হয়ে যাবে।'

শুনতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল কাকলির, শেষ কথাটায় গভীর উপশম পেল। সন্দেশ-সুদ্ধ হাত দীপঙ্করের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নিন, ঠকবেন না, মিষ্টিমুখের মত খবর আছে।'

হাত বাড়িয়ে দিল দীপঙ্কর। বললে, 'আছে? কী খবর?'

'আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

'আপনি?' বাড়ানো হাত গুটোনো যায় না, বরং এটাও যে একটা অকুন্ঠিত আনন্দের সংবাদ এটা সজোরে সাব্যস্ত করা উচিত। 'বলেন কী?' কাকলির সন্দেশ-সুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলল দীপঙ্কর: 'কী করে পেলেন? কে দিল?'

সন্দেশটা দীপঙ্করের হাতে চালান করে দিতে দিতে কাকলি বললে, 'মিথ্যে বলব কেন, বরেনবাবুই পাইয়ে দিলেন। ওঁর মেসোমশায়ের ফার্মে। বাটারওয়ার্থে।'

না, মিথ্যে ম্লান হবে কেন? কাকলিকে কেন হিংসে করবে? ওর সঙ্গে সংঘর্ষ কোথায়? বরং এ তো ভরসার কথা। কাকলি জানে আদায় করতে। যখন নিজের জন্যে পেরেছে বন্ধুর জন্যেও পারবে।

গোটা সন্দেশটা মুখে পুরে দীপঙ্কর বললে, 'আমি ঠিকই বলেছি। বরেনের উপর আপনার অখণ্ড প্রতাপ! আপনি যদি তেমন করে বলেন ওর সাধ্য নেই আপনাকে ফেরাতে পারে—'

'যদি তেমন করে বলি—' চোখের কোণে হাসল কাকলি।

'হ্যাঁ। আপনিই তো বলেছেন যে নাটকে যেমন পার্ট। যে রানী সাজতে পারে সে ঝিও সাজতে পারে। মানে যে নিজের জন্যে বলতে পারে সে চাকরের জন্যে—বলতে গেলে আমি তো বরেনের চাকরই—চাকরের জন্যেও বলতে পারে। নিজের চোখে দেখছেন তো আমার সংসার। আমি কেন সন্ন্যেসী হই না? কেন সব ফেলে-ছড়িয়ে চলে যাই না নিরুদ্দেশে? আমার কী দায়! আমি কেন হাতি ঠেলি?'

'না ঠেলে আপনার শান্তি নেই। আপনার স্বভাবই আপনাকে পালাতে দেবে না, সংগ্রাম করিয়ে ছাড়বে।'

'তেমনি যদি আরেকটি স্বভাব পাই যে সে সংগ্রামে আমাকে সাহায্য করতে উন্মুখ, অস্ত্র জোগাতে তৎপর—'

'বলেছি তো, বলব, অজস্র বলব। চেষ্টা করব প্রাণপণে।' কাকলি উঠে পড়ল। দুর্গাবালার হাতে সন্দেশের বাক্সটা—তখনো নিঃশেষ হয় নি—পৌঁছে দিল। বললে, 'এবার বাড়ি যাই।'

'হ্যাঁ, বাড়ি গিয়েই সাজ পালটাও।' বললে দুর্গাবালা, 'দেরি কোরো না।'

'শত্রুর শিবিরের শোভা বাড়িয়ে লাভ কী!' হাসল কাকলি : 'বাইরে এই তো ভালো আছি সংগ্রামীর পোশাকে। বাড়িতে ঢুকলেই তো মাথায় পরতে হবে দাসত্বের চিহ্ন, হাতে-গলায় বন্ধনের বেড়ি—'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। সাজলে-গুজলে ঠিক রাজেশ্বরীর মত দেখাবে। জানো তো লক্ষ্মীই রাজেশ্বরী।' কাকলির চিবুক ধরে আদর করল দুর্গাবালা।

কাকলি বললে, 'ঘোরো লক্ষ্মীর চেয়ে বুনো কালীই অনেক ভালো, মা।'

ছেলেমেয়ের দল আবার ঘিরে ধরল কাকলিকে : 'আবার এসো। আবার এসো কিন্তু। কবে আসবে?'

সবচেয়ে ছোটটা বললে, 'এর পর কী আনবে?'

বিন্টু বললে জলজলে চোখে, 'কিছু আনতে হবে না। তুমি অমনি এসো।'

বাইরে রাস্তায় এসে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, 'সাজগোজের এই ছলনাটা চাকরি জোগাড়ে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই—'

'নিশ্চয়ই।'

'এতে সুকুর সায় আছে?' প্রশ্নটা করেই দীপঙ্করের মনে হল অপ্রাসঙ্গিক শোনাচ্ছে।

স্বরে ঝাঁজ এনে কাকলি বললে, 'ওর সায় আছে কি না আছে কে তা জিজ্ঞেস করতে গেছে? বিশেষ সিদ্ধির জন্যে বিশেষ কৌশল বিধেয়। আর বিষয় যখন আমার তখন আঙ্গিকও আমার রচনা।'

'তবেই দেখছেন, আপনি ছলনাতেও নিপুণ।'

'তাই তো দেখছি।'

'সুতরাং ছল বল কৌশল যখন যেমন প্রয়োজন, আপনি বরেনের উপর অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারবেন। আর আমার আকাঙ্ক্ষা কী সামান্য তা তো জানেন। শুধু মাইনে বৃদ্ধি! তাও অকারণে নয়, কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই।'

'আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।' পরে একটু বুঝি বা সন্নিহিত হল, বললে কাকলি, 'আমার তূণে যত বাণ আছে ছুঁড়ব একে একে—আপনি বিশ্বাস করুন।'

বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল দীপঙ্কর।

সারা রাস্তা কাকলি ভাবতে-ভাবতে এল, কী দেখলাম নিজের চোখে! দারিদ্র্য কী মর্মন্তুদ কুৎসিত, আর এই যে আশ্বাস দিয়ে এলাম আমি এর প্রতিকারের চেষ্টা করব, কে জানে, এও বোধ হয় ছলনারই নামান্তর। আমার তূণে যত বাণ আছে—

কী বাণ আছে? বাণ থাকলেই কি ছোঁড়া যায়, না তা লক্ষ্যকে বিঁধতে পারে? তবু অত বড় পঙ্গুতা ও নিরুপায়তার সামনে কিছু একটা আশ্বাসের কথা না বলতে পারলেও নিশ্বাসকষ্ট হয়। আমি মেয়ে, আমি সংস্কারে সংকীর্ণ, স্বভাবে স্তিমিত, দুনিয়ার হালচাল আমি কী বুঝি, আমার দ্বারা কিছু হবে না—এ বলে সরে পড়লেই কি মর্যাদা পেত মনুষ্যত্ব? আমি মেয়ে বলে কি এতই অকিঞ্চিৎ? সংসারে আছে কী? শুধু দুটো জিনিসই তো আছে। প্রয়াস আর প্রসাদ। নিজের জন্যে প্রয়াস, পরের জন্যে প্রসাদ। পরকে একটু প্রসন্ন করতেও কি নিজে প্রয়াসী হব না?

সারাক্ষণ কি একটানা এই নৈষ্ফল্য আর নৈরাশ্যের কথাই ভাববে? যে লোকটা চৌকাঠের বাইরে উঠোনের ধারে পড়েছিল উপুড় হয়ে তার কথা ছাড়া আর কিছুই কি তার মনে পড়বে না? আর সেই বিষ্টুর দেয়াল ধরে এক পায়ে উঠে দাঁড়ানো? আর আভার সেই গায়ের উপর খাটো আঁচল? আর সেই মেয়েটার জিজ্ঞাসা: এর পর কী আনবে?

তার জীবনে কি কোথাও সুখ নেই, উপশম নেই, অন্ধকার স্লেটে অন্তত একটা শাদা পেনসিলের দাগ?

না, আছে। কাকলির চাকরি হয়েছে। কজনের ঘটে এমন সৌভাগ্য? শুধু স্বাধীনতা পাওয়া নয়, স্বাধীনতার পিছনে ক্ষমতাকেও পাওয়া।

কিন্তু ওদের কারু গায়ে একটাও গরম জামা দেখলাম না। গরম দূরের কথা, সম্পূর্ণ জামাও দেখলাম না। কী ভাবে শোয়, কী না জানি খায়। আর নিশ্বাসে কোন পারিজাতের সৌরভ না জানি আস্বাদ করে!

'এত দেরি হল?' মৃদুস্বরেই জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'হয়ে গেল।' মৃদুতর উত্তর কাকলির।

দীর্ঘ রজনী কাটল চুপচাপ।

পরদিন সকালে উঠে, সিঁড়ি দিয়ে নামছে মৃণালিনী, এগিয়ে এসে কাকলি তাকে প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না দিয়েই বললে, 'আমার চাকরি হয়েছে।'

'বলো কি? সত্যি? কত মাইনে?' সব প্রশ্নের বড় প্রশ্নটাই আগে এল মৃণালিনীর।

'শুরুতেই দু শো। এদিক সেদিক ফালতুও কিছু আছে হয়তো। তারপর বছরে বছরে বাড়বেও বলেছে।'

'ওরে তোরা শুনেছিস, বউমার চাকরি হয়েছে—' আহ্লাদে ফেটে পড়ল মৃণালিনী। চারদিকে আনন্দের হাট বসিয়ে দিল।

ঘরে ঘরে আশীর্বাদ কুড়োতে গেল কাকলি।

ভূপেন বললে, 'কোম্পানিটা ভালো আর পোস্টটাও সম্ভ্রান্ত। আশীর্বাদ না করে আর উপায় কী!'

'আর কাজকর্ম খুব বেশি হবে না বলেই মনে হয়।' বললে হেমেন, 'তুমি ম্যানেজারকে বলে আওয়ার্সটা এগারোটা-চারটে করতে পারো কিনা দেখো। দশটা-পাঁচটা হলে স্ট্রেইন খুব বেশি হবে, তারপর আফিস-টাইমের ট্র্যাম-বাস—'

প্রশান্ত বললে, 'যাই আওয়ার্স হোক, পেট ভরে টিফিন খেয়ো।'

ঘরে ফিরলে সুকান্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'চাকরি হয়েছে, তা আমাকে বলো নি কেন?'

'তোমাকে শেষে বলব।'

'শেষে মানে?'

'মাসের শেষে।'

'মাসের শেষে?'

'হঁ্যা, যখন মাইনে পাব। যখন হাতে টাকা আসবে।' কাকলি স্নানে যাবে বলে চুল খুলতে লাগল: 'তোমার তো চাকরির খোঁজ নয়, তোমার শুধু টাকার খোঁজ। কোত্থেকে টাকাটা আনলাম তা নয়, কত আনলাম তা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সুকান্ত। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু চাকরিটা পেল কে? কাকলি বসু, না কাকলি মিত্র?'

'কাকলি বসুর ঐ তো চেহারা!' সুকান্তর দিকে হাত বাড়াল কাকলি: 'চাকরি পেয়েছে কাকলি মিত্র। শ্রীমতী নয়—শ্রীমতী একটা ছলনা—স্পষ্ট কুমারী কাকলি মিত্র।'

তবু মৃণালিনীর মধ্যে যেন দুশ্চিন্তা ছিল। সদরে যদিও আম্রপল্লবে ঢাকা পূর্ণঘট রেখেছে এবং যদিও দোর পেরোবার আগে তা করজোড়ে প্রণাম করেছে কাকলি, তবুও কাঁটাটা যাচ্ছিল না কিছুতেই। এক পাশে সরে এসে প্রায় কানে-কানে বলার মত করে মৃণালিনী বললে, 'মুখের এক কথায় এমন সুন্দর চাকরিটা যেন ছেড়ে দিয়ে এসো না।'

'তেমনিধারা হবে না বোধ হয়। দায়িত্বজ্ঞান আছে এমন লোক আছে পিছনে। তবে, কে জানে, কিছুই বলা যায় না।' রাস্তায় নেমে গেল কাকলি।

দুপুরবেলা, আফিসে, বরেনের ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো।' বরেন রিসিভার তুলল।

'আমি। আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।'

'কী আশ্চর্য! অত কেন? গলার স্বরেই চিনতে পেরেছি।'

'জয়েন করেছি আজ।'

'করেছেন? ও-কে। কেমন লাগছে?'

'ভালো—দেখুন, শুনুন—'

'কোনো ডিফিকালটি হলেই ম্যানেজারকে বলবেন।'

'শুনুন, আপনাকে বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

'বেশ তো, বলুন না কী কথা!'

'আপনার কাছে গিয়ে বলব।'

'সে কথা তো আরো ভালো।'

'সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনি থাকবেন?'

'থাকব।'

'আমি তখন যাচ্ছি আপনার কাছে।' রিসিভারটা রেখে দিল কাকলি।

পিঠ-পিঠ কথাটা বলতে পেল না বরেন। না পেয়ে ভালোই করেছে। হয়তো কিছু উত্তাপ কিছু আগ্রহের স্বর আসত। সেটা ঠিক নয়। সমীচীনতা থেকে সে স্খলিত হবে না, নইলে দুপুরের নির্জনে অমন টেলিফোন পেয়ে কেউ অমনি কাঠ-কাঠ কথা কয়? দর্জি হয়ে কাঁচি চালিয়ে কথার মাপজোক করে?

ঠিক সময়ে হাজির হল কাকলি। ক্লান্ত অথচ অম্লান।

'কী, কোনো উৎপাত জোটে নি তো?' নিশ্চিন্ত আলস্যে সিগারেট ধরাল বরেন।

'না। সবাই বেশ ভদ্র, পরিচ্ছন্ন।' কাকলি বসল চেয়ারে।

'শুনুন, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়তো হবে, সেটা উপেক্ষা করবেন—'

'হ্যাঁ, গুঁড়ো-গুঁড়ো ঝুরো-ঝুরো বৃষ্টিতে কিছু অসুবিধে হয় না, মুষলধারে হলেই মুশকিল—'

হাসল বরেন, কিন্তু শব্দ হতে দিল না। নিঃশব্দে হো-হো করে হাসবার মত মুখ করলে। বললে, 'তখন আর ছাতাতে শানায় না।'

'তখন ছাতা কী, তখন তার প্রতিকারও মুষল।'

আবার একটা নিঃশব্দ উচ্চ হাসির মৌখিক ভঙ্গি করল বরেন।

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিবিষ্ট চোখে একটুখানি দেখল

কাকলিকে। পরে ভঙ্গিটাতে হঠাৎ প্রাখর্য এনে টেবিলের কাজকর্ম নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলে। আবার আলস্যে একটু শিথিল হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী একটা কথা ছিল বলছিলেন—'

'হ্যাঁ, আজ থাক।'

'থাক।' দিব্যি সায় দিল বরেন।

'আরেক দিন আসব।'

'যেদিন আপনার খুশি। আমি কান পেতে থাকব।'

'হ্যাঁ, ফোন করে আসব। আমার টেবিলের কাছেই ফোন।'

'আমি তো ফোনের জন্যেই কান পেতে থাকব।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

'আজ উঠি।' উঠে পড়ল কাকলি।

'আমিও।' বলে, এমনি একবার লোভ হল বরেনের। চলুন, আমার গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দিই বাড়িতে। যা এখন জগদ্দলন ভিড়।

বলল না, স্যাকরার সূক্ষ্ম নিক্তিতে মেপেই বলল না। শুধু বলতে হয়, মামুলি ভাবে বললে, 'বাড়ি ফিরবেন?'

'হ্যাঁ, নইলে আর জায়গা কোথায়?'

বরেন বাইরে একবার আফিস-ভাঙা কোলাহলের দিকে তাকাল। মনেমনে অনেক ছাঁটকাট করে সূক্ষ্ম করে বললে, 'বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে—'

যদি কাকলি নিজের থেকে বলে! গাড়ির প্রস্তাবটা যদি কাকলির হয়।

গাড়ির কথার ধার দিয়েও কাকলি গেল না। বললে, 'ঘুরতে-ঘুরতে দেরি করে বাড়ি ফেরার আনন্দের কথা শুনেইছি শুধু, অনুমানও করেছি আগে-আগে। এবার প্রত্যক্ষ করব।' মুক্তির পাখায় ঝলমল করতে-করতে আকাশের শূন্যে উড়ে গেল বিহঙ্গ।

উলটো পথের ট্র্যাম ধরল কাকলি।

দূরের মোড়ে নেমে একটা অন্ধকার মতন জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল, যেখানে তার বাড়ি, তার মা-বাবা ভাই-বোনের বাড়ি, তার আশৈশব স্নেহনীড়টা দেখা যায়। দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় আলো জ্বলছে। পত্রালি পড়ছে বোধ হয়। নাকি মা কিছু করছেন। নাকি অমনিই আলোটা জ্বালা। ঘরে কেউ নেই।

আর ঐ সেই কদম গাছ! অনেক পাতা ঝরে গিয়েছে বোধ হয়।

কত দিন পরে দূরে দাঁড়িয়ে একটু দেখছে। দেখতে ভালো লাগছে।

চাকরির খবরটা মা-বাবাকেই শুধু বলা হয় নি। যেন বলা যায়। যেন খবরটা নিয়ে জয়ীর মত দাঁড়ানো যায় তাঁদের কাছে।

না, দরকার নেই! ওঁরা কি কখনো চেয়েছিলেন মেয়ে চাকরি করুক? স্বাধীন পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়াক?

ধীরে-ধীরে ফিরে গেল কাকলি। আবার সোজা পথের বাস ধরল।

...৩০ ....

বাড়ি ফিরতে সর্বপ্রথমে সেণ্টুই উল্লাস করে উঠল: 'এই তো। এই তো কাম্মা।' বলে ছুটতে-ছুটতে এসে কাকলির দুই বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাকলির চিবুকটা ধরে ঘুরিয়ে মুখটা তার চোখের সামনে সম্পূর্ণ করে রেখে সেণ্টু বললে, 'তুমি আসতে দেরি করছিলে বলে সবাই ভাবছিল।'

'নানা জনে নানা কথা বলছিল।' পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঝণ্টু, বললে হাসতে হাসতে।

'কে কী বলছিল রে?'

'কেউ বলছিল রাস্তা পার হতে গাড়ি চাপা পড়েছে। কেউ বলছিল চলতি বাস থেকে নামতে গিয়ে চিৎপটাং। কেউ বলছিল, বাসে-ট্রামে উঠতে না পেরে হেঁটেই আসছে বুঝি।' যত বলছে ততই হাসছে ঝণ্টু: 'আবার কেউ বলছিল একটা ট্যাক্সি নিয়েছ আর ড্রাইভারটা তোমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে।'

সংসারে থেকে ঝণ্টু বেশ চালাক হয়ে উঠছে, তাই কে কোন কথাটা বলেছে নাম দিচ্ছে না। নাম না থাকলে উদ্ধৃতিটা যে নির্দোষ দেখাবে এটা সে বুঝে গিয়েছে।

কিন্তু সেণ্টু একতাল সারল্য। বললে, 'কাকাটা ভারি মন্দ। কী বলছিল জানো?'

'কী বলছিল?'

'বলছিল তোর কাম্মা আর ফিরে আসবে না। তোর কাম্মা অন্য দেশে চলে গিয়েছে।'

'যেমন বুদ্ধি তেমনি তো বলবে।'

'এই তো কাম্মা। এই তো।' সেণ্টু দুহাতে কাকলির গলা জড়িয়ে ধরল।

অনেকেই বাইরের বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল উদ্বেগের চোখ নিয়ে, স্বস্থ-

সমর্থ কাকলিকে ফিরতে দেখে জুড়িয়ে গেল মুহূর্তে। উত্তেজনাটা সমীচীন উৎসাহ পেল না। সব ডাল-ভাত হয়ে গেল।

সেন্টুকে কোল থেকে নামিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল কাকলি। বারান্দা থেকে সুকান্তও ফিরল। ব্র্যাকেটে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখে কাকলি বললে, 'আমার জন্যে এত সবার ভাববার কী হয়েছে?'

'তোমার জন্যে কে ভাবে?' সুকান্ত অন্য দিকে মুখ করে বললে।

'আমার জন্যে নয়?'

'না। সবাই ভাবছে সংসারের কথা, তার মান-সম্মানের কথা।'

'মানে?'

'একটা বউ চাকরি করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরছে না, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে, তখন থানায় গিয়ে ডায়রি করতে হয় তো। আর বউ-পালানোর ডায়রি করতে গেলে মানুষে কী ভাবে? সংসারের মানে টান পড়ে কিনা—'

'কেন, অনেস্ট অ্যাকসিডেন্টও তো হতে পারে।'

'পারে। তার মানেই হাজারগণ্ডা ঝামেলা। এ-হাসপাতাল থেকে ও হাসপাতাল খুঁজে খুঁজে বেড়াও। যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে বাড়িতে গিয়ে খবর দাও।' সুরে দার্শনিকতার টান আনল সুকান্ত: 'হতে তো অনেক কিছুই পারে।'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই পারে।' কাকলি বললে, 'এখন আর ফিরে যাওয়া নেই। সেই যে ফোড়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, ফোড়া, তুমি দেখতে কেন ছোট? ফোড়া বলেছিল, আমায় একটুখানি খোঁটো। সেই ফোড়া এখন খুঁটে দিয়েছ। বাড়বেই তো যন্ত্রণা—'

'বেচারা আফিস থেকে এসেছে ক্লান্ত হয়ে, এখুনি আবার কী কথা?' ছেলেকে একটু-বা তিরস্কার করতে চাইল মৃণালিনী: 'ও আগে একটু ঠাণ্ডা হোক, চা-টা খাক। পরে কাকলিকে লক্ষ্য করল: 'তুমি বাথরুম থেকে এসো, আমি তোমার জলখাবার নিয়ে আসছি।'

'এই যাচ্ছি মা।'

কাপড়চোপড় ছাড়বে, ইঙ্গিত পেয়ে সরে গেল সুকান্ত।

যে প্রশ্নটা মনের মধ্যে খচখচ করছিল সেটা উৎপাটন করল মৃণালিনী: 'এত দেরি হল কেন ফিরতে?'

'এমনি হবে মা দেরি। উপায় নেই। কতগুলি ট্র্যাম-বাস ছেড়ে দিয়ে তবে একটা পাওয়া যায়। তারপরে দেখা হয়ে যায় কত লোকের সঙ্গে। কলেজের বন্ধু—'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। বাইরে বেরুলেই আরেক জগৎ।'
মৃণালিনী।

'দেরি হলে ভাববেন না। স্বাধীনতা যখন নিয়েছি তখন দায়িত্বও নিয়েছি।'

'তা তো ঠিকই। তবু মায়ের প্রাণ—' মৃণালিনী নিচে নামল।

'কি, কী নিয়ে গেল রে দিদি?' রান্নাঘরের পাশ থেকে বিজয়া জিজ্ঞেস করল বন্দনাকে।

'এক গ্লাস গরম দুধ আর এক প্লেট জলখাবার। জলখাবারের মধ্যে লুচি আর তরকারি আর দুটো শাঁখ সন্দেশ।'

'কার জন্যে?'

'আহা, এও বুঝতে পারছেন না? ছোট বউয়ের জন্যে। চাকরি করছে বউ, মাস-মাস টাকা এনে দেবে, খাওয়াবে না?'

'ঠাকুরানী চাকুরানীকে খাওয়াচ্ছেন! এ চাকরি টিঁকলে হয়!' বিদ্রূপে জলে উঠল বিজয়া: 'আর এই যে বড় বউটা অসুখের থেকে উঠে এসে আবার লাগল সংসারে, তাকে কোনোদিন গ্লাসভর্তি দুধ খাইয়েছে, সন্দেশ খাইয়েছে?'

'একটা প্যাঁড়া-গজাও খাওয়ায় নি।' বন্দনা ফোঁস করে উঠল।

'এই একচোখোমি সইবে না।' বিজয়া গনগন করতে লাগল।

কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী? দেশে ঠাকুরের খুড়ো মারা গেছে, এক মাসের ছুটি নিয়েছে ঠাকুর। অল্প সময়ের জন্যে বলে বদলি জোগাড় করতে পারে নি। সুতরাং, তুমি বন্দনা, বাড়ির বড় বউ, তুমি হেঁশেলে গিয়ে ঢোকো। অফিসের ভাত দাও। সে ভাত ছোট বউও খেয়ে যাবে।

'তুমি রোগা মানুষ, তুমি কেন রাঁধতে এসেছ?' উনুনের পাশ থেকে বন্দনাকে সরিয়ে দিল বিজয়া। বললে, 'এক বউ উনুনে পুড়বে আর এক বউ দিব্যি খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে এ কে কবে শুনেছে?'

'এটা কেমনধারা কথা হল?' মৃণালিনী তর্জন করে উঠল: 'তা হলে বলতে চাও অমন চাকরিটা ছোট বউ ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দিয়ে তোমাদের খাওয়াবার জন্যে হেঁশেলে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবে?'

'ওরে বাবা, তা কি বলতে পারি?'

'তা যখন পারো না তখন ঠিক সময়ে ওকে দিতেই হবে আফিসের ভাত। নাও, সরো, তোমাদের কাউকে রাঁধতে হবে না। আমিই রাঁধব।' মৃণালিনী বিজয়ার

হাত থেকে হাতাখুন্তি কেড়ে নিল সজোরে : 'কী হিংসের কথা ! একটা গুণী মেয়ে নিজের জোরে দামী হয়ে উঠেছে তাই জ্বলে যাচ্ছে সকলে ! ছি ছি !'

'দামী বলে দামী !' ফোড়ন দিল বিজয়া : 'মাস-মাস দু শো টাকা।'

'বছরে চব্বিশ শো।' লেজুড় জুড়ল বন্দনা : 'তারপর বছর বাদে যখন আবার দশ টাকা বাড়বে, তখন বারো ইনটু দু শো দশ—সে আরো বেশি। তারপর পরের বছর—'

'অঙ্ক করতে হলে নিজের ঘরে গিয়ে করো গে।' মৃণালিনী মুখিয়ে উঠল : 'এতই যখন অঙ্কের তুমি বিদুষী তখন মেয়েটাকে তো একটু শেখাতে পারো। ঝণ্টুটা তো অঙ্কে ফেল করেছে শুনলাম।'

'ওমা, ঝণ্টু আবার ফেল করল কবে !' প্রায় শোকের কান্না তুলল বন্দনা।

'তবে সেই যে জয়ন্তী বললে।'

'ওমা, সে তো নেচার স্টাডিতে কম পেয়েছে।'

'বেশ তো, সেই নচ্ছার স্টাডিটাই পড়াও না গিয়ে মেয়েকে। কোথায় নিজেরা বড় হবে তা নয়, যে বড় হয়েছে তাকে নামিয়ে আনার চেষ্টা। যত সব হিংসের পুঁটলি।' তারপর সময় হলে মধু ঢেলে ডাকল কাকলিকে : 'ছোট বউমা, খাবে এসো। তোমার ভাত বেড়েছি—'

দিব্যি আগ বাড়িয়েই খেল কাকলি। নানারকম অভিযোগ অনুযোগ যে উঠেছে এখানে-ওখানে সে তা গায়েই মাখছে না। মহৎ কাজ করতে গেলেই সমালোচনা জোটে। আর যারা ক্ষুদ্র তারা নিন্দে ছাড়া আর কী করবে ?

আঁচাচ্ছে, ভূপেন জিজ্ঞেস করল, 'পেট ভরল তো মা ?'

'আফিস-টাইমের খাওয়ায় আবার পেট ভরে !' হেমেন বললে, 'একটা কাঁটা চুষবার বা ডাঁটা চিবুবার সময় নেই। তা ক্যান্টিনে খেয়ে নিয়ো হেভি টিফিন—'

'তোমাদের আফিসের স্যালারি-পেমেণ্ট কি উইকলি না ফোর্টনাইটলি ?' এ জিজ্ঞাসা প্রশান্তর।

সবাই একেবারে পঙ্ক্তিতে টেনে নিয়েছে। নীরবে দূরে দাঁড়িয়ে অনুকম্পা করতে পাচ্ছে না, প্রত্যক্ষে দিতে হচ্ছে বা মর্যাদার ছাপ ! দলের স্বাক্ষর।

'শ্বশুর-ভাসুরের আগেই চললেন !' বললে বন্দনা।

'শাশুড়ি পান সেজে হাতে গুঁজে দিচ্ছে।' বিজয়া ঠোঁট টিপে বললে।

শুধু তাই নয়, সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিল মৃণালিনী। বললে, 'সাবধানে যেও।'

'আর যদি দেরি হয়, মিছে ভাববেন না—' হাওয়াতে আঁচল দুলিয়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

সেদিনও কাকলির দেরি হল ফিরতে।

'আজও দেরি হল?' সুকান্ত জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটাই যেন কেমন! দোষ-ধরা! কৈফিয়ত-চাওয়া! আজও কষ্ট হল ফিরতে—এমনি করে বলা যেত না? বাস-এর জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে—শুধু এটুকু সহানুভূতি?

কাঁধ থেকে ব্যাগের স্ট্র্যাপটা মুক্ত করতে করতে কাকলি বললে, 'রোজ দেরি হবে।'

'প্রত্যহ?'

'প্রত্যহ। আমি তো হনুমান নই যে ঝুলতে-ঝুলতে আসব? যতক্ষণ না সিট পাব বুঝি, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।'

'ঢের মেয়ে তোমার আগে আসে।'

'আমি অমনি ভিড়ের মধ্যে হাত তুলে রড ধরে আসতে পারব না কখনো।'

'তোমার জন্যে একেবারে ফাঁকা চাই, হাওয়া-চলাচলের রাস্তা চাই।'

'হ্যাঁ, চাই। আর চাই এখন এ ঘর ছেড়ে চলে যাও। আমি খাটে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করি।'

'আমার খাটে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'তুমি এ ঘর থেকে সরে গেলেই এ খাট আর তোমার খাট থাকবে না, যার-তার খাট হয়ে যাবে।' বেশে-বাসে হালকা হতে চাইল কাকলি। বললে, 'এখন মেঝেতে কিছু পাতবার আগ্রহ হচ্ছে না—'

'তা আমি যাচ্ছি।' সুকান্ত ঘুরে দাঁড়াল: 'কিন্তু এখন কি তোমার শোবার সময়?'

'শোবার সময় নয় মানে? আমি এখন হাত-পা টান করে বিশ্রাম করব না?'

'কিন্তু, তুমি জানো, বাড়িতে ঠাকুর নেই।'

'ঠাকুর নেই তো আমি কী করব?' ঝিলকিয়ে উঠল কাকলি: 'আমি রান্না করতে ঢুকব?'

'রান্না ঠিক না করলেও বউদিকে তো একটু সাহায্য করতে পারো।'

'আমি হাক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে এখন আবার সাহায্য করতে লাগব? লজ্জা করে না বলতে? কেন, তোমার নিজের হস্ত-পদ নেই? তুমি যাও না, লাগো না সাহায্যে।' সুকান্তকে উপেক্ষা করেই খাটের দিকে এগুল কাকলি। বললে, 'খুব মজা! তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধও করবে আবার দাড়িও কামাবে।'

'জানি, সেজন্যেই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরো নি।'

'সেজন্যে মানে !'

'যাতে রান্না করতে না হয়—'

'খুব বুঝেছ ! আর, বেশ, যদি সেই কারণই হয়ে থাকে তো দোষের কী ! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া দিয়ে তুমি গাড়ি টানাবে ? বুদ্ধি খুব খুলছে মগজে। আরো অনেক কারণই খুঁজে পাবে ক্রমশ।' খাটের উপরই এলিয়ে পড়ল কাকলি। বললে, 'তখনই বলেছিলাম বেশি ঘাঁটিও না, খেপিয়ো না আমাকে। সুখে-শান্তিতে থাকতে দাও।' চোখ বুজল কাকলি।

কিন্তু শান্তি কি আছে ? শাশুড়ি আবার দুধ আর খাবার নিয়ে আসছে।

'আজ কী নিয়ে গেল গো ?' নিচে রান্নাঘরে বিজয়া জিজ্ঞেস করল বন্দনাকে।

'আজ পরোটা আর ডিমের ডালনা।'

'তারপর রাত্রে আরেকবার হবে।'

'যে যাই কেননা রাঁধো, ডিস্ট্রিবিউশন কর্ত্রীর হাতে।' বন্দনা বললে, 'মাছের বাটি ঠিক সাজাতে আসবে আর ল্যাজাটা ঠিক ছোট বউয়ের বাটিতে। আগে ছেলেকে খাওয়াত এখন বউকে খাওয়াচ্ছে।'

'ল্যাজা তো দেখছি দুখানা।' বিজয়া বললে।

'দ্বিতীয়খানা নিজে খাবে।'

দু-জনে হাসতে লাগল একত্র হয়ে।

মৃণালিনীকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'ও এখন থাক, মা। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে গা ধুয়ে একেবারে নিচে গিয়ে খাব।'

'তাই খাবে। কিন্তু বলি শরীর খারাপ হয় নি তো ?'

'না।' মৃদু হাসল কাকলি।

'মাথা ধরে নি তো ?'

'না।'

'গা-হাত-পা ব্যথা হয় নি তো ?

নাঃ, খাটে আর শোয়া গেল না। নেমে পড়ল কাকলি। বেশবাস বদলাতে উদ্যোগী হল। দুধ আর খাবারের প্লেট নিয়ে নিচে গেল মৃণালিনী।

'চাকর দিয়ে পাঠালে চলবে না, নিজে নিয়ে যাবে।' বললে বিজয়া।

'নিয়েও আসছে নিজে।' বন্দনা বললে, 'এখুনি বসে থাকবে, যতক্ষণ না স্নান করে আসে। কাছে বসিয়ে খাওয়াবে।'

সারাক্ষণই একটা কথা কানের কাছে বাজতে লাগল কাকলির। সাহায্য। কথাটা

যেন মন থেকে সরে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল জীবন্ত হয়ে। কেন, বন্দনার অসুখের সময় ও সাহায্য করে নি? এখনও করছে না? ওর আয়ে সাহায্য হবে না সংসারের? তোমার—পরমগুরুর?

আমাকে সাহায্য করে কে?

চট করে মনে পড়ে গেল বরেনের কথা।

মানুষের জীবনে দুটো জিনিসই তো আছে নিজের বিপদে সাহস আর পরের বিপদে সাহায্য।

দুপুরবেলায়ই ফোন তুলে নিল কাকলি।

'আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।'

'আবার পদবী কেন?'

'বা, পদবীর জন্যেই তো সব।' কাকলি হাসি মিশিয়ে বললে, 'সভ্যসমাজে সম্মানের দুই পা। এক পা পদক আরেক পা পদবী।'

'কথা আপনি ভারি সুন্দর বলেন।'

'শুধু কথা বলে লাভ কী? চিঁড়েও ভেজে না। আসল হচ্ছে কাজ। আর আপনি কাজ করেন সুন্দর।'

'কেন, কিছু করতে হবে?' মর্ম পর্যন্ত কর্ণ করে তুলল বরেন।

কাকলি আর কথা বাড়াল না। বললে, 'এখন আপনি ফ্রি আছেন?'

'আমি সব সময়েই ফ্রি।'

'এখন একবার আপনার ওখানে যেতে পারি?'

'আসবেন? আসুন—'

'সেই আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—'

'হ্যাঁ, সেই কথা, নতুন কথা, যে কোনো কথা হোক—চলে আসুন।' নিজেরও অজানতে উৎসাহ বোধ হয় একটু বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ল। গলায় ফের গন্ধ এনে বরেন বললে, 'গাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'না।'

'কী করে আসবেন তবে?'

'হেঁটে। কতটুকুন বা রাস্তা। আর, কত হাঁটছি আজকাল।'

হেঁটে আসা মানেই দেরি হয়ে যাওয়া। যখন মন একবার বলেছে যাই, তখন যত দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায়। হেঁটে আসা মানেই আরেকজনকে খাটিয়ে মারা। বসিয়ে বসিয়ে খাটিয়ে মারা। অকারণে দারোয়ান-চাপরাসিরও পায়ের শব্দে চমকিয়ে তোলা।

হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে বলে দুপুরের রোদেই বেরিয়ে পড়ল কাকলি। দুপুরটাই ভালো। বিজিনেস-টক যখন, তখন আফিস-টাইমটাই প্রশস্ত। আফিস-টাইমের বাইরে হলে কেমন গল্প-গল্প গন্ধ এসে পড়ে। পিঠতোলা খাড়া চেয়ার না এসে কেমন ইজি-চেয়ার এসে যায়। কিছুতেই যেন কথায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য আনা যায় না।

সদ্য বার হওয়া নতুন একখানা উপন্যাসের মত এসে দাঁড়াল কাকলি।

বরেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বললে, 'বসুন।'

বসলে নিজেও বসল। কী কথা বলে শোনবার জন্যে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাকলি একটু অস্বস্তি বোধ করছে বুঝি, কিন্তু এ অবস্থায় অন্য দিকে মুখ করে থাকারও তো কোনো মানে হয় না। অন্য দিকে মুখ করে থাকলে ভেবে নিতে পারে তাকে অগ্রাহ্য করছি। তার কথার কোনো মূল্য দেব না বলে আগে থেকেই আমি প্রস্তুত।

দ্বিধা কিসের, বলেই ফেলো না ঢোঁক গিলে। জানি তো কী বলবে। নিজের চাকরি জোগাড় হয়েছে, এখন স্বামীর জন্যে একটি জোগাড় হয় কিনা তারই ফিকির খুঁজছ। আছ বেশ। তোমার চাকরি হল, তোমার স্বামীর চাকরি হল, তোমরা দুটিতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করলে—তার মধ্যে আমি কোথায়? আমার চাকরি কোথায়? আমার মাইনে কী!

'যদি অপরাধ না নেন তো বলি—' কাকলির গলার কাছটা কাঠ-কাঠ লাগল।

'না, না, মেয়েদের আবার অপরাধ কী! পাগল, মাতাল, শিশু আর মেয়ে—পেনাল কোডে এদের কোনো অপরাধ নেই।'

'সে কী কথা?' কাকলি হকচকিয়ে উঠল: 'কত মেয়ে কত অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটছে—'

'খাটুক। কিন্তু যেটা শ্রেষ্ঠতম অপরাধ, অ্যাডালটারি, সেটাতে মেয়েরা নির্দোষ, নির্মুক্ত—আইনের বাইরে।' হেসে উঠল বরেন, সূক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করল, কাকলির মুখটা অনুরূপ উজ্জ্বল হল না। তাই তাকে সাহস দেবার জন্যে বললে, 'কথাটার জন্যে আপনিও যেন আমার অপরাধ নেবেন না। কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, সুকু কি আর রিসার্চ করবে না? চাকরি করবে বলছে?'

'না, না, আমি ওর কথা বলতে আসি নি।' কাকলি উজ্জ্বল হল।

'তবে কার কথা বলতে এসেছেন?' আশ্বস্ত হয়েও হতে পারছে না বরেন।

'আপনার এখানে কাজ করে—ঐ যে দীপঙ্কর—দীপঙ্করবাবু—তার কথা বলতে এসেছি।'

মুহূর্তে বরেন পাথর হয়ে গেল। একটা পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে, 'কেন, তার কী হয়েছে?'

এতক্ষণ যখন লঘু ছিল, ভালো ছিল। কিন্তু এখন তার এ কী চেহারা!

তবু, হতাশ হবার এখুনি হয়েছে কী! শেষ পর্যন্ত দেখি।

'তার ঘোর দারিদ্র্য। দেখে এসেছি নিজের চোখে।' কাকলি বললে ঠাণ্ডা হয়ে।

'দেখে এসেছেন? দীপঙ্কর নিয়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'হ্যা—'নিজেই গিয়েছিল উদ্যোগ করে, বলতে বাধল যেন কাকলির।

'কী দেখলেন?'

'দেখলাম নোংরা বস্তির মধ্যে রয়েছে। মানুষের বসবাসের উপযুক্ত নয় এমন এক আবর্জনার কুণ্ডে। বাপ-মা, ভাই-বোন তো আছেই, তার উপরে ছেলেমেয়ে সমেত এক দিদি। বাপ অথর্ব আর দিদিটি বিধবা—'

'তাতে আপনারই বা কী, আমারই বা কী!' বরেন পেপারওয়েটটা ধরল মুঠো করে।

গম্ভীর থাকবার কোনো মানে হয় না তাই হাসল কাকলি। বললে, 'আমার কষ্ট, আপনার দয়া।'

'কষ্ট করা সোজা, দয়া করা কঠিন।'

'শীতে ছেলেপিলেগুলোর গায়ে জামা নেই, শোবার বিছানা নেই—'

'তা আমাকে কী করতে হবে?' প্রশ্নটা সুবিধেমত হল না, বলেই বুঝতে পারল বরেন। মোলায়েম করল: 'তা আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আমি বলছি না, ও বলছে।'

'হ্যা, তাই তো দেখছি—ও বলছে। কিন্তু কথাটা কী?'

'কথাটা—চোখ নিচু করল কাকলি: 'যদি ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেন। বাড়তি কাজ করছে নাকি, তারই জন্যে বাড়তি মাইনে।'

'কত বাড়িয়ে দিতে হবে তা বলে দেয় নি?'

'না।'

'কিন্তু জিজ্ঞেস করি, দীপঙ্কর আপনার কে?'

ভয়ে ভয়ে চোখ তুলল কাকলি। 'কেউ না।'

'আর আমি?'

প্রশ্নের অস্বস্তিটা হাসি দিয়ে ধুয়ে দিতে চাইল কাকলি। বললে, 'কেউ না।'

'তা হলে না-তে না-তে কাটাকাটি হয়ে গেল।' পেপারওয়েটটা ছেড়ে দিল :রেন।

'না, না, কাটাকুটি নয়। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, ও-ও আমার স্বামীর বন্ধু।'

'তা হলে বলতে চান সমান-সমান? আমি আর ও সমান আপনার কাছে?' ।ভিমানীর মত মুখ করল বরেন।

হাপিয়ে উঠল কাকলি।

'যদি সমান-সমানই হয় তা হলেও প্লাস-মাইনাস হয়ে শূন্যই হয়ে গেল।'

'না, আপনি বেশি আমার কাছে।' গলা এতটুকু কাঁপল না কাকলির।

'আর ও যখন তদবির-করতে আপনাকেই পাঠিয়েছে তখন ও-ও নিশ্চয় ভেবেছে, ামারও কাছে আপনিই বেশি। শুনুন ওর এ ভাবনাটা অন্যায়। এ ইঙ্গিতটা শুচি।'

মাটির ঢিপি হয়ে রইল কাকলি।

'নইলে সুকু, যে কমন্ ফ্রেণ্ড, তাকে না পাঠিয়ে আপনাকে পাঠায় কেন? তা লে কি বুঝব যে আপনি সত্যি করে ওরই লোক?' পেপারওয়েটটা হাতের মুঠোয় নয়ে ছেড়ে-ছেড়ে দিয়ে ধরতে লাগল বারে-বারে: 'মানে, আমার মার্কেট থেকে কিছু কা বেরিয়ে ওর পকেটে গিয়ে ঢুকলেই আপনি খুশি?'

'না, আপনি দাতা আর ও প্রার্থী।' অনেকক্ষণ পরে কথা খুঁজে পেল কাকলি।

'আমি লুণ্ঠিত আর ও দস্যু।'

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল কাকলি। সনমস্কার বললে, 'আচ্ছা যাই, অনেকক্ষণ রেক্ত করলাম আপনাকে—'

'শুনুন একটা কথা বলি।' মামুলি সরকারি কথার ধার দিয়েও গেল না বরেন। ললে, 'আঁকড়ে থাকুন। পরের জন্যে জায়গা ছেড়ে উঠতে গিয়েছেন কী, জায়গা সকে গিয়েছে। পরকে সাহায্য করা অনেক সময় বিপদকে সাহায্য করা—'

'আচ্ছা আসি।' সুইং-ডোরের কাছে এসে আরেকবার ফিরে তাকাল কাকলি।

'যদি আপনার নিজের জন্যে হয়, সুকুর জন্যে হয়, আসবেন। কে না কে এক লাকার—'

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

কলিং বেল টিপল বরেন। হ্যাঁ, দীপঙ্করকে ডাকো।

দীপঙ্কর নেই আফিসে।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল, কাকলি এখনো বাড়িতে নেই।

ফিরতে-ফিরতে নটা। সেন্টু? সেন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। তা হলে আর ভাবনা কী। এখন যে যাই বলুক, যে যাই জবাবদিহি চাক, কোথাও কাকলি ঠেকবে না, ভয় পাবে না।

'এত দেরি হল?' সুকান্ত কিনা অভিভাবকদের সর্দার, তাই সেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলে।

'সিনেমায় গিয়েছিলাম।' চটপট বললে কাকলি।

'একা-একা?'

'একা-একা কেউ যায়? কোনোদিন গিয়েছি?'

'তবে? সঙ্গে কে ছিল?'

'তাও শুনবে? আমার আফিস-পাড়ার কজন বন্ধু।'

'বন্ধু?'

'হ্যা, মিত্র।'

'কোন লিঙ্গ?'

'ক্লীব লিঙ্গ।'

'মানে?' সুকান্ত প্রায় গর্জে উঠল।

'মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।'

নিশ্বাস ফেলে সুকান্ত বললে, 'বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে তো পারতে।'

'কী করে পাঠাব? বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

ছেলের বউয়ের খবর নিতে আসছে মৃণালিনী—এখন আর জলখাবারে না গিয়ে একেবারে ভাতে যাক—শুনতে পেয়েছে কথাটা। উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আস্তে-আস্তে এবার টেলিফোন বসবে—কী সুন্দর টেলিফোনের বাজনা! বেজে চলেছে তো বেজেই চলছে।'

'বাড়ি হয়েও তো যেতে পারতে।'

'কোন দুঃখে? তুমিও মাঝখানে না এসে এমনি একেবারে সিনেমা দেখে ফেরো নি?'

'আমি তো কতদিন রাত বারোটার সময়ও ফিরেছি।'

'দরকার হলে আমিও ফিরব।'

'যদি আমি একদিন রাত্রে একেবারেই না ফিরি?'

'বেশি কথা কী, দরকার হলে আমিও সারা রাত বাইরে কাটাব।'

'তা কাটাও না, আজ থেকেই শুরু করো না কাটাতে। নটা তো কখনই বেজেছে

রাত পোয়াবার তা হলে আর বাকি কী। তবে আর ফিরলে কেন? একেবারে ভোর করে এলেই পারতে।'

'ভোর হলেই বা ফিরব কেন? বাইরেতেই বিভোর হয়ে থাকব।'

'তাই থাকো। ঘর খোঁজো।' ঘর ছেড়ে চলে গেল সুকান্ত।

সেদিন আফিস-ফেরত কাকলি চলে এল বিনতাদের হস্টেলে।

'বিনতা আছিস?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই হাঁকল কাকলি।

'কে, কাকলি? আয় আয় আয়—' ঢেউয়ের মত কাকলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনতা। সমস্ত গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে আলিঙ্গন করল। বললে, 'তোকে ধরলে তোকে ছুঁলেও ব্রহ্মস্বাদের অনুভূতি হয়।'

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'ব্রহ্ম এখন নিরাকার হয়ে গিয়েছে।'

'ফাজলামো করিস নে।' ভুরু বাঁকাল বিনতা।

'সত্যি। সত্যি আমি ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি। তোর এখানে পাওয়া যাবে ঘর?'

'কদিন বাদে আমার পাশের ঘরটাই খালি হবে। তখন তোকে ওটা পাইয়ে দেব। তারপর একদিন তোর গতির্ভর্তাপ্রভুসাক্ষীকে নিয়ে আসবি ধরে। দরকার হলে মেয়ে সাজিয়ে। আর আমি আমার বন্ধ-ঘরের দরজায় একটা ছেঁদা করে রাখব। সেই গর্ত দিয়ে উপোসী চোখে দেখব তোদের খাসলীলা। খবরদার, আলো নেবাতে পারবি নে।'

'যদি ধরা পড়ি?'

'হাত জোড় করে বলবি, আর করব না, স্যার। ফার্স্ট অফেন্স, স্যার। টেকনিক্যাল অফেন্স, স্যার। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবে।'

দুই বন্ধুনী হাসতে লাগল।

৩১

দীপঙ্করকে অফিস-ঘরেই ডেকে পাঠাল বরেন।

কোনো ভূমিকা না করেই মুখের উপর ছুঁড়ে মারল প্রশ্ন: 'আপনি এটা কী ভেবেছেন?'

কাঠের পুতুলের মত তাকিয়ে রইল দীপঙ্কর।

'আপনি মিসেস বোসকে দিয়ে ক্যানভাসিং করাচ্ছেন?'

'কে মিসেস বোস ?' যেন সাত হাত জলের তলা থেকে দীপঙ্কর বললে।

'সুকান্ত বোসের স্ত্রী। চেনেন না সুকান্তকে ?'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি—' দীপঙ্কর ঢোঁক গিলল।

'বুঝেছেন ? তাকে দিয়ে তদবির করাবার মানে ?'

'একে ঠিক তদবির বলে না—'

'তবে কী বলে ?'

কী বলে ভাষাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না দীপঙ্কর। বললে, 'কাজ আন্দাজে আমার মাইনেটা কম তাই সেটা কিছু বাড়িয়ে দেবার জন্যে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম। আজ নয় কাল বলে আপনি শুধু মুলতুবি রাখছিলেন। কিছুতেই আপনার গা হচ্ছিল না। তাই, মিসেস বোসের সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে দেখে তাঁকে বলেছিলাম আপনাকে অনুরোধ করতে—'

'আমার সঙ্গে কত লোকেরই তো জানাশোনা', প্রায় গর্জে উঠল বরেন: 'কই, আর কাউকে তো পাঠান নি তদবিরে।'

'যাকে পাঠাব তার সঙ্গে আমারও তো একটু জানাশোনা থাকা দরকার। তা সেটা যতই ক্ষীণ হোক—'

'আপনার বেলায় ক্ষীণ আর আমার বেলায় গাঢ় ? আপনি ভেবেছেন ভদ্রমহিলা বললেই আমি একেবারে গলে যাব ? উথলে পড়ব ?' বরেন গমগম করে উঠল।

'কিছুই ভাবি নি স্যার—'

'ভাবেন নি ? কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। জঘন্য।'

'ইঙ্গিত ?'

'ন্যাকা সাজবেন না। এই বোঝাতে চেয়েছেন, আমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, চরিত্র নেই—একজন আগন্তুক ভদ্রমহিলা হেসে-কেশে একটা কিছু অনুরোধ করলেই আমি তেড়েফুঁড়ে তা পালন করব। আমি বুদ্ধির ঢেঁকি, অনুরোধের ঢেঁকি গিলতে আমার বাধবে না—'

'অত তলিয়ে কিছু বুঝি নি।' দীপঙ্কর হাঁসফাঁস করে উঠল: 'তলিয়ে যাচ্ছিলাম, হাতের কাছে একটা খড়কুটো পেয়ে ধরলাম আঁকড়ে।'

'আর ভাবলেন সেই খড়কুটোটা আমার কাছে কাঠ-বাঁশ হয়ে উঠবে। ভুল, আপনার ভুল হয়েছে। অত সহজে হেলে-পড়ার লোক নই আমি। হালকা-পলকা নই।'

'আমাকে মার্জনা করবেন।'

'হ্যাঁ, যান। আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি। ফার্মের সম্ভ্রমের উপর ছায়া পড়ে এমন কোনো কাজে হাত দেবেন না, আভাসে-ইশারায়ও না।' চলে যাচ্ছিল দীপঙ্কর, ডাকল বরেন। বললে, 'শুনুন। আপনার মাইনে বাড়বে না।'

'বাড়বে না?'

'না। বাড়বার কোনো সংগত কারণ নেই।'

'নেই?'

'না। শত তদবির সত্ত্বেও না।'

যদি এখুনি, এই মুহূর্তে, মুখের উপর চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারত দীপঙ্কর! নিষ্ঠুরতার মুখে ছুঁড়ে মারতে পারত একতাল বিদ্রোহের কাদা!

দুর্বলের মত চলে যাচ্ছে, দীপঙ্করকে আবার ডাকল বরেন: 'শুনুন, যদি ভদ্রভাবে শুদ্ধভাবে কাজ করতে চান তো থাকুন, নইলে অন্যত্র পথ দেখুন! সেখানে যান যেখানে ইউনিয়ন আছে, স্ট্রাইক আছে, ময়দান আছে। দাবি মানাবার ঝাণ্ডা আছে। এখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, মর্জির উপরে আর্জি। এখানে বিশেষ সুবিধে নেই, না তদবিরে, না জবরদস্তিতে। সুতরাং—'

বাড়ি এসে মন ভার করে বসেছে দীপঙ্কর। ওর মন আবার ভালো থাকে কবে? ওই তো ওর মুখের স্বাভাবিক রঙ। দুর্গাবালা সাহস করে বসল পাশ ঘেঁষে। বললে, 'তোর তো এইবার মাইনে বাড়বে শুনছি—'

না শুনে উপায় কী। আশার কথা না শুনে মানুষ বাঁচবে কী করে, কী করে তাকাবে সামনে? আশা পূর্ণ হলেও আবার আশা করবে, কেবলই আশা করবে। আকাশে সূর্য থাকলেও চাইবে আরেক স্বপ্নের সূর্য। কিছুতেই আশার শেষ হবে না। কেবল বেড়েই চলবে। দাবি বাড়বে, মাইনেও বাড়বে। মাইনে বাড়লে আবার দাবিও চড়বে। সব সময়ে এক পৃষ্ঠায় বসে শুনবে আরেক পৃষ্ঠার গুঞ্জরন।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকবে এ আর নতুন কথা কী।

'যদি বাড়তি কিছু পাস এবার, তিনখানা শাড়ি কিনিস।'

'তিনখানা?' বলে ফেলল দীপঙ্কর।

'অন্তত দুখানা তো বটেই। একখানা তোর দিদির, আরেকখানা আভার।'

'আর তৃতীয় ব্যক্তিটি যে তুমি তা না বললেও বুঝছি। কিন্তু মা, মাইনে বাড়বে না।'

'বাড়বে না?'

'না। বলে দিয়েছে মুনিব।'

'যতই বলুক, ঠিক বাড়বে দেখিস। কাকলি বলেছে চেষ্টা করবে, মুনিবের সঙ্গে ওর চেনা আছে।' দুর্গাবালা তবুও দড়ি ছাড়বে না, ঝড়ের মধ্যেই আলো জ্বালাবে: 'আর ও মেয়ে অসাধ্যকে সুসাধ্য করার মেয়ে—'

'থামো।' ধমকে উঠল দীপঙ্কর: 'কাকলি চেষ্টা করেছিল, আর সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে।'

হাল তবুও ধরে থাকবে দুর্গাবালা: 'এক চেষ্টায় হয় নি, আরেক চেষ্টা করবে। চেষ্টার কি শেষ আছে? এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খুলবে। চালাক মেয়ে, ও ঠিক আদায় করে দেবে দেখিস।'

'না, দেবে না। বাড়বে না মাইনে।' উঠে পড়ল দীপঙ্কর। বললে, 'ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরতে হবে।'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কাকলি সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। প্রথমেই গেল মৃণালিনীর কাছে। বললে, 'মা, মাইনে পেয়েছি।'

'অ্যাঁ! কই, দেখি।' মুখ ঢেকে খবরের কাগজ পড়ছিল—ধড়মড় করে উঠে বসল মৃণালিনী।

এ কী! কাকলির হাতে তিনটে চৌকো কাগজের বাক্স!

'মাইনের টাকায় তিনখানা শাড়ি কিনলাম মা।' নিচু খাটে মৃণালিনীর পাশে গিয়ে বসল কাকলি। বড় বাক্সটা খুলে বলল, 'এ কড়িয়ালখানা আপনার জন্যে, আর এ দুখানা কাঞ্জিভরম—কাকিমা আর দিদির জন্যে। কি, ভালো নয়?' বলে প্রণাম করল হেঁট হয়ে।

আনন্দে চলচল মুখে শাড়িগুলি দেখতে লাগল মৃণালিনী। সন্দেহ কি, তার শাড়িটাই অভিজাত। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'মাইনে কত পেলে?'

'ভাঙা মাস তো, তাই পুরো পাই নি।' পাশ কাটাতে চাইল কাকলি।

'তবু থোক কত এল হাতে?' মৃণালিনী লোলুপ চোখে তাকাল।

'তা একুশ দিনের মাইনে—'

'কত?'

'বলবার মতন তেমন কিছু নয়।'

'শাড়ি তিনখানির দাম কত হল?'

'গায়ে টিকিট আঁটা নেই?' স্পষ্ট হিসেবের মধ্যে আসতে চাইল না কাকলি: 'দাম তো ভারি হাতেই নিয়েছে। কি, ঠকেছি বলে মনে হয়? বেশ দামী বলে মনে হচ্ছে না?'

জমিগুলি আবার পরীক্ষা করল মৃণালিনী। বললে, 'এত দামী কেনবার কী হয়েছিল? হাতে তো তা হলে বিশেষ কিছুই রইল না।'

'তা আছে কিছু।'

'কত?' মনে-মনে আরেকবার হাত বাড়াল মৃণালিনী।

'সামান্যই। তা দিয়ে আবার অন্য কেনাকাটা আছে।' কাঞ্জিভরম দুখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বিজয়ার ঘরে ঢুকে বিজয়াকে প্রণাম করলে।

'আমার প্রথম মাইনের প্রণামী।' হাসি-মুখে বললে কাকলি, 'কোনটা আপনার পছন্দ?'

'আমাকে দেবার কী হয়েছিল!' চোখটা অন্য দিকে করল বিজয়া।

'সে আমি বুঝব। এখন দেখুন কোনটা দেব?'

'দুটোই তো রঙিন। রঙিন পরবার কি বয়েস আছে?' দৃষ্টিটা তবু সরল করল বিজয়া।

'রঙ কি বয়সে? রঙ মনে। তবু দুটোর মধ্যে এটাই বেশ 'সোবার' মনে হচ্ছে। এটা দিই।' কোলের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালাল কাকলি।

'আর, দিদিভাই, এটা তোমার।'

'এই ঝলমলে শাড়ি দিয়ে আমি কী করব?'

'পরবে।'

'পরে, যখন ঠাকুর থাকবে না, তখন রান্নাঘরে বসে হাঁড়ি ঠেলবে। বলো, শেষ করে যাও কথাটা—'

কাকলি পালাল নিজের ঘরে। সুকান্ত মজুত নেই, এ এক এখন শান্তি। ফাঁকা পাওয়া কখনো-কখনো টাকা পাবার মতই মোলায়েম।

প্রথমে শামিল হল বন্দনা-বিজয়া।

'বড় গাছেই কাছি বেঁধেছে।' বিজয়া টিপ্পনী কাটল: 'মহারানীকে খোল-বিচালি দিয়ে আমাদের বেলায় শুধু ঘাস-জল। দিবি তো সমান করে দে। সাম্যবাদের যুগ এখন—'

'আপনি এক কাজ করবেন। নেমন্তন্ন-বাড়িতে পরে যাবে বলে সেদিন আপনার সেই মুর্শিদাবাদীটা নিয়ে যেমন আর ফেরত দিল না, আলমারিতে পুরল, আপনিও তেমনি এক বেলা পরবেন বলে নিয়ে বেমালুম বাক্সে ভরবেন।' শাশুড়ির পক্ষপাতিত্বে অসন্তোষে ছিল, তাই সহজেই বলতে পারল বন্দনা: 'তা হলেই জব্দ হবে।'

'আমাদের লাগবে না।' বললে বিজয়া, 'যে গরলডাকিনী বউ এসেছে সেই পারবে জব্দ করতে।'

পরে শামিল হল মৃণালিনী-বন্দনা।

'তোমাকে বুঝি ঝলমলেটা দিয়েছে?' মৃণালিনী যাচাই করতে এল।

'কী করি! কাকিমা একেবারে থাবা বসিয়ে কেড়ে নিলেন ভালোখানা।' বললে বন্দনা।

'তুমি নিলে কেন? বললেই পারতে, আমি ছেলেপুলের মা, গম্ভীর রঙের খানাই আমাকে দাও। আর উনি হাত-পা-ঝাড়া একলা মানুষ, বুড়ি হয়েও ছুঁড়ি-ছুঁড়ি করছেন, উনিই নিন ঝলমলেটা—'

'আমি ওটা পরব না। পর্দা তৈরি করব।'

'দিবি তো আপনজনদের দে, ডিরেক্ট লাইনদের।' বললে মৃণালিনী, 'কাকিমাকে দেওয়া কেন?'

শেষে শামিল হল মৃণালিনী-বিজয়া।

'কী কটা টাকা পেয়েছে, আদেখলার মত তছনছ শুরু করে দিয়েছে।' মৃণালিনী নিভৃত হল বিজয়াকে নিয়ে: 'প্রথমেই একেবারে তিনখানা শাড়ি কেন? সেরা দুই গুরুজন, দুই শাশুড়িকেই প্রথমে দিলে হত। বড় বউমাকে গোড়াতেই দেওয়া কেন?'

'ঠিক কথা।' দিব্যি সায় দিল বিজয়া: 'বড় বউমাকে দিতে হলে বাসন্তীকেও দিতে হয়। ওরা এক পর্যায়।'

'আর আমার বাসন্তীর কী কষ্ট!'

'পোশাকি একটাও শাড়ি নেই হয়তো।'

'পোশাকি! আস্ত একখানা আছে কিনা তাই বা ঠিক কী! যদি সত্যিকার কারু দুঃখ দূর করা যায় তা হলে টাকা রোজগারের মানে হয়, নইলে উপর-উপর শুধু শুধু বাবুয়ানার জন্যে চাকরি—ছি ছি!'

সুকান্ত যখন বাড়ি ঢুকছে, প্রথমেই, নিচে বিজয়ার সঙ্গে দেখা।

'ছোট বউমা তোমার জন্যে কী আনল?' জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

'তার মানে?' দাঁড়িয়ে পড়ল সুকান্ত।

'প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সে যে মোচ্ছব বসিয়েছে। আমাদের তিন অচাকরানীর জন্যে শাড়ি এনেছে তিনখানা। তোমার জন্যে—'

'আমার জন্যে হয়তো দিল্লীর সিংহাসন।'

ঘরস্থ হবার আগেই ডাকল মৃণালিনী। বারান্দার নিরালায় নিয়ে গিয়ে নালিশ জানাতে বসল।

'ছোট বউমা কত মাইনে পেল জানতেই পেলাম না।' বললে মৃণালিনী, 'জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরও দিল না।'

'উত্তরও দিল না?'

'না। তিন-তিনটে ফ্যাশনের শাড়ি কিনে এনেছে—কত দাম তাও বললে না।'

'কী বললে?'

'বলবেই না কিছু, তা, কী বললে!' ভেঙচে উঠল মৃণালিনী: 'তারপর নগদ কত টাকা হাতে আছে সে সম্বন্ধেও একেবারে চুপ। টাকা নিয়ে যদি ইচ্ছেমত ছিনিমিনি খেলে, কেউ শাসন করবার না থাকে, তা হলে চাকরি তো নয়, অনর্থ। সংসারেরই যদি সুরাহা না হয় তা হলে আর লাভ কী। কত সাধ ছিল বউয়ের প্রথম মাসের মাইনে থেকে আমার ঘরে একটা রেডিও বসবে। তা নয়, যত সব আজেবাজে জিনিস। শুধু শাড়ি পরালেই তো হল না, ধোয়াবার খরচ দেবে কে? তখন—যখন শাড়ি ময়লা হবে? যখন নেমন্তন্ন-বাড়ির মাংসের ঝোলের দাগ লাগবে? আসলের সঙ্গে দেখা নেই, সুদের পরিপাটি!'

বিজয়ার ঘরের রেডিওতে কাঁটা ঘোরাবার স্বাধীনতা নেই মৃণালিনীর। তার কত দিনের সাধ, সে ঘরে-বারান্দায় কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়াবে আর রেডিও বাজবে অবিশ্রান্ত। ঢালাও একটা গোলমাল চলবে একটানা। কখনো বা দুই ঘরে সমস্বরে। ঘরে-ঘরে ফ্যানের মত রেডিও থাকবে এটাই তো বড়লোকির লক্ষণ। একজনের কাঁটায় আরেকজন কণ্টক হবে না। তোমার কাঁটা যদি সিনেমার গানে, আমারটা কিত্তনে।

তা অধিকারই দিল না, আয়ত্তি তো দূরের কথা। কবলের মধ্যে না আনলে খাবল মারি কী করে? সমস্ত টাকাটাই যদি বউ নিজের আঁচলে বাঁধে তবে মৃণালিনী তো ফক্কা। মুখ ঘোলা করে বসে রইল মৃণালিনী। শুধু অস্ফুটে একবার বললে, 'অত বাড় ভালো নয়।'

ঘরে গিয়ে আলো জ্বালতেই খাটের উপর কিলবিল করে উঠল কাকলি। এক দণ্ড নিরিবিলি থাকবার জো নেই, চাঞ্চল্যের বুঝি এই বক্তব্য।

'খুব নাকি দানখয়রাত শুরু করে দিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'আপত্তি কী! অব্রাহ্মণে তো দিই নি।' উঠে বসল কাকলি, অনুকম্পার সুরে বললে, 'তোমার জন্যে কিছু আনি নি বলে বলছ? বেশ তো, বলো না কী লাগবে?

ব্লেড এক প্যাকেট? শেভিং স্টিক? শ্যাম্পু? না কি'—চোখে এবার মরণকামড় হানল: 'না কি বেডসুইচটা অকেজো হয়ে গেছে সেটা সারিয়ে দিতে বলব?'

'খুব টাকা হয়েছে তোমার?'

'টাকা হলেই দানখয়রাত করা যায় না, কিঞ্চিৎ হৃদয়ও হওয়া দরকার।'

'আর কিঞ্চিৎ অহংকার।'

'নিশ্চয়ই। কিছু ব্যক্তিত্ববোধ। সেই অর্থে অহংকারই তো অলংকার। টাকা শুধু রোজগার করা নয়, টাকা ব্যয় করার অধিকার। আর অধিকারের মানেই স্বাধীনতা। অহংকারের আর দোষ কী!'

আমতা-আমতা করে সুকান্ত বললে, 'টাকাটা মার হাতেই দিলে পারতে।'

'কোন আইনে?' ঝলসে উঠল কাকলি।

'সব আইনই লেখা থাকে না। মার হাতে দিলেই শোভন হত।'

'তুমি ছেলে, তুমি দাও গে। তুমি শোভন ছেড়ে সুশোভন হও। আমি দিতে যাব কেন?'

'তা হলে তুমি চাও না তোমার টাকায় সংসারের কিছু সুরাহা হোক?'

'চাইলেও, সেটা একান্তই আমার ডিসক্রিশান। সুরাহাটা কী এবং কতটুকু তা আমি বুঝব, তোমরা নয়। পাঁঠাটা যখন আমার তখন আমি বুঝব কোন দিকে কাটব বা আদৌ কাটব কিনা। তোমরা সাজেশশান দিতে পারো কিন্তু আমি তা মানতে বাধ্য নই।' ঘুরে দাঁড়াল কাকলি: 'এই যে তিনখানা শাড়ি কিনে দিলাম এটা সংসারের সাশ্রয় নয়? তারপর তোমাকে যদি সাবান ব্লেড তেল-শ্যাম্পু কিনে দিই, এক দিক থেকে সেটাও তো উপশম সংসারের—'

'মার কত দিনের শখ নিজস্ব একটা রেডিও হয়।' পরিত্যক্ত খাটে শুতে গেল সুকান্ত।

'রেডিও? সেটা ঐ বড় ঘরে বসবে যে ঘরে জয়ন্তী আর সুবীর পড়ে? তাদের কত যে পড়ার সময় গ্রাস করে নেবে রেডিও তার হিসেব করো? ছেলেমেয়েদের যে লেখাপড়া হচ্ছে না তার মূলে বাপ-মায়ের অসাবধানতা বা ঐ বিলাসপ্রিয়তা। আজকাল বাপ-মারা কী পরিমাণ সিনেমা দেখছে আর তার আলোচনায় প্রশ্রয় জোগাচ্ছে, একবার নেবে তার স্ট্যাটিস্টিকস? ঘরের বাইরে যে পাপ চিত্ররূপে আছে সে পাপ আর শখরূপে ঘরে এনো না।'

'থাক। তোমাকে আর বক্তৃতা মারতে হবে না।'

'এক শো বার হবে। শেয়ালকে কাঁকুড়ের খেত দেখিয়েছ, এখন লাঠি ওঁচালে চলবে কেন?'

'না চলুক। শোনো।' একটু বা আপোসের ভঙ্গি করল সুকান্ত : বললে, 'বাকি কত টাকা আছে তোমার হাতে?'

'যাই থাক, হিসেব দিতে পারব না।'

'হিসেব কে চাইছে? সংসারে যখন আছ, তখন মার হাতে বাকি টাকাটা দিয়ে দাও।'

এক মুহূর্ত থামল কাকলি। বললে, 'সংসারে আছি মানে, পেয়িং গেস্ট হয়ে নেই, তোমার স্ত্রী হয়ে আছি। তাই সে টাকা, তুমি সক্ষম স্বামী, তুমি দেবে। আমার টাকা আমার। বাকি টাকাটা মার হাতে দিলেই আমার আর স্বাধীনতা থাকবে না। আমার কত এখনো দানখয়রাত বাকি।'

'তোমার অত দানখয়রাত করবার কী হয়েছে?' ধমকে উঠল সুকান্ত।

'বলেছি না, ও বুঝতে হলে হৃদয় দরকার। তোমার ও বস্তু কোথায়? তোমার তো গলার পরেই পেট। গেলা আর ভরার মধ্যে সামান্য ব্যবধানও তুমি রাখতে চাও না। তোমার খালি টাকা আর মায়ের ব্যাঙ্কে রাখা। শোনো, তোমার মাকে বোলো', ঘর ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করল কাকলি : 'পরে যখন আমার আরো মাইনে হবে, তখন তাঁকে না হয় দেব কিছু সেলামি।'

'আরো মাইনে হবে মানে?'

'বা, আমার আর মাইনে বাড়বে না? চাকরিতে উন্নতি হবে না আমার?' এক পা ফিরল কাকলি।

'এর পর আবার উন্নতিও আছে নাকি?'

'এক শো বার আছে। শেয়াল শুধু কাঁকুড় খেতেই থাকবে? আখ খেতে ঢুকবে না? নিশ্চয়ই ঢুকবে যদি সে সত্যি শেয়াল হয়। উন্নতি করবার যতরকম কারণ-প্রকরণ আছে সব সে অবলম্বন করবে। চাকরি মানেই উন্নতি।'

'কিন্তু করণ-প্রকরণটা কী?' গুই-গুই করেও থেমে গেল সুকান্ত।

'ক্ষেত্র বুঝে বিধান। এ তো এক প্রবন্ধ লিখে সারা জীবনেব জন্যে ডক্টর হওয়া নয়। এখানে অনেক প্রবন্ধ, অনেক কারুকার্য।'

'এত শিগগিরই কারুকার্য দেখাবে!' একটু যেন বা হুল ফোটাল সুকান্ত।

'সেইটেই তো এফিসিয়েন্সির প্রমাণ। যে নাচতে জানে তার পাক দিতেও জানা উচিত। এ তো তোমারই কথা। সুতরাং—' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

শুয়ে পড়ল সুকান্ত।

কদিন পরে কতগুলি জামা নিয়ে কাকলি চলে এল দীপঙ্করের বস্তিতে।

'বয়েস ধরে আন্দাজে কিনে এনেছি মা। কার কোনটা লাগে কে জানে।' একটা মোড়া এসেছে, তাতে বসল কাকলি।

ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একে আস্ত জামা, তায় নতুন, তায় আবার রঙদার।

দুর্গাবালা সামলাবার চেষ্টা করল। ঠেলেঠুলে শিশুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'চুপচাপ দাঁড়াও সকলে ঠিক হয়ে। উনি যাকে যেটা দেন সেটা সে নেবে। ঝগড়া করতে পারবে না।'

'জামা এনেছে! এবার জামা এনেছে!' ছেলেমেয়েগুলো বলতে লাগল সোল্লাসে।

'এত সব আনবার কী দরকার ছিল?' ওপার থেকে কে বলে উঠল করুণ-কণ্ঠে।

'এ কি? আপনি?' কাকলি ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল দীপঙ্কর শুয়ে আছে তক্তপোশে: 'কী হয়েছে আপনার?'

'কিছু নয়। সামান্য একটু জ্বর আর মাথাধরা।' বললে দীপঙ্কর, 'মাথার আর কাজ নেই, আমার জন্যে মাথাব্যথা!'

'আফিস গিয়েছিলেন?'

'না গিয়ে উপায় আছে? সকাল-সকাল যে আসতে পেরেছি এই ভাগ্যি।'

'কালও যাবেন জ্বর নিয়ে?'

'কাল জ্বর থাকবে না আশা করি। আর যদি থাকেও—'

'না, না, কদিন ছুটি নিন। আপনাকে সত্যিই খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'ও কিছু নয়। তা ছাড়া, বরেন ছুটি দেবে না। সেদিনের পর থেকে ও আমার উপর ভীষণ চটে আছে। পারলে হাতে মাথা কাটে।'

'কোন দিনের পর থেকে?'

'যেদিন আমার হয়ে ওকে বলেছিলেন আপনি। সেই আমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা।'

'বা, সে তো আমি বলেছিলাম। চটলে আমার উপর চটবে।'

'না, ও ঠিক বুঝেছে আমিই পাঠিয়েছিলাম আপনাকে। আমার সেটা ঠিক হয় নি, অন্যায় হয়েছিল। ও ভেবেছে আমি ক্যানভাসিং করছি, আপনাকে পাঠিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করতে চেয়েছি ওকে। মাইনে যে বাড়ল না সেটা লাগছে না, কিন্তু আমার জন্যে আপনাকে অপমানিত হতে হল সেইটেই অসহ্য।'

'না, না, অপমান কী!' ঝলমল করে উঠল কাকলি: 'একবার চেষ্টা করেছিলাম, হয় নি। আবার চেষ্টা করে দেখব হয় কিনা। চেষ্টায় বিফল হওয়াকেই অপমানিত হওয়া বলে না। যার যত লড়াই তারই তত বড়াই। কি, ঠিক নয়?'

খুশিতে ছাপিয়ে পড়ল দুর্গাবালা। বললে, 'আমি ঠিক জানি কাকলি বুদ্ধিমতী মেয়ে, পরের দুঃখে ওর প্রাণ কাঁদে, ও ঠিক আদায় করতে পারবে। এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খোলা পাবে। ওকে আটকায় এমন কার সাধ্যি?'

'না, না, আর চেষ্টা করতে হবে না।' তপ্তকণ্ঠে নিষেধ করে উঠল দীপঙ্কর: 'আর দরজা খুলিয়ে কাজ নেই। যে চাকরিটুকু আছে সেটুকুই থাকুক টায়েটুয়ে। আর যেন না বিপন্ন হই।'

'তা হলে আমিই দেখছি আপনার বিপদের কারণ।' নত না হয়ে দৃঢ় হল কাকলি: 'তা হলে বিপদ আমাকেই কাটিয়ে দিতে হবে। আর বিপদ যদি নাও কাটে, আমরা সংগ্রামী মানুষ, আমরা কেন ভয় পাব?'

মূঢ়ের মত না মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল দীপঙ্কর।

শিশুগুলির মধ্যে জামা বণ্টন করে, আবার অন্যতর জিনিস আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে পড়ল কাকলি।

'হ্যালো—' রিসিভারটা তুলে নিল বরেন।

'আমি কা—'

'বলতে হবে না। আপনি 'কা তব কান্তা'র কা। তার মানে, আপনি কেউ নন, কারুরই কেউ নন।'

একটু কি বেশি বলে ফেলল বরেন? তা কী করা যাবে! কথার পিঠে কথা পেলে সেই সুযোগই বা ছাড়ে কে! কিন্তু ওদিক বুঝি পিঠ দেখাল।

না, বলেছে কথা।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আদিম পরিচয়ই আসল পরিচয়।'

'তাই তো বিজ্ঞাপনে বলে আদিম ও অকৃত্রিম।'

'বিজ্ঞাপনে কী বলে শুনবেন না, আমাকে শুনুন।'

'শুধু শুনব? দেখব না?'

'হ্যাঁ, দেখবেন। আফিসের পর যাচ্ছি আপনার কাছে। একটা কাজ আছে।'

'আজ আর শুধু কথা নয়। আজ কাজ। চলে আসুন।'

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এল কাকলি। উদ্ভাসিত, উচ্চারিত চেহারা। চোখে

গাঢ় করে সুর্মা, ঠোঁটে পাতলা করে রঙ। পরনের শাড়ির ফিকে নীল পাড়ের সঙ্গে গায়ের ব্লাউজের সংগতি করা, হয়তো বা জুতোর স্ট্র্যাপের সঙ্গে।

'আপনার উন্নতি কে আটকায়।' বরেন অভিবাদন করল।

লজ্জিত-লজ্জিত মুখ করল কাকলি। বললে, 'সাজসজ্জার উন্নতি দেখে বলছেন?'

'নিশ্চয়ই। ঐ তো উন্নতির প্রথম সিঁড়ি।' বরেন উঠে দাঁড়াল: 'এ তো সরকারি চাকরি নয় যে ব্লাউজের প্যাটার্ন ঠিক করে দেবে, বা হুকুম জারি করবে যে এক চিলতেও পেট দেখানো চলবে না। এ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্ম। এখানে যত উড়বেন তত উঠবেন।'

'কী আর করি! যেমন কলি তেমনি চলি। যেমন দেশ তেমনি বেশ।'

'এক শো বার ঠিক।'

'আর চাকরি করতে আসাই মানে উন্নতি করতে আসা। কী বলেন, ঠিক নয়?'

'হাজার বার ঠিক।' একটু নড়ল-চড়ল বরেন: 'তারপর কাজটা কী?'

'বিশেষ কিছুই নয়। আপনার যদি অসুবিধে না হয়, আপনার গাড়িতে একটা লিফ্‌ট দিন আমাকে--'

'বেশ তো, চলুন। আমিও বেরোচ্ছি।' কদ্দূর যাবেন?'

'কদ্দূর আবার! বাড়ি পর্যন্ত।'

ড্রাইভার স্টার্ট দিল। পিছনের সিটে পাশাপাশি কাকলি আর বরেন।

বিশেষ কিছুই নয়? ভীষণ বিশেষ। অভাবনীয়েরও বেশি। নিজের থেকেই এসেছে। সেজেগুজে এসেছে। মোটরে বসেছে। বসেছে পাশ ঘেঁষে।

আশ্চর্যের দেশে আছে কত আলাদিনের লণ্ঠন!

চুপচাপ কাটছে রাস্তাটা।

বাড়ির কিছুটা আগেই থামতে বলল কাকলি।

'সে কি, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।' একটু বুঝি চঞ্চল হল বরেন।

'দরকার নেই। কে কী দেখে ফেলে তার ঠিক কী!'

'কে মানে, সুকান্ত?'

'তা ছাড়া আর কে। বচনে উদার, প্রত্যক্ষে হয়তো বিপরীত।' নিখুঁত নেমে পড়ল কাকলি: 'নমস্কার। এমনি কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত করব আপনাকে।'

সত্যিই বিরক্ত করা। আড়ষ্ট অসাড় করে রাখা। এক পাত দৃঢ় ইস্পাত ছাড়া আর কিছু নয় কাকলি। রেখা নেই, স্পন্দন নেই, স্ফুরণ নেই। ঠাসা এক স্তূপ ঔদাসীন্য।

সেদিন আবার গাড়ি থামিয়ে রেস্তরাঁয় কফি খেয়ে নিল কাকলি।

একেই বুঝি বলে বোকা বানিয়ে কাজ বাগাবার ফন্দি। দিব্যি বিনা পয়সায় বিনা ঝামেলায় বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত।

তা কেন হবে? অক্লেশে বাড়ি ফেরাই যদি উদ্দেশ্য হত তা হলে আফিসেরই কোনো এক শাঁসালো বাবুর গাড়িতেই সোয়ারি হতে পারতাম। মনে-মনে হাসে কাকলি। এ একরকমের তদবির। কথা কয়ে অনুরোধ করেছিলাম বলে চটেছিল, এখন দেখি কথা না কয়ে অনুরোধ করা যায় কিনা। বাড়ে কিনা দীপঙ্করের মাইনে।

'কি, আমার এখন পরিচয় কী?' গাড়ি থেকে নেমে কাকলি বললে, 'আপনার বন্ধুর স্ত্রী, না আপনার শুধু-বন্ধু?'

'শুধু-বন্ধু।'

'হ্যাঁ, শুধু-বন্ধু।' হাসতে হাসতে চলে গেল কাকলি। বলে গেল, 'শুধু-বন্ধুরই জোর বেশি। তার অনুরোধ আপনি আর ফেলতে পারবেন না।'

দাঁড়ান, আস্তে-আস্তে। মনে মনে দীপঙ্করকে লক্ষ্য করলে। প্রায় সাজিয়েছি। এবার কিস্তি পড়বে।

হ্যাঁ, আস্তে-আস্তে। প্রতীক্ষার মত রোমাঞ্চ নেই। প্রাপ্তির চেয়েও প্রতীক্ষা সুন্দর। দেখি না কী ঘটে। কী রটে! কী হয়ে দাঁড়ায়!

তুমিও প্রতীক্ষা করো। অন্তত এক রাত্রি। সুকান্তের দিকে চেয়ে মনে-মনে বললে কাকলি। ভাবছ, আনি নি। তোমার জন্যেও এনেছি।

পরের মাসের মাইনে পেয়ে চারখানা ধুতি কিনল কাকলি। ভূপেনকে, হেমেনকে, প্রশান্তকে একখানা করে দিয়ে প্রণাম করল।

'ঠাকুরপোকে দিলে না?' জিজ্ঞাসা করল বন্দনা।

'কী, বস্ত্র?' সে তো কবেই একবার দিয়েছি—আর কেন?' কাকলি হাসতে লাগল।

সকাল বেলায় বললে, 'ভেবেছিলাম তোমার জন্যে স্যুটের কাপড় আনব। পরে ভাবলাম তোমার তো ওসবে অভ্যেস নেই, তাই প্লেন ধুতি এনেছি। এই নাও।' সুকান্ত হাত বাড়িয়ে নিল না বলে তার সামনের টেবিলের উপর রাখল কাকলি।

ভগলুকে হঠাৎ চিৎকার করে ডাকতে লাগল সুকান্ত: 'কি রে, ঘর মুছেছিস? বেলা হয়ে গেল, শিগগির আয় জল নিয়ে।'

বালতি-ভর্তি জল নিয়ে চলে এল ভগলু। বললে, 'ন্যাকড়া নিয়ে আসি।'

'লাগবে না ন্যাকড়া। এটা দিয়ে ঘর মোছ।' কাপড়খানা বালতির জলে চুবিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর : 'নে মোছ ভালো করে।'

কাকলির চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। কাম্মার দেওয়া নতুন কেনা রেল-লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চালাচ্ছিল সেণ্টু, সুকান্ত একটা লাথি মেরে ছত্রখান করে দিল।

'এটা কী হল?' জিজ্ঞেস করল সেণ্টু।

অপ্রস্তুত হল সুকান্ত। বললে, 'দেখি নি—না দেখে হয়েছে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এটা হল কী?'

'কলিশন।'

'এটা মোটেই কলিশন নয়। এটা ভূমিকম্প।'

৩২

নীল কাগজে আঁকা একটা নক্‌শা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল হেমেন, বিজয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী এটা?'

'বাড়িওলা ছাদের উপর নতুন একখানা ঘর তুলে দিতে রাজি হয়েছে।' হেমেন নক্‌শার উপরে চোখ রেখে বললে, 'সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম।'

'কী মজা!' উছলে উঠল বিজয়া : 'নতুন ঘরটায় আমরা উঠে যাব। আর নিচের এ ঘরটায় ড্রয়িং রুম হবে।'

কথাটায় বাস্তব রূপ দেবার জন্যে শামিল হল মৃণালিনী। জিজ্ঞেস করল, 'কার খরচে উঠবে নতুন ঘর?'

'বাড়িওলা অপ্‌শান দিয়েছে। আমরা নিজের খরচেও তুলতে পারি, সে ক্ষেত্রে এ বাড়ি ছেড়ে দেবার সময় ও ঘর তার হয়ে যাবে। কিংবা বাড়িওলা নিজেও তুলে দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে মাস-মাস।'

'কত ভাড়া?'

'তা এখনো ঠিক হয় নি। প্রশ্ন হচ্ছে কোন বিকল্পটা গ্রহণীয়।' মুখচোখ চিন্তিত করল হেমেন।

'বা, এর আর ভাবাভাবি কী! নিজেরাই খরচ করে তুলে ফেলা উচিত।'

চকলক করে উঠল বিজয়া : 'মাস-মাস বাড়তি ভাড়া টানার যন্ত্রণা কেন? কবে উচ্ছেদ করবে, কবে বা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাব তা ধূসর ভবিষ্যৎ—'

ঐ ব্যবস্থা হলেই তো হয়েছে। চোখে আঁধার দেখল মৃণালিনী। নিজেদের পকেট থেকে খরচ দিতে হলে একমাত্র দিতে পারবে হেমেন। সেই ক্ষেত্রে ঐ ঘর হেমেন, তার মানে বিজয়া দাবি করে বসবে। আমরা গাঁটের টাকা খরচ করে ঘর তুলেছি, এ ঘর আমাদের। এমন যুক্তিকে সহজে ঠেকানো যাবে না। বাড়িওলার খরচে হওয়াই ভালো। না হয় দেওয়া যাবে কিছু বেশি ভাড়া। সেটা এজমালি সংসারের থেকেই দেওয়া হবে। টেনান্সি যখন ভূপেনের নামে তখন ঐ নতুন ঘরেও চলবে তার মালিকানা। এবং সে সূত্রে সে ঘর ধরতে পারবে প্রশান্ত।

'আমি বলি কি, নতুন ঘর যদি হয় তা হলে তা মাসিক ভাড়ার মধ্যেই নিয়ে আসা উচিত।' মৃণালিনী বললে, 'পরের বাড়িতে কে যাবে গুচ্ছের খরচ করতে?'

'আমিও তাই বলি।' বিজয়ার প্রতিবাদপ্রখর নীরব কটাক্ষ উপেক্ষা করে হেমেন বললে; 'নতুন ঘরের জন্যে বাড়তি ভাড়া আর কতই বা হবে। বিশ—ত্রিশ—পঞ্চাশ? যাই হোক, যতই হোক, ছোট বউমা তা দিতে পারবে অনায়াসে। সুতরাং ঐ নতুন ঘর সুকান্তর হবে—'

বোমার মত ফেটে পড়ল মৃণালিনী : 'ককখনো না। ঐ ঘরে প্রশান্ত থাকবে। ছেলেপিলেওলা সংসার, বউমা রুগ্ন, ওরই একখানা বড় ঘরের দরকার। তা ছাড়া ও বাড়ির বড় ছেলে।'

'কিন্তু প্রশান্ত মাস-মাস দিতে পারবে ভাড়া?' হেমেন তাকাল ভয়ে-ভয়ে।

'প্রশান্ত দেবে কেন আলাদা করে? সে ভাড়া এজমালি সংসার দেবে। ভাড়া বেশি হয়, এজমালি টাকায় না কুলোয়, তোমরা তোমাদের 'কোটা' বাড়িয়ে দেবে। আর ঐ চাকুরে বউকেও বাধ্য করবে চাঁদা দিতে।'

'চাঁদ পাবে না অথচ চাঁদা দিয়ে মরবে!' হাসল হেমেন : নিজে থাকবে ভাপসা ঘরে আর টাকা দেবে অন্যকে ভালো ঘরে বাহাল করতে, এটা রীতি নয়।'

'নয়? তবে কোনটা রীতি?' প্রায় কোমর বাঁধল মৃণালিনী : 'চাকরি করে মাইনে আনবে অথচ তা দেবে না সংসারে?'

'কোন সংসার?' প্রায় দার্শনিক হতে চাইল হেমেন।

'কোন সংসার মানে? যে সংসার আনুকূল্য করে তাকে চাকরি করতে দিচ্ছে সেই সংসার।'

'কী বলে ছোট বউমা?'

'কিছুই বলে না। মুখটা আগুনের খাপরা করে রেখেছে, বলবে কী।'

'না, না, বলে।' বিজয়া মৃণালিনীর পক্ষে এসে দাঁড়াল: 'বলে, বলুন তো সুবীরের জন্যে একটা মাস্টার রাখি, কিংবা ছেলেমেয়েদের মাইনেটা আমি দিই, কিংবা ইলেকট্রিকের বিল, কিংবা সেণ্টুকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তার সমস্ত খরচটা আমি টানি। মানে খুচরো কিছু খরচের ভার সে নিতে পারে দয়া করে—'

'চালাক মেয়ে—নাম কেনবার ফিকির!' মৃণালিনী বিজয়ার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল: 'আইটেমের উপর খরচ করতে চায়। এমনি থোক টাকা দিলে এজমালিতে মিশে যাবে, তাতে তো নাম লেখা থাকবে না, তাই তাতে সায় নেই। এমনি ঘুঘু নয়, বাস্তু ঘুঘু। বলে বেড়াবে, ইলেকট্রিকের বিল আমি দিচ্ছি, সুবীর ভালো রেজাল্ট করেছে আমি মাস্টার রেখে দিয়েছিলাম বলে, আর সেণ্টু-ঝণ্টুকে কি ইংরেজি ইস্কুলে পড়াতে পারত ওর বাপ-মা? আমি ছিলুম বলে রক্ষে। বুঝলে না, চাল মারবার না কিল মারবার গোঁসাই। কেন, সবাই যার-যা কোটা দিচ্ছে, তুইও দিয়ে দে একমুষ্টে। আমি কর্ত্রী, আমি যা ন্যায্য বুঝব খরচ করব। সংসারকে সাজাব-গোছাব।'

'তা একটা টাকা ধরে চাইলেই পারো সরাসরি।' সমান শত্রুর বিরুদ্ধে দুই জা কেমন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে চোখ ভরে তাই দেখতে-দেখতে হেমেন বললে।

'কোন লজ্জায়? ওগো বউ, টাকা দাও, ইলেকট্রিকের বিল দিতে পাচ্ছি না। ওগো বউ, টাকা দাও, মাসকাবারের মুটে এসেছে। ওগো বউ, টাকা দাও, গাড়ি এসেছে কয়লার, গয়লা ফর্দ এনেছে দু মাসের। আমি হাত পাততে যাব কেন? ওর নিজের কাণ্ডজ্ঞান নেই? ও এ বাড়িতে থাকে না? খায় না?'

'বা, থাকে-খায় তো, সে দায়িত্ব তার স্বামীর। সুকান্তর।' হেমেন বললে।

'আরে তাকে যে চাকরি করবার জন্যে এত সবাই সুবিধে করে দিচ্ছি তার জন্যে সংসারকে সে ট্যাক্স দেবে না?' এবার বিজয়া মুখিয়ে উঠল: 'দিদি যে এত করে তার আফিসের ভাত তৈরি করে দিচ্ছে, আফিস ফেরত পর্বতপ্রমাণ জলখাবার, তার কোনো বিবেচনা নেই?'

'তার মানে,' হেমেন হাসল, 'চাকুরে বউয়েদের জন্যে দুটো ইনকাম ট্যাক্স। একটা সরকারকে, আরেকটা শাশুড়িকে!'

'কেন নয়?' বললে মৃণালিনী: 'যখন ঠাকুর ছিল না তখন শাশুড়ি রান্না করে নি? রেহাই দেয় নি বউকে? চাকর-বাকর কটা কাজ করে? খুঁটিনাটি কাজের কি অন্ত থাকে সংসারে? সেসব কাজে বউয়ের আর ডাক কই? তাকে ছুটি দেয় নি সংসার? তবে সংসারকেই বা সে ট্যাক্সো দেবে না কেন?'

'এক ধোবার হিসেব মেলাতেই এক দুপুর।' বললে বিজয়া: 'ও তো ছোট বউয়ের প্রভিন্স ছিল। তা উনি চাকরি করতে গেছেন আর বড় বউমা তা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। ওকে চাকরিতে পাঠিয়েই তো বড় বউমার এই কষ্ট—'

'তা ছাড়া টাইমে-বেটাইমে কত অতিথি-বিতিথি সংসারে। ঝামেলা কিছু পোহাতে হয় ছোট বউকে?'

'সংসার থেকে যে সময় সে নিয়ে নিচ্ছে তার ক্ষতি সে পূরণ করবে না টাকা দিয়ে?' বিজ্ঞানের কথা বললে বিজয়া।

আর মৃণালিনী অর্থশাস্ত্র আওড়াল: 'যে শ্রম তার করণীয় ছিল, তা আমরা, সংসারের আর সকলে ভাগ করে নিচ্ছি। তার জন্যে সংসারকে দেবে না সে পারিশ্রমিক?'

'জানেন সেদিন জয়ন্তীকে কী বলছিল কাকলি?' আরো একটু অন্তরঙ্গ হল বিজয়া।

'কী বলছিল?'

'বলছিল, ঐ তো সামান্য কটা টাকা, বাতাসার মত হরির লুট দিই আর কী! সহায় নেই, সম্বল নেই, বাপের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, গায়ে গয়না নেই, ব্যাঙ্কে-বাক্সে টাকা নেই, আর স্বামী— স্বামীর ঐ তো মুরোদ— এখন এ অবস্থায় একটি পয়সাও নষ্ট করতে পারব না।'

'সংসারকে দেওয়া মানে নষ্ট করা!'

'বলছে, যত পারি জমাব তিল-তিল করে। মেয়েছেলের কখন কী বিপদ ঘটে ঠিক নেই আর বিপদের দিনে বন্ধু একমাত্র টাকা।'

'কী ছোটমন স্বার্থপর মেয়ে!' রি-রি করে উঠল মৃণালিনী।

'ঐ রকম একটা গুমোট ছোট ঘরে থাকতে হলে মন খোলসা হয় কী করে?' হেমেন উঠে পড়ল: 'ছাদে নতুন ঘর উঠলে ঐটে ওকে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে—'

'ছাদে কেন, মাঠে থাক না। মাঠেই তো বেশি ফাঁকা, বেশি খোলসা—' ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল মৃণালিনী।

দাঁড়িয়েই ধাক্কা খেল। দেখল দরজার পাশে দেয়ালে ভূপেন কান পেতে আছে।

'এ কী, তুমি এখানে, এ অবস্থায়?'

মুখ কাঁচুমাচু করে ভূপেন বললে, 'আমার তো কিছু বলবার অধিকার নেই, তাই কেবল শুনে যাচ্ছি।'

'তোমার বলবার কী-ই বা আছে !'

'বলতে গেলেই দাবড়ি খাচ্ছি। তাই কিছু বলছি না। শুধু শুনছি। গোচরে অগোচরে শুনছি। দেখছি আমার মনের কথাটি কেউ বলে কি না।'

'থাক। তোমার মনের কথা তো, কাউকে কিছু বলতে যেও না, যে যার খুশি চরে বেড়াক। এ জড়ভরতের মন নিয়ে সংসার করা চলে না। চোখের সামনে অন্যায়-অনাচার হবে অথচ চোখ বুজে থাকব, এ অসম্ভব। তুমি যাও—এক্ষুনি যাও—'

'যাচ্ছি। যাচ্ছি।' পায়ের চটিজুতো নিয়ে শশব্যস্ত হল ভূপেন।

'বাড়িওলার কাছে যাও। আমার মনের কথা গিয়ে সেখানে ব্যক্ত করো। বলো যেন তার নিজের খরচেই সে ঘর তোলে। যা ন্যায্য ভাড়া হয় তা আমরা দেব। আমরা দেব মানে, তুমি দেবে। আর সে ঘরে প্রশান্ত থাকবে।'

হেমেনের কাছে নীরব চোখে আশ্রয় চাইল ভূপেন।

হেমেন বললে, আচ্ছা, 'আমি দেখছি—'

দরজা খোলসা হতেই বিজয়া ডুকরে উঠল : 'ছাদের ঘরে তুমি তুলছ ছোট বউকে আর দিদি তুলছে বড় বউকে— আর আমি, আমি এ বাড়ির বউ নই, কেউ নই আমি—'

'তুমি হচ্ছ নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী—'

'কেউ নই, আমি কেউ নই।' দু হাতে মুখ ঢাকল বিজয়া।

'তুমি পাগল না আর কিছু !' খাটের দিকে এগুল হেমেন : 'বাড়িওলার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, নিজের খরচে ভাড়াটের জন্যে ঘর তুলে দেবে। যদি অনুমতি দেয়, আমরা, ভাড়াটেরাই তুলে নেব। সে ক্ষেত্রে, বলছি তোমাকে, আমিই অ্যাডভান্স করব সমস্ত টাকা। তা হলে সে ঘরে তোমারই অগ্রাধিকার হবে। তখন সে ঘরে তুমি নিজে থাকো বা তোমার মনের মত লোককে থাকতে দাও সে তোমার এক্তিয়ার—'

'মনে থাকে যেন।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বিজয়া।

কিন্তু কাকলির স্বস্তির নিশ্বাসটুকু চলে গেল যখন সন্ধ্যার শেষে আফিস-ফেরত তাকে সুবীর বললে, 'কে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—'

আমার সঙ্গে ! চমকে উঠল কাকলি। কে—কে হতে পারে ? দীপঙ্কর ? কী আর তার বক্তব্য থাকতে পারে ? তবে সমূহ কোনো বিপদে পড়েছে ? বন্ধুর বাড়িতে এসে বন্ধুকে না খুঁজে তার স্ত্রীকে খোঁজা ? বন্ধুর স্ত্রীকেই যদি তার দরকার তবে খোদ

বন্ধুর বাড়িতে কেন? কাকলির আফিস কি তার অজানা? না হয় টেলিফোন?

তবে কি বরেন? তার এমন কাঁচা মাথা? যেখানে কাকলিই যায় আগ বাড়িয়ে সেখানে তার কেন ব্যগ্র হওয়া? তবে কি দীপঙ্করের মাইনে বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে? এত অল্পেই রাজি হয়েছে? রাজি হয়েছে তো বাড়ি বয়ে এসে খবর দেবার কী দরকার? কী নগদ লাভ তাতে বরেনের?

না, বরেনও নয়।

'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

'সুবিধে নয়।' এক কথায় সারতে চাইল সুবীর। কিন্তু তাতে ছোট বউদিরও অসুবিধে ঘটাল মনে করে একটু বিস্তৃত হল: 'ময়লা শার্ট আর ফুল প্যাণ্ট পরনে, চুলগুলি উস্কখুস্ক, পায়ে জুতো আছে কি নেই লক্ষ্য করি নি—'

কে এই কিম্ভূত? তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল কাকলি।

সদরের কাছে, বাইরে ঝাপসা-ঝাপসা হলেও চিনতে এক পলক দেরি হল না।

'এই যে কাকলি। কেমন আছিস?' দেবনাথ এগুল এক পা।

প্রথম প্রশ্নটা কী করবে কাকলি ভেবে ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ কী মনে করে? নিজে এসেছ, না কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে? কেমন আছ সকলে? বাবা-মা? পত্রালি-দেবল?

একটা অকারণ কান্না গলার কাছে দলা পাকাতে লাগল।

'তোর সঙ্গে খুব একটা জরুরি কথা আছে।' কোথায় কথাটা বলা যায় চারদিকে ত্রস্ত চোখে তাকাতে লাগল দেবনাথ।

মন্দ কি। বাড়ির মধ্যে নিজের ঘরেই নিয়ে যাই। সুকান্ত এখনো ফেরে নি, আজকাল কাকলিকে অনেক সময় দিয়ে বেশ দেরি করেই ঘরে আসে। ফাঁকা খাটে পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করতে পারবে। যেন অনেক পথ হেঁটেছে, অনেক রাত্রি ঘুমোয় নি। একটা খিদে-পাওয়া শুকনো চেহারা। মন্দ কি যদি ভগলুকে দিয়ে কিছু খাবার আনানো যায়।

'এসো না, ভেতরে এসো—' ঘরে নিয়ে এল কাকলি। বললে, 'বোসো।'

'শোন, বসব না। যে কাজের জন্যে আসা তোর কাছে। আমাকে দু শো-টা টাকা দে।'

'টাকা?' কাকলি পাথর হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে তুই চাকরি করছিস আর তা বেশ ভালো মাইনের চাকরি। দু শো টাকা তোর কাছে কিছুই নয়। যার ভবিষ্যৎ আছে, তার

আবার টাকার জন্যে ভাবনা। বেশ যদি দু শো না পারিস, অন্তত এক শো দে। আজ রাত্রের মধ্যে যদি এক শো টাকা না পাই, তা হলে কাল সকালেই হাতকড়া পরব দেখিস। খবরের কাগজে বেরুবে অপযশ। সইতে পারবি নে। বাবার সেকেণ্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে, খবর পড়ে আরেকবার পড়বেন।

সেকেণ্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে! কেমন আছেন এখন? ভালো নয়। ডান হাতটা খসে গিয়েছে। পেনসনের পেমেণ্ট অর্ডার বা ব্যাঙ্কের চেক কিছুই সই করতে পারছেন না। টাকার সমূহ খুব টানাটানি যাচ্ছে। নিত্যি আর কত ধার চলবে? কেউ এমন নেই যে, টাকার একটা বিলি-ব্যবস্থা করে! আমাকে তো দেখছিসই, আর তুই, তোরা তো বিতাড়িত।

'এই অনটনের সময় এক শো-টা টাকা তুমি নষ্ট করবে? বাবার বোধ হয় ভালো চিকিৎসা-পথ্যও চলছে না—'

তা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাকে টাকাটা নষ্ট করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত বাবার প্রাণটুকুই না নষ্ট হয়। তুই বোন, তোকে বলতে পারব না, কিন্তু মুহূর্তের ভুলে যে অপরাধ করে ফেলেছি, খেসারত না দিলে তার থেকে আর ত্রাণ নেই। বেশি দেরি করিস নে। ওরা না আবার এর মধ্যে থানায় গিয়ে এত্তেলা দেয়।

'তোমার মাথার অসুখ এখন কেমন আছে?'

'ভালো আছে। দেখছিস না কেমন সুস্থ ও সংলগ্নভাবে কথা কইছি।'

কিন্তু মনে হচ্ছে টাকার জন্যে যে গল্প ফেঁদেছ সেটা সত্যি নয়। গল্প যদি ফাঁদতেই পারি, তবে প্রমাণ হচ্ছে, মাথা সুস্থ আছে। যদি তাই থাকে, সুস্থ মাথায় মিথ্যে সাজাব কেন? গল্প মিথ্যে হলেও টাকার দরকারটা মিথ্যে নয়। আর কোনোদিন চাইব না। খুব বিপদে না পড়লে চাইতাম না তোর কাছে। আমাকে টাকা দেওয়া মানেই হয়তো জলে ফেলা, কিন্তু ও টাকা জলে না ফেললে ডুবে মরব, ডাঙা পাব না।

'দিচ্ছি। আরেকটু বোসো। তোমাকে চা এনে দি। তারপর মায়ের কথা শুনি।'

'মায়ের কথা আরেকদিন শুনিস। এখন টাকাটা দে—'

একটা এটাচি কেস কিনেছে কাকলি। সেটা খুলে ভাঁজ-করা দশটা দশ টাকার নোট দিয়ে দিল দেবনাথকে।

দেবনাথ তক্ষুনি বেরিয়ে গেল। কি ভাবল, যেতে-যেতে, সিঁড়ির কাছে একটু থামল। দ্রুত আঙুলে গুনে নিল সত্যি টাকাটা এক শো কিনা।

বাক্স বন্ধ করে গুছিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাইরে এল কাকলি। দেবনাথকে আর ধরতে পেল না। পিছনে অনুম্রিয়মাণ একটা ছায়া অনুভব করে সে একবার শুধু বলল, 'আবার আসব', তারপর মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

'তোমার আফিসের কেউ বুঝি ?' মৃণালিনী কাছেই ছিল, তেরছা চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

এ আবার কিরকম প্রশ্ন! কাকলি চুপ করে রইল।

'আফিসের লোকের সঙ্গে তো আফিসেই দেখা হচ্ছে। তা আবার বাড়িতে কেন ?' আরো কী যেন বলতে চাচ্ছিল মৃণালিনী, প্রস্ফুট হল না।

'ও আমার দাদা।' বললে কাকলি।

'আজকাল তো হাটে-বাজারে দাদার ছড়াছড়ি। বলি কোন ধরনের দাদা ?'

গা জলে যাচ্ছিল কাকলির, তবু বললে সংযতস্বরে, 'মায়ের পেটের ভাই।'

'মায়ের পেটের ভাই!' হাঁ করল মৃণালিনী : 'তা এরকম চোহারা ?'

চুপ করে রইল কাকলি।

'টলছিল মনে হচ্ছিল। ঠিক করে পা ফেলতে পারছিল না সিঁড়িতে—'

চোখ তুলে তাকাল কাকলি : 'দাদার শরীরটা ভালো নয়।'

'কী নিয়ে গেল ?'

'টাকা।'

'টাকা!' যেন শক্তিশেলে টঙ্কার পড়ল : 'কত নিল ?'

এও আবার জিজ্ঞাস্য নাকি ? দোনামনা করতে লাগল কাকলি।

'বলি, দিলে কত ?'

'এক শো।'

'অ্যাক শো! এত টাকা হঠাৎ দরকার পড়ল দাদার ?'

'বাবার খুব অসুখ।'

'তা তোমার বাবার কি টাকার অভাব হয়েছে ? ব্যাঙ্কেই তো তার কত টাকা। তুমিই তো দশ হাজার টাকা তাকে দান করে এলে। আবার সে টাকা চায় কোন মুখে ?'

'স্ট্রোক হয়ে পড়ে গিয়েছেন। ডান হাত অবশ হয়ে গিয়েছে।' কণ্ঠস্বর ভিজে এল কাকলির : 'চেক সই করতে পারছেন না।'

'তা হলে যদ্দিন সই করতে না পারেন মাস-মাস এমনি পাঠাবে নাকি বাপের বাড়ি ?'

'কি করে বলি!' কাকলি পাশ কাটাতে চাইল।

'কি করে বলি মানে? তুমি চাকরি করছ তোমার বাপের বাড়ির জন্যে?

কষ্টে একটু হাসবার চেষ্টা করল কাকলি। বললে, 'ছেলেরা যে চাকরি করে কার জন্যে? তার বাপের বাড়ির জন্যেই করে। শ্বশুরবাড়ির জন্যে নয়। মেয়েদের বেলায় অন্য নিয়ম হবে কেন? স্বাধীন ভারতে তারতম্যকরণ চলবে না। মেয়েরাও তাই বাপের বাড়িরই করবে, শ্বশুরবাড়ির নয়।'

'ছেলে আর মেয়ে এক কথা হল?' খিঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী: 'ছেলে রোজগার করে তার বাপের বাড়িতে থেকে আর মেয়ে, তুমি—তুমি রোজগার করছ তোমার শ্বশুরবাড়িতে থেকে। যেখানে থেকে রোজগার, সে সংসারেরই অধিকার সে রোজগারে।'

'থাকার কথাটা অবান্তর। আপনার ছেলে যদি আজ আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত তা হলেও তার টাকাটা বাপের বাড়িই দাবি করত। ছেলের টাকা যদি তার বাপ-মা নিতে পারে মেয়ের টাকাই বা তার বাপ-মা নিতে পারবে না কেন?'

'তোমার বাপ-মা তো তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—'

গলার কাছে একটা দলা উঠেছিল, সেটা গিলে ফেলল কাকলি। বললে, 'কিন্তু রক্তের সম্পর্ক কি তাড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'তোমার বাপ-মায়ের যদি জেদ থাকে, তুমি তাদের মেয়ে, তোমারই বা জেদ থাকবে না কেন?'

কাকলি মৃদু রেখায় হাসল। বললে, 'কিন্তু শত হলেও, বাপ-মা যদি দুরবস্থায় পড়ে তা হলে মেয়ে তাদের সাহায্য করবে না?'

'তোমার বাপ-মায়ের এমন কিছু দুরবস্থা হয় নি।'

'তেমনি আমার শ্বশুরবাড়িরও তেমন কিছু অভাব নেই।'

'নেই? তুমি যদি চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকো তার কী করব? ঘরেঘরে দোরে-জানলায় পর্দা নেই, খাবার জায়গায় ফ্যান নেই, নিজস্ব একটা আমার রেডিও হল না। অনুরোধের আসরটা শুনতে পাই না, উকিলের বাড়ি একটা টেলিফোন নেই, আজকাল সভায়-সমিতিতে কাউকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে চাল করে ফোন-নম্বর বলে, আমার আর সে ভাগ্য হল না, ঠিকানা বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল! চতুর্দিকে আত্মীয়স্বজনের কত ফোন আর আমার সেই আদ্যিকালের গ্রামোফোন! তারপর একটা রেফ্রিজিরেটার কেনার শখ—তারপর মোটর গাড়ি—সে তো চ্যাটায়ে- শোয়া স্বপ্ন।'

পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে যেতে চাইল কাকলি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে মৃণালিনী বললে, 'তা হলে তুমি পরের জন্যে, বাপের বাড়ির জন্যে চাকরি করছ ?'

থামল কাকলি। বললে, 'রাগ করবেন না, আমি চাকরি করতে চাই নি, আপনারাই আমাকে উদ্ব্যস্ত করে-করে চাকরি করতে পাঠিয়েছেন। আমি আগেই বুঝেছিলাম চাকরি ডেকে আনা মানে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা। আমি চাই নি খাল কাটতে। আপনারা—'

'তাই বলে তুমি মাইনের টাকা তছনছ করবে? টাকা এ সংসারে থাকবে না, যাবে অদানে-অব্রাহ্মণে ?'

'চাকরি আমার। মাইনেটাও আমার।' আরো দু সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল, আবার থামল কাকলি। বললে, 'তাই আমি বুঝব টাকাটা কোথায় থাকবে বা কোথায় যাবে। থাকলেই বা কতটা থাকবে, গেলেই বা কতটা যাবে। উড়িয়ে পুড়িয়ে দেব, না দান খয়রাত করব তারও বুঝ আমার আর আমার টাকার।'

'তাই যদি হয়, তা হলে এ চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, বউমা। তোমাকে আর করতে হবে না চাকরি।'

'তা আর হয় না।' বাকি সিঁড়িগুলি পেরিয়ে গেল কাকলি।

'আর যদি করতেই হয়, এ বাড়িতে বসে হবে না। বাড়ির বাইরে গিয়ে করো।'

এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল কাকলি। বলল, 'তা দেখা যাবে।'

বাড়িতে পুরুষেরা ফিরলে তুমুল করল মৃণালিনী! মাইনের টাকা, ঘরের টাকা কিনা বাপের বাড়ি পাচার করে দিচ্ছে। বাপের বাড়ির জন্যেই নাকি চাকরি করা। বাপের হাত না সারা পর্যন্ত মাস-মাস নাকি অমনি পাচার করবে।

'অসহ্য !' হেমেন বললে, 'আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। এ প্রিপশচারাস !'

'আমি বলে দিয়েছি চাকরি ছেড়ে দাও। করতে হবে না চাকরি। ঝাঁকের কই ঝাঁকে এসে মেশো।'

'অ্যাবসার্ড। সেই ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল বাঘের বাচ্চা, ঘাস খেত আর ভ্যা-ভ্যা করত—যেই একদিন মাংস খেল, রক্তের স্বাদ পেল, জলে নিজের হাঁড়িমুখ দেখল, আর ফিরল না ঘাসখেকোদের দলে, বনে চলে গেল।'

'আমিও তাই তাকে বনে চলে যেতেই বলেছি।' বীরদর্পে বললে মৃণালিনী, 'বলেছি অমন চাকরি করতে হয় বাড়ির বাইরে বসে করো।'

এটা যেন চূড়ান্ত হয়েছে, সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, নতুন বন্ধুতা হয়েছে, বিজয়া এল দিদির সমর্থনে। বললে, 'এ আর আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না, রক্তের টানে, মাংসের টানে নিজেই বেরিয়ে যাবে একদিন।'

'হ্যাঁ, টাকাই শক্তির রক্তমাংস।' হেমেন দার্শনিক হল।

সুকান্ত একটু বা ভয় করছিল কাকলি বুঝি মায়ের শেষ কথাটা নিয়ে তোলপাড় করবে, কিন্তু ধার-কাছ দিয়েও গেল না। যেমন আজকাল বেশির ভাগ সময়, বিশেষ এই মুখোমুখি হবার সময়, সে চুপ করে থাকে তেমনি চুপ করে রইল। মেঝেতে পাততে লাগল বিছানা।

সুকান্তই খোঁচা মারল। বললে, 'মা যে তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন তা শুনেছ?'

'শুনেছি।' কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল কাকলি: 'বাপের বাড়ি তাড়িয়েছে, শ্বশুরবাড়ি তাড়াবে এ আর বিচিত্র কী। কিন্তু মা শুধু একলা বললে চলবে কেন?'

'তার মানে?'

'তার মানে মায়ের বরপুত্রকেও বলতে হবে। তুমি যেদিন বলবে সেদিন চলে যাব।'

'কেন, বাবার বলতে লাগবে না? যিনি এ বাড়ির মালিক, যার নামে টেনান্সি—'

'না। শ্বশুরবাড়িতে রাক্ষস-খোক্কস শুধু দু-জন। স্বামী আর শাশুড়ি। যারা চাকরি করতে পাঠাবে অথচ মাইনের ওপরে স্বাধীনতা দেবে না। নাচতে নামাবে অথচ দড়ি ধরে থাকবে।'

'তাই তো করে। দেখ নি বাঁদরনাচ? বাঁদরে নাচে কিন্তু নাচওয়ালার মুঠোতে দড়ি ধরা।'

'দেখেছি। আর রোজগারটা যে নাচে তার নয়, যে নাচায় তার। ওর বাঁদর নাচিয়ে রোজগার, তোমার বউ নাচিয়ে রোজগার।'

'বেশ, এখন তুমি না সরো, তোমার এই বাক্সটা তো সরাবে?'

'আই অ্যাম সরি! তাড়াতাড়িতে তখন ওটা রেখে গেছি তোমার টেবলে।' নিজের মনে কাজই করতে লাগল কাকলি: 'জানি, ওটার ওপর তোমার ভীষণ রাগ।'

'শুধু ওটার উপরে নয়, জগৎসংসারের উপরে। কি, সরালে?'

'সরাচ্ছি। হাতের কাজটা আগে সারি—'

'না, আগে সরাও। না সরাবে তো ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।'

'ওরে বাবা, ওটার মধ্যে আমার টাকা, আমার ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবই—' ছুটে গিয়ে বাক্সটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল কাকলি : 'তার চেয়ে তোমার জগৎসংসারকে ছুঁড়ে ফেলো।'

'তুমি এরই মধ্যে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টও খুলে ফেলেছ নাকি ?'

'স্বভুজবীযে উপার্জন করছি, কেন খুলব না ?' বাক্সটা সরকারি জায়গা খাটের নিচে চালান করে দিলে কাকলি। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তবু তো এখনো—কী জানি কথাটা—তবু তো এখনো তেল মাখি নি।'

'তার মানে ?'

'তবু তো এখনো একখানা গয়নার অর্ডার দিই নি।'

'তারপর ঐ কাঠামোর উপর আবার গয়না চাপাবে নাকি ?'

'এখন তো কাঠামোই ঠেকবে। তবু দু-একখানা ঠেকিয়ে দেখই না ঝকমক করে কিনা। দিয়েছ ? দেবার মুরোদ আছে ? নিজের কিছু জোগাড় নেই, পরের জন্যে বেগার খাটো। নিজের কানে সোনা নেই, পরের কানে টেলিফোন। নিজের বলতে একখানা ঘর নেই, পরের জন্যে রেফ্রিজিরেটর। আমার ভাতে নুন না জুটুক ওরা ঘি খাবেন।'

'তোমার তেজ খুব বেড়েছে।' চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসল সুকান্ত।

'তা তেজের দোষ কী ! তখনই বলেছিলাম প্রদীপের আগুনকে মশালের আগুন কোরো না। নাড়াবুনে আছি ডেকো না কীত্তুনে হতে। এখন তো কীর্তনের শুরু। চাকরির গোড়া। তারপর ভরা কীত্তনে খোল ফাটবে, খঞ্জনী ভাঙবে, ধুলট উড়বে। ভরা চাকরিতেও কোনো দিশপাশ থাকবে না। কীত্তুনের মুখে এক বুলি হরেকৃষ্ণ, চাকুরের মুখেও এক বুলি, উন্নতি আর উন্নতি আর উন্নতি।'

'তুমি ভাবছ স্পর্ধায় বা কৃতিত্বে কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না কোনো দিন—'

'যারা জীবনে এক প্রবন্ধ লিখেই বিদগ্ধ অন্তত তাদের কেউ নয়।' নিচে টাঙানো মশারির মধ্যে প্রবেশ করল কাকলি। বললে, 'তোমার জগৎসংসার যখন এখনো নিটুট আছে, তখন আমি উদ্বাস্তর মত কী করে আর ফুটপাতে শুই। শুই হর্ম্যতলে।'

সেদিন আবার নতুন রূপ ধরল কাকলি।

আফিসে বেরুবার আগেই, ঘরের মধ্যে, সুকান্তর সামনে, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকল।

'এ আবার কী অভিনয় !' ব্যঙ্গের সুর আনল সুকান্ত।

'কাল আফিসে চাউর করে দিয়েছি ঝট করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চাকুরি-মেয়ে তো শাঁসালো ক্যাপিটাল। ও কি আর না-খাটানো থাকে? সবাই বলছে, নেমন্তন্ন কই? গাছতলায় বসে চাঁদ সাক্ষী করে বিয়ে, তার আবার নেমন্তন্ন। পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি। নেমন্তন্ন ইত্যাদি সামাজিক কাজ এড়াবার জন্যেই তো রেজেস্ট্রি বিয়ে। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হবে?'

'তোমার কৌমার্যের মোচন হলে তোমার চাকরির ক্ষতি হবে না?'

'এখন তো ঘাটে পৌঁছেই গিয়েছি, নৌকো এখন থাকল আর গেল।' কাকলি নিজের মুখ আয়নায় অনেকক্ষণ দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। বললে, 'বিবাহ দ্বারা কৌমার্যমোচন দুর্নীতি নয়। বরং উলটো, উন্নতির সহায়। কি, কেমন লাগছে কাঠামোকে? রানী-রানী লাগছে?'

'আমার লাগলেই বা কী, না লাগলেই বা কী—'

'হ্যাঁ, পাঁচজনের লাগা নিয়ে কথা। শোনো, আমি অভিনয় করছি—'

'চিরকালই তো করেছ।'

'সেটা তো একটা গেঁয়ো বোকা মেয়ের অভিনয় করেছিলাম। এবার করছি রানীর অভিনয়। স্টেজে রানী সাজছি আমি।'

'স্টেজে?' সর্বশরীরে আড়ষ্ট হয়ে রইল সুকান্ত।

'এখুনি কাঠ হয়ে যাবার কী হল! আমাদের আফিসে আমাদের ডিপার্টমেণ্টে সংস্কৃতি আছে। সব আফিসে সব ডিপার্টমেণ্টেই আছে, ছেয়ে আছে। আর সংস্কৃতি মানেই নাটক। আর নাটক মানেই কুশীলবদের দহরম-মহরম। রিহার্সেলের হুল্লোড়। কিন্তু উপায় নেই।'

'উপায় নেই?'

'দেখি না তো। উন্নতি করতে হবে চাকরিতে। উন্নতি করতে হলে রানী সাজা অত্যাবশ্যক।'

'আর রাজা কে?'

'আমার আফিসের এক কর্তা। তাই তাক বুঝে বিয়েটা স্থাপিত করলাম।'

'তাকে বিমর্ষ করলে বোধ হয়।'

'কে জানে, হয়তো বা নিশ্চিন্ত করলাম।'

'তোমার মত আফিসের আর সব মেয়েই কি এমনি উন্নতি করছে?'

'সব মেয়েরই কি রানী হবার চেহারা?'

'তবে আর সব মেয়ের পার্ট কে করছে ?'

'ঐ যে আছে একদল গৃহস্থ মেয়ে, টাকা নিয়ে ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করে বেড়ায়, তারা।'

'গেরস্থ না হাফ-গেরস্থ ।'

'সে খোঁজে আমার কী দরকার ? আমি যা বলছি—'

'তুমি ওসব বর্ডার-লাইনের মেয়েদের সঙ্গে প্লে করবে ? মিশবে ? চলাফেরা করবে ?'

'কে কোন লাইনে, বর্ডারে না সেণ্টারে, তাতে আমার কী মাথাব্যথা ! আমি রানী সাজতে এসেছি রানী সেজে যাব।'

'তার মানে তুমিও তোমার আফিস-বসের হাত ধরে বর্ডার-লাইনে এসে দাঁড়াবে।'

'দাঁড়াই তো দাঁড়াব। শোনো যা বলছি, আফিস-টাইমের পর রিহার্সেল, তাই বাড়ি ফিরতে রাত হবে ! বেশি ব্যস্ত হোয়ো না', ব্যঙ্গ ঢালল কাকলি : 'থানা হাসপাতাল কোরো না।'

'এবার তো খোঁজবার ক্ষেত্র বেড়ে যাবে। বসের রুমস, হোটেল, ময়দান—'

'যাই বলো আমি চটছি না। যে সংস্কৃতিমান সে ঝগড়া করে না, সীন করে না—'

'সে বেনের দোকানে মেকি চালায়।'

'কী চালায় জানি না ! কিন্তু উপায় নেই, কিছু একটা চালাতেই হবে। সংস্কৃতির উন্নতিতেই চাকরির উন্নতি—'

'তুমি করো উন্নতি। আর উন্নতির ঠেলায় বর্ডার-লাইন ক্রস করে যাও। গণ্ডি পেরিয়ে চলে যাও লঙ্কায়। আর তা হলে, ফিরে এসো না।'

'আসব না।' ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে গেল কাকলি।

৩৩

'কী, ফিরে এলে ?' রাত করে বাড়ি ফিরলে, কাকলিকে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'এখনো তো গণ্ডি পেরোই নি।'

'পেরিয়েছ কি না-পেরিয়েছ তার বিচার করবে কে ? তুমি ?' সুকান্ত মুখিয়ে উঠল।

'তবে কি তুমি ?' পালটা নিক্ষিপ্ত হল কাকলি।

'বেশ, তুমি আমি কেউ নই, বিচারক সমাজ।' নাটুকেভাবে বললে সুকান্ত।

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : 'যেমন বিচারক গাঁয়ের পঞ্চায়েত। একজন তার প্রতিবেশীর পাঁঠা কেটেছে, প্রতিবেশীর অভিযোগে গ্রাম্য পঞ্চায়েত লোকটাকে ধরে ৩০২ ধারায় চার্জ করেছে, ফর মার্ডারিং এ গোট। কাটা পাঁঠাটাকে পাঠিয়েছে হাসপাতালে, পোস্ট মর্টেম করতে। তেমনি ধারা বিচার আর কী! জনতার বিচার! আর একতাল অন্ধ মূর্খতার নামই জনতা।'

'সমাজ মূর্খ ?' গলায় ঠিক-ঠিক স্বর ফুটছে না তবু জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'যে সমাজ ছেলেধরা সন্দেহ করে ভিখিরিকে পিটিয়ে মারে, দৈবাৎ রাস্তায় চাপা দিলে যে সমাজ গাড়িটাকে পুড়িয়ে দেয়, শুধু চাপা-দেওয়া গাড়িটাকে নয়, পিছনের নিরীহ গাড়িটাকেও—যে সমাজ পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন এলে চেয়ার-টেবল ওলটায় জলের কুঁজো জানলার কাঁচ ভাঙে, যারা ভীরু নয় যারা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে, তাদের খাতা ছেঁড়ে, গার্ডদের মাথা ফাটায়, তাদের তুমি অভিনন্দন করবে ?'

'না। সমাজ তাদের সমর্থন করে না। তারা অপকর্মী। সমাজের বিচারে তারা নিন্দনীয়।'

'সে সমাজ কোথায় ? রাখো।' দ্বিতীয় চেয়ার হয়েছে ঘরে—কাকলিই কিনেছে—সেটা জানলার কাছে টেনে নিয়ে বসল কাকলি : 'যে সমাজ ঘুমোয় তার আবার বিচার কী! সে অন্ধ আর মুর্খ না হোক, সে ক্লীব। ক্লীবত্ব আরো জঘন্য। যাদের অপকর্মী বলছ, তাদেরও মস্ত সমাজ। আর তাদের ধারণায় তাদের বিচারই ঠিক। তারা যা করছে, সেইটেই করণীয়। সুতরাং গণ্ডির রেখা টানবে কে ? কে ঠিক-ঠিক মাপ-জরিপ করে দাগ দিয়ে বলবে, ঢেউ এই পর্যন্ত, আর নয়!' চেয়ারটা ঘোরাল সুকান্ত 'তা হলে তোমার মতে চরম বিচারক কেউ নেই ?'

'না। কেউ নেই।' জোর দিয়ে বললে কাকলি। পরমুহূর্তে হেলান দেবার ভঙ্গিতে ক্লান্ত শরীরে একটু নম্রতা এনে বললে, 'বলতে পারতাম বিবেক চরম বিচারক। কিন্তু আমার বিবেক আর তোমার বিবেকে মিল হবে না। স্ট্যালিনের কাছে হিটলার পাজি, হিটলারের কাছে স্ট্যালিন। চার্চিলের বিচারে গান্ধী আধ-ন্যাংটা ফকির, আর আমাদের বিচারে, ভারতবাসীর বিচারে ? আমাদের বিচারে গান্ধী সমস্ত পৃথিবীর রাজা—রাখালরাজা। তাই দয়া করে চরম বিচারের কথা বোলো না। সব খামখেয়াল।'

'খামখেয়াল ?'

'অন্তত নির্দিষ্ট করে চেয়ো না গভীর রেখা টানতে। যে প্রকাণ্ড, তার গণ্ডিও প্রকাণ্ড। তাই, দেখতে পাচ্ছ না,' হাসল কাকলি : 'মানুষ ছোট বলে তার বেলায় যা পাপ, দেবতারা প্রকাণ্ড বলে তাদের বেলায় তা লীলাখেলা।'

'তুমিও বুঝি তেমনি কলির দেবতা হয়ে উঠছ! চালিয়েছ লীলাখেলা?'

'যদি চালিয়ে থাকি,' ব্যঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল কাকলি : 'উইথ ইয়োর পারমিশন স্যর, উইথ ইয়োর কনাইভেন্স। তুমি আর সমাজের হয়ে মোক্তারি করতে এসো না। তোমার সমাজ বারে-বারে মেয়েদের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমেই লিখতে পড়তে বললে, পর্দা ঘোচালে; বাড়িয়ে দিলে বিয়ের বয়েস। বললে, ঐটুকু পড়ায় কী হবে, কলেজে এসো, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। বাড়িয়ে দিল এলেকা। ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারি, ব্যারিস্টারি—কী, দেয় নি বাড়িয়ে? ডেকে নিয়ে আসেনি বিজ্ঞানের ল্যাবরেট্যারিতে, খেলার মাঠে, সভামঞ্চে,পার্লামেণ্টে—রাজাসনে? কোথায় গণ্ডি? বলে নি, পাইলট হও সমুদ্র পার হও সাঁতরে, প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দাও অন্ধকারে? গণ্ডি নেই, গণ্ডি মুছে গিয়েছে।'

'না। যায় নি।' সরোষে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত : 'কোথাও না কোথাও আছে তার শেষ রেখা?'

'আছে?

'হ্যাঁ, আছে। দি লিমিট। উটের পিঠে শেষ খড়।'

'কী সেটা?'

'বলব?' দৃষ্টি ধারালো করল সুকান্ত।

'শুনতেই তো চাচ্ছি।'

'সেটা হচ্ছে শারীরিক শুচিতা। সমস্ত প্রগতির সেইটে অন্তত শেষ সীমা। যে সীমা অমান্য করা যায় না, ইহজীবনে যা আর লঙ্ঘন করবার নয়। কী, মানো?'

'হয়তো মানি। কিন্তু সেখানেও কথা থাকবে। শুচিতার রেখাটারই বা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ সে বিচারও তর্কের ব্যাপার। আর শোনো,' উঠে দাঁড়াল কাকলি : 'আইন আজ মেয়েদের শুধু সম্পত্তিতেই অংশ দেয় নি, বিয়ে খণ্ডে দেবারও স্বত্ব দিয়েছে। শুধু রেজেস্ট্রি করা বিয়ে নয়, মন্ত্র-পড়া আগুন-সাক্ষী-রাখা বিয়ে। আর বিয়ের বিচ্ছেদের পর দিয়েছে আবার তাকে বিয়ে করার অধিকার। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ যে অশুচিতা এক বিয়ের উপসংহার তাই আবার আরেক বিয়ের ভূমিকা। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে, আইনই গণ্ডি, দি টার্মিন্যাল পয়েণ্ট। যতক্ষণ না আইন ভাঙছি ততক্ষণ তাই আছি গণ্ডির মধ্যে।'

'কে থাকতে বলছে ? ভাঙো আইন। ভিঙোও গণ্ডি। তারপর রসকষওয়ালা শাঁসালো কোনো আফিসবাবুর কণ্ঠলগ্ন হও গে।' সুকান্ত দাউ-দাউ করে উঠল।

'কী আকাট আহাম্মকের মত কথা!' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল কাকলি: 'একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন হচ্ছে, তার মধ্যে যত ছোট মনের নোংরামি। ইতর, স্টুপিড কোথাকার—'

আর দাঁড়াল না কাকলি। নিচে নেমে গেল।

নিচেটা প্রায় খালি। বাড়ির সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরে গিয়ে শামিল হয়েছে এরই মধ্যে। ঠাকুর-চাকরদের খেয়ে নিতে হুকুম দিয়ে দিয়েছিল মৃণালিনী, কিন্তু কী মনে করে তারা তখনো গড়িমসি করছিল। ছোট বউমা বাড়িতে যখন পৌঁছে গিয়েছেন, তখন তার আগেই নিজেরা খায় কি করে?

'আমার ভাত তো টেবলের উপর ঐ ঢাকা আছে—'

'হ্যাঁ, মা-ই বেড়ে ঢেকে রেখেছেন।' বললে ঠাকুর।

'তবে তোমরা বসে পড়ো গে। আমি স্নান সেরে পরে খাব। আমার জন্যে কারু অপেক্ষা করতে হবে না।'

উপরের বাথরুমটা কে যেন অতিরিক্ত সময় আটকে রেখেছে, হয়তো বা তাকেই জব্দ করবার জন্যে। নিচেরটা হেমেনের ভয়েই হয়তো যুগপৎ আক্রান্ত হতে পারে নি। নিচেরটা খোলা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কাকলি।

স্নান সেরে খেতে বসল। কেউ ধারে কাছে দাঁড়িয়ে নেই, জেগে নেই। জয়ন্ত পড়ছে দেখে এসেছে। তাকেও একবার কেউ নামতে বলল না। রাত আর এখন এমন বেশি কি! দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

ঢাকাটা তুলল কাকলি। থালাতে এলানো কটা ভাত, শিয়রে নুন, পাশে ন্যাতনেতে দুখানা কুমড়ো ভাজা। একটা বাটিতে ট্যালটেলে ডাল, আরেকটাতে ফিনফিনে ঝোল তাতে এক টুকরো লিকলিকে মাছ। তৃতীয় বাটিতে এক হাতা জোলো দুধ, আঙুল ডুবিয়ে দেখল একটা সরুঙ্গে কলা পর্যন্ত নেই, জিভে ঠেকিয়ে দেখল, না বা এক ফোঁটা চিনি।

কোনোরকমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেয়ে টোপ ঢাকা দিয়ে উঠে পড়ল কাকলি।

রিহার্সেল যেদিন থাকে, সেদিনই দেরি হয় ফিরতে।

সেদিন ফিরে দেখল ঠাকুর-চাকরও অনুপস্থিত। রান্নাঘরের পাট তোলা।

কাকলি আর টোপ তুলল না। সোজা উঠে গেল উপরে।

সকালবেলায় প্রথমেই আবিষ্কার করল মৃণালিনী। নিচে সুকান্ত মুখ ধুতে এসে-

ছিল, তাকে শুনিয়ে বললে, 'রাত্রে যে খাবে না তা আগে থেকে বলে গেলেই তো পারে। গৃহস্থ বাড়ির ভাতডাল শুধু শুধু নষ্ট করবার কী দরকার।'

সেই ঝগড়া উপরে নিয়ে গেল সুকান্ত।

'ভাতডাল নষ্ট করার দরকার কী! খাবে না তা আগে বলে গেলেই তো পারো।'

'তুমিও তো কতদিন বাড়িতে ফিরে বলো, খাব না। তখন তো ভাতডাল নষ্ট হতে দেখি না।' পালটা কথা শোনাল কাকলি।

'আমি যে খাই না তা হঠাৎ শরীর খারাপ হয় বলে—'

'তেমনি আমার শরীরও তো খারাপ হতে পারে।'

'তোমার শরীর খারাপ? কই, লক্ষণ তো কিছু দেখি না।'

'মনের থেকে রুচি চলে যাওয়াও শরীর খারাপ হওয়া।'

'তবে তো আগে থেকেই বলে যাওয়া যায় এ বাড়ির খাওয়াতে আমার রুচি নেই। তা হলে দু মুঠো আহার্য বাঁচে গৃহস্থের।'

'গৃহস্থের অনেক কিছুই বাঁচবে।' কাকলি চোখ বেঁকাল: 'কিন্তু এক বেলা খাই নি কি না, তা নিয়ে তুমি কথা বলতে আসো কেন? মা নিজে বলতে পারেন না? মুখোমুখি নিতে পারেন না কৈফিয়ত?'

'তোমার সামনে এগোবে এমন সাহস কী! তুমি এখন ফার্মের একজন অফিসার।' রাঙ্গ ঝরাল সুকান্ত: 'তারপর চুড়োর উপর ময়ূরপুচ্ছ, চাকরির উপর সংস্কৃতি ধরেছ।'

'কী আশ্চর্য, তোমার কিছুই ধরতে হয় না।' কাকলি উতোর দিল: 'তুমি নিজেই পুচ্ছধর।'

সেদিন আফিস যাবার মুখে কাকলি মৃণালিনীর উদ্দেশে ফেলে দিল কথাটা: 'আজ আমার জন্যে ভাত রাখতে হবে না। খাব না বাড়িতে।'

এবং এমনি একদিন নয়, একাধিক দিন।

আবার এই নিয়ে অশান্তি।

'তোর বউ যে রাত্রে প্রায়ই খায় না, এর মানে কী?' মৃণালিনী আবার সুকান্তের এজলাসে হাজির হল।

তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে সুকান্ত। অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'মানেটা কী তা তুমি নিজে বউকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। আমাকে জ্বালাতন করো কেন?'

মৃণালিনী স্তম্ভিত হবার ভাব করল: 'তুই স্বামী, পুরুষ, তুই অনাচারী বউকে শায়েস্তা করবি নে? বসে বসে শুধু লেজ নাড়বি?'

'আমাকে কী করতে বলো?'

'যার বাইরে রাত্রের খাওয়া জোটে, তার বাইরে রাত্রের শোওয়াও জুটবে। বলতে পারিস নে মুখের উপর ? রাতের প্রায় আদ্ধেক যে খেয়ে বেড়িয়ে বাইরে কাটাতে পারে, তার আর বাড়িতে ফেরা কেন ? পারিস না বলতে ? মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারিস নে ?'

'ও-ই বা কী করবে ?' অলক্ষ্যে কাকলির পক্ষ নিয়ে বসল সুকান্ত : 'থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে গিয়ে রাত হয়ে যায়। আফিসের সংস্কৃতি তো, তাই নাটক পঞ্চাঙ্ক। অনেক লোককে প্রোভাইড করতে হবে বলে অনেক চরিত্রওলা ঘটোৎকচ বই। আর ওর পার্ট লাস্ট সিন পর্যন্ত—'

'সেই লাস্ট সিনটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাক। এক্ষুনি-এক্ষুনি।'

সুকান্ত চুপ করে রইল।

'আমরা বউকে চাকরি করতেই পাঠিয়েছিলাম, থিয়েটার করতে নয়।'

কথা কইল না সুকান্ত।

'আবার থিয়েটার থেকে সার্কাসে যায়, না সিনেমায় যায় তার ঠিক কী ! আঙুল ফুলে কলা গাছ বরং সহ্য হয়, এ আঙুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ।'

সুকান্ত তবু নির্বিবাদ।

'এ বউকে দিয়ে আমাদের সুরাহাটা কী হল ? না ঘরে না ঘাটে কোনো কাজে লাগল না। মাইনের টাকা বাপের বাড়ি পাঠাল।'

'কেন, মাঝে মাঝে তো এদিকেও খরচ করে।' না বলে পারল না সুকান্ত : 'খাবার টেবলটা কিনে দিল, তোমাকে নেটের মশারি—'

'যেন বকশিশ দিল সংসারকে। কেন এক থোকে সব টাকা তুলে দেবে না ? আমাকে না দিক, তোকে, স্বামীকে ? তুই সুবিধে করে দিয়েছিস বলেই তো ওর এত স্বাধীনতা। কিন্তু তোকেই বা কী মান্যটা করে শুনি ? এমন একটা ভাব দেখায় উনিই আকাশে-ওড়া পাখি আর তুই একটা কীটপতঙ্গ।'

নিশ্চল নিস্পন্দ সুকান্ত।

'বাইরে খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে শোয়ার ঠাট বজায় রাখতে বাড়ি ফেরে কিসের ঠাট-বজায় ? চাকরিকে সমর্থন করবি বলে কদাচারকে প্রশ্রয় দিবি ? কক্‌খনো না। যে বানের জল থেকে তুলে এনেছিস সেই বানের জলে ভাসিয়ে দে।'

চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরল মৃণালিনী। বললে, 'অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে। বউ এখন বেশি-আগুন হতে চলেছে। সংসার পুড়িয়ে

়কেবারে ছারখার করে দেবে। হাতের থাবড়াতে নিববে না আর, জল ঢেলে নবাতে হবে।' ঢোঁক গিলল মৃণালিনী : 'আর সে জল চোখের জল।'

সেদিন, রাত্রে সদর বন্ধ করতে গেল সুকান্ত।

'এ কি, এখুনি বন্ধ করছিস ?' জিজ্ঞেস করল হেমেন : 'ছোট বউমা ফিরেছে ?'

'না।'

'তবে এখুনি এত তৎপর ?'

'আজ ফিরবে না।'

'যাবে কোথায় ?'

'কী জানি কোথায় যাবে।' নিজেই এখন কোথায় যায় সুকান্ত পথ খুঁজতে াগল।

'কেন, ঠিকানা জেনে রাখিস নি ?'

'যে রাত করে বাড়ি ফেরে তার ফেরা না-ফেরা সমান।' উপরে পালিয়ে গেল ুকান্ত।

'যে চোরকে চুরি করতে বলে নিজে গৃহস্থ সাজে সে চোরের চেয়েও বেশি।' হমেন নিষ্ঠুরের মত বললে, 'সে বাটপাড়। আর চোরের ধনের দিকেই বাটপাড়ের জর।'

খানিক পরেই কড়া নাড়ল কাকলি।

হেমেন দরজা খুলে দিল। বললে, 'আর কদ্দিন চলবে রিহার্সেল ?'

'আজ স্টেজ রিহার্সেল হয়ে গেল। তাই', কুণ্ঠিত মুখ করল কাকলি, 'তাই বেশ একটু দেরি হল আজ—'

'তা হোক। আসল প্লে কবে ?'

'এই শুক্রবার হয়তো।'

'যাক, ঝামেলা যাবে তা হলে। খাটনির খাটনি—চেহারা কাহিল হয়ে গেল।' রের মধ্যে তাকিয়ে দেখল বিছানা পাওয়া মাত্রই বিজয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গলা ামিয়ে বললে, 'আর, থিয়েটারের পাশ এনো না এ বাড়ির জন্যে। কোন দৃশ্যে ক কী দেখবে আর দপদপ করবে বলা যায় না। আরো শোনো।' হাসিমুখে াকলি ফিরে দাঁড়াতে বললে, 'যদি দেখ, তোমার উপরের ঘরের দরজা বন্ধ করে য়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে দরজা খুলে দিচ্ছে না, তা হলে যেন দরজার াইরে আসন পেড়ে বসে থেকো না শবরীর মত, টুক করে এসে আমাকে একটু বর দিও—'

লজ্জায় মরে গেল কাকলি। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে, 'না, খুলে দেবে—' বলেই ছুট দিল উপরে।'

'তুমি তো জানতাম এ বাড়ির এক্সটার্ন্যাল অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার, তুমি ওদের ইনটার্ন্যাল ব্যাপারে নাক ঢোকাচ্ছ কেন?' শোয়া বিজয়া কুণ্ডলীর ভিতরে থেকেই ফোঁস করে উঠল।

'ও। তুমি ঘুমন্ত নয়? তুমি ঘুমজাগন্ত।' হেসে উঠল হেমেন। ঘরে ঢুকে বললে, 'যদি ভেতরে জায়গা পায়, তা হলে আর আমার জুরিসডিকশান নেই, সেখানে মারামারি-কাটাকাটি যাই হোক গে। কিন্তু যদি ঘরের বাইরে, দরজার বাইরে বসিয়ে রাখে, তা হলে ব্যাপারটা এক্সটার্ন্যাল অ্যাফেয়ার্সের। সে ক্ষেত্রে সেটা আমার ডিপার্টমেণ্ট।'

'তোমার মুণ্ডু।' পাশ ফিরল বিজয়া।

কিন্তু না, ঘর খোলা, আলো জ্বেলে লেখাপড়া করছে সুকান্ত।

চোখ না তুলেই বললে, 'শেষ পর্যন্ত সেই ফিরেই আসতে হল।'

'নইলে যাব আর কোন চুলোয়।' ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখল কাকলি।

'কিন্তু যাবার সময় যেমন পাখা মেলেছিলে মনে হচ্ছিল যেন অন্য কোনো গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবে। আসলে বাসন্তীও যা, তুমিও তাই।'

'বাসন্তী—মানে, ঠাকুরঝি?'

'হ্যাঁ, শত অত্যাচার সত্ত্বেও বাসন্তী তার স্বামীর ঘর আঁকড়ে আছে, তুমিও তেমনি শত অসুবিধে সত্ত্বেও—'

'কথাটা অসুবিধে করছ কেন, বলো, অত্যাচার সত্ত্বেও।' কাকলি তাকাল চারদিকে: 'আমার ওপর এসব কম অত্যাচার?'

কথা রদবদল করল না সুকান্ত। বললে, 'তেমন শত অসুবিধে সত্ত্বেও তুমিও তেমনি আঁকড়ে আছ শ্বশুরবাড়ি।'

'থাকব না তো যাব কোথায়?'

'তাই বলছিলাম, তুমি আর বাসন্তী একগোত্র।'

'মোটেই নয়। বাসন্তীর অবস্থা আমার চেয়ে ঢের ভালো। তার বাপের বাড়ি আছে। রোজগেরে বাপ-কাকা আছে। দুই গণেশ-কার্তিক ভাই আছে। আমার তো ওসব কিচ্ছু নেই। আমি তো নিঃস্ব। উদ্বাস্তু।'

'কেন, তোমার তো থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে, হোটেল আছে, ক্লাব আছে, রণ্ডিভু আছে। তা তুমি শ্বশুরবাড়ি ছাড়বে কেন? যার এক চিলতে

বুদ্ধি আছে, সে কখনো ছাড়ে? খাওয়া-থাকা ফ্রি, একটা স্বামীকে শিখণ্ডীরূপে সামনে রাখা, আফিসে মোটা চাকরি, আর মাইনেতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য—অবাধ স্বাধীনতা, স্বাধীনতা না স্বেচ্ছাচার—এমন রাজত্ব কেউ ছাড়ে? তাই যতই মুখসাপট মারো কাজের বেলায় সেই গুটিগুটি শ্বশুরালয়েই ফিরে আসো।'

'তবে তো বুঝেইছ আমার চালাকি। কিন্তু আসল চালাকিটার জন্যে সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ।' মুখের ভাবটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করল কাকলি: 'সেটা হচ্ছে আমাকে যে চাকরি করতে খুঁচিয়েছ। উঃ, যদি আজ আমার চাকরি না থাকত, নিজের বলে এক মুঠো টাকা না থাকত, তা হলে আমি কোথায় গিয়ে পড়তাম।' কাকলি ঝলমল করে উঠল: 'আমি বাসন্তী হতে যাব কেন? কোন দুঃখে? আমি কি ওর মত ননম্যাট্রিক অকর্মণ্য অসার? নাই বা থাক আমার বাপের বাড়ি, আমার বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, চাকরি আছে, চেহারা আছে। শত্রুতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সবচেয়ে যে বড় অস্ত্র সেই টাকা আছে। আমি কেন দুর্বলের মত স্বামীর ঘর আঁকড়ে থাকব? আমার ছাদ যায় মাটি আছে, গাছ যায় মাঠ আছে। তোমাকে শিখণ্ডী করতে হবে কেন? যে কোনো দিন আদালতে গিয়ে তোমার স্বামিত্বকে এক কলমে কেটে দিয়ে হালকা হয়ে যেতে পারি—'

'অতি-চালাকের গলায় দড়ি পড়ে।' গম্ভীর হয়ে বললে সুকান্ত।

'পড়ুক। তবু পায়ের বেড়ির চেয়ে তা ভালো। আমাকে যেতে বলছ, কেন, তুমি চলে যাও না। কত ছেলে তো বিদেশে যায়, নিরুদ্দেশ হয়, সন্নেসী হয়ে বনে বনে টহল মারে, তুমিও তাই করো না। উপদেশটা আমাকে না দিয়ে নিজের উপরেও তো খাটাতে পারো। নিজেই তো যেতে পারো বেরিয়ে।'

'মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে। তোমারও তাই উঠেছে।'

'ও, মরব! সে তো এক নতুন রোমাঞ্চ। কিন্তু কানু হেন গুণনিধি কাকে সেদিন দিয়ে যাব না জানি। কোন কাক সেদিন এ পাকা বেলে ঠোকর মারবে!'

কাকলি ছাদে চলে গেল আর ঘর অন্ধকার করে দিল সুকান্ত।

থিয়েটার হয়ে গিয়েছে। কদিন পরে কাকলি এল আবার নতুন দরখাস্ত নিয়ে।

'নতুন আবার এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

'তা, আমি কী করব!' সুকান্ত বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'যতক্ষণ তুমি নাকচ না হচ্ছ ততক্ষণ তোমাকেই জানাতে হবে।'

সুকান্ত ঘাড় তুলল না।

'শোনো, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার একটা ককটেইল পার্টি দিচ্ছেন—'

'কী টেইল ?' মুখিয়ে উঠল সুকান্ত।

'ককটেইল। সেদিন তুমি আমাকে ময়ূরপুচ্ছ বলেছিলে না। এ হচ্ছে কুক্কুটপুচ্ছ। সে পার্টিতে আমার নেমন্তন্ন হয়েছে। আমি যাব! যদি চাকরির উন্নতি চাই আমার যাওয়াই উচিত। উপরিওলার খুশিতেই উপরে তোলা।'

'তা আমি কী করব ?' রীতিমত ধমকে উঠল সুকান্ত।

'ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো, যাবে ? তোমারও নেমন্তন্ন হয়েছে।'

'আমার ?' চেয়ারের দুটো হাতলই একসঙ্গে ধরল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, কনসর্টের নেমন্তন্ন। পুরুষ-অফিসরদের সস্ত্রীক নেমন্তন্ন, তেমনি মেয়ে-অফিসরদেরও সপতিক। হালে আমার বিয়েটা যখন এস্টাব্লিশ্‌ড্‌ হয়েছে তখন আমাকে বলেছে স্বামীসহ হাজির হতে। অফিসরের স্ত্রী যদি যেতে পারে, অফিসরের স্বামীই বা যেতে পারবে না কেন ? কি, যাবে ?'

'মুখ সামলে কথা বলো বলছি। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।'

'কেন, দোষ কী! কত গণ্যমান্যেরা যাবে। চলো না। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে জীবনে। কোনোদিন গিয়েছ অমন জায়গায় ? যখন যাও নি তখন চলো।'

'আমি নয়। তোমার একার জন্যেই গোল্লার পথ খোলা থাক।'

অল্পে অথচ তীক্ষ্ণে সজ্জিত হল কাকলি। যথাসময়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। মোড় থেকে ট্যাক্সি নিলে।

তাক বুঝে সুকান্ত পালিয়েছে।

মৃণালিনীর চোখ এড়ায় নি। বন্দনাকে লক্ষ্য করে বললে, 'আজ আবার কোন অভিসার ?'

বন্দনা বললে, 'আজ জলাভিসার।'

পার্টিতে বরেন এসে শামিল হল। কাকলি একা-একা বসেছিল এক কোণে, তার টেবিলে মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল।

'বাবাঃ বাঁচলাম, আপনি এসেছেন। নইলে কী বিপদে যে পড়তাম!' বললে কাকলি।

'কেন, বিপদ কিসের ?'

বিপদ যে সত্যি বিশেষ নয়, হাসল কাকলি। বললে, 'কে না কে বসত ঠিক আছে ?'

'সকলের চোখই তো আপনাকে খুঁজছে—'

'কিন্তু আমার চোখ ?' ছোট একটি কটাক্ষ করল কাকলি: 'যাক এতক্ষণে

আরাম হল। চারদিকের বৈষম্যের মধ্যে সমতার উপশম : খুঁজে নেওয়াই বুঝি জীবনের সাধনা। শুনুন ওসব পানীয় কিন্তু নেবেন না—'

'সে কি, একটু স্বাদ নিয়ে দেখবেন না? অন্তত এক সিপ্, এক চুমুক?' বরেন চোখমুখ উজ্জ্বল করল।

'দরকার নেই। নামটা শুনতেই সাংঘাতিক।'

'বাঙলা নামগুলোই অমনি কবিত্বহীন। কিন্তু সুরা বা মদিরা বলুন, তবু সহ্য হয়। আর যদি সোম বলতে চান তো দেবভোগ্য।'

'দরকার নেই নামের সমারোহে। আপনি দুটো কোকো-কোলা নিন—'

'আসুক।' বরেন অনুকম্পার সুরে বললে, 'কিন্তু লিকার যেটুকু আছে তা এমনিতেই খুব সফ্ট। একটুখানি মিষ্টি ঝাঁজের বেশি নয়।'

'জীবন এমনিতেই বেশ ঝাঁজালো আছে।' কাকলি বললে।

'অন্তত ঠোঁট দুটি একটু ঠেকাবেন। স্বাদ না নিন, গন্ধ নেবেন—'

'প্রথমে ঝাঁজ, পরে ঝাঁকার, শেষে একেবারে নেশা—মানে ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া। দরকার নেই আমার স্বাদে-গন্ধে। মাটিতে-আকাশে এত স্বাদ-গন্ধ আছে, জীবনে এত রোমাঞ্চ, কোনো কৃত্রিম আয়োজনের প্রয়োজন নেই। আর যাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত তাকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াই উচিত নয়।'

দুটো লেমনেড চেয়ে নিল বরেন। উদার আনন্দে বললে, 'আপনার জন্যে নিরীহ হলাম। কোথায় তরল অনল হব, তা নয়, শরবত হলাম। মদিরা না হয়ে শর্করা।'

'মধু হলেন।'

ভরসন্ধে পার করেই ঘরে ফিরল কাকলি। আর বলা নেই কওয়া নেই, ঘরে ঢুকতেই, সুকান্ত তাকে দু বাহু দিয়ে নিপিষ্ট জড়িয়ে ধরল। মুখের কাছে আনতে চাইল ব্যাকুল মুখ।

প্রথমটা ভীষণ হকচকাল কাকলি। এ কী আকস্মিক আদরের তোড়। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল এ আদর নয়, এ আক্রমণ।

'বলো কী খেয়েছ তুমি? তোমার মুখে এ কিসের গন্ধ?'

'যা লোকে খায় তাই খেয়েছি। বর্বরতা কোরো না বলছি, ছেড়ে দাও—' ঝটকা মারতে চাইল কাকলি।

'তুমি মদ খেয়েছ?'

'বাঙলা শব্দটা অত উচ্চস্বরে ঘোষণা না করলেও চলবে। সংসারকে শোনাতে হবে না তোমার আবিষ্কারের কথা।'

'এক শো বার শোনাতে হবে। তোমাকে চাকরি করতেই দেওয়া হয়েছে, মদ খেতে নয়। বেলেল্লাপনা করতে নয়।' কাকলিকে খাটের উপর ছুঁড়ে দিল সুকান্ত।

'বলিহারি গন্ধ-রাজ।' ব্যঙ্গে ঝংকার দিয়ে উঠল কাকলি : 'লোকে ওয়াইন-টেস্টারের কাজ নেয়, তুমি হও গিয়ে ওয়াইন-সেণ্টার। এমনি না হলে নাক, এমনি না হলে বুদ্ধি! কোন বনের গন্ধগোকুল তুমি!'

'কোন বনের—তা দেখাচ্ছি তোমাকে।' দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

কী দেখাবে, কদিন যেতে পুরোদস্তুর একটা স্যুট পরল সুকান্ত।

কাকলি হালকা হবার চেষ্টায় বললে, 'না, এখন আর গন্ধগোকুল লাগছে না। এখন মনে হচ্ছে. বিলিতি মার্জার।'

কোনো উত্তর দিল না সুকান্ত। দৃপ্ত পায়ে বেরিয়ে গেল।

উঠল গিয়ে সটান বরেনের আফিসে।

'আরে সুকু যে!' উত্তাপে উথলে উঠল বরেন : 'এই রাজবেশ?'

'রাজবেশের নিচেই ভিক্ষুকের চীর।'

'সে কী? তুই ভিক্ষুক?'

'হ্যাঁ, একটা চাকরি চাই।'

হো-হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠল বরেন : 'আমি ভাবলাম কী না জানি কী।' পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'বেশ তো, আমাদের এখানে করবি?'

'কেন করব না? নিশ্চয় করব।'

'দাঁড়া, বাবার কাছে তোকে নিয়ে যাই।'

পাশের কামরাটাই ধীরেনবাবুর।

'আমার বন্ধু, বাবা। সুকান্ত। এম-এ, খুব ভালো ছেলে। রিসার্চ করছিল। সম্প্রতি বড় অভাবগ্রস্ত। চাকরি চায়। আমি বলি কি, এইখানেই তো হতে পারে একটা।'

'হ্যাঁ, পারে। ঐ দীপঙ্কর ছোঁড়াটাকে বরখাস্ত করে দাও।'

'আমিও তাই বলছিলাম বাবা—'

'পোস্টটা বড় করে দাও। কলকাতার বাইরেও তো টুর করা আছে। টুরিং ইন্‌স্পেক্টর।'

'আর দীপঙ্করকে একটা নোটিশ দিয়ে দিলেই তো হবে।'

'হ্যাঁ, একেবারে ডিসচার্জ নোটিশ। ওর চাকরির তো ঐ কণ্ডিশন। টার্মিনেবল অ্যাট প্লেজার। বড্ড বাড় বেড়েছিল ছোঁড়াটা—'

'তারপরে যতরকম হীন আর হীনাস্‌ তদবির।' স্বর্গের দিকে তাকাল বরেন

'বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই শেষ করে দেওয়া দরকার।' নিচু হয়ে কাজ করতে লাগল

ধীরেন: 'এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। ডিটেল্‌স্‌ ঠিক করে নিয়ে এসো।'

স্তব্ধের মত বরেনের ঘরে ফিরে এল সুকান্ত।

...৩৪·

কেমন কিরকম হল? ভাবতে বসল বরেন। মোটের উপর ভালোই হল বলতে হবে। অন্তত আমি তো ভালোই করলাম, পরোপকার করলাম। আপাতচোখে দেখতে আমার আর দোষ কী! প্রথমে স্ত্রী এল, ব্যবস্থা করে দিলাম। পরে স্বামী এল, বসিয়ে দিলাম উঁচু দাঁড়ে। সচরাচর দুর্লভ এমন বদান্যতা। একজনেরই হয় না, এ একেবারে ডবল চাকরি। হনুমানের কাঁধের উপর রামকে বসানো। আর আমাকে এখন এক হাতে স্যালিউট করা নয়, দুই হাতে, যুক্তকরে, নমস্কার করো। কৃতজ্ঞতায় শুধু বিগলিত হওয়া নয়, কৃতজ্ঞতায় বশীভূত হও।

বলতে পারো, দীপঙ্করের চাকরিটা গেল! তা, অস্থায়ী চাকরি, একদিন না একদিন যেতই। এ অবস্থাটা ওর অজানা ছিল না। তাই খবর পেয়ে এমন কিছু পড়বে না আকাশ থেকে। তা ছাড়া শাস্ত্রেই বলেছে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়। আশ্চর্য, সর্বজনহিতায়, সর্বজনসুখায় বলে নি। একসঙ্গে সকলের সুখ তাই সাধ্যাতীত। একজনের চাকরি পাওয়া মানেই আরেকজনের চাকরি যাওয়া, বা চাকরি না-পাওয়া। একজনের প্রথম হওয়া মানেই আরেকজনকে দ্বিতীয় হওয়ার দুঃখ দেওয়া। সুখ যা সঞ্চিত হয় তা শুধু অন্যকে বঞ্চিত করে। তাই তোমাদের সুখের পিছনে অন্যের দুঃখ থাকবে। এ আর বিচিত্র কী। দেখতে হবে অল্পের দুঃখে বহুর সুখ হল কিনা। তা যদি হয়, তবে অল্পের দুঃখ মার্জনীয়। বর্তমান ক্ষেত্রে তিন বন্ধুর মধ্যে—হ্যাঁ, কাকলিও তার বন্ধু বটে, শুধু বন্ধু—দু-জনের চাকরি হল, একজনের চাকরি গেল। বহুজনসুখায় ঠিক বজায় থাকল। তাই বরেনকে কোনোভাবেই কেউ দোষী করতে পারো না। সে কল্যাণকৃৎ, সে পরার্থপর।

তা ছাড়া দীপঙ্কর কি তার বন্ধু? তোমার সমৃদ্ধিতে যার যন্ত্রণা তাকে কি সংসার বন্ধু বলবে? কী করে তোমার পকেট হালকা করবে, তোমার বুকে বসে তোমারই

দাড়ি ওপড়াবে, সব সময়ে এই যার অভিসন্ধি, তাকে তুমি দেবে প্রশ্রয়-আশ্রয় ? যে কাঁটা হয়ে বিঁধে থেকে অনবরত খচখচ করবে তাকে তুমি তুলে ফেলবে না ? না কি বাঁচিয়ে রাখবে সেই অস্বস্তি ? আর কাঁটার কারুকার্যটা দেখ। আর কিছু নয়, কাকলিকে দিয়ে তদবির ! মানে বরেন নিতান্তই খেলো, শক্তিশূন্য, একটা মেয়েছেলে এসে জল কাত বললেই সে ঘাড় কাত করবে। এ প্রায় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ, ব্যক্তিত্বের অসম্মান। বরেন যে অমন অসার নয়, তদবির গুহ্যই হোক আর প্রকাশ্যই হোক, সে যে নির্বিচল তা প্রমাণ করবার জন্যেই এ কঠিন ভঙ্গিটা সমীচীন। অন্তত আর যারা এখনো চাকরিতে আছে, তারা শিখবে, তারা সাবধান হবে। ভয় করবে বরেনকে, শ্রদ্ধা করবে।

দীপঙ্কর একবার মাপ চেয়েছিল মনে পড়ছে। সে শুধু একটা কথার কথা, বিবাদের কায়দা। পা মাড়িয়ে দেবার পর 'সরি' বলা। তা ছাড়া এর মধ্যে মাপামাপির আছে কী ! ব্যবসায় খাতিরেই আনতে হচ্ছে সুকান্তকে। সুকান্তকে যদি পাওয়া যায় তবে দীপঙ্করকে কে পোঁছে ! দীপঙ্করের চেয়ে সুকান্ত ঢের বেশি যোগ্য, ঢের বেশি তীক্ষ্ণ। সুকান্তকে দিয়ে বাণিজ্যের ঢের বেশি প্রসারের সম্ভাবনা। এ এটা নিছক বন্ধুতার প্রশ্ন নয়, নিছক গণিতের প্রশ্ন। ব্যবসা করতে বসা মানেই আয় করতে আসা। আর কখনো-কখনো যে আমরা ব্যয় বাড়াই সে শুধু আয়ের আয়তন আশা করে। সুতরাং যেদিক থেকেই দেখ, ধর্মের দিক থেকেই হোক, নীতির দিক থেকেই হোক বা অর্থের দিক থেকেই হোক, দীপঙ্করের যাওয়াটা বিধেয়। আর, সুকান্তকে আমরা কেউ ডেকে আনি নি। কেউ তদবির করে নি তার জন্যে। সে নিজের থেকে এসেছে, এসেছে নিজের জোরে। তার আসাটা অভাবনীয়। প্রায় চমৎকারের ধার দিয়ে। নিঃশব্দের মাঠ পেরিয়ে।

তবু থেকে যাচ্ছে খটকা। দীপঙ্করের জন্যে তদবির করতে চেয়েছিল, সেই দীপঙ্করের চাকরি চলে যাওয়াটা প্রথমত নিশ্চয়ই মনঃপূত হবে না। কিন্তু যখন দেখবে সে ক্ষতির উচ্ছ্বসিত পূরণ হচ্ছে তার নিজেরই স্বার্থে, নিজেরই স্বামীতে, তখন সে নির্ঘাত চুপ করে যাবে। যখন দেখবে তিক্ত গাছে মধুক্ষরণ হচ্ছে তখন গোপন তৃপ্তিতে তাই সে লেহন করবে মনে মনে। নিজের আয় স্বামীর আয়, সদর আর খিড়কি দু দরজা খুলে গেল একসঙ্গে, দু দরজা দিয়েই হাওয়ার খেলা চলবে, চলবে বরেনের নির্ভীক আসা যাওয়া। হালে দাঁড়ে দু-জনকে বসিয়েছে দু দিকে, নৌকো এবার তরতরিয়ে বয়ে যাবে যে নৌকোর প্রথম সোয়ারি, একমাত্র সোয়ারি বরেন। দেখি না আনন্দের বন্দর কোথাও আছে কি না। গোপনে ঠিক বিগলিত

যদি না-ও হও, প্রকাশ্যে বশীভূত তো হবে। নিজের বিবেচনায় না হও, অন্তত স্বামীর প্ররোচনায় তো হবে। নইলে তোমার স্বামীকে এনে বসালাম কেন? খিড়কি যদি কৃপণ করেও রাখো, সদর উদার করে রাখবে স্নকান্ত। যতই কেননা জোরালো হাতে দণ্ড টানো, তার হালের বাঁকের চালাকিটুকু ধরতে পাবে না। তোমার দাঁড়েও আমি, তার হালেও আমি।

কিন্তু বনে গিয়েও যে দুধ খাব, গাইয়ে-বাছুরে কি ভাব আছে? বোধ হয় নেই। কাকলি দীপঙ্করের হয়ে তদবির করে অথচ স্নকান্তের, তার পরমগুরুর যে ঘোরতর অভাব, সমূহ একটা চাকরির দরকার, ঘুণাক্ষরেও বলে না। আর স্নকান্ত এমন হুড়মুড় করে এসে পড়ল, হাড়গোড় ভাঙা হয়ে যে এ বেলা চাকরি না পেলে ও বেলা তার হাড়ি চড়বে না, মান-ইজ্জত সব ভেসে যাবে। তার বউ যে হৃষ্টপুষ্ট মাইনে পাচ্ছে, এমন একখানা ভাব করল, তা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তার পকেট আর তার বউয়ের ব্যাগের মধ্যে যেন কত যোজনের ছাড়াছাড়ি আর যার-যার হৃদয় এখন যার-যার পকেটে আর ব্যাগে।

তাই হবে—হালকা হয়ে সিগারেট ধরাল বরেন—স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, আইনের ভাষায়, অসংগতি। তাই চাকরির বাজারে কুমারী সেজেছে কাকলি হাত আর মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়েছে স্বামীকে। বাড়ির দরজা পর্যন্ত মোটর নিতে দিচ্ছে না। আর এ চাকরিতে টুরিং হল বলে স্নকান্ত একেবারে গদগদ, পারলে এক্ষুনি, পরের ট্রেনেই সে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি ছাড়তে পাবে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে কাকলির সান্নিধ্য এই এখন তার দ্রুততম উপশম—এমনি যেন তার অস্থিরতার অর্থ। সন্দেহ নেই, গভীরে কোথাও ওদের বেস্নর লেগেছে, সূক্ষ্ম ফাট ধরেছে। লাগুক, ধরুক, ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলুক দু-জনে। সেখানেও তবে বরেনেরই খেলা। সেতু বাঁধার খেলা। এ হাত তুমি ধরবে, ও হাত ও। মিলিয়ে দেব। সে মিটমাটের মামলায় আমিই জানবে প্রধান মোক্তার।

আর, যদি মিটমাট না করো, সেখানেও আমি। তুমি এ কানে লাগাবে, ও ও কানে। দু পক্ষেই অস্ত্র জোগাব। এক পক্ষকে শক্তিশেল দিয়ে আরেক পক্ষকে গন্ধমাদন। দু পক্ষের মামলায়ই তদবিরকার সাজব—দু-জনেই জানবে এমন হিতৈষী আর হতে নেই। যেমন চাও, কাটলটা প্রশস্ত করে দেব। উড়িয়ে দেব অট্টালিকার চূড়া। যদি স্নবিধে হয় তো, খসিয়ে দেব কাকলির চাকরি। আরো স্নবিধে হয়, স্নকান্তকে সরিয়ে আবার বসবে দীপঙ্কর। লাগ ভেলকি লাগ। তুকেও আমি তাকেও আমি। আমাকে যেমন লাগাবে তেমনি লাগব। যেমন নাচাবে তেমনি

নাচব। বন্ধুতায়ও আমি, শত্রুতায়ও আমি। আমার উদ্যোগ-প্রয়োগ নেই। শুধু এখন বলো, আমাকে কী করতে হবে, কী করলে তুমি সুখী হও। দেখি পারি কিনা করতে।

তাই তোমাদের ভাব না ঝগড়া, জানতে চাই না, তোমরা চাকরি চেয়েছ জোগাড় করে দিয়েছি। উপকার চেয়েছ, করেছি উপকার। আমার তবে দোষ কী, দায়িত্ব কী! তোমরা ভাবে আছ না অভাবে আছ, শস্যে না দুর্ভিক্ষে, তা নিয়ে আমার কী মাথাব্যথা! জানতেও চাই নি, চাইবও না কোনোদিন। আমার শুধু কান পেতে থাকা, প্রাণ পেতে থাকা। সাধ্যমত পরোপকার করা। আর, মাপ কোরো, মনে-মনে ডুগডুগি বাজিয়ে লাগ ভেলকি লাগ মন্ত্র বলা।

দীপঙ্করের চাকরি যাবার পর তার জন্যে তদবিরে কি আরো একটু ঘন, দ্রুত হবে কাকলি? না কি একেবারে সরে পড়বে, এ তল্লাটও ঘেঁষবে না? লাগ ভেলকি লাগ। দেখ না ঘটনার স্রোত কাকে কতদূর ঠেলে নেয় বা টেনে আনে? তুমি শুধু দেখ আর ন্যায় যা বলে তাই করো। আর জল চাইলেও ফল চেয়ো না। মা ফলেষু কদাচন।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে,' হাসিমুখে সুকান্তকে বললে বরেন, ইংরেজিতে বললে, 'তোমাকে কিভাবে ডাকি, কোন সর্বনামে?'

ইংরিজিতে উত্তর দিল সুকান্ত: 'যেমন তোমার খুশি।'

বাঙলা ধরল বরেন: 'মানে, আপনি বলি, না তুমি বলি, না তুই বলি?'

'তুমিটা ভীষণ বিচ্ছিরি।' সুকান্ত ঝাঁজিয়ে উঠল: 'মনে হয় যেন মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক। ঊর্ধ্বতন অধস্তনকে হুকুম করছে।'

'তা হলে আপনি?'

'সেটা একটা দূরদিগন্তের ডাক। প্রাণ নেই, তাপ নেই, রক্ত নেই—'

'তা হলে তুই।' হো-হো করে হেসে উঠল বরেন।

'সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে সুন্দর।'

'উঁহু। বাঙলা চলবে না। ইংরিজিতে বলব। তুই বলাটা আফিসের পক্ষে অসম্ভ্রান্ত।'

'কিন্তু আমাদের মধ্যে সবটাই তো আর আফিস নয়।' মোলায়েম করে বললে সুকান্ত, 'কিছুটা তো আবার বাড়িঘরও আছে।'

'নিশ্চয়ই আছে।' উথলে উঠল বরেন: 'তখন আমাদের তুই—চিরকেলে তুই।' সিগারেট-কেসটা মেলে ধরল। সুকান্ত একটা নিলে, নিজে আরেকটা

ধরাল। বললে, ‘এখন যেমন। আফিস-টাইমের পর এখন এ ঘর আমাদের বৈঠকখানা—’

‘আড্ডাখানা।’ কথাটা আরো উষ্ণ করল সুকান্ত।

‘খুব ভালো বলেছিস।’ বরেন আবার অঢেল হেসে উঠল: ‘এখন তোর চতুর্দিক ভালো। যা এখন তুই বলবি-চলবি সব কিছু ঝিলিক মারবে। তোর মত ভাগ্যবান আর কজন ?’

‘ভাগ্যবান ?’ হাতের সিগারেটটা হাতেই ধরা রইল সুকান্তর।

‘তোর স্ত্রীও তো চাকরি করছেন শুনেছি—’ চোখের দৃষ্টিটাকে একটু তির্যক করল বরেন।

‘হ্যাঁ, করেন একটা।’ সুকান্ত পাশ কাটাতে চাইল।

‘কোথায় যেন ?’

‘বাটারওয়ার্থে।’

‘বলিস কী! তা হলে মাইনে তো বেশ ভালোই। বা, পেল কী করে ?

‘কী জানি কী করে!’

আসলে সুকান্ত সমস্ত বিবরণ জানে না। কাকলিই জানায় নি, চেপে রেখেছে। তার মানেই ওদের সম্পর্কের সারল্য ঘুচে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে অনৈক্য। সুন্দর আরাম পেল বরেন। বরেনকে আড়ালে রেখেছে। গোপনে রেখেছে। যাকে আপনার জন বলে বিশ্বাস তাকেই তো নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায় লুকিয়ে।

‘তা হলে তুই তো মহাভাগ্যবান।’ বরেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো: ‘চিরকাল শিল্ডের এক দিকই থাকে, তোর তুই দিকে শিল্ড। প্রতিমার এক দিকে রঙচঙ, আরেক দিকে খড়। তোর প্রতিমার এদিকেও রঙচঙ ওদিকেও রঙচঙ। মানুষে নিজে একটা চাকরি পায় না,’ বরেন হাসল: ‘আর তোদের স্ত্রী-পুরুষে চাকরি। আয়ে-আয়ে কায়পরিমাণ।’

‘আমার স্ত্রী চাকরি করে তাতে আমার কী।’ সুকান্ত মুখ ফিরিয়ে নিল।

‘আমার কী মানে! একসঙ্গে থাকিস না ?’

‘একসঙ্গে থাকলে কী হয়!’

‘কী হয় মানে ? যখন স্ত্রী মেটারনিটিতে যাবে, তখনো বলবি, এ আমার স্ত্রীর চাকরি—আমার কী!’ হাসল বরেন: ‘ভুখা-ও শুনেছি দু হাতে খায় না। কিন্তু যাই বলিস, এ তোর দু হাতে খাওয়া। গাছেরও খাবি, তলারও কুড়োবি। মজাসে আছিস যা হোক।’

'মোটেই নয়।' কথা যখন উঠেছে, প্রতিবাদ করতে হয় দৃঢ় হয়ে। বরেন শুধু বন্ধু নয়, মনিব। ওকে অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। তাই সুকান্ত বললে, 'নিজের শক্তিসামর্থ্য আছে, গাছে উঠতে জানি, নিজেই পাড়ছি গাছেরটা।'

'আর তলারটা? স্ত্রীর রোজগারটা?'

'যার রোজগার সেই খাচ্ছে। তার আলাদা সব পোষ্য পাল্য আছে তাদেরই খাওয়াচ্ছে।'

'তোকে দিচ্ছে না কিছু?'

'না।' বলতে স্বস্তি পাচ্ছিল না সুকান্ত, তাই ফের যুক্ত করলে, 'কে চায় তারটা?'

'বা, চাইতে হবে কেন? স্ত্রী নিজের থেকেই স্বামীর ভাণ্ডার পূর্ণ করবে। এক গুণকে দ্বিগুণ করবে। তারই জন্যে তো কৃতী মেয়ে বিয়ে করা।'

'উনি আবার একটু বেশি কৃতী। অহংকারের রঙ-মশাল। এবার যাবে অহংকার।' সিগারেটটা টেবিলের উপর ঠুকতে লাগল সুকান্ত।

'অহংকার যাওয়াই ভালো।' বচন ঝাড়ার মত করে বললে বরেন, 'শত হলেও স্ত্রী, একটু আয়ত্তে-অধীনে থাকবে তো! তা তোদের তো প্রেমের বিয়ে। সেই প্রেম এরই মধ্যে ফ্রেম হয়ে গেল?'

সুকান্ত চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল। নখ দিয়ে চিরতে লাগল সিগারেটটা।

'কথাটা বুঝতে পেরেছিস?'

'পেরেছি। ছবি নেই কাঁচ নেই পিজবোর্ড নেই শুধু ফ্রেমটা ঝুলছে।'

হো হো করে হেসে উঠল বরেন: 'প্রেম ফ্রেম হয়ে গেল! কী, ভালো বলি নি?' পরক্ষণেই গম্ভীর হল: 'কিন্তু তোর ভাগ্যে এমন হল কেন?'

'চোখের ভুলে আমিও বুঝি ফ্রেম দেখেছিলাম। সার-শস্য নেই, শুধু ঠাট, শুধু ঝিলিক—' ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুঝি সুকান্ত। সিগারেটটা দলা পাকাতে লাগল।

'কী যে বাজে বকিস তার ঠিক নেই।' আশ্বাস দেবার মত করে বললে বরেন, 'এসব বিরোধ জলের দাগ—এ মিটে যাবে। তোকে সচ্ছল দেখলেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোর পদ প্রান্তে বসবেন তোর স্ত্রী—কী জানি সেই গানটা—'পদপ্রান্তে রাখো সেবক'—ধরবেন সেই গান।'

'দেখি কী হয়! ম্লান হেসে উঠে পড়ল সুকান্ত।

'কিন্তু একটা কথা। এক জায়গায় একটু খটকা লাগছে।' বরেন আবার দৃষ্টি তির্যক করল: 'তোর এই সচ্ছলতাটা না অন্য দিক থেকে তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়।'

'ক্ষোভের কারণ হবে ? কার ? কাকলির ?' সুকান্ত থেমে পড়ল।

'দীপঙ্করকে ডিসমিস করে সে ভেকেন্সিতে তো তোর চাকরি।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন : 'দীপঙ্করের ডিসমিসটা হয়তো তাঁর ভালো লাগবে না।'

'কেন, তাতে তার কী ? কোন আফিস কাকে নিচ্ছে না তাড়াচ্ছে তাতে তার কী মাথাব্যথা !'

'না, দীপঙ্করের কেসটা আলাদা।' বরেন তাকাল কাগজপত্রের দিকে : 'দীপঙ্করের জন্যে উনি তদবির করেছিলেন—'

'তদবির ?'

'হ্যাঁ, আমাকে অনেক ধরেছিলেন যাতে দীপঙ্করের মাইনেটা বাড়িয়ে দিই।' আসনে দৃঢ়ীভূত হল বরেন : 'কিন্তু পারলাম না তাঁর অনুরোধ রাখতে। দীপঙ্করটা কাজে-কর্মে খারাপ, অলস, তাতে আবার অসন্তুষ্ট। তার উপরে স্ত্রীলোক পাঠায় তদবির করতে ! ইঙ্গিতটা কী অন্যায়। তিনি ওর ইন্‌টিমেট বলে তাঁকে না হয় ও ইনফ্লুয়েন্স করল, কিন্তু আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে কে ? আমাকে টলানো কি এতই সোজা ?'

সুকান্তই টলতে লাগল।

'কিন্তু যাই হোক, মিসেস বোসকে পুষিয়ে দিলাম। খিড়কি দিয়ে যা বেরিয়ে গেল তাই ফিরে এল সদর দিয়ে, হয়তো বা বেশি হয়ে।' হাসতে লাগল বরেন : 'তাই আসলে তাঁর ক্ষুব্ধ থাকবার কোনো কারণ রইল না—রাখলাম না কারণ।'

সিগারেটের দলাটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

সুকান্তকে আর এখন পায় কে। স্যুটে-বুটে খটমট করতে লাগল। তার চাকরি হয়েছে, মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি হয়েছে, হুল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। মৃণালিনী তার বুকেপিঠে হাত বুলুতে লাগল, মা সর্বমঙ্গলাকে বলতে লাগল, মা, আমার সুকুকে উজ্জ্বল করো। আর জব্দ করো কালনাগিনীকে। বিজয়া বন্দনাও ওথলাতে লাগল, এমন কাণ্ড শুরু করল যেন তারা লটারিতে বিলেত যাবার টিকিট পেয়েছে। সংসারে সবদিকেই এখন জলুস, শুধু একজনের মুখটাই আশানুরূপ চকচকে নয় এই নিয়ে আবার টিপ্পনী। স্বামীর সুখে সুখ নেই এ কোন ছিরির ইস্তিরি ! যাই বলো, থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে এবার। কাকলির চেয়ে সুকুর মাইনে বেশি। আর তোর বাড়িতেও শাড়ি চাকরিতেও শাড়ি। সেও তোর দশ হাতে কাছা নেই, আর দেখ দেখি পুরুষকে, কেমন বিচিত্র সে বেশেবাসে। ধুতি-পাঞ্জাবিতেও সুন্দর, কোটেপ্যান্টেও সুন্দর। পুচ্ছেও সুন্দর, কেশরেও সুন্দর।

তুই যাস আবার তার সঙ্গে টেক্কা দিতে! এক পঙ্‌ক্তিতে বসে আফিসের ভাত খেতে!

'ছোড়দার ভাতটা আগে দিয়ে দাও।' ঠাকুরকে তাড়া দিল মৃণালিনী।

আফিস-আদালত যাবে, আর-সকলেও বসেছে খাবার টেবিলে, কিন্তু মৃণালিনীর অনন্য নজর সুকান্তে। বন্দনা-বিজয়াও লেগেছে তার সাহায্যে। কেউ নুন-লেবু এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা জলের গ্লাস। সকলের এমন ভাব, যদি কৃতিত্ব বা কৌশল কেউ দেখিয়ে থাকে এ যুগে তবে সে সুকান্ত। পরীক্ষায় সে কম হতে পারে, বিয়েতে সে ঠকতে পারে কিন্তু এখন, চাকরিতে, টাকা উপার্জনের ক্ষেত্রে, সে কৃতকর্মা।

'ছোট বউমাকে দেবে না?' এক পাশে কুণ্ঠিতের মত, উদ্বাস্তুর মত কাকলি দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

'হবেখন।' মৃণালিনী ঝামটা দিয়ে উঠল: 'একেবারে স্বামী-শ্বশুর-ভাসুরদের সঙ্গে একত্রে বসে খাবার কী হয়েছে?'

'বা, তারও যে দশটায় আফিস।'

'যা না চাকরি তার আবার আফিস! তার আবার দশটা-পাঁচটা! ও খোঁয়াড়ে এগারোটায় গেলেই বা কী, বারোটায় গেলেই বা কী!' মৃণালিনী গজগজ করতে লাগল।

'আর না গেলেই বা কী!' ব্যঙ্গের ভঙ্গি করল হেমেন।

'হ্যাঁ, না গেলেই বা কী!' মৃণালিনী দাউদাউ করে উঠল: 'যে চাকরিতে সংসারের সুরাহা নেই তা থাকলেও যা, না থাকলেও তাই।'

আবার কী বলতে যাচ্ছিল হেমেন, করুণমুখে কাকলি বললে, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি রান্নাঘর থেকে নিজেই নিয়ে নিচ্ছি।'

একটা কলাইকরা বাসন কুড়িয়ে নিয়ে কাকলি ঢুকল রান্নাঘরে। ঠাকুরের পরিবেশনের ফাঁকে দু হাতা ভাত আর এক হাতা ডাল আর কিছু ভাজাভুজি তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেতে লাগল।

'খাবার আবার এ কোন ছিরি!' হুমকে উঠল মৃণালিনী।

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে কাকলি থালা নিয়ে মাটিতে বসে পড়ল তক্ষুনি।

বন্দনা এল সর্দারি করতে: 'দাঁড়াও, একটা আসন পেতে দি। ভদ্র হয়ে বসে খাও।'

উইংস-এর ভিতর থেকে বিজয়াও উঁকি মারল: 'শুধু ন্যাড়া ডাল-ভাত কেন? এক টুকরো মাছ নাও।'

কাকলি কথা বলল না। গ্রাসে-গ্রাসে এগোতে লাগল।

'অমন থাবা দিয়ে জিনিস তুলে নিয়ে হতশ্রীর মত খাবার কী হয়েছে! বাড়ির বউ বাড়ির লক্ষ্মী তাড়াবে এ কেমন কথা!' চূড়ান্ত কথাটা তারপরে ছাড়ল মৃণালিনী: :ড়ির বউ হয়ে চাকরি করবার কী দরকার!'

'তারপর এখন যখন ঠাকুরপোর চাকরি হল।' বন্দনা পাড় বুনল।

'চাকরি না হলেই বা কী। তাই বলে মেয়েদের দুপুরবেলার ঘুম যাবে?' পাড়ে া তুলল বিজয়া: 'মেয়েরা জন্মেইছে এই দুপুরবেলায় ঘুমুবার জন্যে। ঘুমিয়ে-মিয়ে নিটোল হবার জন্যে। মেয়েদের এই সনাতন জন্মগত অধিকার যারা ক্ষুণ্ন রতে চায়—'

তাড়াতাড়ি খেয়ে-আঁচিয়ে উপরে উঠে এল কাকলি। ঘরে সুকান্তর শামিল হল।

'শ্রীমানের চাকরিটা কোথায় হল?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

প্রশ্ন সুকান্ত কানেও তুলল না।

'তা হলে রিসার্চ ছেড়ে দিলে? ছেড়ে দিলে প্রফেসারি স্বপ্ন?'

'চাকরি পেলে কে আর রিসার্চ করে? দাঁড়াবার পা পেলে কে তার পায়ের নিচের স, মানে ফুটনোট দেখে? একটা কারঝোলানো বা চাদর-দোলানো মাস্টারের য়ে কোটে-নেকটাইয়ে একটা রাজপুত্তুর অফিসর ঢের বেশি সুন্দর।'

'এই। রাজপুত্তুর চাকরিটা কোন মুলুকে? রাজ্যটার নাম কী?'

গ্রাহ্যও করল না সুকান্ত। সাজগোজ করতে লাগল।

'বলি চাকরিটা জোটালে কিসে?'

আর যায় কোথা! সংযমের সীমা পেরিয়ে গেল সুকান্ত। বললে' 'আর যাই রে হোক, মেয়েমানুষ পাঠিয়ে তদবির করিয়ে নয়।'

'তার মানে?' সর্বাঙ্গে নিস্পন্দ কাঠ হয়ে রইল কাকলি।

'কী হল তদবিরে? ফুল ফুটল, না ফল পাকল?' আঘাতের আনন্দে মরিয়া হয়ে উল সুকান্ত: 'কিছু হল না। উলটে অপমান করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল।'

'তুমি কার কথা বলছ?' চাপা আর্তনাদের মত শোনাল কাকলিকে।

'কারু কথা বলছি না। কিন্তু যে তদবির করতে পাঠায় অপমান তার নয়, যে দবির করতে যায় অথচ ব্যর্থ হয়, গাল বাড়িয়ে চড় নিয়ে আসে, অপমান তার। কিন্তু খন, এই অপমানের পর, এখন কী করবে?'

'বা, আমার কথা তুমি কী বলছ!' ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কাকলি: ামি কী করেছি, আমি কী করব!'

'না, করবে বৈকি। এখন বন্ধুর—তোমার সুজন মাঝির—গলা ধরে বসে কাঁদবে'
কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই নিচে নেমে গেল সুকান্ত।

প্রণামাদি সারতে কিছুটা সময় নেবে, ইতিমধ্যে ঝটপট তৈরি হয়ে নিল কাকলি। তর সইছে না। মোড় পর্যন্ত একসঙ্গে পায়ে হাঁটার পথেই কথাটা খোলসা করে নিতে হবে—কাকলিও ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

'শোনো—'ক পা আগেই বা সুকান্ত, পিছন থেকে ডাকল কাকলি।

ভাগ্যের কী দয়া, হঠাৎ খালি একটা ট্যাক্সি এসে উপস্থিত হল, সুকান্ত হাত তুলে দাঁড় করাল। ভালোই হল, ভাবল কাকলি, পথে চলতে-চলতে কি আর কথা করা চলে, গাড়িতে বসেই ঠিক পরিবেশটা হবে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সুকান্ত, দ্রুত পায়ে কাকলি প্রায় কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, কতটুকুই বা দূরত্ব, ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। ড্রাইভারের ভুল হয়তো। সুকান্তের নির্দেশে এখুনি নিশ্চয় থামবে, তুলে নেবে কাকলিকে। আর কিছু না হোক অন্তত এক বেলা ভিড়ের যন্ত্রণা থেকে একজন সহযাত্রীকে বাঁচাবে সুকান্ত! কিন্তু থামল না ট্যাক্সি। কাকলি বোকার মত, চাপা-পড়ার মত, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইল।

লাঞ্চ টাইমে তুলে নিল টেলিফোন।

'হ্যালো। 'ওপার থেকে বরেন প্রতিধ্বনিত হল।

'আমি মিসেস কাকলি বসু।'

'নমস্কার। আজকাল আপনার নামের প্রথম অক্ষরটিও বলতে হয় না। টেলিফোনের ঘণ্টা শুনেই বুঝতে পারি। তারপর—শুনেছেন খবর?'

'না তো। কী খবর? আছে নাকি কিছু?'

'বা, সুকু, থুড়ি, আপনার মিস্টার সুকান্ত বসু বলেন নি আপনাকে?'

'তন্তুমাত্র না।'

'সে কী?' তারপর একটু থেমে হালকা করে তুলি টানল বরেন: 'না বলুক কিন্তু লক্ষ্য করেন নি কিছু?'

'হ্যাঁ, লক্ষ্য করলাম সাজগোজে হঠাৎ খুব গর্বিত হয়ে উঠেছেন।' হালকা টান কাকলিও আমদানি করল: 'তেলাপোকা পাখি হলে যেমন হয়। দাঁড়কাক যদি ময়ূরের পাখা পিঠে গোঁজে—'

'কী আশ্চর্য, ওর যে আমাদের এখানে চাকরি হয়েছে। টার্মস—শুনবেন কাছে—যত দূর লিবারেল হতে হয়। তা ছাড়া ইচ্ছেমত মাদ্রাজ-বোম্বাই টুরি

ছে। টুরিং হলেই টি-এ। তারপর টেলিফোন পাবে বাড়িতে। বুঝুন—আর চাই!' তারপর একটু থেমে: 'কী, খুশি?'

'ভীষণ খুশি। কিন্তু দীপঙ্কর? দীপঙ্করের কী হল?'

'আপনার এই নতুন আনন্দে-আলোকে দীপঙ্করকে অনায়াসে খারিজ করে দিতে পারেন। তাই করাই উচিত।' অনাবশ্যক স্পষ্ট ও শক্ত হল বরেন: 'দীপঙ্কর ডিসমিস হয়ে গিয়েছে।'

'ডিসমিস হয়ে গিয়েছে!' কেঁপে উঠল কাকলি।

'কথাটা ঠিক মোলায়েম শোনাচ্ছে না, কিন্তু এ ছাড়া অবশ্য কোনো পথ ছিল না।'

'একজনকে চাকরি দেবার জন্যে আরেকজনের চাকরি খেলেন?'

কথাটা খুব বিশ্রী শোনাল, তবু বরেন গায়ে না মাখবার চেষ্টা করল। লঘুতো বজায় রেখে বললে, 'কিন্তু যাকে চাকরি দেওয়া হল সে আপনার কে?'

'যেই হোক, কিন্তু এভাবে একজনকে সর্বস্বান্ত করা, তার মুখের ভাত কেড়ে নেওয়া—এটা কি ন্যায় না ধর্ম?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল বরেন। পরে বললে, 'এসব ব্যাপারে ফার্মের কর্তা আমার বাবা, তিনিই প্রোপ্রাইটর, মালিক, ম্যান অ্যাট দি সুইচ—'

'তার সঙ্গে তো আলাপ নেই। আপনাকে চিনি, আপনাকেই বলছি।'

'সবচেয়ে তো আপনার বেশি আলাপ সুকান্ত বসুর সঙ্গে। সুতরাং তাকে বললেই কি সবচেয়ে ভালো হয় না?'

'তাকে বলে যদি তাকে সরিয়েও নিয়ে আসা যায় চাকরি থেকে তা'হলে কি দীপঙ্কর তার পুরোনো জায়গা ফিরে পাবে?'

'পাবে না। এক কান্ত সরে আরেক কান্ত আসবে, কিন্তু যে দীপ একবার নিবেছে সে আর জলবে না। কথাটা একটু ফিলসফিক্যাল হয়ে গেল। মাপ করবেন।'

'একজনের খিদের উপরে ভরাপেটে ফিলসফি করতে বাধা কী।'

'কিন্তু আপনার স্বামীর খিদেটাও তো দেখবেন। তাই বলে এভাবে দেখবেন না, সুকান্তকে চাকরি দেবার জন্যেই দীপঙ্করকে তাড়ানো হল! বরং এভাবে দেখবেন, দীপঙ্করকে তাড়ানো হল বলেই নেওয়া হল সুকান্তকে। তা ছাড়া, শুনছেন,' গলাটা একটু খাটো করল বরেন: 'প্রিয়তমের চেয়েও প্রিয়তর কেউ থাকতে পারে ভাবতে পারতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম সুকুর পেট ভরলে আপনারও বুক ভরবে। এ হিসেবে মিল থাকবে। হ্যালো—শুনছেন? হ্যালো—' ওপারে শব্দ নেই। লাগ ভেলকি লাগ—বরেনও ছেড়ে দিল টেলিফোন।

কিন্তু দীপঙ্করকে, দুর্গাবালাকে, ওদের সমস্ত পরিবারকে কী করে মুখ দে
কাকলি! তাই বলে সে পালিয়ে যাবে না ককখনো, দুই হাতে যত শক্তি আছে রশিতে টান দেবে, প্রাণপণ চেষ্টা করবে দুর্ভাগ্যের ঘাটের থেকে বিকল চাকাটা কিনা তুলতে। পারবে, এক শো বার পারবে। যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সেই জ
জন্যে প্রস্তুত।

সমস্ত দিনটা ম্লান হয়ে রইল। আফিসের পর কাকলি সোজা চলে গে
দীপঙ্করের বস্তি।

তাকে দেখেই মড়াকান্না শুরু করল দুর্গাবালা। আর দুর্গাবালাকে কাঁ
দেখে শিশুগুলোও স্বর জুড়ল। আভা বিষ্টুও দলছাড়া রইল না। দিদি আঁচলে চোখমুখ ঢেকে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে দাঁড়াল এসে সামনে। দীপঙ্করের বাবা যে শুধু উঠোন আঁকড়ে ধরে ধোঁকে সেও হঠাৎ কপাল চাপড়া
লাগল মাটিতে।

'কি, কী হয়েছে?' চারদিকে ব্যাকুল চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল কাকলি

কেউ মারা গিয়েছে এমনি মনে হচ্ছে। এমন কেউ মরেছে যাকে কাকলি
চেনে। তাই এই অঝোর কান্না। কিন্তু কে সে প্রিয়জন? তবে কি—তবে কি—

পাশবাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে এদের? কোনো শোক—মৃত্যু
আত্মহত্যা?'

'ওদের চাকরি চলে গিয়েছে।'

কাকলির মনে হল চাকরি নামে এদের এক বলিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ আত্মীয় ছিল
সমস্ত সংসারের যে স্তম্ভ। পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সে মারা গিয়েছে অপঘাতে
বন্দুকের গুলিতে।

দুর্গাবালার কাছে এসে বসল কাকলি।

অনেক পরে চোখ মুছে দুর্গাবালা বললে, 'তুমি এ ছলনাটা না করলেই পারতে
কোথায় তুমি দীপুর মাইনে বাড়িয়ে দেবে বললে, তা নয়, উলটে তাকে ডিসমি
খাওয়ালে আর তার জায়গায় বসালে তোমার স্বামীকে! শুনেছি বড়লোকে
ধর্ম নাকি আলাদা। কিন্তু, তুমি বলো, বড়লোক বলেই ধর্ম বরদাস্ত করবে
অবিচার!'

'করবে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতে আমার কোনো হাত নেই।'

'তোমার হাত নেই?'

'না, সব আমার শত্রুর চক্রান্ত।'

'শত্রুর !'

'হ্যাঁ, আমার স্বামীর।' মাথা নোয়াল কাকলি।

'এসব তুমি কী বলছ !'

'বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু যা বলছি তার এক বর্ণ মিথ্যে নয়। সম্প্রতি স্বামীই আমার প্রতিপক্ষ। আর আমাকে জব্দ করবার জন্যেই তার এই কারসাজি।'

মুখের দিকে মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল দুর্গাবালা।

'স্বামী যে শত্রু হতে পারে তা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না ? ঐ উঠোনে বসে যে ধুঁকছে, সমস্ত আয় ফুঁকে দিচ্ছে নেশাভাঙে, ও আপনার শত্রু নয় ? আপনাকে বলেছি, অপরাধে আমার হাত নেই, কিন্তু তার প্রতিকারে হাত আছে। নিশ্চয় আছে, এক শো বার আছে। আমি তার প্রমাণ দেব। কিছু প্রমাণ এখুনি দিচ্ছি— এখুনি—' ব্যাগ খুলে কিছু টাকা বের করল কাকলি।

টাকা দেখে প্রথমে ভয় পেল দুর্গাবালা। হাত সরিয়ে নিতে চাইল।

'দীপু যেমন আপনার ছেলে আমিও তেমনি আপনার মেয়ে। বিপদের দিনে সমর্থ মেয়েকে সাহায্য করতে দেবেন না কেন ?' দুর্গাবালার হাতে নোট কখানা জোর করে গুঁজে দিল কাকলি। বললে, 'এ যদি আমার ছলনা হত, আমি আসতাম না, হোক সামান্য, তবু এই সামান্য টাকাও দিতাম না আপনাদের, অন্যায়ের প্রতিকারের পথ খুঁজতাম না—'

'না, না, স্বামীর সঙ্গে বিরোধ ভালো নয়।' দুর্গাবালা বলছে আর আঁচলের খুঁটে নোট বাঁধছে।

'এ বিরোধ স্বামীর সঙ্গে কিনা জানি না, কিন্তু এ বিরোধ ক্ষুদ্রতার সঙ্গে, ঔদ্ধত্যের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে।' উঠে পড়ল কাকলি : 'দীপঙ্করবাবু কোথায় ?'

কাছেই কোথায় আছে, ডাকতে গেল ছেলেরা।

জলন্ত দুঃস্বপ্নের মত দাঁড়াল এসে দীপঙ্কর। দেখল কাকলিকে। যেন পরাভব মানবে না এমন আনন্দ তার চোখে। যেন নিঃশেষ হবে না এমন অভয় তার আননে।

'আপনাকে উইদাউট নোটিশে ডিসচার্জ করেছে ?'

'হ্যাঁ, উইদাউট নোটিশে।' বললে দীপঙ্কর।

'আপনি কোর্টে মামলা করুন। ডিসচার্জ ভ্যালিড নয়।'

'মামলা করব কার বিরুদ্ধে ?'

'ফার্মের বিরুদ্ধে। বাপ-ছেলের ফার্ম, বাপ-ছেলের বিরুদ্ধে।'

'আর যে লোকটা বসল, বা যাকে বসাবার জন্যেই আমাকে খসাল তাকেও দ্র হলে ডিফেনডেন্ট করতে হয়।'

'করবেন, এক শো বার করবেন। কাউকে ছেড়ে দেবেন না।' কাকলি প্রখরকণ্ঠে বললে, 'ওদের সমস্ত ভুয়ো প্রেস্টিজ গুঁড়ো করে দেবেন।'

'কিন্তু মামলার টাকা পাব কোথায়?'

'টাকা আমি দেব।'

'আপনি দেবেন?'

'হ্যাঁ, আমার উপার্জনের ক্ষমতাকে সার্থক করব।'

৩৫

'ছি ছি ছি, তুমি এইরকম?' ঘরে নিরিবিলি হবার পর বলা নেই কওয়া নেই, কাকলি হঠাৎ ঝাঁজিয়ে উঠল।

'এটা তো আমারও মনের কথা।' বললে সুকান্ত।

'তোমারও মনের কথা! তোমার মন যে এত ক্ষুদ্র তা কে জানত!

'আর তোমার মন যে এত কুটিল এত কুৎসিত তাই বা কি জানা ছিল আমার?'

'কুৎসিত? তা তো তুমি এখন বলবেই। কিন্তু, আমার কথা থাক। তুমি—' অলক্ষিতে এক পা কাছে এগোল কাকলি: 'তুমি কী বলে এক গরীব মানুষের চাকরি খেলে?'

'গরীব মানুষ!' আকাশ-থেকে-পড়া ফ্যাকাশে মুখ সুকান্তর: 'সে আবার কে?'

'সে আবার কে! ন্যাকা সাজতে চেয়ো না। সে তোমার দীপঙ্কর।'

'আমি তার চাকরি খেলাম মানে?' ঝাঁজিয়ে উঠল সুকান্ত: 'আমি কি তার এমপ্লয়ার? তার মনিব?'

'সেটাই তো দি মোস্ট আনকাইণ্ডেস্ট কাট। তুমি তার বন্ধু।'

'বন্ধু! সবাই সবার বন্ধু।'

'তাই তো দেখছি—'

'বন্ধু— তা হয়েছে কী! ওর চাকরি খাওয়াতে আমার হাত কোথায়?'

'তোমার হাত নয় তো কার হাত?'

'ওর মাস্টার বরেন— বরেনের হাত।'

'হাত বরেনের হতে পারে কিন্তু গ্রাসটা তোমার।' কাকলি রি-রি করে উঠল: 'পাঠাটা কাটল বরেন কিন্তু খেলে তুমি।'

'তার আমি কী জানি!' উদাসীন হবার ভঙ্গি করল সুকান্ত: 'ক্ষুধার্ত হয়ে খেতে চেয়েছি খেতে দিয়েছে। মাংসই খেতে দিয়েছে। কিন্তু সেটা কার পাঁঠা তা আমি বুঝব কী করে?' কিরকম তির্যক রেখায় তাকাল সুকান্ত।

'ছি ছি ছি,' ধিক্কারে শতধা হতে চাইল কাকলি: 'তুমি শুধু ক্ষুদ্র নও, ভয়ংকর ক্ষুদ্র।'

'কেন, আমার কী অপরাধ! তুমি তো খুব আইন মানো, আইনকেই বলো শেষ সীমা। সেই সীমা আমি লঙ্ঘন করলাম কোথায়? অনেস্টলি একটা চাকরি চাইলাম, ফ্যায়ার অ্যাণ্ড স্কোয়ার পেয়ে গেলাম একটা। টার্মস ভালো মনে হল— তোমার চেয়ে অন্তত বেশি মাইনে— রেডিলি অ্যাকসেপ্ট করলাম। এতে আইনের চোখে আমি দণ্ডনীয় কিসে? এ আমি বলি নি যে ওকে কেটে আমাকে বসাও। ওর থেকে কেড়ে নিয়ে আমাতে ঢালো। আমি পৌঁছে দিতে বলেছি, আমাকে পৌঁছে দিয়েছে। গাড়ি জলে এসেছে না ধোঁয়ায় এসেছে, তেলে এসেছে না ঠেলে এসেছে এ আমার প্রশ্ন নয়—পারেই না হতে।'

'কিন্তু যখন তুমি দেখলে তোমার চাকরির সুবিধে করে দেবার জন্যে আরেকজনকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হল, আর যে বরখাস্ত হল সে আর-কেউই নয়, তোমারই বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়—তুমি জানো, কী দুঃস্থ আর দুর্বল—তখন কি তোমার বলা উচিত ছিল না, এ চাকরি আমি নেব না, অন্তত এ অবস্থায় নেব না?' কাকলি হাঁপাতে লাগল: 'বলো, ছিল না উচিত?'

'না। কোনো আইনে তা লেখে না।' আচার্যের মত ভঙ্গি করল সুকান্ত: 'দেওয়ানি ফৌজদারি কোনো আইনই নয়। আর ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন, আইনেরই জয় হোক।'

'তাই হোক। তাই হবে।' কাকলি গুম মেরে বসে রইল চেয়ারে।

'ধরো, তুমি এক চাকরি, আমার হাতে আসবার জন্যে তুমি নিসপিস করছ, আর আমি ভাবছি তোমার থেকেই আমার জীবনের সর্ব প্রমোশন হবে, সর্ব উন্নতি-উৎপত্তি, তখন বলো আমি তোমাকে নেব না, যদি দেখি আরো একজন, এক-

জন কেন, আরো অনেকে, তোমার জন্যে ঘুরঘুর করছে, ছোঁক-ছোঁক করছে ?' চেয়ার ঘুরিয়ে বসল সুকান্ত : 'তা হলে তো জীবনে কোনো প্রতিযোগিতায়ই নামা যায় না, ছিনিয়ে নেয়া যায় না কোনো পুরস্কার। আর, জীবন—জীবন একটা অখণ্ড প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কী !'

'এই ব্যাপারটা তাই হল ?' ঝলসে উঠল কাকলি। 'একটা ওপন্ কম্পিটিশন হয়, ঢালা মাঠে ফ্ল্যাট রেস হয়, অনেকের মধ্যে দৌড়ে যে প্রথম হবে, তা বিচার যেমন-তরই হোক না কেন, তাকে পুরস্কৃত দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। মনে জ্বালা ধরে না। কিন্তু এখানে ? কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ! এখানে একটা প্রাইজ-পাওয়া লোকের হাত থেকে প্রাইজটা কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে চম্পট দেওয়া। এটা প্রতিযোগিতা হল ?'

'হরে-দরে সে একই কথা। কিন্তু এখানে প্রাইজ-পাওয়া লোকের হাত থেকে প্রাইজটা কাড়ছে কে ? নিশ্চয়ই সে চম্পট-দেওয়া লোকটা নয়। প্রাইজ কাড়ছে স্বয়ং বিচারক। সেই সিদ্ধান্ত করছে এ পুরস্কার প্রথমের প্রাপ্য নয়, দ্বিতীয়ের প্রাপ্য। বিচারক তার ভুল সংশোধন করে প্রথমের থেকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয়কে, তুমি যাকে চম্পটী বলছ সেই চম্পটীকে দিয়ে দিচ্ছে। চম্পটী কী করবে ? নেবে না' ?'

'না, নেবে না। ফিরিয়ে দেবে।' মুখিয়ে উঠল কাকলি।

'কী বুদ্ধি ! সাধে কি বিচার করতে দেয় না মেয়েদের ! যারা আজন্ম শুধু টিচার তারা বিচার করবে কী।' চেয়ারটা আরো একটু কাছে টানল সুকান্ত : 'চম্পটী যদি প্রাইজ ফিরিয়ে দেয় তো বিচারককে দেবে। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে বিচারক তা আবার লম্পটীর হাতে পৌঁছে দেবেন।'

'কার হাতে ?'

'লম্পটীর হাতে।'

'তার মানে ?' রক্তের মধ্যে জ্বলতে লাগল কাকলি।

'তার মানে, আমি চাকরিটা না নিলেই বরেন দীপঙ্করকে পুনর্বহাল করত না। আমি চাকরি নিই কি না-নিই, দীপঙ্কর বরখাস্ত হতই। আমি চাকরি না নিলে লাভ কী হত ? দীপঙ্কর তো যেতই, আমারও হত না। লাঠিও ভাঙত, সাপও মরত না।'

'না, তুমি চাকরির জন্যে হন্যের মত অমন হুমড়ি খেয়ে না পড়লে, খসত না দীপঙ্কর। তাকে বাঁচানো যেত। বাঁচানো যেত তার ছেঁড়াখোঁড়া ঝুরঝুরে সংসার।'

'বাঁচানো যেতো না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুকান্ত।

'যদি বাঁচানো না-ও যেত তুমি মহৎ হতে। তোমার হাতে রক্ত লাগতে দিতে না। বন্ধুত্ব বলে তবু একটা কথা তো এখনো চালু আছে সংসারে—তুমি তার মান রাখতে।'

'তুমি যেমন এখন স্বামিত্ব বলে চালু কথাটার মান রাখছ! কিন্তু কেন?' ঘুরে দাঁড়াল সুকান্ত: 'তুমি স্বামীর পক্ষে না থেকে কেন এক আগন্তুকের পক্ষে থাকবে?'

'আমি ন্যায়ের পক্ষে থাকব।' অন্যদিকে মুখ ফেরাল কাকলি: 'যা একুইটি আর গুড কনসায়েন্স, যা ন্যাচারেল জাস্টিস, তার পক্ষে।'

'তার মানে স্বামীটা একটা আন্‌ন্যাচারেল জাস্টিস?'

'আমি তা বলি নি।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ স্বামীর বিরুদ্ধে কেউ যদি, কেউ কেন, তার বন্ধু যদি মামলা করে, তবে স্ত্রীর ভাবনার একটা অবকাশ থাকবে সে কোন দিকে যাবে। স্বামীর দিকে, না বন্ধুর দিকে। আহা, কোন দিকে ন্যাচারেল জাস্টিস! যেদিকে স্বামী সেদিকে স্ত্রী এটাই যেন ন্যাচারেল নয়। নয় স্বতঃসিদ্ধ।'

'না, নয়।' গর্জে উঠল কাকলি। 'ন্যায়ের ক্ষেত্রে দুই প্রতিপক্ষ, স্বামী আর বন্ধু, স্ত্রীর কাছে সমান।'

'সমান?' যেন নতুন শুনছে এমনি ভাবে আওয়াজ তুলল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, কোথায়, কেন তার পক্ষপাত হতে যাবে? দুইই তার পর, বিদেশী—সমান আগন্তুক। কারুর সঙ্গেই তার রক্তের সম্পর্ক নেই।'

'রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আহাহা, প্রেমের সম্পর্ক?'

'কখনো-কখনো ন্যায় প্রেমের চেয়েও বড়।'

'তাই বলো। বড়। তবে সমান-সমান বলছ কেন?' ঘৃণা-লেখা মুখে ঝাঁজিয়ে উঠল সুকান্ত: 'স্বামীর চেয়ে বড় বন্ধু। চম্পটীর চেয়ে বড় লম্পটী।'

'ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।' চেয়ারের হাতল ধরে রুখে উঠল কাকলি।

'প্রেমিক ভাবে কথা বলতে শিখিয়েছিলে এককালে, দয়া করে এখন আবার ভদ্র ভাবটা শিখিয়ো না। ভদ্র ভাব যেখানে আছে সেখানেই থাক। তোমার মুখ যখন এখন ওদিকে, আমার দিকে নয়—'

'নয়ই তো। যে নির্মম, ক্ষুদ্রাত্মা, যে প্রতারক দস্যু, তার দিকে কেউই থাকে না—'

'এ পার্টটা বুঝি তোমার হালের অভিনয় থেকে পাওয়া?' কিরকম বিশ্রী করে

হাসল সুকান্ত : 'বেশ তো, থাকতে হবে না আমার দিকে, আমার এলেকায়! তোমার সেই ভদ্রতার স্বর্গে, বস্তিতে গিয়ে বাসা নাও। দীপঙ্করী হও।'

'কি, কী বললে?'

'বললাম, সেবার তেল ঢেলে পূজার দীপকে উজ্জ্বল করো।'

'ইতর জঘন্য কোথাকার।'

'এর চেয়ে আর তীব্রতর গালাগাল পেলে না? পাবে। যেখানে যাচ্ছ সেখানে পাবে অনেক শব্দের ফুলঝুরি। দীপ নিবে গেলেও দেবীর বিসর্জন হবে না। গলির মুখে এসে ঠেকে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে। স্বস্তির প্রতিমা তো আর নয়, থাকবে বস্তির প্রতিমা হয়ে।'

'তাই থাকব।' দাঁড়িয়ে পড়ল কাকলি: 'ভয় কী। নইলে, তোমাকে তো চিনি, পুরোপুরি নিজেকে তুমি আবিষ্কার করবে কী করে?'

'আবিষ্কার! আরো আবিষ্কার!'

'হ্যাঁ, আরো। আবিষ্কার করবে কোন কাঠামোর ঘরে যেতে অন্ধকারে ভুল করে এই প্রতিমার ঘরে এসে উঠেছ। আর কাকে বলতে কাকে বলছ সেইসব প্রেমের কথা, মামুলি কথা, মুখস্থ কথা—আস্তাবল না শুঁড়িখানা না ধাঙড়পটি থেকে কুড়িয়ে আনা—আহা, কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে চটের বিছানায় শুয়ে শুনবে না, শোনাবে না আরেকবার?'

সুকান্তের ইচ্ছে হল কাকলির গাল-গলা জুড়ে এক প্রভূত চড় কষে। কিন্তু না, সংযত করল নিজেকে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে ছাদে চলে গেল। যার হাতে চরম অস্ত্র আছে সে কি চড়চাপড়ের ঝামেলা পোহায়? পথের থেকে কুড়িয়ে কে ঢিল ছোঁড়ার পরিশ্রম করে যার হাতের বন্দুক গুলিভরা!

ছাদে উঠে অন্ধকার একাকিত্বে দেহ-মন অনেক ঠাণ্ডা করেছিল সুকান্ত, এবং পরে, রাতের নির্জন বিরামে, অশব্দের মাঠে শুয়ে; কিন্তু আফিসে আসতেই সূক্ষ্ম ছুঁচে খোঁচা মেরে বরেন তাকে তাতিয়ে তুলল।

'দীপঙ্করের চাকরি যাওয়াতে মিসেস বোস খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে হচ্ছে—'

'কী করে বুঝলে?' বলবে না ভেবেছিল তবু না বলে পারল না সুকান্ত।

'বাটারওয়ার্থে ওকে ঢোকাবার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন শুনছি।'

'চেষ্টা করছেন, পারবেন ঢোকাতে?' বিপন্নমুখে তাকাল সুকান্ত।

'কী করে পারবে? যখন জানবে আমরা ডিসচার্জ করে দিয়েছি তখন ওরা সাহস পাবে না। ওরা তো আমাদের অজানা নয়। তবে—'

'কী তবে?'

'তবে মিসেস বোস এরই মধ্যে বেশ ইনফ্লুয়েন্সিয়্যাল হয়ে উঠেছেন, ওঁর খাতিরে কোনো ডিপার্টমেন্টাল হেড না পথ ছাড়ে, পথ ছেড়ে জায়গা দিয়ে বসে।'

'খাতিরে ?'

'হ্যাঁ, হয়তো বলবে, কোনো প্রসিডিং করে তাড়ানো হয় নি, কোনো চার্জ নেই, ফাইণ্ডিং নেই, নৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো কিছুই নয়, তখন নতুন জায়গায় টাটকা চাকরি পেতে দোষ কী ! আরো হয়তো বলবে, এভাবে চাকরি নেওয়া নৃশংস খামখেয়াল, অকপট অন্যায়—এরকম সব বলে-কয়ে কিছু সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে হয়তো—তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কিছু সুরাহা করতে পারবে না।'

'একটা মেয়ে-কেরানির কথায় একটা ফার্মের লোক নেবার পলিসি নির্ণীত হবে এ তো কলঙ্কের কথা।'

'অথচ চেষ্টা করলে তোকে কিন্তু ঢোকাতে পারত। তুই স্বামী শুধু এই স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশনে। সেটা তা হলে কত গৌরবের হত বল দেখি।

'এখন গৌরবশশী অস্তে চলেছে।'

'হ্যাঁ, বাটারওয়ার্থে না হোক অন্য কোনো ওয়ার্থে—বাটারে না হোক, অন্তত গাটারে—মিসেস বোস ওকে ঢুকিয়ে দেবেনই দেবেন। যে পরিমাণ ঘুরছেন ওঁরা দু-জনে, একসঙ্গে।'

ঘোরাঘুরির কাজ তো সুকান্তেরও। সুকান্ত বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে লাগল। দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে।

'হ্যালো। চিনতে পাচ্ছেন ?'

'আপনাকে চিনব না ?' কাকলি একটু ব্যঙ্গের টান আনতে চাইল।

'কিরকম লাগছে ? শত্রু-শত্রু, না মিত্র-মিত্র ?'

'শত্রু-শত্রু।'

'এখুনি মিত্র-মিত্র হয়ে যাচ্ছি। আপনার দীপঙ্করকে পাঠিয়ে দেবেন।'

'আমার দীপঙ্কর মানে ?'

'সরি, আমাদের দীপঙ্কর। কিন্তু পাঠিয়ে না দিলে ওকে নতুন আরেকটা চাকরি দিই কী করে ?'

'পাঠিয়ে দেবার মালিক কি আমি ?

'আহা, একটা খবর তো দিতে পারেন। আমি তো আর এ অবস্থায় ওকে ডেকে এনে ফের চাকরি দিতে পারি না। ওর তো একবার আসতে হয় নতুন দরখাস্ত নিয়ে। সব কিছুরই তো একটা শ্রী আছে, রীতি আছে—'

'আপনার আফিসে নতুন যে গুণধরকে রেখেছেন তাকে পাঠান না—'

'সে যাবে না।'

'যাবে না মানে ? সে আপনার চাকর, আপনি বললে সে না যাক তার ঘাড় যাবে।'

'সে তো চায় না দীপঙ্কর চাকরি পাক, আপনি সুখী হন !'

'আর আপনি চান আমার সুখ ?'

'চাই বলেই তো দীপঙ্করকে আর কোথাও একটা চাকরি দেবার জন্যে উসখুস করছি।'

'থাক, উসখুসুনি ভালো নয় ! দীপঙ্কর যাবে না আপনাদের কাছে।'

'যাবে না ?'

'না। সে অন্যত্র গেছে।'

'অন্যত্র ? কোথায় ?'

'আদালতে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধতা।

'শুনুন, শুনছেন ?' এবার কাকলির উদ্যোগ।

'শুনছি—'

'যদি কিছু আমার টাকার দরকার হয়, পারবেন দিতে ?'

'টাকা !' যেন অভাবিত এমনি বিস্ময়ের স্বর বেরিয়ে গেল অলক্ষ্যে।

'হ্যাঁ, ধার। আমি পরিষ্কার শোধ করে দেব। জানেন তো আমার এখন অনেক ক্রেডিট, যাকে বলে লং ক্রেডিট—তাই আমার সঙ্গে ডিল করা মোটেই রিস্কি নয়—'

'না, নয়—'

'অবশ্যি আমি এখানে বা অন্যত্রও রেইজ করতে পারি। তবে যেহেতু আপনি আমার সুখ চান—কী, চান না ?'

'চাই।'

'তাই, দরকার বুঝলে, আমাকে সুখী করবার সুযোগ দিতে চাই আপনাকে। আর সেই সঙ্গে আপনারও তো সুখী হওয়া, কী বলেন ?' মধুর স্বরে হেসে উঠল কাকলি : 'কৃষ্ণ সুখে সুখী। কী, ঠিক নয় ?'

'হ্যাঁ, বলবেন, চেক পাঠিয়ে দেব।'

'চেক কেন ? হাতে-হাতে হয় না ?'

'হয়। দেবেন হাত পাঠিয়ে।'

দু'জনে সমস্বরে হেসে উঠল।

ঘোরবার জন্যে সুকান্তকে গাড়ি দিল বরেন। আর সুকান্তের অলি-গলির যাতে ভুল না হয় নিজেই মাঝে মাঝে লাঞ্চ টাইমে তার সঙ্গী হল। ঐ দেখ, ঐ আফিস-গেটের সামনে ঐ দীপঙ্কর না? আর উনি, উনি কে? হ্যাঁ, কাকলি। সমর্থন করতে একটুকুও বেগ পেতে হল না সুকান্তের। ওরা একসঙ্গে ঢুকল কোথায়? ওটা বোধ হয় রেস্তরাঁ। আর ঐ যে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি? ওটা বোধ হয় বাস-স্ট্যাণ্ড। একসঙ্গে যাবে বুঝি কোথাও! আর কোথায়! নিশ্চয়ই দীপঙ্করের বস্তিতে। এলোমেলো নিরিবিলিতে।

কিন্তু সেদিন বরেন যা দেখাল তার আর ভাষ্য-ব্যাখ্যার প্রয়োজন হল না। দীপঙ্কর আদালতে নালিশ করেছে। সমন জারি করতে এসেছে আফিসে। শুধু বরেনের আর তার বাবার উপরে নয়, সুকান্তেরও উপরে। হ্যাঁ, সুকান্তকেও পক্ষ করেছে— মোকাবিলা বিবাদী করেছে। দীপঙ্করের নালিশ, তার বরখাস্তটা বেআইনী হয়েছে, আইনের চোখে সে এখনো চাকরিতে অধিষ্ঠিত, তার পূর্বতন সমস্ত সুখ-সুবিধের সে অধিকারী—এই মর্মে চাইছে সে ঘোষণা।

'কিন্তু, আশ্চর্য, তুই এই মামলায় আসিস কী করে?' বরেন জিজ্ঞেস করল।

'বুঝতে পাচ্ছিস না, এটা ওর—কাকলির কারুকার্য। যাতে আমি জব্দ হই, অপমানিত হই, চুনকালির কিছু ছিটেফোঁটা আমারও মুখে লাগে!'

'কিন্তু যাই বল, দীপঙ্কর মামলা যখন করেছে তখন আমি ওকে স্ম্যাশ করব।' টেবলচাপাটা বরেন ঠুকল সজোরে।

'আর আমারও ছিল কিছু স্ম্যাশ করবার।' আরেকটা টেবলচাপা কুড়িয়ে নিল সুকান্ত।

'করবি? সত্যি?' একটু কি এখন উৎফুল্ল দেখাল বরেনকে?

'হ্যাঁ—কোনোক্রমে ওর— কাকলির চাকরিটা খতম করে দেওয়া যায় না? সত্যি, দুঃসহ ওর এই অহংকার। শুধু চাকরির জোরে, আমার সঙ্গে কথা না বলে, আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে, সর্বাঙ্গীণ অগ্রাহ্য করে, আমারই সঙ্গে থাকতে পারছে এক বাড়িতে, এক ঘরে। শুধু চাকরির জোরে সংসারের কোনো উপেক্ষা, কোনো লাঞ্ছনা, কোনো অপমানই গায়ে মাখছে না। অসম্ভব। যদি গুঁড়ো করে দেওয়া যেত তার ঐ স্পর্ধাটাকে—'

'তা হলে লাভ কী হত? তা হলে তুই তো আরো বেশি জব্দ হতিস। একটা বেকার, অবাধ্য, অসুখী স্ত্রীকে টানতে হত সারা জীবন। এ তো আরো চুনকালি।

তা ছাড়া,' ঢোঁক গিলল বরেন: 'একটা স্ত্রীলোকের চাকরি খসানো কি সোজা কথা? দেখছিস তো, আবার সেই মামলা' সেই কেঁচে গণ্ডূষ, সেই থুতু ফেলে থুতু খাওয়া। তার চেয়ে—' গহন চোখে তাকাল বরেন।

'তার চেয়ে বিয়েটা খসিয়ে দেওয়া অনেক সোজা। এক শো বার।' উঠে পড়ল স্থকান্ত: 'সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত কী! যে অবস্থায় আছি, তার চেয়ে ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়িতে থাকাও নিরাপদ।'

ঘুরতে গেল স্থকান্ত, আর বরেন তুলে নিল রিসিভার।

'হ্যালো। মিসেস বোস?'

'উঃ, কী জঘন্য সম্বোধন! কেন, শ্রীমতী কাকলি বলতে পারেন না?'

'আর পদবী?'

'পদবী অবান্তর। মানুষের আবার পদবী কী! সাহিত্যিকের আবার ডিগ্রি কী!'

'ঠিক। সুন্দরীর আবার গয়না কী! শুনুন, দুটো অবান্তর কথা জিজ্ঞেস করি।'

'করুন।'

'আপনার— সরি— আমাদের দীপঙ্কর সত্যি কী চায়?'

'কী চায় মানে? কোথায়? কার কাছে?'

'মানে, আদালতে।'

'কেন, আর্জির নকল পান নি?'

'পেয়েছি। কিন্তু, মানে—' ঢোঁক গিলল বরেন: 'মানে, আপনি কী চান? মানে, আপনি কি চান যে দীপঙ্করকে আবার চাকরি দিই?'

'এক শো বার চাই। শুধু চাকরিটাই দেবেন না, মাইনেটাও বাড়িয়ে দেবেন সেই সঙ্গে।'

'আর স্থকান্ত?'

'স্রেফ তাড়িয়ে দেবেন, ক্লিয়ার আউট করে দেবেন। নাড়াবুনে ছিল কীত্তনে হবার সাধ হল। আগে লেখাপড়া নিয়ে থাকত তবু একটা ভদ্রতা ছিল, এখন কী একটা স্যুট পরেছে বলুন দেখি— কোথাকার সে দর্জি কে জানে—মনে হচ্ছে যেন সার্কাসের ক্লাউন চলেছে। আপনি আর লোক পেলেন না চাকরি দেবার? চাকরি দেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না?'

'সেটা ভুল হয়েছে।' টেলিফোনেই যেন মাথা চুলকোল বরেন: 'কিন্তু এখন স্থকুর চাকরি থাকা কি না থাকায় আপনার আর কোনো ইন্টারেস্ট থাকার কথা নয়

'কেন বলুন তো?'

'সুকু আপনার বিরুদ্ধে মামলা করছে।'

'মামলা? কিসের মামলা? রেষ্টিটিউশন অফ কনজ্যুগাল রাইটস্?' হাসল কাকলি।

'না। তার উলটো। ডিভোর্স। বিবাহ-বিচ্ছেদ।'

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি: 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বিচ্ছেদ নয়, উচ্ছেদ। বউ-উচ্ছেদের মামলা। উঃ, বাঁচা যাবে। সব কটা টাকা ধরে রাখতে পারব হাতের মুঠোয়। কেউ দালালি-মোড়লি করতে পারবে না। নিজের পাঁঠা মনের সুখে অগ্রে-পশ্চাতে কাটতে পারব। খাই কি না-খাই, শুই কি না-শুই— একেবারে মুক্ত বর্শা, ফ্রি লান্স।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে আপনি ডিরেক্টলি শুধু দীপঙ্করেই ইণ্টারেস্টেড, ছাট ইজ, দীপঙ্করের চাকরিতে।'

'ইউ আর রাইট। আপনি একবার নিজের চোখে দেখে আসুন ওদের অবস্থা। শিশুগুলি কী মিষ্টি, অথচ কী করুণ, কী অসহায়! ওদেরকে বস্তি থেকে ফুটপাতে, ফুটপাত থেকে নর্দমায় নেমে যেতে দেব না। ওদেরকে আমরা তুলব, আস্তাকুড় থেকে অঙ্গনে, দৈন্য থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে, বস্তি থেকে প্রাসাদে। কী, পারবেন না? পারবেন না আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে?'

'পারব।'

'তবে দেবেন হাত পাঠিয়ে।' আগের আরেকদিনের কথা মনে করে হাসল কাকলি: 'তবে রিক্ত হাত পাঠাবেন না।'

'না। ডাকাতে হাত না হোক, টাকাতে হাত পাঠাব।'

'না। টাকার চেয়েও বড় জিনিস পাঠাবেন। হাতের সঙ্গে পাঠাবেন আপনার হৃদয়।'

বরেনের হাতে রিসিভারটা কেঁপে উঠল। মনে হল তার হাতের মুঠোতে তার হৃদয়ই কাঁপছে বুঝি।

তারপর ব্যাপারটা খুব হঠাৎ ঘটে গেল এবং খুব সংক্ষেপে।

সকালবেলায় দর্জি এসেছে, সুকান্তের স্যুটের বিল নিয়ে।

চোখ একবার ছানাবড়া করল সুকান্ত। পরে বলল, 'এত টাকা একসঙ্গে দিতে পারব না। এ মাসে এক শো টাকা নিয়ে যান।' বলেই হাঁক পাড়ল : 'মা, এক শো টাকা দাও।'

মৃণালিনী বেরিয়ে এল। বললে, 'কেন, টাকা কেন ?'

'দর্জির বিলের বাবদ দিতে হবে।' মাকে তবু দ্বিধা করতে দেখে সুকান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'তোমার কাছে তো আমার টাকা আছে, সেই থেকে দাও না।'

'তোর টাকায় এখুনি হাত দিয়ে দরকার কী!' কটাক্ষগর্ভ চাউনি হানল মৃণালিনী : 'তোর বউকে বল না। স্বামীর পোশাকের টাকা দেয় না স্ত্রী ? পারে না দিতে ?'

'বলতে হলে তুমি বলো।' একটু বুঝি আড়াল হল সুকান্ত।

কাকলিকে ডাকাল মৃণালিনী। বললে, 'তুমি তো আইটেমের উপর খরচ করতে চাও। এবার পোশাকের আইটেমে এক শো-টা টাকা দাও।'

'কার পোশাক ?' কাকলি থমকে দাঁড়াল।

'সুকুর। সেই যে স্যুট-টুট করেছে তার দাম। দর্জি এসেছে।'

আর কিছু হলেও না হয় হত। স্যুট শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল কাকলির। ঝলসে উঠে বলল, 'উনি আমাকে কখানা শাড়ি কিনে দিয়েছেন যে, ওঁর স্যুটের দাম দেব ?'

'ওর দেওয়ার দিন কি ফুরিয়ে গেছে ? কত পড়ে আছে ভবিষ্যতে। আজকে এর ঠেকা।'

'আমার ঠেকা আরো বেশি।'

'আহা, বাপের বাড়িতে এক মাস এক শো-টা টাকা কম দিলে কী হয় ?'

'বাপের বাড়িতে দিচ্ছি না। তারও চেয়ে দুঃস্থ পঙ্গু আরেক অসহায় পরিবারকে দিচ্ছি।'

'তারা আবার কে ?'

'তারা কেউ নয়। তারা বস্তিতে থাকে।'

'কেউ নয় তো তাদের দেবার দায় কী।'

'তাদের মধ্যে যে রোজগার করছিল সে আপনার ছেলের বন্ধু। আপনার ছেলে বন্ধু হয়ে বন্ধুর চাকরি খেয়েছে, বন্ধুকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসেছে গদিয়ান হয়ে। তাই সে পরিবারে যে ক্ষতি করা হয়েছে তারই আমি পূরণ করছি।'

'ক্ষতিপূরণ যখন করছ তখন,' রাগে নীল হয়ে বেরিয়ে এল সুকান্ত : 'তখন সম্পূর্ণ ষোল আনাই পূরণ করো গে যাও, এখানে সতী সেজে থাকবার দরকার কী। যাও, যাও চলে এ বাড়ি থেকে। বস্তিতে গিয়ে ওঠো, বস্তিবাসিনী হও। তোমার সঙ্গে এ বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। যাও এখুনি, এ মুহূর্তে। কী, গেলে ?' না গেলে গায়ে হাত তুলবে এমনি প্রায় ভঙ্গি করল সুকান্ত।

'যাচ্ছি। চেঁচিও না। সীন কোরো না।' আপাতত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল
লি। হাতব্যাগটা শুধু গুছিয়ে নিল। তার মানে এটাচি কেসটা খুলে টাকা
র ব্যাঙ্কের বই-টইগুলি তুলে নিল ব্যাগে। আর কিছু করল না—চুলে চিরুনি
ল না, শাড়ি বদলানো দূরস্থান, পরনেরটাও ঘুরিয়ে নিল না। আয়নায় মুখ
খল না পর্যন্ত। এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেল।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চোখের সামনে সমস্ত প্রত্যক্ষ করেও যেন কিছু বুঝতে পারল
মৃণালিনী।

আস্তে আস্তে চালু হল কথাটা। ছোট বউমা কোথায়? কাছেই কোথাও
য়েছে বোধ হয়, কিছু কিনতে-কাটতে। কই, ফিরছে না কেন? স্নান করবে
. খাবে না, আফিস যাবে না? সে কি, কে বললে আফিস আজ ছুটি? তবে?
গড়া করেছে স্বকুর সঙ্গে। শব্দে-নিঃশব্দে সে ঝগড়া তো রাতদিনই চলেছে, এ
বার নতুন কী! না, এবার ঝগড়ার নিবৃত্তি। এ স্বামীর ঘর সে করবে না, এ
কথা ঘোষণা করে গেছে। মোটেই তা নয়। স্বকুই তাকে বলেছে যেতে।
মৃদু করে বলছ কেন? স্বকুই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ করেছে।

সকলেই চুপ করে গেল, অকর্মণ্য অসহায় বলে মনে হতে লাগল নিজেদের।
কিছুই বলবার নেই, করবার নেই, খোঁজখবর নেবার নেই। প্রতিবাদ-প্রতিকারেরও
বকাশ নেই কোথাও। এ স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, দুনিয়ার আর কারু এলেকা-
ক্তিয়ার নেই। এ কারু ছেলে নয়, ভাইপো নয় যে কাগজে ছবি ছাপাবে
বিজ্ঞাপন দেবে, বাবা, ফিরে আয়, টাকা লাগে তো লেখ, তোর মা শেষ শয্যায়
য়েছেন। থানাতে প্রথম এত্তেলারও এ বিষয় নয়। কাউকে ধরবার-বলবারও
থ নেই।

মৃণালিনীই শব্দ বার করতে লাগল আস্তে-আস্তে।

'এরকম কত কথা কাটাকাটি হয় স্বামী-স্ত্রীতে, তারই জন্যে এমনি বাড়ি-ঘর ছেড়ে
লে যায় কে?'

'আর কী তেজ দেখ!' এক বিপদে আক্রান্ত, মৃণালিনীর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল
জয়া: 'কাউকে কিছু জানিয়ে গেল না। পরামর্শও নিল না কারুর।'

'পরামর্শ নেবে কী! সব আগে থেকেই ঠিক।' জুড়ল মৃণালিনী।

'চরম ঝগড়ার সময় লোকে তো চেঁচামেচিও করে। আশেপাশের লোক জানতে
ায়, ছুটে এসে মিটমাট করে দেয়। এ মেয়ে একটা চান্সও দিল না কাউকে।'

'চান্স দেবে কী! বলেছি না আগে থেকে সব ঠিক-করা। এ কোঠা-বাড়িতে

রুচছে না তাঁর। কোন বস্তিতে গিয়ে নাকি বাসা বাঁধবেন। গরিবের মোছাবেন।'

'না, না, ফিরে আসবে।' ঘর-দোর তদন্ত করছে, বলে উঠল বন্দনা: 'দেখছ না সব জিনিসপত্র ফেলে গেছে, এমন-কি প্রাণের এটাচিটা পর্যন্ত।'

'দেখেছি খুলে—ধড়টাই শুধু আছে, প্রাণ নেই।' হতাশ-হতাশ মুখ কর মৃণালিনী: 'আসল প্রাণ ঠিক সরিয়ে নিয়েছে।'

'কোথায় সরাবে? যতই চোটচাপট করুক, মেজাজ-দেমাক দেখাক, ফিরে আসবে গুটিগুটি। কেল্লা ফেলে কে যাবে খোলা মাঠে লড়াই করতে? না হস্তী।' বিজয়ার বুঝি বা একটু মায়া হল: 'সন্ধেটা হোক না।'

'দরকার নেই ফিরে এসে। আর ফিরে এলেই বা কী!' মৃণালিনী রুখে উঠ 'সুকান্ত কি ভেড়াকান্ত যে দরজাটা মুখের উপর বন্ধ করে দিতে পারবে ন ভালোবাসার বিয়ের কি চেহারা তা চিনতে কি আর তার বাকি আছে? দেখতে দেখতেই, দিন হতে না হতেই সন্ধে।'

'আর সন্ধে হতে না হতেই রাত বারোটা।' হাসল বিজয়া।

সুকান্তের ঘর নতুন করে ওলট-পালট করে সাজাল মৃণালিনী। কাকলির ট্র আর স্যুটকেস যা ছিল, যা চলতি কাপড়চোপড়, সব নিচে চালান দিল। ঘরটা অবিবাহিত করে দিল। কাকলি যদি কোনো ফাঁকে লুকিয়েও আসে, যেন দেখে, কোথাও নেই, নামে-গন্ধেও নেই, না স্মৃতিতে, না আশায়, না বা স্বপ্নের ধারে-কাছে

আফিসে প্রশান্ত রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গেল। আফিসে এসেছে তে চারটে সংখ্যা ঘুরিয়ে থেমে পড়ল হঠাৎ। সত্যি, এতে তার এক্তিয়ার কী? য বলে, এসেছি, তা হলে কি তার বলা সাজবে, ছি, রাগ কোরো না, বাড়ি ফিরে এস না, এ ব্যাপারে তার নাক ঢোকাবার, মাথা ঘামাবার অধিকার নেই। রিসিভ নামিয়ে রাখল প্রশান্ত।

সন্ধে করে বাড়ি ফিরল ভূপেন। ইতি-উতি শুঁকতে লাগল। না, ফেরে কাকলি। তার কথা কেউ উচ্চারণও করছে না।

হেমেন ইচ্ছে করেই অনেক রাত করল। বিজয়া সদর বন্ধ করতে এসেছি হেমেন জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধ করছ যে, সবাই ফিরেছে?'

নাটুকে মুখ করল বিজয়া। বললে, 'একজন শুধু ফেরে নি।' বললে দরজায় খিল চাপাল।

পরদিন বার লাইব্রেরি থেকে টেলিফোন তুলল ভূপেন। কী জিজ্ঞেস কর

ন্তুস করবার মত কী থাকতে পারে প্রশ্ন ? আর কিছু নয়, শুধোবে, কোথায় আছ, কানা কী। যদি উত্তরে বলে বস্তিতে আছি, তা হলে ? তখন পিঠ-পিঠ আবার রবে, মা, বস্তিতে থাকতে নেই, দালানে এসো। না, কোনো এক্তিয়ার নেই। বিয়ণ্ড রিসডিকশন। রিসিভার নামিয়ে রাখল ভূপেন।

হেমেনও চেষ্টা করল। সেও অফিসে বসে তুলল রিসিভার। কিন্তু কী রবে সে নতুন কথা ? তুমি কোথায় আছ, ঠিকানা কী, এসব প্রশ্ন নয়। কিংবা, মি ফিরে এসো, রাগ করে থেকো না, এ ধরনের অনুরোধ নয়। যদি কনেকশন য়, তাকে অভিনন্দন করবে। বলবে, ঠিক করেছ। নিজের মর্যাদাকে যে ম্লান রো নি, জানাই সংবর্ধনা। কিন্তু উত্তরে যদি শুধু বলে, থ্যাঙ্ক ইউ, তা হলে ? যা জে ভালো তাকে বাক্যে ভালো বলে বাহুল্য করে লাভ কী ? না, অ্যাকটিং ইদাউট জুরিসডিকশন। হেমেনও নামিয়ে রাখল রিসিভার।

অফিস থেকে সুকান্তকে টেলিফোন দিয়েছে বাড়িতে।

মৃণালিনীর স্ফূর্তি আর দেখে কে। অলক্ষ্মী চলে গিয়েছে বলেই সুকুর ঘরে বাজবে খন সৌভাগ্যের ঘণ্টা।

'হ্যালো, হ্যালো—' দুপুরবেলায় ঘুমন্ত মায়ের সঙ্গ ছেড়ে সেণ্টু এসেছে কাকার রে, ফাঁকা ঘরে, চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে এনে, ডায়াল-ফায়ালের ধার না ধেরে টলিফোনটা কানে লাগিয়েছে, চোঙের মধ্যে মুখ দিয়ে বলছে, 'হ্যালো—কে, কাম্মা ? া, আমি সেণ্টু। তুমি কী করছ ? বাড়িতে আসছ না কেন ? স্নান করো না, ও না, আছ কোথায় ? অ্যাঁ ? হ্যাঁ, শিগগির চলে এসো। আসবে তো ? হ্যাঁ, সো। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে—'

'ওমা, কী সর্বনাশ !' পাশের ঘর থেকে এসেছে বন্দনা।

ছুটে এসেছে মৃণালিনী।

'কী সাংঘাতিক দুষ্টু !' আতঙ্কে-আনন্দে উজ্জ্বল হল বন্দনা: 'বানিয়ে-বানিয়ে ক রকম বলছে দেখুন !'

'কিন্তু বলছে তো কাম্মার সঙ্গে। বাবার সঙ্গে নয়, কাকার সঙ্গে নয়, ঠাকুর-দাদের সঙ্গে নয়—কোথাকার কে এক বিদেশী মেয়ে—তার সঙ্গে !' মৃণালিনী মকে উঠল: 'রাখ, রাখ বলছি পাজি ছেলে।'

'হ্যাঁ, রাখছি, ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠাকমাটা এসেছে, বকছে। হ্যাঁ, মারতেও ারে। অ্যাঁ ? আসবে ? এসো। হ্যাঁ, আমি সেণ্টু।'

মৃণালিনী কেড়ে নিল রিসিভার।

৩৬

'পারলাম না।' কান্নার মত করে বলে উঠল কাকলি।

'কী পারলি না?' পাশে বসে বিনতা একটা পত্রিকা ঘাঁটছিল, জিজ্ঞেস করল চোখ তুলে।

'বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না।'

'কী বাঁচিয়ে রাখতে?'

তক্তপোশে শুয়ে ছিল কাকলি, মুখটা অন্য দিকে ফেরাল। বললে, 'আমার অহংকারকে বাঁচিয়ে রাখতে।'

'অহংকার?'

'হ্যাঁ, আমার প্রথম কদম ফুল।'

'সে আবার কী!' গম্ভের গলায় বললে বিনতা।

'গর্বের সৌরভে ভরা আমার নিটোল ভালোবাসা। কিছুতেই পারলাম না জিইয়ে রাখতে। সারাক্ষণ কেবল ঝগড়াই করলাম।'

'ভালোবাসা না হাতি! ভালোবাসার ছদ্মবেশ।'

'ছদ্মবেশই হবে।' আবার এদিকে মুখ ফেরাল কাকলি: 'কিন্তু কটা দিন-রাত্রি অপূর্বের কী পোশাক পরেছিল বল দেখি। একটা হাত-পাতা ভিখিরি রাজা সেজে এসেছিল। কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ, আমি মনে ভেবেছিলাম এ কোন মহারাজ! পারলাম না টিকিয়ে রাখতে।'

'ছেড়ে এসেছিস বলে তোর যে দেখছি এখন খুব অনুতাপ হচ্ছে।' বিনতা প্রা ধিক্কারের স্বর আনল।

'অনুতাপ নয়, বলতে পারিস আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে।' মৃদুরেখায় হাসবার চেষ্টা করল কাকলি: 'যে ভালোবাসা নিয়ে এত স্পর্ধা করেছিলাম, বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম তাকে বাঁচিয়ে রাখতে কেন আরো কৃচ্ছ্র করলাম না, কেন আরো ধৈ ধরলাম না, কেন আঘাতের বিনিময়ে আঘাতই হানলাম ক্রমাগত?'

'সত্যিই তো। ঐতিহ্য-ভ্রষ্ট হয়েছিল।' হাতের পত্রিকাটা সামনের টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলল বিনতা: 'একাদিক্রমে স্বামীই শুধু হানবে, আর স্ত্রী মাটি আঁকড়ে

পড়ে থাকবে ধৈর্য ধরে। আহা, সর্বসহা বসুমতী যে। তবে যা না, অপমান করে তাড়িয়ে দিলে কী হয়, পায়ে ধরে গিয়ে ক্ষমা চা, জুতোর ফিতে বেঁধে দে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে নির্ভেজাল ভেজিটেবল হয়ে থাক—'

'যা হবার নয়, যা অসম্ভব, তা বলিস কেন?' উঠে বসল কাকলি। চুলে হাতপ্যাচ দিয়ে বললে, 'কিন্তু কথা কি তবু একটু থেকে যায় না?'

'কী কথা?'

'কেন এমন হল? কেন পারলাম না?'

'না পারলে কী হয়?' ঝলসে উঠল বিনতা: 'আমিও তো পারি নি। তুই তো তবু ভালোবাসলি, বিয়ে করলি, ব্রহ্মস্বাদ পেলি—তারপর আর পারলি নে। কী না জানি বলেছেন বরেনবাবু, প্রেম ফ্রেম হয়ে গেল। কিন্তু আমি? আমি তো গোড়া থেকেই অপারগ। ভালোবাসা দূরের কথা, একটা বৈধ জৈব ঝংকার পর্যন্ত পেলাম না শরীরে। তাই বলে আমি কি হায় হায় করছি, না দু হাতে বুক চাপড়াচ্ছি?'

'হায় হায় আমিও করছি না। বুকও চাপড়াচ্ছি না দু হাতে।' হাসল কাকলি: 'তবু ভাগ্যকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেন এমন হল? কেন হেরে গেলাম? কেন ঘুড়িটাকে সুতো ছেড়ে-ছেড়ে রাখতে পারলাম না উড়িয়ে?'

'সোজা কথা, নাটাইয়ে আর সুতো ছিল না। সহ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলি।'

'ঠিক। সুতো ছিঁড়ে গেল। ফুরিয়ে গেল।'

'তাই, তোর হার কোথায়? তোর তো জিত। অপমানের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করতে পারলি। ছিঁড়তে পারলি দাসত্বের বন্ধন।' তপ্ত হতে তপ্ততর হতে লাগল বিনতা: 'নইলে এ কী জুলুম। বিদুষী হয়েছ যখন, তখন আলস্য করতে পাবে না, চাকরি করো, পয়সা কামাও। আর যদিও আয় তোমার, তোমার ব্যয়ের স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছেমত তুমি পারবে না খরচ করতে। প্রতি পদে হস্তক্ষেপ। তুমি পারবে না তোমার বাপের বাড়িকে সাহায্য করতে। কোনো দুঃস্থ বন্ধুকে ক্ষণিক উপশম দিতে। তুমি দাসী, তোমার টাকাও দাসী। তারপর পারবে না ইচ্ছেমত চলতে-ফিরতে, অন্তত বাড়ি ফিরতে। কী অন্যায়, বাইরে কলম পিষে এসে আবার বাড়িতে মসলা পেষো, ট্র্যাম-বাস ঠেলে এসে আবার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলো। এ যদি না করেছ, যদি বা চেয়েছ গায়ে-পায়ে স্বাধীনতার হাওয়া লাগাতে, তা হলেই, বেরিয়ে যাও, নাক-বরাবর সোজা পথ দেখ। বাপের বাড়ি নেই, কোথায় যে যায় মেয়েটা, তা পর্যন্ত বিবেচনা করল না—'

'ভাগ্যিস তুই ছিলি, তোর এই ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলটা ছিল—' কাকলি দেয়ালে পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসল।

'সেটা কিছু নয়, সেটা অবাস্তর। আসল হচ্ছে তুই ঐ অভদ্রতার পত্রপাঠ উত্তর দিতে পারলি, যোগ্য উত্তর—বেরিয়ে আসতে পারলি এক বস্ত্রে। এখানেই তো তোর জয়। তুই সমস্ত মেয়েজাতের মান রাখলি। অত্যাচারী পুরুষের ঔদ্ধত্যকে পারলি শায়েস্তা করতে। সম্মানের মালা তো তোরই গলায়।'

'তবু আয়নায় মুখটা কেন ঠিক উজ্জ্বল দেখছি না বলতে পারিস?' কাকলি তবু যেন রুক্ষ হতে পারছে না: 'একদিন জাঁক করে মুখটা তুলে ধরেছিলাম সূর্যের দিকে, পৃথিবীর দিকে। রোদ লাগুক, বৃষ্টি লাগুক, মুখটা সব সময়েই আলো-আলো লাগত। আমার চোখেও যেন দেখতাম সেই আলো। আজ লোকে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে এই দেখ সেই ভালোবাসার মেয়ে, সব ছেড়েছুড়ে হন্তদন্ত হয়ে যাকে গিয়ে বিয়ে করেছিল সে-ই এখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—'

'তাড়িয়ে দিয়েছে?' কিছুতেই যেন মেনে নেবে না বিনতা।

'না হয় ঘুরিয়েই বলবে, মেয়েটা স্বামীর অত্যাচারের জন্যে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। যেভাবেই বলুক, আমার সেই জাঁক থাকল কই? যে ভালোবাসা পুঁতেছিলাম বুকের মধ্যে তা জলন্ত-ফলন্ত হল কই?'

'তোর যে দেখছি এখনো সুকান্তর জন্যে মায়া!'

'মিথ্যে কথা।' কাকলি এক ঝটকায় নেমে পড়ল খাট থেকে।

'তবে কণ্ঠস্বরটাকে অমন ভিজে-ভিজে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা করেছিস কেন? মায়ার ছোঁয়া না লাগলে গলার স্বর অমন স্যাঁতসেঁতে হয়?'

'যদি মায়াই বলতে চাস, সে মায়া কোনো লোকের জন্যে নয়, পাষণ্ডের জন্যে নয়, সে মায়া আমার কুমারী হৃদয়ের প্রথম নগ্নতার জন্যে। আমি ভালোবাসি এই উন্মুক্ত উচ্চারণেই তো হৃদয়ের প্রথম নগ্নতা। সেই শুচিশুভ্র উজ্জ্বল স্বপ্নটিকে নিয়ে কত খেলেছি দিনে-রাত্রে, কত খুলেছি আর ঢেকেছি, কল্পনার কত দুধ-মধু খাইয়ে লালন-পালন করেছি। আমার প্রথম স্বপ্নশিশু মরে গেল অকালে—'

'কিন্তু তোর গর্ভিণী হবার শক্তি তো মরে যায় নি।' ঠাট্টায় ঝাঁজিয়ে উঠল বিনতা: 'একটা প্রেম মরে গেলে কী এসে যায়? আরো কত প্রেম আসে। প্রথমই পরম নয় সব সময়।

'নিশ্চয়ই নয়।'

'কখনো-কখনো দ্বিতীয়ও অদ্বিতীয়।'

'সন্দেহ কি !'

'আবার কখনো-কখনো চরমই পরম।'

'এক শো বার। শেষ বর্ষণেও অজস্র ফুল ফুটতে বাধা নেই।'

'সুতরাং যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে থাকবার তো কোনো মানে হয় না।'

'কে বলে হয় ?'

'হ্যাঁ, এক মাঠ ফুরোলে আরেক মাঠ আসে। এক প্রত্যয় ভাঙলে আরেক প্রত্যয়।'

'তাই সব সময়েই আশা আছে আমাদের।' হাসল কাকলি।

'তোর আছে, আমার নেই।' বিনতা মুখ ফেরাল।

'তোর নেই ? সত্যি ? দেখি দেখি দেখি মুখখানা।' বিনতাকে ছুটে ধরতে গেল কাকলি।

'হয়তো তোরও নেই। তুইও বুঝি সেই আদিম মেয়ে—তোর ননদ বাসন্তীরই অনুরূপ। কত নির্যাতনেও বাসন্তী ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে, তুই আছিস তেমনি স্মৃতি আঁকড়ে।' কাকলির স্পর্শটা ছাড়িয়ে নিল বিনতা : 'অথচ বাসন্তীর তুলনায় তুই কত স্বাধীন, কত সমর্থ। সমাজ যতই বিদ্যানী করুক, আইন-কানুন দিক, সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াক, মেয়ে আসলে বুঝি মেয়েই।'

সবলে বিনতাকে জাপটে ধরল কাকলি। বললে, 'আর কুমারী আসলে বুঝি কুমারীই।'

উচ্চ হাসির রোল তুলল দু-জনে।

'তুমি বাসন্তীর ব্যবস্থা করলে ?' ভূপেনের কাছে মৃণালিনী আর্জি নিয়ে হাজির হল : 'কত আর নির্যাতন সইবে ও স্বামীর ঘরে ?'

'তুমি কী করতে বলো ?' সভয়ে মতটা জানতে চাইল ভূপেন।

'আজকাল এত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা হচ্ছে, আমার ইচ্ছে ওকে দিয়ে অমনি একটা মামলা করাও।'

'বিবাহ-বিচ্ছেদ !' মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ভূপেনের। বললে, 'বউটাকে তাড়িয়ে এবার জামাইটাকেও তাড়াবে ?'

'বউটাকে আমি তাড়িয়েছি ?'

'না, না, থুড়ি, ছেলে তাড়িয়েছে।'

'মোটেও তা নয়। বউ নিজের থেকে ভেগেছে। দড়ি লম্বা পেয়েছিল,' অলক্ষিতে গলা নামাল মৃণালিনী : 'পর-গোয়ালে ঢুকেছে জাবনা খেতে।'

'তা সে পরের মেয়ে বাইরে-বাইরে যেখানে খুশি মরুক গিয়ে, কিন্তু নিজের মেয়ের সর্বনাশ ঘটাতে চাও কী বলে?'

'সর্বনাশ মানে! স্বচক্ষে দেখে এসেছ মেয়ের চেহারা? যদি কিছু বিহিত না করো মেয়েটা অমনিতেই মরে যাবে।' চোখে জল এনে ফেলল মৃণালিনী: 'তখন সেই সর্বনাশের জন্যে দায়ী হবে তুমি। মেয়েটার অদৃষ্টে স্বামী নিষ্ঠুর, বাপও নিষ্ঠুর—'

'নিষ্ঠুরতা—নির্যাতন, শুনছি তো অনেক কঠিন-কঠিন কথা, কিন্তু জামাইয়ের অপরাধটা কী?'

'এতদিন পরে অপরাধটা কী? সমানে মেয়েটাকে মারধোর করে চলেছে। গোড়ায় ভেবেছিলাম সময়ে শোধরাবে হয়তো। কিন্তু কিছু পরিবর্তন নেই।'

ভূপেন কাগজপত্রে মন দিতে চাইল। বললে, 'মাঝে মাঝে অমন-দু-চারটে প্রবল ঝগড়া দাম্পত্যজীবনে স্বাস্থ্যকর।'

'ঝগড়া? তুমি একে শুধু ঝগড়া বলতে চাও? সেদিন শুনলাম চড় মেরে দুটো দাঁত নড়িয়ে দিয়েছে। মাথায় যে চুল নেই, তা অমনি উঠে যাচ্ছে বলে নয়, জামাই গোছা-গোছা করে টেনে তুলে নিয়েছে বলে—'

'কিন্তু স্বামী মারধোর করে এই কারণে তো হিন্দু বিয়ের সরাসরি ডিভোর্স হতে পারে না।' আইনের গলায় বললে ভূপেন।

'তোমাকে বলেছে! ভারি তুমি উকিল হয়েছ।' ভেঙচে উঠল মৃণালিনী: 'শারীরিক পীড়ন করে স্বামী স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করবে তাতে আইনে স্ত্রীর কোনো প্রতিকার নেই?'

'আছে, সে হচ্ছে জুডিশিয়াল সেপারেশান। স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে থাকবার অধিকার।' পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল ভূপেন। 'সেটা বিয়ে ঠিক ছিন্ন করে ফেলা নয়, গোড়াটাকে আলগা করে দেওয়া। ঠিক উচ্ছেদ-বিচ্ছেদ না বলে বলতে পারো বিরহ—বিভেদ—'

'কিন্তু তাতে খোরপোশ পাবে তো?'

'তা হয়তো পাবে—স্বামীর আয় বুঝে। কিন্তু,' ঘোলাটে চোখ তুলল ভূপেন: 'কিন্তু বাসস্থান পাবে না। বাসস্থান স্ত্রীকে জোগাড় করে নিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে, বাসন্তীর বেলায় তার আর জায়গা কোথায়, তাকে এসে উঠতে হবে এইখানে, এই বাপের বাড়িতে।'

'তাই উঠবে। হতচ্ছাড়ী বউটা সরেছে, ঘর উঠছে দোতলায়, যে করে হোক ঠাঁই করে নেবে। শুধু নিজের জন্যে নয়, পেটে যতগুলো ধরেছে, সব কটার জন্যে ভারি হাতে আদায় করবে খোরপোশ। হ্যাঁ গো, ছেলেমেয়েগুলোর জন্যেও পাবে তো?'

'তা পাবে। সবগুলোই যখন—কটা যেন—সবগুলোই যখন নাবালক। যদি অবশ্যি সবগুলোকেই মা নিয়ে আসতে পারে সঙ্গে করে।'

'সঙ্গে করে আনবে না তো ফেলবে কোথায়?'

'তা তো ঠিকই।' আবার হতাশ মুখ করল ভূপেন: 'কিন্তু এখানে, এ বাড়িতে, প্রকাণ্ড ভিড় হয়ে যাবে না?'

'তার আর কী করা! আদ্যোপান্ত খোরপোশ দেবে তো। জিভ বেরিয়ে যাবে পাজিটার। তখন মজা বুঝবে, কী করে কী চলে!' উৎফুল্ল হবার ভাব করল মৃণালিনী: 'তারপরে ঠিক দেখো পায়ে তেল মাখাতে আসবে। বাপুবাছা বলে পিঠে হাত বুলুবে। বলবে আর ককখনো অমনটি করব না। কাঁদবে। হ্যাঁ গো, জুডিশিয়াল সেপারেশান হবার পর আবার মিলতে পারে না স্বামী-স্ত্রী?'

'তা পারে। মিট হয়ে গিয়েছে এই বলে আদালতে দরখাস্ত করলে সেপারেশানের ডিক্রি নাকচ করা যায়।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো।' মৃণালিনী প্রায় নেচে উঠল· 'পাজিটার শিক্ষা হোক। তারপরে আসুক একদিন বাসন্তীর পায়ে ধরে মীমাংসা করতে—'

'আমি বলি কি, এই মীমাংসার জন্যে প্রতীক্ষাটা বাসন্তী এখানে না করে তার স্বস্থানে শ্বশুরবাড়িতে করলেই কি ভালো হয় না?'

'ওখানে করতে গেলে ও মরে যাবে। তুমি বাপ হয়ে তাই এলাউ করবে? ও অক্ষম বলে তুমিও অক্ষম হবে?' চেয়ারের কাছে এসে ভূপেনের মুখের উপর প্রায় নিশ্বাস ফেলল মৃণালিনী: 'জানো সেদিন শুনলাম একটা লাঠি দিয়ে মেরেছে মেয়েটাকে—'

'আর তোমার মেয়ে কী দিয়ে মেরেছে?'

'আমার মেয়ে মেরেছে মানে?'

'তা জামাইকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যায়। শোনো,' মুখ প্রায় নিষ্প্রাণ করল ভূপেন: 'একতরফা বিচার কোরো না। এক হাতে তালি বাজে না কখনো। যদি জামাইকে বলতে দাও, ও হয়তো লিষ্টি দেবে কী কী অস্ত্রে সুনিপুণ তোমার বাসন্তী। হয়তো শুনবে, কাঁচি দিয়ে মেরেছে, পেপারওয়টে দিয়ে, মোটা বই-খাতা ছুঁড়ে। তা ছাড়া তোমারই তো—আমাদেরই তো মেয়ে—কী দুরন্ত রাগী হবার সম্ভাবনা তা তো বুঝি। তা খোঁজ করলেই হয়তো দেখবে, ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কত কী জিনিস ভেঙেছে সংসারের। চায়ের পেয়ালা বা কাঁচের গ্লাস শুধু নয়, টাইমপিস ঘড়ি, ওষুধের শিশি, ইলেকট্রিকের বালব—'

'তোমাকে সব বলেছে ! তোমাকে উকিল রেখেছে জামাই !' মৃণালিনী টিটকিরি দিয়ে উঠল।

'বলে নি কিন্তু অনুমান করতে পারছি। পুরুষমানুষ তো, সহজেই গেঞ্জি-পাঞ্জাবি খুলে পিঠটা দেখাবে না। কিন্তু যদি খুলত, সেখানেও দেখতে পেতে অনেক প্রহারের লাঞ্ছনা। অন্তত দাঁতের দাগ।'

'দাঁতের দাগ ?'

'মেয়েরা আর কিছু না পারুক কামড়াতে ওস্তাদ !'

'তা দেবেই তো কামড়ে। পাষণ্ডদের বিরুদ্ধে তাদের আর অস্ত্র কী ! দাঁত আর নখই তাদের অস্ত্র।'

'সুতরাং চিন্তিত হোয়ো না মেয়ের জন্যে।'

'চিন্তিত হব না ?' ক্রুদ্ধ হল মৃণালিনী।

'না। তার উপরে যষ্টির যেমন কৃপা আছে, ষষ্ঠীরও তেমনি কৃপা আছে। সুতরাং ভয় পাবার কিছু নেই।' নথিপত্রের গভীরে ঝুঁকতে চাইল ভূপেন।

'বা, সে আবার কী কথা। যা দৈব দুর্ঘটনা—'

'হ্যাঁ, দৈব দুর্ঘটনাই ঘটাবে মীমাংসা। ষষ্ঠীই বাঁচাবেন যষ্টি থেকে। শোনো—' আবার চোখ তুলল ভূপেন, নিষ্প্রাণ চোখ : 'কোনো ঘটনাকে জটিল কোরো না, যার যা নিজের স্রোত, তাই নিতে দাও। আহারে-বিহারে যদি ওদের মীমাংসা হয়ে থাকে, প্রহারেও হবে।'

'তার মানে মেয়েটাকে তুমি মরতে দেবে।'

'হ্যাঁ, আদালতও তাই দেখবে তেমন কোনো ভয় আছে কিনা, অন্তত বাসন্তীর মনে তাই আছে কিনা। তেমন ভয় আছে মনে করি না, কোনো দিন জানায়ও নি তেমনি বাসন্তী। ধৈর্য ধরে আছে, থাকতে দাও। ঘাঁটিয়ো না। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, বড় হোক—'

'তুমি যে নিষ্কর্মার অবতার, তা আমি আগেই জানতাম। দেখি আমি নিজে কী করতে পারি ! আজকাল আইনকানুনের কত সুবিধে—এ সুবিধে যে না নেয় সে গাধা।'

'বটে ? আইন বলেছে ধৈর্য থাকবে না, ক্ষমা থাকবে না, ত্যাগ থাকবে না, সৎ প্রবৃত্তি সব বনবাসে যাবে ? সূচ্যগ্র অধিকার নিয়ে পক্ষে-পক্ষে শুধু হানাহানি কামড়া-কামড়ি করবে ? এর বাইরে আর বাঁচবার জায়গা থাকবে না মানুষের ? শোনো,' চলে যাচ্ছিল মৃণালিনী, ডাকল ভূপেন : 'শিকড়ের ছোট একটা তন্তুও বেঁচে থাকলে

মাটির সঙ্গে লেগে থাকলে লতার আবার দৃঢ় হবার, পুষ্ট হবার আশা থাকে কিন্তু সেটা যদি একেবারে টেনে-ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলো—যদি সেটা সত্যি বিষলতা না হয়—'

অতশত শোনবার সময় নেই মৃণালিনীর, সে আবার ঘাই মারল।

'এ তো তোমার মেয়ের কথা হল।' আবার ডাকল ভূপেন: 'তোমার ছেলের খবর কী?'

'তার আমি আবার বিয়ে দেব।' ফিরে দাঁড়িয়ে বললে মৃণালিনী।

সচরাচর হাসে না ভূপেন। কিন্তু এখন অবারিত হেসে উঠল। বললে, 'তার মানে মেয়েকে কয়েদ করবে বাপের বাড়িতে আর ছেলেকে কয়েদ করবে খোদ জেলখানায়।'

'তার মানে?' রুখে উঠল মৃণালিনী।

'এক স্ত্রী থাকতে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করা নতুন আইনে নিষিদ্ধ। সে সোনার অতীত চলে গিয়েছে। এক স্ত্রীকে ত্যাগ করে আরেক স্ত্রীকে, চাই কি একাধিক স্ত্রীকে অঙ্কশায়িনী করা। স্ত্রী বর্তমানে সুকু যদি আবার বিয়ে করে, নতুন আইনে দ্বিতীয় বিয়ে তো ভণ্ডুল হবেই, উপরন্তু সুকুর জেল হয়ে যাবে, আর তুমি—তুমিও পড়বে অ্যাবেটমেণ্টের চার্জে—'

'কী বুদ্ধি!' ধিক্কার দিয়ে উঠল মৃণালিনী: 'এই না হলে উকিল!' পরে প্রাঞ্জল হবার চেষ্টায় বললে, 'স্ত্রীর বর্তমানে তো হবে না, কিন্তু স্ত্রীর অবর্তমানে?'

'অবর্তমানে মানে?'

'মানে যখন স্ত্রী থাকবে না—'

'থাকবে না কী! বেঁচে থাকবে না?'

'কী বুদ্ধি!' দৃঢ়, স্পষ্ট হল মৃণালিনী: 'স্ত্রীকে সুকু ডিভোর্স করবে।'

'ডিভোর্স করবে?' হতবুদ্ধির মত তাকাল ভূপেন।

'হ্যাঁ, তার জন্যে তোমার সঙ্গে তার পরামর্শ করতে হবে না। সে পুরুষ, সে স্বামী। সে একাই বুঝবে, একাই ব্যবস্থা করতে পারবে। এখানে তোমাদের কোনো অভিভাবকের এক্তিয়ার নেই। যেমন একা-একা জল থেকে তুলে এনেছিল তেমনি একা-একা ছুঁড়ে ফেলে দেবে জলের মধ্যে।'

ভূপেন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

'ডিভোর্স হয়ে গেলে তখন তো আর বিয়ে করতে বাধা নেই?' মৃণালিনীও হাসতে জানে, সে খলখল করে হেসে উঠল।

'হ্যালো—' ঘণ্টার প্রতিধ্বনি করল ওপার।

'আপনি মিসেস বোস ?'

'না, আমি কাকলি মিত্র।'

'যার যা ভেবে শান্তি। কিন্তু', গলার স্বরে গাঢ় হল বরেন : 'কিন্তু আইনের চোখে সমাজের বিচারে আপনি মিসেস সুকান্ত বোস। অন্তত এখনো পর্যন্ত তাই। শুনুন, একটা কথা আছে।'

'যদি কাজের কথা হয় তো বলুন।' কাঠ-কাঠ জবাব দিল কাকলি।

'ভীষণ কাজের কথা।' গলা আরো খাদে নামাল বরেন : 'শুনুন। শুনছেন ?'

'বলুন।'

'কথাটা ভালো নয়। দুঃসংবাদ।'

এক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করল কাকলি। তবে বাবার কিছু হয়েছে ? ঐ সেদিনও তো দেবনাথ এসেছিল টাকা নিতে। বাবার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে এমন কিছু বলে নি তো। তা ছাড়া বাবার খবরে বরেনের আগ্রহ কী। তবে দীপঙ্করের মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে ? দুঃসংবাদটা বিদ্রূপ ? তা ছাড়া, খারিজ হয় কী করে ? সমস্ত তদবির নিটুট করে রাখা হয়েছে কোর্টে। তবে কি মামলায় হেরে গিয়েছে বরেন ? বা, এত শিগগিরই বা মামলার নিষ্পত্তি হয় কী করে ? শুনানি হলে তারিখটা জানতে পেত না কাকলি !

নিশ্চয়ই এ অন্য কোনো কারসাজি। যেন একটা বিবাদ মেটাবার জন্যে সালিশ সাজবার দরকার পড়েছে বরেনের, মধ্যস্থ হয়ে বাহাদুরি কেনবার। তাই কাকলিকে কৌশলে সুকান্তর কাছে টেনে নেওয়া যায় কি না তাই একটা গল্প ফাঁদা। দুর্ঘটনা বানানো। পড়ে-টড়ে কোথাও একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে, হাসপাতালে আছে, শেষ দেখা দেখতে চায় কাকলিকে, ভীষণ সে অনুতপ্ত—সুতরাং কাকলি যদি মানুষ হয়, তার যদি হৃদয় বলে কিছু থাকে যেন পত্রপাঠ ছুট দেয়, যেন তার শিয়রে এসে দাঁড়ায়। আর সেখানে, হয়তো বা সেটা হাসপাতাল নয়, হয়তো বা হোটেল, অনেক মন্ত্র আওড়ে শান্তির জল ছিটিয়ে, দু হাত একত্র করে দেবে বরেন। বলিহারি যাই, কী মামার বাড়ির আবদার। এ যেন খেলতে-খেলতে দুই বিরুদ্ধ খেলোয়াড় হঠাৎ মারামারি করে ফেলেছে আর রেফারি ঝগড়া মিটিয়ে দিলে হ্যাণ্ডশেক করছে পরস্পর। যেন এও একটা এক বেলারই খেলা আর সাময়িক চড়া মেজাজটাকে নরম করবার জন্যে সামান্য একটু হাত ঝাঁকানি। ব্যাপারটা যেন এমনি হালকা, এমনি উপর-উপর। আর বরেন যেন সেই রেফারি। মোড়ল-মাতব্বর।

'কী বলুন। এ কি চুপ করে গেলেন কেন ?' কাকলি উৎসুক স্বর ছুঁড়ল।

'খবরটা ভালো নয়। পারবেন তো সইতে?'

'যখন শখ করে শোনাচ্ছেন, না সয়ে উপায় কী।'

'খবরটা অন্যায়—'

'দুঃসংবাদের আবার ন্যায়-অন্যায় কী।'

'শুনুন। সুকান্তকে চেনেন?'

'কোন সুকান্ত? যে আপনাদের ফার্মের এমপ্লয়ি?'

'হ্যাঁ, চেনেন তা হলে।' আশ্বস্ত হবার ভাব করল বরেন: 'সে একটা হঠাৎ কাণ্ড করেছে।'

'কী কাণ্ড! কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড?'

'প্রায় তাই। আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে। ঠিক করে নি এখনো, তবে করবে বলে ঠিক করেছে।' বরেন কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গতার তুলি টানল।

'কী মামলা?'

'হ্যাঁ, আপনাকে তাই আগেভাগে জানিয়ে রাখছি। জানেন তো ফোরওয়র্নড ইজ ফোরআর্মড।'

'কিন্তু মামলাটা কী তাই তো বলবেন—' রুষ্ট শোনাল কাকলিকে।

'ডিভোর্সের মামলা।'

'বলেন কী! এ দুঃসংবাদ কোথায়? এ তো সুসংবাদ।'

'সুসংবাদ?'

'হ্যাঁ, লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার মত।' কাকলি দৃঢ় অথচ বাঁকা গলায় বললে, 'তবে আপনার এমপ্লয়িকে বলবেন সে শুধু মামলা করবে বলে ঠিক করেছে আর আমি মামলা অলরেডি ফাইল করে দিয়েছি।'

'ফাইল করে দিয়েছেন?'

'কেন, বাধা কী? নতুন আইনে হিন্দু-স্ত্রীও যে স্বামীর থেকে ডিভোর্স চাইতে পারে জানেন না?'

'জানি।'

'তবে চমকাচ্ছেন কেন?'

'চমকাচ্ছি, আপনিও ডিভোর্স চান।'

'এক শো বার চাই। রোগ হলে তার উৎখাত চাই, ভুল হলে তার সংশোধন চাই। ভালোবাসা নামে একটা রোগ হয়েছিল একদিন, চোখের ভুল নামে একটা বিকৃতি। সেই রোগের বিতাড়ন চাই, সেই বিভ্রমের অপসারণ।'

'ভালো কথা। দু-জনেই যখন চান,' বরেন স্বরে মধু ঢেলে বললে, 'তখন একটা মিটমাট হতে পারে না ?'

'মিটমাট ? অ্যাবসার্ড।' ক্রুদ্ধ শব্দে ফোন ছেড়ে দিল কাকলি।

ধীরে-ধীরে বরেনও রেখে দিল রিসিভার।

সুকান্ত সামনেই বসে ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'কী বললে ?'

'ডিভোর্সে রাজি আছে ষোল আনা।' গম্ভীর মুখে বললে বরেন, 'এত রাজি যে, পারলে ও-পক্ষই মামলা রুজু করে দেয়।'

'দিক না। যে কোনো ভাবেই হোক বাঁধনটা ছিঁড়ে গেলেই বাঁচা যায়।'

'তাই বলছিলাম, মিটমাট করে নিন।' একটু সকরুণ হাসল এখানে বরেন। বললে, 'মিটমাটের কথা উঠতেই খেপে গেল, জ্বলে উঠল তেলে-বেগুনে—'

'ভুল বুঝেছে।'

'ভেবেছে বুঝি আমি বিরোধটাই মিটিয়ে নিতে বলছি। আমি যে বলছি মিটমাট করে ডিভোর্সের ডিগ্রিটা হাসিল করে নিন, সেটা বোঝে নি। কী রাগ রে বাবা!'

'অসম্ভব।' টিপ্পনী জুড়ল সুকান্ত।

বরেন আবার ডায়াল করল।

'হ্যালো—' প্রতিধ্বনিত হল কাকলি।

'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। মিটমাট মানে আমি আপনাদের কলহকে আপোস করে নিতে বলছি না, আমি বলছি, আপোসে আপনাদের ডিভোর্সের ডিগ্রিটা কোর্টের কাছ থেকে আদায় করে নিতে।'

'ও! ধন্যবাদ। আচ্ছা, মিউচ্যুয়াল কনসেণ্টে ডিভোর্স হয় না ?'

'হয়, স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে হয়, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে হয় না। আপনাদের তো হিন্দু বিয়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন যে হিঁদুয়ানি' দেখাতে গেলেন! দিব্যি ধর্মাধর্ম মানি না বলে ডিক্লেরেশান দেবেন, স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে রেজেস্ট্রি করে দিব্যি ভদ্রলোকের মত বিয়ে হবে। তেমনি রেজেস্ট্রি-করা বিয়ে হলে আজ আর ভাবনা ছিল কী। মিউচ্যুয়াল কনসেণ্টের পিটিশন দিয়ে দিব্যি কেটে পড়তে পারতেন। তারপর বছর দুই ছোঁয়াছুঁয়ি বন্ধ, ব্যস, বিয়ে 'ফাট'।'

'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে কোনো সুবিধে বা শর্টকাট নেই ?' কাকলি কথা খুঁজতে

খুঁজতে বললে, মানে, দু পক্ষই যখন চায় বিয়েটা যাক, তখন সহজে কার্যসিদ্ধির একটা পথ বাতলানো যাবে না ? আপনি যখন আমার বন্ধু—আর বুদ্ধিমান—'

'এক পক্ষের প্রভু আরেক পক্ষের—কী বললেন, বন্ধু—' হাসল বরেন, সুকান্তর দিকে চেয়ে হাসল। বউকে যখন সে ছেড়েই দিচ্ছে, তখন গায়ে পড়ে একটু স্বাধীনতা নিলে তার আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাই বললে, 'মনে হয়, ছন্দ রাখতে গিয়ে বলা উচিত, এক পক্ষের প্রভু, আরেক পক্ষের ভৃত্য। দু পক্ষেই সমান ইনটারেস্টেড। হ্যাঁ, ভেবে-চিন্তে বাতলাতে হবে পথ। দেওয়াল যখন আছে, তখন ঘুলঘুলিও আছে। আইন যখন আছে, তখন ফাঁকি দেবার রাস্তাও আছে।'

'কেন, ফাঁকি কেন ? দু-জনেই যখন ডিভোর্স চাচ্ছি, তখন আর ফাঁকি কোথায় ?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। শিগগির একদিন আসবেন। পথ-সন্ধানের পরামর্শ করব।'

'আপনার ওখানে যাব কী! ওখানে গেলেই তো আপনার সেই এমপ্লয়ির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—'

'হ্যাঁ, সত্যিই তো। না, আপনি আসবেন না, আমিই যাব।'

'টেলিফোনে স্থান-কাল ঠিক করে নেবেন।' ফোন রেখে দিল কাকলি।

বরেন সুকান্তকে বললে, 'লিভিং ইন অ্যাডালটারিটাই ডিভোর্সের গ্রাউণ্ড করতে হবে।'

'আর কোনো কিছুই খাটে না বুঝি ?'

'অ্যাডালটারিটাও খাটে না, তবে সেটা হয়তো ম্যানেজ করা যায়।' হাসতে গিয়েও হাসল না বরেন : 'অন্য যেসব কারণ আছে, তা কোর্টকে বিশ্বাস করানো দুষ্কর।'

'যথা ?'

'ধরো, ধর্মান্তর গ্রহণ, ধরো সন্ন্যাস, কুষ্ঠ, যৌন ব্যাধি, ধরো সাত বছরের নিরুদ্দেশ। তুমি যদি বলো, আমার স্ত্রী হিন্দুত্ব ছেড়ে অন্য ধর্ম নিয়েছে কিংবা সন্ন্যাসিনী হয়েছে কিংবা সাত বছর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না বা তিন বছর ধরে প্রবল কুষ্ঠে বা যৌন ব্যাধিতে ভুগছে, আদালত চট করে বিশ্বাস করবে না, অন্তত বিশ্বাসের সপক্ষে প্রমাণ চাইবে। কিন্তু যদি বলো আমার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত আছেন—'

'তা হলেই বিশ্বাস করবে ?

'বিশ্বাস করা সহজ হবে। দুই কারণে সহজ হবে। প্রথমত, তোমার স্ত্রী, যিনি নিজেও ডিভোর্স চাচ্ছেন, এ অভিযোগের প্রতিবাদ করবেন না। প্রতিবাদ করা তাঁর স্বার্থের বিরুদ্ধে। তিনি ঘাড় পেতে মেনে নেবেন অপবাদ।'

'আর দ্বিতীয়ত ?'

'দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত, তোমার দরখাস্তে তার নাম উল্লেখ করতে হবে। আর সেই লোক নোটিশ পেয়েও হাজির হবে না, জবাব দেবে না, করবে না প্রতিবাদ। তোমাদের খাতিরে, যাতে তোমাদের কার্যসিদ্ধি হয়, তার জন্যে এই কুৎসায় সায় দেবে। তুমি তো দীপঙ্করের কথা ভাবছ—'

'হ্যাঁ, সেখানে ঠিক সত্যের রোদ না থাক, সন্দেহের অন্তত আবছায়া আছে।' সুকান্ত চোখ নামাল।

'দীপঙ্করকে কো-রেসপণ্ডেন্ট করলে কাজটা সুগম হবে না।' বরেন মুখ তুলে তাকাল পরিপূর্ণ ঔদার্যে: 'দীপঙ্কর মেনে নেবে না এ অপযশ। সে হাজির হবে, জবাব দেবে, অস্বীকার করবে, লড়বে প্রাণপণে। লিভিং ইন অ্যাডালটারি প্রমাণ হবে না। তোমার মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।'

অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

'কোনো তরফ থেকে কনটেস্ট হলেই তুমি কুপোকাত।' বরেন আবার তাকাল প্রশান্ত হয়ে: 'তোমার চাই একজন নেম-লেণ্ডার, যে সহজেই তার নামটা ধার দেবে তোমাকে তোমার বিবাহচ্ছেদের অস্ত্ররূপে, চাই এক নীলকণ্ঠ, যে সহজেই হজম করবে হলাহল, আর যে নামে তোমার স্ত্রীরও আপত্তি হবে না। রাম-শ্যাম-চাকর-বাকর ধরে যদি তুমি নাম দাও, তোমার স্ত্রী আবার তাতে প্রচণ্ড খেপে যেতে পারেন, কোর্টে ছুটে আসতে পারেন ডিফেণ্ড করতে। সুতরাং সব দিক ভেবে-চিন্তে, স্বামী-স্ত্রী, তৃতীয় পক্ষ, কারু না অসম্মতি থাকে, এমন এক লোক বাছতে হবে—'

'তবে তুমি যদি রাজি হও, তুমি যদি নাম দাও—' মিনতি-ভরা মুখে তাকাল সুকান্ত।

উদার সিন্ধুর মত হেসে উঠল বরেন। বললে, 'আমার আপত্তি কী! কলঙ্কের ঢেউ আমাকে কী করবে! বন্ধুর যদি উপকার হয়, আমি শেষ পর্যন্ত যেতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে তোমার স্ত্রী রাজি হবেন কিনা।'

'একটা শুধু নাম তো। আর সেই নাম না পেলে তারও মনস্কাম—ডিভোর্স তো তারও মনস্কাম—সফল হয় কী করে?' আবার অনুনয়ের ভঙ্গি করল সুকান্ত: 'তার সঙ্গে তো দেখা করছ তুমি।'

'করতেই হবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এ কথায়, এ কু-কথায় সে রাজি হবে কিনা।' বরেন সিগারেট ধরাল।

আমার বাড়িতে আসতে আপনার আপত্তি আছে?' টেলিফোনেই জিজ্ঞেস করল বরেন।

'না, আপত্তি কিসের?' কাকলি একটু বরং উত্তেজিত হল। বললে, 'এসব পরামর্শ তো নিরিবিলিতেই হওয়াই ভালো।'

'আসলে এসব পরামর্শের জায়গা উকিলের চেম্বার—যা যত সব দুষ্টু নাটকের সাজঘর।' হাসল বরেন: 'কিন্তু আপনাদের মামলা তো উকিল সাজাবে না, আপনারাই সাজিয়ে উপহার দেবেন উকিলকে।'

'আর তা আপনার মধ্যস্থতায়।' কৃতজ্ঞতার সুর আনল কাকলি।

'হ্যাঁ, আমি সাঁকো মাত্র, আপনাদের চলাচলের সাঁকো।' উদার ভঙ্গি করল বরেন: 'যদি বলেন জুড়তে পারি নয়তো বলেন তুড়তে পারি—'

'আর যুক্ত নয়, এবার মুক্ত—'

'হ্যাঁ, সেই মুক্তির জন্যেই যুক্তির প্রয়োজন।' বরেন চঞ্চল হয়ে উঠল: 'আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, না, গাড়ি লাগবে না। আমি বাসে-ট্র্যামেই যাব। আমি যাচ্ছি আমার নিজের গরজে, কারু নিমন্ত্রণে নয়। এখন দয়া করে বাড়ির ডিরেকশনটা বলে দিন—'

সন্ধের দিকে হস্টেলফেরত গেল কাকলি। নিজেই সজাগ চোখে অপেক্ষা করছিল বরেন, নিচের সরকারি ড্রয়িং রুমে না ঢুকিয়ে সোজা উপরে নিয়ে এল।

চারদিকে সচ্ছলতা উচ্ছল হয়ে রয়েছে। এ আর দেখবার কী! নিজের সাহসটাকে দেখতে-দেখতে একের পর এক সিঁড়ি ভাঙতে লাগল কাকলি।

'বসুন।'

শোবার ঘর নয়, শোবার ঘরের পাশে একটা ছোট বসবার ঘর। অল্প আসবাব আর অনেক বই দিয়ে শ্রীমন্ত।

একটা নিচু কৌচে বসল কাকলি। আফিস থেকে সটান আসে নি, হস্টেল হয়ে এসেছে, তাই রুক্ষ-শুষ্ক ভাবটা নেই। ধোয়াপাখলা করে এসেছে, একটু বা মেজে-ঘষে সারা শরীরে এনেছে মসৃণ বিশ্রাম। পরনের শাড়িটা অনেক ঢিলেঢালা, হাওয়া-ওড়ানো। চুলের ভুরটা মাথার উপর উন্মত হয়ে না থেকে ঘাড়ের উপর ঢলে পড়া।

সমস্ত ভঙ্গিটা আলস্যের লাস্য দিয়ে বিজড়িত। অনেকক্ষণ থাকতে হবে অনেকক্ষ বসতে হবে এমনি বিলম্বিত লয়ের বাজনা।

একটা চটি বই কাকলির দিকে বাড়িয়ে দিল বরেন। বললে, 'এই হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টটা পড়ে দেখুন। ডিভোর্সের সেকশন—'

বইটা হাত বাড়িয়ে নিল কাকলি। নিতে-নিতে বললে, 'আমি এর কী বুঝব।'

'কেন বুঝবেন না? আইনের ভাষা খুব স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। অন্তত যতক্ষণ না উকিল আসে। পড়ুন।'

নত, নিবিষ্ট চোখে পড়তে লাগল কাকলি। একবার পড়ে আরেকবার পড়ল।

ততক্ষণ নিরালম্ব চোখে দেখতে লাগল বরেন। শাড়ির পাড়, ব্লাউজের কাজ, জুতোর স্ট্র্যাপ, হাতের সরু চুড়িগাছটা। কী নয়? কণ্ঠার হাড়, হাতের রগ, নাকের ডাঁট, গলার উপরকার তিলটুকু পর্যন্ত।

পড়া শেষ করে বিমর্ষ চোখে তাকাল কাকলি।

'দেখলেন? কী মনে হয়? মনে হয় না ব্যভিচারটাই সোজা।'

'সোজা?' প্রায় আঁতকে উঠল কাকলি।

'সোজা মানে প্রমাণ করা সোজা।' বরেন বইটা টেনে নিল কাকলির হাত থেকে 'নইলে ধর্মান্তর বলুন, যৌন ব্যাধি বলুন বা কুষ্ঠ বা পাগলামি বলুন, এ ক্ষেত্রে কিছুই খাটবে না, প্রমাণ করা অসম্ভব হবে।'

'আর ওটা—ঐ যে কী বললেন—ওটা—' ঢোঁক গিলল কাকলি।

'হ্যাঁ, ব্যভিচার। অ্যাডালটারি। শব্দটা উচ্চারণ করতে ঘাবড়াচ্ছেন কেন?' প্রশান্ত মুখে মৃদুস্নিগ্ধ হাসল বরেন: 'একটা বৈজ্ঞানিক টার্ম। আইনের মন্ত্র।'

'না, ঘাবড়াবার কী হয়েছে!' দৃঢ় হবার ভাব করল কাকলি: 'কিন্তু ব্যভিচারটাই বা সহজে প্রমাণ হবে কিসে?'

'আমি যদি বলি আমার স্ত্রী কাকলি বসু খৃষ্টান হয়েছেন, বা মুসলমান হয়েছেন মিথ্যে শোনাবে—অন দি ফেস অফ ইট মিথ্যে শোনাবে—'

'আপনার স্ত্রী?' মুচকে হাসল কাকলি।

'ওটা মাপ করে নেবেন। এখানে আমি মানে সুকান্ত। সুকান্ত বাদী, বাদী কেসটা স্টেট করছি।' গম্ভীর হল বরেন: 'তারপর কোন চার্চ কোন মস্ক, কী না ধরল ধর্ম বদলে, পাঁচ শো ঝামেলা।'

'কিন্তু যদি বলা যায় সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সন্ন্যাসিনী হয়ে—' দুষ্টু-দু মুখ করল কাকলি।

'সেটাও সমান মিথ্যে শোনাবে। কাকলি বস্থ বাটারওয়ার্থে জলজ্যান্ত কাজ করছেন কোর্ট হাত বাড়িয়েই ধরতে পারবে। তাই সেটাতেও জোর পাচ্ছে না স্থকান্ত। আর ব্যাধি-ইত্যাদি যদি বলেন, তা হলে কোর্ট সরাসরি মেডিকেল সার্টিফিকেট চেয়ে বসবে। তা হলেই তো প্রমাণের দফা রফা!'

'কিন্তু ব্যভিচারের বেলায় প্রমাণ চাইবে না কোর্ট?'

'চাইবে। কিন্তু সে প্রমাণ নলিনীদলগত জলের মতই তরল।'

'বলেন কী? কী করে?'

'আমি যদি বলি, আমি এখানে স্থকান্ত—যে আমার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত, আর যদি নোটিশ পেয়েও সে তা প্রতিবাদ না করে, আর যার সঙ্গে লিপ্ত সেও যদি অনুরূপ মৌনাবলম্বন করে থাকে, তা হলেই আইনের চোখে অভিযোগ সপ্রমাণ হল। যা সজ্ঞানে অপ্রতিবাদিত তাই আইনে প্রমাণিত বলে ধরতে হবে। স্থতরাং—'

ভীতু-ভীতু মুখ করল কাকলি। বললে, 'স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা অস্পষ্ট অভিযোগ করলেই শুধু চলবে না, একজন দ্বিতীয় পুরুষকে দাঁড় করাতে হবে?'

'হ্যাঁ, জলজ্যান্ত দ্বিতীয় পুরুষ।' বরেন নড়ে-চড়ে বসল: 'স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক, অভিযোগটা তো আগাগোড়াই মিথ্যে, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষটিকে কাল্পনিক করা চলবে না। আর্জিতে স্থকান্তকে বলতে হবে আমার স্ত্রী অমুক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত আছেন। ব্যভিচারটা মিথ্যে, অমুকের সঙ্গেটাও মিথ্যে, কিন্তু বাস্তবে স্ত্রীটি যেমন খাঁটি তেমনি অমুক ব্যক্তিটিকেও খাঁটি হতে হবে। যাতে নোটিশটা তার উপরে হাজির-জারি হয়।'

একটা কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাকলি? ক্লান্তের মত বললে, 'স্থকান্ত এমনি করে ভাবছে?'

'এমনি করে না ভাবলে ডিভোর্স হয় কী করে? নইলে, বেশ তো,' খাড়া হয়ে বসল বরেন: 'আপনি লড়ুন, কনটেস্ট করুন। পাষণ্ড স্বামী মিথ্যে বদনাম দেবে আপনি তা সইবেন কেন? মামলায় ওকে হারিয়ে দিন। আপনার বিয়েটিকে টিঁকিয়ে রাখুন।'

'অসম্ভব। যা গেছে তা যাক নিঃশেষ হয়ে।' হাওয়াতে হাতের ঝাপটা মারল কাকলি।

'তা হলে ও ছাড়া আর উপায় নেই, কৌশল নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

'কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ বলে ও কার নাম করছে?' ত্রস্ত চোখে তাকাল কাকলি।

'তা জেনে আপনার কী হবে? রাম শ্যাম যদু মধু যাকে দিয়ে খুশি ও পদ-পূরণ করুক, আপনার কী এসে যায়! এতে আপনার কোনো নির্বাচন নেই। আপনি চুপ করে আছেন, চুপ করে থাকবেন। ঘোলা-ময়লা যত জল আছে বয়ে যাক গঙ্গা দিয়ে। আপনার গায়ে জলের ছিটেটিও লাগবে না। আপনি একদিন শুভক্ষণে চোখ মেলে দেখবেন বিয়েটা খসে গিয়েছে, আপনি মুক্তবন্ধ, মুক্তবেণী—কী না জানি কথাটা—আপনি উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা হয়ে গিয়েছেন—'

'উঃ, সে কী অদ্ভুত রোমাঞ্চ!' খোলা আঁচলে ঝলমল করে উঠল কাকলি নতুন আরেক আরম্ভের শুভ্রতা। কিন্তু চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিক মারল। 'মেয়েদের কৌতূহলের কথা জানেন তো? সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটি কে না জেনে শান্তি পাচ্ছি না—'

'বা, কৌতূহল কেন, জানবার তো আপনার অধিকারই আছে। আর্জির নকল তো জারিই হবে আপনার উপর।'

'তবু কদিন আগেই না হয় জানি। নিজেকে প্রস্তুত করি।'

'প্রস্তুত করবেন মানে?'

'প্রস্তুত করি সহ্য করতে। শেষকালে আর্জির নকলে একটা যাচ্ছেতাই নাম দেখে না নাড়িভুঁড়ি উলটে আসে!'

'মহৎ একটা নাম দেখলেই বা আপনার এমন কী খুশি হবার কথা!'

'না, না, সত্যিই তো, আমার কী এসে যায়!' কাকলি লক্ষ্য করে দেখল আগের কথাটা ঠিকমত বলা হয় নি, কিরকম অসাবধানে বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। তাই সলজ্জ সংশোধনের চেষ্টায় বললে, 'আমায় শুধু বেরিয়ে আসা নিয়ে কথা। যে কোনো একটা নাম ধরে ভবার্ণব পার হয়ে যাওয়া।'

'হ্যাঁ, তাই। নাম নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি প্রশ্ন কেউ তুলতে পারে সে হচ্ছে আদালত। মানে, আদালত দেখতে পারে নামটা বিশ্বাস্য শোনাচ্ছে, না অবিশ্বাস্য। সন্দেহ উদ্রেক করছে, না বেশ সরল-সরল দেখাচ্ছে। শুধু এইটুকু—' বরেন হেলান দিল পিঠ ছেড়ে।

'আমিও তাইই বলতে চাইছিলাম।'

'আপনার কিছু বলবার নেই। আপনি একেবারে চুপ। আপনার শুধু কোনো-রকমে বেরিয়ে আসা। খণ্ডে দেওয়া।'

কাকলি চুপ করে গেল। রইল অধোমুখে।

'আর প্রশ্ন তুলতে পারে দ্বিতীয় পক্ষ। প্রশ্ন তুলতে পারে, সে মেনে নেবে কিনা

এই অপযশ। আপনি মেনে নিচ্ছেন আপনার স্বার্থ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্বার্থ কী?'

'বা, অনুকূল দ্বিতীয় পক্ষ না পেলে তো মামলা ডিক্রিই হবে না।'

'হ্যাঁ, অনুকূল। উদার, বদান্য, নিঃস্বার্থ। বিলেতে কো-রেসপণ্ডেন্ট মানে দ্বিতীয় পক্ষ কিনতে পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু এখানে তা কোথায়?'

'তেমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি?'

'সুকান্ত দীপঙ্করকে বেছেছিল—'

'দীপঙ্করকে? ছি ছি ছি—'

'যাকে বাছবে তারই বেলায় ঐ ছি ছি উঠবে। কেননা গল্পটা যে আগাগোড়া মিথ্যে, বানানো। তা ছাড়া দীপঙ্করকে বাছলে সে মেনে নেবে নাকি? সে অসন্তুষ্ট, সে নির্ঘাত প্রতিরোধ করবে। আর প্রতিরোধ করলেই মামলা হাওয়া।'

'তা হলে?'

'এমন চাই দ্বিতীয় পক্ষ যে বাদী-বিবাদীর বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, যে উভয় পক্ষের স্বার্থে মেনে নেবে এ কলঙ্ক, এ অসম্মান।'

'তেমন লোক নেই বুঝি?'

'আছে। আমিই সেই লোক। আমিই রাজি হয়েছি দ্বিতীয় পক্ষ হতে।'

'উঃ, আপনি কী ভালো!' উদ্বেল, বিহ্বল চোখে তাকাল কাকলি। ফুটে উঠল বা একটু আনন্দের অরুণিমা।

দৃশ্য-স্পৃশ্য সমস্তই উপেক্ষা করল বরেন। বললে, 'আমার দ্বারা আপনাদের যদি স্থায়ী একটা উপকার হয়, আমি তা দেখব না কেন? নইলে এ ছাড়া আর আপনাদের উপায় কী?'

'কিন্তু মিছিমিছি তো আপনাকে দুর্নামের ভাগী হতে হল!' মায়া-মাখানো মুখ করল কাকলি।

'দুর্নাম? পুরুষের আবার দুর্নামের ভয়! আর এ তো মিথ্যে, মায়া, মরীচিকা—'

'প্রায় সব দুর্নামই তাই। অল্পের উপরে কল্পনার কারুকাজ।'

'এখানে তো স্বল্পও নেই। জমিই নেই তাই জমিদারি। কী জানি কথাটা! স্ল্যাং একটু, কিন্তু ভারি লাগসই। মূলে মাগ নেই তায় ফুলশয্যে।' উদারকণ্ঠে হেসে উঠল বরেন: 'কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনো চা দিয়ে গেল না?' বরেন এগুল দরজার দিকে।

বরেন আবার কাছে ফিরে এলে কাকলি বললে, 'যাঁরা মহৎ পরোপকার করেন

তাঁরা এমনি বেহিসেবী হন। কপোতকে বাঁচাতে গিয়ে শ্যেন পাখিকে নিজের বুকের মাংস কেটে দেন।'

চাকর চা নিয়ে এল ট্রেতে করে।

'আপনি সুন্দর কথা বলেন।' বরেন বসল মুখোমুখি : 'কিন্তু জানেন, আরো একটু কথা আছে।'

চা করতে-করতে চোখ তুলে তাকাল কাকলি : 'আরো ?'

'হ্যাঁ, আরো।' গম্ভীর হল বরেন : 'আপনাদের বিয়ের পর তিন বছর এখানো যায় নি। আর হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট বলছে বিয়ের পর তিন বছর না যেতে ডিভোর্সের মামলা করা যাবে না।'

'যাবে না ?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কাকলি, ঢালন্ত চা খানিকটা পেয়ালার বাইরে পড়ে গেল : 'তবে উপায় ? দম বন্ধ করে পুরো তিন বছর বসে থাকতে হবে ?'

'না, আইন কি অত নির্দয় হতে পারে ? উপায় রেখেছে একটা।'

'রেখেছে ?'

'হ্যাঁ, বিয়ের তিন বছর না পুরতেও মামলা করা যাবে যদি ব্যভিচারটা অসাধারণ-ভাবে কদর্য হয়, মানে আইনের ভাষায় যদি তাতে এক্সেপশ্যানাল ডিপ্রেভিটি থাকে—'

পেয়ালায় চামচ নাড়তে-নাড়তে খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : 'মানে খালি সন্দেশ নয়, সন্দেশের উপর যদি ফের রাংতা থাকে।'

'তাই।' পেয়ালায় চুমুক দিল বরেন : 'তাই বাধাটা অতিক্রম করবার জন্যে ঘোরতর কিছু বলতে হবে সুকান্তকে।'

'বলুক গে। যা ওর খুশি। যত দূর ওর যেতে পারে কল্পনা।' নিচু হয়ে কাকলিও চুমুক দিল পেয়ালায় : 'আমরা দু-জনেই যখন স্তব্ধ, দুজনেরই যখন কানে তুলো দেওয়া আর পিঠে কুলো বাঁধা, তখন আমাদের আর ভয় কী! আমাদের টলাতেও পারবে না, গলাতেও পারবে না। তবু,' নিজেরও অলক্ষিতে কৌতূহল খোঁচাতে লাগল কাকলিকে : 'তবু কী জাতীয় উক্তি সম্ভব হতে পারে ? অন্তত আইনে কোন উক্তি এক্সেপশ্যানাল ডিপ্রেভিটির হিসেবের মধ্যে আসবে মনে হয় ?'

'জানি না।' সরাসরি বলে ফেলেই তক্ষুনি আবার সামলে নিল বরেন : 'হয়তো বলবে ওর বাড়ির কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছি আপনাকে, কিংবা কে জানে, হয়তো দিনে-দুপুরেই পথে-ঘাটে আপনাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করছি, কিংবা ওর বাড়িতেই এসেছি একদিন দু-জনে অসুস্থ হয়ে—'

তালিকার মধ্যপথেই চিৎকার করে উঠল কাকলি : 'কী মিথ্যুক, কী জঘন্য !'

'হ্যাঁ, অতিশয়োক্তি করতেই হবে। নইলে ঐ তিন বছরের বাধাটা ডিঙোনো যাবে না। সবই বাক্যের ফুলঝুরি।'

'কল্পনার দাঙ্গা-হাঙ্গামা।'

'সুন্দর বলেছেন। নইলে পথ কেটে বেরিয়ে আসা যায় না। মুক্তির জন্যে যে মিথ্যে তা মিথ্যে নয়।'

'কাউকে বাঁচাবার জন্যে যে মিথ্যে,' লক্ষ্মীকটাক্ষ করল কাকলি: 'তা পরম পুণ্য। বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি—'

ডান হাত বাড়িয়ে দিতে পারত অনায়াসে, দিল না বরেন। চা খেতে-খেতে বললে, 'অথচ হাকিমকে ফাইণ্ড করতে হবে এ মামলায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কলিউশন নেই, যোগসাজস নেই, চালাকি করে আপোসে বিয়েটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে না—'

'হাকিম বুঝবে কী করে?'

'যদি উকিল না লাগে সাধ্য কী হাকিমের বুদ্ধি খেলে। তা ছাড়া তার বোঝবারই বা কী দায় পড়েছে! স্বামী স্পষ্ট নালিশ করছে, হলফান জবানবন্দি করছে, স্ত্রী আসছে না, তার প্যারামুর আসছে না, কেউ কিছু বলছে না প্রতিবাদে—এমন সব ইহকাল-পরকাল-ভেদী কথা—তার মানেই মামলা সত্য—স্বীকৃত সত্য। আর তা হলেই প্রমাণিত সত্য।'

'আঃ, তারপরেই আমার ডি-ডে।' এক মুখ হাসি নিয়ে বললে কাকলি।

'ডে অফ ডেলিভারেন্স।' কথাটাকে ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল করল বরেন।

'ডে অফ ডিভোর্স।' উজ্জ্বলতর করল কাকলি। বললে, 'সত্যি, আপনার মত বন্ধু না থাকলে এ যাত্রায় আর ত্রাণ পাওয়া যেত না। আইন অধিকার দিলে কী হবে, আদালতে গিয়ে অধিকার সাব্যস্ত করা কি মুখের কথা? উকিল মুহুরি আমলা সাক্ষী —সপ্তরথী ভেদ করে ব্যূহে গিয়ে ঢোকা, তারপর সময় সম্মান টাকা খুইয়ে সে কী কুম্ভীপাকের মধ্যে গিয়ে পড়া—সাধ্য নেই কেউ আস্ত বেরিয়ে আসে। তারপর শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত ফল নিয়ে আসতে পারবে কিনা তারও ঠিক নেই। আপনি ছিলেন বলেই, আপনার উদারতা ছিল বলেই, কত সহজ হল, সুন্দর হল—'

'ও কি, মিষ্টি কিছু খান।' সঙ্গের থালার দিকে নির্দেশ করল বরেন।

'না, মিষ্টিতে এমনিতেই ভরে আছি।'

'চলুন, তা হলে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' তাক বুঝে উঠে পড়ল বরেন।

এবার আর 'না' বলতে পারল না কাকলি। গাড়ির ভিতরে বসল পাশাপাশি। ভেবেছিল গাড়ি বুঝি লম্বা দৌড় দেবে, জি-টি বি-টি না নিলেও নদী বা হ্রদের ধারের

রাস্তা নেবে, কিন্তু সমীচীন এলেকায় এসে বরেন বললে, 'আপনার হস্টেলটা কোনদিকে বলে দিন ড্রাইভারকে !'

আশ্চর্য, কত শালীন কত সম্ভ্রান্ত। এমনটি আর হয় না, হতে নেই। এত বড় উৎসর্গ অথচ কী নির্মল উপেক্ষা। একেই বুঝি বলে অনাসক্তি। যার আরেক নাম নির্মম শাস্তি।

গেটে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে বরেনও নামল।

কাকলির মনে হল বরেন বুঝি তার ডান হাতটা ধরবে। কিন্তু না, বরেন দু হাত যুক্ত করে কপালে এনে ঠেকাল! বললে, 'নমস্কার।'

'নমস্কার।' যেন ধাক্কা খেল এমনিভাবে কাকলি বললে।

'হ্যাঁ, নমস্কার বৈকি। আপনি এখনো পরনারী।' হাসতে হাসতে গাড়িতে গিয়ে উঠল বরেন। গাড়ি স্টার্ট দিতেই মুখ বাড়িয়ে বললে, 'এখনো বরনারী নন।'

ঘরে ফিরে এসে বিনতাকে সব বললে কাকলি।

আদ্যোপান্ত সব শুনে আদ্যোপান্ত জ্বলে উঠল বিনতা। বললে, 'তুই একটা গরু। আরো বেশি করে বলতে হয়। তুই একটা গাধি। বিশ্বামিত্রের বাপ গাধি নয়, গাধার স্ত্রী গাধি।'

'বা, আমি কী দোষ করলাম!' কাকলি হাঁ হয়ে রইল।

'কী দোষ করলাম মানে? তুই সমস্ত মেয়েজাতের লজ্জা। তুই কেন সুকান্তর মামলায় বিবাদী হতে যাবি? নিজের মাথায় নিতে যাবি কলঙ্কের পসরা? তুই কেন বাদী হয়ে অভিযোক্তা হয়ে স্বাধীনভাবে মামলা করতে পারবি নে?' সর্বাঙ্গে জ্বলতে লাগল বিনতা: 'হ্যাঁ, সুকান্তকে অ্যাকিউজ করে? ও তোকে কলঙ্কিনী সাজাতে পারে, তুই কেন ওকে ব্যভিচারী সাজাতে পারবি নে? সব যখন মিথ্যে, আপোসে নিষ্পত্তি, তখন বোঝাটা তুই না টেনে ওকে দিয়ে টানা না। গরুতে টানে, না বলদে টানে?'

'তার মানে তুই বলতে চাস আমিই ডিভোর্স চাইব?'

'চাইবি নে? তোকে তোর স্বামী কু-কথা বলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দেবে আর তুই চাইবি নে ডিভোর্স? পা-পুজো করবি?' রি-রি করতে লাগল বিনতা।

'আর ডিভোর্স চাইব এই হেতুতে যে আমার স্বামী ব্যভিচারে লিপ্ত—'

'তা আবার বলতে। ওর নিজের মুদ্রাতেই ওকে দাম দিবি। আইনে, অন্তত বিয়ে-ভাঙার আইনে, স্বামীর যা হেতু স্ত্রীরও তাই হেতু—'

'কিন্তু লিপ্ত, কার সঙ্গে লিপ্ত বলব ?' সন্ধিৎসু চোখে তাকাল কাকলি : 'মেয়ে পাব কোথায় ? স্পষ্ট নামোল্লেখ করতে হবে তা ? আর এমন নাম-ঠিকানা হওয়া চাই যা দেখে আপাতচক্ষে আদালতের বিশ্বাস্য মনে হবে। আজগুবি ঠেকবে না। সমন জারি হবে। এমন কে আছে যে আমার জন্যে নেবে এই অখ্যাতির ডালি ?'

'আর কাউকে না পাস, আমি আছি।' স্থির স্বরে বললে বিনতা, 'আমি নাম দেব। তোর মামলায়, সুকান্তর বিরুদ্ধে মামলায়, আমি কো-রেসপণ্ডেণ্ট হব।'

'তুই ? সত্যি ?' উচ্ছ্বসিত সুখে বিনতাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরল কাকলি। পরে শান্ত হয়ে বললে, 'কিন্তু এতে তোর কোনো ক্ষতি হবে না তো ?'

'এ তো একটা মিথ্যের খেলা। এতে আবার ক্ষয়-ক্ষতি কিসের ? পাগলে কোথায় কী বলেছে, না ছাগলে কোথায় কী খেয়েছে এ নিয়ে কে মাথা ঘামায় ?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল কাকলি : 'এসব মামলার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপা বারণ। তাই বিশাল বিশ্বে জানাজানি হবার কিছু ভয় নেই। চাই কি, খোলা কোর্টে নয়, এ মামলার বিচারও ক্যামেরায় হবে।'

'সবই ক্যামেরায়।' হাসল বিনতা : 'কাণ্ডও ক্যামেরায়, বিচারও ক্যামেরায়।'

'কাণ্ড কোথায় ! যাকে বলে অমূল তরু, বরেনবাবুর কথা পালটে বলা যায়, মুলে বর নেই তায় বরযাত্রী !'

'এতখানি বয়স হল, গায়ে কিছুই লাগল না,' করুণ মুখে হাসল বিনতা : 'একটু কলঙ্ক পর্যন্ত না। তোর জন্যে, একটা মেয়ের মর্যাদার জন্যে যদি ঐটুকু দাগী হলাম, তো হলাম, কী এসে যায় ? তবু তোকে পারব না ছোট দেখতে, মুখাপেক্ষী দেখতে। তুই তোর নিজের দাবিতে দাঁড়াবি, নিজের বক্তব্যের দাবিতে, নীরবে এক পাশে বসে থেকে ভিক্ষুকের মত প্রসাদ কুড়িয়ে নিবি এ গ্লানি থেকে তোকে রক্ষা করব।'

অবাক বিস্ময়ে বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কাকলি।

'তুই যে এত অদ্ভুত ভালো তা জানতাম না।' একটা হাত ধরল বিনতার।

'শুধু সৌম্যাই ভালো নয়, রৌদ্রাও ভালো।' বললে বিনতা, 'লক্ষ্মী হয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পদসেবা করো ক্ষতি নেই, কিন্তু দরকার হলে রণাঙ্গনে কালী হয়ে শিবকে পায়ের নিচে ফেলতে দ্বিধা করিস নে।'

পরদিন টেলিফোন করল কাকলি।

'হ্যাঁ, আমি। একটা জরুরি কথা আছে। ধারে কাছে কেউ আছে নাকি আপনার সাব-অর্ডিনেট ?'

'না, নেই। বলুন।'

'শুনুন, আপনি কাল যে অ্যারেঞ্জমেণ্টের কথা বলেছিলেন, তার একটা বিকল্প আছে। আর ভেবে দেখলাম সেই বিকল্পটাই ভালো। অন্তত আমার পক্ষে সম্ভ্রান্ত।'

'কী বিকল্প ?' বরেনের গলায় যেন বা একটু উদ্বেগের ঝাঁজ।

'মামলাটা আমি আনব।'

'আপনি আনবেন ? গ্রাউণ্ড ?'

'ঐ একই গ্রাউণ্ড। লিভিং ইন অ্যাডালটারি—'

'দ্বিতীয় পক্ষ, মানে কো-রেসপণ্ডেণ্ট কে ?'

'আমাদের হস্টেলের একটি মেয়ে—'

'মেয়ে ?'

'মানে মহিলা। ইস্কুলের শিক্ষিকা। শুনতে বেশ শোনাবে। আপনার আদালত বিশ্বাস করতে অস্বস্তি বোধ করবে না।'

'কুমারী ?'

'হ্যাঁ।'

'বলেন কী ? সমস্ত ইমপ্লিকেশানস জানে ? বোঝে ?'

'কেন বুঝবে না ?'

'জীবনে সাধ করে এমন একটা কলঙ্ক-কালিমা নেবে ?'

'আপনি যেমন কেয়ার করেন না, ওও তেমনি কেয়ার করে না। তারপর ব্যাপারটা যখন অকপট মিথ্যে তখন দেহে-মনে-বিবেকে ও নির্ভয় পরিচ্ছন্ন।'

'আপনার বন্ধু বুঝি ?'

'ছেলেবেলা থেকে। আপনি যেমন স্বকান্তর।'

'বেশ, স্বকান্তকে বলে দেখি।' বরেন একটু বা অনিশ্চয়ের ভাব আনল : 'দেখি সে এতে রাজি হয় কিনা।'

'তার মামলায় আমি রাজি হব, আর আমার মামলায় সে রাজি হতে পারবে না ?' পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বলে উঠল কাকলি।

'হওয়া তো উচিত।' আগুনে জল ঢালতে চাইল বরেন : 'কেননা আকারে-প্রকারে দুটো মামলারই এক চেহারা। ওর মামলায় আপনি চুপ, আপনার মামলায় ও চুপ। একই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। তবু ও কী বলে জেনে রাখা ভালো।'

'শুনুন, ও যদি আমার মামলায় রাজি না হয়, আমিও ওর মামলায় রাজি হব না। ওকে বলে দেবেন।' কাকলি দৃঢ় হল।

'তা হলে তো এক দিক থেকে ভালোই হয়।' আশ্চর্য নির্লিপ্ত মুখে বললে বরেন, 'তা হলে আর বিয়েটা আপনাদের ভাঙে না। বেঁচে থাকে। লেগে থাকে।'

'কী সর্বনাশ!' ফাঁপরে পড়ল কাকলি।

'এই ত্রাহি ডাক তো স্থকান্তরও।'

'তা আমি জানি না, আমার মামলাই বহাল হবে আদালতে। জানেন আমিই উৎপীড়িত, সুতরাং আমার মামলা করাটাই যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষত যখন সব মাল-মশলাই আমার হাতের কাছে মজুত আছে।' বিদ্রূপে ঝলসে উঠল কাকলি: 'আপনার স্থকান্তকে বলবেন, তার কোর্ট ফি খরচ করতে হবে না।'

'বলব।' কথাটার মোড় ঘোরাল বরেন: 'শুনুন। আপনি বলছিলেন টাকার দরকার হলে বলবেন আমাকে।'

'দরকার পড়ে নি তো! স্থকান্তর মামলা হলে তো বিবাদী হিসাবে আমার এক পয়সাও খরচ নেই। আর আমার মামলা হলেও অতি সামান্য খরচ। বিয়ে-বিচ্ছেদের ব্যাপারে সরকার খুব দরদ দেখিয়েছেন, কোর্ট ফি সস্তা করে দিয়েছেন, যাতে সহজেই মানুষে এ প্রতিকার অবলম্বন করতে পারে। আপনার কাছে যে টাকা চেয়েছিলাম তা দীপঙ্করের জন্যে, তার মামলার জন্যে। কিন্তু সে বলে দিয়েছে, আর যার কাছ থেকেই সাহায্য নিই, যেন আপনার কাছে না হাত পাতি। এমন-কি ছলনা করেও যেন আপনার টাকা আমার হাত ছুঁয়ে ওর তবিলে গিয়ে না পৌঁছয়।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। ছেড়ে দিই। আমি বলব স্থকুকে। সময়মত জানাব ওর মতামত।'

'যদি অমত হয় তা হলে আমার অসম্মতিটাও জানিয়ে দেবেন।'

হো হো করে হেসে উঠল বরেন। বললে, 'যদি মরতে বসেও দু-জনে ঝগড়া করেন তা হলে আর বিচ্ছেদ হল না।'

'অসম্ভব।' রিসিভার রেখে দিল কাকলি।

স্থকান্তকে ডাকাল বরেন। বললে, 'তোর বউ মেয়েটি কম নয়।'

'কেন, কী হয়েছে?'

তখন বললে সব বরেন।

স্থকান্ত তেরিয়া হয়ে বললে, 'না, তা চলবে না। আমি মেনে নেব না অপভাষ।'

'সে কথা তো ওও বলতে পারে। ওই বা কেন তবে সইবে অকীর্তি?'

'বেশ, তবে দুটো মামলাই চলুক।'

'লাভের মধ্যে হবে, কোনো মামলাই চলবে না।' বরেন প্রসন্ন ঔদার্যের ভাব করল : 'ভালোই তো, গ্রন্থি অটুট থাকবে।'

'অসম্ভব।'

'শোন, এক কাজ কর—'

অস্থির হয়ে উঠতে যাচ্ছিল সুকান্ত, ফের বসল।

'মেয়েটাকে, মানে যে অন্যথাচারিণী সাজতে চেয়েছে তাকে ঠেকা। তোর সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলি। যে করে পারিস ওকে নিবৃত্ত কর। নইলে তুই যদি একরোখা হোস, তোর বউও ইকোয়্যালি একগুঁয়ে হতে পারে। তখন খালি জেদই হবে, জিত হবে না। দুটো মামলা চললে তা সেই কনটেস্টই হয়ে গেল, সেই মুখোমুখি যুদ্ধ—পরস্পর জখম হলি, শান্তি হল না। দুটো মামলাই ফেঁসে গেল। আমি ঐ মেয়েটাকে তোর সঙ্গে দেখা করতে বলে পাঠাই, তুই ওকে রুখে দে, ঠাণ্ডা কর।'

সুকান্ত ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে এসে দেখে তুমুল গোলমাল। সেন্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি পাবার পর সুকান্ত সাহেব হয়ে উঠেছে। শার্ট-ট্রাউজার্স পরে টেবিলে বসে খায় আর তা ছুরি-কাঁটায়। দুপুরে লাঞ্চ খায় আফিস-পাড়ায়। বড় চাকরি করছে বলে মৃণালিনী আবার তার খাওয়াদাওয়া বড় করে দিয়েছে। বউকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে বলে সংসারের হয়ে দিচ্ছে তাকে বিস্তৃততর সেবা, বিস্তৃততর অভ্যর্থনা।

সাহেব হবার প্রথম লক্ষণ হিসেবে আজকাল কম কথা বলছে সুকান্ত এবং যখন যেটুকু নেহাত বলছে নিতান্ত আস্তে। কারু সঙ্গেই মিশছে না বাড়িতে, কেউ না বিরক্ত করে তাই যতক্ষণ বাড়িতে থাকছে খালি বই পড়ছে এবং বলাই বাহুল্য, ইংরিজি বই। বাবা-কাকা-দাদাদের ধার দিয়েও ঘেঁষছে না, এবং যদি কখনো চায়ের টেবিলে রাজনীতি বা বিশ্বনীতি নিয়ে তর্ক করে তার মধ্যে সে ঢোকে না, এমন একখানা মুখ করে উঠে যায় যেন জ্ঞানের চরম কথাটি ও-ই একমাত্র জেনে নিয়েছে পৃথিবীতে।

সাহেব হবার দ্বিতীয় লক্ষণ, কিছুতেই উত্তেজিত হবে না। তাই সমস্ত বাড়ি যখন তোলপাড়, সামনে দূরে সমস্ত পাড়া যখন খোঁজাখুঁজি করছে, তখন নিশ্চিন্তকণ্ঠে বললে সুকান্ত, 'এ তো সোজা কথা। কাকলিই নিয়ে গেছে চুরি করে।'

'তবে তুমি যাও, ওকে নিয়ে এসো।' বন্দনা আকুলি-বিকুলি করে উঠল।

'আমি যাব কেন? চোরের কাছে পুলিশ যাবে। পুলিশ গিয়ে চোরকে অ্যারেস্ট করবে! সেণ্টুকে 'সিজ' করে পৌঁছে দেবে বাড়ি। আর যে কিডন্যাপ করেছে তাকে জেলে পাঠাবে।'

'তাই, তাই একটা কিছু কর।' মৃণালিনী উৎসাহ জোগাল।

'হ্যাঁ, থানায় টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

থানায় টেলিফোন করে দিল সুকান্ত।

৩৮

বন্দনা বললে, 'নিশ্চয়ই, সন্দেহ নেই, কাকলিই নিয়ে গেছে। হয়তো এখান দিয়ে যাচ্ছিল কিংবা কে জানে, বাড়ির আশে-পাশে ঘুরঘুর করছিল আর কোন ফাঁকে সদর খোলা পেয়ে বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা, আর অমনি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পালিয়েছে—'

ছেলেহারা মায়ের কল্পনাকে তুচ্ছ করতে চাইল না হেমেন। প্রশান্তকে বলল, 'যা না ছোট বউমার হস্টেলে, দেখ না গিয়ে ওখানে আছে কিনা। যদি থাকে তো নিয়ে আয়।'

'না, না, নিয়ে আসতে হবে না।' বন্দনা উদ্বেল হয়ে উঠল: 'তুমি শুধু একবার দেখে এসো যে ওখানে, ওর কাম্মার কাছে ও আছে। তা হলেই হবে।'

'তা হলেই হবে?' মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী: 'ছেলেকে নিয়ে আসবে না?'

'কদিন ভীষণ কান্নাকাটি করছে কাম্মার জন্যে। রাতে ঘুমুতে পাচ্ছে না, ঘুমের মধ্যে কেঁদে-কেঁদে উঠছে।' বন্দনার চোখ আর গলা ছলছল করে উঠল: 'যদি ওখানে থাকে, ওর কাম্মার কাছে, তা হলে থাকুক এক রাত্তির, পাশে শুয়ে ঘুম যাক আরামে। তা ছাড়া যদি সত্যিই ও ওখানে থাকে, ওর কাম্মার কাছে—' সুকান্তর দিকে তাকাল এবার বন্দনা: 'ওকে পারবে নাকি ছিনিয়ে আনতে? প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দেবে, তুলবে তুমুল শোরগোল। তবু যদি জোর করে কেড়ে নিয়ে আসো কাঁদতে কাঁদতে ও ঠিক তবে অসুখে পড়বে।'

'তা হলে করবে কী শুনি?' মৃণালিনী ধমকে উঠল।

'সকাল বেলা ওর কান্নাই ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে যাবে বাড়ি।'

'ও কালোমুখী আর এ বাড়ি ঢুকেছে!'

'বাড়ির মধ্যে না ঢুকলেও দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।' বন্দনা বাইরে তাকাল জানলা দিয়ে: 'ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে। ছেলেটার মন দিনরাত পুড়ছিল কান্নার জন্যে, তাই সহজেই বোঝা যায়, কাকলির প্রাণও কিরকম হু-হু করছিল। তাই আর থাকতে না পেরে এক ফাঁকে লুকিয়ে এসে চুরি করে নিয়ে গেছে। সকালে উঠে ছেলেটা যখন আবার বাড়ি-বাড়ি করবে, মা-মা করবে, তখন আবার নির্ঘাত দিয়ে যাবে ফিরিয়ে।'

'ফিরিয়ে দেবে, না হাতি!' মৃণালিনী বললে, 'চরম শত্রুতা করবার জন্যেই ও সরিয়েছে ছেলেকে। ওর দলে কত কী লোক আছে তার ঠিক কি। হয়তো ছেলের বিনিময়ে টাকা চেয়ে বসবে। এমনি তো কত আজকাল দেখতে পাই খবরের কাগজে। ফিরিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গেছে, না আরো কিছু। হয়তো মারধোর করবে, খেতে-পরতে দেবে না, মেরেই ফেলবে শেষ পর্যন্ত—'

'কী যে বলো পাগলের মত!' প্রশান্ত বিরক্ত মুখে বললে।

কাকলির কাছে সেণ্টুর অনাদর কত বড় অসম্ভব ব্যাপার, বন্দনারও চোখে-মুখে তার সমর্থন ফুটে উঠল।

'কেন, ও কি আর এ সংসারের বউ, নাকি ও আর সেণ্টুর কাকিমা যে, ওর আর এ বাড়ির লোকেদের জন্যে মায়া থাকবে?' মৃণালিনী বললে, 'ও তো এখন ঘোর শত্রু। আমাদের বিপক্ষ।'

'বিপক্ষ?' চমকে উঠল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, ও ডিভোর্স স্যুট করেছে।' যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সুকান্ত বললে।

'তোর বিবাহিত স্ত্রী তোর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা এনেছে বলতে তোর লজ্জা হল না?' হেমেন গর্জন করে উঠল: 'কিসের ডিভোর্স? জোর করে ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে আয় বউকে। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখ তোর সবল ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তুই একটা পুরুষমানুষ না?'

নির্লিপ্ত মুখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সুকান্ত: 'আমি সভ্য মানুষ।'

'সভ্য হওয়া মানে কাপুরুষের মত হাত গুটিয়ে বসে থাকা?'

'না। সভ্য হওয়া মানে আইন অনুসারে কাজ করা। এ ক্ষেত্রে পুলিশকে খবর দেওয়া। তা দিয়েছি খবর।'

কিন্তু পুলিশের নড়াচড়ার আগেই পাওয়া গেল সেন্টুকে।

ঐ দেখ, ভগলুর কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরছে। কিন্তু কাঁদছে কেন? থেকে-থেকে মারছে কেন ভগলুকে?

কী ব্যাপার?

সেন্টুর বিশ্বাস, রোজ ঠিক সময়ই কাম্মা ফেরে আফিস থেকে, নামে নির্ধারিত বাস-স্টপে, কিন্তু বাস-স্টপ থেকে বাড়ি আসবার যে পথ সে পথ ঠিক চিনতে পারে না। গোলকধাঁধায় পড়ে গিয়ে রোজ পথ ভুল করে বসে, উলটো পথে চলে যায়। সেন্টুর বিশ্বাস, সে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠিক ধরতে পারবে কাম্মাকে, তারপরে সে-ই অলিগলি ঘুরিয়ে ঠিক তাকে নিয়ে আসতে পারবে বাড়িতে। তাকে পেলে কাম্মা আর অসুবিধেয় পড়বে না। তাই ভগলুকে অনেক করে রাজি করিয়ে লুকিয়ে চলে এসেছে বড় রাস্তায়। দাঁড়িয়েছে স্টপের কাছে। কত ট্র্যাম-বাস চলে গেল, কিন্তু কাম্মার দেখা নেই অথচ বাড়ি ফেরারও তাগিদ নেই সেন্টুর। তখন অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ভগলু বললে, কাম্মার আফিস এখনো ছুটিই হয় নি, আজ কী কাজের জন্যে তাকে রাতে থাকতে হবে আফিসে। তখন ছেলে বায়না ধরল, আমাকে তবে আফিসে নিয়ে চল। অগত্যা ভগলুকে বলতে হল আফিসের রাস্তা সে চেনে না। তবু সেন্টু নাছোড়বান্দা। তুই আমাকে নিয়ে একটা গাড়িতে ওঠ, ভদ্রলোকদের বললে তারা ঠিক আফিস দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আমার কাছে পয়সা কই, ভাড়া কই, যাব কী করে? ভগলু আরেক অস্ত্র প্রয়োগ করল। বেমালুম ফিরিয়ে দিল সেন্টু। বললে, আমার টিকিট তো লাগেই না আর তুই আমার চাকর শুনলে তোকেও ছেড়ে দেবে। কিন্তু চাকর-বাকরকে যে ঢুকতে দেয় না আফিসে। বলে সেন্টুকে জোর করে কাঁধের উপর তুলে বাড়ির দিকে ছুট দিল ভগলু। আর সারা রাস্তা সেন্টুর এই বলে কান্না, তোকে তাড়িয়ে দেয় তো দেবে, তুই আমাকে শুধু কাম্মার কাছে পৌঁছে দে। যত কাঁদে, ভগলু তত ছোটে। আর তাকে ছুটতে দেখে সেন্টুর এই মার তো সেই মার।

সেন্টুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতেই মৃণালিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে তুলে নিয়ে হাঁপাতে লাগল। গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললে, 'ভাগ্যিস শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে নি।'

অভিযোগে তখনো ভাঁটা পড়ে নি সেন্টুর। বলছে, 'বললাম তুই চাকর, তোকে যদি আফিসে ঢুকতে না দেয়, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কাম্মা এসে আমাকে কোলে করে ভেতরে নিয়ে যাবে। তারপর তুই যেখানে খুশি সেখানে যা, আমরা কিছু তোকে বলতে আসব না—'

এক পলকে বুঝে নিল বন্দনা। বললে, 'তোমার কাম্মা আফিসে কোথায়? তোমার কাম্মা তো হাসপাতালে।'

'বা, এতদিন বলছ, আফিসে সেই যে গেল আর এল না, আফিসেই আছে—আর আজ বলছ হাসপাতাল?' মায়ের দিকে গঞ্জনাভরা চোখে তাকাল সেণ্টু: 'বেশ, তবে আমাকে হাসপাতালেই নিয়ে চলো।'

'ভালোর দিকে আসুক, তারপর নিয়ে যাব।' পাছে স্তোকের মত শোনায় বন্দনা কথাটিকে বাস্তব করতে চাইল: 'সেই যে আমি হাসপাতালে ছিলাম, তুমি প্রথম প্রথম যেতে না, কাম্মার কাছে থাকতে বাড়িতে, তারপর শেষ দিকে আমি যখন প্রায় ভালো হয়ে উঠলাম, তখন গেলে তোমরা—'

'তোমার তো পেট কাটা গিয়েছিল, আমার কাম্মার কী হয়েছে?'

'তোর কাম্মার গলা কাটা গিয়েছে।' মৃণালিনী ঝলসে উঠল।

'তোমার গলা কাটা গিয়েছে।'

'ছি, অমন কথা বলতে নেই।' প্রশান্ত ছেলেকে টেনে নিয়ে চলে গেল বাইরে।

'আমার কাম্মার কিচ্ছু হয় নি, কিচ্ছু হয় নি—' বলতে বলতে কাঁদতে-কাঁদতে বাপের সঙ্গে চলে গেল সেণ্টু।

'দেখলেন ছেলেটার কী মায়া অথচ ও পক্ষের এতটুকু একটু টান নেই।' বিজয়াকে লক্ষ্য করে বন্দনা অনুযোগ দিল: 'এত দিনের মধ্যে একবার একটু খোঁজ নিল না ছেলেটার। কেমন আছে, কিরকম রয়েছে, তার কাম্মা ছাড়া হয়ে রাতে ঘুমুতে পাচ্ছে কিনা, কার হাতে খাচ্ছে— আশ্চর্য!'

'শত্রু, মহাশত্রু।' মৃণালিনীই টিপ্পনী জুড়ল।

বিজয়ার মনে হল, কাকলি যদি ছেলেধরা সেজেও নিয়ে যেত সেণ্টুকে, বন্দনা যেন তৃপ্তি পেত। তৃপ্তি পেত স্নেহের মান দেখে। এক দিক এত ভালোবাসার আরেক দিক নিস্তরঙ্গ থাকবে এ যেন প্রকৃতির নিয়মেই বেমানান।

তবু কিছু বক্তব্য কাকলিরও আছে এ স্পষ্ট অনুভব করল বিজয়া। হয়তো নিজেকে দিয়েই করল। বলল, 'কাকলির কী হচ্ছে তা কাকলিই জানে। খোঁজ নিতে এ বাড়িতে আসবার আর তার পথ কোথায়? দরজা কোথায়?' হেমেনকে সুকান্তর ঐভাবে কথা বলাটা ভালো লাগে নি, তাই দূরে-সরে-যাওয়া সুকান্তকে লক্ষ্য করল বিজয়া: 'ভগলু বেড়াতে নিয়ে গেল, আর কাকলি ছেলেধরা বলে সাব্যস্ত হল, থানায় চলে গেল এত্তেলা। তারপর কোনো একদিন যদি দেখা যেত কাকলি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে, এ-ঘর ও-ঘর করছে, তখন কী চার্জে ফেলত তার ঠিক কি!'

'চার্জে ফেলবে না তো ফেলবে কোথায় ?' ফণা তুলল মৃণালিনী : 'উনি এই বাড়ির সম্মান কোন অতল তলে ফেলছেন সেটা দেখছ ?'

এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বিজয়া। আগের কথার জের টেনে বললে, 'তা ছাড়া পরের ছেলের জন্যে মায়া করে লাভ কী !'

'কেউ কি লাভ লোকসান ভেবে মায়া করে ?' করুণ চোখে তাকাল বন্দনা।

'অকারণে দুঃখ পাবার সুখের দিকে তাই না যাওয়াই ভালো। ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে সেই ছেলেই জানিয়ে দেবে তুমি আমার পর। তা ছাড়া', বিজয়া কণ্ঠে একটু তারল্য আনল : 'তা ছাড়া সময়ে বুড়োরাই শোক ভোলে, আর এ তো শিশু। সুকু যদি আবার বিয়ে করে তখন সেই নতুন বউকেই কাম্মা বলে ধরতে পারবে সেন্টু, পুরোনোকে মনেও রাখবে না।'

'সে পরের কথা পরে।' বন্দনাকে লক্ষ্য করে ঝলসে উঠল মৃণালিনী : 'তুমি হাসপাতাল বলছ কেন ? হাসপাতাল বলে কেন ছেলেটাকে ঝুলিয়ে রাখছ ? স্ট্রেইট বলে দাও মরে গেছে কাম্মা। আর আসবে না।'

'মরে মরে না এমন শত্রুও দুর্লভ নয় সংসারে।' হেমেন বললে, 'সুতরাং আমি বলি কি, ছেলেটা যখন এত কাতর তখন,' বন্দনার দিকে লক্ষ্য করল : 'তোমরা, তুমি আর প্রশান্ত, একদিন ওকে নিয়ে কাকলির হস্টেলে গিয়ে একটু দেখিয়ে আনলেই তো পারো।'

'অসম্ভব।' দূরে সরে গিয়েছিল সুকান্ত, ফিরে এসে হুঙ্কার ছাড়ল।

সবাই একদৃষ্টে তাকাল সুকান্তর দিকে।

সুকান্ত বললে, 'যে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছে তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী ! তাকে দেখবার বা দেখা দেবার কোনো মানে হয় না। না, কখনো না,' বন্দনার দিকে চোখ রাখল সুকান্ত : 'মরে গেলেও যেতে পারবে না তোমরা। সেধে নিতে পারবে না অপমান। কাটা ঘায়ে সইবে না নুনের ছিটে।'

হেমেনের মুখের উপর আবার সুকান্ত কথা বলেছে বলে বিজয়ার অসহ্য লাগল। রুক্ষ স্বরে বললে, 'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক উঠে গেছে বলে আর সকলের সঙ্গেও উঠে যাবে এমন কোনো কথা নেই। কত শিশু কত নিঃসম্পর্কীয়াকেও মা-মাসি খুড়ি-পিসি বলে, আপনজনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সম্পর্ক নেই বলে চলবে না সে ডাক ?'

'না, চলবে না।' সুকান্ত কঠিনতর হল : 'আমার বিরুদ্ধে কী অসম্ভব কু-কথা বলে ও বিয়ে-ভাঙার মামলা করছে তা জানো ?'

সবাই একটা বাজ পড়ার আশঙ্কায় থ হয়ে রইল।

বিজয়া বললে, 'তা জেনে আমাদের দরকার নেই। তা তোমরা বুঝবে। অভিযোগ মিথ্যে হয় তুমি লড়বে আদালতে। ওকে হারিয়ে দেবে। বিয়েটা ভাঙতে দেবে না—'

'এ বিয়ে আবার কেউ বাঁচিয়ে রাখে!' ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকাল সুকান্ত।

'রাখো বা না রাখো, তাতে সেণ্টুর কী!' বিজয়া বললে, 'তোমার বউ থাকলেও সে কান্না, না থাকলেও কান্না। যতক্ষণ সেণ্টুর ভালোবাসা আছে ততক্ষণ তার কান্নাও আছে। তাই যদি হয়, কাকলি বউই থাক বা ভদ্রমহিলাই হয়ে যাক, ছেলেকে নিয়ে প্রশান্ত আর বন্দনা যেতে পারবে না তার কাছে এর মধ্যে কোনো আইন নেই, যুক্তির বাষ্প পর্যন্ত নেই।'

সুকান্ত হঠাৎ মৃণালিনীর কাছে এল। বললে, 'মা, এ বাড়ি থেকে কেউ যদি যায়ই হস্টেলে বা ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে তা হলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আলাদা হয়ে যাব।'

'তাই যাওয়াই তো উচিত।' এবার হেমেন গলায় ঝাঁজ আনল: 'বউকে তাড়িয়েছিস, এবার নিজেকে তাড়া। নইলে ষোল কলা বীরত্ব প্রমাণ হবে কি করে?'

'হ্যাঁ, সত্যি, আলাদা ফ্ল্যাট দেখ। তোমার মতলব বুঝতে আর কারু বাকি নেই।' বিজয়া চিপটেন ঝাড়ল: 'এবার যাকে সংগ্রহ করবে তাকে আর এজমালিতে পোষাবে না, তাই তারই জন্যে আলাদা ফ্ল্যাট চাই। আগাম ভাড়া নিয়ে না রাখলে সময়কালে বিপদে পড়বে।'

বিপদে তো সুকান্ত এখুনিই পড়েছে। বিনতার সঙ্গে যে সবিস্তার কথা বলবে এমন একটা প্রশস্ত জায়গা কোথাও নেই।

আফিসে বরেন বললে, 'মিসেস বোসের মামলার কো-রেসপণ্ডেন্ট—কে এক শিক্ষিকা, বিনতা সেন, তোর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

'কোথায় দেখা করি?' ফাঁপরে পড়ল সুকান্ত।

'তোর বাড়িতে জায়গা নেই। আমার বাড়িটাও ঠিক নয়। রিফিউজিদের ঠেলায় এম্পটি হাউস পাবার আর জো নেই।' বরেন হাসল: 'কাজে-কাজেই হোটেলই সমীচীন। আমি তাই ফোনে বলে দিচ্ছি—' পরে রিসিভারের চোঙটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললে, 'যে করে পারিস ঠেকা শিক্ষিকাকে। কে কোথাকার শ্রীমতী বিনতা সেন অজ্ঞেয় অনির্দেশ্য হয়ে থাকবে। কিন্তু ধীরেন অ্যাণ্ড সন্সের সুকান্ত বোস—লোকের ধরতে-ছুঁতে বেগ পেতে হবে না। ইয়ং ম্যান, কেরিয়রের প্রথম

মুখেই একটা মর‍্যাল টার্পিটিউডের কালিমা এসে লাগবে এটা ঠিক নয়, আর,' মুখ-চোখ গম্ভীর করল বরেন : 'আর সেটা আমাদের ফার্মের পক্ষেও ক্ষতিকর।'

ব্যাপারটা যেন চোখ ধাঁধানো ভয়ের আলোয় দেখল সুকান্ত। উদ্বিগ্ন অথচ জোরালো গলায় বললে, 'না, না, ওরকমভাবে হতে পারবে না। মামলা আমিই করব। আমার বাদীত্বেই হবে।'

'হ্যাঁ, সেটাই প্রপার। তবে,' সূক্ষ্ম রেখায় হাসল বরেন : 'তবে জোরজবরদস্তি করতে গেলে মুশকিল হতে পারে। তুই জোর দেখাতে গেলে ও পক্ষও জেদ ধরবে। তুই বলবি আমি বাদী হব তুমি কলঙ্কিনী হও, ও বলবে আমি বাদী হব তুমি কপট-নিপট সাজো। সব ভেস্তে যাবে।'

'না, না, এ নিয়ে ঠোকাঠুকি করা যাবে না, সুদের ট্যাক্সে আসলই মারা পড়বে তা হলে।' বিচক্ষণের মত মুখ করল সুকান্ত : 'ম্যানেজ করতে হবে। তুই বলে দে হোটেলের কথা।'

নির্ধারিত দিনে দামী হোটেলের সান্ধ্য বারান্দায় বসেছে দু-জনে—বিনতা আর সুকান্ত—দু-জনের মাঝখানে ছোট একটা টেবিল রেখে।

একটু যেন সজ্ঞানে সেজেছে বিনতা। সম্ভ্রান্ত শুভ্র তো বটেই তার মধ্যে হঠাৎ কখনো দু-একটা বা লজ্জার অরুণিমা। ভঙ্গিটি গম্ভীর, তার মধ্যে ক্বচিৎকদাচিৎ একটু বা লালিত্যের ঢেউ।

একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে কবে কে বসতে পেরেছে মেয়ে!

'হোটেলটা সুবিধের নয়, বাড়িতে ডাকলেই তো পারতেন।' কথার দিকে বিনতাই প্রথম অগ্রসর হল।

'কেন, বেশ তো নিরিবিলি জায়গা। সবরকম কথাই বলা চলে।' বললে সুকান্ত।

'তবু জটিল একটা মামলার বিষয়ে পরামর্শ করছি চট করে এ পরিবেশটা আনে না। বরং একটা হালকা ও চটুল খোশগল্পের দেশে এসেছি এমনি মনে হয়।'

'জীবনমরণের মত দুর্ধর্ষ সমস্যা এমনি খোশগল্পের মধ্যেই সমাধান খুঁজে পেয়েছে।'

'আপনাদের বাড়িতে নিরিবিলি ঘর নেই বুঝি?' পরীক্ষায় প্রশ্ন করছে এমনি নির্লিপ্ত মুখ করল বিনতা। আর যে প্রশ্নটার উত্তর তার জানা সেটাই জিজ্ঞেস করে মাস্টার।

'আমাদের বাড়ি? সে একটা এজমালি হিজিবিজি। নিচু জায়গা দেখলে যেমন জল ঢুকে পড়ে তেমনি ফাঁকা একটা ঘর দেখলে আত্মীয়স্বজন ঢুকে পড়ে।'

'ড্রয়িংরুম নেই বুঝি?'

'ড্রিল-ড্রয়িং ওসব ফালতু কিছুই নেই আমাদের বিত্থালয়ে।' হাসল সুকান্ত. 'মামুলি নোট পড়ো আর টায়েটুয়ে পাশ-মার্ক নিয়ে বেরিয়ে যাও—মানে কোনোরকমে দিন কাটাও। তবে তেতলায় এবারে ঘর উঠছে, কাকা-কাকিমা ওটাতে উঠে যাবেন, ওঁরা উঠে গেলে ওঁদের নিচের ঘরটাকে বসবার ঘর করা যাবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু ততদিন তো আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই।'

'তবে এখন যদি হঠাৎ কেউ বিজিনেস ব্যাপারে এসে পড়ে বাড়িতে?'

'তখন যার বিজিনেস তার ঘরে গিয়ে সে ঠাঁই নেবে। বিজিনেসটুকু সেরে চলে যাবে। একেবারে অন্দরমহলের ঘর, বেশিক্ষণ বসবার প্রশ্রয় পাবে না। কথা সারো, কেটে পড়ো। ড্রয়িংরুম না থাকার এইটেই মস্ত লাভ।' বেশ স্বচ্ছন্দ সারল্যে বললে সুকান্ত।

কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আনল বিনতা। বললে, 'আমার বিজিনেসটাও স্বল্পস্থায়ী—দু-এক কথার। তাই আমাকেও আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল এবং,' কালো চোখে নিশ্চল তাকাল বিনতা: 'এবং আপনার ঘরে।'

'ওরে বাবাঃ,' আঁতকে ওঠার ভাব করল সুকান্ত: 'আমাদের বাড়ি আপনি চেনেন না। বিত্থালয় খামোকা বলি নি। মহাবিত্থালয়টাই ঠিক কথা। মহাবিত্থা কী জানেন তো? মহা প্লাস অবিত্থা মহাবিত্থা। লোকে ভাবে প্রশংসা করছি কিন্তু ভিতরে যে কী সন্ধি করেছি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন।'

'বাজে কথা। কাকলি কত ভালো বলছিল সকলকে।'

'তাই তো সে আলগা দিয়েছে, খসে পড়েছে—'

'সে তো স্রেফ আপনার জন্যে।'

'তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু জানেন, কাকলি যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে আসে, তখন সকলে ওকে সাবানের ফিরিউলি ভেবেছিল। তেমনি আপনি যদি আমাদের বাড়ি যান আপনাকে কিসের ফিরিউলি ভাববে তার ঠিক নেই।'

'তা ভাবলেই বা।' ঔদাস্যের সুর আনল বিনতা: 'আসলে সবাই আমরা ফিরিউলি ছাড়া আর কী! কেউ রূপের, কেউ বিত্তের, কেউ বৈদগ্ধ্যের। কেউ বা ব্যর্থতার। আশাহীনতার।' ম্লান রেখায় হাসল বিনতা: 'ফিরিউলি না বলে বলা উচিত স্যাম্পেলওয়ালি।'

'না, না, আপনি অনেক সম্ভ্রান্ত—'

'সে শুধু উপসর্গের গুণে। উপসর্গ বদলে গেলেই বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারি—কে জানে হয়তো বা উদ্‌ভ্রান্ত।' দিব্যি দাঁত দেখিয়ে হাসল বিনতা।

'আচ্ছা, আপনাকে কি আমি ওর বিয়ের সময় দেখেছি ?'

'কার বিয়ে ?' দুষ্টু-দুষ্টু হাসল বিনতা।

'হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে।' বলেই আবার কেমন অপ্রস্তুত লাগল সুকান্তর : 'মানে আমার আর আপনার বন্ধু কাকলির বিয়ে—'

'মানে বর্তমান বিয়ে, যে বিয়েটা এখনো চালু আছে—'

'হ্যাঁ, যেটা যেতে বসেছে। কী, দেখেছি আপনাকে ?'

'দেখা উচিত ছিল কিন্তু দেখেন নি। কী করে দেখবেন ? আপনি তো তখন শুধু একজনকে দেখতেই ব্যস্ত।'

'সুন্দর বলেছেন—একজনকে দেখতেই ব্যস্ত। প্রেমে আমরা বোধ হয় তাই বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে দেখি না, সেই যে একজন তাকে দেখি। জন এক, নাম নানা। তাই দেহের ক্ষয় হয়, আকাঙ্ক্ষার ক্ষয় নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতি রোমকূপ দেখেও বিজ্ঞান অন্ত পায় না রহস্যের।'

'প্রেমে কী হয় জানি না,' নিচু হয়ে পেয়ালায় চুমুক দিল বিনতা : 'কোনোদিন প্রেম আসে নি জীবনে। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা বুঝি, ওটা উড়ু-উড়ু নয়, কাব্য-কাব্য নয়।'

'আপনি কী করে বলছেন ? বিয়েও তো আপনার আসে নি।'

'ও না এলেও বলা যায়, কেননা—' পেয়ালায় আবার মুখ ঢাকল বিনতা।

'কেননা—'

'প্রেম হচ্ছে একটা অবস্থা, আর বিয়ে হচ্ছে একটা ব্যবস্থা।' বিনতা হাসল : 'অবস্থায় না পড়লে অবস্থার কথা বলা যায় না কিন্তু ব্যবস্থা না করলেও ব্যবস্থাটা কিরকম, বলা যায় বাইরে থেকে। ঘিয়ের আস্বাদ কেমন ঘি না খেলে বোঝা কঠিন কিন্তু কী করে ঘি তৈরি করা উচিত তা বলা যায় বই পড়ে।'

'তা, বই পড়ে কী জেনেছেন বিয়ের বিষয় ?'

'জেনেছি, যাকে ভালোবাসা যায় তাকে বিয়ে করা উচিত নয়।'

'সেই তো মরণ। যাকে চাই তাকে না পাওয়াও ট্র্যাজেডি, যাকে চাই তাকে পাওয়াও ট্র্যাজেডি।'

'সুতরাং ঐ ভুল আর করবেন না।'

'আর করব না মানে ?

'মানে এর পর আবার যখন বিয়ে করবেন, ঝপ করে করবেন। ভালোবাসার জন্যে বসে থাকবেন না। প্রেম ফুল আর বিয়ে ফল এটা ঠিক নয়। বিয়ে ফুল আর প্রেম ফল এটাই ঠিক। আর—'

আরেক পাট চা দিয়ে গেল বয়।

'কী আর ?'

'শুধু হৃদয়ই বড় করবেন না, ঘরখানিও বড় করবেন : মানে, স্ত্রীকে নিয়ে এজমালি ঘিঞ্জির মধ্যে থাকবেন না, আলাদা বাড়ি করে থাকবেন—'

'দ্বিতীয় স্ত্রী হোক কি না হোক, আমি শিগগিরই সরে যাচ্ছি বাড়ি থেকে, আলাদা ফ্ল্যাট নিচ্ছি—'

'সেই আলাদা ফ্ল্যাট যদি আগে নিতেন তা হলে প্রথম বিয়েটা নষ্ট হত না।' চা ঢালতে ঢালতে বিনতা বললে, 'ঘর ছোট হলে হৃদয়ও ছোট হয়ে যায়।'

'কত বলেছিলাম আপনার বন্ধুকে আলাদা ফ্ল্যাট নি। কিছুতে রাজি হল না মেয়ে। এজমালি সংসারে সকলের মধ্যে থাকতে কী যে মধুচ্ছবি দেখেছিল তা ওই জানে। আগে থেকে ঘরদোর সরজমিনে সার্ভে করিয়ে নিয়েছি ওকে দিয়ে, বলতে পারবে না প্রতারণা করেছি। কত বুঝিয়েছি ঐ ঠোকাঠুকির সংসারে খাপ খাব না আমরা, চলো নিজের মাপে নীড় বাঁধি গে নির্জনে। কিন্তু মেয়ের আর কিছু না থাক, গোঁ আছে। বলে বাপ-মা ছেড়েছি, শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়তে পারব না, ননদ-দেওরের স্বাদ আর কোথায় পাব ? তা ছাড়া, সেণ্টু—সেণ্টুকে ছেড়ে থাকব কী করে ?'

'কিন্তু দেখলেন তো পরিণাম। আলাদা হয়ে থাকতে পারলে সব টিঁকে থাকত—শান্তি, সৌহার্দ্য, আত্মীয়তা—সমস্ত। নিত্য টানাটানিতে ছিঁড়ত না দড়িগাছা। এখন কোথায় বা শ্বশুর-শাশুড়ি, কোথায় বা সেণ্টু। দিনেরাত্রে ভুলেও একবার নাম করে না। সুতরাং—' হাসল বিনতা : 'পরের বারে সাবধান হবেন। গোড়া থেকেই হবেন।'

'আমি তো গোড়া থেকেই সাবধান ছিলাম। কিন্তু মেয়ে কী ভীষণ এক-বগ্‌গা—যা একবার বলেছে তা না করে ছাড়বে না।'

'সেটা তো মহৎ গুণ। আপনিও পারতপক্ষে তাই অনুসরণ করবেন। সংকল্পকে নিয়ে যাবেন উদ্‌যাপনে।' নতুন চা তৈরি করে বিনতা পেয়ালা এগিয়ে দিল সুকান্তকে। বললে, 'বিয়ের বিষয় যখন জানতে চেয়েছেন তখন আরো একটা কথা বলে রাখি—'

'বলুন।' চোখে চোখ রাখল সুকান্ত।

'এবার যখন বিয়ে করবেন তখন নিশ্চয়ই বনেদী চাকুরে মেয়ে বেছে নেবেন। তার সঙ্গে গোড়াতেই বোঝাপড়া করে নেবেন, কোথায় কী তার কমিটমেণ্টস। তা হলেই আর কোনো বিরোধ ঘটবে না।'

'আগে এই বিয়েটা তো ভাঙুক।' অসহিষ্ণু ভঙ্গি করল সুকান্ত।

'এ তো ভেঙেই রয়েছে। শুধু আদালতের একটা সই নিয়ে আসা। কাকলি তার আর্জি খসড়া করেছে। দেখবেন খসড়া?'

উৎসাহ দেখাল না স্থকান্ত। অনুতাপের স্বর ফুটিয়ে বললে, 'কী অবুঝ মেয়ে, কিছুতেই রেজেষ্ট্রি বিয়ে মেনে নিতে চাইল না। একেবারে সেকেলে। বললে যজ্ঞ চাই, মন্ত্র চাই, শালগ্রাম চাই, সাত-পাক চাই—আর চাই মুখচন্দ্রিকা—'

'আহা, কী মুখচন্দ্রিকাই হল।'

'বললাম অত সব জবড়জঙে কাজ নেই, চলো টিপ-ছাপ দিয়ে এক ঢোঁকে কাজটা সেরে আসি। তা নয়, বললে বিয়ে যদি বিয়ের মতই না হয় তা হলে বিয়েতে আর ইয়েতে তফাত কী। সানাই বাজবে না, লাল-নীল আলো জলবে না, বেন রসী পরব না, গা ভরে গয়না গমগম করবে না, বাসর হবে না, ফুলশয্যা হবে না, তা হলে বাঙলা দেশে জন্মালাম কেন মেয়ে হয়ে?'

'জানেন, ওর বিয়েতে আমি ওকে সাজিয়েছিলাম।' তির্যক রেখায় হাসল বিনতা: 'এবার ও না তার শোধ তোলে!'

'কিন্তু কী ফল হল অত সাজগোজের?' বললে স্থকান্ত, 'ও ঐতিহ্যকে মানতে গেল কিন্তু ঐতিহ্য যে শুধু একটা পীড়াদায়ক ভার, অন্ধ কুসংস্কারের সমষ্টি, তা বিচার করে দেখল না। চিরদিনই মেয়েটার কাব্যঘেঁষা মন, রঙচঙ জেল্লা-জমকের পক্ষপাতী, শাদাসিধেতে মন ওঠে না। তাই ম্যাজেষ্টিতে গেল, রেজেষ্ট্রিতে গেল না। রেজেষ্ট্রিতে গেলে কত স্থবিধের ছিল, একটা সংযুক্ত দরখাস্ত করেই আজ নাকচ করা যেত বিয়ে। আড়ম্বর করতে গিয়েই যত ঝামেলা বাধিয়েছে। হিন্দু সাজতে গিয়েই ফেলেছে জলের নিচে। এখন লুকিয়ে-চুরিয়ে এক কো-রেসপণ্ডেণ্ট জোগাড় করতেই ঘায়েল হয়ে যাচ্ছি।'

'তা কো-রেসপণ্ডেণ্ট তো আছেই হাতের কাছে।' প্রায় হাত বাড়াল বিনতা: 'দেখুন না ওর আর্জির ড্রাফ্‌টটা।'

বিচলিত হল না স্থকান্ত। বললে, 'ওর আর্জি কিসের? ওর আর্জি চলবে না।'

'তবে আপনার আর্জি চলবে?' চট করে স্বর পালটাল বিনতা।

'হ্যাঁ, তাই তো উচিত।'

'তার মানে আপনি ওকে দুর্নাম দেবেন, নিজে নিতে পারবেন না দুর্নাম?'

'না, কী করে নেব? আমি দুর্নাম নিলে আমার চাকরি যায়। আর চাকরি গেলে,' আড়চোখে তাকাল স্থকান্ত: 'আলাদা ফ্ল্যাট নেওয়া হয় না, দ্বিতীয় বিয়ে তো দূরস্থান।'

'সে অন্য কথা।' বসার ভঙ্গিটা ঋজু করল বিনতা : 'তাই বলে একটা নির্দোষ মেয়ের গায়ে আপনি কাদা লেপবেন ?'

'কেন, সেই ব্যবস্থায় তো সে রাজি ছিল। সে যখন বিচ্ছেদ চায় তখন তার নিজের স্বার্থেই তো তার তা মেনে নেওয়া উচিত।'

'বিচ্ছেদ তো আপনিও চান, তবে আপনার নিজের স্বার্থেই বিকল্প ব্যবস্থা আপনি মানবেন না কেন ?' ভঙ্গি আরো দৃঢ় করল বিনতা : 'আপনার আর্জিতে বরেনবাবু কো-রেসপণ্ডেণ্ট হতে পারলে কাকলির আর্জিতে আমার হতে দোষ কী !'

'দোষ কী !' প্রায় মাথায় হাত দিল সুকান্ত : 'আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, একটা মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষিকা, আপনি যেচে-সেধে এই কলঙ্ক নেবেন ? আপনার ভয়-ডর নেই ?'

'আমি আপনাদের ঐসব প্রথামানা পুঁচকে পুঁটিমাছের প্রাণওয়ালা ক্ষুদ্র মেয়ে নই।' জ্বলে উঠল বিনতা : 'মিথ্যা কুৎসাকে আমি ভয় করি না। এক সংকীর্ণ পুরুষের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত এক মেয়ের মান রাখতে ওটুকু ঝুঁকি আমি নিতে পারব অনায়াসে।'

'কিন্তু ঐ কুৎসায় আপনার যদি চাকরি যায় ?'

'যতদূর বিশ্বাস, যাবে না। আর যদি যায়ও, গ্রাহ্য করি না। সংসারে চাকরি বা টাকাই সব নয়। আত্মার কোনো খাদ্যই টাকা দিয়ে কেনা যায় না।'

'ঐ কলঙ্ক আপনার আত্মার খাদ্য ?' বিঁধিয়ে উঠল সুকান্ত।

'না, একটা অবিবেচক পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দমন করা যাবে সেই তৃপ্তিই আমার আত্মার ভোজ।'

'তা হলে তো বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না—' হতাশের মত হাওয়ায় হাত ছুঁড়ল সুকান্ত।

'হয়ই না তো।' দাঁড়িয়ে পড়ল বিনতা : 'বিরোধ কি শুধু ঘরে, কোর্টে নয় ? বিরোধ কোর্টেও। আপনার আর্জি ফাইল হবে, না কাকলির আর্জি, তাতে বিরোধ, কো-রেসপণ্ডেণ্ট বরেনবাবু হবেন, না আমি হব, তাতে বিরোধ। এত গোলমালে মামলা রুজু হয় না। আর মামলা রুজু না হলে বিচ্ছেদ কোথায় ?'

'কাকলি কি তাই চায় ?' সুকান্তও উঠে দাঁড়াল।

'আমাদের সব পাওয়া কি চাওয়া দিয়েই নির্ণীত হয় ? এই সংঘর্ষই কি কাকলি চেয়েছিল, না আপনি চেয়েছিলেন ? আর এত যে আপনি দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে লালায়িত, তা কি শুধু চাইলেই জুটবে ? কাকলি যতই চাক, ভাগ্য যদি না দেয়, এ বিবাহ অচ্ছিন্ন হয়েই থাকবে। তাই আমি বলি কী—'

উন্মুখ হয়ে তাকাল সুকান্ত।

'আমি বলি আপনি যান, কাকলিকে দুই প্রবল হাতে তুলে নিয়ে আসুন আপনার নতুন ফ্ল্যাটে। আপনি নিষ্ঠুর হয়েছেন, এবার কোমল হোন। এ তো আর্জির মামলা নয়, এ মর্জির মামলা। যে নির্মম তারই তো দয়ালু হওয়া সাজে। যে কঠিন সেই-ই তো দ্রব হবে, আর্দ্র হবে। যান, নিয়ে আসুন গিয়ে, কোনো অপমান নেই, কোনো পরাভব নেই।'

'ও আসতে পারে না?'

'না। আপনি ওকে চলে যেতে বলেছেন আপনিই তুলে নিয়ে আসবেন।'

'অসম্ভব।'

'সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ অসম্ভব। আর প্রথম বিয়ে চালু থাকতে দ্বিতীয় বিয়ের কল্পনা করা অসম্ভব তো বটেই, অসৎও। আচ্ছা আসি, নমস্কার।'

বেরিয়ে গেল বিনতা।

বরেনের কাছে এসে রিপোর্ট করল সুকান্ত।

বরেন সব শুনে বললে, 'দুর্দান্ত মেয়ে।' পরে মুচকে হেসে বললে, 'বিয়ে ভেঙে গেলে দ্বিতীয়া বলে ট্রাই করতে পারিস।'

'অসম্ভব। যা একখানা রসনা, আবার দ্বিতীয়বার ভাঙবে।'

'তা ছাড়া প্রথমটা ভাঙলে তো দ্বিতীয়।' বরেন টিপ্পনী কাটল।

'তবে উপায়?'

'জটিল করে ফেললে।' চিন্তিত স্বরে বরেন বললে, 'দাঁড়া, কাকলিকে ফোন করি। ফোন করে আসতে বলি। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল।'

৩৯

কান্না যাব। সুকান্তের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে সেণ্টু।

প্রথম প্রথম সাহেবী নির্লিপ্ততায় কান্নাটা উপেক্ষা করতে চাইছিল সুকান্ত কিন্তু সেণ্টু একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমাকে কান্নার কাছে নিয়ে চলো।'

কাঁহাতক থাকতে পারবে চুপ করে? ক্রমে সেণ্টু একেবারে কোলের কাছে চলে এসেছে।

তাকে ঠেলে দিয়ে আলগা হবার চেষ্টায় সুকান্ত বললে, 'ও কোথায় গেছে তা কি আমি জানি ?'

'বা, কাম্মা তো আফিসে গেছে। মস্ত বাড়ি, অনেক লোক সেখানে কাজ করে, খাঁচা করে ওঠে-নামে— কত আমাকে গল্প বলেছে কাম্মা—'

'ওর আফিস কোথায় কেউ জানে না।'

'না, তুমি জানো। কাম্মা যে তোমার বউ।'

এত কষ্টেও হাসি পেল সুকান্তের। বললে, 'ওর আফিস উঠে গেছে।'

'কোথায় উঠে গেছে ? যেখানে উঠে গেছে সেখানে সে বাড়িতে নিয়ে চলো।'

এ তো ভারি মুশকিল হল। সুকান্ত আবার কোলের কাছ থেকে ঠেলে দিল সেণ্টুকে। বললে, 'ও আর আফিসে যায় না।'

'যাঃ, তা কখনো হয় ?' অবিশ্বাসের হাসি হাসল সেণ্টু।

'হ্যাঁ, ও কাজ ছেড়ে দিয়েছে।'

'ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেছে ?' বিজ্ঞের মত মুখ করল সেণ্টু।

'কেউ জানে না।'

'না, জানে। আফিসের লোকেরা জানে। তারা ঠিক বলতে পারবে।'

'কী করে পারবে ?' ধমকে উঠল সুকান্ত: 'তারা যে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে ?' এ আরেক অবিশ্বাস্য কথা। ছোট্ট উকিলের মত সেণ্টু বললে, 'কোথায় ?'

'রাস্তায়।'

এও পুরো মানতে প্রস্তুত নয় সেণ্টু। বললে, 'তবে চলো কাম্মার নতুন আফিসের রাস্তায়, কিছু ঘোরাঘুরি করলেই ঠিক কাম্মাকে দেখতে পাব।'

'দেখতে পেলে কী হয়, ও ফিরবে না।'

'আমাকে দেখতে পেলেই ফিরবে।' স্নেহ ও সারল্যে দুই চোখ বড় করল সেণ্টু: 'আমি কাম্মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরব— আদর করব। কাম্মা আর ফিরে যেতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক চলে আসবে।' সেণ্টু আবার সুকান্তর কোল ঘেঁষে এল: 'চলো আমরা গিয়ে খুঁজি। কাম্মার কাছে কত গল্প শুনেছি এই রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে কত লোকে কত হারানো ছেলে-মেয়ে খুঁজে পেয়েছে— কত হারানো বাপ-মা। চলো আমরা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাব কাম্মাকে। চলো—' আবার কান্না জুড়ল সেণ্টু।

'রাস্তায় রাস্তায় ঘোরবার আমার সময় নেই।' উনুনের মত মুখ করল সুকান্ত।

তবুও নিরস্ত হয় না সেণ্টু। বললে, 'রোজ একটু-একটু করে ঘুরবে।'

'যা, আর কারু সঙ্গে ঘোর গে যা।' আবার ঠেলে দিল সুকান্ত।

'না, তোমার সঙ্গে ঘুরব।'

'আমি পারব না ঘুরতে।'

শাসনের সুরে সেণ্টু বললে, 'বা, তোমার বউ, তুমিই তো ঘুরবে।'

'পাকামো করবি তো, এক চড়ে গাল উড়িয়ে দেব।' এবার সেণ্টুকে জোরে, দূরে ছুঁড়ে দিল সুকান্ত।

তবু ছেলেটার ভয়-ডর নেই। বললে, 'দাঁড়াও না, যাও না আফিসে, তোমার সব বই-খাতা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলব।'

'করে একবার দেখিসই না।' সুকান্ত নিষ্ঠুরের মত বললে, 'তোর কাম্মাকে যেমন জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি তেমনি তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।'

'তাই দাও না।' দিব্যি নির্ভয়ে এগুল সেণ্টু: 'তা হলে তো ভালোই হয়। ঠিক তা হলে কাম্মার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।'

'না, জানলা দিয়ে দেখ তাকিয়ে।' বললে সুকান্ত, 'বাইরে একেবারে খোলা রাস্তা। শক্ত ইঁট, পাথর। তোর কাম্মা-টাম্মা কেউ দাঁড়িয়ে নেই। পড়বি আর থেঁতলে যাবি।'

আস্তে আস্তে আবার ঘনিষ্ঠ হল সেণ্টু। বললে, 'তবে যেখানে পড়লে থেঁতলে যাব না সেইখানে ফেলো।'

'সেটা আবার কোন জায়গা?' সেণ্টুর চোখের দিকে তাকাল সুকান্ত।

'কেন, কাম্মার কোল।' কাকাকে ঠকিয়েছে সেই আনন্দে এক গাল হাসল সেণ্টু।

সুকান্ত গম্ভীর হয়ে সামনের টেবিলের কাগজপত্রে মন দিতে চাইল।

'চলো না কাম্মার কাছে।' আবার মুখখানি করুণ করল সেণ্টু।

সুকান্ত নড়ল না।

'চলো। তোমার তো কিচ্ছু পয়সা খরচ হবে না। আমি হেঁটে-হেঁটেই যাব। চলো—'

'না।'

'তুমি ভেতরে নাই বা ঢুকলে। আমাকে কাম্মার কাছে পৌছে দিয়েই ফিরে যেও—'

'না।' গর্জন করে উঠল সুকান্ত।

'আমি না হয় কদিন পরেই ফিরব। কাম্মাকে ঠিক নিয়ে আসব সঙ্গে করে।'

'বিরক্ত করিস নে বলছি।' সুকান্ত চোখ পাকাল: 'তোর মার কাছে যা। ফের বিরক্ত করবি তো—'

'এতে বিরক্তের কী আছে!' দু চোখ ছলছল করে উঠল সেণ্টুর: 'কত দিন কাম্মাকে দেখি নি বলো তো! তোমার কষ্ট হয় না বলে কি আমার হবে না?'

'ফের! আবার!' সেণ্টুর গালে সটান এক চড় বসাল সুকান্ত।

'আর, নির্গলিত কান্না জুড়ল সেণ্টু।

পাশের ঘর থেকে বন্দনা এল ছুটে। রোষ-উষ্ণ মুখে বললে, 'মারো কেন ছেলেটাকে? বোঝাতে পারো না?'

'যা বিচ্ছু ছেলে, বুঝলে তো!'

'কিন্তু ভুলিয়ে-ভালিয়েই তো ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে। একে মনে-মনে পুড়ছে তায় আবার শরীরে মার!' বন্দনা ছেলেকে কাছে টেনে নিল।

'বেশ করেছি মেরেছি।'

'কিন্তু ওর অপরাধ কী? ও ওর কাম্মাকে ভালোবাসে, কাম্মার কাছে যেতে চায়, এই অপরাধ?'

'হ্যাঁ, এই অপরাধ।'

'অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ, এখন এক নিরীহ শিশুকে মেরে তার আর প্রমাণ দিতে চেয়ো না।' বন্দনাও কর্কশ হল।

'চল, তোকে তোর কাম্মার কাছে দিয়ে আসি।' ক্ষিপ্র হাতে মায়ের কাছ থেকে সেণ্টুকে ছিনিয়ে নিয়ে পাঁজাকোলে করে সুকান্ত জোর পায়ে ছুটল নিচে।

অনায়াসেই বুঝতে পেরেছে সেণ্টু, এটা কখনোই কাম্মার কাছে নিয়ে যাবার রীতি নয়! এটা রাস্তায় কতক্ষণ একলা ফেলে রেখে নিষ্ঠুর ভয় দেখাবার চেষ্টা। এ এক প্রতিশোধের চেহারা।

বুঝেই হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সেণ্টু। আর রোল তুলল আকাশছোঁয়া।

'চল, তোকে এমন এক জায়গায় দিয়ে আসি যেখানে আর তোর কাম্মার কথা মুখে না আসে। কাম্মা যাব, কাম্মা কোথায়, কাম্মার কাছে নিয়ে চলো আর বলতে না পারিস—'

তীব্র চিৎকার করতে লাগল সেণ্টু।

নিচে নামতেই বিজয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল: 'কী, কী হয়েছে?'

বিজয়াকে দেখেই তার দিকে ব্যাকুল হাত বাড়াল সেণ্টু। আর বিজয়া উদ্বেল হয়ে নিজের বুকের মধ্যে কুড়িয়ে নিতেই ফুঁপিয়ে উঠল: 'কাম্মা যাব।'

'ফের! ফের কান্না? চড়িয়ে মুখ ভেঙে দেব বলি নি?' সেন্টুকে লক্ষ্য করে সুকান্ত প্রচণ্ড চড় ওঁচাল।

'ওকে মেরে কী হবে?' সেন্টুর চুলে হাত বুলুতে লাগল বিজয়া। বললে, 'তার চেয়ে ওকে একদিন কাকলির কাছে নিয়ে যাও না।'

'আমি নিয়ে যাব?' বুকের মধ্যিখানে তর্জনী রেখে নিজেকে চিহ্নিত করল সুকান্ত।

'গেলেই বা।' প্রায় উড়িয়ে দিতে চাইল বিজয়া।

'এ অবস্থায় লোকে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত আটকায়, মায়ের কাছে যেতে দেয় না।' সুকান্ত আহত স্বরে বললে, 'আর এ এক পরের ছেলে কী খানিক কান্নাকাটি করেছে তখনি গলে গিয়ে অপমান সয়ে তার বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ মিট করে দিয়ে আসব?'

'মিট করে দিলেই বা ক্ষতি কি।' ঘর থেকে হেমেনও বাইরে এল: 'এ অবস্থায় বলছিস—তোর কী এমন অবস্থা?'

'যে স্ত্রী স্পর্ধাভরে অপমান করে চলে যায় তাকে আমি যেচে সেধে একটা ছেলের কান্না দেখিয়ে পটিয়ে ফিরিয়ে আনতে যাব? অসম্ভব।' সুকান্ত সদর্পে বললে, 'আমার মেরুদণ্ড জেলি দিয়ে তৈরি নয়, হাড় দিয়ে তৈরি।'

'তোর মেরুদণ্ড কী দিয়ে তৈরি জানি না কিন্তু তোর মাথাটা গোবর দিয়ে তৈরি।' বললে হেমেন, 'বলি এমন কী হয়েছে তোদের মধ্যে? সামান্য একটা ঝগড়া—কথা-কাটাকাটি। এমন বচসা হামেশাই হয় স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় সংসারে। তার জন্যে বউকে কেউ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে না। আর রাগের মাথায় গোঁয়ার স্বামী যদি তা বলেও, আর একগুঁয়ে স্ত্রী তাইতে গোসা করে চলে যায়, তা হলেই তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে চিরদিনের মত? সেখানে আর কোনো দিন সেতু বাঁধা হবে না?'

'তাই বলে একটা অবান্তর শিশুর মায়াকান্না দিয়ে সেতু বাঁধতে হবে?' সুকান্ত সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ঘাড় ফেরাল: 'কেন, ও পক্ষ ছেলেটার টানে আসতে পারে না এগিয়ে? সেতুটা ওদিক থেকে পড়তে পারে না?'

'কেন, কী হয়েছে?' মৃণালিনী সর্বকর্ত্রী, সে এসে নাক ঢোকাল। ব্যাপারটা জেনে, সরাসরি সেন্টুর উপর ঝাঁজিয়ে উঠল: 'কাম্মা কোথায়! তোর কাম্মা তো মরে গিয়েছে। মরা লোক আবার কী করে আসে! কী করে যাওয়া যায় তার কাছে! সে তো এখন ভূত। গাছে-গাছে ঘুরে বেড়ায়। সে এলে তো ভয় পাবি।'

সত্যি বুঝি ভয় পেল সেন্টু। বিজয়ার গলা দু হাতে আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে।

'কত শিশুর ভালোবাসার জন—মা, দিদি, মাসি-পিসি মরে যায়—কদিন শিশু কাঁদে-কাটে, পরে ভুলে যায় আস্তে-আস্তে।' বিজয়াকে লক্ষ্য করল মৃণালিনী: 'তেমনিধারা ছেলেটাকে তোমরা ভোলাতে পারো না? বলতে পারো না, হাসপাতালে গিয়েছিল কাম্মা, সেখানে মরে গিয়েছে, চলে গিয়েছে সগ্গে—পারো না বোঝাতে?'

উত্তরে দুরন্ত শিশু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মাথাটা কাঁধের উপর সজোরে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিজয়া।

সুকান্তকে লক্ষ্য করে হেমেন বললে, 'ওদিক থেকে সেতু না পড়লে তুই এ পারে হাত গুটিয়ে বসে থাকবি চুপচাপ?'

কোনো জবাব না দিয়েই উঠে যাচ্ছিল সুকান্ত, উপর থেকে প্রশান্ত নেমে আসতেই মাঝপথে বাধা পেল।

প্রশান্ত বললে, 'সেতুটা তো তুইই ফেলবি, তোর দিক থেকেই বাড়বে। সেন্টুর জোরে যাবি কেন, তুই তোর নিজের জোরে যাবি। যাবি খালি হাতে। আর খালি হাতে বলেই টেনে নিয়ে আসবি হিড়হিড় করে।'

'যা জানো না, বোঝো না, যে অবস্থার মধ্যে নিজে কখনো পড়ো নি, তাই নিয়ে কথা বলতে এসো না।' সুকান্ত থমথমে মুখে বললে।

নিচে থেকে হেমেন আবার জ্বলে উঠল। বললে, 'আর যেহেতু তুইই তাড়িয়ে দিয়েছিস তোরই কোনো ছুতো ধরে যাওয়া উচিত আগ বাড়িয়ে। তোরই রাগের পিছে-পিছে, রাগকে অনুসরণ করে, মানে অনুরাগ নিয়ে।'

'যে স্ত্রী ডিভোর্সের মামলা করছে, তার কাছে?' মৃণালিনী সুকান্তের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াল।

'রাখো। ডিভোর্স অমনি মুখের কথা?' মৃণালিনীর দিকে তাকাল হেমেন: 'অমনি কথায় কথায়, মুখের কথায় ডিভোর্স করতে হলে আমি-উনি তুমি-দাদা প্রশান্ত-বন্দনা কেউই আস্ত থাকব না। তা হলে সেই যে বলেছিল অন্ধ স্ত্রী আর কালা স্বামীর বিয়েই সার্থক বিয়ে, দুশ্ছেদ্য বিয়ে, সেই আদর্শ সমাজে গিয়েই আমাদের উঠতে হয়। অন্ধ স্ত্রী দেখতে পাচ্ছে না স্বামীর দুষ্কীর্তি, আর কালা স্বামী শুনতে পাচ্ছে না স্ত্রীর গলিত অগ্নিস্রাব—সেই আদর্শ বিয়ে পাব কোথায়? বাস্তব সংসারে কিছু কলহ কিছু সংঘর্ষ কিছু বিতণ্ডা থাকবেই, তাই বলে সহিষ্ণুতা থাকবে না, ক্ষমা থাকবে না, উদারতা থাকবে না, সমস্ত সদ্বৃত্তি নস্যাৎ হয়ে যাবে এ মহাভারতে লেখে না।'

'এ কি শুধু এক বেলার ঝগড়া, না শুধু একটা সাময়িক মতের অমিল ?' সুকান্ত উঁচু পর্দায় বললে উঁচু সিঁড়ি থেকে, 'এর মূল আরো গভীরে, ঘোর পঙ্কের মধ্যে।'

'মিথ্যে কথা।' ক্রোধে ফেটে পড়ল হেমেন।

'তোমার সত্য আর আমাদের সত্য, স্বামী-স্ত্রীর সত্য, এক নয়—' স্বরে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম একটি কাঁপন আনল সুকান্ত: 'ইতিহাসের সত্য, আর ভালোবাসার সত্য আলাদা। তেমনি বিজ্ঞানের সত্য আর সাহিত্যের সত্য—'

'সত্য-সত্যই অদ্ভুত—' হেমেন বিদ্রূপটা ফিরিয়ে দিতে চাইল।

'হ্যাঁ, অদ্ভুত, আর সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' দৃঢ়, প্রায় দুর্বিনীত শোনাল সুকান্তকে: 'আর এ ব্যাপারে কারু কোনো অভিভাবকত্বের স্কোপ নেই।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে থামল সুকান্ত, নিচে দাঁড়ানো মাকে লক্ষ্য করে বললে, 'মা! সবাই মিলে যদি এমনি অশান্তি করতে শুরু করে, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাত দিতে চায়, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বলছি। সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাব। কোনো সম্পর্ক রাখব না।'

মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল, 'সত্যি, দু দণ্ড শান্তি পেল না ছেলেটা। আগে বউয়ে ধরেছিল এখন ফেউয়ে ধরেছে। যে বউ ছেড়েছুড়ে চলে যায় তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী! সেখানে আবার ছেলে নিয়ে যাবার কথা ওঠে কী করে? যে বউ বার হয়ে যায় সে তো মড়ার শামিল আর যারা সে বউয়ের পক্ষ টেনে কথা বলে—' বিশেষণ খুঁজে পেল না মৃণালিনী।

প্রশান্ত আগেই ভেগেছে, হেমেনও তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দেখল বিজয়া সেণ্টুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ক্ষীরকদম্ব খেতে দিয়েছে, আর তার লোভের মধ্যে রেখেছে আরেকটা লাল রসগোল্লা। আরো, রসগোল্লার পরে রাজভোগ, বলছে বিজয়া, 'কারু কাছে বলবি না বল, আমি তোকে তোর কাম্মার কাছে নিয়ে যাব।'

'আমি কাউকে বলব না।' ব্যাপারের গন্ধটা যেন কিছু সেণ্টুও টের পেয়েছে। স্বর নামিয়ে বললে, 'চুপিচুপি যাব, চুপিচুপি ফিরে আসব।'

'হ্যাঁ, কাঁদতে পাবি না।'

'না, কাঁদব কেন? আমি কি আর এখন দু-এক বছরের শিশু?'

'থাকতে চাইবি না কিন্তু।'

'খানিকক্ষণ থাকার পর মা-ই তো আমাকে নিয়ে যায় বিছানায়। তেমনি খানিকক্ষণ পর তুমি তুলে নিয়ে আসবে।'

হেমেন বললে, 'সত্যি, কোনোক্রমে বউটাকে যদি বাড়ি নিয়ে আসা যেত তা হলে জব্দ হত ইডিয়টটা।'

'চলো না আমরা গিয়ে নিয়ে আসি।' লাফিয়ে উঠল সেণ্টু। সঙ্গে-সঙ্গে হাত বাড়াল লাল রসগোল্লার দিকে।

'ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকত বউমা', হেমেন প্রায় সিনেমার ছবি আঁকল : 'আর শ্রীমান ঘরে ঢুকেই দেখত, মূর্তিমতী ক্ষমা বসে আছে প্রতীক্ষা করে। তখন দেখতাম শ্রীমান কী করে! চেনে কিনা, হাসে কিনা, ধরে কিনা—'

'কিংবা মূর্তিমান সমর্পণ হয়ে পড়ে কিনা পদতলে।' বিজয়া চিপটেন কাটল।

আর কী বুঝল কে জানে, খিলখিল করে হেসে উঠল সেণ্টু।

'একবার দেখি না চেষ্টা করে।' হেমেন প্রায় মনে-মনে বললে।

আফিস থেকে টেলিফোনে কাকলিকে ধরল হেমেন।

'আমি কি শ্রীমতী কাকলির সঙ্গে কথা কইছি?'

'হ্যাঁ। বলুন।'

'আমাকে চিনতে পাচ্ছ?'

'না।'

'আমি শ্রীহেমেন্দ্র— হেমেন বোস— তোমার—'

'কাকা?' কাকলি একটি স্নিগ্ধস্মিত টান দিল কণ্ঠস্বরে : 'কী আশ্চর্য! ব্যাপার কী বলুন।'

'তোমার সঙ্গে একবার দেখা হয়?'

'বা, কেন হবে না? আমার আফিসে আসবেন?'

'না, তোমার হস্টেলে। কোনো বাধা নেই তো?'

'না, আপনার পক্ষে নেই।' সূক্ষ্ম একটু বুঝি বা হাসল কাকলি।

'আমার পক্ষে নেই মানে—' হেমেন বিষয়টা যেন একটু বিশদ করতে চাইল।

'শুধু আপনার পক্ষেই নেই। হস্টেলে একজন লোক্যাল গার্ডিয়ানের নাম দিতে হয়। আমি আপনার নাম দিয়েছি। তাই আপনার আসতে কোনো বাধা নেই। আর সব পুরুষ ডিবার্ড্।' একটু বুঝি বা থামল কাকলি : 'তবে আমি অবশ্যি অন্যত্র গিয়ে যে কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারি। তাই বলুন, আমি গিয়ে আপনার আফিসে দেখা করব?'

'না, না, তোমার কষ্ট করতে হবে না।'

'আপনারই বা অত দূর কষ্ট করে যাবার দরকার কী!' কাকলি নির্লিপ্ত স্বরে বললে, 'কী ব্যাপার, যদি সম্ভব হয়, টেলিফোনেই বলুন।'

সরাসরি সম্মুখীন হতে পারল না হেমেন। ঘুরিয়ে বললে, 'ব্যাপার আর কিছু নয়, তোমার কাকিমা একবার তোমার কাছে যাবেন।'

'বা, বেশ তো, মেয়েদের আসতে কোনোই অসুবিধে নেই। কবে আসবেন? সামনের রবিবার? ছুটির দিন?'

'না, ছুটির দিন সুবিধে হবে না।'

'বেশ, উইক-ডেতেই আসবেন। পরশু, কেমন? বেশ, কখন, কটায় সময়?'

'দুপুরবেলা। ধরো একটা থেকে দুটো। তোমার লাঞ্চ-টাইম।'

হাসল কাকলি, 'টিফিন-টাইম! তা আমি সকাল-সকাল ফিরব হস্টেলে। টিফিন না হয় ওখানেই করব। বেশ, তাই। সব ভালো? আচ্ছা, ছাড়ি। প্রণাম।'

বাড়ি ফিরে বিজয়াকে সব বললে বিজয়া যেন খুব উৎসাহিত হল না। বললে, 'ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আমি যেন দূতের কাজ নিয়ে যাচ্ছি। আর সে দৌত্যের কী ফল হবে তা যেন ওর কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট হয়ে আছে। মিষ্টিমুখে আমাকে ফিরিয়ে দেবে— তাতে ওর এতটুকু অসুবিধে হবে না। আমি কেন পরের জন্যে নিচু হতে যাব? আমার কী দায় পড়েছে? আমি কেন কুড়োতে যাব প্রত্যাখ্যান?'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।' হেমেন কানের পিঠ চুলকোতে ল্যাগল: 'যদি সত্যি তোমাকে এক কথায় ফিরিয়ে দেয়। সে অপমান তুমি নাও কেন? এটা, এ অবস্থাটা তো ঠিক মাথায় আসে নি।'

স্বামীর অস্বস্তি দেখে হাসল বিজয়া। বললে, 'তবে এক কাজ করো। ওকে টেলিফোনে জানাও যে আসলে সেণ্টু ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। আর আমি যাচ্ছি তার এস্কর্ট হয়ে। তা হলেই পড়বে অসুবিধেয়। আমি কোনো ভিক্ষের আবেদন নিয়ে যাচ্ছি না, একটা ন্যাওটা অপোগণ্ড শিশু তার আবদার নিয়ে যাচ্ছে। যদি ফেরাবে তো শিশুকে ফেরাবে, আমাকে নয়। তখন আমার তোমার, সারা সংসারে কারুরই কোনো লাগবে না অপমান।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ।'

পরদিন ফের রিসিভার তুলে নিল হেমেন: 'আমি কি শ্রীমতী কাকলির সঙ্গে কথা কইছি?'

'কে, কাকা?' খুশি খুশি উজ্জ্বল কণ্ঠে বললে কাকলি, 'কি, ঠিক চিনতে পেরেছি?'

'পেরেছ। শোনো। কাল দুপুরে তোমার কাছে যে তোমার কাকিমা যাচ্ছেন—'

'হ্যাঁ, ঠিক মনে আছে। একটা থেকে দুটো।'

'হ্যাঁ, সঙ্গে আরো একজন যাচ্ছেন।'

'আরো একজন?' কেমন কর্কশ শোনাল কাকলিকে: 'কে?'

'আসলে সেই অতিরিক্ত লোকটিই যাচ্ছেন। তোমার কাকিমা যাচ্ছেন তার সঙ্গী হয়ে।'

'কে সেই লোক?' কাকলী আরো রুক্ষ হল: 'নাম বলুন।'

'নামটাও ছোট্ট। লোকটাও ছোট্ট।'

'কে? তার পরিচয় নেই?'

'আছে। সে সেণ্টু।'

'সেণ্টু? সেণ্টু আসছে?' প্রথম সংঘাতে উথলে উঠল কাকলি। পরমুহূর্তেই তার স্বর কাঁপতে লাগল, হাতের মুঠোয় কাঁপতে লাগল রিসিভার: 'সেণ্টু আসছে. কেন? ওর আসা কি ঠিক হবে? যদি কাঁদাকাটি করে? যদি—' নিজেই প্রায় কেঁদে ফেলল কাকলি। ছেড়ে দিল টেলিফোন।

'এবার বড় অসুবিধেয় পড়েছে।' বাড়ি এসে বিজয়াকে বললে হেমেন, 'সেণ্টু যাচ্ছে শুনে অভ্যন্তবিন্দুতে আর স্থির থাকতে পারছে না। কাঁপছে, হয়তো বা কাঁদছে। হঠাৎ টেলিফোন ছেড়ে দিল।'

'এবারই ওর পরীক্ষা।'

'ফল?'

'ও জানে আর ওর সেণ্টু জানে।'

'একটু তুমিও জানো।' অর্থপূর্ণভাবে তাকাল হেমেন: 'পরীক্ষা একটু তোমারও। সেণ্টু আর তার কান্নার টানাটানির মধ্যে তুমি একটু প্যাঁচ কষে কায়দা করে বউটাকে নিয়ে আসতে পারো কিনা বাড়ি। স্বকুর নিরেট কপালটার উপর পারো কিনা ছুঁড়ে দিতে।'

পরদিন ঠিক একটা বাজার দশ মিনিট আগে হেমেন আফিসের গাড়ি নিয়ে হাজির।

সমস্ত বাড়ি ঘুমে। বিজয়া পা টিপে টিপে বন্দনার ঘরে এল। বন্দনাকে জাগিয়ে বললে, 'সেণ্টুকে সাজিয়ে দাও।'

ঘুমুচ্ছিল সেণ্টু, লাফ দিয়ে উঠে বসল। সাজাবে আবার কী! আমি তো আর সেই ছোটটি নেই যে কপালে টিপ আর চোখে কাজল দেবে। না, পাউডারেরও

দরকার নেই। সত্যিকার পুরুষমানুষ মুখে কখনো পাউডার মাখে না। শুধু চুলটা আঁচড়ে দাও আর চাও যদি, দাও অ্যালবার্ট কেটে। বুশ শার্ট আর প্যান্ট পরিয়ে দাও, আর পায়ে শূ নয়, হাওয়াই স্যাণ্ডেল। শূ নিয়ে কোলে উঠলে কাম্মার শাড়ি নোংরা হয়ে যাবে কিন্তু স্যাণ্ডেল থাকলে কোলে উঠতে-উঠতেই পা থেকে খসিয়ে নিচে ফেলে দিতে পারব।

সেণ্টু হেঁটেই নেমে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু বিজয়া তাকে কোলে তুলে নিল। আস্তে-আস্তে নেমে যেতে যেতে আস্তে-আস্তে বললে, 'কোনো শব্দ যাতে না হয়, কেউ যেন টের না পায়।'

এ কথা কয়টাও তত ফিসফিস করে বলা হয় নি সেটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে সেণ্টু বললে, 'আরো আস্তে।'

হস্টেলের গেটে এসে হেমেন খবর নিয়ে জানল, হ্যাঁ, কাকলি আছে বাড়িতে। কথা দিয়ে কথা না রাখবার কৌশল করে নি। হেমেন বললে, 'তোমরা চলে যাও ভিতরে। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরছি গাড়ি নিয়ে।'

টিপিটিপি পায়ে বিজয়া আর সেণ্টু কাকলির দরজায় এসে পৌছল। আর চৌকাঠটা পেরোবার আগেই চকিতে দু হাতের বিহ্বল বিস্তারের মধ্যে সেণ্টুকে বুকে তুলে নিল কাকলি। নিবিড় নিপীড়নে কাকলির কাঁধের মধ্যে মুখ লুকোল সেণ্টু।

মুখটা কাকলির চোখের কাছে সম্পূর্ণ মেলে ধরবে না কিছুতেই। লজ্জায় মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে।

'আমি কে বলো তো ?'

সেটুকু বলতেও লজ্জায় ভেসে যাচ্ছে সেণ্টু।

'আমি কে চিনতে পেরেছ ? চেয়ে দেখ না আমার দিকে।'

কথা নেই, শুধু বাহুবেষ্টন।

'এতদিন আসো নি কেন ?'

'তুমি যাচ্ছ না কেন বাড়ি ?' মুখ না ফিরিয়েই ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করল সেণ্টু।

'কী করে যাই বলো। দেখছ না পড়ছি, পরীক্ষা দিচ্ছি, ভীষণ কঠিন পরীক্ষা—'

পরীক্ষাটা কী জিনিস আবছা-আবছা বোঝে খানিক সেণ্টু। দিদির পরীক্ষাটা যে কী হয়রানি, সুবীর-জয়ন্তীও কেমন নাজেহাল ঐ উপদ্রবে, তার অজানা নয়।

'কই, এ কথা তো আমাকে কেউ বলে নি—' সহসা মুখ ফেরাল সেণ্টু। কান্না-কান্না চোখে হাসির সরল নিশ্চিন্ততা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'বেশ, এবার তো জানলে !'

'তবে বলো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে পর যাবে।'

'বা, যাব বৈকি। নিশ্চয় যাব। তখন আর যেতে বাধা কী! তবে বলো তুমি আর কাঁদবে না, বাড়িতে অশান্তি করবে না। যা খেলনা দেব তাই নিয়ে খেলবে।'

কোল থেকে নেমে পড়ল সেন্টু: 'না, তুমি যখন যাবেই তখন আর কাঁদব কেন? ঠাকুরমাটা বলে তুমি মরে গেছ, তাই তো কাঁদি। কাকাটা তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে পরে মারে তাই তো অশান্তি করি। নইলে তুমি ঠিক আছ, তুমি ঠিক যাবে, আজ না-হয় কদিন পর, তা হলেই তো আমি হৈ-চৈ করি না। কই, আমার খেলনা কই?'

টেবিলের উপর খেলনার বাক্স, তার দিকে ধাবিত হল সেন্টু।

এতক্ষণে বিজয়াকে প্রণাম করবার সময় পেল কাকলি। প্রণাম করে বিনম্র স্নিগ্ধ মুখে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। কী আদেশ হয় যেন তারই প্রতীক্ষায়।

'তুমি বললে পরীক্ষার পরে যাবে।' অন্তরঙ্গের মত গলা নামাল বিজয়া: 'এখন থেকে-থেকে শুধু কাম্মার পরীক্ষার খোঁজ নেবে। পরীক্ষা শেষ হল কিনা, চলো কাম্মাকে নিয়ে আসি বাড়ি এই বলে নতুন কীর্তন ধরবে।'

'এখন আপাতত তো ঠেকালাম।'

'তোমার মতন জাদুকর আর কে আছে। কী ভালোবাসে তোমাকে, এক কথায়ই কেমন বিশ্বাস করে ফেলল।' বেশ একটু সপ্রশংসভাবেই বললে বিজয়া, 'নইলে কী কাঁদছিল তোমার জন্যে, কদিন ধরেই কাঁদছিল। সবাই ভাবছিল ওর কান্না দেখে তুমি স্থির থাকতে পারবে না, ওকে শান্ত করতেই ওকে বুকে নিয়ে ফিরে আসবে বাড়ি।'

করুণ করে একটু হাসল কাকলি। বললে, 'একটা অপোগণ্ড শিশুর কান্নাই সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাবে, সমস্ত সমস্যার সমাধান?'

'তার আর দরকার হল কই? ছেলেটা তোমাকে দেখে কাঁদতেই ভুলে গেল। এখন দেখ,' বিজয়া আবিষ্ট চোখে দেখতে লাগল: 'সত্যি দেখ, ছেলেটা কেমন খেলা নিয়ে মেতেছে, কেমন হাসছে আপন মনে। কিন্তু,' বক্সুর চোখে তাকাল বিজয়া: 'কিন্তু ছেলেটা হাসলেও বা খেলা নিয়ে ভুলে থাকলেও কি ফিরে যাওয়া যায় না? কিসের বিবাদ, কোথায় সমস্যা!'

'বলেন কী,' গম্ভীর হল কাকলি: 'ব্যাপারটা এত সাংঘাতিক যে আদালতে গিয়ে উঠেছে।'

'শুনেছি। কিন্তু আমি বলি কী, তুমি সব ধুয়ে প্রক্ষালন করে নির্মল করে দিতে পারো না?' বিজয়ার চোখে মিনতি ঝরতে লাগল: 'যেমন এক কথায় তুমি সেণ্টুকে হাসালে তেমনি আরেকজনকে হাসাতে পারো না?'

'আরেকজনকে হাসাব?' নিজেই হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'সেণ্টু যেমন আমার কাছে এসেছে, ও পারে না আসতে!'

'ও না পারুক, কিন্তু তুমি তো পারো। তুমি কাজ-জানা মেয়ে। তুমি অসাধ্যসাধিকা। আমার মনে হয়,' ভয়ে-ভয়ে তাকাল বিজয়া: 'তুমি যদি তোমার ঘরে ফিরে যাও, নিশ্চয়ই ও তোমার কাছে ধরা দেবে।'

'কোনো গ্যারিণ্টি নেই। বরং সেই গ্যারিণ্টি থাকত যদি ও এখানে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইত। ডাকত ফিরে যেতে। বোঝাপড়া করে নিত।'

'ও পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে তুমিও ফেল করবে কেন? তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে।' বিজয়া একখানা হাত ধরল কাকলির, কতটা শুকিয়েছে, বালা কেমন ঢিলে হয়েছে তাই দেখল নেড়ে-চেড়ে। বললে, 'ও যে ক্ষমা চাইতে আসছে না ওর সেই নির্লজ্জতাও তুমি ক্ষমা করবে। ক্ষমার কোনো মাপজোক নেই, দেশ-কাল নেই। ক্ষমা ক্ষমা। নইলে তুমিও জেদ ধরে থাকবে ওও জেদ ধরে থাকবে তা হলে চলে কী করে?'

'আপনি এ কথা বলছেন?' স্তম্ভিতের মত চেহারা করে রইল কাকলি: 'বলছেন, আমি গুটিগুটি ফিরে যাব? এই বিচার আপনার?'

'বিচার কাকে বলে বুঝি না। বুঝি মীমাংসা।' আবার ভয়ে-ভয়ে তাকাল বিজয়া: 'যদি তুমি গেলে শুধু সেণ্টু নয়, সমস্ত সংসারে ফের শান্তি ফিরে আসে'—

'সূক্ষ্ম বিচার না বোঝেন একটা সামান্য স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় তো দেবেন।' ভিতরে-ভিতরে তপ্ত হয়ে উঠেছে কাকলি: 'বলি অত্যাচারিত কে—?'

চুপ করে রইল বিজয়া।

'বলি, কাকে অকারণে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে? জেনে শুনে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে?'

'তোমাকে। তুমি অত্যাচারিত।'

'তবে আপনি আমার পক্ষ নেবেন না? যে অত্যাচারী তার পক্ষ নেবেন?' কাকলি মুখ প্রায় কাঁদ-কাঁদ করল: 'যে অত্যাচারী তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবেন না, আর আমাকে বলবেন ফিরে যেতে?'

'না। তোমাকে বলি না ফিরে যেতে।' বিজয়া মাথা উঁচু করে বললে।

'বলেন না !'

'না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম তুমি তোমার প্রতিজ্ঞায় বিনিশ্চল আছ কিনা। নাকি সেন্টুকে দেখে, আমাদের দেখে, বা এতদিন কাউকে না দেখে নরম হয়ে গিয়েছ। তুমি নরম হওনি, হবে না। কোনো অনুরোধে-উপরোধে নয়, কোনো কান্নাকাটিতে নয়, নয় বা কোনো বাধা-বিপদে। অত্যাচারীর অপমানের শোধ নেবে, উত্তর দেবে সমুচিত।'

'বা, আপনি আমার পক্ষে!' প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল কাকলি।

'আমি কেন, সকলেই তোমার পক্ষে। কিন্তু একটা কথা। ডিভোর্সের মামলাটা তুমি আনবে কেন?'

কুণ্ঠিত মুখ করে কাকলি বললে, 'তা এখনো পাকাপাকি ঠিক হয় নি কে বাদী হবে। ছ'একদিনের মধ্যেই ঠিক করে দেবে উকিল।'

'না, তুমি অত্যাচারিত, তুমি কোনো উদ্যোগ করবে না।' পরামর্শ দেবার মত করে বললে বিজয়া, 'অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে অকারণে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই উদ্যোগ করে বিবাহ ছিন্ন করলে—সমাজ দেখুক স্বামীর স্বেচ্ছাচার। নইলে তুমি যদি মামলা আনো, লোকে বলবে, স্বামী রাগের মাথায় একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল বটে কিন্তু বউটা কী মন্দ, স্বামীকে সংশোধনের একটা পথ দিলে না, নিজেই ইচ্ছে করে বিয়েটা ভেঙে দিলে। স্বামীর সমস্ত দোষ তাহলে ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি মামলা করে তা হলে বিয়ে ভাঙার জন্যে স্ত্রীর আর দুর্নাম রটে না—'

'দেখি, ভেবে দেখি।' পরে মুখ টিপে হাসল কাকলি: 'সমুদ্রের আবার শিশিরে ভয়। কৃষ্ণনামের ভয় আবার দুর্নামে।'

যে দুটো খেলনা পেয়েছে সেন্টু, দুটোই পিস্তল। একটা লাল প্লাসটিকের, পিংপং-এর বল তার গুলি। গুলি যেখানেই লাগুক লাফ দিয়ে ফিরে আসে। আর অন্যটা স্টিলের, গুলি হচ্ছে বাণের মত, মাথায় রবারের টুপি। আর এ বাণ, একাধিক বাণ, যেখানে গিয়ে লাগে সেখানে আটকে থাকে।

সেন্টু মহাস্ফূর্তিতে বলছে, 'এ লাল পিস্তলটা ছুঁড়ব কাকার মাথায়, বল মাথায় লেগে সাঁ করে বেরিয়ে যাবে, লুফে নেব। আর এটা ছুঁড়ব ঠাকুমাকে তাক করে, বাণ ঠিক লেগে থাকবে কপালে, আরেকটা ঠিক নাকের ডগায়—'

বাকি খেলনাটা আরো মজার। একটা আস্ত মস্ত জাহাজ। মালবোঝাই, লাল নীল শাদা সবুজ হলদে। এক জাহাজ লেবেনচুষ।

গাড়িতে, ফিরে যেতে-যেতে হেমেন জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন বুঝলে?'

'সঙিন। তার মানে দু দিকেই সঙিন খাড়া। জেদ ভর্সস জেদ। আর ঝগড়া তো সূচ্যগ্র ভূমি নিয়ে।' বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'ওও দেবে না, ওও ছাড়বে না।'

আফিসে ফিরে যেতেই বরেনের ফোন পেল কাকলি।

'কী ঠিক করলেন ?'

'আমি ছেড়ে কথা কইব না। আমিই বাদী হব।' কাকলি বললে।

'কিন্তু তার আরেক বিপদ আছে।'

'আপনি থাকতে বিপদকে ভয় করি নাকি ?' লঘুস্বরে হেসে উঠল কাকলি : 'আপনি আর কিছুর বারণ না হোন আপনি বিপদবারণ।'

'হ্যাঁ, তবে সন্ধ্যার দিকে আসবেন আমার বাড়ি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব।'

'আসব।'

সন্ধ্যার দিকে ঠিক গেল কাকলি।

'এসেছেন ?' বরেন কণ্ঠস্বরে হাত বাড়িয়ে দিল।

'এখন তো তবু অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসি, যখন-তখন আসি না—' চোখের কোণে কাকলি হাসল।

'বসুন।'

কাকলি বসল : 'নতুন বিপদটা কী ?' চোখে আবার ঝিলিক দিল। যেন বিপদ কিছুই হতে পারে না।

'না, বিপদ কিছু নয়, তবে আপনি যদি মামলা করেন, যেই করুক, তাকে গিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে জবানবন্দি করতে হবে।'

'তার মানে সকলের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে আমার বক্তব্য ?'

'হ্যাঁ, আদ্যোপান্ত ব্যভিচারের কাহিনী— মানে সুকান্তর সঙ্গে বিনতার ব্যাপার। পারবেন ?'

'ওরে বাবা, সেই বানানো গল্প ?'

'সবই বানানো কিন্তু পারবেন বলতে ?'

'না, গলায় বোধ হয় বেধে যাবে।'

'তারপর আদালত হয়তো যাচাই করবার জন্যে নিজেই কিছু খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করল, পারবেন সামলাতে ? কোর্ট ভর্তি লোক, উকিলের দল, সব ব্যভিচারের গন্ধ পেয়েছে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বরে আনতে পারবেন সারল্য, আনতে পারবেন স্পষ্টতা ?'

'অসম্ভব।' সোফার গায়ে পিঠটা ছেড়ে দিল কাকলি।

'জবানবন্দির দৌর্বল্যে কোর্টের মনে যদি একবার সন্দেহ হয় যে কাহিনী বানানো, তা হলেই কোর্ট এনকোয়ারি চালাবে, আর যদি সাব্যস্ত হয় আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, ফৌজদারিতে আপনার শাস্তি হয়ে যাবে।'

'কী সর্বনাশ !'

'হ্যাঁ, তাই বলছি, আপনার রিস্‌ক নেবার দরকার কী ! যা ঝড়ঝঞ্ঝা, সুকুর উপর দিয়ে বয়ে যাক। ও সামলাতে হলে সামলাক, ভেঙে পড়তে হলে ভেঙে পড়ুক।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো।' চিন্তিত মুখে কাকলি বললে, 'শুধু একটা মিথ্যে আর্জি করা নয়, তার সপক্ষে দাঁড়িয়ে আবার মিথ্যে কথা বলে আসা ? পারব না। যাক, আমার গিয়ে দরকার নেই।'

'সেইটেই ডিসেণ্ট, সেইটেই ডিগনিফাইড। আপনি কেন মিথ্যে কাহিনীর স্রষ্টা বলে বক্তা বলে বিবেকের কাছে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হবেন ? আপনি কিছু জানেন না, কিছুতে আপনার স্পৃহা নেই আক্রোশ নেই, আপনি সেই উদার ও উদাসীন ভাব করে থাকুন—'

'অন্তত, এই ক্ষেত্রে, সেইটেই সোজা।' সোজাসুজিই হাসল কাকলি : 'তবে তাই হোক।' না, বিনতার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই, ভালো মন্দ সব সে স্পষ্ট দেখে নিয়েছে : 'আমি বাদী হব না। আপনার বন্ধুই কর্তা সেজে বিয়েটা ছিন্ন করে নিক।'

'সেইটেই পরিচ্ছন্ন।' উঠে দাঁড়াল বরেন।

তারপর যখন গাড়ি করে কাকলিকে তার হস্টেলে পৌঁছে দিতে যাবে, তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হাতে একটা ছোট রক্তগোলাপের দিকে তাকাতে তাকাতে বরেন বললে, 'তবে দাঁড়াচ্ছে আমিই ব্যভিচারী।'

ঘাড় ফিরিয়ে হাসল কাকলি। বললে, 'বদান্য।'

'বদান্য, প্রেমে বদান্য না হলেই বা ব্যভিচারী হয় কী করে ?' উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল বরেন আর রক্তগোলাপটা কাকলির চুলের মধ্যে আটকে দিল।

এর ক মাস পরে বাড়িতে একখণ্ড কাগজ নিয়ে এসে সুকান্ত খুব হৈ-চৈ শুরু করল। প্রথমেই দেখাল বন্দনাকে : 'এই দেখ, ডিক্রির নকল নিয়ে এসেছি। ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। ডিভোর্সের ডিক্রি।'

বন্দনা কাঁপতে লাগল। প্রশান্তকে ডাকল।

প্রশান্ত পড়ে দেখল, তাই। কী কারণ তা ডিক্রিতে লেখা নেই কিন্তু স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে সুকান্ত বসু আর কাকলি মিত্রের মধ্যে যে বিবাহ হয়েছিল তা এতদ্দ্বারা ছিন্ন ও কর্তিত করা হল।

'বাঁচলাম। মুক্ত হলাম।' মায়ের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দ হয়ে বললে সুকান্ত।

দেখল বিজয়া, দেখল হেমেন। দু-জনেই মাথা নিচু করে রইল।

দেখল ভূপেন। দুবার, আরো একবার পড়ল। রাগে দুঃখে অপমানে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কতক্ষণ পরে ফেটে পড়ল বোমার মত। সুকান্তর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল: 'বেরো, বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে। যা, আলাদা হয়ে যা। সকলের মধ্যে তুই তবে ঐ পাপমুখ নিয়ে কী করে দাঁড়িয়ে আছিস?'

হেমেন এসে ধরল ভূপেনকে। বললে, 'সে কী দাদা? ও চলে গেলে, আলাদা হয়ে গেলে আমাদের এজমালি পরিবার ভেঙে গেল না?'

'যখন বউমা চলে গেল তখনই তো ভাঙল আমার এজমালির স্বপ্ন।' ভূপেনের স্বর অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল।

'আহা, বউ একটা পরের বাড়ির মেয়ে।' বললে মৃণালিনী, 'সে চলে গেলে এজমালি পরিবার ভাঙে কী করে? ভাইয়েরা একত্র থাকলেই তো হল।'

'না, বউয়েরাও একত্র। বউয়েরাই বাড়ির অস্থিমজ্জা।' ভূপেন স্খলিত পায়ে এগুল তার চিরন্তন বৈঠকখানার দিকে। বললে, 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'

·৪·

যতদূর সাধ্য শব্দ না করে ঢুকল কাকলি।

'কে?' পরুষভাবে কে হাঁক পাড়ল। আর হাঁক পাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এল এক অচেনা মূর্তি: 'কী চাই?'

'আমি এ বাড়ির মেয়ে।'

'কোন ঠিকানা খুঁজছেন?'

ঠিকানা বললে কাকলি।

'এখানে বাড়ি দুটো। উপর তলায় বাড়িওলা নিচের তলায় ভাড়াটে। আপনি কোন তলার মেয়ে?'

'উপর তলার।'

'তা হলে সিঁড়িটা ওদিক দিয়ে।' দেখিয়ে দিল ভদ্রলোক।

অনেক অদলবদল হয়েছে। ভাড়াটে বসেছে নিচে। বাড়িটার আর সেই শ্রী নেই, জলুস নেই। ভাড়াটেরা অনেক রকম সব খোপ ও খাঁচা তৈরি করেছে, তুলেছে বেড়া আর পার্টিশনের দেয়াল। ঝুলিয়েছে অনেক তোশক-চাদর। বাড়িটার সম্ভ্রান্ত মুখে দিয়েছে চুনকালি। কী আর করবেন বাবা! আয় নেই, স্বাস্থ্য নেই, স্ফূর্তি নেই। বড় ছেলেটা অমানুষ। মেয়েটা গৃহান্তরী।

ওপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সিঁড়ির মুখ পেল কাকলি। আস্তে আস্তে নিশ্বাস গুনে-গুনে উঠতে লাগল উপরে।

হব-হব সন্ধে। রাস্তার আলো জলি-জলি করছে।

সিঁড়িতে প্রথম বাঁক নিতেই দেখতে পেল কাকলি, ভিতরের বারান্দায় বাবা শুয়ে আছেন ইজিচেয়ারে আর মা চেয়ারে বসে আছেন পাশটিতে। কী যেন একটা পড়ছিলেন মা, দিনের আলো ঝাপসা হয়ে আসতেই থেমে গিয়েছেন। হাতের বইটা কোলের উপরে খসে পড়েছে।

ক্ষণকালের ধূসর পেয়ালায় একটি সোনালী স্তব্ধতা টলটল করছে।

ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল কাকলি।

'কে?' গায়ত্রী চমকে উঠল।

'আমি।'

'কে আমি?' চোখে ভালো ঠাহর করতে পারছেন না, প্রায় গর্জালেন বনবিহারী।

'আমি কাকলি।'

বিষাদের মাঠে যেন একটি প্রশ্রয়ের ছায়া পড়েছে, কাকলি মা-বাবার মাঝখানে মেঝের উপর বসে পড়ল।

যেন ভগ্ন, নত, বিজিত দেখাচ্ছে। পরিত্যক্ত, সর্বক্ষুণ্ণ।

'কি, ফিরে এলি?' গায়ত্রী কণ্ঠস্বরে মায়ের করুণা ঢালল।

'এলাম।' শান্ত দৃঢ় স্বরে কাকলি বললে, 'তোমাদের মেয়ে, বাড়ির মেয়ে হয়ে চলে এলাম

'তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি?' বনবিহারীর স্বরে একটু বা ঝাঁজ ফুটল।

'বিয়েটাই নাকচ করে দিয়ে এলাম।'

'তার মানে?' ভুরু কুঁচকোলেন বনবিহারী: 'তার মানে এবার ভিক্ষান্ন? খোরপোশ?'

'না, না, সমস্ত বিয়েটাই রদ হয়ে গেল।' হাতব্যাগটা হাটকাতে লাগল কাকলি : 'কোর্ট থেকে ডিক্রি হয়েছে ডিভোর্সের।'

'সত্যি ?' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল গায়ত্রী : 'তোর বিয়েটা নেই ?'

এক মুখ আলো নিয়ে কাকলি বললে, 'নেই। এই দেখ ডিক্রির সার্টিফায়েড কপি, জাবেদা নকল। এই দেখ কোর্টের সিল, গোলমোহর।'

'নেই ? নেই ?' উদ্বেল বাহুতে গায়ত্রী কাকলিকে কোলের মধ্যে টেনে নিল। যেন ঘোর ক্যান্সার হয়েছিল কিংবা করাল টি-বি—তা আর নেই, কোন অব্যর্থ চিকিৎসায় তা হঠাৎ দূরীভূত হয়েছে। এ যেন কল্পনা-ভাবনার বাইরে। এ প্রায় গন্ধর্বনগর!

'পড়, পড়ে শোনা ডিক্রি।' বনবিহারী হুকুম করলেন।

আলো জ্বেলে পড়তে লাগল কাকলি।

আর সন্দেহ কি। যে রাহু কলঙ্কস্পর্শ ফেলেছিল তা অপসৃত হয়েছে। আবার চাঁদ ঢেলে দিয়েছে লাবণ্য। তার কৌমারকান্তি।

গায়ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ আলিঙ্গন করল মেয়েকে। বললে, 'তুই আবার আমায় মেয়ে।'

হাসল কাকলি : 'তাই বলে তোমার বিধবা মেয়ে নই, সধবা মেয়েও নই। আবার তোমার কুমারী মেয়ে! আবার সেই কাকলি মিত্র। মিস কাকলি মিত্র।'

'শরীর কেমন আছে ?' গায়ত্রী তাকাল পস্টাপষ্টি।

'ভালো আছে, খুব ভালো। হাওয়ার মত ভালো, আলোর মত ভালো—'

'কী করে রহিত হল বিয়েটা ?' যেন কোথায় একটা অস্বস্তি বোধ করছেন এমনি ভাবের থেকে বললেন বনবিহারী।

'যে করেই হোক, পাপগ্রহ বিদায় নিয়েছে, এইটেই বড় কথা।' বললে গায়ত্রী, 'যেখানে মুক্তি পাওয়া নিয়ে কথা সেখানে ছল-বল-কৌশল কোনো কিছুই আপত্তিকর নয়। মুক্তির পক্ষে সমস্ত শর্তই গ্রাহ্য।'

'না, না, শর্ত-টর্ত কিছু নেই, একেবারে আকাশের মত ফাঁকা—' ডানা মেলে-দেওয়া পাখির স্বরে বললে কাকলি।

'ডিক্রিটা একতরফা দেখছি।' সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন বনবিহারী, 'আর বাদী বা অভিযোক্তা স্বয়ং সুকান্ত।'

'উলটোটাও হতে পারত।' হাসির ঝিলিক দিয়ে কাকলি বললে, 'এ দু পক্ষে একটা বোঝাপড়া করে শর্টকাট দিয়ে বেরিয়ে আসা। মামলার ওই আকারটাই আপোস-মীমাংসার নিরীহতম ভদ্রতম চেহারা।'

'বিগ্রহ ভেঙে গেলে তাকে আর মেরামত করা নয়—' সরোষে বললে গায়ত্রী।

'অল্প একটু চিড় খেলে না হয় চলে মেরামতি, কিন্তু বিগ্রহ যেখানে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে—'

'সেখানে গঙ্গায় বিসর্জন।' গায়ত্রী লাফিয়ে উঠল : 'সেখানে আবার নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।' জগদ্দল পাথর নেমে গিয়েছে বুক থেকে এমনি ত্বরিত লঘিমায় শরীরে ঘূর্ণি দিল গায়ত্রী। বললে, 'এবার আবার কাকলির বিয়ে দেব।'

গম্ভীর-গম্ভীর মুখে বনবিহারী শুধোলেন, 'তুমি না কোথায় চাকরি করতে ?'

'তোমাকে কে বললে ?' তৃপ্তির ঢেউ তুলল কাকলি।

'কেন, দেবনাথ বলেছে।' বললে গায়ত্রী। স্বামীকে সংশোধন করলে : 'করত কী, এখনো করছে। মস্ত বিলিতি আফিস। কত না জানি মাইনে তোর রে খুকি ?'

বনবিহারীর পাশ ঘেঁষে বসে কাকলি সমস্ত বিশদ করল। আদর করে বাড়িতে খুকি বলছ কি, আফিসে গিয়ে দেখে এসো কী বিক্রম! আলাদা ঘর, টেবিলের উপর টেলিফোন, কেমন সব হালী আসবাব। লাগোয়া বাথরুম, বেসিন আয়না ব্র্যাকেট—সব ফার্স্ট রেট। সবাই বলে অপ্সরী।

পত্রালি এসে গিয়েছে। সোৎসাহে বললে, 'চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে ? শুনিয়ে শুনিয়ে ?'

'না। পরোক্ষে বলে। শুনতে পাই কানাঘুষো।'

'খুব সেজেগুজে যাও বুঝি ?' স্বপ্নের চোখে বললে পত্রালি!

'নাই বা সাজল-গুজল।' ভরাট গলায় গায়ত্রী বললে, 'খুকি আমার এমনিতেই সুন্দর। দেবীর মত সুন্দর।'

'সেই অর্থে বলছে না মা।' কাকলি হেসে উঠল : 'রাষ্ট্রভাষায় অফিসারকে বলে অফ্‌সর্। সেই সূত্রে স্ত্রী-অফিসারকে বলে অফ্‌সারী, মানে অপ্সরী।'

সকলে হেসে উঠল।

বিজনও পৌঁছে গিয়েছে এতক্ষণে।

আনন্দের ঢেউ উঠল সর্বত্র। ঘরের মেঝেয়-দেয়ালে, কাঠে-ইঁটে, আলনায়-

'দাদা কোথায় ? দাদা ফেরে নি ?' ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'পার্কে দেখে এসেছি। এক ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব ?' বিজন চঞ্চল হয়ে উঠল। কাকলির দিকে তাকাল : 'তুমি এসেছ শুনলে একটুও দেরি করবে না, পড়িমরি ছুটবে বাড়ির দিকে। তোমাকে খুব ভালোবাসে।'

'আর তুই ভালোবাসিস না?' ছোট ভাইকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরল কাকলি। লজ্জায় হাসল বিজন।

সত্যি, দিদিকে কী অদ্ভুত মিষ্টি লাগছে। কতদিন দেখি নি, যেন ভুলে গিয়েছিলাম। যেন রূপকথার দেশে কোন অন্ধকার পাথর-পুরীতে বন্দী ছিলেন এতদিন, নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়-নদী ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছেন লোকালয়ে—আর তাঁকে কে ধরে, সটান চলে এসেছেন কলকাতায়।

'এখানেই তো থাকবি?' জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

'বাড়ির মেয়ে কোথায় আবার যাব!' কাকলি আদুরে গলায় বললে, 'আর কোথায় ফেলবে?'

'তোর জিনিসপত্র?'

'একটা মেয়ে-হস্টেলে আছে যেখানে শেষ কালটায় ছিলাম। কাল ভোরে গিয়ে নিয়ে আসব।'

নিজের আগের ঘরেই জায়গা হল কাকলির। ঘরটা পত্রালি আর বিজন তাদের আলাদা পড়ার জায়গা বলে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, এখন দু ভাইবোন সংযুক্ত হাতে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে দিদির জন্যে ফাঁকা করতে লাগল। মর-মর রুগী, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে চাঙ্গা হয়ে, তেমনিই তাদের দিদির ফিরে আসা। ইঁট-পাথর-ভাঙা ভূমিকম্পের দেশে আস্ত খুঁজে পাওয়া। তার জন্যে কোনো ত্যাগই আজ আর তাদের দুঃসহ নয়।

মার থেকে শাড়ি-ব্লাউজ সাবান-তোয়ালে চেয়ে নিয়ে কাকলি বাথরুমে ঢুকল। টাবে-ড্রামে-বালতিতে কত জল, কী মনোরম ঠাণ্ডা! সস্পৃহ দেহ শীতল অবগাহনের জন্যে আনচান করে উঠল। নিবিড় নিঃশেষে বিন্দু-বিন্দু জল ঢেলে-ঢেলে স্নান করবে কাকলি। হস্টেলে কৃপণ মেয়েগুলির আস্তানায় না আছে জলের গৌরব, না বা স্নানের ঔদার্য। একটা কালো জলের টলটলে পুকুর পেলে গা ডুবিয়ে স্নান করত কাকলি। জলের নিচে নিজের ছায়া দেখে চলকে-চলকে চমকে-চমকে উঠত। কিংবা যদি পেত একটা নীলচে সমুদ্র। ধারে পারে কেউ কোথাও নেই, তুচ্ছ একটা তৃণগুল্মও নয়, পেত যদি অবাধ নির্জনতা। যার রঙ শাদা, স্পর্শ শান্তির।

ইজিচেয়ারের নিচে চাকা বসানো, বনবিহারীকে তাঁর ঘরে, বিছানায়, ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে চাকর।

ঘরের কাছে আসতেই, বিছানায় স্থানান্তরিত হবার আগে, বনবিহারী চাকরকে থামতে বললেন। বললেন, 'আমাকে ধর তো, দেখি আমি উঠে দাঁড়াতে পারি কিনা।'

চাকর বললে, 'না বাবু, থাক। পারবেন না।'

'না, পারব।' বনবিহারী তবু জোর করতে লাগলেন: 'তুই তোর হাতটা শুধু দে। কাঁধ দিতে হবে না। আমার পা আর এখন দেবনাথ নেই, আমার পা এখন কাকলি হয়ে গিয়েছে।' প্রায় পাগলের মত, শিশুর মত হেসে উঠলেন বনবিহারী।

উঠি-উঠি করবার দুঃসহ চেষ্টা করছেন, গায়ত্রী ছুটে এসে ধরে ফেলল স্বামীকে। বললে, 'না, উঠতে হবে না। উঠতে গেলে বুকে চোট লাগবে। দরকার নেই একজার্ট করে।'

'তুমি জানো না, আমার কাকলি ফিরে এসেছে, তার মানে আমার শক্তি ফিরে এসেছে, আমার যৌবন ফিরে এসেছে।' বনবিহারী বলতে লাগলেন উজ্জ্বল চোখে: 'আমি উঠে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেয়েছি, পেয়েছি এগিয়ে যাবার উৎসাহ। তুমি বাধা দিও না। দেখি, দেখি না চেষ্টা করে।'

'না।' ধমক দিয়ে উঠল গায়ত্রী: 'এখুনি কোনো দরকার নেই। কাকলি তো এখন বাড়িতেই থাকবে। বাড়িতে থেকেই আফিস করবে। ও যখন আর সঙ্গছাড়া হবে না তখন আর তোমার ভাবনা কী। ও নিশ্চয়ই তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবে। নিয়ে যাবে এগিয়ে।'

সুবোধ শিশুর মতন চুপ করলেন বনবিহারী। বিছানাটা ইজিচেয়ারের সঙ্গে সমতল, বিছানাতে নিজস্ব কায়দায় উপনীত হলেন। শুয়ে হাঁপাতে লাগলেন, গায়ত্রী শিয়রে বসে কখনো মাথায় কখনো বুকে ধীরে হাত বুলুতে লাগল।

'কাকলি কোথায়?'

'স্নান করছে।'

'কত দিন পরে ওর নামটা উচ্চারণ করছি বলো তো।' চোখ বুজলেন বনবিহারী: 'সংসারে আমাদের ছাড়াও কি যেন কী একটা আছে। যার বলে হারানো ধনও আবার ফিরে পাওয়া যায়। আশাতীতও আপনি এসে হেসে দেখা দেয়। স্নান হয়ে গেলে কাকলিকে আমার কাছে এসে বসতে বোলো।'

'আজ আর নয়।' গায়ত্রী আবার শাসনের ফণা তুলল: 'আজ অনেক অনেক কথা বলেছ। আজ আর কোনো আইন-আদালত নয়। কাকলি তো আর পালাচ্ছে না। ধীরে সুস্থে সব জেনেশুনে নিলেই তো হবে—'

'দেখ।' বনবিহারী এবার নিজে স্ত্রীর হাতে হাত বুলুতে লাগলেন: 'একটা কথা কেবলই বুকের মধ্যে খচখচ করছে।'

'কী?'

'কাকলিকে দেখেছ ?'

'বা, দেখলুম বৈকি।'

'দেখেছ তার হাতে শাঁখা নেই লোহা নেই, সিঁথিতে সিঁদুর-নেই ?'

হেসে উঠল গায়ত্রী। বললে, 'কুমারী মেয়েরা ওসব পরে নাকি ? তেমন-তেমন জাতের সধবা মেয়েরাও পরে না। যারা প্রগ্রেসিভ তারা তো মনে করে ওসব দাসত্বের চিহ্ন।'

'হ্যাঁ, চিহ্ন তো বটেই কিন্তু শ্রী-র চিহ্ন, বলতে পারো, শ্রী-লেখা। যেমন পায়ের আলতা, ঠোঁটের পান, চোখের কাজল, তেমনিই একটি অলংকরণ।' যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বনবিহারী : 'কাকলির এ শোভা উঠে গেল ?'

'উঠে গেল কী !' গায়ত্রী আবার হাসল : 'আবার পরবে। আবার সাজবে।' তারপর গলায় একটু ঝাঁজ আনল : 'ওসব পরা থাকলে ও ফিরে আসত কী করে ? জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল বলেই তো ওকে পারলে তুলে নিতে।'

'কথাটা ঠিক। কিন্তু বিয়েটা যখন করেই ছিল,' শূন্য চোখে বাইরের দিকে তাকালেন বনবিহারী : 'বিয়েটা ও ভাঙতে গেল কেন ?'

'যাদের বিয়ে তারা ভেঙেছে। আর যারা ভেঙেছে তারা জানে কেন ভাঙল। এ নিয়ে তোমার-আমার মাথাব্যথা কী !' ঝলসে উঠল গায়ত্রী : 'অ্যাকসিডেণ্টে জখম হয়েছিল, হাসপাতাল থেকে সারিয়ে সুস্থ-সবল করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে এতেই আমাদের যথেষ্ট। কেন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, কোন সূক্ষ্মে-প্রচ্ছন্নে লেগেছিল আঘাত তা জেনে আমাদের কী দরকার ! সুস্থ-মুক্ত কাকলিকে আমরা পেয়েছি তাইতেই আমাদের সমস্ত।'

'হয়তো তাই।' তেমনি উদাস ভঙ্গিতেই বললেন বনবিহারী, 'তবু কেন জানি না প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মনের মধ্যে। কাকলি হারল কেন ? বিদ্রোহই যখন করেছিল তখন কেন সে বিদ্রোহকে জয়ী করতে পারল না ?'

'তুমি কী বলছ ? একটা অপদার্থ বিয়েকে খণ্ডে দিয়ে এল এ তার হার ? এ তার জয়। এও তার বিদ্রোহ।'

'না, না, ভাঙার বিদ্রোহ নয়, গড়ার বিদ্রোহের কথা বলছিলাম। একটি ভালোবাসা দিয়ে আনন্দ দিয়ে নতুন জীবন নতুন সংসার নির্মাণ করবে প্রতিজ্ঞার এই জলন্ত শিখা নিয়ে সে বেরিয়েছিল অন্ধকারে। সে শিখা সে নিবতে দিল কেন ? কেন ধৈর্যের দেয়ালের আড়ালে প্রতীক্ষার কোটরের মধ্যে তাকে রাখল না বাঁচিয়ে ?'

'সে কথা আদালতে গিয়ে জিজ্ঞেস করো হাকিমকে।' বিরক্ত হল গায়ত্রী।

'ওর বিয়েতে আমাদের সম্মতি ছিল না, আশীর্বাদ ছিল না—কে জানে, হয়তো বা তারই জন্যে বিয়েটা বেমজবুত ছিল, কিন্তু তাই বলে ও এতদূর যাবে যে বিয়েটা ভেঙে দেবে? কিরকম যেন লাগছে, কিরকম যেন মনটা পুরোপুরি সায় দিতে পারছে না। ও কেন এত অস্থির হল, এত তাড়াতাড়ি করল, কেন আরো সহ্য করল না? সহ্যশক্তিতেই দৃঢ় থেকে কেন বশীভূত করল না বিমুখকে? কেন ছেড়ে দিল? কেন পালিয়ে এল?'

সহ্যশক্তিতে গায়ত্রীও পারল না দৃঢ় থাকতে। বললে, 'তাই কোর্টে দাঁড়িয়ে বলো না গিয়ে হাকিমকে আপনার এ বিচার অন্যায় হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি ডিক্রি দিলেন কেন? কেন আমার মেয়েকে দিলেন না সহ্যশক্তির শকুন্তলা সাজতে? বলে দেখ কনটেম্পট হয় কিনা—'

বনবিহারী চুপ করে রইলেন।

'কোর্টে না যাও, পার্লামেন্টে যাও। সেখানে গিয়ে এ আইন বাতিল করাও। যতক্ষণ আইন আছে ততক্ষণ তার খেলা আছে। ততক্ষণ পীড়িতেরা নেবেই তার প্রতিকার। তেমনি কাকলিও বেআইনী কিছু করে নি। যা আইনে সুসিদ্ধ তার তুমি বিরুদ্ধতা করতে পারো না।'

'না, তা পারি না।' তবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বনবিহারী।

'তা ছাড়া কার কিসে অসহ্য কার কোথায় অপমান, তুমি-আমি বুঝব কী করে? ওদের নিক্তি আর আমাদের নিক্তি কি এক হবে? সাপে যাকে না কেটেছে সে কী করে বুঝবে কেমন সে দংশন?'

'তবু—'

'রাখো।' এবার স্পষ্ট ধমক দিয়ে উঠল গায়ত্রী: 'তুমি কাকলিকে দেখছ, আর ও পক্ষ—ও পক্ষ কে দেখছে? ও পক্ষ কী দুঃসহ কালকূট তার তুমি কী জানো! সহ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল বলেই ও রাজি হয়েছিল বিচ্ছেদে। কী না জানি ও বলছিল, আপোস-মীমাংসায়। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের রিসার্চের কী দরকার? মুখোমুখি কলিশনে মোটর গাড়ি যদি পুড়ে শেষ হয়ে যায় তার আর কী করা যাবে। আরোহী যদি বেঁচে থাকে তা হলেই যথেষ্ট। কার দোষে কলিশন হল, এ পক্ষের না ও পক্ষের, এ গবেষণা বৃথা। যদি সংগতি থাকে আবার কিনে নেবে মোটর গাড়ি।'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন কাকলি ভালোবেসেছিল—'

'থাক। সব চোখের অঞ্জন। উপরের ঝকমক।'

'তাই কি মনে হয়েছিল তখন ?' বিহ্বল চোখে তাকালেন বনবিহারী।

'নাই বা মনে হল ! তার আর কী হবে ? যদি কেউ ভুল করে, তার আর সংশোধন হবে না ? লাল টুকটুকে আম দেখে কেউ যদি তা পাড়ে হাত বাড়িয়ে, দোষ দেব না। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখে আমের মধ্যে পোকা তা হলে তাকে পোকা সুদ্ধ খেতে বলব ? অসম্ভব। বলব গোটা আমটাই ছুঁড়ে ফেলে দে। ঢের আম আছে গাছে।'

'উপমা দিয়ে কথা বোলো না। উপমা ভারি বিচ্ছিরি।' রুষ্ট মুখে বললেন বনবিহারী, 'সোজা কথা সোজা করে বলো।'

'বুঝেছি, তোমার মধ্যে রয়েছে এখনো কুসংস্কার। একটা হিন্দু বিয়ে ভেঙে গেছে, যার ফলে দু পক্ষই এখন স্বাধীন, স্বতন্ত্র, এ তুমি মেনে নিতে পারছ না। কিন্তু আধুনিক যুগের মেয়েরা কেন মানবে এই দীনতা ? আইন যখন অধিকার দিয়েছে তখন যোগ্য ক্ষেত্রে কেন ছিন্ন করবে না সেই দাসত্ব ?'

'কিন্তু ভালোবাসা—'

'ভালোবাসা সব কথার ফুলঝুরি। আর ভালোবাসা হতে গেলেই তাকে চিরস্থায়ী, জীবনস্থায়ী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দু দিনের ভালোবাসাই বা ভালোবাসা নয় কেন ?' গায়ত্রী উঠে পড়ল : 'ভালোবাসা চলে গেলে জীবনের বাকি কটা দিনও কি মুছে দিতে হবে ? নাকি বাকি কটা দিন বাঁচিয়ে রেখে জীবনকে উজ্জ্বল করতে হবে আরেক ভালোবাসায়, আরেক প্রতিশ্রুতিতে ?'

বনবিহারী ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিতে বললেন।

গায়ত্রী বললে, 'তুমি এখন খাবে না ?'

'আরেকটু পরে খাব।'

আলোটা নিবিয়ে দিল গায়ত্রী। ঘর অন্ধকার করে দিল।

স্নান সেরে নিজের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কাকলি। ফাঁকা ঘরে নিচু পায়ার একটা খাট টেনে এনে দু ভাইবোনে দিদির জন্যে দিব্যি বিছানা করে রেখেছে। একটা লেখবার টেবিল, টিপাই আর গোটা দুই চেয়ার ছাড়া বাড়তি জিনিস আর কিছু রাখে নি। সব এ ঘর ও ঘর চালান করে দিয়েছে।

পত্রালি বললে, 'কেমন হল ?'

ঘরময় হাসতে হাসতে ঘুরতে লাগল কাকলি। এ জানলা থেকে ও জানলা। দেখতে লাগল কেমন দেখায় বাইরেটা। সব আগের মত, না বদলেছে ?

সব আগের মত।

কিছু বদলায় নি। একটি কণামাত্র না। সেই আলো-আলো অন্ধকার; দূর-দূর মানুষের নৈকট্য, চিনি-না-চিনি পথের হাতছানি।

'কাল সকালেই তোমার জন্যে ফুল নিয়ে আসব দিদি।' বিজন বললে।

একা-একা ছাদে চলে এল কাকলি। সেই অগাধ অক্ষোভ আকাশ। সেই গোপন-গাঢ় নির্জনতা। বলিষ্ঠ উপস্থিতির মত সেই বিশ্রামভরা কদম গাছ।

গাছের কাছটিতে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি। একাধিক ডাল চলে এসেছে এদিকে। কটা পাতা ছুঁল আদর করে। সমস্ত গা সিরসির করে উঠল।

একটু অন্যমনা হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। হঠাৎ কাকলির মনে হল কে যেন আরো একজন ছাদে উঠে এসেছে নিঃশব্দে। ঠিক বুঝি দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। ঘাড়ের উপরে নিশ্বাস ফেলেছে। কাকলি চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল এদিক ওদিক। না, কেউ না। পথ-না-পাওয়া এক ঝলক হাওয়া আপন খুশিতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সে রাত্রে একা-একা অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি কাকলির। বিছানায় না থাকলেও ঘরে কেউ নেই এমন অব্যাহতির ভাবটা আর ছিল না। গা ভরা এত পবিত্রতাও যেন পীড়ার মত। যদি অন্তত সেণ্টুটাকেও নিয়ে আসা যেত বুকের উপর। যদি অন্তত তার নশ্বর উপস্থিতিটাও থাকত গায়ের কাছে।

সকালেই কাকলি চলে গেল হস্টেলে— বাক্স আর বিছানা যা ছিল আর টুকিটাকি যা জিনিস— ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে এল।

আর বিকেলেই দেখা দিল বরেন।

উপরে নিয়ে আসতে আসতে সিঁড়িতেই কাকলি বললে, 'কই, দুপুরে আফিসে ফোন করেন নি তো?'

'ফোন করার আর কী দরকার!' দৃঢ়, শক্ত, অভ্রান্ত পায়ে উঠতে লাগল বরেন বললে, 'ভাবেন নি যে বিকেলে আসব?'

'সারাক্ষণই ভাবছি।' উঠতে-উঠতে কাকলি বললে, 'তবু ফোনে কথা বলতে বেশ ভালো লাগে। বেশ একটু অন্যরকম লাগে।'

'সেই অন্যরকম কথা অন্যরকম করে মুখোমুখি বলা যাবে এখন।' হাসল বরেন। আর কাকলির ঘরের মধ্যে আসতেই বললে, 'বাটারওয়ার্থকে বলুন আপনাকে বাড়িতেও একটা ফোন দেবে।'

'এই তো সবে বাড়ি পেলুম!'

'না, বাড়িও ঠিক বলতে পারেন না। বাড়ি পশ্চাতে আছে।'

'এটা তবে কী?'

'এটা ধর্মশালা।'

'তবে পশ্চাতে যেটা আছে সেটা অধর্মশালা?' কাকলি চোখ নামাল।

দু-জনে হেসে উঠল একসঙ্গে।

'চলুন বাবা-মার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

বনবিহারী আর গায়ত্রী একসঙ্গেই আছেন।

'এই আমার মা-বাবা। আর ইনি ধীরেন অ্যাণ্ড সন্‌সের বরেনবাবু—'

গায়ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর চিরদিনের যা স্বভাব, সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকালেন বনবিহারী।

নিজেই চেয়ার টেনে বসল বরেন। আর মুহূর্তে নিরর্গল হল। অনেক কথার মধ্যে তিনটি আশ্বাস সে উঁচু করে ধরল। বনবিহারীর চিকিৎসার আরো ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্ছেদ করতে হবে নিচের ভাড়াটেকে। আর দেবনাথকে সতর্ক শাসন-চক্ষুর নিচে দিতে হবে একটা স্থায়ী চাকরি।

'সে কী? আপনি এখনো তৈরি হন নি?' ত্বরিত চোখে বরেন তাকাল কাকলির দিকে: 'বাইরে বেরোবেন না?'

'এই যে আসছি। দু মিনিট।'

'আচ্ছা আরো দু মিনিট গ্রেস মার্ক দিচ্ছি।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল বরেন। হেসে বললে, 'কাড়াকাড়ি করে তাড়াতাড়িতে দরকার নেই। ধীরে সুস্থেই তৈরি হোন।'

ঠিক এমনটিই হবে এই যেন মুখস্থ বনবিহারীর। পারবে না, রোধ করতে পারবে না। কোনো দিনই কেউ পারে নি। শুধু এমনিটিই হবে বলে তাকিয়ে রয়েছে।

দু-জনে, বরেন আর কাকলি, বেরিয়ে গেল একসঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল পাশাপাশি।

নামতে-নামতে কাকলি বললে, 'আপনি যে বদান্যতার হরিহরছত্র খুলে দিয়েছেন।'

কানের কাছে মুখ এনে বরেন বললে, 'তোমাকে যদি পাই, ভাগ্যের এই বদান্যতাকে কী বলবে?'

'কিন্তু দীপঙ্করের মামলার কী হল?' একটু অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করল বুঝি কাকলি।

'বলছি। চলো। ওঠো গাড়িতে।'

. . . ৪১ . . . .

গাড়িতে উঠে এ দরজা থেকে ও দরজার দিকে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সরে যেতে-যেতে কাকলি বললে, 'তারপর ?'

সব দেশের নিয়মেই গাড়িতে মেয়েরা আগে ওঠে। কাকলিও উঠল। উঠেই, রাস্তার ধারের, কাছের দরজা ঘেঁষে বসল। সেই ক্ষেত্রে বরেনের উচিত ছিল গাড়িটা অতিক্রম করে বিপরীত দিকের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকা। কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে সে প্রস্তুত নয়। সে কাকলির দরজার পাশে এসেই দাঁড়াল আর কাকলিকে পরোক্ষ ইঙ্গিত করল ওপাশে সরে যেতে।

যেন একটা প্রোপ্রাইটরি ভাব। শুধু সান্নিধ্যের প্রবলতায় সম্মত করানো।

ওরকমভাবে দাঁড়ালে সরে যাওয়াটাই ভদ্রতা। কাকলি ও দরজার দিকে সরে যেতে লাগল।

এরকমভাবে সরে যাওয়া কী কঠিন !

আর কী সুন্দর !

বরেন উঠতেই গাড়িতে স্টার্ট দিল।

আর আগের কথার জের টানবার সুরে কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ?'

'ও প্রশ্নটা তো আমি করব।' কাকলির ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে বেমালুম টেনে নিল বরেন। স্পর্শের মধ্যে আলস্য ঢেলে দেবার চেষ্টায় মৃদুকণ্ঠে বললে, 'ততঃ কিম ?'

একেই বুঝি বলে গায়ের জোর। মনে-মুখে একসঙ্গে হাসল কাকলি। বললে, 'এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন।'

কাকলির হঠাৎ মনে পড়ে গেল আরেকজনকেও এ প্রশ্ন সে করেছিল একদিন। পারে নি উত্তর দিতে। কেউ পারে না। উত্তর হয় না এ প্রশ্নের। দিন থেকে দিনে, বছর থেকে বছরে, জীবন থেকে জীবনে মানুষ শুধু উত্তরই খুঁজে খুঁজে ফিরেছে।

'না, না, খুব সোজা উত্তর।'

'সোজা ?' চাউনিতে ভয়-ভয় চমক আনল কাকলি।

একেবারে ডাল-ভাতের মত।'

'যথা ?'

'উত্তর—উত্তর হচ্ছে, তিন মাস।'

'তিন মাস ?'

'হ্যাঁ, বড় জোর তিন মাস। তিন মাসের কমও হতে পারে যদি ইচ্ছে করেন।'

'কিছু বুঝতে পারছি না।' ভ্যাবাচাকা-খাওয়ার মত মুখে তাকিয়ে রইল কাকলি।

'আপনি এত কম বোঝেন।' কাকলির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে বার কয়েক লুফল বরেন : 'তিন মাস মানে আপিলের টাইম। একটা ডিক্রি যখন হয়েছে তখন তার বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা আছে। আর সেই আপিল করতে হলে তিন মাসের মধ্যে করতে হবে।'

'আপিল করতে হলে তো আমি করব।' কাকলি যেন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, ডিক্রি যখন আপনার বিরুদ্ধে তখন আপনিই আপিলের হকদার। সুকান্ত তো মামলা জিতেছে, সে আপিল করবে কেন ?'

'আমিই বা আপিল করব কেন ? আমিও তো জিতেছি।' হেসে উঠল কাকলি।

'তবে দেখছেন তিন মাসও অপেক্ষা করতে হবে না।' নড়ে-চড়ে বসল বরেন : 'আইন বলছে আপিলের সময়টা চলে গেলেই আগের স্বামী ও স্ত্রী তাদের ইচ্ছেমত অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে। সুতরাং ডিক্রির তিন মাস পরেই আপনি আবার বিয়ের লায়েক হবেন। আর এ ক্ষেত্রে আপনি যখন আপিল করছেন না, আপনার আপিল করবার কথা যখন উঠছেই না, তখন তিন মাস অপেক্ষা না করলেও চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'আবার বিয়ে করতে হবে!' করুণ-করুণ মুখ করল কাকলি।

'নইলে এই সোনার জমি পতিত পড়ে থাকবে ?'

'কিন্তু আবাদ করবে কে ?' হাত যেন এবার নিজের ইচ্ছেয় নিবিড় ছেড়ে দিল কাকলি।

যেন এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নেই। থাকতে পারে না। যেন কৃষক অবধারিত। পূর্বনির্দিষ্ট। তেমনি দৃঢ় স্পষ্ট ভঙ্গি করল বরেন। বললে, 'তা তুমি জানো।'

'আর আপনি জানেন না।' খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। পরমুহূর্তেই আবার আবদেরে সুরে বললে, 'এত তাড়াতাড়ি!'

'তাড়াতাড়িই তো সুন্দর।' চাঞ্চল্যের শিহর তুলল বরেন : 'আসরে নেমেই গান শুরু করে দেওয়া উচিত। নইলে রঙ্গমঞ্চে উঠে বসে তবলায় হাতুড়ি ঠোকা বা সেতারের কান মলা অসহ্য, অসহ্য—'

'কিন্তু তার আগে দীপঙ্করের একটা ব্যবস্থা হবে তো!'

'হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি।'

'কার কথা? আমার কথা?'

'তোমার কথা বাবার সম্মতি বা অনুমতি কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। তুমি কোম্পানির বিষয় নও, তুমি আমার একলার ব্যাপার। আমি মধ্যবিত্ত মাছি নই,' কথার সুরে প্রচ্ছন্ন ঘৃণার খোঁচা দিল বরেন: 'যে আমার একটা পৈতৃক এজমালি চাক লাগবে—অনেক ফোকরের মধ্যে একটা ফোকর। আমি—আমি—' একটা জুতসই কথা খুঁজতে লাগল।

'আপনি কস্তুরী মৃগ।' মিষ্টি করে বললে কাকলি, 'আপনি একলা।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।' বরেন উৎসাহিত হয়ে উঠল: 'কিন্তু আমি জানি কোথায় আমার সুগন্ধের উৎস।'

'কোথায়?' দুঃসাহসীর মত জিজ্ঞেস করল কাকলি।

কাকলির আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে নিজের আঙুলগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে বরেন বললে, 'আমার নাভিকুণ্ডে।'

'তা হলে কার কথা বলছিলেন বাবার সঙ্গে?' কথাটাকে সহসা নিস্তেজ করে দিতে চাইল কাকলি।

'দীপঙ্করের কথা।'

'কী ঠিক হল?'

'ঠিক হল মামলা ডিফেণ্ড করে বিশেষ ফল হবে না।'

'হবে না?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম মামলাটা লং-ড্রন করতে পারলে ও হেদিয়ে পড়বে। ছেড়ে দেবে মামলা। এক ফাঁকে খারিজ করিয়ে নিতে পারব। কিন্তু ও ভীষণ হুঁশিয়ার। কচ্ছপের কামড়ের মতই ও নাছোড়।'

'তা চালাক না মামলা।' আঙুলগুলি আস্তে-আস্তে মুক্ত করে নিল কাকলি: 'ডিফেণ্ড করবেন না কেন?'

'এখন দেখতে পাচ্ছি ওকে ডিসমিস করার মধ্যে টেকনিক্যাল একটা ফ্ল ছিল। যা ওর টার্ম অফ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, তাতে ও নাকি নোটিশ পেতে হকদার। ওকে বিনা নোটিশে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। মামলা তাই লড়ব না ঠিক করেছি।'

'লড়বেন না?' আনন্দটা গোপন করে রাখতে পারছে না কাকলি।

'না। টেকনিক্যাল ক্ল নিয়ে এতদিন ধরে একটা মামলার মুখোমুখি হয়ে থাকাটাও ভালো নয়। ফার্মের প্রেস্টিজে ধুলো লাগবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি—'

'কী কথা ?'

'ও এতদিন ধরে টিঁকে থাকল কী করে ? কী করে টিঁকিয়ে রাখতে পারল মামলা ?' বরেনের হাতের মধ্যে কাকলির বালাটা এসে ঠেকল : 'আগে জানতাম যার লেঙ্‌থ্‌ অফ পার্স মামলায় তারই জিত। কিন্তু পার্স লম্বা করেও ওকে দাবানো গেল না। ও কোত্থেকে যে পেল এত রেস্ত কে জানে।'

'লড়বেন না তো কী হবে ?' হাতের বালাটাও আলগোছে সরিয়ে নিল কাকলি।

'মামলা মিটিয়ে নেব।'

'সর্বত্রই মামলা মিটানো।' ক্ষীণকণ্ঠে একটু হাসল কাকলি।

'তোমাদের মামলায় তোমরা দু পক্ষই জিতলে। একটা অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে কাম্য ত্রাণ দু-জনেই পেয়ে গেলে। কিন্তু আমাদের এ মামলায় শুধু এক পক্ষই জিতবে। আর সে পক্ষ দীপঙ্কর।'

'জিতবে ?'

'হ্যাঁ, ও আবার ওর পুরোনো চাকরি ফিরে পাবে।'

'পাবে ? সত্যি ?' উল্লাসের নির্লজ্জতাটা কিছুতেই লুকোতে পাচ্ছে না কাকলি।

'আমরা তো অফার করব, ও এখন নেবে কিনা ও জানে—' একটু বা গম্ভীর শোনাল বরেনকে !

'বা, নেবে না কী ! মামলা করলই চাকরির জন্যে। তারপর মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে আপোসে। আপোসের শর্তই হচ্ছে চাকরিতে পুনর্বহাল—' একটু বুঝি বা হেলে এল কাকলি : 'কিন্তু ওর মাইনেটা কিছু বাড়বে তো ?'

'না, না, মাইনে বাড়বে কী !' গা ঝাড়া দিয়ে উঠল বরেন : 'মাইনে বাড়ার দাবি তো নেই ওর আর্জিতে।'

'বা, ওটা মামলার বিষয় হয় কী করে ? ওটা মামলার বাইরের কথা। ওটা বৈধের বাইরে উদ্বৃত্তের কথা।' কালো চোখে ঝিলিক দিল কাকলি।

'না, না, এ ক মাসের সমস্ত ব্যাক পে ও পাচ্ছে, এর উপর আবার উদ্বৃত্ত কী !' রাগ-রাগ মুখ করল বরেন।

'কিন্তু দিলেনই না হয় সামান্য একটু মাইনে বাড়িয়ে—'

এবার কাকলির আবদারে যেন নতুন এক ঘনিষ্ঠতার তাপ ফুটল।

'ওর মাইনে বাড়লে তুমি বুঝি খুশি হও?'

'আমরা সকলেই তো বাড়িয়ে নিলাম। ওর যেটুকু সাধ্য ওও নিক না একটু বাড়িয়ে।' মৃদু লাস্যে হাসল কাকলি।

'বা, আমার বাড়ল কোথায়?'

'সত্যি বলছেন? বাড়ে নি? এই যে আমি আপনার পাশে, এটা কি আপনার বাড়তি নয়?'

'জীবিকার নয় জীবনের বাড়তি।' হাতের থাবাটা অনেক বড় করে বরেন ধরল আবার কাকলির হাত। বললে, 'কত দিন থেকে খুঁজছি আমার সহচরীকে। নর্মের সহচরীকে হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু মর্মের সহচরীই দুর্লভ—'

'দুই নম্বরই বুঝি আমি, নর্ম আর মর্ম দুটোই। কী বলেন?' লঘু করে দিতে চাইল কাকলি।

'আর কেউ-কেউ এসেছে আমার জীবনে। বলে, অক্ষত, অনাঘ্রাত। বলে, পবিত্রতায় উজ্জ্বল—'

'সব ধর্ম-সহচরী!'

'বিস্বাদ, বিস্বাদ—জোলো, ফিকে, সেকেলে। বাবা-মার মত নিয়ে লাভার-খোঁজা মেয়ে। মেয়ে কি উজ্জ্বল পবিত্রতায়? মেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে। তার রূপ শিষ্টতায় নয়, বিশিষ্টতায়। তুমি আমার সেই বিশেষ—'

'তবে দেখুন কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছি। শেষের চেয়েও বেশি—বিশেষ!

'হ্যাঁ, তোমার মাঝে ঐ যে খুঁত ওইটিই তো ব্যঞ্জনের নুন। সমস্ত আহার্যকে যে সুস্বাদু করেছে। তারপর সাধন করে পেয়েছি তোমাকে। আর আকাঙ্ক্ষার মূল্য কিসে? শুধু সাধ করায় নয় সাধন করায়—'

'সাধন করেছেন?' অবিশ্বাসের সুর ফোটাল কাকলি।

'করি নি? কী সুন্দর মামলা সাজিয়েছি! কী নিপুণ কারুকার্য করেছি! বাধা সরিয়েছি। বি-শৃঙ্খল করেছি। যাতে ছিনিয়ে নিতে পারি তোমাকে। কিংবা বলতে পারো, লুফে নিতে পারি। ক্রিকেট খেলা দেখেছ? ফাস্ট বলে ব্যাট্স্‌ম্যান কেমন অজানতে খোঁচা মেরে বসে আর স্লিপের লোক কেমন সাঁ করে তীক্ষ্ন ক্যাচ লুফে নেয়—সেই লোফাটাও একটা সাধনার জিনিস, ওয়ার্ক অফ আর্ট—'

'নিশ্চয়ই। এক শো বার। তবেই দেখুন বল হয়ে আপনার থাবার মধ্যে পড়ে, জমে গিয়ে, কেমন বাড়িয়ে দিলুম আপনাকে। নইলে শাদামাঠা একটা মেয়ে কুড়িয়ে নিলে আপনার জেল্লাজলুস কিছুই বাড়ত না।' কটাক্ষটা একটু বিলোল করল কাকলি।

'বাড়ত না।' স্বীকার করল বরেন : 'আসল সুখ হচ্ছে খাঁজে। হ্যাঁ, খাঁজে তুমিই আমার সেই খাঁজ। সুতরাং, নিশ্চয়ই, বেড়েছে আমার মাইনে অনেক, অনেক বেড়েছে কিন্তু তোমার— তোমার বাড়ল কিসে?'

'সংখ্যায়।'

'সংখ্যায়?'

'হ্যাঁ, সেই একই হিসেবে। আমি যেমন আপনার দুই নম্বর তেমনি আপনিও আমার দুই নম্বর।'

ভাসা ভাসা বুঝলেও গলা ছেড়ে হেসে উঠল বরেন।

'আমি একে-একে দুই, মানে নর্মে-মর্মে দুই, আর আপনি একের পরে দুই।' স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দিল কাকলি। শাস্তি দিল বরেনকে।

হাত ছেড়ে দিয়ে সিগারেট খুঁজতে লাগল বরেন। বললে, 'যদি অনুমতি দাও তো একটা সিগারেট খাই।'

'স্বচ্ছন্দে।' সানন্দে সায় দিল কাকলি। বরং মুখে একটা বাস্তব আগুন থাকাই ভালো। ঐ আগুনটাই নিশ্চিন্ত।

'তুমি আমাকে শান্তি দিলে।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন।

'আর আপনি আমাকে দিলেন মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা। কেমন সব তাই মাইনে বাড়িয়ে নিলুম আমরা। এর মধ্যে শুধু একজন—'

'তুমি দীপঙ্করের কথা ভাবছ?'

'নইলে আর কার কথা ভাবব?'

'গোড়াতে ও আগের চাকরি ধরুক, এরিয়র-পে নিক, পরে এক ফাঁকে কিছু না হয় বাড়িয়ে দেব এলাউয়েন্স—'

'বা, তাতেই হল। ওও ফিরে পেল ওর মর্যাদা।'

কতক্ষণ কাটল চুপচাপ।

'বৃষ্টি হচ্ছে।' কাকলি বললে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

নিজের দিকের জানালাটা তুলে দিতে-দিতে বরেন বললে, 'লেকস্‌-এ।'

'লেক শুনলেই কেমন যেন খারাপ-খারাপ মনে হয়। মানে, এই আর কি, জল তো, তাই জোলো-জোলো মনে হয়।'

'কিন্তু যদি বাঙলা করে বলি? যদি সরোবর বলি?'

'সেটা আরো খারাপ। মানে, হে বর, তুমি সরো, এ জায়গা বর্বরের জন্যে।'

'আমি বর্বর?'

'দুই নম্বরের হলে তাকে আর কি বলে ?' খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি।

বরেনও হাসল। বললে, 'আমাকে নিশ্চিন্ত করলে।'

আবার কাটল একটু চুপচাপ।

'তুমি ভিজে যাচ্ছ যে। কাঁচটা তুলে দাও।' বরেন একটু বা জোর মেশাল অনুরোধে।

'বৃষ্টি দেখতে বেশ ভালো লাগছে।'

'তাই বলে অসুখ করবে নাকি ?'

'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয় ? এই সেই লেক্স্।' কাকলি ছেলেমানুষের মত উচ্ছল হয়ে উঠল : 'আসুন না, চলুন না আমরা ভিজি। জলের একেবারে কাছে গিয়ে জলের উপরে জল পড়ার শব্দ শুনি।'

'ভিজবে ?'

'হ্যাঁ, দেখুন ঐ কতগুলি লোক গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয় নিলে কী হবে, তবু ভিজছে, কিন্তু কৃপণের মত ভিজছে। ঐরকম করে ভেজা নয়। একেবারে ফাঁকা ঘাসের উপর খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভেজা। চলুন, নামি, ভিজি দু-জনে—'

'মাথা খারাপ !' হাত ধরে বাধা দিল বরেন। আর প্রায় গায়ের জোরেই কাকলির দিকের জানলাটা তুলে দিল। বললে, 'বৃষ্টি কিরকম জোর এসে গেল। রাস্তা থেকে লোক ঝেঁটিয়ে দূর করে দিল নিমেষে। বরং জনশূন্য রাস্তায় বৃষ্টিতে গাড়ি ছুটিয়ে যাওয়াতেই তো বেশি সুখ—'

'হ্যাঁ, নীরন্ধ্র সাহসে পিচ্ছিল পথে দুর্ধর্ষ এগিয়ে যাওয়া— সুখ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু,' কাকলির স্বরে একটু ঔদাস্যের ছোঁয়া লাগল : 'এত রাজ্যের লোক হঠাৎ কোথায় উঠে গেল বলুন তো ?'

'কোথায় আর যাবে ? এই দেখ না সবাই সাময়িক আশ্রয়ের আশায় এখানে-ওখানে ভিড় করেছে। ঐ গাড়ি-বারান্দার নিচে, দোকানে, সিনেমার লবিতে—'

'চলুন না আমরাও অমনি গিয়ে দাঁড়াই।'

'শুধু-শুধু ? গাড়িটা ছেড়ে-দিয়ে ?'

'হ্যাঁ, গাড়িটাও তো সাময়িক আশ্রয় ছাড়া কিছু নয়। চলুন না ঐ সিনেমার লবিতে গিয়ে আমরা দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবি, আমাদের বাড়ি নেই গাড়ি নেই, বাড়ি ফেরবার রাস্তা নেই, কতক্ষণে বৃষ্টি ধরবে তাও আমরা জানি না—'

'তুমি কী ছেলেমানুষ !'

'যাক, তবু মর্বিড বলেন নি।' জানলার কাঁচ আবার আধখানা নামিয়ে দিল কাকলি।

'সে কি', অবাধ্যপনায় একটু বা বিরক্ত হল বরেন : 'আরো ভিজলে নির্ঘাত অসুখ করবে।'

'খুব জ্বর হয়ে বিছানা নিতে ইচ্ছে করে একেক সময়—'

'এবার কিন্তু মর্বিড বলব।'

'ছেলেমানুষ বলবেন না ?' মিষ্টি করে হাসল কাকলি। বললে, 'সমস্ত গা ভরে সুতীব্র একটা আকাঙ্ক্ষার মত জ্বর মন্দ লাগে না কিন্তু। কত দিন ভারি হাতে অসুখ হয় নি। সবাই কেমন উদ্বিগ্ন হবে, সেবা করবে, দেখা করতে আসবে, জ্বরো চোখে সব কেমন অবাস্তব দেখব, চিনলেও চিনতে পারব না— খুব মর্বিড, তাই না ?'

'ভীষণ।' বরেন ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে বলল।

আস্তে-আস্তে কাঁচের জানলাটা তুলে দিল কাকলি।

'চলো তোমার মাকে গিয়ে বলি।'

'এখন বুঝি মা গার্ডিয়ান ?'

'হ্যাঁ, বড় জোর আপিলের পিরিয়ডটুকু।'

শাস্তিতে পিঠটা ছেড়ে দিল কাকলি।

কাটল খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বরেনই ফের কথা পাড়ল। বললে, 'দীপঙ্করকে চাকরিতে ফের বহাল করতে গেলে একটা অসুবিধে আছে।'

'কী অসুবিধে ?'

'যে উড়ে এসে ওর জায়গায় জুড়ে বসেছে সেই সুকান্তকে তাড়িয়ে দিতে হয়।'

'দিন তাড়িয়ে।' উৎসাহে উজ্জ্বল হল কাকলি : 'খুব মজা হয়।'

'মজা হয় ?'

'মানে জব্দ হয়। থেঁতো মুখ ভোঁতা হয়।'

'তা হলে তুমি খুশি হও ?'

'বা, খুশি হই না ? শত্রুর অপমান উপভোগ্য নয় ?' কাকলি প্রায় হাততালি দিতে চাইল : 'সুন্দর হবে, সমীচীন হবে। দীপঙ্কর পুনস্কেরানি হবে আর আপনার বন্ধু— কী জানি নাম— হবে পুনর্মূষিক। স্যাণ্ডেল পায়ে উড়ুনি উড়িয়ে আবার প্রাইভেট টিউশানি করে বেড়াবে—'

'তুমি এইরকম নিষ্ঠুর!'

'আহাহা, দুঃশাসনের উপর সদয় হবে দ্রৌপদী! কীচককে রান্না করে খাওয়াবে! তা যদি বলেন তবে আমি বলব আপনিই মর্বিড।'

'বা, একটা লোক বেকার হয়ে যাবে তাতে উল্লাস করবে তুমি?' কেমন যেন অস্বস্তি মনে হল বরেনের।

'কত শত লোক বেকার হচ্ছে, কোথায় জানতে পাচ্ছি? যদি জানতে পাই চেনা কোনো কেউ ছাঁট হয়েছে নিশ্চয়ই দুঃখিত হই। কিন্তু যে শত্রু যে বক্ষশূল সে যদি পড়ে তা হলে মনে মনেও একটু নাচব না এ আপনি আশা করতে পারেন না—'

'কিন্তু ও আর শত্রু কই? ওর সঙ্গে তো মিটে গিয়েছে মামলা। ও তো এখন ভদ্রলোক—'

'আপনার কাছে হতে পারে, আমার কাছে নয়।' কাকলি কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকাল বাইরে: 'মিটে গেলেও জ্বালা যায় না। ঘা শুকিয়ে গেলেও দাগ থাকে। যাক গে, এ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য ও যেন না দীপঙ্করের পুনর্বহালের বাধা হয়ে ওঠে।'

'না, তা হবে না। দীপঙ্করকে তো নিতেই হবে মামলার শর্তে। কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে করি কী! একই পোস্টে দু-জনকে রাখতে দেবে না কোম্পানি।'

'দয়া করুন। এ নিয়ে আমার সঙ্গে কিছু বলতে আসবেন না।' মুখ সরিয়ে নিল কাকলি।

'বা, তুমি এখন আমার মন্ত্রীর সমান। তোমার সঙ্গেই তো পরামর্শ করব।'

'আমি তো বলেছি, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সোজা বার করে দিন। আপনার তো তাতে ভদ্রতায় বাধে। মানবিক করুণার দুধ ওথলায়!'

'না, তার চেয়েও স্পষ্টতর অসুবিধে আছে।'

'কী?'

'ডিসমিস করলে ও না আবার মামলা করে! আবার না ঝকমারির মাশুল জোগাই!'

ড্রাইভারের সামনে কাঁচের উপরে ওয়াইপার দুটোর ওঠা-নামার দিকে চোখ রেখে কাকলি বললে, 'তা হলে ওকে অন্য কোথাও ঢুকিয়ে দিন—'

'হ্যাঁ, এটা মন্দ বলো নি। এইটেই সৎ পরামর্শ।'

'মোটেই সৎ পরামর্শ নয়। সৎ পরামর্শ ছিল ওকে কোনোরকমে বেকায়দায় ফেলা—'

'কেন, ও তো কিছু দোষ করে নি। ও তো ভালো কাজই করেছে। বউ ছেড়ে দিয়েছে। যাতে আমি পেতে পারি! ওকে তো বরং পুরস্কৃতই করা উচিত।'

বরেনের সঙ্গে সঙ্গে কাকলিও হেসে উঠল। বললে, 'হ্যাঁ, সেটা খেয়াল হয় নি। তবে ওকে পুরস্কৃতই করবেন।'

হাসতে হাসতে নামল কাকলি। গায়ত্রী সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসেছে আগ বাড়িয়ে। গাড়িতে থাকলেও যে ভিজেছে, মায়ের কাছে ধরা পড়তে চায় না বলেই কাকলি ছুটতে-ছুটতে উঠে গেল উপরে।

বরেন আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। উঠতে-উঠতে বললে, 'আপনার মেয়ে ভারি ছেলেমানুষ।'

'ভীষণ।' দিব্যি সায় দিল গায়ত্রী : 'তুমি ওকে একটু শাসন কোরো।'

যেন অবধারিত। যেন দেয়ালে লেখা আছে বড় অক্ষরে। যেহেতু উনি ত্রাণ করেছেন সেহেতু ওঁকেই প্রাণ সঁপে দিতে হবে। যিনি মোচনকর্তা, সন্দেহ কি, তিনিই ভোজনকর্তা হবেন।

হ্যাঁ, সেইটেই সংগত। শোভন। সেইটেই বৈধ।

শুধু নীতির দিক থেকেই নয়। লোকটাকে নিজের গুণে দেখ। সমাজের শীর্ষাসনের ছেলে। বলতে পারো এয়ারকণ্ডিশান্‌ড পাত্র। এ যদি এমনিও আসে চৌকাঠ ডিঙিয়ে, রেখে দিতে হয় বন্দী করে। আর এ তো দুর্বার শক্তিতে দস্যুর মত এসেছে, নিজের দাবিতে টাইফুনের মত।

বনবিহারী কেমন আছেন, খোঁজ নিতে গেল বরেন।

'বেড়িয়ে ফিরলে বুঝি?' চোখের সামনে অবধারিতকেই দেখছেন এমনি চোখে তাকালেন বনবিহারী।

'কই আর বেড়াতে পেলাম! যা বৃষ্টি নামল।'

'কিন্তু কাকলিকে ভিজে-ভিজে দেখলাম না?'

'নামে নি গাড়ি থেকে। নতুন বৃষ্টি দেখে জানলার কাঁচ নামিয়ে রেখে ভিজল ইচ্ছে করে। ছেলেমানুষ।'

'একেবারে। কিছু বোঝবার ক্ষমতা নেই।'

কিন্তু এটুকু তো বোঝা যায়, যাই করুক, কাকলিকে ফের বিয়ে দিতে হবে। আর বরেনের মত এ-ক্লাশ পাত্র আর কোথায়? সুতরাং বরেনকে যদি-সে অভিমুখী করে

তুলতে পারে তা হলে আর কাকলিকে ছেলেমানুষ বলা যাবে কী করে? বলা যাবে বেশ চালাক, পটু, ঘোড়েল মেয়ে।

তাই নিয়তির মত অবধারিত। অনিবার্য।

গায়ত্রী চা না খাইয়ে ছাড়বে না।

আর শুধু এক দিন নয়, ঘন-ঘন।

৪২

গায়ত্রী বরেনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের আর দেরি কত?'

'এই তো তিন মাসের কটা দিন আর বাকী আছে।' দেয়ালে ক্যালেণ্ডার আছে মনে করে বরেন দেয়ালের দিকে তাকাল। ক্যালেণ্ডার না থাকলেও এ কটা দিনের হিসেব করতে কিছু বেগ পাবার নেই। মুখস্থ আছে বরেনের।

'তবে লেগে যাই তোড়জোড়ে।'

'এ আবার তোড়জোড় কী। একটা নোটিশ দেওয়া তো শুধু। আর রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করা।'

'তা হোক। তবু একটা উৎসব তো করতে হবে। ওঁর কতদিনের শখ।'

'মিছিমিছি কতগুলি টাকা নষ্ট। খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয়ই একটা হবে। সে আমিই স্ট্যাণ্ড করব। কোনো হোটেলে, না হয় বাগানবাড়িতে।' প্রস্তাবটা কনের মায়ের মন-ভরা হচ্ছে না বুঝতে পারল বরেন। তাড়াতাড়ি বললে, 'ওসব খুঁটিনাটিতে আটকাবে না। আসলটা তো হোক। কই, কোথায়?' সমস্ত ঘরে সমান রাজত্ব করছে এমনি একখানা দরাজ গলা ছাড়ল বরেন।

'ঘরে শুয়ে আছে বোধ হয়।' বলে গায়ত্রী বনবিহারীর দিকে গেল।

আলোচনাটা বরেনের সঙ্গে করাই বরং সোজা। ইদানীং বনবিহারী কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। দুর্বার নিয়তির হাত থেকে আর ত্রাণ নেই—এই অবশ্যম্ভাবিতাতেই তিনি সায় দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদ নেই, উৎসাহ নেই—যা হবার তা হবে, হতে দিতে হবে। আলো জ্বলুক চাই না-ই জ্বলুক।

রায় আর জবানবন্দির নকল নিয়ে এসে পড়েছেন বনবিহারী। বিবাহ-বিচ্ছেদটা কেন হল, কী উক্তিতে? কাকলি লড়ে নি মামলা, মেনে নিয়েছে সব পাপ কথা

খোলা ঘায়ের মত পাপকে থাকতে দেওয়া হবে না। বিয়ের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে আচ্ছাদন না করে আর উপায় কী।

তাই যা হবার তাই হোক। বনবিহারীর প্রতিবাদও নেই উৎসাহও নেই।

'তোমার উৎসাহ থাকবে না কেন?' গায়ত্রী তাকে উত্তেজিত করতে চায়: 'তোমার মনের মত পাত্র। নিজেদের বাড়ি গাড়ি, শুনতে পাই বাগানবাড়িও কিনেছে একটা।'

'বাগানবাড়ি?' একটু বুঝি বা চমকান বনবিহারী।

'ক বিঘে ফল-ফলারির বাগান, সবজির খেতও আছে, আর মাঝখানে ছোট একটা একতলা বাড়ি—তারই নাম বাগানবাড়ি।'

'নইলে এমনিতে বাগানবাড়ি নামটা শুনতে ভালো নয়।' মুখ করুণ করলেন বনবিহারী।

'কে বললে নয়? সবদিক থেকে শুনতে ভালো। কত বড় ফার্মের পার্টনার। বাবা বেঁচে, কত বড় রবরবা—এক ডাকে সকলে চেনে।'

'আর মা?'

'মা নেই। কত বড় শান্তি!'

'ভাই-বোন?'

'কে জানে কে আছে!'

'একটু খোঁজ-টোজ নেবে না?' বলেই বনবিহারী কিরকম উদাস হয়ে গেলেন: 'আর খোঁজ নেবারই বা কী দরকার। যখন বিয়ে দিতেই হবে তখন অন্য জিজ্ঞাসা অবান্তর।'

'ভাইটাই নেই শুনেছি। দুই বোন আছে, বিয়ে হয়ে গিয়েছে।' ঘনিয়ে এল গায়ত্রী: 'বিয়ে দিতেই হবে মানে? জোর নাকি?'

'নীতি।' সংক্ষেপে বললেন বনবিহারী।

'নীতি—কিসের নীতি?'

'যাকে ব্যভিচারী বলে স্বীকার করা হয়েছে তাকে বর বলে বরণ করার নীতি। নইলে ঐ কলঙ্কের মোচন নেই।'

'কলঙ্ক? তুমি কাকে কলঙ্ক বলছ? ও তো একটা অবাঞ্ছিত বন্ধনের থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছলনা।'

'তা মেনে নেবে না সংসার। তোমাকে একজন কলঙ্কিনী বলে ঘোষণা করেছে আর তুমি তাই স্বীকার করে নিয়েছ—এ অবস্থাটার থেকে আর ত্রাণ নেই। আর

যদি ছলনা করে থাকে সে ছলনাও কলঙ্ক।' সুতরাং থরথর করে কাঁপতে লাগলেন বনবিহারী: 'বিয়ে দিয়ে দাও। স্বামী-ছাড়া মেয়েটার কলঙ্কী মুখ আর দেখতে পারি না।'

হাত বুলিয়ে দিতে লাগল গায়ত্রী: 'তুমি ওরকম করে দেখছ কেন? তুমি তো জানোই মেয়েটা নির্দোষ আর বরেন সব দিক থেকেই বাঞ্ছনীয়। এমনিতে দেখতে গেলে এ বিয়ে প্রার্থনা করে পাবার মত।'

'কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু বিয়েটা এখানে আসছে প্রার্থিত হয়ে নয়, নিক্ষিপ্ত হয়ে।' বনবিহারী নির্লিপ্ত মুখে বললেন।

'সব বিয়েই ভাগ্যের নিক্ষেপ।'

'এ ক্ষেত্রে, বলতে পারো, নির্বাচিত নয়, আরোপিত।'

'নির্বাচন একেবারেই নেই তা বলো কী করে?' গহন সংকেতে ঘনিয়ে এল গায়ত্রী: 'নইলে বরেন মোকাবিলা-বিবাদী সাজতে রাজি হয় কেন? আর কেনই বা তাতে সায় দেয় কাকলি? মনস্তত্ত্ব কী বলে?'

'যাই বলুক, এখন তাড়াতাড়ি ঘর ছেয়ে দাও। নরুকে ডাকো। খোলা মাঠে আর বেশি দিন থাকতে দিও না।'

কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাকলির আপত্তি।

বললে, 'একটু হাত-পা খালি হয়ে থাকতে দাও না আরামে।'

গায়ত্রী বিরক্ত হবার ভাব করল: 'যখন ঠিকঠাকই আছে তখন দেরি করার মানে কী? হাত-পা খালি হয়েই বা থাকবি কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে তো তোর অভ্যেসই হয়ে আছে।' কোত্থেকে নরুকাকা এসে জুটেছে, টিপ্পনী কাটল: 'এ তো আর তোর নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়।'

'তুমি বুঝি বিয়ের গন্ধ পেলেই আসো।'

'কি আর করি না এসে! তোর একেকটা বিয়ে একেকটা বিপদ।'

'বিপদ!'

'তা ছাড়া আর কী! শখ করে বিয়ে করলি, বিয়ে দেওয়ালাম কত কাঠখড় পুড়িয়ে। আবার শখ করে তা ভেঙে দিলি—'

'শখ করে ভেঙে দিলাম!'

'তা ছাড়া আর কী! শখের বিয়ে, শখের ডিভোর্স!'

'শখের?'

'ছোট ছেলে ঘড়ি পেলে যেমন সে আছড়ে-আছড়ে ভাঙে, কী করে পৌঁছুনো

যায় কলকত্তায়, তেমনি তোরা বিয়েটা পেয়ে সমানে আছড়াতে লাগলি কী কৌশলে পৌছুনো যায় ডিভোর্সে।'

'যাক, এ নিয়ে তোমাকে গবেষণা করতে ডাকা হয় নি।' গায়ত্রী বললে, 'যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। এখন যা হবার তাই উদ্ধার করে দাও।'

'উদ্ধার তো হয়েই আছে। তা নিয়ে ভাবনা কী। কিন্তু আমি বলছি, কী এমন হয়েছিল যে শেকড় স্থদ্ধ উপড়ে তুলে ফেলতে হল সমূলে?'

'আবার সেই কথা!' ধমকে উঠল গায়ত্রী: 'অতীত দিয়ে কী হবে? এখন ভবিষ্যৎ সামলাও।'

'গতস্য শোচনা নাস্তি হতে পারে, গতস্য আলোচনা নাস্তি নয়।' হাসল নরনাথ: 'কী হয়েছিল?'

'কিছুই হতে লাগে না।' কাকলি গম্ভীর হল।

'ঝগড়া? মারপিট? নাকি শুধু একটু মনকষাকষি?'

'কারণ এর চেয়েও তুচ্ছ হতে পারে। সামান্য মতবিরোধ।' কাকলি হাতে ধরা বইয়ের দিকে তাকাল: 'যাকে বলা যায় ইনকমপ্যাটিবিলিটি। অসংগতি। বৈসাদৃশ্য।'

নরনাথ হাঁ হয়ে রইল: 'এসব আবার কী কথা?'

'কথাগুলি কঠিন কিন্তু ব্যাপারটা সোজা। মানে মিশ না খাওয়া। দাঁতে দাঁত না পড়া। এ বলে পুব, ও বলে পশ্চিম। এ বলে ভালো, ও বলে যাচ্ছেতাই। এ বলে যাবে না, ও বলে যাবে। এমনি পদে-পদে। শাসনের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের লড়াই।'

'তাই নিয়েই ফাটাফাটি?'

'ফাটাফাটি যাতে না হয় তারই জন্যে সরে পড়া।' কাকলি পৃষ্ঠা ওলটাল: 'স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে মিউচুয়াল কনসেন্টে বিচ্ছিন্ন হবার বিধান আছে। সংযুক্ত একটা দরখাস্ত করলেই হল। কোনো কারণ দর্শাবার দরকার নেই। স্বামী নাক ডাকায়, না স্ত্রীর গায়ে গন্ধ, কার কী ব্যক্তিগত কদাচার, কেউ জিজ্ঞেস করতে আসে না। হিন্দু অ্যাক্টে সেই স্থবিধে নেই। কিন্তু হিন্দুর ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত অমিলের জন্যে জীবন দুঃসহ হতে পারে। তখন ঐ ঘোরালো পথেই পারস্পরিক সম্মতি খুঁজতে হয়। এ ছাড়া আর পথ কই?'

'কিন্তু পাঁচজনে অন্য কথা বলে।' নরনাথ ইঙ্গিতের বিষবাণ ছুঁড়ল।

'কী বলে?' জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

নরনাথ হঠাৎ থেমে গেল। বললে, 'না, থাক। অতীত দিয়ে কী হবে?'

'আমিও তো তাই বলি।' বললে গায়ত্রী, 'এখন শুধু ভবিষ্যৎকে ঠেকাও।'

'না, বলো, কী বলে।' কাকলি চোখ তুলল।

'বলে,' নরনাথ চেয়ার টেনে বসল: 'যে একবার প্রেম করে সে বারে-বারেই করে। বিয়েও তাকে নিরস্ত করতে পারে না। তাই প্রেমের বিয়ে করেও কাকলি আবার প্রেম খুঁজছে, প্রেম করেছে। মানে নতুন করে ভালোবেসেছে বরেনকে। আর তারই জন্যে বিয়েটাকে নস্যি করে দিয়েছে।'

'তা হলে তো স্থূল, ন্যায্য একটা কারণ আছে বিচ্ছেদের।' কাকলি উঠে পড়ল: 'তা হলে শখের ডিভোর্স বলছিলে কেন?'

'শখের ডিভোর্স, যেহেতু বরেনের বিয়েটাও টেঁকসই হবে না।'

'আগে হোক তো বিয়েটা।' ব্যস্ত হল গায়ত্রী।

'তার মানে বরেনবাবুকে বিয়ে করে, যেহেতু গোড়ায় একবার প্রেম করেছি, আবার হরেনবাবুর সঙ্গে পটব। হরেনববাবুকে বিয়ে করে নরেনবাবুর সঙ্গে—' না চটে উঠে হাসল কাকলি: 'বিচ্ছেদের কোনো তামাদি নেই আইনে। এক বার কি দু বার কি দশ বারের বেশি চলবে না এমন কথা লেখে না। মন্দ কি, চলবে শোভাযাত্রা। কিন্তু কথাটা কে বললে?'

'আহা, লোকে স্পষ্ট কিছু নাই বলুক।' নরনাথ হেরে-যাওয়া তার্কিকের মত বিষয় পালটে বললে, 'কোর্টের রায়-ডিক্রিতেই বোঝা যাবে বরেনের প্রতি কেন তোর পক্ষপাত।'

'ও, সেই কথা?' বইটা হাতে করেই দরজার দিকে এগুল কাকলি। বললে, 'ব্যভিচারী আর প্রেমিক এক বস্তু?'

'হরে দরে হাঁটুজল।' নরনাথ বললে, 'যা চালভাজা তাই মুড়ি।'

'কিন্তু যাই হোক, যে নামই দাও, বিয়েটা তো চটপট সেরে ফেলতে হবে।' গায়ত্রী চেয়ারের পিঠ ধরল: 'আবরণ তো দিতে হবে মেয়েকে।'

'নিশ্চয়। এক শো বার।' নিজেই উঠে পড়ল নরনাথ: 'আর উপস্থিত ক্ষেত্রে ঐ তো একমাত্র আবরণ।'

'এত যখন করতে পারলাম এটুকুও করতে পারব।' যেতে যেতে থামল কাকলি।

'কিন্তু তাড়াতাড়ি সারতে হবে। তোমার মতে পাত্র কেমন?' গায়ত্রীর প্রশ্ন।

'দিগ্বিজয়ী। খোলা তলোয়ারে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে।' বললে নরনাথ, 'দেরি করবার তার সময় নেই। আর যখন হরে দরে, এরই জন্যে এত, দেরি করার দরকারই বা কী।'

বা, আইনের সময়টুকু তো রাখতে হবে?' কাকলি মার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল।

'এ ক্ষেত্রে তারও দরকার ছিল না।' চিন্তিত মুখ করল গায়ত্রী: 'দেরি দেখলে পাত্র না বিরক্ত হয়!'

'কত বড় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত পাত্র— বিরক্ত তো হতেই পারে। এ না ভেবে বসে মেয়ে আমাকে খেলাচ্ছে।' গায়ত্রীর মুখে নরনাথ আরেক পোঁচ চিন্তা মাখাল: 'সরে পড়ার না ছুতো ধরে। তাই সরার আগে সেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'ও ফসকে গেলে এমন পাত্র পাব কোথায়?'

'এমন পাত্র মানে?' নরনাথ চোখ প্রায় কপালে তুলল: 'ও ফসকে গেলে আর কোনো পাত্রই জুটবে না।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গায়ত্রী। কাকলিও কম চমকাল না।

'আদালত ওর চরিত্রে যে সিল দিয়ে দিয়েছে তা কিছুতেই মুছে যাবে না। এ শুধু একটা লোকমুখের অপবাদ নয়, এ আদালতের বিচারের সিদ্ধান্ত—সর্বকালে সমস্ত বিশ্বে এর ঘোষণা— এর খণ্ডন নেই, ভঞ্জন নেই, নিরাকরণ নেই—'

'চরিত্রে সিল—কী সিল?' আতঙ্কিত মুখ করল গায়ত্রী।

'যে, বিবাহিত স্ত্রী হয়ে কাকলি জনৈক বরেন চট্টোপাধ্যায়ে আসক্ত, তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত, যার দরুন তার স্বামী তাকে দূর করে দিয়েছে, ছিন্ন করেছে বিবাহের গ্রন্থি। সুতরাং বিয়ে-ছুট কাকলিকে বরণ করতে পারে বা আবরণ করতে পারে একমাত্র ঐ ব্যভিচারী বরেন চট্টোপাধ্যায়, আদ্যোপান্ত যার সঙ্গে তার ঘটনা। অন্য কোনো পাত্র এগোবে না এ বাজারে, এ ব্যাপারে। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রং। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন যখন ভালো তখন সকলে মিলে এর দ্রুত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করাই বিধেয়। যাই দেখি দাদা কী বলে!' নরনাথ পাশের প্যাসেজ ধরল।

মেয়েকে উদ্দেশ করে গায়ত্রী বললে, 'শুনলি তো?'

'শুনলাম। সব জানা কথা। বাসি কথা।' কাকলি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল।

'তবে দেরি করছিস কেন? তিন মাসের আর বাকি কত?'

'জানি না। হিসেব রাখি নি।' তারপর শান্তমুখে বললে, 'তিন মাস তো কিছুই না। দেখতে-দেখতে কেটে গেল। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা ভালো।'

'না, না, অপেক্ষা কেন! অপেক্ষা করতে গেলে ও ঠিক পালিয়ে যাবে।' গায়ত্রী হাঁপিয়ে উঠল।

'যাক পালিয়ে। ও পালিয়ে গেলেই পৃথিবী ছোট হয়ে যাবে না। আমি চাকরি-বাকরি করব, উন্নতি করব, বড় হব। সংসারের দুঃখ ঘোচাব।' জানলার বাইরে তাকাল কাকলি।

'কিন্তু নিজের কলঙ্কের সিল ঘোচাবি কী করে?'

'যা মিথ্যে তা সময়ের জলে মুছে যাবে, মা। আর যদি নাই যায়, যদি কলঙ্কিনীই থাকি, তবু পৃথিবীর মমতায় কলঙ্কিনীরও স্থান আছে।'

'কিন্তু ও পক্ষ যখন প্রস্তুত তখন তোর আর কিসের প্রতীক্ষা?'

'প্রতীক্ষা ভালোবাসার। দেখি ভালোবাসা জাগে কি না।'

'আবার সেই কথা?' দীর্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল গায়ত্রী।

কাকলি হাসল। বলল, 'আগাগোড়াই সেই কথা। পুরোনো কথা। পাথুরে মাটি খুঁড়ছি, চেষ্টা করছি খুঁড়তে। দেখি একটা ফোয়ারা পাই কি না।'

'আগের বারও তো ঐ ফোয়ারাই খুঁজেছিলি—'

'সেবার পেয়েওছিলাম। ফোয়ারাটা জল পেল না, ফুরিয়ে গেল। তাই বলে আবার ফোয়ারা দেখতে হবে না এ হতেই পারে না। মাটির শস্যে খাদ্য হতে পারে, হৃষ্টি-পুষ্টি হতে পারে, কিন্তু ফোয়ারার জল না পেলে পিপাসাই মিটবে না। পিপাসার জল না থাকলে কিসের খাদ্য, কিসের হৃষ্টি-পুষ্টি।

বড় চাকুরে মেয়ে, বেশি তাড়ন-তর্জনের দিন নেই—আর করলেই বা কত শুনবে। তাই খাটের পাশে বসে মেয়ের চুলে হাত দিল গায়ত্রী। বললে, 'জাগবে, জাগবে ফোয়ারা। এমন সমর্থ-সুন্দর ছেলে, মেয়ে আর মা যা চায় সেই রূপ আর বিত্ত যেখানে একত্র, তাকে ভালো না লেগেই পারে না। মিশতে-মিশতেই ভালোবাসা আসবে।'

'যেমন কাঁদতে-কাঁদতে শোক আসে।' হাসল কাকলি।

'চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। ঘর করতে-করতেই জেগেছে আদর-অনুরাগ।' কাকলির চুলের ভার পিঠময় খুলে দিল গায়ত্রী।

'সেই যে অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নতুন হোয়।'

'হ্যাঁ, তিলে-তিলে নতুন হবে। তোকে কত সুখে রাখবে। পরিবারের কত বড় সম্বল, কত বড় মুরুব্বি হয়ে দাঁড়াবে। তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস। মিছিমিছি দেরি করছিস—'

'না, চমৎকার লোক। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আর কত উপকারী।' মায়ের স্নেহের মধ্যে মাথাটা ছেড়ে দিল কাকলি: 'না, দেরি করব না। তোমাদের যখন এত ইচ্ছে—'

দ্রুত পায়ে ফিরে এল নরনাথ।

বললে, 'কই, এ বিয়েতে তো আমাকে দরকার হবে না?'

'কেন?' কাকলি-গায়ত্রী একসঙ্গে বলে উঠল।

'শুনছি প্যাণ্ডেল হবে না, আলো জ্বলবে না, সানাই বাজবে না—নো ডেকরেশান। যদি এসব না হয়, যদি কনস্টেবল দাঁড় করিয়ে না ট্র্যাফিক কন্‌ট্রোল করতে পারি তা হলে আমি কেন?' নরনাথ হতাশ-হতাশ মুখ করল: 'শুনছি দলিলী বিয়ে আর হোটেলী ডিনার। তা যেমন খুশি হোক, বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই শান্তি। এক দলিল দিয়ে আরেক দলিল খারিজ করা।'

'সর্বত্রই দলিলের লীলা।' মুখ টিপে হাসল কাকলি: 'জন্মের দলিল, মৃত্যুর দলিল বরাবরই ছিল, এইবার বিয়ের দলিল হল। বলতেই বলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ—'

'তাই দেখছি।' নরনাথ চলে যাবার উদ্যোগ করল।

বাধা দিল গায়ত্রী। বললে, 'না, না, আমাদের দিক থেকে একটা উৎসব করবে বৈকি। সব ভি-আই-পি-দের ডাকবে, কাগজওয়ালাদের, যাতে খবরটা বেরোয় ফলাও করে। খবরের মত খবর।'

নামতে-নামতে নরনাথ বললে, 'দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের আবার ফলাও! যা না কনে তার ডু পায়ে আলতা। বরেন ঠিকই বলে নমো নমো করে লক্ষ্মীপুজো। ঘট-প্রতিমা নয়, সরা দিয়েই কাজ সারা।'

গায়ত্রী উঠে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল পিছনে। বললে, 'মোটেই তা নয়। এটাই প্রথম, এটাই আসল। সেভাবেই খবর বেরোবে, চিঠি যাবে নেমন্তন্নের।'

'আর আগেরটা?' পিছনে তাকাল নরনাথ।

'আগেরটা দুঃস্বপ্ন।'

'তাই হোক, পরেরটা সুখস্বপ্ন হোক—অন্তত শেষ স্বপ্ন।' নিচে পৌঁছে হাঁক ছাড়ল নরনাথ: 'যখনই ডাকবে তখনই পাবে। উৎসবেও পাবে, দুর্ভিক্ষেও পাবে। চলি।' চলে গেল নরনাথ।

বরেন ঘরে ঢুকল।

'এ কি, শুয়ে আছ? ছুটির দিন, সকালবেলা—'

'এটাই তো শুয়ে কাটাবার প্রশস্ত সময়।' শৈথিল্যকে শাসন করতে করতে উঠে বসল কাকলি।

'চলো কোথাও বেরুই।'

'কোথায় যাবেন?'

'তুমিই বলো।'

দু চোখে উচ্ছল খুশি নিয়ে কাকলি বললে, 'চলুন চিড়িয়াখানায় যাই।'

'মাথা খারাপ!' প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মত ভাব করল বরেন। 'আমরা কি বাচ্চা? ছেলেমানুষ?'

আশ্চর্য, কোনো কথাই বলতে পারে না কাকলি। যেন আগে থেকেই হেরে বসে আছে। সব জোর ফুরিয়ে ফেলেছে নিঃশেষে।

হ্যাঁ, ছেলেমানুষ তো বটেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো এক চিরন্তন শিশু আছে। এটুকু অন্তত তো বলা যেত। কিংবা, পশুপাখি তো কেবল বাচ্চারাই দেখে না, বুড়োরাও দেখে।

কিন্তু সাধ্য নেই প্রতিবাদ করে। স্বত্বের বুঝি আর এক কণাও বাকি নেই। নাকবেঁধা গরু হয়ে চলেছে যেমন টানছে। নাক যখন বিঁধতে দিয়েছে, দড়ি ঢুকিয়ে তো টানবেই যেখানে-সেখানে।

যার স্বত্ব নেই তার দখলও বুঝি আর বহাল থাকে না।

কিন্তু মুখের একটা ফাঁকা কথায়ই কি চলে যায় স্বত্ব? আমার এ বাড়িঘর তোমার, মুখে বললেই এ বাড়িঘর তোমার হয়ে যাবে? আমি যদি দলিল করেও বলি যে তোমাকে এ বাড়িঘর বিক্রি করলাম তা হলেও এ বাড়িঘর তোমার হবে না যদি না তুমি মূল্য দাও। মূল্যের অভাবে দলিল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কী মূল্য দিল বরেন এ পর্যন্ত? খালি মনিব্যাগই খুলল। মূল্য কি মনিব্যাগে থাকে?

সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করি, 'বরেন কি ভালোবাসা দিল?'

মাথা খারাপ! বরেনের উত্তরটা ঠিক অনুমান করতে পারে কাকলি। ভালোবাসা আবার কী! ভালোবাসা কি আগুন নেই ধোঁয়া, কাম নেই সন্তান?

বরেনের শরীরে একটা লুব্ধতা স্তম্ভিত হয়ে আছে। সেটাও কি ভালোবাসা নয়? ছিঁড়েখুঁড়ে কেড়ে খাবার যে হিংস্র ক্ষুধা সেটাও কি ভালোবাসা থেকে আসে না? ভালোবাসা মানে কি পাথরের গ্লাসে সাত্ত্বিক মিছরিপানা? কাঁচের ডিকেণ্টারে রাজসিক মদ নয়?

কি জানি কী! মন খালি ভয় পায়। বরেন এসেছে শুনলে মন ছুটে যায় না, গুটিয়ে যায়। খুশির আবির উড়োয় না, বরং রঙ দিতে এসেছে ভেবে দরজায় খিল চাপায়।

বলতে পারত, শরীর ভালো নেই। কত সোজা ছিল, অথচ কিছুতেই, বলতে

পারল না। সব সময়েই যেন একটা জোর দিয়ে চেপে রেখেছে। প্রায় বুড়ো আঙুলের তলায়। কোথায় যাবে? যদি যাবে তো ধার শোধ করে দিয়ে যাও। আর ধার শোধ দিতে এসেছ কি, চিরদিনের মত ধরা পড়ে গেছ।

সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়। সব সময়ে কৃত্রিম। ভালোবাসা কি একটা কৃত্রিম অস্তিত্ব?

নয় কে বললে? ভালোবাসা মানেই তো তুমি যা এক বেলার, তাই চিরদিনের মতন করে দেখাবার কারসাজি।

কিন্তু তাই বলে কি তা স্পষ্ট ভয়? নিজেকে অলঙ্ঘ্য করে রাখবার সদা-জাগ্রত চেষ্টা? ভয় আর পরিহার এই কি ভালোবাসার দুই গোল পোস্ট?

'কোথায় তা হলে যাব?

চলো কোথায় কী ইংরেজি নাটক হচ্ছে। কোথায় কী বিদেশী ছবির প্রদর্শনী। যেসব জায়গায় গেলে তোমার বৈদগ্ধ্য আপ্‌সে বিঘোষিত হবে সেসব জায়গায়।

একদিন কাকলি বললে, 'ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে যাবেন?'

হা-হা করে হেসে উঠল: 'তার চেয়ে বরং চলো না কালীঘাট যাই।'

ম্লান হয়ে গেল কাকলি। সত্যি ওটা কি একটা বলে-কয়ে যাবার মত জায়গা!

'কলকাতার বাইরে চলুন কোথাও।' আরেকদিন বলে ফেলেই কাকলি পাংশু হয়ে গেল।

'কেন, কলকাতা কি দোষ করল? প্রেমে-অপ্রেমে কলকাতার মত কি জায়গা আছে?'

'চলুন তা হলে গঙ্গার দিকে।'

'কী মামুলী।'

'বেশ, তবে মাঠে চলুন, ঘাসের উপর বসে গল্প করি।'

'মাঠেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু ঘাসের উপর নয়, বসবে চাঁদোয়ার নিচে, সব চেয়ে দামী গ্যালারির সিটে।'

'সে কোথায়?'

'ইডেন গার্ডেনে। ক্রিকেট খেলা দেখতে।'

'ক্রিকেটের আমি বুঝি কী!'

'ইংরেজি সিনেমা-নাটক সম্বন্ধেও তুমি এই কথা বলো—বুঝি কী! শোনো, সবটা আমিও বুঝি না। কিন্তু কথাটা বোঝা নয়। বোঝানো। বোঝানো যে আমি খুব বুঝি, আমি একজন সমজদার। তেমনি ক্রিকেট মাঠে যাওয়া খেলা দেখতে

নয়, খেলা দেখাতে। হ্যাঁ, তোমার খেলা। শাড়ির খেলা, রঙ-ঢঙের খেলা, বলতে পারো খাবার খেলা। জীবন শুধু দেখতেই নয়, দেখানোতেও। যেমন আমি এখন ক্রিকেটের টিকিট দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'কেন, সামান্য টিকিটে কী আছে?'

'সামান্য? এ টিকিট যার হাতে, জানবে সেই দেশের প্রধান। মুখ্যটুখ্যদের একজন। যে সাধনা করে নারীর হৃদয় পেতে হয় সেই সাধনা করে এই টিকিট।'

একদিন কাকলি বললে, 'দিশি সিনেমাতে আপত্তি আছে? চলুন একটা বাঙলা বইয়ে যাই। ব্যালকনিতে বসি। সুন্দর একটু নিরিবিলি দেখে।'

হা-হা করে হাসল বরেন। এটা যেন বিদ্রূপের হাসি নয়। লোলুপতার হাসি।

'নিরিবিলির জন্যে সিনেমার ব্যালকনি কেন?' দু-এক পা করে যেন এগিয়ে এল বরেন: 'আমার বাগানবাড়িই তো আছে। তুমি তো সেখানে কোনোদিন যাও নি।'

চোখে ব্যথিত কটাক্ষ নিয়ে তাকাল কাকলি। মহতের কাছে প্রার্থনার স্বর এনে বললে, 'সেটা বুঝি সুন্দর নিরিবিলি হল?'

সেই অদ্ভুত হাসিটা আবার হাসল বরেন। বললে, 'সুন্দর তো নিশ্চয়ই। তবে নিরিবিলি না বলে বলতে পারো মধুরালি।'

কাকলি মুখ ফিরিয়ে নিল চকিতে। কী বিশ্রী শোনাল কথাটা। কী বীভৎস দেখাল বরেনকে।

এখন মুখ সরিয়ে নিলে চলবে কেন? এবার বরেন মনে-মনে হাসল। আদালতের কাগজে নিজের হাতে সই করে দিয়েছ। স্বীকার করেছ আমি ব্যভিচারী, আমার সঙ্গেই তোমার চূড়ান্ত সংশ্লেষ, তোমার সঙ্গে আমার। এখন তেমন কিছু ব্যবহার দেখলে কেউ আশ্চর্য হবে না, বিবেকাহত হবে না। পরিণাম সম্বন্ধে সকলেই প্রশ্রয়শীল। বাইরে আদালত তো বটেই, ভিতরে তোমার এই গৃহ, তোমার বাবা-মা। কঠিন লাগছে তা বুঝি, কিন্তু অন্যায় বলতে পারো না, অত্যাচার বলতে পারো না। বলতে পারো না কুৎসিত। তোমার বাজতে পারে, তোমার বাজছে, তাই তো আগে বিয়েটা সেরে ফেলতে চাচ্ছি। তুমি পরস্ত্রী বলেই তো পরশ্রী—পরমশ্রী। সেই পরত্বে, সেই পরকীয়ত্বেই তো তোমার ঐশ্বর্য। তাই তো তোমার এত লাবণ্য, তোমাতে এত লোভ। তবে তুমি তাড়াতাড়ি হতে দিচ্ছ না কেন! তিন মাস চলে গেল তবুও তুমি গড়িমসি করছ। খালি সময় নিচ্ছ। কিসের সময়? বলছ, প্রস্তুত হবার সময়। বিচ্ছেদ-মামলার আর্জি দাখিল করবার দিন থেকেই তো তুমি প্রস্তুত।

অন্তত যেদিন আর্জির নকলসমেত সমন জারি হল তোমার উপর, তুমি সই করে সমন নিলে, সেদিন থেকে। এখন তানানানা করলে শুনব কেন? কে শোনে? জানি জোর করে দেঁড়েমুষে নিতে গেলে আনন্দ পেলেও আনন্দের সুগন্ধ পাওয়া যায় না। আর সুগন্ধই সমস্ত। তাই তো জোর খাটাতে চাই না। তোমার মন কিসে খুশি হবে তারই চেষ্টা করি। ভোগ তো শুধু দেহের নয়, ভোগ মনেরও। শুধু খিদে পেলেই খেয়ে তৃপ্তি হয় না যদি না খাদ্য স্বাদু হয়, পরিবেশনে না শ্রী থাকে। তাই তোমার বিশ্রামে-আলস্যে সায় দিয়ে যাচ্ছি। বিয়েটাকে আবশ্যিক করবার জন্যে আইনদত্ত অধিকার খাটাচ্ছি না। তুমি সুখী হও। স্বয়মাগতা হও। আমি জানি মন যদি চাঙ্গা হয় কাঠের কটোরার জলেও গঙ্গা খেলে। তাই তোমার মন চাঙ্গা করবার জন্যে পথে-পথে ঘুরছি, সময়ের বালি পড়তে দিচ্ছি ঝরে-ঝরে।

'জানো, আজ তোমার দীপঙ্কর রিজিউম করল।'

'সত্যি?' উৎফুল্ল চোখে তাকাল কাকলি।

'বেশ হাসিখুশি হয়ে সহজভাবেই কাজ করছে।'

'আপনারা?'

'আমরাও স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেই নিয়েছি। মিটিয়ে দিয়েছি ব্যাক্-পে।'

'দিয়েছেন? কী ভালো!' প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল কাকলি: 'এবার তা হলে এক ফাঁকে কিছু ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে দিন।

'দেব। আমাদের বিয়েটা আগে হোক। ওকে তখন সেটা বকশিশ দেব।'

'উপহার দেব বলুন। কী মজা! ও ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।'

বরেন সেদিন আর বেশীক্ষণ বসল না। একা-একা চলে গেল তাড়াতাড়ি। এই নতুন সুখ নিয়ে কাকলি একটু নাড়াচাড়া করুক। আরো একটু কৃতজ্ঞ হোক। আরো একটু বিগলিত। স্বয়মাগতা হবার জন্যে আরো এক ধাপ নিচে নামুক।

বরেন চলে গেলে কাকলি চঞ্চল হয়ে উঠল। ছুটে এল জানলার কাছে। তাকাল বাইরে। গাড়িটা দেখা গেল না। তবে কি বরেন এখনো যায় নি? কই, বাড়ির কাছেও তো গাড়ি নেই। চলে গিয়েছে।

আরো, আরো যে একটা খবর জানবার ছিল।

বা, সেটা আর এমন কী না জানা। নিশ্চয়ই ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, পথ দেখ। তা হলেই তো কাকলি সুখী হয়। তাইই তো কাকলি বলেছে বলতে।

• • • ৪৩ •

কাকলি ভেবেছিল দীপঙ্কর নিজে থেকে এসেই খবর দেবে। অন্তত একটা টেলিফোন করতে কী বাধা ছিল! কেন, বাড়িতেই বা আসবে না কেন? সে তো আর এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বাড়িতে নেই। তার নিজের বাড়িতেই মানে বাবার বাড়িতে আছে। সেখানে তো দরজা নিষ্কণ্টক। এলেই হয়। জানাতে পারে কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়াল।

কদিন অপেক্ষা করে নিজেই সুতরাং গেল কাকলি।

গিয়ে দেখে, ভোঁ ভোঁ, কেউ কোথাও নেই।

সে কি? গেল কোথায়?

ওরা বাড়ি বদলেছে। কোঠাবাড়িতে উঠে গেছে।

সত্যি? স্বপ্নের সত্য হবার আলোতে ঝলমল করে উঠল কাকলি।

ঠিকানা নিয়ে গেল তখুনি নতুন বাড়িতে। গলির মধ্যে ছোট একটা একতলার টুকরো কিন্তু দিব্যি ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে, জানলায় পর্দা। দিব্যি সম্ভ্রান্ততার চাদর দেওয়া গায়ে।

দিব্যি কড়ানাড়া দরজা। শব্দ করতেই বেরিয়ে এল দীপঙ্কর।

'আরে, আপনি? কী ভীষণ কথা!' দীপঙ্কর আকাশ থেকে পড়ার মত চোখ করল।

'কেন, এর আগে আসি নি কোনোদিন?'

'বা, কত এসেছেন। যখন আমরা বস্তিতে ছিলাম।'

'আর এখন বুঝি কোঠাবাড়িতে আসতে পারি না?'

কুণ্ঠিত হবার ভাব করল দীপঙ্কর: 'তখন আপনি বন্ধুর স্ত্রী ছিলেন—'

'আর এখন?'

'এখন বস্-এর স্ত্রী—'

'হই নি তো এখনো।'

'হতে আর বাকি কী! বন্ধুপত্নী তবু ঘরোয়া কিন্তু বস্‌পত্নী, ওরে বাবা, তটস্থ হয়ে থাকবার মত।'

'কিন্তু এখনো তো জলে পড়ি নি ঝাঁপ দিয়ে। নিজেই এখন তটস্থ আছি,' কষ্টে হাসল কাকলি : 'কি, বাড়িঘরদোর দেখাবেন না? বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন?'

'সে কি, আসবেন ভিতরে?'

'কি আশ্চর্য! আমার কি শুধু আপনার সঙ্গে সম্পর্ক?' নিজেই পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল কাকলি।

মুহূর্তে যেন আলাদিনের প্রদীপ জ্বলে উঠল। আনন্দের কলরব পড়ে গেল চারদিকে। ছেলেবুড়ো সবাই ছুটে এসে ঘিরে ধরল কাকলিকে। বিষ্টু পর্যন্ত দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

অভ্যাসের দেশে যেন অভাবনীয়ের আবির্ভাব।

অভাবনীয় শুধু কাকলি নয়, অভাবনীয় এই কোঠা কখানা, জিনিসপত্রগুলি একটু গোছগাছ করে রাখা, দীপঙ্করের বাবার মাটি ছেড়ে তক্তপোশে এসে বসা, আর চারদিকে এই কটা ইলেকট্রিক আলো। চারদিকে তাকাল কাকলি। ইলেকট্রিক আলোতেই প্রফুল্ল দেখাচ্ছে সব কিছু। সকলের মুখ চোখ চেহারা।

'সব, সব মা, তোমার জন্যে।' দুর্গাবালা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় বললে গদগদ হয়ে, 'তুমি, তুমি না সাহায্য করলে এসব কিছুই হত না।'

'এ তো সামান্য।'

'এই আমাদের কাছে স্বপ্নের মত। তুমিই মাস-মাস টাকা দিয়েছ বলেই না—'

'রাখুন।' বসবার জন্যে আগেকার সেই মোড়াটার খোঁজে তক্তপোশের নিচে তাকাল কাকলি।

কিন্তু মোড়ায় আজ আর তাকে কে বসতে দেবে! সবাই তাকে ধরাধরি করে একটা চেয়ারে এনে বসাল।

'কই, মোড়াটা গেল কোথায়? মাদুর? শতরঞ্জি?'

'এখন কি আর আপনাকে মোড়ায়-মাদুরে মানায়? আপনার এখন সিংহাসন।' দীপঙ্কর চিপটেন কাটল।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে কাকলি বললে, 'ফের অমনি বলবেন তো মেঝের উপর, মাটিতে বসে পড়ব।' কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কাকলির সাধ্য কী। ছেলেমেয়ে সবাই মিলে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে রেখেছে।

'মা, এই চেয়ারখানাও তোমার জন্যে।' বললে দুর্গাবালা।

'মানে আপনার মহানুভবতার জন্যে, আপনার অভ্যর্থনার জন্যে।' আবার টিপ্পনী কাটল দীপঙ্কর।

'না, মা, তোমাকে অভ্যর্থনার জন্যে চেয়ার হবে কেন, তোমার আসন আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে।' স্নিগ্ধ শাসনের চোখে ছেলের দিকে তাকাল দুর্গাবালা : 'ওকে অভ্যর্থনা কি শুধু একখানা চেয়ারে বসিয়ে, না পাখার হাওয়া খাইয়ে?' কেননা ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা একটা হাতপাখা কুড়িয়ে এনে কাড়াকাড়ি করে হাওয়া করছে কাকলিকে।

'তা যদি বলো মা, ভাষা দিয়েও নয়। এমন ভাষা নেই মানুষের যা দিয়ে সেই স্তবস্তুতি তৈরি হয়।'

দীপঙ্করের মুখে শ্লেষের ছায়া আছে কি না দেখবার জন্যে তাকাল কাকলি।

'এমন কাণ্ড হয় না, এ ঘটে নি কোনোদিন। শোনে নি কেউ কোনোখানে।'

এ আবার কী আতঙ্কের কথা বলে। কাকলির চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

'জানেন, ব্যাক-পে হিসেবে মোটা একটা টাকা পেয়েছি বলেই ভারি হাতে সেলামি দিয়ে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিতে পেরেছি।' দীপঙ্করের মুখে নির্মল সত্যের সারল্য : 'নইলে ঐ খাটালের মধ্যেই পচতে হত। আর এই ব্যাক-পেটা জমতে পারল, এক থোকা থাবার মধ্যে আসতে পারল, কিসের জোরে, কার অনুগ্রহে? শুধু আপনার জোরে, আপনার অনুগ্রহে। মাস-মাস আপনি এই দুঃস্থ পরিবারকে সমানে অর্থসাহায্য করেছেন বলে। আগে আগে নিজে এসে দিয়ে গিয়েছেন, পরে যখন আপনার নানা বিপদ যাচ্ছে, তখনো মনে করে মার নামে পাঠিয়েছেন মনি-অর্ডার।'

'থাক—' কাকলি চোখ নামিয়ে নিল।

'না, থাকবে কেন? বলতে দিন। আর কিছু করতে পারি আর না পারি প্রাণ ভরে জানাতে দিন কৃতজ্ঞতা।' দীপঙ্করের কণ্ঠে সেই প্রসন্ন স্বাচ্ছন্দ্য : 'আজকের দিনে পরোপকার করা উঠে গেছে কিনা জানি না, কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলে আর কিছু নেই সংসারে। অন্তত মুখের কৃতজ্ঞতাটুকু জানাই অকপটে।'

'আহাহা, কী আর অমন করলাম। কটা টাকাই বা সাহায্য!'

'কটা টাকা? এক ঝুড়ি টাকা।' বললে দুর্গাবালা।

কাকলি শব্দ করে হাসল : 'পঞ্চাশ টাকায় এক ঝুড়ি হয়?'

'এক ঝুড়ির বেশি হয়।' বললে দীপঙ্কর, 'মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা। নিঃস্বের কাছে এ এক সাম্রাজ্যের সমান। বলেছি তো এমন কাণ্ড হয় না, এ ঘটে নি কোনোদিন। শোনে নি কেউ কোনোখানে।'

'আমার টাকা বেশি ছিল, খরচ ছিল না, দিয়েছি—' যেন গায়ে লাগে না এমনি করে কাকলি বললে।

'টাকা যেন কারু বেশি হয় ! যা লোকের বেশি হয় তা টাকা নয়, তা অহংকার।' ছোট একটা ভাগ্নের চুলে আঙুল বুলিয়ে আদর করতে করতে দীপঙ্কর বললে, 'আপনার ঐ পঞ্চাশ টাকা কতখানি আসান ছিল সংসারে তা মা জানে আর আমি জানি। দেখুন তক্তপোশের উপর থেকে বাবা পর্যন্ত সায় দিচ্ছেন। তারপর বাকি টাকা আমি টিউশানি করে প্রুফ দেখে বিজ্ঞাপন লিখে, কতরকম উঞ্ছবৃত্তি করে জোগাড় করবার চেষ্টা করেছি। কখনো পেরেছি জোগাড় করতে, কখনো পারি নি। কিন্তু আমার সমস্ত সংগ্রামের উৎসাহ আপনি আর আপনার ঐ কটা টাকা। ঠিক সময়ে ঐ টাকা কটা এসে আমাকে টেনে তুলেছে অবসাদ থেকে নৈরাশ্য থেকে—সমস্ত তিক্ততা থেকে। বঞ্চনার কথাই জেনে এসেছি, এ যে দেখি অন্যরকম। একেবারে অহেতুক।'

'মোটেই অহেতুক নয়।' হাসতে গিয়ে গম্ভীর হল কাকলি।

'যাই হোক, আপনার এ টাকা আমি শোধ করে দেব।'

'মস্ত বড় কাজ করবেন।'

'হ্যাঁ, মস্ত বড় কাজ। উপকারীর ঋণ শোধ করাই আজকের দিনে মস্ত বড় কাজ।'

'কিন্তু আমি কি আপনাকে ধার দিয়েছি যে আপনি শোধ দেবার কথা বলছেন ?' কাকলির চোখ মমতায় কোমল দেখাল।

'আপনি তবে কী দিয়েছেন ?'

'আমি মেয়ের কাজ করেছি।'

'মেয়ের কাজ ?'

'হ্যাঁ, ঐ যে আপনার মা, উনি আমারও মা।' দুর্গাবালার তৃপ্তশীতল মুখের দিকে তাকাল কাকলি : 'কাঁচা স্যাঁতসেঁতে মাটির থেকে একটা গোটা পরিবারকে পাকা সিমেণ্টের মেঝের উপরে নিয়ে আসব এ আমার স্বপ্ন—'

'কী যে বলো !' দুর্গাবালা পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, থামল। 'দূরস্য দূর, পরস্য পর, আমরা তোমার কে ? আমাদের জন্যে কেন তোমার এত মায়া হবে ?'

'মায়া কেন হয় তা কি কখনো বলা যায় ?' কথাটা কাকলির নিজের কানেই বুঝি দুর্বল শোনাল।

'তুমি মানুষ নও, তুমি দেবী।' পাশের ঘরে চলে গেল দুর্গাবালা : 'মানুষে এতটা করে না।'

'দেবীরাও করে না।' ফোড়ন দিল দীপঙ্কর।

'তা হলে অমানুষে করে।' লঘু হতে চাইল কাকলি।

'শুনুন, আমাদের দুঃস্থতায় আপনার দয়া হয়েছিল।' দীপঙ্কর বললে, 'আপনি করুণায় অকাতর হলেন। আপনি অমানুষ কিনা জানি না। কিন্তু আমাকে দয়া করে অমানুষ হতে দেবেন না। সত্যি কথা বলছি এক থোকে পারব না, আস্তে আস্তে কিছু কিছু করে আপনার টাকা শোধ করে দেব—'

'না।'

দৃঢ়তাটা কতখানি গভীর প্রথমটা বুঝতে পারল না দীপঙ্কর। আপন মনে বলতে লাগল, 'বরেন আমার সঙ্গে এখন সাংঘাতিক ভালো ব্যবহার করছে। এও আশ্বাস দিয়েছে অচিরেই আমার মাইনেটা বাড়িয়ে দেবে। তখন তো কোনো কষ্টই হবে না, বাড়তি টাকাটাই স্বচ্ছন্দে দিতে পারব আপনাকে। ব্যাক-পের থেকে একটা অংশ আপনাকে দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তা হলে এই সিমেণ্টের বাড়িটা ভাড়া নেওয়া যেত না।'

'না, টাকা-ফাকা পারব না নিতে।' কাকলি এবার আরও স্পষ্ট হল: 'আমি কোনো দানধ্যান করি নি, আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি।'

'কর্তব্য? ঐ যে বলছিলেন মেয়ে— সেই মেয়ের কর্তব্য?'

'না, কাল্পনিক নয়, বাস্তব কর্তব্য। এক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্র নাগরিকের কর্তব্য।' কাকলি শরীরে কাঠিন্য আনল।

হাঁ হয়ে গেল দীপঙ্কর। বললে, 'এমন আপনার কোন কর্তব্য?'

'যদি অন্যায়রকম কারু ক্ষতি করে থাকি, তার ক্ষতিপূরণের কর্তব্য।'

'আপনি সুকান্তর কথা ভাবছেন?'

'না, কারু কথা ভাবছি না। কিন্তু ধরুন, যদি কেউ অন্যায় করে কারু চাকরি কেড়ে নেয়, আর সে যদি দৈবযোগে আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়, আর আপনার বিচারে যদি আপনি মনে করেন ঐ কেড়ে নেওয়াটা অধর্ম হয়েছে, তা হলে আপনি কী করেন? যদি আপনার স্বাধীন শক্তি থাকে, তা হলেও কি বসে থাকেন নিষ্ক্রিয় হয়ে? অবিচারের প্রশ্রয় দেন? অন্যায়ের শোধন করেন না? ক্ষতিগ্রস্তকে দেন না পুষিয়ে?'

'জানি না কী করি।' যেন ফাঁপরে পড়ল দীপঙ্কর।

'কিন্তু আমি জানতাম আমার কর্তব্য। তাই আমি অবিচারের প্রতিবাদে নিজে জরিমানা দিয়েছি।'

'আপনার কী দায়!'

'উদ্ধত বিচারককে শিক্ষা দেবার দায়। নীতিগত দায়। এক ইংরেজের কোর্টে সিডিশনের আসামীর জরিমানা আরেক ইংরেজ দিয়ে দিয়েছে নিজের পকেট থেকে এইটে বোঝাতে যে, এটা বিচার নয়, এটা প্রহসন।'

'এমনি প্রসহন তো কত আছে সংসারে—'

'এ প্রহসন আমারই এক নিকট আত্মীয়, আমারই এক গহনতম লজ্জা। তাই এর শাসনে-সংশোধনে আমার সেই স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা।'

'কিন্তু এখন— এখন কী করবেন? এখন কার ক্ষতিপূরণ করবেন?'

'তার মানে?' যেন চমকে উঠল কাকলি।

'এখন আমার চাকরি দিয়ে সুকান্তর চাকরিকে রদ করা হচ্ছে—'

'তার আমি কী জানি।' কাকলি তাকাল অন্য দিকে। পরমুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কিন্তু আপনি কি আমার নিকট আত্মীয় যে, আপনার অন্যায়ের খেসারত আমি দিতে যাব?'

'বা, আমি আসি কোত্থেকে? আমি তো আর সুকান্তর চাকরি খাচ্ছি না। আমি শুধু আমার পুরোনো চাকরিতে গিয়ে বহাল হচ্ছি। চাকরি খাচ্ছে স্বয়ং বরেন। আর বরেন আপনার নিকট আত্মীয়।'

'মোটেই নয়।' উঠে পড়ল কাকলি।

'হয় নি, হবে।'

'যখন হবে তখন ভাবা যাবে ক্ষতিপূরণের কথা।' কাকলি চলে যাবার উদ্যোগ করল: 'কিন্তু যাই বলুন, বরেনের বিচারটা তো অন্যায় হবে না। যে অনধিকারী জোর করে দখল করে নিয়েছে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া কি অন্যায়?'

'একটা পাওয়া-চাকরি নিয়ে নেওয়াই ঘোরতর অন্যায়। যে-কোনো অবস্থায় অন্যায়।'

কোথায় যাবে কাকলি, দুর্গাবালা খাবারের থালা নিয়ে তাকে আটকাল। বললে, 'তোমার মুখ এমনিতেই মিষ্টি, তোমার মিষ্টি মুখ কী করব, এ শুধু তোমার খাওয়া দেখে আমাদের চোখ মিষ্টি করা।'

খেতে-খেতে কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই ছাড়িয়ে দিচ্ছে ওকে?'

'হ্যাঁ, শুনছি, তাই নাকি আপনার অর্ডার।'

'বা, আমার অর্ডার! আমি কি কোম্পানির কেউ?'

'শুনছি ওকে ডিসমিস করলেই নাকি আপনি খুশি হন। আর আপনাকে খুশি করতে বরেন বহুদূর যেতে পারে।'

'বাজে কথা।'

'কিন্তু জানেন, ওর যদি চাকরি যায় তা হলে ও ভীষণ বিপদে পড়বে।'

'কেন, বিপদ কেন? টিউশানি করবে, স্কুল-মাস্টারি করবে।'

'তাতে হবে না। কষ্ট হবে। ও বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে এসেছে।'

'কেন, আলাদা কেন?'

'ঠিক জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।'

অনুমান তো কাকলিও করতে পারে। তবু জিজ্ঞেস করল, কী অনুমান?'

'অবনিবনা হয়েছে।'

এটা এমন আর কী বেশি কথা। তবু একটু মন্তব্য করবার লোভ হল কাকলির: 'চিরকাল এই অবনিবনাতেই ওস্তাদ।' সিঙাড়াটা গুঁড়ো করতে লাগল অন্য মনে: 'আলাদা হয়ে থাকে কোথায়?'

এটা কি মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল নয়? মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল কাকলি।

'হোটেলে। কোন হোটেলে, কী ঠিকানা, এখুনি আপনাকে বলতে পাচ্ছি না।'

'কে চায় ঠিকানা?' জ্বলে উঠল কাকলি: 'তার ঠিকানা দিয়ে আমার কী হবে।' হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল জলের গ্লাস।

'তা ছাড়া আরো এক তার ভীষণ অসুবিধে হবে চাকরি গেলে—'

দীপঙ্করের কথায় আর কান দেবে না কাকলি। কে না কার কী অসুবিধে হবে তার কী যায় আসে। দুনিয়ার লোকের দুঃখের ইতিবৃত্ত শোনবার তার সময় নেই, রুচি নেই।

কাকলি উঠে শিশুগুলিকে আদর করতে লাগল।

'অসুবিধে হবে মানে,' পিছু নিল দীপঙ্কর: 'তার বিয়েটা পিছিয়ে যাবে।'

'বিয়ে?' না হেসে উঠে আর পারল না কাকলি: 'আবারও সে বিয়ে করবে নাকি?' পরমুহূর্তে, বিবেকে বিদ্যুৎ খেলতেই বললে, 'তা কেনই বা করবে না? বিয়ে করতে আর দোষ কী। বিয়ে তো ভালোই। তা পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে?'

এ কি একটা প্রশ্ন? দীপঙ্কর কি বিয়ের ঘটকালি করে?

'শুনেছি তো হয়েছে।' দিব্যি উত্তর দিল দীপঙ্কর।

তা হোক। কোথাকার কে মধ্যবিত্ত পাঁচি-খেঁদি, জেনে কাকলির দরকার নেই। ঈশ্বর করুন যেন একটা ঝগড়াটে বুড়ি হয়। ঝগড়ার সময় হাতের সামনেই যেন ঝাঁটাগাছটা কুড়িয়ে পায়।

'আপনি তাকে চেনেন।' দরজার কাছে ঘেঁষে এসে প্রায় কানে-কানে বলার মত করে বললে দীপঙ্কর।

'চিনি?'

'হ্যাঁ, আপনার বন্ধু।'

'বন্ধু?'

'হ্যাঁ, বিনতা।'

'মিথ্যে কথা।' কাকলি হঠাৎ ঝলসে উঠল। পরমুহূর্তে, বিবেকে বিদ্যুৎ খেলতেই ভাবলে, বা, মিথ্যে হতে যাবে কেন? একজনের সঙ্গে আরেকজনের বিয়ে—এর মধ্যে মিথ্যের আছে কী! নিজেকে দমন করে মুখে স্বচ্ছন্দ হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'বা, সুকান্তই বলেছে আমাকে। আপনি বরং আপনার বন্ধু বিনতাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।'

'আমার বয়ে গেছে! কার না কার বিয়ে হচ্ছে, কার না কার সঙ্গে, তাতে আমার ভারি মাথাব্যথা।' কাকলি ঘাড় ফেরাল দীপঙ্করের দিকে: 'বরং এবার আপনার কবে বিয়ে হচ্ছে বলুন।'

পিছন থেকে দুর্গাবালা বললে, 'ঠিক তোমার মত একটি মেয়ে দেখে দিতে পারো মা—ঠিক তোমার মত শ্রী, তোমার মত স্বভাব—'

কী সর্বনাশ! হেসে উঠল কাকলি।

দেখাদেখি দীপঙ্কর।

কলিং বেল টিপল বরেন। বেয়ারা আসতেই বললে, 'বোস সাহেবকে, সুকান্তবাবুকে খবর দাও।'

সুকান্তর সঙ্গে এতদিন যা সম্পর্ক ছিল, এতটা ঘটা না করলেও হয়তো চলত। পাশের ঘরেই তো সুকান্ত বসে। মাঝখানের পার্টিশনের দেয়ালটা তো সিলিঙ পর্যন্ত ওঠে নি। এমনি গলা ছেড়ে নাম ধরে ডাকলেই বেশ চলত। এতদিন তো তাই চলছে। ঘণ্টা বাজিয়ে দূত পাঠিয়ে ডাকবার দরকার হয় নি। ইচ্ছে করলে অক্লেশে

নিজেও যেতে পারত ও ঘরে। কতদিন তাই গিয়েছে। হয় ওখানেই জমেছে, নয় তো নিয়ে এসেছে টেনে।

কে জানে, সম্পর্কের সুর বুঝি বদলাচ্ছে ক্রমশ।

কী একটা লেখা নিয়ে মগ্ন আছে বরেন, ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুকান্ত।

হঠাৎ মুখ তুলে বরেন বললে, 'দীপঙ্কর তো ফিরে এল।'

'তাই তো দেখছি।' গা না লাগিয়ে বললে সুকান্ত।

'এখন তোমার—তোমার কী হবে—ও কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।' বরেন ব্যস্ত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করল।

আর বুঝি 'তুই' নয়, 'তুমি'। 'তোর' নয়, 'তোমার'। 'বোস্' নয়, 'বোসো'।

চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত। বললে, 'আমার কী হবে মানে?'

'মানে, দীপঙ্কর তো তোমার জায়গায় এল।' চোখের কোণটাকে একটু কুটিল করল বরেন।

'আমার জায়গায় আসবে কেন? সে নতুন অ্যাপয়েণ্টেড হল।'

'চেহারাটা সেরকম নয়। বলতে পারো, সে নিজের জায়গায় বহাল হল।'

'তা হোক। তাতে আমার সঙ্গে তার ক্ল্যাশ কোথায়?' অসহিষ্ণু হয়ে চেয়ারটা আরো কাছে টানল সুকান্ত: 'সে তার পুরোনো পোস্টে, আমি আমার নতুন পোস্টে।'

করুণার অবতারের মত হাসল বরেন। বললে, 'আসলে পোস্টটা এক। তুমি এলে ও যায়, ও এলে তুমি যাও।'

'বা, আমি যাব কেন?' টেবিলের ধারটা শক্ত করে ধরল সুকান্ত: 'তোমাদের বিজিনেস দিনে-দিনে কত এক্সটেণ্ড করছে, একটা বাড়তি চাকরি আমার জন্যে অনায়াসে তোমরা প্রোভাইড করতে পারো। যাকে বলে ডেভলাপমেণ্ট অফিসার, অন্তত তেমনি ধারা একটা কিছু—'

'ডিরেকটার্স মিটিঙে তাই বলব আমি।' আশ্বাসে প্রশস্ত হল বরেন!

'ওসব মিটিং-ফিটিং ফালতু কথা। তোমার বাবাকে যদি তুমি বলো তা হলেই হয়ে যায়।' যেন অব্যক্ত এক সিক্ত সুর বেজে উঠল প্রার্থনায়: 'যেমন গোড়াতে হয়েছিল

'সেটা একজনের ভেকেন্সিতে আরেকজনকে নেওয়া। সেখানে বাবার কথাই চূড়ান্ত। কিন্তু,' সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানতে চাইল বরেন: 'কিন্তু এটা হচ্ছে বাড়তি লোক নেওয়া, কোম্পানির খরচ বাড়ানো। এটা তাই বোর্ডে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু বোর্ড যদি উলটো সিদ্ধান্ত করে?' সুকান্তকে কেমন শুকনো-শুকনো শোনাল।

'উলটো সিদ্ধান্ত মানে?' অবোধের মত মুখ করল বরেন।

'মানে, যদি আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়া তাড়িয়ে দেওয়াই ঠিক মনে করে?'

'তা হলে', কথা যেন হঠাৎ খুঁজে পেল না বরেন, আমতা-আমতা করে বললে, 'তা হলে, তুমি তা মেনে নেবে কেন? নেবে না মেনে। তুমি ফাইট করবে। মামলা করবে।'

'মামলা করব!'

'হ্যাঁ, দীপঙ্কর যেমন করেছিল।'

'আবার মামলা!' শূন্যে হাত ঝাড়ল সুকান্ত।

'কেন, মামলায় তো তুমি বরাবর জেতো। মামলায় তোমার ভয় কী! আর, এ তো কোনো সাজানো মামলা নয়, এ সত্যি মামলা। বোর্ড যদি তোমাকে ডিসচার্জ করে তবে সে ডিসচার্জ ন্যাচারেল জাস্টিসের পরিপন্থী। সহজেই তোমার জিত হবে মামলায়।' বরেন সিগারেটটা ধরাল।

'মামলায় জিততেও আমার আর রুচি নেই।'

'সে কী?' চমকে উঠল বরেন। এক মুহূর্ত তাকাল সুকান্তর দিকে। তাকে একটা সিগারেট দেব-দেব করেও দিল না। বললে, 'তা হলে কী করবে?'

'আমি আমার নিজের লাইনে ফিরে যাব।'

'নিজের লাইন। ট্র্যাম-লাইন, না রেল-লাইন?'

'লেখাপড়ার লাইন। মাস্টারি করব। অধ্যাপকি।'

'ও কি লাইন? ও পট-হোল। বড় জোর বলতে পারো গরুর গাড়ির নিক। লাইন অফ ঢিমে তেতালা!'

'তা আর কী করা যাবে! যার যেমন সামর্থ্য।' সুকান্ত উঠি-উঠি করতে লাগল।

'না, না, অত নিরাশ হবার কী হয়েছে? দেখি না কতদূর কী করতে পারি! আমিই তো আছি।' সিগারেটটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতে কলম ফের তুলে নিল বরেন।

আর কোনো কথা নেই। প্রশ্ন নেই, পরামর্শ নেই। নেই কোনো গুপ্ত মন্ত্রণার আত্মীয়তা। সব কিছুর সমাধান হয়ে গিয়েছে। সমস্ত জিজ্ঞাসা স্তব্ধ। কৌতূহল নিরস্ত। সংশয় দূরীকৃত। অভিলাষ চরিতার্থ। কিছুই আর ধরবার করবার নেই।

আর তবে বসে রয়েছ কী ! এবার ওঠো।

'উঠি।' নিঃসীম নিঃস্বের মত উঠে পড়ল সুকান্ত।

অনুকম্পায় মন্থর চোখ তুলে তাকাল বরেন : 'আচ্ছা, দেখি। এখুনি হাল ছাড়বার কিছু হয় নি।'

ধীরে ধীরে চলে গেল সুকান্ত। পিছন থেকে তার যাওয়াটা বরেন দেখল আহাহা, স্যুট পরেছেন। সাহেব হয়েছেন। পেটে ভাত নেই, গোঁফে তা !

কেমন শীর্ণ দেখাচ্ছে পিছনটা। কেমন বা টোল-খাওয়া। বরেনের মনে হল কে যেন পিছন থেকে সুকান্তকে লাথি মেরেছে। বরেন ছাড়া আর কে মারবে ? হ্যাঁ, বরেনই মেরেছে। তার বউ কেড়ে নিয়েছে। এবার চাকরি কেড়ে নেবে।

কাকলি বলেছিল, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে। পিছন থেকে কেউ এসে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছে বুঝি। বরেন ছাড়া আর কে দেবে ? হ্যাঁ, বরেনই দিয়েছে। ইউ ইমবেসিল ফুল, নিনকমপুপ ! নির্বীর্য ! নিস্তেজ, নিষ্পৌরুষ। ক্লিয়ার আউট। বেরিয়ে যাও। কী, গেলে না ? যাও বলছি। হটো, ভাগো, নিকালো।

সেদিনের ধুলোমাখা মফস্বলের ছেলে সিমেন্ট বাঁধানো কলকাতায় এসে তড়পেছিল। ঝিলিক মেরেছিল। শহুরে ভাষায় যাকে ডাঁট বলে সেই ডাঁট দেখিয়েছিল। কোথায় ভোঁতা-ভোঁতা ভারি-ভারি দা-কাটারি হয়ে থাকবে, তা না, শান-দেওয়া ফিনফিনে তরোয়াল হয়ে উঠেছিল। দেখলে, মুখে হাসি-হাসি ভাব রাখলেও গা জলে যেত বরেনের। গাফিলতি করতে করতে ঢিকোতে ঢিকোতে কোনোরকমে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে বেরো—তোদের যা অবস্থা, অত ঠাটবাট কিসের, পড়া ছেড়ে দিয়ে কোথাও একটা পুঁচকে কেরানিগিরি চাকরি নে—তা না, পাহাড়ের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে না, একেবারে চুড়া থেকে চুড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে তুঙ্গতম শিখরে এসে উঠলি— সহ্যের অতীত এই দাহ। একটা কোলকুঁজো ঘুঁটে-কুড়োনো ছেলে, গলায় সোনার মেডেল ঝোলালি ! শৃঙ্গে যেখানে তুষার জমেছে, ঝলমলাচ্ছে সোনালি রোদে, সেখানে সেই খ্যাতির শুভ্রতায় ঠাঁই নিলি জগজ্জনের সপ্রশংস সোনার দৃষ্টির প্রসাদে। তাও না হয় সইত, ক্ষমা করা যেত, কিন্তু কী বলে কোন সাহসে কাকলির মত মেয়েকে বিয়ে করলি ? বানর হয়ে পরলি মুক্তোর মালা ? সামান্য পাঁচালি লিখে বসলি গিয়ে কবিসমারোহে ! শোন, এতটা হয় না, সয় না, দৃষ্টিকটু লাগে। কাকলির মত মেয়ে তোর মত হজগজ-র জন্যে নয়, তোর জন্যে নয় রাজা-রাজড়ার প্রতিষ্ঠা। পাড়ার ছেলে পাড়ায় গিয়ে টহল দে। কেমন সুন্দর বললে কাকলি ! উড়ুনি উড়িয়ে স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে টিউশানি করে বেড়াবে। যার

যেমন কাজ! যার যাতে হজম! বিশ্বসৃষ্টিতেও একটা নিয়ম আছে, মাত্রা আছে। বৈসাদৃশ্যকে সে বরদাস্ত করে না। বামন হয়ে চাঁদ ধরাটা সেখানকার এটিকেট নয়।

আঙুল ফুলে কলা গাছ বরং দেখা যায়, কিন্তু তুই আঙুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ হতে গিয়েছিলি। তাই তোর আঙুলও গেল, গাছও গেল। বউও গেল, চাকরিও থাকল না।

উপভোগের প্রচ্ছন্ন জিভ দিয়ে মনের সর্বাঙ্গ চাটতে লাগল বরেন।

'বউ নিয়েছে নিক, কিন্তু চাকরি নিতে দেব না।'

'বউ নিয়েছে মানে?' দীপঙ্করের মুখের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল সুকান্ত।

'বউ মানে কাকলি মিত্রের কথা বলছিলাম।'

'ও কি আমার বউ?'

'আই অ্যাম সরি। এক্স-বউ। প্রাক্তনী।' বিশেষ আর কোনো সম্ভ্রান্ততার অপেক্ষা রাখে না বলে একটু বা নিশ্চিন্ত হল দীপঙ্কর। বললে, 'প্রথম পক্ষী।'

'তা মিস মিত্রকে কী করেছে বরেন?' একটু যেন বা উন্মনস্কের মত তাকাল সুকান্ত।

'একটা মেয়েকে আর কী করতে পারে? বিয়ে করতে পারে।' বুঝি বা একটু হাসল দীপঙ্কর: 'কাকলিকে বিয়ে করছে বরেন।'

'তা করুক না।' মুখ ফিরিয়ে নিল সুকান্ত। 'সী ইজ ফ্রি টু ম্যারি—'

'হ্যাঁ। দেশে দেশে কলত্রানি। কিন্তু বরেন এমন একখানা ভাব করছে যেন মস্ত এক দাঁও মেরেছে—'

'কেন, আছে কী ওর মধ্যে?'

'কার মধ্যে?'

'ঐ তোর, কী না-জানি নাম— কাকলির মধ্যে।' সঘৃণ কটাক্ষ করল সুকান্ত: 'ও তো নষ্ট।'

'নষ্ট?' ভিন্ন অর্থে চমকে উঠতে চাইল দীপঙ্কর।

'হ্যাঁ, নষ্ট।' সম্যক অর্থে আরূঢ় করতে চাইল সুকান্ত। সঙ্গে আরো দুটো বিশেষণ জুড়ল: 'দষ্ট। চর্বিত।'

'তা, গরুরাই তো চর্বিত-চর্বণ করে।' মৃদু স্বরে হাসল দীপঙ্কর: 'মূর্খরাই তো পরের বউকে বিয়ে করে জাঁক করে বেড়ায়।'

'পরের ব্যবহৃত বউকে।' সংশোধনী জুড়ল সুকান্ত। উত্তেজনায় জোরালো শোনাল কণ্ঠস্বর।

'এই, আস্তে।' যদিও আফিসে ঠিক রবেনের পাশের ঘরেই এরা এখন বসে নেই, তবু কে জানে, দেয়ালের কান আছে, পিঁপড়ের মত কথা হাঁটে অলক্ষ্যে, তিলকে তাল করে শুনতে পারে রবেন। শুনলে, আর যাই হোক, রাগের মাথায় চাকরিটা না খসায়। বউ গেলে বউ পাবে, কিন্তু চাকরি গেলে চাকরি দূরস্থান।

'বা, আস্তে কেন? তুমি বলছ দাঁও মেরেছে এমনিই এক ব্যাপার। তা হলে তো উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি দেওয়াই সমীচীন।'

'না। তুষ্ট করেছ তুষ্টই করে যাও।' দীপঙ্কর গম্ভীর হল: 'চটিয়ে লাভ নেই। চাকরিটা না যায়।'

'গেলে যাবে।' হাল ছেড়ে দিল সুকান্ত।

'এ বউ নয় যে গেলে যাবে বলে হাত তুলে নেবে—'

'আমার বউ গেল কোথায়?' তপ্ত হয়ে উঠল সুকান্ত: 'আমি তো তাকে ফেলে দিয়েছি। ছুঁড়ে দিয়েছি জানলা দিয়ে। আমার তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর ও কুড়িয়ে নিয়েছে। ছিবড়ে কুড়িয়ে নিয়েছে। তুমি বলছ ঐ ছিবড়ে নিয়েই ওর দেমাক!'

'কেন নয়? অমুকের ডিভোর্সড স্ত্রীকে বিয়ে করেছি এও আজকাল এক জলুস। আগে আগে শুনেছি নিজের স্ত্রীতে পরিচিত, প্রসিদ্ধ হত স্বামীরা। আধুনিক কোনো কোনো স্বামী— তাদের গো-স্বামী বলতে পারো— পরের স্ত্রীতে, মানে, পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীতে, তকমা আঁটে। অমুক স্ত্রীলোকের স্বামী শুধু এই আখ্যায় সুখ নেই, অমুকের বর্জিত স্ত্রীর স্বামী এই পরিচয়ে সুখ। শুধু সুখ নয়, গৌরব। ভাবখানা এই, যেন কত বড় আবিষ্কারক। পূর্বতন স্বামী মূর্খ, অকিঞ্চিৎ, তাই ধরতে পারে নি স্ত্রীর তাৎপর্য। আমি পারঙ্গম, বুঝতে পেরেছি ঠিক-ঠিক মহিমা, তাই গজমুক্তার হার দাঁতে না কেটে গলায় পরেছি। এমনি ভাবের থেকে সমাজের কাছে মূল্য নেবার চেষ্টা, ডঙ্কা মেরে বেড়ানো।' বিদ্রূপের ঝাঁঝ মেশাল দীপঙ্কর।

'বেড়াক ডঙ্কা মেরে।' সুকান্ত উদাসীনের মত বললে।

'ভাবখানা এই, সুকান্তটা অপোগণ্ড, সাধ্য নেই কাকলির মানে বোঝে, তার মান রাখে। তাই আমি, বিদগ্ধ ও বিদ্বান, প্রবল ও সমর্থ, ওকে নিয়ে এসে ওর যোগ্য আসনে বসিয়েছি। তা ছাড়া নীচ সুকান্তর ঘরে যে অবহেলা ও অবিচার ওকে সহ্য করতে হয়েছে তারও নিরাকর্তা আমি। এমনি এক ঢাক পিটিয়ে সমারোহ করা।'

'তাতে আমার আপত্তি কী! যে ঢাকে এত শব্দ সে আমারই বর্জিত এই স্তব্ধতাই আমার চরম উত্তর। আর, অনেক সময় জানো তো,' স্নিগ্ধ চোখে তাকাল সুকান্ত: 'ঢাকের বাজনা থামলেই মিষ্টি। কিন্তু, কিন্তু—' ম্লান হাসল এখানে: 'এত কথা তুমি জানলে কি করে?'

'এত কথা মানে? কথা তো খুবই সামান্য।'

'হ্যাঁ, অতি সামান্য কথা। মানে ওদের বিয়ের কথা। ওরা বিয়ে করছে এ তোমাকে বললে কে?'

'বা, কাকলিই বলেছে।'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?'

'বা, আমাদের বাড়ি এসেছিল যে। প্রায়ই তো আসে।'

আসুক। এতে কার কী বলবার আছে? কেন আসে—এতে কারই বা কী কৌতূহল!

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সুকান্ত। পরে হঠাৎ বললে, আশ্চর্য, মুখ দিয়ে কথাটা এসে গেল অজানতে; 'তা হলে বেশ আনন্দেই আছে।'

'তা আর বলতে। কত বড় স্বামী!'

'হ্যাঁ, এই নিয়ে কারু কিছু বলবার-কইবার নেই। সমাজে-আইনে সে এখন স্বাধীন, যাকে তার মন চায় তাকেই সে বিয়ে করতে অধিকারী। তাই করুক।' সহসা সমস্ত মন তুলে নিল সুকান্ত: 'ও সুখী হোক, শান্তি পাক।'

'কিন্তু যদি এই কাণ্ডটা ইন ওয়েডলক ঘটত?' দীপঙ্কর উস্কে দিতে চাইল।

'তার মানে?'

'যদি, যদ্দিন তোমাদের বিয়েটা ছিল, তার মধ্যে ঘটত এই দুষ্কাণ্ড?'

'মানে, বলতে চাও, আদালতে বিচ্ছেদের কারণ যেটা বলা হয়েছিল সেটা ছলনা না হয়ে যদি বাস্তব হত?'

'হ্যাঁ, বর্জিত হবার পরে নয়, বিবাহিত থাকবার মধ্যেই, যদি ঘটত এই অভিচার?' দীপঙ্কর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল।

'তা হলে? তা হলে শঙ্কর মাছের লেজের খোঁজ করতাম।'

'সে লেজে কাকে সংবর্ধনা করতে?'

'নিশ্চয়ই নারীকে নয়। পুরুষকে। যে আমার অধিকারকে লুণ্ঠন করতে এসেছে সেই আততায়ীকে।'

'এখনো তো আরেকবার খোঁজ করলে পারো।'

'না, না, এখন আর আমার অধিকার কোথায়? দাড়ি কামিয়ে ফেলবার পর সে দাড়িতে আর অধিকার থাকে না।'

'আহা, তোমার প্রাক্তনীর কথা কে বলছে?'

'তবে কার কথা বলছ?'

'চাকরির কথা বলছি।' দীপঙ্কর ষড়যন্ত্রীর মত ঝুঁকে এল সামনে: 'দেওয়া চাকরি যদি আবার ফিরিয়ে নেয় তবে—'দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষল দীপঙ্কর। হাতের মুঠো দৃঢ় করল।

ক্ষীণকণ্ঠে হাসল সুকান্ত। বললে, 'এর জন্যে চাবুক চলে না। যদি চলেও তাতে চাকরি হয় না, শ্রীঘর হয়।'

'তুমি একটা কাওয়ার্ড।'

'তা যদি বলো, মেনে নেব।' নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'না হলে মামলা করো। আমি যেমন করেছিলাম।'

'তুমি কোত্থেকে টাকা পেয়েছিলে জানি না, কিন্তু আমার টাকা নেই। কেউ সাহায্য করবার নেই। আমি একা, বিচ্ছিন্ন—' নিজেই নিজেকে সহসা চাবুক মারলে সুকান্ত, অবসাদ থেকে তুলল ধাক্কা মেরে: 'আসল কথা, মামলা ব্যাপারটাতেই কেমন একটা ঘেন্না ধরে গেছে। আদালত তো নয়, নরককুণ্ড। যেখানে গোটা একটা মিথ্যা নিরেট ইমারত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—'

'তা আদালতের দোষ কী! ইমারতের কারিগর তো তোমরা।'

'না, কারু দোষ ধরছি না।'

'মামলাও যদি না করো তা হলে করবে কী?'

'একা মানুষ, করবার দরকারই বা আছে কী! লেখাপড়া নিয়ে থাকব।'

'মানে ডঃ হবে?'

প্রথমটা বুঝতে পারে নি সুকান্ত।

'আগে ডাঃ ছিল এখন ডঃ হয়েছে। ডক হয়েছে। ঠিকই হয়েছে। ডকে জাহাজ থাকে তেমনি তোমরাও বিদ্যের জাহাজ পুষবে এক গাদা—'

'সেসব দুরাকাঙ্ক্ষা আর নেই। স্কলারশিপ-টিপ কবে গেছে।'

'আর সেই যে—সেদিন যে বলেছিলে—' দীপঙ্কর মনে করিয়ে দিতে চাইল।

'কী বলেছিলাম?'

'সেই বিনতার কথা—'

'হ্যাঁ, বেচারা, তাকেও বলব। নইলে সে যদি আসে আর মাঝপথে হঠাৎ

দেখে আমার চাকরি নেই, তাকেই খাওয়াতে হচ্ছে আমাকে, তার কমিটমেণ্টস পুরোপুরি রাখতে পারছে না, তা হলে, কে জানে, হয়তো বিরক্ত হবে, খেপে যাবে—'

'হয়তো আবার কোর্টে ছুটোছুটি করবে!' হাসল দীপঙ্কর।

'বলা যায় না।' হাসল সুকান্ত: 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তেমনি ডিভোর্সে ছুঁলে আঠারো বিয়ে। তাই তাকে আগেই বলে রাখব।'

'কী বলে রাখবে? বাঘের কথা?'

'না। বলে রাখব সে যে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে সেটা তাসের ঘর। এক ফুঁয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবার মত। এক উপরিয়ালার মর্জির উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত বনেদ টলমল করছে—'

'না, হবে না কিছু বলতে।' দৃঢ় হল দীপঙ্কর।

'হবে না?'

'না। এখনো তো যায় নি চাকরি। বিনতাকে তবে মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দেবে কেন?'

'যায় নি, যাবে অচিরে। ভয়ের কী আছে? তবু সম্ভাবিত বাস্তবের ছবিটা আগে থেকে দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো নয়?'

'না, নয়। কেননা চাকরি যাবে না। যেতে দেব না আমরা।' উঠে দাঁড়াল দীপঙ্কর।

'এ তুমি কী করে বলছ? এখানে ইউনিয়ন নেই, স্ট্রাইক নেই, শঙ্কর মাছের লেজ নেই, ঘুষ পাঠাবার মত লালস নেই—নির্ঘাত বিদায় হয়ে যাব।'

'না। যে আদালতকে নরককুণ্ড বলে বিদ্রূপ করতে চেয়েছ সেই আদালতই আবার হৃতসর্বস্ব একলা মানুষের আশ্রয়। সুতরাং আর কিছু আপাতত না পারি মামলা করব তোমার হয়ে। তোমার টাকা না থাকে সে টাকা আমি জোগাব, আমরা জোগাব। আর সে মামলায় আমরাই জিতপার্টি—' দরজার কাছে এগিয়ে গেল দীপঙ্কর। ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'সুতরাং বউ নিয়েছে নিক, চাকরি নিতে দেব না।'

ক্লান্তের মত নিজের একলা ঘরে, হোটেলে শুয়ে আছে সুকান্ত! টুক টুক করে দরজায় আঙুলের গিঁটের মৃদু-মৃদু শব্দ হল।

'এসো, দরজা খোলা আছে।'

একটা চিতাবাঘের মত ঝলমল করতে করতে দ্রুত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল

বিনতা। ভীষণ চমকে উঠেছিল সুকান্ত। এতদূর চমকেছিল যে, উঠে বসেছিল বিছানায়। পরমুহূর্তেই হাসল আপন মনে। ভঙ্গিটা শিথিল করে দিল। কাকলি কি কখনো অমনি, অতখানি সাজগোজ করে? নাকি তার সাজগোজে স্মর-স্পৃহার স্পর্ধা থাকে?

ছিটকিনির উপর দুঃসাহসী হাত রাখল বিনতা।

'ছিটকিনি দিতে হবে না। দরজাটা শুধু ভেজানো থাক।' বিছানা থেকে নামতে নামতে বললে সুকান্ত।

·৪৫

সেই থেকে, সুকান্তের বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আসার পর থেকেই, বিনতা তার পিছু নিয়েছে। ছি ছি, অমনি করে ভাবছে সুকান্ত? পিছু নিয়েছে? তুমি নিজে পথ না দিলে সাধ্য কী কেউ পিছু নেয়! পিছু নিয়েছে তো বুক ঠুকে রুখে দাঁড়াও না। সমক্ষসংঘাতে দাও না তাড়িয়ে।

পিছু নিয়েছে! যে দুর্বল, যার প্রতিরোধের ক্ষমতা কম, রোগ তারই পিছু নেয়।

হোটেলে আসার সামান্য কয়েক দিন পরেই একদিন বিনতা এসে হাজির। বন্ধ দরজার উপরে আঙুলের গিঁটের মৃদু-মৃদু শব্দ। যেন চমকে দেবে তারই অনুচ্চ গভীর ইশারা।

চমকে দেবারও অনেক স্তর আছে, পাপড়ি আছে। একেকটি পাপড়ি মেলো, একেকটি চমক ফোটাও। চমক ছাড়া জীবন কী! কবিতা কী!

'আরে, আপনি?' দরজা খুলে চমকে উঠেছিল সুকান্ত। সংকীর্ণ বেশবাস বিস্তীর্ণ করতে-করতে বলেছিল, 'ভাবতেই পারি নি।'

'একেবারে ভাবতেই পারেন নি!' কটাক্ষ করবার চেষ্টা করল বিনতা।

'কী করে পারব বলুন। সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, নিলুম না সাহায্য। ভাবলুম চটেই গেলেন বুঝি।'

'সাহায্য?' চোখ দুটো একটু কপালে তোলবার চেষ্টা করল বিনতা: 'আপনার সেই মামলার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। দেখলেন তো আপনার বিনা সাহায্যে, মানে, আপনার অপ্রতিবাদিত্বেই, কেমন ডিক্রি পেয়ে গেলাম।'

'তাই তো অভিনন্দন জানাতে এসেছি।'

'অভিনন্দন?'

'হ্যাঁ, যে মুক্তি খুঁজে নিতে পেরেছে সে-ই অভিনন্দনের যোগ্য।'

একটু বা স্থগোল চোখে তাকাল স্থকান্ত: 'আপনি তা হলে আমার পক্ষে? আপনার বন্ধুর পক্ষে নয়?'

'আমি দু-জনেরই পক্ষে। কেমন দু-জনেই আপনারা সংগ্রাম করে মুক্ত হয়েছেন—আমি স্বাধীনতার পক্ষে। আমি স্বাধীনতাকেই সংবর্ধনা করছি। স্বাধীনতা জিন্দাবাদ।'

'কী আশ্চর্য, বস্থন।'

ভঙ্গিকে বিলোল করে, চেয়ারে না গিয়ে, সোফায় বসল বিনতা।

দরজা বন্ধ হল না। ভেজানোও না। শুধু পর্দাটা আধখানা টেনে দিল স্থকান্ত।

চুলটা ঠিক করতে-করতে বিনতা বললে, 'এখন কাকলি তার মনোনীত জীবনে গিয়ে ঢুকবে, আপনি আপনার।' বহুপ্রাজ্ঞের মত সূক্ষ্ম রেখায় হাসল: 'অতীতে একবার সাহায্য নেন নি বলে ভবিষ্যতেও নেবেন না এ আপনি বলতে পারেন না জোর করে।'

'না, তা বলতে পারি কই? কেউ পারে না। কোনো অহংকারই টেঁকে না সংসারে।'

'হ্যাঁ, জীবন প্রকাণ্ড, দড়ি ফেলে আর কোনোদিন তার সরজমিন তদন্ত হয় না।' বিনতাও কথায় তত্ত্বের স্থর আনতে পারে: 'কেউ মাপজোক করে বার করতে পারে না তার সরহদ্দসীমানা। যে হারাবার নয় সেই হারিয়ে যায় আর যে স্বপ্নের অগোচর সেই একদিন অনায়াসে হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসে।' তেমনি সেও এসেছে এমনি হেলে-দোলে নড়ে-চড়ে উঠল বিনতা।

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল স্থকান্ত।

'কী করে আপনার ঠিকানা পেলাম জানতে চাইলেন না তো!' মদালসার মত চোখ করে তাকাল বিনতা।

'সত্যিই তো, আশ্চর্য, একদম মনে আসে নি। সত্যি, কী করে পেলেন ঠিকানা?'

'যার জন্যে আমরা ব্যাকুল সেই ঈপ্সিতকে যদি পাওয়া যায়,' বিনতা আবার তত্ত্বের স্থর আনল: 'তবে তার সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত কৌতূহল অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। সে এসেছে, তাকে পেয়েছি, শুধু এই কথাটাই একমাত্র হয়ে ওঠে।'

'সত্যি, কী করে পেলেন?'

'অনুমান করুন।'

'আমার আফিসে গিয়েছিলেন?'

'আপনার আফিস? সে আবার কোথায়?'

'তবে বরেনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'আমি কি কাকলি, যে বড়লোকের ভজনা করব?' অন্তরে কোথায় একটা জ্বালা আছে বিনতার, কণ্ঠস্বরে উঠে এল।

'তবে?'

'পারলেন না তো অনুমান করতে। আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম।'

'আমার বাড়ি!' ধুলিসাৎ করে দিতে চাইল সুকান্ত।

'মানে আপনাদের বাড়ি।' রাস্তার নাম-নম্বর বললে বিনতা।

'গিয়েছিলেন?' পলকের জন্যে প্রফুল্ল না হয়ে পারল না সুকান্ত। বললে, 'কী দেখলেন?'

'দেখলাম তেতলায় ঘর উঠছে।'

'ওসব ঘরদোরে আমি ইনটারেস্টেড নই।'

'আমিও না।' নিস্পৃহ মুখে সায় দিল বিনতা: 'একটা মৌমাছির চাকে নিরর্থক ফোকর বাড়ছে তাতে কার কী মাথাব্যথা!'

'ও তো বাইরে থেকে দেখলেন। ভিতরে কিছু দেখলেন?'

'দেখলাম।' মিটিমিটি হাসতে লাগল বিনতা।

'কী দেখলেন?'

'দেখলাম আপনার ঘরে আপনার টেলিফোনটা নিয়ে সবাই কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে।'

'কী সর্বনাশ!' আতঙ্কে মুখ কালো করল সুকান্ত: 'ওটা এখনো ডিসকনেকটেড হয় নি বুঝি? আফিস তো জানে আমি এখানে। তবে?' তারপর চোখ ফেরাল বিনতার দিকে: 'কে, কারা কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে?'

'আপনার বউদি বন্দনা আর কাকিমা বিজয়া। যেখানে যা পাচ্ছে, সম্ভব-অসম্ভব দূর-অদূর সমস্ত সম্পর্কের বাড়িতে টেলিফোন করে চলেছে। কখন নিয়ে যায় ঠিক নেই, মাগনা পাওয়া গিয়েছে, মনের সুখে চাকতি ঘোরাও—ডায়াল করো। শেষকালে বিজয়া এক অপরিচিত বাড়িতে রিং করে বসল। বললে, বাড়ির মেয়েদের চাই। মেয়ে একজন এসে বললে, কী চাই? বিজয়া বললে, দুপুরবেলা ঘুম আসছে

না, তোমার সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে চাই ভাই। ভালো আছ সকলে? বলছে আর হাসছে।'

'কী সর্বনাশ! মা কিছু বলছেন না?'

'তিনি কী বলবেন! তাঁকে বলা হয়েছে নিরভিভাবক ফোন, পয়সার খিরকিচ নেই, তাইতেই তাঁর শান্তি। শুধু একজনই যা একটু বাধা দিচ্ছিল—'

'একজন—কে একজন?'

'সেণ্টু।'

'কেন, সেণ্টু কী বলছিল?' চোখমুখ উজ্জ্বল হল সুকান্তর।

'ও নিজের স্বার্থেই বাধা দিচ্ছিল। মানে ওও চাচ্ছিল ফোন করতে। আপনাকে ফোন করতে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, বারে-বারে ও জানতে চাচ্ছিল কাকা কবে কাম্মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।'

'ওকে বুঝি করতেই দিচ্ছিল না ফোন!'

'আপনার মা ওকে বারে-বারে সংশোধন করছিলেন—'

'সংশোধন?'

'হ্যাঁ, বলছিলেন, কাকা আর কাম্মাকে নিয়ে ফিরবে না, কাকিমাকে নিয়ে ফিরবে।'

সস্মিত চোখোচোখি হল দু-জনের।

'ভিতরের এত খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে?'

'একেবারে ভিতরে ঢুকতে পেলুম যে। শুধু বাড়ির ভিতরে নয়, আপনার মার হৃদয়ের ভিতরে। আমিও জাদু জানি।'

'জাদুটা কী?'

'আমি দেখতে সুন্দর।' বলে নিজের মনেই হাসল বিনতা: 'শুধু এতেই হত না। আমার ব্যবহার নম্র, মৃদু, লজ্জালু। শুধু এতেও হত না। আমি আপনার বন্ধু—পড়তুম একসঙ্গে—'

'পড়তেন?' প্রতিবাদ করে উঠল সুকান্ত।

'ওটা বানালুম। মাঝে মাঝে কিছুটা বানিয়ে বলতে হয়—'

'তা হয়।' সায় দিল সুকান্ত: 'কিন্তু কিছুটা।' সঙ্গে আবার সাবধান করে দিল। 'যেটা বিশ্বাস্য সে ক্ষেত্রেই বানানো চলে। আসলে আমি হয়তো আপনার চেয়ে বয়েসে কিছু বড়—'

'বয়েস মায়া। আত্মার বয়েস নেই।'

'আকাঙ্ক্ষারও নেই। তা ছাড়া, মেয়েদের বয়েস কে ধরে? আসলে চল্লিশ, দেখায় চব্বিশের মত। তাই আমি যে আপনার একবয়সী, পড়তুম একসঙ্গে— এ বিশ্বাস করতে মায়ের বেগ পেতে হল না। আর যখন আপনার সহপাঠী তখন আমি কাকলিরও সহচরী। আর, আমি আর কাকলি যে বন্ধু, এক হস্টেলে থাকি, এ তো সত্য কথাই।'

'ও কথা মা তুললেন, না আপনি তুললেন?'

'আমি তুললাম। আর তুলেই আছাড় মারলাম।'

'আছাড় মারলেন?'

'হ্যাঁ, ঠেসে নিন্দে করলাম। যাকে তুলো-ধোনা বলে তেমনি।'

'বা, নিন্দে করতে গেলেন কেন?'

'নিন্দে করব না? কী একখানা প্রশংসার কাজ করে গেছেন শুনি? একটা সংসার তছনছ করে দিয়ে চলে গেল! খুব ভালো কাজ?'

'বা, আমিই তো তাকে তাড়িয়ে দিলাম!'

'তা তো দেবেনই। আর নিন্দে না করলেই বা আমি মায়ের মন পাই কী করে?' সরল মুখে হাসল বিনতা: 'মন-প্রাণ ঢেলে নিন্দে করলুম আর মা আমাকে নিমেষে আপনজন বলে স্থির করলেন। আপনার ঠিকানা দিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন, যেন আবার আপনার খবর নিয়ে এসে তাঁকে জানিয়ে যাই। যোগাযোগের সেতু করলেন আমাকে।'

'যাকে বলে লিয়াজঁ অফিসর।' মুখ টিপে হাসল সুকান্ত: 'কথাটার কিন্তু আরেকটা মানে আছে। মানেটা খুব সম্ভ্রান্ত নয়।'

আদৌ নয়। মানেটা খারাপ। অবৈধ। কিন্তু, যাই বলুন, ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন।' কপালে হাত তুলে সেই অনুপস্থিতের উদ্দেশে নমস্কার করল বিনতা।

'বাঁচিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে আপনার মামলায় ব্যভিচারিণী সাজতে হয় নি, আপনার মামলার বাইরে আমি যেমন ভদ্র, যেমন বৈধ, যেমন পবিত্র, তেমনি ভদ্র আর বৈধ আর পবিত্র হয়েই দেখা দিয়েছি। আমার পথ ঘুরপথ নয়, আমার পথ সরল সদরের পথ। মা কি আর সোজা আপন বলে ভাবলেন! ঠিকানা দিলেন আপনার। তলব তাগাদা করার সুবিধে করে দিলেন!'

ইচ্ছায় আর এর চেয়ে কী বেশি অভিব্যক্ত হওয়া যায়! সুকান্ত চুপ করে রইল।

চা আর চিংড়ির কাটলেট খেয়ে চলে গেল বিনতা। বললে, 'আবার আসব। মার কথামতই আসতে হবে।'

'মার কথামত!'

'বেশ তো, বলুন না, আপনার কথামত! তা হলে তো আরো ভালো!'

আবার কদিন পরে এল ঠিক বিনতা। নিজের হাতেই এবার সে পর্দা টানল। আর আধখানা নয়, সম্পূর্ণ।

'এ কি, ফোন পান নি এখনো?'

'না। হোটেলটা পার্মানেণ্ট রেসিডেন্স নয়, আপত্তি করছে আফিস।' বললে সুকান্ত।

'ঠিকই করছে।' চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিয়ে বসল বিনতা।

'মোটেই ঠিক নয়। হাইলি টেকনিক্যাল। সংসারে কিছুই পার্মানেণ্ট নয়। আর আমি যেখানে থাকব সেটাই আমার রেসিডেন্স।'

'তাই বলে জঙ্গলে মাচা বেঁধে থাকবেন বা নদীতে নৌকোর পাটাতনে, ওটা আপনি মানুষের আবাস বলতে পারেন না।' দুই চোখে তিরস্কার ভরে তাকাল বিনতা: 'হোটেলের একক ঘর একটা কী! পর্বতের গুহাও এর চেয়ে ভালো। এর চেয়ে নির্বিঘ্ন।'

'না, না, একা লোকের পক্ষে হোটেলই আইডিয়াল।'

'একা লোকের পক্ষে! কিন্তু কোনোদিন যদি গেস্ট আসে?'

'তেমন গেস্ট এলে, এখানে, এ ঘরেই থাকবে।'

'এক রাত্রির গেস্ট নয়, সারা জীবনের গেস্ট।'

'সারা জীবন ধরে থাকলে সে আর গেস্ট নয়, সে গোস্ট।' হাসল সুকান্ত: 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তেমন ভূতে আর আমাকে ধরবে না।'

'মোটেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। ভূতের হাতে ধরা না দিলে নিজেই কখন ভূত হয়ে যাবেন। সেটাও হতে দেওয়া ভয়ের কথা।'

'সব সময় ভূতই ভয় দেখায় না, মাঝে মাঝে ভূতও ভয় পেয়ে সটকান দেয়। তেমনি আমাকে দেখে ভয় পাবে ভূত।' একটু বা আত্মস্থ হল সুকান্ত: 'আমার অনেক দোষ। আমি অসহিষ্ণু, সন্দিগ্ধ, ক্ষুদ্রদৃষ্টি। আমাকে দেখে ভূতের সাবধান হওয়া দরকার।'

'আপনি তো আমাকে সাবধান করছেন। আমি কি ভূত?' ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল বিনতা: 'দেখুন, ছুঁয়ে দেখুন, আমি কি অশরীরী?'

হ্লাদিনীকে দেখ, কিন্তু খবরদার, ছুঁয়ো না। শুধু দেখলেই আর আকুল হবে না, কিন্তু ছুঁয়েছ কী, পড়ে গিয়েছ। সেই শক্তি তোমাকে ছিন্ন করেছে।

সুকান্ত দ্বিধা করতে লাগল।

'কী, বলুন, আমি কি ভূত?' পরাস্তের মত বসে পড়ল বিনতা। কিন্তু পড়েও মাটি ছাড়ল না। বললে, 'আমি ভূত নয়, আমি ভবিষ্যৎ। আর ভবিষ্যতের জলবায়ুতে আপনার দোষত্রুটি কিছু থাকবে না। আপনি উদার হবেন, সহিষ্ণু হবেন, চোখের থেকে ক্ষুদ্রতা আর সন্দেহ চলে যাবে। কী জানি সেই গানটা— নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো—'

'বলিহারি। আর যখন একদিন গর্জে উঠে হুকুম করব, বেরিয়ে যাও বাড়ি ছেড়ে—তখন, তখন কী করবেন?'

এমন প্রত্যক্ষ বাস্তবের সুরে উচ্চারণ করল কথাটা যে শুনেই মুহূর্তে বিনতা পাংশু হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল অভিনয়টা কৃত্রিম, তার ইঙ্গিত যেহেতু বর্তমানে নয়, অতীতে। বুঝতে পেরেই ম্লান রেখায় হাসল। বললে, 'অমন একটা গর্জনের অবকাশই রাখব না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে যে তাড়াবেন, আগে বাড়ি হোক। মার কাছে যে গিয়েছিলুম, মারও সেই কথা।'

'কী কথা?' চোখ বড় করল সুকান্ত।

'বললেন, ও যদি সংসারে ফিরে না আসতে চায়, নাই আসুক। ও আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকুক। শুধু একখানা বাড়তি ঘর রাখে যেন আমার জন্যে। আমি মাঝে মাঝে যাব।'

'আর ঝগড়া করব।'

'মোটেই ঝগড়া করবে না। ঝগড়াটা অনেকটা হাঁচির মত। এলার্জি থেকে হয়। গোড়াতে সেটা করেক্ট করে নিতে পারলেই পরিষ্কার। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তো থাকবেন। অসুবিধে বুঝলে নিজেই চলে যাবেন অন্য বাড়ি। সে ভাবনা ভাবতে হবে না আপনাকে। সেসব আমি বুঝব। টেকনিক আমার। আপনি শুধু একটা বাড়ি নিন—আই মিন—ফ্ল্যাট নিন।'

'আমি বরাবরই ফ্ল্যাটের পক্ষপাতী। কিন্তু—' হঠাৎ থেমে পড়ল সুকান্ত।

'কিন্তু—কিন্তু কী?'

'কিন্তু, ফ্ল্যাটটা খুব নিরাপদ নয়। একা হোক ফাঁকা হোক সব সময়ে গুণ্ডামির ভয়।'

'আহা, ভয়েই মোলো।' টিটকিরি দিয়ে উঠল বিনতা: 'জীবনের প্রতি পদে ভয়, তাই বলে জীবনধারণই করব না? দুর্ঘটনার ভয়, তাই চড়ব না ট্রেনে-প্লেনে, হাঁটব না রাস্তায়? সংসারে-শ্মশানে কত দায়িত্বের ভয়, তাই বলে নেব না ব্রহ্মস্বাদ?'

'একটু ভয় থাকা ভালো।' ভয়ে-ভয়ে সুকান্ত বললে।

'সে তো মিষ্টি।' ইঙ্গিতটাকে গহনে নিয়ে গেল বিনতা। বসল ফের চেয়ারে। 'বেশি ভয় হলেই সমস্ত নোনতা। তা, আমি বলি কি, এই গিরি-গুহা ছেড়ে সংসারী ফ্ল্যাট নিন—'

'কত টাকার মধ্যে?'

'আমাদের দু-জনের মাইনে একত্র হলে অনায়াসে আড়াই শো পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।'

এরকমভাবেও পারে লোকে বলতে। সুকান্ত এক নিশ্বাস থমকে গেল। আপনার কত মাইনে—জিজ্ঞেস করতে লোভ হল একবার। কিন্তু দমন করে স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আপনিও থাকবেন বুঝি সেই ফ্ল্যাটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মামলায় ব্যভিচারিণীর শর্তে নয়—উঃ, ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন—থাকব সম্মানিত স্ত্রীর দাবিতে। আমি নইলে মায়ের ছেলেকে রক্ষে করবে কে!'

যেন মরিয়ার মত বলছে। এরকমভাবে খোলাখুলি বলার মধ্যেও দীপ্তি আছে। মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলো সুকান্ত। ঢোঁক গিলে বললে, 'তা হলে তো ফ্ল্যাট নেওয়া দরকারই একান্ত।'

'এবং যথাশীঘ্র। আপনি খুঁজুন, আমিও খুঁজছি।'

'আমি আর খোঁজাখুঁজিতে নেই।'

'নেই?'

'না। আপনি এলার্জি বলছিলেন না? আমার লেথার্জি। আমাকে লেথার্জিতে পেয়েছে। আলস্যে পেয়েছে। জড়ত্বে ধরেছে।'

'খুব খারাপ রোগ।'

'যাকে বলে, স্লিপিং সিকনেস।' হতাশের মুখ করল সুকান্ত: 'ব্যবসাবাণিজ্য সব দেউলে হবার দাখিল।'

'ভয় নেই, সারিয়ে দেব। ব্যবসাতে স্লিপিং-পার্টনার পেলেই স্লিপিং সিকনেস

সেরে যাবে।' উচ্ছল কণ্ঠে বললে বিনতা, 'বেশ, আমিই একা খুঁজব। লোক লাগাব।'

'স্থানের সঙ্গে-সঙ্গে পাত্রও যদি একটু খোঁজেন!' ভয়ে-ভয়ে তাকাল সুকান্ত!

'আর সেই সঙ্গে কালও খুঁজব না?'

'আহা, কাল তো অকাল। সমস্ত খোঁজাখুঁজির বাইরে।'

'দেখুন আপনাকে যদি আলস্যে পেয়ে থাকে আমাকে পেয়েছে ক্লান্তিতে—' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ল বিনতা।

'মানে আমাকে যদি জড়ত্বে পেয়ে থাকে আপনাকে পেয়েছে বড়ত্বে। মানে আপনার বড় হবার বয়েস হবার অধৈর্যে।'

'যা বলেন।' আরো পাণ্ডুর শোনাল বিনতাকে।

'তাই যা পেয়েছেন হাতের কাছে, তাই চাচ্ছেন আঁকড়াতে। কিন্তু আমি কি একটা পাত্র?

'আপনি তবে কী?'

'আমি একটা খুরি।'

'কথা কইব না আপনার সঙ্গে।'

'খেলো, সস্তা, ঠুনকো। অল্প ধরে, তার উপরে, ব্যবহার হয়ে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়।'

'অল্প ধরে! আপনার কত মাইনে, কত বড় চাকরি, কত আপনার লেখাপড়া, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি—'

'বলুন কত আপনার উনুনের ছাই!'

'আর যারা এক ব্র্যাকেটে বিবাদী হয়, যারা অবৈধে তৃপ্তি খোঁজে তারাই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যাক, আমার নির্বাচন আমি বুঝব।' টান-টান হয়ে বসল বিনতা: 'তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।'

অথচ সে নিজে নির্বাচ্য কিনা, সে প্রশ্নে এ পক্ষের মাথা স্বেদাক্ত হতে পারে কিনা, তা নিয়ে এতটুকু সংশয় প্রকাশ নেই। এতটুকু বিনয়বয়ন নেই। নেই বা এক তন্তু লজ্জার কুয়াশা। যেহেতু উনি শিক্ষিকা অভিভাবকতুল্যা, ওঁর নিক্ষেপ মানতেই হবে। যেহেতু স্ত্রী আর স্বামীর বন্ধু এক ব্র্যাকেটে গিয়েছে, সেই হেতু স্বামী আর স্ত্রীর বন্ধুকেও এক ব্র্যাকেটে যেতে হবে। এই বুঝি বিধির বিধান। নিয়তির প্রতিশোধ

তবু, এত সব বিরাগ-বিরক্তির মধ্যে মনে পড়ল সুকান্তর—মনে পড়াকে সে

করে রোধ করতে পারে—কাকলি যেন প্রথমেই এমনতর ছিল না, একটু-বা মৃদু ছিল, নম্র ছিল, ধিমে আঁচের ছিল, ছিল বা একটু লজ্জার-লতা-পাতা। এমন তপ্তখোলা ছিল না।

কিন্তু যাই বলো, উগ্রচণ্ডী স্পষ্টতার আকর্ষণও কম নয়। লজ্জার মত নির্লজ্জতাও সুন্দর হতে জানে।

কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল সুকান্ত। বললে, 'আজ কী খাবেন বলুন ?'

'আজ উঠি। আজ কিছু খাব না।'

'তা কি হয় ? আজ কিছু কারি-কোর্মা সিদ্ধ-সিক্ত খাওয়া যাক। আজ আর শুকনো নয়। কী বলেন ?'

'মন্দ কী।' অনায়াসে মত বদলাল বিনতা : 'তা হলে রাত্রে হোস্টেলে আর কিছু খাব না।'

খেতে-খেতে সুকান্ত বললে, 'একটা কথা বলি।'

'বলুন।'

'আমাকে একবার মায়ের ছেলে বলছিলেন না ?'

'বলছিলুমই তো। আপনি তো মায়েরই ছেলে।'

'না, এবার আর মায়ের ছেলে নয়, এবার মায়ের বউ।'

ইঙ্গিতটা সহজেই বুঝতে পারল বিনতা। হেসে বললে, 'তা আর আমাকে বলতে হবে না।'

'সুতরাং মাকে বশীভূত করুন।'

'আর আপনাকে ?'

'আমাকে রশীভূত।' রজ্জুবদ্ধ হবার ভাব দেখাল সুকান্ত।

ঝোলে-মাংসে একমুখ হেসে উঠল বিনতা।

কদিন পরেই আবার সন্ধের দিকে হাজির।

নিজেই পর্দা টেনে বসল। বললে, 'আপনাদের বাড়ি থেকে আসছি। মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'কেমন আছে সকলে ?' উদাসীন স্বর আনল সুকান্ত।

'ভালো। ডেকে পাঠিয়েছিলেন পরামর্শ করতে।'

'পরামর্শ ?'

'হ্যাঁ, একগাদা মেয়ের ফোটো দেখাচ্ছিলেন, কোনটা আপনার জন্যে পছন্দ করা যায়।'

'একগাদা !'

'হ্যাঁ, লিজিয়ন ! ঘাসে-বসা, সিঁড়িতে-বসা, চেয়ারে-বসা এক রাজ্যের ছবি চিবুকে-গালে তাচ্ছিল্যের রেখা ফোটাল বিনতা : 'সব কলেজের ছুকরি। কেউ আয় করে না এক পয়সা, সবাই ব্যয়ের রঙমশাল। সবাইকে বাতিল করে দিলুম।'

'পথে বসালেন বলুন।'

'প্রায় তাই।' খিলখিল করে হেসে উঠল বিনতা। এবং উচ্চ হাসি আশেপাশে শ্রুতি-শোভন হবে না বিবেচনা করে দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিল : 'মাকে বললুম, এসব সুকান্তর পছন্দ হবে না। সুকান্ত চাকুরে রোজগেরে মেয়ে চায় প্রত্যেক বুদ্ধিমান স্বামীই চায়। আর প্রথমে যখন একবার তাই চেয়েছিল, দ্বিতীয়েও নির্ঘাত তাই চাইবে।'

'মা কী বললেন ?'

'বললেন, বেশ তো, সুকান্তর যদি তাই পছন্দ, তেমনি কাউকে বাছুক। আমি কিছু বলতে আসব না।'

'শেষে টাকা-পয়সা নিয়ে লাগবে !'

'না, এবার তাও লাগবে না। মনটা ভিজে আছে তো, তাই বললেন, যেভাবে ওদের খুশি সেইভাবে থাকবে, আয়-ব্যয় করবে, আমি কিছুই বলতে আসব না। ছেলের টাকা কি আর টাকা ? স্ত্রীলোকের স্বামীর টাকাই টাকা।'

'শাস্তির কথা। সেই সময় তাক বুঝে নিজেকে অফার করলেন না কেন ?'

'অফার—কিসের অফার ?'

'ঐ যে চাকরির দরখাস্ত লেখে,' হাসতে লাগল সুকান্ত, 'নোইং দ্যাট এ ভেকেন্সি হ্যাজ ফলেন আই অফার মিসেলফ অ্যাজ এ ক্যাণ্ডিডেট—'

বিনতাও হাসল সশব্দে। বললে, 'মোটেই ভেকেন্সি ফিল-আপ করতে যাচ্ছি না।'

'না, পদের, কোনো অঙ্গের শূন্যতা নয়, এ আত্মার শূন্যতা।' বিনতার চোখের দিকে তাকাল সুকান্ত : 'মাকে বললেন না কেন ?'

'আমি বলব ? বা রে, এ তো আপনি বলবেন।'

'হ্যাঁ, আমিই বলব।' খাটে হেলান দিল সুকান্ত : 'কিন্তু জানেন তো লেথার্জি—লেথার্জি—আলস্যই আমাকে পেয়ে বসেছে।'

'বা, এই ব্যাপারে আলস্য করলে চলবে কেন ?'

'না, বলব, বলব শিগগির। কিন্তু কবে বলব ? ও বাড়িতে তো আর যাই না—'

দু পা এগিয়ে এল বিনতা। শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাল। বললে, 'মাকে বলতেই বা

হবে কেন? হবে না বলতে। মা বলেছেন, সুকু এবার যাকেই নিয়ে আসুক, বুড়ি-ছুঁড়ি, ধলী-কালী, মেথরানী-রাজরানী, যাই হোক, তাকেই তিনি নেবেন হাসিমুখে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার উদ্যোগই বলবান হবে।'

'হবে।' সায় দিল সুকান্ত: 'আর কটা দিন যাক।'

'কেন, দেরি কেন? আপিলের মেয়াদ তো কবেই চলে গিয়েছে।'

'না, না, তার হিসেব কে করে?'

'তবে, আনন্দকে পিছিয়ে দেওয়া কেন?'

হাসল সুকান্ত। বললে, 'আনন্দের জন্যে দেরি করাতেও আনন্দ।'

'সব কিছুই তো তৈরি।' আরো এক পা এগুল বিনতা।

'শুধু এখনো ভালোবাসাই তৈরি নয়। তারই এখনো সাজগোজ হয় নি। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ হয়নি তার।'

'দেখি তার কতদূর হল!' দরজার দিকেই এগুল বিনতা: 'কিন্তু প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই কি তার প্রবেশ? আপনি ঠিক জানেন?'

'বোধ হয় নয়। কিছু পরেও হতে পারে।' আশ্বাস দিল সুকান্ত: 'আপনি দেখবেন বইটা?'

'আমি দেখেছি। এ নাটকে তার পার্টই নেই। ক্লান্তি, প্রতীক্ষা, প্রলোভন, প্রতিশোধ— এসবই এ নাটকের কুশীলব।'

'না, না, সেও আছে। হয়তো বা দেরিতে আছে। ভালোবাসার জন্যে দেরি করাও ভালোবাসা।'

বিনতা চলে গেল।

কিন্তু দেরি করল না। সাজগোজ করতে বসল। অগ্নিশিখাকে নগ্ন করে তোলার সাজ। দেখি জাগে কিনা, জ্বলে কিনা। একরাশ স্তূপীভূত আলস্যের খড় পুড়ে ছাই হয় কিনা নিমেষে।

ও মা, তুই কোত্থেকে? ধূসর ছায়া পড়ল আয়নায়। কী মনে করে? কার কাছে?

'তোর কাছে।' কাকলি স্বচ্ছ মুখে বললে।

'আমার দাঁড়াবার সময় নেই, বেরুচ্ছি এখুনি।'

'সে তো আমারও নেই। নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে।' কাকলি রুক্ষ হল।

'তোর সঙ্গে গাড়ি আছে?' উঃ, গডসেণ্ড। আমাকে একটু তবে দে না পৌঁছিয়ে।'

'কোথায় ?'

'সে দেখতেই পাবি।' ঠোঁট কুঁচকিয়ে হাসল বিনতা।

'তবু শুনি না।'

'এক হোটেলে।'

'কিন্তু এ কী বিচ্ছিরি সেজেছিস! আমাকে ডাকলি না কেন, সাজিয়ে দিতাম।'

'মানে শোধ তুলতিস। কিন্তু আমার তো সোহিনীর সাজ নয়, মোহিনীর সাজ।'

'তাই বল।' ফিরে দাঁড়াল কাকলি : 'এ সাজে গাড়ি চড়বি কী? ঢাকা একটা রিকশা করে চলে যা।' বলে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচে।

বারান্দায় এসে মুখ বাড়াল বিনতা। কই, গাড়ি কোথায়! পায়ে হেঁটেই গলিটা পার হয়ে যাচ্ছে কাকলি।

এ যেন তার সমারোহে আসা ছিল না, ছিল বা বুঝি প্রচ্ছন্নে আসা। এখন যদি সে, ক্ষণকালের জন্যে হলেও, ব্যাহত হয়ে থাকে, তাতেই বিনতা চরিতার্থ।

কিন্তু সুকান্ত সহসা এত ম্লান কেন? তার ঘরের আলোর পাওয়ারটাই কি আজ কমে গেছে?

'জানেন কাকলি মিত্রকে দেখলুম।' বললে বিনতা। যদি অন্তত এ কথাটা শুনে সুকান্তের রক্ত লাল হয়ে ওঠে।

সুকান্ত উড়িয়ে দিল কথাটা। বললে, 'আমি আপনাকে দেখছি।'

'সত্যি?' সমূহ কটাক্ষ ছুঁড়ল বিনতা : 'কেমন মনে হচ্ছে?'

'অপূর্ব।'

'বাড়ি গিয়েছিলেন?'

'গিয়েছিলুম।'

'মা কি বললেন?'

'কী বলবেন! তিনি তো এক কথায় রাজি।'

'তবে?' আবার কটাক্ষ বিলম্বিত করল বিনতা।

তবে আরো একটু বিনতা অন্য কথা বলে না কেন? যদিও শুনতে গায়ের রক্ত আগুন হয়ে উঠবে, হাতের মুঠো দৃঢ় হতে চাইবে, দাঁতের পাটি একত্র হবে, তবু একটু বলুক না ওর কথা। কোথায় দেখা হল? কী করছিল? কেমন আছে?

'তবে, তবু আর আপনি নিস্তেজ কেন?' বিনতা খাটের প্রান্তে এসে বসল।

এই বুঝি চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্ধকারের চিতাবাঘ।

'কিন্তু এদিকে একটা দুঃসংবাদ আছে।' সুকান্ত বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'দুঃসংবাদ !'

'হ্যাঁ, আমার চাকরিটা গেছে।'

'গেছে ?' যেন সব গেছে, এমনি আর্তনাদ করে উঠল বিনতা।

'হ্যাঁ, বরেনরা তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে।' মুমূর্ষু রেখায় হাসল স্থকান্ত : 'আমি বলেছি না দেরি করা ভালো ! সর্বনাশের চেয়ে দেরি বাঞ্ছনীয়। এখন আবার ঘোরো, দেয়ালে-দেয়ালে মাথা কোটো, চাকরি জোটাও—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ করে রইল বিনতা।

স্থকান্তর চোখ বোজা। এত ক্লান্ত, এত অলস, অপূর্বকে দেখবারও বুঝি আর উৎসাহ নেই।

'আপনার মন খারাপ, আজ তা হলে আসি।' উঠে পড়ল বিনতা।

'সে কি, চা খেয়ে যাবেন না ?'

'অকারণে আপনার হোটেলের বিল বাড়িয়ে লাভ কি !' বিধ্বস্তের মত ধীরে ধীরে চলে গেল বিনতা।

এক কথায় চলে গেল।

সে-সে দিন হলে, স্থকান্ত স্থির মনে করতে পারল, কাকলি এ অবস্থায় নিশ্চয়ই চলে যেত না।

বেল টিপল স্থকান্ত। বেয়ারা আসতে বললে, 'কি রে, খাবার দিবি নে ?'

'দিচ্ছি।'

'দু-জনের মত খাবার।'

'আরেকজন কোথায় ?'

'আরেকজন নেই। দু-জনের মতই খিদে পেয়েছে আজকে।' হাসতে লাগল স্থকান্ত।

·৪৬

আশ্চর্য, দীপঙ্কর কিনা স্থকান্তের অনুকূলে !

'আপনি যে কী বলে ওর পক্ষ টেনে কথা বলেন ভেবে পাই না।' দীপঙ্করের বাড়ি এসেছিল কাকলি, অভিযোগ করল।

'বা, আমি আবার কার পক্ষ টেনে কথা কইলাম !' দীপঙ্কর বিস্মিত হবার ভাব করল।

'ঐ যে এতক্ষণ যার কথা কইছিলেন—চন্দ্রকান্ত না কৃষ্ণকান্ত !'

'যাক, নামটা এখনো ভুলতে পারেন নি। কিন্তু তার পক্ষ টানলুম কোথায় ?'

'টানলেন না ? তার চাকরিটা যাওয়া উচিত নয়, যদি যায় খুব অন্যায় হবে, এমনি ভাবের কথা বলছিলেন না এতক্ষণ ?'

'বলছিলামই তো। এখনো বলছি।'

'কিন্তু তার জন্যে আপনার এত শোক কেন ? সে আপনার কে ?'

'বলেন কী ! সে আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়েছিলাম কলেজে।'

'আহা, কত সে আপনার বন্ধুর কাজ করেছিল ! কত সে হিতকারী আপনার !'

এক মুহূর্ত চুপ করে গেল দীপঙ্কর। ঘৃণার দাহ এখনো এত তীব্র থাকতে পারে ভাবতে পারে না।

'আপনার চাকরিটা যে খেয়েছিল তা মনে নেই ?'

'বা, তাতে ওর দোষ কী !'

'ওর দোষ নয় ?' প্রায় গালে হাত দিয়ে বসল কাকলি : 'তবে কার দোষ ?'

'যদি দোষ না ধরেন, বলি, বরেনের দোষ। যে ওকে চাকরি দিয়েছে তার দোষ।'

'তার দোষ ?'

'এক শো বার তার। যে চাকরি দেওয়ার ফলে আরেকজন বেকার হয়ে যাবে সে চাকরি সে দেয় কেন ?'

'আর যে লোক চাকরি চাইল ? আবেদন করল ?'

'সে তো চাইবেই। সে 'নিডি', অভাবী, সে চাইবে না কেন ?'

'মোটেই তখন তার চাকরির দরকার ছিল না।' কাকলি অতীতের দিকে তাকাল।

'আপনি বললে তা আমি মানব কেন ? যার দরকার সে বোঝে। দরকার ছিল না তো আবেদন করল কেন ? আবেদনই দরকারের প্রমাণ।'

'কিন্তু আবেদন করবার সময় সে জানত, যদি চাকরি হয়, আপনাকে ডিসমিস করিয়ে তবে হবে।' কাকলি আবার ঘৃণার ঝাঁজ ছড়াল : 'এই তো আপনার বন্ধুর নমুনা।'

'বা, কিসে কী হবে, কত ধানে কত চাল, অফিসিয়্যালি তা তার জানবার কথা নয়। তার চাইবার কথা, সে চেয়েছে। যে দেনেওয়ালা সে অমন করে না দিলেই পারত। যখন দেখল ওতে আমার চাকরি যায়, তখন নামঞ্জুর করলেই পারত ওর

আবেদন। তাই,' বলতে দীপঙ্কর ভড়কাল না: 'যদি দোষ না ধরেন, সব দোষ ঐ দেনেওয়ালার।'

'চমৎকার।' এবার বিদ্রূপের কশা হানল কাকলি: 'যে লোকটা জ্বলন্ত মশাল হাতে তুলে দিল তার দোষ নয়, যে লোক জ্বলন্ত মশালটা ব্যবহার করে ঘর পোড়াল দোষ তার?'

'নিশ্চয়। মশাল হাতে পেলেই পরের ঘরে আগুন দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই।' দীপঙ্কর স্বর দৃঢ় করল: 'মশাল হাতে পেয়েও ফেলে দেওয়া যায় মাটিতে। আমি হলে তাই দিতাম।'

'তা হলে যে ওর চাকরি হয় না।'

'হত না! কিংবা ইচ্ছে করলে বরেন ওর অন্যত্র চাকরি করে দিতে পারত। তাই বলে অকারণে একজনের চাকরি খেয়ে সে জায়গায় আরেকজনকে বসাতে হবে এটা ভীষণ অবিচার। আপনিই বলুন, অবিচার নয়? সুতরাং যে চেয়েছে দোষ তার নয়, যে দিয়েছে দোষ তার।'

তবু যেন মানতে চায় না কাকলি। বললে, 'কিন্তু যখন ও চোখের উপর দেখল ওর চাকরি নেওয়ার নীট রেজাল্ট হচ্ছে আপনার ডিসমিস তখন ও চাকরি ফেরত দিতে পারত। ডিক্লাইন করতে পারত। আমিও কত তাকে বলেছিলাম। বলেছিলাম এ ক্ষেত্রে চাকরি নেওয়া নীচতা হবে। কিন্তু ও শুনল না। দিব্যি বন্ধুর পোড়া বাড়ির কাঠ দিয়ে নিজের ঘর তৈরি করল। বুঝুন কতখানি নিচু মন, কত বড় স্বার্থপর—'

স্বচ্ছ মুখে হাসল দীপঙ্কর: 'বা, তার খেসারত তো আপনি দিয়েছেন।'

'সে আমি দিয়েছি। কিন্তু ওর মনটা তো দেখলেন।'

'দেখলাম। এবং দেখছি। অনবরতই দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাই ওর চাকরি গেলে কারু ক্ষোভের কারণ হওয়া উচিত নয়। যেমন লোক তেমনি তার শাস্তি হওয়া দরকার।'

'তবু চাকরি চলে যাওয়া অসহ্য।' দীপঙ্কর আর্তমুখে বললে, 'এ যেন কারু চোখ চলে যাওয়া। লোকটা মন্দ, তাই বলে তার চোখ চলে যাবে এ কোনো কাজের কথাই নয়। হাত-পা গেলে তবু যেন সওয়া যায় কিন্তু অন্ধ হয়ে গিয়েছে এ অসম্ভব।'

'তাও হয় লোকে সংসারে।' কাকলি মুখ ফেরাল: 'যাক গে, যা হবার তা হবে। বোর্ডের মিটিং হয়েছে জানেন?'

'জানি না। বোধ হয় হয় নি। সুকান্ত তো অফিসে বেরুচ্ছে।'

'বা, বোর্ডের মিটিং হয়ে যাবার পরেও তো বেরুতে পারে।'

দীপঙ্কর চমকে তাকাল কাকলির মুখের দিকে : 'তার মানে ?'

'তার মানে মিটিঙে বোর্ড ডিসাইড করতে পারে যে ওর চাকরি থাকুক, আর হয়তো তারই জোরে বেরুচ্ছে আফিসে।'

'তেমন কিছু হলে জানতে পারতাম বোধ হয়।'

'তা একটু জানুন না।' বলেই নিজেকে আবৃত করল কাকলি : 'আর কিছু নয়, সামান্য একটা কৌতূহল।'

'তা, বরেনকে জিজ্ঞেস করুন না। সেই তো হালের মাঝি, নাটের গুরু।'

'আমার বয়ে গেছে।' ঝাপটা মারল কাকলি : 'ভারি তো কথা, তাই নিয়ে ওকে আবার বিরক্ত করব! কথা এমনি উঠে পড়ে, আলাদা কথা!'

'এমনি সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না বুঝি?' দীপঙ্কর চোখের মধ্যে চোখ ফেলল।

'তা যাবে না কেন? তবে পাছে ভুল বোঝে, কী দরকার! পুরুষের মন তো!' তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে হাসল কাকলি।

'আচ্ছা, আমি খোঁজ নেব। জানাব আপনাকে।'

'আজ চলি।'

বাড়িতে এসে আফিস-ফেরত কাকলি টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জামাকাপড় ছাড়ল না, জুতো খুলল না, সর্বসমেত শুয়ে পড়ল।

'শুয়ে পড়লি?' গায়ত্রী কাছে এসে দাঁড়াল।

'টাটকা-টাটকা গরম-গরম বিশ্রাম খানিকটা করে নিই। পরে বাথরুম থেকে এসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠাণ্ডা স্বরে বিলম্বিত বিশ্রাম তো আছেই।'

গায়ত্রী পাশে এসে বসল খাটে। বললে, 'বিয়ের পর এবারও চাকরি করতে হবে নাকি?'

'কে জানে কী হবে!' ঝোলানো পা দুটো সোজা খাটের উপর টেনে আনল কাকলি। হতাশায় লম্বা করল।

'আবার চাকরি কিসের?' গায়ত্রী প্রতিবাদ করে উঠল : 'চাকরিতে নিতি এমনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত হয়ে থাকলে জীবনসম্ভোগ হবে কী করে? বরেনের কি মত আছে চাকরিতে?'

'এখনো জিজ্ঞেস করে দেখি নি।' মায়ের উলটো দিকে কাত হল কাকলি।

বললে, 'অমত করবার তো কারণ দেখি না। ব্যক্তিত্বের যত বৈচিত্র্যে চাকচিক্য থাকে ততই ভালো। ততই মেয়েরা সুন্দর পুরুষের কাছে। যত নতুন তত মধুর।'

'আগে-আগে তো বিয়ের পর মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করতিস না—'

'আগে-আগে ? সে তো ভালোবাসার কালে—' যেন সে অনেক দিনের ওপারে দূর কোন রূপকথার দেশের কথা এমনি নিশ্বাস ফেলল কাকলি।

'আহা, কালের আবার বদল হল কোথায়! সবাই তো সেই তেমনিই আছে।' মেয়ের গায়ে হাত বুলুতে লাগল গায়ত্রী।

'তখন, সেই সর্বাধার আনন্দের সময় সব কথাই বলা সাজে।' পাশ ফিরে মায়ের মুখের দিকে চাইল কাকলি : 'তখন তো আর ভীতি নয়, তখন শুধু ভাতি। তখন চাকরি করব না, এ কথাও বলা যায়; চাকরি পেলে কেন করব না, এ কথাও বলা যায়। তখন সাজসজ্জার কী দরকার, এ কথাও বলা যায়; সাজব গুজব না তো এ দেহ ধরেছি কেন, এ কথাও বলা যায়। তখন সেই উদ্বেলতার সময় কিছুই প্রগল্‌ভ মনে হয় না। কিন্তু এখন—'

'কেন, এখন কী?'

'এখন শুধু অঙ্ক, শুধু গণিত, শুধু আয়-ব্যয়ের হিসেব। সুখ-সুবিধের জমা-খরচ। আদায়-উশুল।' কাকলি উঠে বসল : 'এখন ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

'আচ্ছা, বরেন কদিন আসছে না কেন?' এর পরে এই প্রশ্নটাই কি গায়ত্রীর মনে প্রবল হবে না?

'আসবে, শিগগিরই আসবে।' হাসল কাকলি : 'না এসে যাবে কোথায়?'

'ফোন করেছিল?'

'ও না করলে আমি করি।' কাকলি উঠে দাঁড়াল : 'দরকারে অদরকারে আছে ও নাগালের মধ্যে।'

তবু যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না গায়ত্রী। বললে, 'কিন্তু আর দেরি কেন?'

'না, আর দেরি কোথায়। কটা কাজ নিয়ে ও এখন একটু ব্যস্ত বলছিল, তার মধ্যে একটা—'

অসহিষ্ণু মুখে বললে গায়ত্রী, 'শেষে না দেরি দেখে পিঠটান দেয়।'

'পিঠটান দিয়ে যাবে কোথায়? ওর টিকি আমার কাছে বাঁধা।'

'কিন্তু কী এমন ওর এখন কাজ—'

'সম্প্রতি আমাদের নিচের ভাড়াটেকে তাড়ানো। তুমি জানো না?'

'জানি বৈকি। কিন্তু ও কি যাবে ?'

'যাবে না ?'

'খালি যাব-যাব করবে।' অদ্ভুত স্বরে বললে গায়ত্রী।

কাকলি শব্দ করে হেসে উঠল। কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে : 'যাব-যাব করবে। উড়ু-উড়ু করবে। ধানাই-পানাই করবে। কিন্তু এ বরেন। এ নাছোড়। একগুঁয়ে, ওঠাবে তবে ছাড়বে। রেহাই পেতে দেবে না কিছুতেই।'

'আজকাল ভাড়াটে তোলা মুখের কথা ?'

'বরেনের কিছুই অসাধ্য নয়। মুখের কথাতেই তুলবে।'

'মুখের কথায় ? মামলা-মকদ্দমা লাগবে না ?'

প্রাথমিকভাবে হালকা হচ্ছে কাকলি। জুতো-জামা খুলছে। খুলতে-খুলতে বললে, 'মামলা-মকদ্দমা তো নাগবন্ধন। এই প্যাঁচ খুলেছ তো ঐ আরেক প্যাঁচ। এই পাক কাটিয়েছ তো ঐ আরেক পাক। ডালের পরে আবার ফেঁকড়ি। তারপর যুদ্ধের শেষে প্রাপ্তির বেলায় ঢু-ঢু। কুরুক্ষেত্রের মাঠ। বিষয়সম্পত্তির কিছু নেই, শুধু আদালতের রায়-ডিক্রির নকল।'

'মুখের কথায় ভাড়াটে উঠে যায় এ কি সত্য যুগে ফিরে এসেছি নাকি ?'

'বরেনের চাতুরি। শুধু চাতুরি নয়, সামর্থ্যও। ভাড়াটেকে বললে, এ বাড়ির বড় মেয়ে ফিরে এসেছে, অফিসার-মেয়ে, নিচেটা এখন দরকার। আমি আপনাকে আরেক বাড়ি দেখে দিচ্ছি। আরেক বাড়ি ? হ্যাঁ, এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে এমিনিটিস বেশি। ভাড়া কম, নয়তো বড় জোর সমান। আপনার অরাজি হবার কিছু নেই। তা ছাড়া, বুঝতেই পাচ্ছেন, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা সুখের নয়। বেশ, দেখুন। ভাড়াটে রাজি হয়েছে। এখন থেকে-থেকে বরেন তাকে বাড়ি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটার মজা মন্দ নয়। বরেনের গাড়িতে চড়ে দিব্যি সান্ধ্যভ্রমণ সারছে।' যেন খুব ঈর্ষিত, কুপিত হবার কথা এমনি ভাব করল কাকলি : 'কার গাড়ি কে চড়ে !'

'কোনো বাড়ি রুচল ভদ্রলোকের ?'

'প্রথম-প্রথম ভাঁড়াতে চেয়েছিল, এখন শুনছি, চাপে পড়ে 'না' করতে পারছে না। একটা বাড়ি পছন্দ করেছে। উঠে যাবে শিগগির। তারই তোড়-জোড়ে বরেন কদিন অনুপস্থিত। এলেও লোয়ার হাউসে আসছে, ভাড়াটের ব্যাপারে, আপার হাউসে টু-লেট টাঙানো।' মা তার কতদিনের বন্ধু এমনি লঘুতায় কথা বলছে কাকলি, বলতে কত আরাম পাচ্ছে।

'উনি সব জানেন ?'

'তুমিও তো জানো।'

'কিন্তু লোকটা সত্যি উঠে যাচ্ছে এত দূর জানি না।'

'বাবা কী খুশি! গোটা বাড়িটা আবার নিষ্কলুষ বনবিহারী মিত্রের বাড়ি হচ্ছে, বাবার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।'

'আহা, আনন্দ তো কত!'

'আমি যেমনি রাহুমুক্ত হয়েছি, তেমনি বাড়িটাও হতে যাচ্ছে। স্বনামপরিচিত।'

'কিন্তু বাড়তি আয় যে একটা আসছিল, তার কী হবে ?'

'কেন, আমি দেব।' ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করছিল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কাকলি।

'তুই কোত্থেকে দিবি ?'

'আমি চাকরি করছি না ? এক লাফে আমার মাইনে কত হয়েছে তুমি জানো ?' মায়ের দিকে এক পা এগিয়ে এল কাকলি: 'আমার কাজে-কর্মে, ব্যবহারে-ব্যক্তিত্বে আফিস এত খুশি, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি একটা ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে উঠেছি। দেখবে এসো, আমারই তাঁবে কত কেরানি-কর্মচারী খাটছে। অফসরের স্ত্রীলিঙ্গে যেমন আমাকে অপ্সরী বলে, তেমনি বড়-বাবুর স্ত্রীলিঙ্গে কেউ-কেউ বলে বড়বিবি। তুমি আমাকে কী ভেবেছ ?' আরো এক পা এগোল কাকলি: 'মেয়ে হয়ে বাবাকে এ কটা টাকা সাহায্য করতে পারব না ?'

'মেয়ে হয়ে! তারপর তুই বউ হয়ে যাবি না পরের ঘরে ?'

বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা ধাক্কা খেল কাকলি। আবার সেই পুরোনো নাটক অভিনীত হবে, মা বুঝি তারই ইঙ্গিত করল। মেয়ে বউ হয়ে টাকা রোজগার করলে সে রোজগারের জন্যে কে হাত বাড়াবে, তার দুঃস্থ শ্বশুরবাড়ি, না তার দুর্গত বাপের বাড়ি ? আবারও বুঝি সেই সমস্যার মেঘাভাস।

'ভাগ্যবলে এবার এমন একজনের সঙ্গিনী হচ্ছি যে ক্ষুদ্রাত্মা নয়, দুরাশয় নয়, যে জানে, টাকা যখন আমি উপায় করছি, টাকা আমার, আর আমার যেমন অভিরুচি, তেমনি খরচ করবার আমারই স্বাধীনতা, যতক্ষণ সেটা দুষ্কৃতি নয় বা দুর্নীতির এলেকায় আসে না। তাই টাকা আমি পিতার আশ্রমে দিই, না অনাথ আশ্রমে দিই, এ নিয়ে বরেনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তার অনেক টাকা।'

'তবু', মুখ নিচু করল গায়ত্রী: 'তবু বিবাহিত মেয়ে যত বড়লোকই হোক, পারতপক্ষে তার থেকে বাপ-মায়ের সাহায্য না নেওয়াই সমীচীন।'

'বেশ তো, ভাড়ার কটা বা টাকা, ঐ টাকা দাদা রোজগার করবে' গন্ন-ভরা স্ফূর্তি নিয়ে কাকলি বললে।

'কে, দেবনাথ?' গায়ত্রী যেন অন্ধকারে চোখ মেলল।

'হ্যাঁ, দাদার জন্যেও সুবিধেমত চাকরি দেখছে বরেন। যা কথা দিয়েছে, সব সে রাখবে একে-একে।' ভঙ্গিতে দৃপ্তি আনল কাকলি: 'সব রাখবার মত জোর রাখে সে-শরীরে।'

'দেবনাথ যদি ফেরে, যদি সে পাকা কাজ পায়, তা হলে আর ভাবনা কী কিন্তু যদি তার একটা হিল্লে না হয়, আর তুই বিয়ে হয়ে চলে যাস, তা হলে দেখিস, তোর বাবা আবার নিচেটা ভাড়া দিয়েছে।'

'সে ভবিষ্যতের কথা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদি আমি যেমন আস্ত কাকলি মিত্র, তেমনি বাড়িটাও আস্ত বনবিহারী মিত্র হয়ে থাক। নইলে আমারই বাড়ির একাংশে থেকে ভাড়াটে গেটে তার নেমপ্লেট ঝোলাবে এ অসহ্য। উদার সদর তাকে ছেড়ে দিয়ে অমি ক্ষীণ খিড়কি দিয়ে যাওয়া-আস করব, ঐ দৈন্য থেকে ঈশ্বর আমাকে ত্রাণ করুন। তাই তাঁর কাকলি ফিরে এসেছে, সমস্ত বাড়ি উপর-নিচ তাঁর একলার হয়ে থাক, আর সমস্ত বাড়ি উপর-নিচ তাঁর কাকলি ভরে রাখুক, এই তাঁর আকুল অভিলাষ—বলো, তাই না? উচিত না তাঁর সেই অভিলাষ আমাদের পূরণ করা?'

'উচিত।' দয়ার্দ্র চোখে সায় দিল গায়ত্রী: 'অল্প কদিনের জন্যে হলেও উচিত। তাঁর কাকলি এসেছে, আর তাঁর অভাব নেই, শূন্যতা নেই—'

'তা ছাড়া বরেন যাই বলুক, বিয়েতে মেয়ের বাড়িতে একটা উৎসব হবেই। বাবার কত দিনের সাধ, সমস্ত বাড়িটা আলো দিয়ে সাজাবেন।' চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাকলির: 'তার উপর-নিচ, ছাদ-উঠোন লোকে, জন-কোলাহলে গমগম করবে। সেই উৎসবের দিনে বাড়ির আধখানা যদি বেহাত হয়ে থাকে, নিমন্ত্রিতরা সদর দিয়ে ঢুকতে না পায়, তা হলে তো কেলেঙ্কারির চরম—'

'বরেন রাজি হবে সেই উৎসবে?'

'এক শো বার হবে। লাল-নীল আলো দেখবে না, শুনবে না সানাই?' খেলনা-পাওয়া ছেলেমানুষের মত আহ্লাদ করে উঠল কাকলি: 'যতই এমনিতে মুখ দেখুক, দেখবে না নতুন মুখচন্দ্রিকার মুখ? যে মুখ—বিনতাকে ডাকব, আবার সাজিয়ে দেবে নতুন করে।'

'কে বিনতা?' গায়ত্রী মনে করতে চাইল।

'আমার বন্ধু। তুমি দেখ নি, আমাকে আগের বার সাজিয়ে দিয়েছিল ?'

'না, না, তাকে ডাকতে হবে না।' অপয়া ভেবে গায়ত্রী প্রতিবাদ করতে চাইল।

'না, সাজাক বা না সাজাক, ডাকতে হবে বৈকি। সে আসবে আর হিংসের আগুনে তার বুক চচ্চড় করবে। যতই চোখ বড় করে দেখবে, তার ঘোড়া মরাখেকো, ছ্যাকড়াটানা আর আমার ঘোড়া পক্ষীরাজ।'

'তা হলে আসবে না।'

'না-ই আসুক। উৎসব না-ই হোক। তবু নিচেটা দরকার।'

'দরকার ?'

'হ্যাঁ, একটা ড্রয়িংরুম এসেনশিয়াল। নইলে যে কেউ আসে, সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে যায়, সেটা ঠিক নয়।'

'আহা, না বলে কয়ে উপরে উঠে পড়ার মত লোক তো শুধু একজন—'

যেন তাকে সহসা চিনে উঠতে পারছে না, এমনি চোখ করল কাকলি।

'আর ড্রয়িংরুম দেখিয়ে তাকে বসিয়ে রাখা যাবে, এমন অবস্থা আর কই ?' আগের কথাটা সম্পূর্ণ করল গায়ত্রী।

'না, একটু বসে থাকতে শেখা ভালো।' চুল খুলতে লাগল কাকলি। গম্ভীর মুখে বললে, 'দুর্বারের মত সব সময়ে নিজেকে হাজির করাটা ঠিক নয়।'

'আহা, এ আবার কী কথা !' কটাক্ষে শাসন করতে চাইল গায়ত্রী।

'তুমি প্রস্তুত বলে আমিও প্রস্তুত, এ একটু বাড়াবাড়ি।'

'তার মানে ? বিয়ে আরো পিছিয়ে দিতে চাস ?'

'আহা, সে কথা কে বলছে ? মানে, ধরো, এটা তো আমার শোয়া-বসা, সাজা-গোজা সব কিছুর একার ঘর, আমি হয়তো শিথিল আছি, অসতর্ক আছি, হৈ-হৈ করতে করতে ও অকস্মাৎ ঢুকে পড়ল—সেটা কি ঠিক ? শোভন ?' সরল মুখে প্রশ্ন করল কাকলি।

'কেন, সিঁড়িতে জুতোর শব্দই তো যথেষ্ট ওয়ার্নিং।'

'যথেষ্ট ? কী যে বলো তার ঠিক নেই।'

'পর্দাটা টেনে দিলেই হয়।'

'তার চেয়ে বলো না কেন, দরজা বন্ধ করে দিস। সে আরো বেশি নির্লজ্জতা। শুধু কি শারীরিক আলস্য ? মানসিক আলস্যও তো মানুষের আছে। মেজাজ-মর্জি আছে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিও আছে। বলো, নেই ?'

'তা ও ড্রয়িংরুম মানবে কিনা—'

'না, মানবে। শত হলেও ভদ্র, মার্জিত তো বটে। অন্তত অভ্যস্ত তো বটে। ড্রয়িংরুম দেখলে সে বসবে, খবর পাঠাবে। আমি প্রস্তুত হব। উপযুক্ত প্রতিধ্বনি করব। ও যে সরাসরি উঠে আসে উপরে, তার মানে, আমাদেরই ত্রুটি, আমাদের ড্রয়িংরুম নেই। আমার সেই শ্বশুরবাড়ির মত—'

'সে আবার কী?'

'জানো মা, আমার শ্বশুরবাড়িতেও ড্রয়িংরুম নেই। শ্বশুরের যেটা বৈঠকখানা, সেটা মক্কেলের মজলিশ, যত টাইম-বেটাইমের বাজে লোকের আস্তানা, সেটা আর যাই হোক, বসবার ঘর নয়। এমনি আত্মীয়-বন্ধু কেউ যদি কারু সঙ্গে আসে দেখা করতে,' কাকলির কণ্ঠ হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল: 'সদরে প্রথমে বাছাই হবে কোন ঘরের, কোন পোস্টাফিসের লোক—তারপর সেই ঘরে সেই খোপে—সেখানে তখন কার কী অবস্থা বিবেচনা করবার সময় নেই—সে লোককে সোজা ছুঁড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে—আর-এম-এস-এ সর্টিং-এর মত—'

'ওখানকার কথা অত বিতং করে বলবার কী হয়েছে?' গায়ত্রী ধিক্কারের স্বরে শাসিয়ে উঠল।

মুহূর্তে সংবৃত হল কাকলি। বললে, 'না, আমি বলছিলাম বাইরের একটা বসবার ঘর অত্যাবশ্যক। বাইরের ঘরে যে কথা জমে, তা অন্তঃপুরের ঘরে বলা যায় না। না গাড়িতে, না বা হোটেলে, না বা দোকানে-পসারে, থিয়েটারে-সিনেমায়। মাঠ-ঘাট তো মানচিত্রেই নেই।' বাথরুমের দিকে এগুল কাকলি। মাকে আরো বাঁচিয়ে দিল। বললে, 'তা ছাড়া আজকাল আফিসের কত লোকই তো আসতে পারে দেখা করতে। ড্রয়িংরুম না হলে বসবে কোথায়?'

ড্রয়িংরুম যে কত দরকারি, তা বোঝা গেল, কিছুদিন পরে ভাড়াটে উঠে গেলে, যখন দীপঙ্কর এল দেখা করতে। দস্তুরমত কলিং বেল আছে। অতটা সাহস না হয়, কাগজের প্যাড আর পেন্সিল আছে টেবিলের উপর। তা ছাড়া সমস্ত নিচেটাই যখন বাড়ির মধ্যে এসেছে, তখন নিচেই কোন না লোকজনের, চাকর-বাকরের দ্রুত নাগাল পাবে।

দস্তুরমত লিখিত চিরকুট নিয়ে এল চাকর। নাম দেখল দীপঙ্কর।

এখন কাকলি ঠিক করবে, নিচে নামবে কি নামবে না। যদি দেখা না করতে চায়, কী ওজুহাত দেবে। আর যদি দেখা করতেই চায়, কত ত্বরিতে না মন্থরে প্রস্তুত হবে। একটু সাজগোজ করে নেবে, না যেমন আছে, তেমনি ছুটবে খালি পায়ে।

স্বচ্ছ হয়ে, সুন্দর হয়ে নামল কাকলি।

প্রথমটা, যেমন হয়, আজে-বাজে কুশল কথায় কাটল। কিন্তু কিছু একটা নাতে এসেছে নিশ্চয়ই, তারই ঔৎসুক্যে কান খাড়া করে রাখল কাকলি। থচ নিজে গায়ে পড়ে খবর জানবার তার উৎসাহ নেই। কতদিন খবরের গজটা চোখের সামনে মেলে ধরেও শাঁসালো খবরটাই তাকে এড়িয়ে গেছে।

জানি বলবে। ঠিক গলা খাঁকরে বললে দীপঙ্কর, 'বোর্ডের মিটিংটা ঠিক হল কিনা ঝো গেল না। আপনি কিছু জানেন ?'

'বা, আমি জানব কোত্থেকে ?'

'যদি বরেন কিছু বলে থাকে।'

'আর রাজ্যে কথা নেই, বোর্ডের মিটিং!' কাকলি ভঙ্গিটা বাঁকা করল: 'কেন, আপনি ভিতরের লোক, বোঝেন না কিছু ? ও বেরোচ্ছে এখনো ?'

'তা বেরোচ্ছে, কিন্তু বোধ হয় আভাস পেয়েছে ও থাকবে না।'

'সে তো সবাই পেয়েছে, সেটা আর বেশি কথা কী! কিন্তু আপনার অনুমান ল কিসে ?'

'ও বললে।'

'কী বললে ?'

'বললে, বিনতাকে চলে যেতে বলতে হল।'

'কারণ ?'

'কারণ, বললে, চাকরিটা আর থাকল না।' দীপঙ্কর সহানুভূতির ভাব আনল: চাকরিই যখন থাকল না, বললে, বিনতাকে কষ্ট দেবার আমার অধিকার নেই। কেন ওকে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখি, কেন ওর স্বপ্ন শুধু নয়, আরামের ঘুমটুকুও নষ্ট করে দিই ? তাই, বললে, ছেড়ে দিলাম বিনতাকে। আর চাকরি নেই শুনে বিনতাও নাকি পত্রপাঠ বিদায় হল।'

'পত্রপাঠ বিদায় হবে না তো কি একটা বেকারভূষণকে সারা জীবন পোষণ করবে ? তাও ঐ তো মাইনে মাস্টারনীর।'

'অথচ সরকারিভাবে চাকরি এখনো যায় নি।' দীপঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তের মত বললে, দিব্যি কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কেন যে ওর এই প্রিমনিশান কে বলবে। এত ঢ় ওর বিশ্বাস, কুঠার না পড়তেই গাছের কাঠ ও বেচে দিল। চাকরি না যেতেই ছেড়ে দিল প্রণেয়াকে।'

'আপনিও যেমন!' পরিহাসে ঠোঁটের বঙ্কিমাকে প্রখর করল কাকলি: 'ও ছাড়বে

কেন? বিনতাই ছেড়ে দিয়েছে। এখনো যখন ও চাকরি করছে, চাকরি যাবার ওজুহাত অচল। আসলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিনতা টের পেয়েছে ওর মেজাজের ঝাঁজ, উপহার পেয়েছে বা এক টুকরো ঝগড়া, আর অমনি কেটে পড়েছে। তাবের যতই জোয়ার আসুক, গোঁয়ারের সঙ্গে আঁটবে কে? বুদ্ধিমতী বিনতা।'

'কিন্তু, যাই বলুন, সুকুর এই ধারণা, প্রিমনিশান যাতে মিথ্যে হয়, তার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে।'

'কী ধারণা?'

'যে ওর চাকরিটা থাকবে না।'

'তা আগে চাকরিটা যাক। বোর্ড ডিসাইড করুক। রাম না হতেই রামায়ণ কী'

'না, আপনাকে বলে রাখছি। বোর্ডের ডিসিশন যদি ওর পক্ষে যায়, কোন কথা নেই। যদি না যায়, আপনাকে বিহিত করতে হবে। আপনি ছাড়া কেউ নেই।' উঠে পড়ল দীপঙ্কর: 'মামলা-মকদ্দমা করা বড় টিডিয়স। জরাগ্রস্ত হয়ে রোগশয্যায়, ধূলিশয্যায় পড়ে আছি প্রাণ বেরোচ্ছে না—তেমনি হচ্ছে মামলার যন্ত্রণা।'

'তা আপনার এসব প্লিডিংও তো প্রিম্যাচিওর।' কাকলিও উঠে পড়ল: 'চাকরিটা আগে যাক। এ যেন গাছে ফুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলছেন। গাছের ফুল আগে ছেঁড়া হোক।'

'আচ্ছা, আসি।' চা খাবার পর চলে গেল দীপঙ্কর।

কিন্তু কদিন পরে আবার এসে সে হাজির। এত চঞ্চল যে, কলিং বেল টিপে বসল।

সে ঘণ্টার উত্তর দিল কাকলি নিজে: 'কী ব্যাপার? বসুন।'

বসবার মত যেন স্থৈর্য নেই, দীপঙ্কর বললে, 'দেখুন, বোর্ডের ডিসিশন বোধ হয় হয়ে গেছে।'

'তা হবে। সোফায় বসল কাকলি।

'আর তা বোধ হয় সুকুর বিরুদ্ধে।' তবু বসতে পাচ্ছে না দীপঙ্কর।

'তা আর আশ্চর্য কী!' কার্পেটে চটি ঘষল কাকলি: 'কী করে বুঝলেন?'

'কদিন ধরে সুকু আফিসে আসছে না, বেশ কদিন ধরে।'

'হয়তো ছুটিতে আছে।' সোফায় ভঙ্গিটাকে আরামমন্থর করল কাকলি: 'বসুন।'

না বসে উপায় কী, বসল দীপঙ্কর। বললে, 'ছুটি নেয় নি। আমি খোঁজ করেছি আফিসে। ছুটির কোনো দরখাস্তই নেই।'

'তা হলে, গেছে।' পরম পরিতোষের সঙ্গে বললে কাকলি, 'কিন্তু ওর বাড়িতে খোঁজ করেছিলেন?' একটু কি আবার উদ্বিগ্ন শোনাল?

'ও তো বাড়িতে থাকে না।'

'হ্যাঁ, গৃহ-বিতাড়িত, আফিস-বিমর্দিত, প্রেয়সী-প্রত্যাখ্যাত—'

'হোটেলে থাকে। ঠিকানাটা জেনে রাখি নি।'

'বন্ধুর কাজ করেছেন।'

'না, ঠিকানাটা হয়তো বার করা যায়। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করে তো চাকরির কোনো ব্যবস্থা হবে না।'

'ব্যবস্থা তা হলে কী করে হবে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করলে।'

'আমার সঙ্গে?' ঝলসে উঠল কাকলি: 'আমি কি বোর্ডের উপরওয়ালী?'

'তা জানি না। কিন্তু আপনি প্রভাব বিস্তার করলে যে 'না' 'হাঁ'তে পরিণত হতে পারে তাতে সন্দেহ করি না।'

'প্রভাব বিস্তার করলে মানে?' শরীরে গর্বের ঢেউ তুলল কাকলি।

'মানেটা আপনি করুন।'

'মানে ময়ূরের মত পেখম বিস্তার করলে?'

'প্রায় তাই।'

'কিন্তু যার জন্যে বিস্তার করব সে কোথায়?' কার্পেটে পা ঘষল কাকলি: 'সে নিজে এসে উমেদারি করবে না?'

'তার যেন চাকরিতে স্পৃহা নেই।'

'স্যাণ্ডেল পায়ে উড়ুনি উড়িয়ে প্রাইভেট টিউশানি করবার স্পৃহা। তবে আপনার কেন খোড়ো ঘরে ঝাড় টানানোর চেষ্টা?'

'এটা রাগের কথা নয়।'

'রাগের কথা নয়, তবে অনুরাগের কথা? বেশ বলেছেন।' কাকলি মুখিয়ে এল: 'কিন্তু আমি যে ওর জন্যে বলব ও আমার কে?'

'ও কেউ নয়। কেউ না হলে কি কিছু করা যায় না? ধরুন ও এক দুঃস্থ অপমানিত যুবক।'

'যে বক জু-তে থাকবার উপযুক্ত।' পরিহাস করেও হাসল না কাকলি।

'ধরুন, ও আমার বন্ধু। তার মানে আপনার এক বন্ধুর বন্ধু। আমিও তো একদিন আপনার বন্ধুরই বন্ধু ছিলাম। কত দয়া করেছেন আমাকে: তেমনি আজ

আপনার আরেক বন্ধুর বন্ধুর জন্যে কিছু করতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন কেন? দয়া তো আপনার শুকিয়ে যায়নি। কারু কোনোদিন যায় বলেও শুনি নি কখনো।'

'জানেন না, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে যায়।' কাকলি ওঠবার ভঙ্গি করল: 'আপনার সঙ্গে তুলনা করবেন না। আপনার উপরে প্রকাণ্ড একটা পরিবার নির্ভর করে ছিল। আর ওর কী? আপনি আর কোপনি। এক স্ত্রী ছিল তাকেও অকারণে খেদিয়ে দিয়েছে। এখন খাই দাই কাঁসি বাজাই। এমন যে দায়িত্বশূন্য তার জন্যে আমার দয়া হবে কেন?' উঠে পড়ল কাকলি: 'কাউকে কিছু পারব বলতে।'

'সবটাই দারিদ্র্যের কথা নয়, মর্যাদার কথাও তো আছে।'

'মর্যাদা! চটিজুতোর আবার ফিতে! দেখুন, যা পারব না তা করতে বলবেন না।'

'তবু—'

'তবু আবার কী!' সোফাসেটির ধার থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে কাকলি বললে, 'আমি নিজেই তো চাই ওর শাস্তি হোক, ও বেকার হয়ে যাক। প্রাইভেট টিউটর কি বেকার? কী বলে সেনসাসে?'

'জানি না।' তবু আশা ছাড়ে না দীপঙ্কর। যেতে-যেত বললে, 'কিন্তু আমি আবার আসব।'

'তা আসবেন।' এতক্ষণে একটা কোমল স্বর বের করল কাকলি।

কদিন পর, আফিসফেরত ঘরে বিশ্রাম করছে কাকলি, পর্দার আড়াল থেকে চাকর বললে, 'বাবু এসেছেন।'

'কে?' ঝাঁকরে উঠল কাকলি।

'বড়বাবু এসেছেন।'

'বরেনবাবু এসেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বরেনবাবু।'

'বলো যাচ্ছি।'

কেমন বসে রয়েছে নিচে। না বসে করে কী। নিজেই সব পছন্দ করে কিনিয়েছে। সাজিয়েছে গুছিয়েছে। তারপর নিজেই কেমন মাকড়সার মত বন্দী হয়েছে নিজের জালে।

আর সাধ্য কী, অনিবার্য দুর্যোগের মত নিভৃতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। মথিত করো শান্তিকে। এই সুন্দর। বাসনাকে প্রতীক্ষার দীপে-ধূপে আরতি করো। সেই ভাগ্যের জন্যে সৌন্দর্যের মঙ্গলাচরণ।

'চলো একটু বেরুই।' কাকলি আসতেই প্রস্তাব করল বরেন: 'কী, যাবে?'

মৃদু হাসল কাকলি: 'মন্দ কী! একটু বসুন, তৈরি হয়ে নি। চা-টা পাঠিয়ে দিই।'

'না, না, চা-টা বাইরে খাব। এই তো বেশ আছ—'

'অজ্ঞানে আছি। অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে আসি, তমসা থেকে জ্যোতিতে, সেন্টে-দ'উডারে—' জোরে হাসল কাকলি।

'মোটেই তা নয়। বরং বিকৃতি থেকে প্রকৃতিতে। কৃত্রিম থেকে আদিমে।'

'এবং তা সুধীরে।'

কী অরুন্তুদ যন্ত্রণা এ ধৈর্যের, কী বা আনন্দ। চলে যাচ্ছিল কাকলি, বরেন ডাকল। বললে, 'একটা খবর ছিল—'

'কী?'

'বোর্ডের সেই মিটিংটা হতে দিলাম না।'

'কেন, কী হল?' থমকে দাঁড়াল কাকলি।

'বোর্ড ওর ডিসমিস্যালই চাইবে বুঝতে পাচ্ছিলাম। তাই ওকে অন্যত্র চাকরি পাইয়ে দিলাম।'

'চাকরি পাইয়ে দিলেন?' প্রায় একটা মূঢ় আর্তনাদ করে উঠল কাকলি।

'হ্যাঁ। গোড়ায় মাইনেটা খুব সুবিধের হল না কিন্তু পরেই একটা পরীক্ষার পর ভালো গ্রেডে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।'

'ও নিল চাকরি?'

'পশ্চাতে যখন উন্নতি আছে তখন কেন নেবে না? ভবিষ্যতে ওখানে কী হবে জানি না কিন্তু এখনকার, এখানকার আনপ্লেজেন্টনেস তো এড়ানো গেল। ওকে তো একেবারে অখুশি করে বিদায় দেওয়া হল না—'

'খুব অন্যায় করলেন।'

'অন্যায় করলাম?'

'হ্যাঁ, ওকে বিমুখ করাই উচিত ছিল। উচিত ছিল শিক্ষা দেওয়া।'

'কী দরকার! আমরা কেন ক্ষুদ্র হই? শত হলেও আমাদের কেন সৌজন্যের অভাব হয়? তা ছাড়া, তুমি একবার বলেছিলে ওকে আর কোথাও যেন ঢুকিয়ে দিই। ঠিকই বলেছিলে। ওর প্রতি আমাদের একটু কৃতজ্ঞতাও তো থাকা উচিত।'

'কৃতজ্ঞতা?'

'হ্যাঁ, ওই তো মাধ্যম, ওই-ই তো আমাদের মিলনের সেতু।'

‘যাক গে যা হয়েছে। মাইনেটা তো কম—’

ক্ষিপ্র পায়ে উপরে উঠে গেল কাকলি। ক্ষিপ্র হাতে সাজগোজ সমাধা করলে। ঝরনার মত নেমে এল লাবণ্যধারায়। বললে, ‘চলুন।’

গাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে বসল বরেন। স্পর্শে ব্যাকুল হয়ে উঠতে চাইল। বোধ হয় চুম্বন করবে। করুক। কী হয় চুমু খেলে?

শান্তস্বরে বললে, ‘নোটিশ তো সই করা হল না—’

‘ও, হ্যাঁ, কী আশ্চর্য, ফর্মটা পকেটে করে এনেছিলাম।’ নিবৃত্ত হল বরেন। পকেট হাটকাতে লাগল।

‘দু-জনকেই সই করতে হবে?’

‘হ্যাঁ, সংযুক্ত নোটিশ। উই ইনটেণ্ড টু ম্যারি—। দেখি, দাঁড়াও, দেখি কিরকম না জানি বয়ানটা। আমি আগে ভেবেছিলাম আমার একার নোটিশ দিলেই বুঝি হবে।’

‘এত ব্যস্ত?’

‘শেষে দেখলাম দু-জনেরই সই চাই।’

‘নোটিশের কদিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে?’

‘তিন মাসের মধ্যে।’

‘তিন মাস!’

‘হ্যাঁ, এক মাস পর্যন্ত অবজেকশানের মেয়াদ, সেটা পেরিয়ে গেলেই কনজাংশান।’

কতক্ষণ কাটল চুপচাপ।

বরেন আবার উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইতেই কাকলি বললে, ‘নোটিশটা আগে সই করি বাড়ি গিয়ে।’

‘ঠিক বলেছ। নোটিশ!’ শিশুর মত হেসে উঠল বরেন। দু’হাতে সিগারেট ধরাল।

বাস-এই আফিস যায় কাকলি। ফেরেও বাস-এ।

যথারীতি বাস-এই ফিরছিল।

'লেডিজ—' হেঁকে উঠল কণ্ডাক্টর।

এক রাজ্যের লেডিজ সিট। তার মধ্যে দু-পাশের দুটো পুরুষেরা দখল করে আছে।

মেয়েছেলেই তো—শাপান্ত করছে পুরুষেরা। কিন্তু এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে দু দল পুরুষের মধ্যে কারা আগে সিট ছাড়ে।

জানলার বাইরে রাস্তার দিকে মুখ করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল সুকান্ত। পাশের লোককে বললে, 'চুপ করে বসে থাকুন। ওরা ছাড়ুক।'

ও সিটের লোকেরাও সমান নাছোড়বান্দা। ওরা ছাড়ুক।

সুকান্তের পাশের লোকটা বোধ হয় মিনমিনে, হাবাগোবা। সুকান্তকে বিশ হাত জলের নিচে ফেলে লোকটা উঠে পড়ল।

অগত্যা সুকান্তকেও ছাড়তে হল জায়গা।

আর সে সম্পূর্ণ বেরিয়ে না এলে ভদ্রমহিলা সিটের গলিতে ঢোকে কী করে।

সংকুচিত হয়েই বসল কাকলি। পাশে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে। যে কেউই বসতে পারে অনায়াসে। কাকলি অবুঝ নয়, অনুদার নয়। একটা পুরুষ তার পাশে বসলে তার গায়ে ফোস্কা পড়ে না। গায়ের সঙ্গে গা লাগলেও মরে যায় না লজ্জায়।

এই মাছপাতুরি ভিড়ের মধ্যে সিট একটা খালি থাকবে এও বুঝি অস্বস্তিকর। নৈর্ব্যক্তিক ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কাকলি বললে, 'একজন বসুন না।'

যত হাবাগোবা ভেবেছিল, তত নয়। সেই মিনমিনে লোকটাই বসে পড়ল বেমালুম। এখনো কী রাগ! কী উপেক্ষা! একবার তাকিয়ে দেখছেও না, এদিকে। সে তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, বাস-এর ভদ্রমহিলার সঙ্গে ঝগড়া কী। যাই বলো, আসলে অসভ্য। নইলে বুশ-শার্ট পরে রড ধরে দাঁড়িয়েছে!

কিন্তু এদিকে তো কই কোনোদিন দেখি নি। আফিসফেরত বাস-এ তো এ

নতুন যাচ্ছি না, কই এর আগে ঘটে নি তো এমন দুর্ঘটনা। তবে কি কাকলিরই আফিসের কাছাকাছি এলাকায় চাকরি হয়েছে ? কোন আফিস, কোন ডিপার্টমেন্ট, —অত খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করা যায় না বরেনকে। কাকলির যে সুদ্ধ কৌতূহল, নিরাসক্ত সন্ধান—এটুকুই যদি না বুঝতে চায়। কী দরকার পরের কথা ঘরে এনে।

কে না কে লোক, তার কুলকুষ্টির খবর নাও!

সাহেব হয়েছিল বলে কত একদিন লম্বাই-চওড়াই করেছিল। আস্তে-আস্তে কথা বলা ধরেছিল, ধরেছিল স্যুপ খাওয়া। বেচারা! মাইনে কমে গিয়েছে। আহা, কোট নেই, টাই-শার্ট নেই। এখন কী একটা জঙ্গুলে জামা পরে আসরে নেমেছে। হাতের লোম-দেখানো জামা, কারু কারু বা বুকের, যাদের বুক গলা থেকেই শুরু; ছি ছি, এ জামাটা যে কী করে সম্ভ্রান্তের সভায় পাঙ্‌ক্তেয় হল কে বলবে। জহরকোর্টটা তবু সহ্য করা যায়—ওটার নিচে গা-হাত-ঢাকা আস্ত-মস্ত পাঞ্জাবি থাকে। কিন্তু এই বুশ-শার্ট ? যেমন চরিত্র তেমনি নাম। ঝোপঝাড়েরই যোগ্য জামা।

তার মানে অবস্থা পড়ে গিয়েছে। সেই জেল্লাজমক নেই। নেই সেই উঁচু নাকের তীক্ষ্ণতা। জামাকাপড়ও ময়লা-ময়লা মনে হল। আয় কমে গিয়েছে, দেখাবেই তো অমন শাদাসিধে ময়লা-ময়লা। কত কমে না জানি স্টার্ট নিল! কী দরকার ছিল অল্প মাইনেতে রাজি হওয়ায়। অবশ্য বরেন যেটা মাইনে দিচ্ছিল সেটা কৃত্রিম—এখন বোঝা যাচ্ছে, সেটা বরেনের শয়তানি, ঝগড়ার আগুনটা যাতে ভালো করে জ্বলে তার ইন্ধন। ঝপ করে গোড়াতেই অত মাইনে হয় না—সেটা বুঝেছে বলেই হয়তো কম মাইনেয়, ন্যায্য মাইনেয়, রাজি হয়েছে। গ্রেডটা হয়তো ভালো, পরে উন্নতি আছে, এই হয়তো আকর্ষণ।

তবু সমূহ টাকাটা তো কমল। সোনার জল তো ধুয়ে গেল। তাই বোধ হয় কিরকম একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। পলকাংশের তো দেখা, তা নিয়ে আবার গবেষণা কী! বিষণ্ণ না হাতি! বোধ হয় রোগা-রোগা দেখাচ্ছিল। ও কি এখনো হোটেলেই আছে ? হোটেলে না থেকে যাবে কোথায় ? হোটেলে থাকলেও, যেহেতু রোজগার কম, খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে—সেকেণ্ড ক্লাশ করিয়ে দিয়েছে।

আর, বিনতা তো সেকেণ্ড ক্লাশই মেয়ে, চাকরির গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক আবার এসে হাজির হবে, ধরনা দেবে দরজা ধরে। আর এবার নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত হবে না। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্য মিলবে, ক্লাশের সঙ্গে ক্লাশ, যেমন দাদা গুণমণি তেমনি বউ রাসমণি!

যাক গে, মরুক গে। কে কখন উঠছে আর নেমে যাচ্ছে তাকে নিয়ে যত রাজ্যের মানসিক বালপ্রলাপ !

কে জানে দেখতে পায় নি হয়তো। কেমন ল্যালাখ্যাপা টাইপ। তাকিয়ে একটু বা তারিয়ে-তারিয়ে দেখবে এমন ধাতই নয়। যাকে বলে সৎ ছেলে, লক্ষ্মণ ছেলে। বলত মেয়েদের মুখের দিকে তাকাই না, পায়ের দিকে তাকাই। খুব অন্যায় কাজ করো। মেয়েরা এত যে মুখের প্রসাধন করল, কপালের ঠিক উপরে চুলে কার্ল দিল কিংবা চোখের পালকগুলোকে লম্বা করল সে তো পুরুষদের দেখাবার জন্যে। এখন বরং না দেখাটাই অসৎ, অন্তত অশালীন। এখন যে পুরুষ দেখে না, সে হয় খ্যাপা, নয় ভণ্ড।

নয় সে শত্রু !

ড্রয়িংরুমেই ডাকল বরেন।

কাকলির একবার ইচ্ছে হল, বলে পাঠাই, শরীরটা ভালো নেই। হয়তো তাতেও নিশ্চিন্ত একলা থাকা যাবে না। অসুখ? কী অসুখ? ব্যস্ত হয়ে উঠে আসবে উপরে। মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া অসম্ভব। আর যখন শরীরে অসুস্থতার তপ্ত প্রমাণ পাবে না, বাইরে বেরুবার জন্যে পিড়াপিড়ি করবে, আর দোষ দেব কাকে, ক্রমশই নির্ধারিতের দিকে প্রধাবিত হতে চাইবে।

কোথাও যদি একলা চলে যাওয়া যেত। নির্জন কোনো পাহাড়ের দেশে, অনেক পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট একফালি সবুজের উপর ছোট্ট একটি কাঠের ঘরে, পাশ দিয়ে বয়ে যেত একটি কালো জলের ঝরনা, পাথরে বাধা পেলেই ফেনায়িত শাদা—আর চারদিকে স্তব্ধ আনন্দের মত উদার-উত্তাল পাহাড়। চুপটি করে মুখ বুজে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে শুয়ে থাকত কাকলি, কেউ তার খোঁজও পেত না, জানতও না ঠিকানা। যদি বা কেউ আসতও শেষ পর্যন্ত, দেখত, যার ঝরনা হবার কথা, সে পাথর হয়ে রয়েছে।

শরীর যে খারাপ তা নিজে গিয়েই জানানো উচিত।

'এই নিন, ফর্ম নিয়ে এসেছি।' কাকলি নামতেই একটা কাগজ বরেন এগিয়ে ধরল।

কাগজটা পড়ে মিষ্টি করে হাসল কাকলি। বললে, 'নোটিশ অফ ইনটেণ্ডেড ম্যারেজ। কি, সই করতে হবে?'

'হ্যাঁ, আর দেরি করে লাভ কী!' বরেন পকেট থেকে কলম বের করল।

কাকলি বসল। বললে, 'এই নোটিশ দেবার তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে?'

'তার আগেও হতে পারে।'

'আগেও হতে পারে?' হাসিটা আরো একটু প্রস্ফুট করল কাকলি।

'আসলে নোটিশটা একমাসের নোটিশ। ম্যারেজ অফিসর এই নোটিশের পর এক মাস অপেক্ষা করবে কোনো আপত্তি পড়ে কিনা। যদি আপত্তি পড়ে, আরেক মাসের মধ্যে তার বিচার করে দেবে অফিসর। যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, পরে আরো এক মাস। আর যদি আপত্তি না পড়ে, তা হলে তো নোটিশের এক মাস অন্তেই—' বরেন আগের জায়গা ছেড়ে কাকলির পাশে এসে বসল।

'আপত্তি—আপত্তি কিসের?' একটু বা ভীত-ত্রস্ত মুখ করল কাকলি: 'কে আপত্তি করবে?'

'কেউ না—আপত্তির কোনো স্কোপই নেই। যা-তা আপত্তি করলেই চলবে না। আপত্তি চলতে পারে যদি আমরা কেউ ইডিয়ট হই—'

'তা, ইডিয়ট? ইডিয়ট কে নয়?' কাকলি হাসল: 'স্থলবিশেষে কমবেশি সকলেই তো ইডিয়ট। বিশেষত যারা বিয়ে করে।'

জোরে হাসল বরেন। বললে, 'সে অর্থে নয়। শরীরিক অর্থে। মানে যদি আমরা কেউ জড়বুদ্ধি হই, কিংবা উন্মাদ হই।'

'উন্মাদ!' চোখে আবার টলটলে হাসি আনল কাকলি।

'মানে, জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত করবার জন্যে উন্মাদ নয়, উন্মাদ মানে বায়ুরোগগ্রস্ত। যাকে বলে, ক্ষিপ্ত। বাতুল।'

'আর কী আপত্তি চলতে পারে?'

'যদি আমরা রক্তের আত্মীয় হই, মানে যদি প্রহিবিটেড ডিগ্রির মধ্যে পড়ি।'

'সে তো এ জন্মে অসম্ভব।'

'কিংবা যদি আমার বয়েস একুশ আর তোমার বয়েস আঠারোর কম হয়।'

'বয়েস? এখন তো ফাঁকা মাঠ। গাছও নেই পাথরও নেই।'

'কিংবা যদি আমার পূর্বতন কোনো স্ত্রী বা তোমার পূর্বতন কোনো স্বামী বেঁচে থাকে।'

'বেঁচে থাকে!' মুহূর্তে কাকলির মুখ ম্লান হয়ে গেল: 'কিন্তু ও তো এখনো বেঁচে আছে।'

'কে বেঁচে আছে?' জীবন-মৃত্যুর কথা নিয়েও বরেন দিব্যি লঘু হতে পারে: 'তুমি কার কথা বলছ?'

'আপনার বন্ধু— সেই—'

'তুমি স্থকান্তর কথা বলছ ?'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল কাকলি।

'সে কি আর তোমার স্বামী ?' শিশুর মুখে ভুল অথচ গম্ভীর কথা শুনে লোকে যেমন হাসে, তেমনি হেসে উঠল বরেন।

সে হাসিতে যোগ দিল কাকলি। শিশুর মতই মুখ করে বললে, 'সত্যিই, আমি কী বোকা !'

একটু বা করুণা হল বরেনের। বললে, 'কী ছেলেমানুষ !'

নিজেকে শাসন করল কাকলি। হাসি মুছে ফেলে মুখে রাগ আনল। বললে, 'কথাটা আমি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারি নি। সত্যিই তো, ও তো এখন একটা রাস্তার লোক আমার কাছে। ও তো ক্রস্‌ড-আউট, ক্যানসেল্ড।' ছোট গোল টেবিলটা টেনে নিল সামনে। বরেনের হাত থেকে কলমটা কুড়িয়ে নিল। টেবিলে ফর্মটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'বলুন কোথায় সই করতে হবে। আমিই আগে সই করব ? না, বাধা নেই। উই হিয়ারবাই গিভ ইউ নোটিশ—'

বরেন আগের কথার জের টানল : 'তুমি যতই কেননা ক্রস মারো, ওর স্বামিত্ব যায় নি।

'যায় নি মানে ?' রুখে উঠল কাকলি : 'কোর্টের ডিক্রি নেই ?'

'স্বামীত্ব মানে স্বামী হবার কর্তৃত্ব। শুনছি নাকি ওও বিয়ে করছে।'

'তা আর বিচিত্র কী। কংসরাজের বংশধর গঙ্গারামও তো বিয়ে করেছিল।'

'আর বিয়ে করছে তো তোমার বন্ধুকে। বিনতাকে।'

'কাকে ?'

'বিনতা সেনকে।'

'বিশ্বাস করি না। বিনতা এত বোকা নয় যে, সামান্য চাকুরে এক আফিসের কেরানীকে বিয়ে করবে। আগের মাইনেপত্র থাকত, তবু না হয় কথা ছিল।'

'যেখানে গেছে সেখানে আগের মাইনেপত্র পেতে কোনো বাধা নেই। তা ছাড়া', সিগারেট ধরাল বরেন : 'তা ছাড়া বিনতার লক্ষ্য স্বামী তত নয় যত পুরুষ। অর্থ তত নয় যত সামর্থ্য। স্থকান্তর চাকরিটা একদম চলে গেলে কী দাঁড়াত বলা যায় না। যা হোক একটা চলনসই যখন জুটেছে, তখন আর তাকে নিরস্ত করে কে ! বোকা তো নয়ই বিনতা, ঝানু মেয়ে, মহাঝানু, ঘুঘুদের মহারানী। নইলে ভাবতে পারো কোনো মেয়ে সাধ করে ব্যভিচারিণী সাজতে চায় ?'

'আপনি শুধু ওকে দুষছেন কেন ?' ঝলসে উঠল কাকলি : 'আপনার গঙ্গারাম

বন্ধুই বা কী! ঐ মেয়েকেই তো দিব্যি পছন্দ করছে। কী আছে ওর মধ্যে। ঐ তো রূপের ছিরি, দেখলে হরিভক্তি পালিয়ে যায়। তারপর যে নিজের থেকে তেড়ে আসে হন্যের মত—'

'কাকে কার ভালো লাগে তুমি কিছুই বলতে পারো না। যে তেড়ে আসে, তাকে হয়তো একজনের ভালো লাগে আর যে নড়েও বসে না, তাকে হয়তো আরেকজনের।' হাসিভরা দীর্ঘ দৃষ্টিতে কাকলিকে স্পর্শ করল বরেন।

'যাক গে। মরুক গে।' আবার ফর্মের উপর ঝুঁকে পড়ল কাকলি: 'পরের কথায় মাথা ব্যথা করে লাভ নেই। বলুন কোথায় সই করব।'

'দাও আমিই আগে করি।' কলমটা টেনে নিতে চাইল বরেন।

'কেন, আপনি আগে কেন?'

'শত হলেও আমি পুরুষ। আমারই দায়িত্ব বেশি।'

'দায়িত্ব-সমান সমান। আমি আগে যেহেতু আমার আগ্রহ বেশি।' প্রায় ঠোকাঠুকি লাগে বোধ হয়।

বরেন ছেড়ে দিল। বললে, 'বেশ, তুমিই আগে করো। শত হলেও তুমি সিনিয়র।'

'সিনিয়র?'

'সিনিয়র ইন এক্সপিরিয়েন্স।'

হাসতে লাগল কাকলি। কিন্তু সই করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল। বললে, 'আজ দিন কেমন?'

'দিন কেমন মানে?'

'না, ভালো দিন না হলে সই করব না। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। শুভদিন দেখেই এর আরম্ভ হোক।' উঠে পড়ল কাকলি: 'দাঁড়ান, মায়ের জ্যোতিষীকে ডাকাই। পাঁজিপুঁথি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে দিক। অদিনে-অক্ষণে সই করলে কে জানে হয়তো সুফল ফলবে না—'

'তুমি এসব মানো?'

'যুক্তি দিয়ে মানি না। কিন্তু যুক্তিই তো সব নয়। শেষে একটা কিছু হোক তখন খুঁতখুঁতুনির অন্ত থাকবে না—'

গায়ত্রী কাছেই ছিল, ঘরে ঢুকে বললে, 'আমি আজই ডাকাচ্ছি জ্যোতিষীকে।' যদিও মেয়ের এই বাজে কথাটায় তার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কথাটা যখন উঠেই পড়েছে তখন সাধ্য নেই যে সেটাকে অতিক্রম করে।

'ঠিক আছে।' উঠে পড়ল বরেন: 'সেই সঙ্গে দিনটাও ঠিক করিয়ে নেবেন।'

'সে তো নোটিশের এক মাস পরে।' গায়ত্রী বললে, 'আচ্ছা দেখছি। যত শিগগির হয়—'

'আজ চলি।' উঠে পড়ল বরেন। একবার তাকাল কাকলির দিকে। মনে হল যেন একটা অচেষ্টার স্তূপ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আশ্চর্য, ওর এই অস্পৃহতাটুকুও সুন্দর। এই আলস্যের স্তূপের মধ্যেই ঘুমন্ত বিদ্যুৎ। না, আর দেরি নেই। মোচন-মন্থনের আসবে সেই কালো রাত।

দরজা পর্যন্ত এগিয়েছে, গায়ত্রী কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুই যাবি নে?'

'আজ আমার একটু অন্যত্র কাজ ছিল।' গাড়িতে বেরিয়ে গেল বরেন।

মেয়ের উপর ঝাঁজিয়ে উঠল গায়ত্রী: 'তুই আবার দিনক্ষণ দেখতে শিখলি কবে? রেজেষ্ট্রি করা বিয়েতে আবার দিন কী! তাও বিয়ের দিন না, নোটিশের দিন!'

'লোকে কোনো কারবারে নামবার আগে দিন দেখে না?' যদিও দুর্বল শোনাচ্ছে তবুও বললে কাকলি, 'কোর্টে আর্জি দাখিল করতেও দিন দেখে। যে কোনো কনট্র্যাক্ট সই করতে।'

'একবার তো দেখেছিলি কত! শালগ্রাম সাক্ষী রেখেছিলি।'

'সত্যি, কোনো মানে হয় না। কিন্তু কী জানি কেন, মনটা হঠাৎ কুট করে দংশন করল। কেন বা একটু ত্রুটি থাকবে। যাই বলো সংস্কার বড় আস্তে মরে। কই, তুমিও তো পারলে না ঝেড়ে ফেলতে।'

'আমার ভয় দেরি দেখে না সরে পড়ে।'

'আর আমার আশা, দেরিতে না ভালোবাসা জেগে বসে। যাবে কোথায়?' উপরের সিঁড়ি ধরল কাকলি: 'আর যদি একবার ভালোবাসা জাগে, তবে পাহাড়েও নৌকো চলে।'

সকাল-সকাল, তিনটে বাজতেই আফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল কাকলি। জয়ন্তীদের ইস্কুল সে জানে। চারটের ছুটি হবার আগেই দাঁড়াল গিয়ে গেটের সামনে। কতদিন সেন্টুর খোঁজ নেওয়া হয় নি। কত বড়টি না জানি হয়েছে। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই এতদিনে।

সব এক রঙের পোশাক মেয়েদের। কোমরের বেল্টে বোতামেও এক রঙ। চুলের রিবনেও। চট করে বেছে নেওয়া মুশকিল।

ইস্কুলের বাস-এ যাওয়া-আসা করে না জয়ন্তী। ইস্কুল তো আর খুব দূরে নয় বাড়ি থেকে, হেঁটেই যায়-আসে।

'এ কে, ছোট বউদি না ?' জয়ন্তীই চিনতে পেরেছে প্রথমে।

হেসে এগিয়ে এল কাকলি। বললে, 'ও সম্পর্ক যে আর নেই জানো না ?'

'জানি বৈকি। তবে তোমাকে কী বলে ডাকব ? কাকলি-দি ?'

'কিছু বলে ডাকতে হবে না।'

'তুমি এদিকে কী মনে করে ?'

'এমনি এসেছিলাম একটা কাজে। হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাড়ির সকলে ভালো আছে ?'

'আছে।'

'তুমি ?'

একটু লজ্জিত হল জয়ন্তী : 'আমি তো ভালোই।'

'সেণ্টু ?'

'ভীষণ দুষ্টু হয়েছে। ভর্তি হয়েছে ইস্কুলে। এতক্ষণে এসে গিয়েছে ওর বাস। পিঠে ব্যাগ বেঁধে কী ভারিক্কি চালে ওঠে-নামে যদি একবার দেখ।'

'আমার কথা আর কিছু বলে ?'

'কিচ্ছু বলে না।'

'কিচ্ছু বলে না ?' ছাইয়ের মত মুখ করল কাকলি।

'ভুলে-টুলে গিয়েছে সব। ছোড়দাও আর বাড়িতে থাকে না কিনা। কথা আর নেই তোমাদের সম্বন্ধে। ওর এখন নতুন জগৎ হয়েছে, ইস্কুল, ইস্কুলের বন্ধু বই খাতা রঙ পেইন্টিং বক্স। তাইতেই মশগুল হয়ে আছে ছেলেটা। তবে তোমাকে দেখে কী করে, বলা যায় না।' কৌতূহলে উজ্জ্বল চোখ তুলল জয়ন্তী : 'যাবে একবার বাড়ি ? সেণ্টুকে দেখবে ?'

'না।' ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাকলি বললে।

'আমাদের বাড়ির চেহারাটা বদলে যাচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে চট করে চিনতে পারবে না।'

'কেন ?'

'তেতলায় ঘর উঠেছে। সব নতুন করে মেরামত চুনকাম হচ্ছে।'

'তেতলায় বিনতা থাকবে বুঝি ?'

'কে বিনতা ?' বেশিক্ষণ কপালে চোখ রাখতে হল না জয়ন্তীর : 'ও! যার সঙ্গে ছোড়দার বিয়ে হচ্ছে! মা যাকে বিনীতা বলে। বলে, আগের বউ ছিল পাখির ডাক, কেঁচকেঁচি—এখন কেমন বিনীতা, শান্ত-শিষ্ট—'

'তোমার মাকে খুব পটিয়েছে বুঝি।'

'তাই হবে।'

'আর, তারই জন্যে তাকে বুঝি তেতলার ঘরে মাথায় করে রাখছে!'

'কী বলো, নতুন বউদি এখানে থাকবে কোথায়?'

'এখানে, তোমাদের বাড়িতে থাকবে না?'

'না। ছোড়দা নতুন ফ্ল্যাট নেবে। সেখানেই থাকবে।' বিজ্ঞের মত মুখ করল জয়ন্তী: 'এখানে থাকতে গেলেই তো অ-সুখ। গোলমাল।'

'তবে তেতলার ঘরে থাকবে কে?'

'মা বলছেন, মা। কাকিমা বলছেন, কাকিমা। দু-জনে টানাটানি চলছে। চলো না,' কাকলির আঁচলটা চেপে ধরতে চাইল জয়ন্তী: 'এই মোড়টা ঘুরলেই তো আমাদের বাড়িটা দেখা যাবে—'

'আমার অন্যত্র কাজ আছে।' পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেল কাকলি।

জয়ন্তী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দেখল কাকলির ভিড়ের মধ্যে গাড়ির মধ্যে মিশে যাওয়া।

কিন্তু জয়ন্তীর সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় এলেও কাকলি ভিতরে ঢুকতে পারত না। ভদ্রমহিলারূপেও না। ছল করে জয়ন্তীদের ইস্কুলের নতুন মাস্টারনী সেজেও না।

কেননা, ভিতরের পরিবেশ ঠাণ্ডা নয়। মৃণালিনীর গলার তখন চড়া রঙ।

'ছোট ভাই বড় ভায়ের মাথার উপরে থাকবে এ কোন দিশি শিষ্টাচার! এ কিছুতেই চলবে না, পারে না চলতে।'

'তার মানে তুমি আমাকে তেতলায় উঠতে বলো?' ভূপেন প্রবলতর আপত্তি করল: 'আর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমার হার্ট পটোল তুলুক?'

'তা, তুমি দোতলায় থাকো, আমি তেতলায় উঠি। কতদিন আমার সাধ নিজের মনের মত একখানা নিরিবিলি ঘর পাই।' শীতের দিনে কার্পেট, গ্রীষ্মের দিনে খসখসের বেড়া আর শীতলপাটি—বই আর বই, রেডিও, ফোন, আর ফ্রিজিডেয়ার—তা যা আমার সাধের সোয়ামী—কানাকড়িরও মুরোদ দেখলাম না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও নিজের পয়সায় যে এই ঘর তুলল, সেই হেমেন যেমন-কে-তেমন তার নিচের ঘরেই থাকবে?' ভূপেনের ন্যায়বুদ্ধিতে বাধল বোধ হয়।

'থাকলই বা। নিজের খরচে একটা ঘরই না হয় তুলে দিল দাদাকে। মানুষে দেয় না? দেয় না ছোট ভাই?'

'কিন্তু দাদা তো চায় না তেতলা। বরং তোমারই তো ড্রয়িংরুমের শখ। হেমেন তেতলায় গেলে নিচের ঘরটা ড্রয়িংরুম হতে পারবে। লোকজন আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, শোবার ঘরে ঢোকালে আব্রু যায়—এসব তো তুমিই নিবারণ করতে চাইতে।'

'তাই বলে আমি তেতলা ছাড়ব কেন? তোমার ড্রয়িংরুমের দরকার হয় তুমি সেখানে বসে ড্রয়িং করো গে—'

'ঘর যদি আমার টাকায় হত,' ভূপেন তবু ছাড়ে না ওকালতি: 'তুমি তা দাবি করতে। আর এখন যখন আমার টাকায় হচ্ছে না, তখনো তুমি তা দাবি করবে, এটা কোনো শাস্ত্রেই ঠিক নয়।'

'তোমার টাকায় হচ্ছে না কেন? কথা ছিল বাড়িওলা নিজের খরচে করে দেবে— বাড়িয়ে নেবে বাড়িভাড়া, সে কথা কেন রইল না?'

'বাড়িওলা রাজি হল না। আর আমারও হাতে নতুন ঘর তৈরির পয়সা নেই।'

'পয়সা নেই তো নতুন ঘর তৈরির অনুমতি দিলে কেন?'

'হেমেনের ইচ্ছে পরিবারকে থিতু করে, বড় করে, বিস্তীর্ণ করে।' ঝড়ের মধ্যে পড়েছে, জলের ঝাপটাকে আর ভয় করে না ভূপেন: 'আস্তে আস্তে আরো ঘর তোলে তেতলায়—'

'আহা, কেমন সবাইকে থিতু করছে সংসারে! সুন্দর ছেলেটাকে বাড়ির বার করে দিলে।' মৃণালিনী কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল।

'একটা ছেলে বাড়ির বার হয়ে গেলেই পরিবার ভেঙে যায় না। ভূপেন শুকনো গলায় বললে, 'কত ছেলে বিদেশে যায় চাকরি করতে, তা সত্ত্বেও সাবেক বাড়ি এজমালিই থাকে।'

'থাকো তোমাদের এজমালি নিয়ে।' আঁচলে মুখ ঢাকল মৃণালিনী: 'আমি সুকুর কাছে চলে যাব।'

'সে কোথায়? সে তো হোটেলে।'

'না, না, সে ফ্ল্যাট নেবে, তার বিয়ে দেব, মেয়ে প্রায় ঠিক।'

'সে তো ভালো কথা। কিন্তু তাদের দু-তিন কুঠুরির ফ্ল্যাটের একটা ঘর তুমি মারবে কী!' ভূপেন হতাশ্বাসের মত নিশ্বাস ছাড়ল: 'আবার ওদের জায়গা কম পড়ে যাবে। হৃদয়ের সমস্ত সংকীর্ণতা স্থানাভাবের জন্যে। সুকুর আর বউমার যে

ঝগড়া হত, তারও মূলে ঐ ছোট ঘর, একখানি ঘর, স্থানের অনটন। তাই স্কুর যদি ফের সংসার হয়—তুমি তোমার ফোন রেডিও ফ্রিজিডেয়ার নিয়ে সেখানে ঢুকো না, ওদের শান্তিতে থাকতে দিও।'

'এখানেও দেখব তোমার কেমন শান্তি।' কান্নার মধ্যেই শাসাল মৃণালিনী।

'আমার আবার অশান্তি কী! তুমি তেতলায় ঘর নেবে, মক্কেল নেবে একতলায়, আর আমি সিঁড়িতে বার কতক ওঠা-নামা করতে করতেই থ্রম্বসিসে প্রাণ হারাব।'

বিজয়া হেমেনকে ফোন করল আফিসে। বটঠাকুরের শরীরটা খারাপ হয়েছে, শিগগির চলে এসো।

ডাক্তার এসে বললে, মাইল্ড হার্ট-অ্যাটাক। ভয়ের কিছু নেই। কদিন পরিপূর্ণ বিশ্রামেই সেরে যাবে। ওঠানামা বন্ধ।

'আমি বুঝি বুঝি না চালাকি?' ঘরের মধ্যে বিড়বিড় করছে মৃণালিনী: 'যাতে আমি তেতলার ঘর দাবি না করি, তার জন্যে এই ছলনা। নচেৎ সুস্থ মানুষ, অমনি একেবারে বিছানায়।'

'কিন্তু কী অধিকারে উনি তেতলার ঘর দাবি করেন! কোন আইনে!' রুদ্ধদ্বার কক্ষে হেমেনকে বলছে বিজয়া, 'টাকা যখন আমাদের, ঘরও আমাদের।'

'এক শো বার।' সায় দিল হেমেন।

'ও ঘরে আমি থাকব।'

'এ সম্বন্ধে কথা কী!'

'যখন উনি কত্তাত্তিতে পারেন না তখন উনি দিদি সাজেন!' ব্যঙ্গের টান দিল বিজয়া: 'আমি এত বড় দিদি, আমি শ্রদ্ধা পাব না, সেবা পাব না? উলটে তখন আমিও তো বলতে পারি আমি এত ছোট বোন, আমি একটু স্নেহ পাব না, প্রশ্রয় পাব না? বুঝলে না, নিজের বেলা আঁটিসাঁটি পরের বেলা চিমটি কাটি।'

'তা, দেখি না, পরে না হয় আরো একখানা ঘর তুলব তেতলায়।'

'আরো একখানা?'

'মন্দ কি। যত বাড়ানো যায় ততই তো ভালো। বাড়ানোই তো বড় হবার প্রমাণ। পাশাপাশি দুই ঘরে তোমরা দুই বোন তখন থাকবে। বউদি আর তুমি। লোকে বলবে লক্ষ্মী আর সরস্বতী।'

'পুতনা আর সূর্পনখা।' বিজয়া মুখ ফেরাল: 'কিন্তু বাড়িওলা এত সব অ্যালাউ করবে?'

'করবে।'

'ভেঙে-চুরে নতুন করে তৈরি করলেও কিছু বলবে না?'

'না।'

'না?' একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিজয়া। হেমেনের চোখভরা হাসির থেকে বুঝে নিল উত্তর। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'সত্যি?'

স্বর মৃদু করল হেমেন: 'সত্যি। বাড়িওলার থেকে গোটা বাড়ি কিনে নিয়েছি।'

'সত্যি? সমস্তটা বাড়ি আমার? আমাদের?'

'আমাদের।' হেমেন আরো মৃদু করল কণ্ঠ: 'তুমি এখুনি তা দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিও না। যদি পেট ফেটে মরে যাচ্ছ বোঝো, মাটিতে গর্ত করে বোলো, ভূমিকম্প ঘটিও, তবু পাঁচজনকে এখুনি জানতে দিও না।'

'না, না, বলব না কাউকে। কিন্তু,' হেমেনের হাত চেপে ধরল বিজয়া: 'সত্যি?'

'সত্যি?' কাকলির ফোন পেয়ে বরেনেরও সেই সানন্দ বিস্ময়।

'সত্যি। জ্যোতিষী বলে পাঠিয়েছেন আজ সন্ধে সাতটা থেকে নটা ভালো সময়। আপনি আসবেন। ফর্ম সই হবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, আর কাল দুপুরেই ম্যারেজ অফিসারের কাছে ফাইল করে দেব।'

ঠিক সময়ে হাজির হল বরেন। এসে দেখল কজন নিমন্ত্রিতও এসেছেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কাকলি। নরুকাকাকে তো চেনেনই, আর ইনি আমার কাকিমা। আর এরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এখন বলা যায় আফিস-পাড়ার: চিত্রা, মীনাক্ষী, শকুন্তলা।

না, লুকোছাপা কী! নোটিশ দেওয়াই তো রাষ্ট্র করা, দেশময় সকলের কর্ণগোচর করে দেওয়া, হ্যাঁ, তোমরাও জানো। বিয়ের নোটিশ দিচ্ছি আমরা।

বরেনই আগে সই করল। নিচে কাকলি। তারপর চলল খাওয়া-দাওয়া। অনেক হাসাহাসি। অনেক মার্জনীয় চাপল্য।

বরেনের ইচ্ছে ছিল মোটরটা ছোটায় এখন একবার রাস্তা দিয়ে। কিন্তু কাকলির আফিস-পাড়ার বন্ধুগুলো কী! কিছুতেই উঠতে চায় না, ছাড়তে চায় না কাকলিকে। চাকরি করে করে বুদ্ধিশুদ্ধিও ভোঁতা করে ফেলেছে। কাকলিকে যে এখন একটু একা থাকতে দেওয়া দরকার এটুকুও মাথায় আসে না কারো।

'এখন উঠি।' আবার তাড়া দিল চিত্রা।

'বোস আরেকটু।' কাকলি আবার বাধা দিল।

ভদ্রতায় খাতিরে কাকলি তো বাধা দেবেই। কিন্তু তুই ভদ্রলোকের মেয়ে, তুই উঠিস না কেন? তুই কেন বসে থাকিস? শেকড় গজাস?

তারপরে যা এতক্ষণ ভয় করছিল বরেন—যদি দয়া করে আপনার গাড়িতে ওদের একটু পৌঁছে দেন বাড়ি—

পরমরসিক ভাগ্যের দিকে নির্মম চোখে তাকাল বরেন।

পিছনের সিটে গদাগাদি করে মেয়ে তিনটে বসল। আর বরেন ড্রাইভারের পাশে।

পরদিন সকালে, আফিস-টাইমে, বরেন এসে তুলে নিল কাকলিকে। ম্যারেজ-আফিসে গিয়ে ম্যারেজ অফিসরের হাতে দিয়ে দিল নোটিশটা।

আফিস-টাইমের রাস্তা। ভিড় দিয়ে ত্বরা দিয়ে রোদ দিয়ে ভরা। সাধ্য নেই শিথিল হও, গা এলাও। জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত সর্বক্ষণ বসে থাকো উচ্চকিত হয়ে।

আফিসের কাছে কাকলিকে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বরেন।

কাকলি ছুটতে-ছুটতে এগুল। লিফ্‌টটা উঠতে যাচ্ছিল, কাকলিকে দেখে থামল। নেমে এল বা ... তল করল। খুলে দিল দরজা।

লিফ্‌টের মধ্যে তখন শুধু একজন যাত্রী। আর সে সুকান্ত।

·৪৮·

দু-জনের বুকের মধ্যেই টুক করে শব্দ হল সমস্বরে।

জলে-স্থলে এমন অসম্ভবও হয় নাকি? এটাকে কী বলা যাবে? এটা অন্তরীক্ষে সম্ভব।

বিধাতাপুরুষ বলে যদি কেউ থাকে—এখন ভাবতে মন্দ লাগছে না যে তেমন কেউ একজন আছে,—তা হলে অদৃশ্য থেকে নিশ্চয়ই এখন চোখ পিটপিট করে হাসছে। নইলে এত রসিকতা কার!

দেয়ালের দিকে সরে গেল সুকান্ত। আর দরজার কাছে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাকলি।

সুকান্ত ভাবছিল, কতটুকুই বা ব্যবধান। কিন্তু মধ্যখানে এক সমুদ্র জল। শুধু নয়, ঝড়বৃষ্টি। আকাশছেঁড়া বিদ্যুতের বেত। সাধ্য নেই এ তুমি ডিঙোও ইহজীবনে। সাধ্য নেই।

কোথায় একটা সুইচ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট রাজপ্রাসাদ অন্ধকার। কোথায়

যে সে সুইচ কারু জানা নেই। হাতড়ে-হাতড়ে মরলেও আর তাকে পাওয়া যায় না খুঁজে। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। অথচ যদি দুটো সূক্ষ্ম তার একত্র করা যেত, এর মুখের সঙ্গে মেলানো যেত ওর মুখ, তা হলে আলোতে উথলে উঠত দশ দিক ঘরে-বারান্দায় ঝলমল করে উঠত রাজপ্রাসাদ।

নেই, নেই আর সেই কারিগরের হাত। জাদুকরের হাত।

কয়েক সেকেণ্ডের তো মামলা, দেখতে-দেখতে এসে যাবে দোতলা, যেখানে সুকান্ত নামবে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকার সুড়ঙ দিয়ে বেগে ট্রেন ছুটেছে, আর সে সুড়ঙের যেন শেষ নেই কোনোদিন।

সেই সেদিনের মত লিফ্‌টটা না বিগড়ে যায়। তা হলেই রসিকতাটা ষোল কলায় ভরে ওঠে।

সুড়ঙের শেষে আলোর আভাসে যেমন স্বস্তি আসে তেমনি দোতলাটা আসতে আরাম পেল সুকান্ত। লিফ্‌টম্যান দরজা খুলে দিল। আর পরিচ্ছন্ন অস্পর্শে, সুভদ্র কুণ্ঠায়, সুকান্ত বেরিয়ে গেল। আঁচলের দূরতম নিশ্বাসও গায়ে লাগল না। যেতে যেতে ফিরেও তাকাল না একবার।

খুব বাহাদুরি দেখিয়েছে। মনে মনে নিজের জিভ কামড়াতে লাগল সুকান্ত একটা নমস্কার করা তো উচিত ছিল, অন্তত শূন্যে ছোট্ট করে একটু কপাল ঠোকা শত হলেও সম্ভ্রান্ত একজন অফিসর তো। পদস্থকে সম্মান দেখানোই তো শালীনতা আর যদি পদস্থ বলে তার জানবার কথা না-ও থাকে, অনন্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহিলা বলে তো সে জানে। সে ক্ষেত্রে নম্র চোখে মুখের দিকে তাকাতে কী বাধা ছিল? আর, মুখের দিকে না তাকিয়েই বা কী করে স্থির করল যে এ কাকলি। হাওয়ার উপর ভাসা-ভাসা দেখেই কি সিদ্ধান্তে আসা যায়? অমন স্নিগ্ধতার ভঙ্গি তো বিরল নয় সংসারে। ধ্যানমুকুরে যা আছে কোথাও তার অস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া দেখলেই সে কাকলি হবে?

উচিত ছিল সোজাসুজি তাকানো। একটু বা তীক্ষ্ণ চোখে দেখা, নতুন প্রেমের আলো কেমন ফেলেছ মুখের উপর, নতুন সুখে কেমন জ্বলছ সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য, এটুকুও তার সাহস হল না, নিজেই কেমন গুটিয়ে গেল, যেন যত অপরাধ সমস্ত তার। কী, কেমন আছেন? এইভাবেও তো, নির্ভীক নির্মল সম্ভাষণ করতে পারত। কেমন ফেলতে পারত বেকায়দায়। কিংবা, ব্যঙ্গের একটু অদৃশ্য টান দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারত, কী, চিনতে পারেন? যেন গঙ্গা দিয়ে কিছুমাত্র জলই বয়ে যায় নি। নিস্পৃহ মুখে আবহাওয়া নিয়েও দুটো মামুলি কথা বলতে পারত। কদিন ধরে

বিশ্রী গরমই না পড়েছে! কিংবা, বাস-এ ট্র্যামেই আসা-যাওয়া করেন নাকি? গাড়ি কেনেন নি এখনো? কিংবা বরেনের কী খবর? নিশ্চয়ই কোনো উত্তর দিত না। তার মানে ওই হেরে যেত। অনায়াসে অপরাধী করে রেখে আসতে পারত ওকে।

মূর্খ—এত বড় সুযোগ কি আর আসবে কোনোদিন?

কথা বলতে সাহস করে নি, নাই করেছিল, কিন্তু চোখের দিকে তাকাতে চাইল না কেন? চোখের দিকে তাকাতে আর কোন সাহসের দরকার! চোখ এত জিনিস দেখতে অভ্যস্ত, দেখতে ইচ্ছুক, এখানেই বা তার কার্পণ্য হল কেন? বেশ তো, মজা দেখত। দেখত তার চোখে কী লেখা! রাগ, না ঘৃণা: বিতৃষ্ণা, না বিরক্তি। নাকি ভদ্র উপেক্ষা, ভদ্রতর ঔদাস্য। নাকি শুদ্ধ অমনোযোগ। সুকান্ত তাকালে কী হবে, ও মুখই ফেরাত না, তুলতই না চোখ। নমস্কার করলে কী হত? ফিরিয়ে দিত নমস্কার? তখন কি একটু চোখোচোখি হত না, ভক্তির বহর দেখে হাসত না চোখের কোণে? কে জানে, নমস্কারও লক্ষ্যের মধ্যে আনত না। যারা খুব বেশী সম্ভ্রান্ত, উচ্চারূঢ় ও অহংকারী, তারা জনসাধারণের নমস্কার গ্রাহ্যও করে না; তুমি যে নমস্কার করলে তাতে তুমিই ধন্য এমনি উদার ভাব করে থাকে। নমস্কার অপ্রত্যর্পিত থাকলে গায়ে পড়ে নতুন অপমান নেওয়া ছাড়া আর কিছুই হত না। তা ছাড়া, কে জানে, যেমন সপ্রতিভ মেয়ে, হয়তো স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিত নমস্কার কিন্তু ফিরেও তাকাত না। লোকটা যে নমস্কার করছে তা লক্ষ্য না করেও অনেকে নমস্কার ফেরাবার কৌশল জানে। তার চেয়ে যদি বলত, 'শুনুন!' তা হলে চোখে চোখ না রেখে থাকতে পারত কাঠ হয়ে? কোনো অজানা কথা শোনবার জন্যে উৎসুক হয় নি, কান খাড়া করে নি এমন মেয়ে আছে নাকি সংসারে? বেশ তো, আচমকা 'শুনুন' শুনে চমকে চাইত না হয় একবার, না হয় চোখের মধ্যেই চাইত, কিন্তু কী শোনাত জিজ্ঞেস করি? কী শোনাবার আছে ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে যেত দোতলায়।

নামবার সময় একটা ধাক্কা দিয়ে গেলে কেমন হত? তাড়াতাড়িতে, আফিস-টাইমে, অমন এক-আধটু ঠোকাঠুকি হয়েই থাকে। খুব সাবধান হবার ভঙ্গি দেখিয়ে অসাবধানে গা লাগাবার কায়দা তো বাস-ট্র্যামের ভিড়ে হরদমই দেখা যাচ্ছে। কী হত তা হলে? চেঁচিয়ে উঠত? লিফ্‌টম্যানটাকে দিয়েই ধরাত? আউটরেজিং মডেস্টি বলে কেস করত? কী সাফাই গাইত সুকান্ত? বলত, নামবার সময় অসাবধানে আমার হাতের একটা আঙুলের সঙ্গে ওর হাতের একটা

আঙুলের শুধু মৃদু কথোপকথন হয়েছে। বিশ্বাস করত কেউ, বিশ্বাস করত কাকলি নিজে ?

কতরকমভাবে জব্দ, নাকাল, নাস্তানাবুদ করতে পারত। অটল অহংকারকে দিতে পারত গুঁড়ো করে। চাই কি, টুঁটি টিপে ধরে খুন করতে পারত। তারপর যা হয় তা হত, এমন সুযোগ তো আর আসত না। এমন সঙ্গহীন সন্নিহিত সুযোগ। ছি ছি, জীবনের কত বড় একটা শুভক্ষণ সে ধুলোয় ফেলে দিয়েছে। এর পর লিফ্‌টে উঠতে কত সতর্ক হবে কাকলি। অগ্রপশ্চাৎ দেখে নেবে। চাই কি, আফিস থেকে মেয়ে-অর্ডালি নেবে। নয়তো পুলিশ এস্কর্ট।

কিন্তু যতই কেননা স্ফীত-সমৃদ্ধ হোক, খুব টান-টান খটখটে দেখাচ্ছে না তো। বরং ছায়া-ছায়া, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। কে জানে, অহংকার দেখাবার এ এক নতুন রীতি। ভিতরে আসলে সৌভাগ্য-গর্বের মহীরুহ, বাইরেতে তৃণসম। তুমি বাইরের লোক, তুমি আমার সোনার খনির কী খবর জানবে, তুমি দেখ আমার এই নিরাভরণ সারল্য। আমি জানি আমি কী খাই, কী পরি, কার গাড়িতে ঘুরে বেড়াই, কোন সুখের ঘরে আমি রূপের আলো। কোন কাঞ্চনদ্রুমে আমি সম্ভোগের ব্রততী।

ছি, ছি, দৈবযোগে সন্নিহিত হয়েছিল বলে মনে-মনে গবেষণা করছিল এতক্ষণ আহা, কত নমস্য, চেয়েছিল নমস্কার করতে। চোখে কত পুণ্য ঝরছে, চেয়েছিল দেখতে। আর গা ভরা কত পবিত্রতা, চেয়েছিল আঙুলের ডগায় তুলে নিতে এক কণা।

দ্রুত পায়ে কোন কক্ষের গহ্বরে মিলিয়ে গেল সুকান্ত।

ও এখানে কেন ? কী মনে করে ? কোনো কাজে-কারবারে এসেছে ? নাকি ওর চাকরিটাও এই আফিসেই ? এই আফিসে তো মাইনে কত ? ঐ তো চেহারা, নিশ্চয়ই অফিসার গ্রেডের নয়। অফিসার গ্রেডের নয় তো কী সাহাস লিফ্‌টে ওঠে ? হঠকারিতা এখনো গেল না ? মাইনেটা কপালে লেখা থাকে না বলেই এত স্পর্ধা ?

কাকলির সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ল। এত কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল যেন হৃৎপিণ্ডে ছুরি মারবে কিংবা শাড়ির খোলটা দেখবে হাত বুলিয়ে। কিন্তু আজ সেই কাছে দাঁড়িয়েও কত দূর। সাধ্য কী কথা কয়, একটু বা মুখের দিকে তাকায় সাহস করে। কেমন ছায়া পর্যন্ত না ছুঁয়ে দেয়ালের ধার দিয়ে পালিয়ে গেল ইঁদুরের মত। দাঁড়াও, খোঁজ করতে হয়। বাজে লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠবে।

একটা ফুলপ্যাণ্ট আর বুশশার্ট পরলেই মান্যগণ্য দেখায় না। তা ছাড়া সেদিনের চেয়েও পোশাকটা ময়লা আর কুঁচকোনো মনে হল। চেহারাটা রোগা-রোগা। আধপেটা-খাওয়া। লিফ্‌টম্যানের আপত্তি করা উচিত ছিল। বলা উচিত ছিল, আপনাদের জন্যে সিঁড়ি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে বলা দরকার, এদিকে কড়া নজর রাখা বিধেয়। কত মেয়েও তো কাজ করে এ আফিসে, লিফ্‌টে চড়ে। আজেবাজে লোক ঢুকে পড়াটা ঠিক নয়। মাঝপথে কারেণ্ট অফ হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।

সেদিন সন্ধের দিকে কাকলি একাই বেরুল।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

হাসল কাকলি। গায়ত্রী বললে, 'উত্তরটা আমার জন্যে নয়। বরেন কদিন আসছে না। যদি আজ আসে, তোর দেখা না পায়, জানতে চায় তুই কোথায়, তখন একটা কিছু বলতে হবে তো ?'

'তার জন্যেই তো বলছি না।' মা যাতে কিছু না মনে করে তার জন্যে অদ্ভুত করে হাসল কাকলি: 'বলবে কিছু বলে যায় নি। ওর যা খুশি ও অনুমান করে নেবে।'

কথা শুনে গায়ত্রীর স্বস্তি হলেও সুখ হল না।

সদরের কাছে গিয়ে আবার ফিরল কাকলি। বললে, 'বোলো ওর ওখানেই গিয়েছি। মাঝে মাঝে ওর ওখানেও তো আমার যাওয়া উচিত। ওর বাবা, ওর বাড়ির লোকজনও আমাকে একটু দেখুক।'

এবার নিঃসন্দেহ সুখী হল গায়ত্রী।

কাকলি সটান বিনতার হস্টেলে এসে হাজির হল।

তীরে ঠেকা নোঙরের নৌকোর মত মনে হচ্ছে বিনতাকে। বল নেই, ভরসা নেই, গা-ভাসানো চেহারা। ঘরে আলোটা যে জ্বালবার জন্যে তাও যেন তার জানা নেই।

কাকলি আলো জ্বালতেই হকচকিয়ে উঠল বিনতা। শুয়ে ছিল, উঠে বসল। 'এ কী, তুই ?'

'সেদিন কী ঝগড়া করলাম বল তো—'কাকলি তক্তপোশে বসল মুখোমুখি।

'সত্যি, কোনো মানে হয় না।' হাসিভরা মুখে সায় দিল বিনতা।

'আমি এলাম তোর কাছে আর তুই কিনা বললি তোর দাঁড়াবার সময় নেই।'

'আর তুই কিনা গাড়ি দেখালি!' হাসিটা বাঁচিয়ে রেখেছে বিনতা। বললে, 'যাক, আবার না ঝগড়া হয়। আজ তোর গাড়ি নেই তো ?'

'আর তোরও আজ তাড়া নেই নিশ্চয়ই।' হৃদ্যতার স্বর আনল কাকলি: 'একা ঘরে অন্ধকারে কী ভাবছিস?'

'একটা সমস্যায় পড়েছি।' বিনতাও প্রতিধ্বনি করল: 'তুই পরামর্শ দিতে পারিস?'

'যদি গোপন কিছু না হয়, যদি আমাকে বলতে আপত্তি না থাকে—'

'আহা, আমার যেন কিছু গোপন আছে!'

'কিন্তু যাই বল গোপনই সুখের আধার।' কাকলি হাসল: 'কথায়ই বলে, চোরি পীরিতির লাখগুণ রঙ্গ—'

'এক রঙ্গই হল না, তায় লাখ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিনতা: 'কিন্তু সমস্যাটা তা নয়—'

'তবে?'

'শিলিগুড়ি ইস্কুলে একটা চাকরি পেয়েছি।'

'কেন, সেখানে চাকরি পেতে গেলি কেন?'

'অ্যাপ্লাই করেছিলাম।'

'তা হলে তো যাবিই। কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে গেলি কোন সুখে?'

'কোন দুঃখে বল। এখন কথা হচ্ছে চাকরিটা নেব কিনা—'

'কেন, শিলা গুঁড়ো করতে অত দূর কেন? কলকাতায় কি শিলা নেই?'

সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল বিনতা। পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'শিলা হয়তো আছে কিন্তু গুঁড়ো করবার অস্ত্র নেই।'

'নিষ্ঠাই অস্ত্র।'

'তার মানে?'

'শুধু লেগে থাকা, ঘেঁষে থাকা, ছেড়ে না দেওয়া।' নিজেই বুঝি একটু ঘেঁষে এল কাকলি। বললে, 'শোন, একটা সুখবর আছে।'

'সত্যি? তোর বিয়ে হচ্ছে?' উলসে উঠল বিনতা।

'তা তো হচ্ছেই।'

'হচ্ছে? কবে?'

'নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অবজেকশান না পড়লে যথাশীঘ্র।'

মুখের কথা কেড়ে নিল বিনতা: 'অবজেকশান আবার কী!'

'জানি না। তবে তার মেয়াদ এক মাস। তাও ফুরিয়ে এল।'

'তা হলে আসছে মাসেই তোর বিয়ে? তা হলে আর আমি শিলিগুড়ি যাই কেন?'

'সুখবর সেটা নয়। সুখবর অন্য।'

'অন্য?' সুখবরও যেন কত ভয়ের হতে পারে তেমনি মুখ করল বিনতা।

'সুখবর মানে তোর বিয়ে।'

'আমার?' হাসির ঘায়ে বিনতার আবার বিদীর্ণ হবার জোগাড়: 'কার সঙ্গে?'

'শোন', লঘুতার হাওয়া একদম উড়িয়ে দিল কাকলি: 'তুই যা খবর পেয়েছিলি তা ঠিক নয়। সুকান্তবাবুর চাকরিটা যায় নি।'

'যায় নি?'

'বরেনবাবুদেরটা গেলেও অন্যত্র পেয়েছে। তার মানেই যায় নি। শার্টে-প্যাণ্টে টিঁকে আছে।'

'মাইনে কত?' গলাটা নামাল বিনতা।

'তা ঠিক বলতে পারব না। তবে যখন নিয়েছে চাকরি, তখন নিশ্চয়ই তা ফেলনা নয়। শত হলেও ভদ্রলোক এম-এ তো। তা ছাড়া শুনতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতেই উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং,' প্রায় মিনতির সুর আনল কাকলি: 'ওকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।'

'আমি ওকে ছাড়লুম কোথায়,' করুণ করে তাকাল বিনতা। 'ওই আমাকে ছাড়ল।'

'ও ছাড়ল?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মত করল কাকলি: 'ও ছাড়বে কেন?'

'মনে হচ্ছে ও আর বিয়ে করতে চায় না।'

'ও বিয়ে করতে চায় না?' অবিশ্বাসের হাসি হাসল কাকলি: 'ওর সর্বাঙ্গ চায়। ও তো বিয়ের জন্যেই তৈরি, পরিবার প্রতিপালনের জন্যে। পাখির যেমন আকাশ ওর তেমনি বিয়ে।'

'তা তুইই ভালো জানিস।'

'তাইই তো বলছি তোকে। ও চায় আরাম, আদর, আলস্য। উত্তপ্ত শয্যা আর শীতল ঘুম। এক কথায় যাকে বলে গার্হস্থ্য সুখ।' একটু বুঝি বা অন্যমনস্ক হল কাকলি: 'হোটেল-ফোটেল ওকে পোষাবে না। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। বেশে-বাসে শ্রীর নামগন্ধও থাকবে না। বিয়ে করতেই হবে তাকে, যদি বাঁচতে চায়। ও বিয়ের জন্যেই তৈরি।'

'কিন্তু আমার জন্যে নয়।' বিনতা জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

'কে বললে?'

'ও ভালোবাসায় এখানো বিশ্বাস করে।'

'আর তুই?'

'আমি আসঙ্গ বিশ্বাস করি।'

'ও একই কথা।' নিশ্চিন্ত-প্রসন্ন মুখ করল কাকলি: 'আসলে আসঙ্গের জন্যে যে সঙ্গ তারই নাম ভালোবাসা। কিংবা বলতে পারিস রতির জন্যে যে আরতি।'

'সুন্দর বলেছিস কিন্তু। কিন্তু যাই বলিস, আমি ওকে আমার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহান্বিত করতে পারলুম না।' বিনতা আবার জানলার বাইরে তাকাল।

'সে ত্রুটি ওর নয়, তোর।'

'তাতে আর সন্দেহ কী।'

'তোর মানে তোর আর-কিছুর নয়, তোর আঙ্গিকের, টেকনিকের। তোর প্রকার-প্রণালীর।'

'তাই হবে।'

'অত হতাশ হয়ে বলবার কী হয়েছে!' যেন শাসন করে উঠল কাকলি: 'আসলে তোর ত্রুটি হচ্ছে ধৈর্যের অভাব, লেগে থাকার দৃঢ়তার অভাব। মাটির কলসীর ছোঁয়ায় পাথর ক্ষয়ে যায়, ক্ষুদ্র জলের ফোঁটায় পাহাড় ধসে; আর তুই বলছিস কিনা তুই ওতে ফাট ধরাতে পারলি না, তুই হেরে গেলি—'

চুপ করে রইল বিনতা।

'শোন, তুই সেদিন বলছিলি, তোর সোহিনীর সাজ নয়, তোর মোহিনীর সাজ। তোকে ওসব কিছুই সাজতে হবে না, তুই সহজ হয়ে যা। কিংবা যদি সাজতেই চাস, সেবিকার সাজ নে। সেবা থেকেই স্নেহ জাগবে। আর স্নেহ-দেহ একত্র হলেই ভালোবাসা। তাই বলছি এ নতুন রাস্তায় চেষ্টা করে ছাখ।'

'কী হবে চেষ্টা করে!'

'অন্তত ওকে তো পরীক্ষা করে দেখতে পাবি। দেখতে পাবি কত খাঁটি ওর নিস্পৃহতা, কত খাঁটি ওর ভালোবাসায় বিশ্বাস।' কাকলি চোখ নামাল।

আবার চুপ করল বিনতা।

'তা ছাড়া তোকে ও প্রত্যাখ্যান করবে আর তুই তা মেনে নিবি? তুই তার প্রতিশোধ নিবি নে? তোর তূণে ব্রহ্মাস্ত্র থাকতে তুই তাতে মরচে পড়তে দিবি?

ওকে জড়াবি নে নাগপাশে ? তারপরে সেই দেখবি, বিয়ে এসেছে, বাসা এসেছে, পরে ভালোবাসাও এসেছে।'

হাসল বিনতা : 'তা হলে বলতে চাস শিলিগুড়ি যাব না ?'

'ককখনো না। কলকাতায় শিল গুঁড়ো করতে পেলে কে যায় শিলিগুড়ি ?' কাকলি উঠে পড়ল : 'যা সুকান্তবাবুর খোঁজ কর গিয়ে। ছাখ আমার সংবাদ ঠিক কিনা। ও মনোযোগ পাবার বিষয় কিনা। তারপর, একটু ধৈর্য ধরলেই দেখবি ওও বেঁচেছে তুইও বেঁচেছিস—'

হাসতে হাসতে চলে গেল কাকলি।

আফিসফেরত শুয়ে আছে, কলিং বেল বাজল। যখন ডবল বেজেছে তখন নির্ঘাত বরেন।

চাকর এল নিচের থেকে, গায়ত্রী পাশের ঘর থেকে।

'শুনেছি। যাচ্ছি ধীরে সুস্থে।' কষ্টে-সৃষ্টে উঠল কাকলি : 'বসুক। বসতে বলো।'

ফিটফাট হয়ে নিচে নামতেই বরেন বললে, 'বিপদ হয়েছে।'

'কী বিপদ ?' মুখ পাংশু হয়ে গেল কাকলির।

'কে এক অপর্ণা বিশ্বাস আমাদের বিয়েতে অবজেকশান দিয়েছে।'

'কে অপর্ণা বিশ্বাস ?'

'কী করে বলব ?'

'কী বলছে আপত্তিতে ?' কাকলি বসল মুখোমুখি।

'বলছে তোমার আগের বিয়েটা নাকি চালু আছে। মানে তোমার স্বামী বর্তমান।'

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : 'এই আপত্তি ? এতে অত ঘাবড়াবার কী আছে ?'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেননা আপত্তি গ্রাউণ্ডলেস, নিরর্থক। কিন্তু,' বরেনের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল : 'দেরি তো করিয়ে দিলে।'

'তা কটা দিনেরই বা দেরি। ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি কে এই শত্রু ?'

'সেই আপত্তিকারিণী অপর্ণা বিশ্বাসকে তো ম্যারেজ অফিসারের কাছে আসতে হয়েছে সশরীরে।'

'আসতে হয়েছে ? তবে এ অপর্ণা বিশ্বাস কাল্পনিক কেউ নয় ?'

'কী করে হবে? আইন বলছে, যে আপত্তি করবে তার আপত্তি ম্যারেজ নোটিশ বইয়ে লিপিবদ্ধ হবে আর সে তা পড়ে নিজের হাতে বই দস্তখত করে দেবে। সুতরাং অপর্ণা বিশ্বাস বলে কোনো মহিলা সশরীরে এসেছিল আফিসে তাতে আর সন্দেহ নেই।'

'এসেছিল না হাতি, সুকান্তই পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'হতে পারে। কিন্তু তাতে সুকান্তর লাভ কী!'

'লাভ শত্রুতাসিদ্ধি।' জ্বলে উঠল কাকলি: 'আমি একটা ভালো ঘরে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হই এ ওর অসহ্য।'

'কিন্তু এ আপত্তি ও টেঁকাবে কী করে?' বললে বরেন, 'তারপর যখন অফিসর দেখবে আপত্তি মিথ্যে তখন ঐ অপর্ণা বিশ্বাসকে ছেড়ে দেবে নাকি? মিথ্যে আপত্তি দেওয়ার জন্যে তার শাস্তি হয়ে যাবে।'

'ও মা, তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। ভাবছি ঐ রিস্‌ক সুকান্ত নিতে যাবে কেন?'

'ঐ যে বলেছেন দেরি করিয়ে দেওয়া, পাগলের গো-বধে আনন্দ—'কী যেন চিন্তা করল কাকলি: 'তবে এ কি বিনতার কাণ্ড? অপর্ণা বিশ্বাস নাম যে ফিকটিশাস তা তো বুঝতেই পাচ্ছি, কিন্তু মেয়ে একটা তো ঠিক এসেছিল আফিসে। কী দুর্দান্ত সাহস। স্বয়ং বিনতাই নয় তো—ঠিকানা, ঠিকানা দেয় নি?'

'ঠিকানা দিলেও সঠিক দেবে নাকি? বরানগর কি যাদবপুর—একটা দিয়ে দিলেই হল।'

'তাই বলে মিথ্যেবাদী পার পেয়ে যাবে?'

'তাকে ধরবে কোথায়? কে সনাক্ত করবে? সে হয়তো আর দেখাই দেবে না।'

'মাঝখান থেকে আমাদের দেরি।'

'তা আর কী করা!' বরেন গাঢ় চোখে বিদ্ধ করল কাকলিকে: 'যত দেরি ততই আবার খিদে। যত বসা ততই আবার বাসনা। তোমার ভয় নেই। বার করব এই অপর্ণাকে। দেখি—' আস্তে আস্তে উঠে একাই চলে গেল বরেন।

কথাটা বনবিহারীর কানে তুলল গায়ত্রী।

'চারদিকে যে কত শত্রু তার ঠিক নেই। এমন সরল বিয়ে, তাতে কে আবার অবজেকশান তুলেছে।'

'তুলেছে?' আনন্দে উথলে উঠলেন বনবিহারী: 'আমি তখনই জানতাম কেউ না কেউ আপত্তি জানাবেই। এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না।'

'কী হতে পারে না?' গায়ত্রী ধমকে উঠল।

নিজেকে সামলালেন বনবিহারী: 'কেউ আপত্তি করবে না এ হতে পারে না। যেহেতু একদা তুমি আমার উপকার করেছ সেহেতু তুমিই আমার উপাস্য হয়ে থাকবে—তুমি ত্রাণ করেছিলে বলে তোমার হাত থেকে আমার ত্রাণ নেই—এ অত্যাচারের কোথাও একটা প্রতিবাদ হবে না এ হতে পারে না। আপত্তি না টিঁকুক, তবু আপত্তি একটা হওয়া দরকার।'

'তোমার ইচ্ছে দিয়েই তো আর সংসার চলছে না।' গায়ত্রী আপত্তি করল: 'এখানে মেয়ের ইচ্ছেই একমাত্র গ্রাহ্য।'

'আর তার মায়ের ইচ্ছে।' ব্যঙ্গ মেশালেন বনবিহারী।

'যেটা সকলের আনন্দের ব্যাপার সেটায় তোমার কেন অনিচ্ছা?' মুখিয়ে উঠল গায়ত্রী।

'তোমাদের কাছে পুণ্য হতে পারে কিন্তু আমার কাছে পাপ—মহাপাপ।' বললেন বনবিহারী, 'এই অত্যাচারই ব্যভিচার।'

'যা আমাদের পুণ্য তা তোমারও পুণ্য।'

'তা হয় না, হতে পারে না। সূর্য পদ্মের কাছে পুণ্য, পেঁচার কাছে পাপ। তোমরা হয়তো বেশি দেখছ তাই তোমাদের স্ফূর্তি, কিন্তু আমি দিবান্ধ, আমি অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখছি না।'

কদিন বরেন আসছে না দেখে কাকলিই গেল তার সন্ধানে। আপত্তিটার কী গোত্র-চরিত্র তার কোনো নির্ণয় হল কিনা তার সন্ধানে। তা ছাড়া দেবনাথের কী ব্যবস্থা হল সে ব্যাপারের একটু তাগিদ দেওয়া দরকার।

গিয়ে শুনল বরেন বাড়ি নেই।

'কী বলতে হবে?' জিজ্ঞেস করল বেয়ারা।

হাসল কাকলি। বলবে, 'মিস মিত্র এসেছিল।'

'কে এসেছিল?' হোটেলে ফিরে নতুন বয়টার উপর ঝলসে উঠল সুকান্ত।

'বললাম তো এক মেয়েছেলে—'

'খুব তুই বোঝালি আমাকে। বলি দেখতে কেমন?'

'দেখতে?' ঢোঁক গিলল চাকর: 'এই ঢ্যাঙা মতন পাতলা মতন—কিন্তু না, অত ঢ্যাঙা হবে না বোধ হয়, একটু বেঁটেসেঁটেই বোধ হয় হবে।'

'গায়ের রঙ ?'

'বেশ ফর্সা—দাঁড়ান, একটু কালচে-কালচেও হতে পারে—'

'নাম—নাম বলে নি কিছু ?'

'বলেছে।'

'কী নাম ?'

'দাঁড়ান। কী যেন—ব, ব, ব—'

'মোটেই ব-ব-ব নয়। দেখ ভেবে, ব-এ আঁকড়ি আছে কিনা।'

'আঁকড়ি ?' দু হাতে মাথা চুলকোতে লাগল বয়।

'হ্যাঁ, দেখ, সেটা ক-ক-ক কিনা।'

'হ্যাঁ,' লাফিয়ে উঠল বয় : 'হ্যাঁ, ক-ক-কই হবে। আরে, নামটা তিনি কাগজে লিখে দিয়ে গেছেন যে। আমার তাই এতক্ষণ মনে ছিল না।'

কাগজটা নিয়ে এল ভিতর থেকে।

সুকান্ত দেখল বিনতা সেন।

এক গ্লাশ জল চেয়ে নিয়ে খেল সমস্তটা। বললে, 'আমি এখন আবার বেরুচ্ছি।'

বিনতাই এতকাল এসেছে। এখন সুকান্ত একবার যাক। ঝড়ে যে কোনো বন্দরই আশ্রয়নীয়! সংসারে প্রেম না থাক, কারুণ্য তো আছে।

·৪৯

মন আবার দুর্গমের পথ ধরে।

মন শুধু মধুর রসেরই ঝরনা নয়, মন আবার কঠিনের উপত্যকা।

কী উপেক্ষা আর ঔদাস্য দিয়ে ভরা। এমন একখানা ভাব করে দাঁড়িয়েছে যেন পায়ের তলার পৃথিবী একটা মৃৎপাত্র ছাড়া কিছু নয়। যেন সর্বাঙ্গে লোহার বর্মের জামা আঁটা। যেন কোথাও একটা আঁচড় পড়ে নি, একেবারে নিদাগ, নিভাঁজ। পৃথিবীর কোনো ক্ষুধাতৃষ্ণার খবর রাখে না, দুঃখ কী দারিদ্র্য কী কামনা কী কলঙ্ক কী এসব জন্মেও শোনে নি। যেন জীবনের কোন এক নিষ্কর জমি ভোগ করছে। তুমি যে এত সামনে দাঁড়িয়ে আছ, তুমি মানুষ না অশরীরী ছায়া, ভ্রূক্ষেপ নেই এতটুকু।

অহংকারে মটমট করছে। অনেক টাকা হয়েছে, অনেক গরমাই। অথচ এ পথে সুকান্তই টেনে এনেছিল, মদিরার পাত্র সুকান্তই প্রথম ধরেছিল মুখে। সুকান্ত না থাকলে কোনো স্বাধীনতাই তো হত না, না টাকা রোজগারের স্বাধীনতা, না খোলা হাওয়ায় হাঁফ ছাড়ার স্বাধীনতা। সুকান্তের ছায়ায়ই তো খোলসছাড়া সাপের মত জ্বলজ্বল করতে পারছে। অথচ এতটুকু সৌজন্য নেই। মৃতের প্রতিও তো লোকে নম্র হয়, শ্রদ্ধালু হয়। সুকান্ত মৃত ছাড়া আর কী।

'আরে, আপনি এখানে?' ইস্কুলফেরত বিনতা হস্টেলে আসছে, দরজার সামনে সুকান্তকে দেখে খুশির ফুলঝুরি হয়ে উঠল।

'আর কারু জন্যে নয় নিশ্চয়ই।' সুকান্তও হাসল।

'আমি বলেছি আর কারু জন্যে? আমি ছাড়া আর কে আছে? কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।' বিনতা ত্বরান্বিত হয়ে উঠল।

ইতস্তত করতে করতে সুকান্ত বললে, 'কিন্তু ভিজিটার্স লিস্টে আমার তো নাম নেই।'

'আমার ভিজিটার্স লিস্টই নেই। আমিই আমার ভিজিটার। আসুন।'

ভিতরের ঘরটা, অর্থাৎ ভিজিটার্স রুমটা, বাইরে থেকে খানিক দেখা যাচ্ছে। সুকান্ত বললে, 'ভিজিটার আর ভিজিটেড কেমন সব মুখোমুখি বসেছে। সবাই আর খাঁটি গার্ডিয়ান নয়, কী বলো, ফল্‌সও আছে।'

'ফল্‌সই বেশি। যাদের কপোতের ভঙ্গি দেখছেন, তারাই সব অলক-দা, অশোক-দা—'

'না, না, দা আজকাল নেই! দা সেকেলে, এক যুগ আগের। এখন নিরুপাধি। এখন শুধু অলক-অশোক দীপক-অলোক। না, না, ওখানে ওদের দলে বসে আলাপ করতে পারব না। আমাদের আলাপ অনেক উচ্চগ্রামের।'

'ওখানে বসে আপনাকে আলাপ করতে বলছে কে? আপনি শুধু একটু ওয়েট করবেন। আমি চেঞ্জ করে আসব।'

'আসুন। আমি রাস্তার ঐ পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে পারব।'

'রাস্তায় কেন?' একটু বুঝি বা ভুরু কুঁচকোল বিনতা।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেই বেশি ভালো লাগে।'

'আচ্ছা, তাই। আমার বড় জোর পাঁচ মিনিট—কে বলবে শিক্ষিকা, ছাত্রীর মতই ছুট দিল বিনতা।

'না, অত তাড়া কিসের? আস্তে-সুস্থে আসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি। দাঁড়িয়ে-

দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি। চলতে-চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তা দেখতে বেশ লাগে।'

অত কথা কানে ঢুকল কিনা কে জানে।

অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে ছিল সুকান্ত, পাশে দাঁড়িয়ে কে বললে, 'এই যে।'

চমকে উঠল সুকান্ত।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিনতা বললে, 'দশ মিনিট লেগে গেল।'

'দশ মিনিট!' সুকান্ত হাসল: 'আমি ভাবছিলাম, গেলেন আর এলেন। আরো দশ মিনিট লাগালেও টের পেতাম না বোধ হয়। তা,' বিনতাকে একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল সুকান্ত: 'তা, এর মধ্যে মন্দ সাজগোজ করেন নি।'

'কী যে বলেন! তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যা পেলাম তাই পরে এলাম।'

'তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে সিল্কের রঙিন শাড়িই তো পাওয়া যায় অহরহ।'

'তা রঙিন পরলামই বা! শিক্ষিকা বলে আমি কি ঠাকুমা?'

'না, না, এখন আর আপনি শিক্ষিকাই বা কোথায়? আপনি তো এখন ছাত্রী।'

'ছাত্রী?'

'হ্যাঁ, পাঠশালার ছাত্রী।'

'পাঠশালার? কোন পাঠশালার?'

'প্রেমের পাঠশালার।'

'তার মানে প্রমোশন আর পাচ্ছি না। প্রাইমারি সেকশানেই পড়ে আছি।'

'তবে অপেক্ষা করে থাকতে পারলে কী হয় বলা যায় না।' আশ্বাসভরা চোখে তাকাল সুকান্ত।

'কিছুই বলা যায় না।' সায় দিল বিনতা: 'হ্যাঁ, জোর করে কিছু হবার নয়। রাতারাতিই আর ফুল ফোটে না।'

হাঁটছে দু-জনে।

'বা, ফুল তো রাতারাতিই ফোটে।' বললে সুকান্ত, 'যদি গাছ তৈরি থাকে। বলতে পারেন গাছই রাতারাতি তৈরি হয় না। গাছ তৈরি হলে অস্থি বল্কল ফল পুষ্প ভস্ম নির্যাস সব তৈরি।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল বিনতা।

'জানি না।'

'ভিড় কাটিয়ে-কাটিয়ে যেতে হচ্ছে।

আমাকে খবর দিলে আমিই তো যেতে পারতাম আপনার হোটেলে।' ভিড়ের
লায় দূরে ছিটকে গিয়েছিল, আবার নতা

'সে তো এখনো যেতে পারেন কিন্তু বারে-বারে একই পরিবেশ ভালো লাগে
। বলুন, লাগে?'

'না, লাগে না। বেশও বদলাতে হয়, পরিবেশও বদলাতে হয়। তাতেই
ত্রের বাজনা। আকাশে কখনো শাদা কখনো নীল কখনো কালো। কখনো
র্ষা কখনো বিদ্যুৎ কখনো রামধনু।'

ভিড়ের মধ্যে কি কথা জমে?

মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

উঠল দু-জনে। বসল পাশাপাশি। কাটল অনেকক্ষণ নির্বোধ স্তব্ধতায়।

মনে হচ্ছে ট্যাক্সিতেও জমছে না। কী যেন কী একটা নেই। কিংবা কী
একটু বেশি থাকার জন্যে কেটে যাচ্ছে। ছবিতে কোথায় যেন রঙ পড়ে নি,
ংবা কে জানে রঙটা বোধ হয় বেশি উচ্চস্বর।

ফাঁকায়-ফাঁকায় আলিপুর-খিদিরপুর ঘুরলে কি সুর আসবে? কিংবা হ্রদে-
দীতে? লেকে-গঙ্গায়?

'আপনি তো ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার এলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল
কান্ত?

'ছেড়ে দিয়েছিলুম মানে?'

'বা, সেই যে চলে গেলেন আমার চাকরি নেই শুনে—'

'চাকরি নেই শুনে? একদম বাজে কথা।'

'বা, তাড়াতাড়ি চলে যান নি সেদিন?'

'না গিয়ে করি কী! আপনি নিজেই বললেন, চাকরি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে
ছে। আপনি মুখ ম্লান করে বসে আছেন। কিরকম ভগ্ন রুগ্ন বিধ্বস্ত চেহারা
পনার। সেই শোকের মুহূর্তে সব কিছু বিস্বাদ লাগতে বাধ্য। তাই না ফিরে
রি কী! নইলে সেদিন কত আশা করে গিয়েছিলুম আপনার কাছে—'

'জানেন আমার চাকরি আবার হয়েছে।'

'জানি।'

'কী করে জানলেন? কে বললে?'

'কে আবার বলবে! হাওয়াতে কান পেতে থাকলেই শোনা যায়। আমি
পনাতে ইনটারেস্টেড—আপনার খবরে স্বভাবতই আমার আগ্রহ।'

'তাই বুঝি আবার আমার দরজায় আপনার সদয় পদার্পণ হল।'

'মোটেই তার জন্যে নয়। আপনাকে ছাড়লুম কবে যে ফিরলুম বলছেন? ছাড়া আপনার বর্তমান চাকরিতে মাইনেটা তো কম।'

'তাও জানেন?'

'শুনেছি।'

'আর এ শোনেন নি যে, কদিন বাদেই সিলেকশান কমিটির সামনে আ ভাইভাভোসি টেস্ট হবে। সে টেস্টে যদি উতরোই তা হলে সুপিরিয়র ে পেয়ে যাব। শোনেন নি সেটা?'

'শুনি নি তো।' ঢোঁক গিলল বিনতা: 'যদি উতরোতে না পারেন?'

'তা হলে, হে বন্ধু, বিদায়।'

'বন্ধু কে? আমি?'

'না, চাকরি। হে চাকরি, বিদায়।'

শুধু চাকরি-বাকরি ইনটারভিয়ুর কথা। অন্য কত কথা কত স্তব্ধতা আ সংসারে। সেসব পাখিরা কোথায়? কোন দেশে উড়ে পালাল ঝাঁক বেঁধে কোন দিগন্তে?

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'চলুন পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে, গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটি।'

'তাই চলুন।' তা হলে যেন একটা অস্বস্তি থেকে বিনতাও রেহাই পায় এমনি চাঞ্চল্যে বলে উঠল।

কিন্তু সেই অল্প-অল্প আলো গা-ছমছম নিভৃতিতেও কোনো কথা কেউ কুড়ি পেল না।

'এই সম্পর্কটাই তো মধুর।' বললে সুকান্ত।

'কোনটা? এই একসঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে হাঁটা?'

'হ্যাঁ, এই সহচরণ।'

'তা আর বলতে। কিন্তু পথ যদি দীর্ঘ হয়? যতটা ভাবি নি তার চেয়েও বে হয়? দীর্ঘতর হয়?'

'হোক। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম।'

'কিন্তু পথ শেষ হবার আগেই যদি ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়ি আর যদি সহচর সঙ্গে দু বাহুতে তুলে নেন?'

'তা হলে সেই তো পর্বতলঙ্ঘন। সেই তো মধুমত্তম।'

যে যা বলতে চেয়েছিল কিছুই যেন বলতে পারল না। সুকান্ত বলতে চেয়েছিল, ধ যেতে-যেতে ভালোবাসা যদি জাগে— আর, ভালোবাসা জাগাবার জন্যই পথ ।— তা হলে সেই জাগরমুহূর্তেই তো অর্পণ-প্রাপণ। আর বিনতা চেয়েছিল তে, যদি পথের কোনো ক্লান্ত বিন্দুতে অর্পণ-প্রাপণ ঘটে যায়, তা হলে সেই তো লোবাসা।

তা হলে দুটোর একটা আসুক। হয় ক্লান্তি, নয় প্রেম।

কিন্তু পারল কি একে অন্যের কাছে বাজতে সেই ইশারায়? যেন সমস্তই স্থুল গেল।

'চলুন কাছেই চীনে হোটেল আছে। কিছু খাই।' চলতে-চলতে বললে সুকান্ত।

'তাই চলুন। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, হস্টেলে তখন খেতে দিলেন কই? টেনে বার করে নিয়ে এলেন।'

'তা, এতক্ষণ বলেন নি কেন? পেটে খিদে মুখে লাজ এখনো?'

'সেই তো ট্র্যাজেডি।'

খেতেও ভালো লাগল না। কী যেন মশলা বাদ পড়েছে রান্নায়। কী যেন স্বাদটি খোয়া গেছে। কী যেন সুরটি এসে লাগছে না খিদেতে।

সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে বিনতার। দেখে সুকান্তর মায়া হল।

'ইচ্ছে করছে হাত দিয়ে মেখে খাই।' করুণ চোখে তাকাল বিনতা।

'একদিন আমার হোটেলে আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব।'

'সত্যি?' খুশিভরা চোখে বিনতা তাকাল: 'খুচরোখাচরা খাওয়া নয়, পুরোপুরি ওয়া। মানে ভাত খাওয়া। খুচ খুচ করে কেটে-গেঁথে খাওয়া নয়, হাত দিয়ে খে গরস পাকিয়ে খাওয়া।'

'নিশ্চয়ই। নইলে নেমন্তন্ন কী।'

'ভাজা থেকে শুরু, দইয়ে-মিষ্টিতে শেষ। দেখছেন তো আমার খিদে।'

'খাবার পরে পান, না?'

'নিশ্চয়ই, মুখভরা পান। নইলে কি মশলা? দুটো সুপুরির কুচো আর কটা চদানা? মুখভর্তি পান না হলে আর নেমন্তন্ন কী? আর শুনুন, নেমন্তন্ন কিন্তু ত্র।'

'তা আর বলতে।'

'আর, শুনুন, সন্ধের দিকে যাব আর অনেকক্ষণ থাকব।'

স্বর বুঝি আবার কেটে গেল।

কিংবা স্বর বুঝি এবার জোর করেই কাটিয়ে দিতে হয়। স্বর কাটিয়ে দিলে যদি স্বর বাজে। তার ছিঁড়ে গেলেই যদি ঝংকার ওঠে।

বাস-এই ফিরে গেল বিনতা। সুকান্ত ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভার বললে, 'কোথায় উত্তর দিল না। সুকান্ত সিগারেট ধরাল।

ড্রাইভার ভাবল গন্তব্যস্থান জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হচ্ছে না। নাকবরাবরই গ চালাল।

কতক্ষণ পরে তন্দ্রার মধ্য থেকে বলে উঠল সুকান্ত, 'কোথাও যেতে হবে না ফাঁকায়-ফাঁকায় ঘোরো খানিকক্ষণ।'

ফাঁকায়-ফাঁকায় ঘুরবে তো সঙ্গের লোক কই? কতরকম মজার লোকই যে গু ট্যাক্সিতে।

হোটেলে ফিরে এসে আলো নিবিয়ে বাসি বিছানাতেই শুয়ে পড়ল সুকান্ত চাকরেরও এসে কিছু বিরক্ত করবার দরকার নেই, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। না, ভ কী, আজকেই তো আর বিনতার নেমন্তন্ন নয়।

চারদিকে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, বিশৃঙ্খলা— মশারিটা পর্যন্ত খাটানো নেই। ডাই ক্লিনিং থেকে আসা আর ডাইং ক্লিনিং-এ যাব-যাব সব কাপড়চোপড় বুঝি তালগোল পাকিয়ে আছে। সিগারেটের ছাই গাদা হয়ে আছে কদিন থেকে। কাগজপত্র স এলোমেলো, ছত্রখান। চাকরটাকে ডেকে যে সব সজুত করবে যেন তার স্পৃহা নেই দিন কেটে যাচ্ছে যাক। যখন যেটুকু দরকার তখন সেটুকু হাতের কাছে পেলে হল। যাকে দরকার নেই, সে থাক বিস্মৃতির জঞ্জালে।

চায়ের একটা পেয়ালা-পিরিচ বুঝি মেঝের উপর নামানো ছিল, নেয় নি চাকর আর ইঁদুর বুঝি এখন সে দুটোর উপর হামলা করেছে।

শব্দ হতেই চমকে উঠল সুকান্ত।

কেউ এল নাকি ঘরে?

একটা কী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? ফুলের গন্ধ কি, না শরীরের? নাকি মৃগনাভির সৌরভ? কোন এক তপ্ত ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে যে সৌরভ সুকান্তের পরিচি ছিল এ যেন তাই। কেউ কি ঘরের মধ্যে নড়ছে-চড়ছে? আস্ত মানুষ, নাকি শু দুখানি হাত? সে হাত কি ঘরের সমস্ত আবর্জনা ক্ষিপ্র লালিত্যে দূর করে দিচ্ছে সংশোধন করছে সমস্ত অনিয়ম? সে হাত কি আরো এগিয়ে আসছে? তা কপালের উপর বসে গলে-গলে পড়ছে?

সে হাত কি বিনতার?

স্বপ্ন দেখছিল বুঝি, ধড়মড় করে উঠে বসল সুকান্ত। ভোর হয়ে গেছে। ঘরময় বিশৃঙ্খলা তার দিকে চেয়ে হাসছে তার নৈষ্ফল্যে।

আজ বেশেবাসে কোনো বিচ্যুতি রাখতে দেবে না সুকান্ত। আজ কেতা-দুরস্ত সরকারি পোশাক পরবে। আধাখেঁচড়া কিছু নয়, পুরো সাহেবি পোশাক। আজকে আফিসে তার ইনটারভিয়ু।

সিলেকশান কমিটিতে দু-জন উঁচু দাঁড়ের অফিসার। আর কজন মেয়ে-কেরানির কেসও বিবেচিত হবে বলে কাকলিকেও নেওয়া হয়েছে কমিটিতে। সে অফিসরদের সাহায্য করবে। প্রাথমিক কাগজপত্র সেই দেখে রেখেছে। লালনীল পেন্সিলে রেখেছে দাগিয়ে।

বর্ণানুক্রমিক ডাকা হচ্ছে নাম। পদবীর বর্ণ।

গোড়ার দিকেই ডাক পড়ল সুকান্তের।

'ডাকো বসু সুকান্তকুমার।'

ঘরে ঢুকে সুকান্ত নমস্কার করল। তিনজনকেই এক নমস্কার।

তা করুক। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ না টেবিলের ওপার থেকে ইঙ্গিত হচ্ছে ততক্ষণ সে বসতে পারছে না। ভদ্র নম্র হয়ে সমীচীন ভঙ্গিতে থাকতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে।

কাকলিই বললে, 'বসুন।'

এ কাকলির কথা নয়, এ কমিটির নির্দেশ। সুকান্ত বসল।

অবিশ্বাস্য প্রকাণ্ড টেবিল, অনেকখানি চওড়া। সমুদ্রের এপার ওপার। চুপ করে প্রশ্নের প্রত্যাশায় বসে রইল আড়ষ্ট হয়ে।

বোধ হয় প্রাসঙ্গিক ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই জিজ্ঞাসাবাদে দেরি হচ্ছে!

পাশের পুরুষ অফিসর, মাদ্রাজী, ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল কাকলিকে, 'এর ফাইলটা তোমার কাছে আছে?'

'আই অ্যাম নট কনসার্নড।' নির্লিপ্তের মত বললে কাকলি, 'আমার কাছে শুধু মেয়েদের ফাইল।'

ও প্রান্তের তৃতীয় অফিসর বাঙালী। তার নথি ঘেঁটে সেও কিছু পাচ্ছে না খুঁজে।

সুতরাং আরো কতক্ষণ চুপচাপ। আর স্তব্ধতাই অতীতের চেতয়িতা। নিষ্ক্রিয় শরীরে কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেই পুরোনো দিনের কথা ভিড় করে কাছে আসে, হেঁটে-হেঁটে বেড়ায় চোখের সামনে।

কলিং বেল বাজল। বেয়ারা এসে দাঁড়াল। যাও ডিলিং ক্লার্ককে ডেকে আন।
এল ডিলিং ক্লার্ক। সংশ্লিষ্ট ফাইলটা বার করুন খুঁজে।
কোনো সুরাহা হল না। তবে এবার হেড অ্যাসিস্ট্যান্টকে খবর দাও!
ঠায় বসে আছে সুকান্ত। ঠায় বসে আছে কাকলি। কেউ কারু দিকে একবার ভুলেও তাকাচ্ছে না। মানুষ লক্ষ্য করে তাকানো দূরের কথা, সামনা-সামনিও তাকাচ্ছে না। কাকলির চোখ তার সামনেকার খোলা ফাইলে, আর সুকান্তের চোখ দূরে জানলার ওপারে।

ভারি মজা লাগছিল সুকান্তের। ঐ দু-জন পুরুষ অফিসর, বাঙালী আর মাদ্রাজী, বয়সে প্রৌঢ়, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঐ সম্ভ্রান্ত সুদৃঢ় ভদ্র-মহিলাটিরও এমন ভাব যেন তার সঙ্গে তাঁর ঘুণাক্ষরেও পরিচয় নেই। সুকান্ত যেন কোন অজানা অজ্ঞাতনামা পথের লোক। উনি যেন কোন পাহাড়ের চূড়াতে বসা অধরা, আর সুকান্ত কোন এক দীনহীন সমতলের বাসিন্দে।

কোন এক মামলার কথা শুনেছিল সুকান্ত। এক সন্ন্যাসী বহু বৎসর পরে স্বদেশে ফিরে এসে এক অভিজাতবংশীয়া বিত্তবতী মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে দাবি করেছিল। প্রমাণ কী, তুমিই তার স্বামী? অনেক প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ যা দিয়েছিল তা সাংঘাতিক দুঃসাহসিক। বলেছিল, শরীরের প্রচ্ছন্নে এমন একটা চিহ্নের কথা বলছি যা স্বামী ছাড়া আর কারু জানবার কথা নয়। এখন সাহস থাকে তো পরীক্ষা করে দেখ। লেডি-ডাক্তার ডাকো।

যতদূর শুনেছে, পরীক্ষা করাতে রাজি হন নি মহিলা। বরং প্রস্তাবের হীনতা দেখে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্যি পরীক্ষায় সে চিহ্ন পাওয়া গেলেও সেটা কিছু নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ হত না। কিন্তু যাই বলো, খুব একটা ঝুঁকি নিয়েছিল সন্ন্যাসী। যদি, ধরা যাক, মহিলা রাজি হতেন, আর পরীক্ষায় সেই চিহ্ন পাওয়া না যেত? তা হলে? তা হলে ফের সন্ন্যাসীকে যেতে হত জঙ্গলে।

টেবিলের ওপারে ঐ ভদ্রমহিলাটির সম্পর্কে তেমনি একটা কথা এখন ওঠে না? তা হলে, সবিনয়ে, মৃদু স্বরে, এমন দু-একটি চিহ্নের কথা সুকান্ত বলে দিতে পারে যা শুনলে ঐ মাদ্রাজী ও বাঙালী অফিসর যুগপৎ আঁতকে উঠবে। কী ভয়ংকর কথা! আপনি কী করে জানলেন? বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে মৃদু-মৃদু হাসবে সুকান্ত। বলবে, আমি শুনতে পারি। আমি সব দেখতে পারি দর্পণের মত।

সেই পাশাপাশি দুটি ছোট কালো তিলকে সুকান্ত বোখারা আর সমরখন্দ

বলত। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, বলত কিনা। মনে হয়, সুকান্তই যেন সেই দুই দেশ আবিষ্কার করেছিল। নইলে ব্যস্ত, বস্ত্রাবৃত কাকলির সময় কোথায় নিজের হৃদয়ের মধ্যে চোখ ফেলে।

কাঠ হয়ে আছে। আশ্চর্য, কেউ কি জানে একদিন ঐ কাঠে কী মন্ত্রে হয়েছিল মঞ্জরীরঞ্জন। শীতে-গ্রীষ্মে যত গান লেখা আছে ঐখানে, কেউ কি জানে, একমাত্র সুকান্তই জানত তার স্বরলিপি।

কেউ জানে না। ঐ বীণে কত আলাপন হয়েছে, কে সে বীণকর—এ কথা কোথাও আজ আর লেখা নেই।

কেউ মরে গেলে তার ভালোটাই শুধু মনে পড়ে। তেমনি কাকলি তো আজ মৃত। তাই তার কিছু-কিছু ভালো যে মনে পড়বে তা আর বিচিত্র কী। এখন তো চোখ না হয় ফিরিয়ে রেখেছে কিন্তু কোনো-কোনো মুহূর্তে সেই চোখে কী আশ্চর্য আলো জ্বলেছিল—যে আলো মাটিতেও নেই, সমুদ্রেও নেই—তা কি আর মুছে যাবার? ঈশ্বর বলেছিল, আলো হোক, অমনি আলো হল। ভালোবাসারও বুঝি সেই কথা। বললে, আলো হও, অমনি, মুহূর্তে এক পিণ্ড মর্ত্য কাদা আলো হয়ে উঠল। সেসব কথা কি কেউ আর বিশ্বাস করবে? কত ছোট চোখ কিন্তু একসঙ্গে কতখানি দেখে ফেলে। কত ছোট বুক কিন্তু একসঙ্গে কতখানি তুলে নেয়, চায় ধরে রাখতে। কত সুখ, কত স্বপ্ন, কত মিথ্যে। একমাত্রই তো মিথ্যে নয়। পাথরের গায়ে সে প্রত্নলিপি কি ঝাপসা-ঝাপসা এখনো পড়া যায় এক-আধটু?

আর যায় না। মুছে গেছে, ঘুচে গেছে।

সব কিছুরই শেষ হয়। ভালোবাসারও শেষ হয়।

ফাইল চলে এসেছে আফিস থেকে। প্রান্তের অফিসর দেখে মধ্যের অফিসরের দিকে এগিয়ে দিল, আর মধ্যের জন ঠেলে দিল কাকলিকে।

নোটে লেখা আছে, ক্যাণ্ডিডেট এম-এ, পরীক্ষা পাসের তালিকায় স্থান উঁচু, পূর্ব-অভিজ্ঞতাও কিছু আছে। রেফারেন্সেসও ভালো। কাজ-কর্মও সন্তোষজনক। এর সম্পর্কে আপত্তি হবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

'তবে আর কী প্রশ্ন করবার আছে?' মধ্যের অফিসরকে বললে কাকলি।

মধ্যের ও প্রান্তের অফিসর নিজেদের মধ্যে কী একটু বলাবলি করল, পরে মধ্যের জন সুকান্তের উদ্দেশে বললে, 'ইউ মে গো।'

উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। কথার ইঙ্গিতটা বুঝল সহজেই। তার প্রমোশন ও কনফার্মেশনটা হবে। তা হলে খুশি মনে একটা উদার নমস্কার করতে হয়।

এবার, কেউই সতর্ক ছিল না, প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ কাকলি ও সুকান্তের ছোট্ট একটু চোখোচোখি হয়ে গেল। কে জানে সত্যি না মিথ্যে, চোখের কোণে কাকলি বুঝি একটু হাসল। আর কে জানে সত্যি না মিথ্যে, চোখের কোণে সুকান্ত বুঝি ফোটাল একটু কৃতজ্ঞতার নম্রতা।

চোখের কাজ হচ্ছে দেখা। কিন্তু শুধু দেখেই সে তৃপ্ত নয়। সে কথা কইবে। সে হাসবে। সে ভাববে। সব শেষে সে কাঁদতে বসবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল কাকলি।

নিচে, সিঁড়ির কাছেই দেখতে পেল দেবনাথকে।

বললে, 'দাদা, তোমার কিছু হল?'

'পুরোপুরি হয় নি এখনো, তবে হব-হব হচ্ছে।'

'কি, চাকরি?'

'না, চাকরি আর কোথায়! সেই সোনার চাকরিটাই চলে গেল।'

'সে কি? তোমার আবার কবে চাকরি গেল?'

'সেই তোর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তোর কাছে হাত পাতা। মুঠোভর্তি ফিরে আসা। সে কেমন সুখের চাকরিটা ছিল বল তো?'

'এখানে বুঝি হাত পাততে সুবিধে পাও না?' ড্রয়িংরুমে চলে এল দু-জনে।

'কী করে পাব? এখানে যে তোর দয়া-মায়া কম।'

'আমার কবে আবার দয়া-মায়া ছিল?'

'ছিল, যখন তুই সেই শ্বশুরবাড়িতে ছিলি তখন ছিল। তখন দূরে ছিলি, বাবা-মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কাউকে দেখছিস না, মনটা নরম ছিল। তখন বাবার অসুখ কি মার অসুখ বলে টাকা চাইলে দ্বিরুক্তি করতিস না, দিয়ে দিতিস। এখন সব দেখতে পাচ্ছিস চোখের উপর, মায়া-দয়াও তাই আর দেখা যাচ্ছে না—'

'যত কম দেখা যায় ততই ভালো। বরেনবাবু কী বলছেন?'

'চাকরি করব না বলে দেওয়াতে তিনি আর চাকরি দেখছেন না। একটা বিজ্‌নেস—'

'কী বিজ্‌নেস?' বিরক্ত মুখে প্রশ্ন করল কাকলি।

'ফার্মিং। পৌলট্রি—'

'সে আবার কোথায়?'

'দক্ষিণের দিকে বরেনবাবুর একটা বাগানবাড়ি আছে না? সেইখানে।'

'সেখানে কী ? সেটা তো একটা বাড়ি।'

'তুই দেখিস নি বুঝি ?'

'না, যাই নি এখনো। কী আর আছে ওখানে ?'

'বাড়ি-পুকুর ছেড়ে দিই, আশেপাশে বিস্তর ডাঙা জমি পড়ে আছে। জমি মানেই ইমেনস পসিবিলিটি। সেই জমিতে এখন চাষবাস করি, না হাঁস মুরগি পালি তাই নিয়ে ভাবা হচ্ছে।'

'ভাবাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে যা হোক কিছুতে হাতে-কলমে লেগে যাও।'

'ভাবাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা সোজা নয়। জমিটা যদি দেখতিস।'

'বেশ, একদিন দেখিয়ে নিয়ে এসো।' উপরে চলে গেল কাকলি।

কতক্ষণ পরে বেল বাজল। সম্পূর্ণ ঘরোয়ায় এখনো এসে পৌঁছয় নি, এরই মধ্যে উৎপাত। কাণ্ডজ্ঞান ক্রমশই লোপ করে দিচ্ছে।

'কে ?' ঝাঁজালো মুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

চাকর বললে, 'একটি মেয়েছেলে।'

'মেয়েছেলে ?' আরামে নিশ্বাস ফেলল কাকলি : 'আসতে বলো।'

আফিস-পাড়ার বন্ধু চিত্রা এল ছুটতে-ছুটতে। ঘরে ঢুকেই, যেমন ডুবন্ত লোকে ধরে তেমনি করে কাকলির হাত চেপে ধরল : 'বাবা, বাঁচলাম এতদিনে।'

'কেন, নির্বিঘ্নে এক মাস পেরিয়ে গেল ?' হাসল কাকলি।

'বাবাঃ, কী ভয়ে-ভয়ে যে দিন কেটেছে। কেবলই মনে হয়েছে পুলিশ আসছে, এই বুঝি পুলিশ এল।'

'পুলিশের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, অপর্ণা বিশ্বাসের খোঁজে বেরুবে! কে অপর্ণা বিশ্বাস ? চোর নয়, ডাকাত নয়, খুনে নয়, জালিয়াত নয়, কোনো সেক্সুয়্যাল ক্রাইমের ভিকটিম-গার্ল নয়, অ্যাবেটর নয়, এক বিয়ের নোটিশের অবজেকটর! তাকে ধরবার জন্যে কলকাতাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াবে পুলিশ! তাদের জানাবেই বা কে ?'

'যদি জানাত! যদি ধরত আমাকে!'

'স্রেফ অস্বীকার করতিস। তোর ছবি আর তুলে রাখে নি। বলতিস, আমি যাই নি, ও সই আমার নয়।'

'মিথ্যে বলতাম ? পারতাম নাকি সত্যি ?'

'পারতেই হত। অনেক সময় মিথ্যে বলাটা মহাপুণ্য। ধর, এখন যদি ছোরা হাতে কেউ তোকে খুন করতে আসে, তুই ভয় পেয়েই খাটের নিচে লুকোস আর

লোকটা যদি ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই ঘরে চিত্রা এসেছে, আমি তখন সত্যবাদী হয়ে 'হ্যাঁ' বলব? ককখনো না। একটা মিথ্যে যখন একজনের প্রাণ বাঁচাচ্ছে তখন স্পষ্ট 'না' বলব, বলব আসে নি। মিথ্যেয় যদি কারু উপকার হয়, মিথ্যেই সত্যি।'

'উপকার!'

'বা, উপকার করলি নে? অবজেকশান দিয়ে মাসখানেক পিছিয়ে দিলি নে?'

'কিন্তু এখন—এখন কী হবে?'

'অবজেকশান নট প্রেস্‌ড, নট পাস্‌ড। অবজেকশানটা বাতিল হয়ে যাবে। আর কী হবে!'

'আর কিছু নয় তো?'

'আবার কী! বিয়ের পথে সাময়িক একটা বাধা এসেছিল, সরে গেল। পথ নিষ্কণ্টক হল। তখন থেকে বাড়ল আবার তাগাদার যন্ত্রণা। ও কি, উঠবি? একটু চা খাবি নে?'

'না। একেবারে যন্ত্রণা নিবারণের দিন এসে মিষ্টিমুখ করব।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভীতু মুখে চিত্রা বললে, 'কিন্তু যদি ভাই হাতের লেখার নমুনা নিয়ে গিয়ে ঐ সইয়ের সঙ্গে মেলায়?'

'মিলবে না। ও সই তো বাঁকা হাতে করেছিস। এখন তা নিয়ে আর ভাবনা কী। অবজেকশানই নেই তায় অপর্ণা বিশ্বাস! ঘরই নেই তার আবার উত্তর শিয়র!'

'ঘর বলে ভেঙে দে, বিয়ে বলে জুড়ে দে।' হাসতে হাসতে নেমে গেল চিত্রা।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে কাকলি।

জানে ঠিক আসবে আজ বরেন।

ঠিক বেজেছে ডবল বেল।

নিচের থেকে চাকর আর পাশের ঘর থেকে গায়ত্রী এসেছে।

মাকে বললে, 'বলে দাও, ভীষণ মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে, উঠতে পাচ্ছে না।'

'সে কী?' একটু বুঝি থমকাল গায়ত্রী।

'সে কী আবার কী! সত্যি, মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, জ্বর আসছে কিনা কে জানে। যা বলছি তাই বলো গে।'

অগত্যা গায়ত্রী তাই বলতে গেল।

'ভীষণ স্ট্রেইন হচ্ছে, কদিন ওর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল বরেন: 'এখন আর ওকে ডিস্টার্ব করব না। শুয়ে আছে, থাক শুয়ে। শুধু

সুসংবাদটা ওকে দিয়ে আসি।' বলে গায়ত্রীর পাশ কাটিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে।

ঘর অন্ধকার। দু-একটা অস্ফুট আর্তস্বরের টুকরোও বুঝি শোনা যাচ্ছে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে মাথা। আলো একেবারে সইতে পারছি না।'

'না, না, জ্বালব না আলো। খুব বেশি কষ্ট হলে আমি বলি কি, ডাক্তার নিয়ে আসি।'

'না, না, ডাক্তার লাগবে না। অন্ধকারে কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারলেই সেরে যাবে আশা করি।'

'হ্যাঁ, আমি যাই তবে। খবরটা বলে যাই। অবজেকশান রিজেকটেড হয়ে গেছে।'

'গেছে? তা তো যাবেই, সে আর বেশি কথা কী। বাজে রদ্দি অবজেকশান।'

'এখন তবে—'

'হ্যাঁ, মার জ্যোতিষীকে ডাকাই, দিনক্ষণ ঠিক করে দিক।'

'হ্যাঁ, আর দেরি করার মানে হয় না।'

'না।' পাশ ফিরল কাকলি। সংকেতে দৃঢ় হল।

নেমে গেল বরেন।

আধ ঘণ্টাটাক পরে আবার উঠে এল চাকর।

ঘরের পর্দা সরিয়ে বললে, 'বাবু এসেছে।'

গভীর একটা তন্দ্রার ঘোরের থেকে জেগে উঠে ধমকে উঠল কাকলি: 'আবার এসেছে? সঙ্গে ডাক্তার আছে বুঝি?'

'ডাক্তার? ডাক্তার তো মনে হল না।'

'বলে দে, দেখা হবে না। দিদিমণি ঘুমিয়ে আছে।'

চাকর নিচে নামল।

আগন্তুককে বললে, 'দেখা হবে না।'

'হবে না?'

'না। বললেন ঘুমিয়ে আছেন।'

'আচ্ছা।' ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

হন্তদন্ত হয়ে কাকলির ঘরে ছুটে এল গায়ত্রী। আলো জ্বালাল।

'কে, কে এসেছিল নিচে? নতুন লোক। কে ও? কে চলে গেল?'

'বা, আমি কি দেখেছি ? কে ?' ধড়মড় করে উঠে বসল কাকলি : 'দীপঙ্কর ?'

'না, না, মনে হল, আর কেউ। আমি কদিন আর দেখেছি ওকে। কিন্তু কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু ওর কী স্পর্ধা ! ও কেন আসে ?'

'বা, আমি তো দেখা করি নি। তাড়িয়ে দিয়েছি।' বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল কাকলি।

'ঠিক করেছিস। দৈব ঠিক করেছে। কিন্তু ওর স্পর্ধাকে বলিহারি। কী সাহসে ও আসে ? কত বড় শত্রু, আবার এমুখো হয় ?' জ্বলতে লাগল, কাঁপতে লাগল গায়ত্রী।

'এসেছে তো সুকান্তকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন বনবিহারী : 'আমি ওকে গুটিকতক প্রশ্ন করব আগে। বিয়ে করাটা এত কঠিন আর বিয়ে ভাঙাটা এত সোজা। সোজা হলেই ভাঙতে হবে ? কঠিনকে কঠিন সাধনায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে না ? কই, পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। আগে আমার কথার উত্তর দিক।'

কিন্তু কোথায় কে।

নিচে নেমে এল কাকলি। সদরের কাছটাও একটু দেখল। তাকাল রাস্তার দিকে। তারপর ছাদে উঠল। তাকাল আকাশের দিকে।

কেউ কোথাও নেই।

৫৫

এটা কিরকম হল ? এটার মানে কী ? এটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না ?

ইনটারভিয়ু সেরে উঠে যাবার আগে কর্তাব্যক্তিদের চোখের দিকে একবার তাকাতেই হয়। সেইটেই স্বাভাবিক। ডোণ্ট কেয়ারি ভাব দেখিয়ে হুট করে চলে যায় না কেউ। বরং সেই শেষ চাউনিটাতে একটি মিনতি এঁকে রাখে, যেন মঞ্জুর হয় প্রার্থনা। কিংবা একটি ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে, কিরকম ছাপ রাখলাম না জানি। কিংবা আদৌ পারলাম কিনা রাখতে। ঐ মুখগুলি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় কিনা যে, আমারও কিঞ্চিৎ আশা আছে। নাকি মুখগুলি নিতান্তই তোলোহাঁড়ি ! নিষ্ঠুরতার নামান্তর !

সারাক্ষণ মুখ নামিয়েই বসে ছিল কাকলি। প্রথম থেকে শেষ, আবার শেষ থেকে প্রথম, কী একটা ফাইলের পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছিল। সরাসরি ওর মুখের দিকে না তাকালেও সুকান্ত বেশ বুঝতে পারছিল ওর বৈরাগ্য, ওর বৈতৃষ্ণ্য, ওর অনীহা। নির্মম অনাসক্তি। কিন্তু, এখন সুকান্তের যাবার সময়, নিঃসম্পর্ক মানুষের ভিড়ের মধ্যে তার হারিয়ে যাবার আগে, এটা কী করে বসল কাকলি? নত মুখখানি তুলল ধীরে-ধীরে, আর নিজেরও অজানতে, চোখের কোণে ছোট্ট একটি হাসির ঝিলিক দিল।

আর সুকান্তই বা তার শেষ চাউনিটা রাখবার জন্যে, ঐ তিনটে মুখের মধ্যে ঐ ছোট, নিরীহ, অকেজো মুখখানিই বেছেছিল কেন? আসল কর্মকর্তা তো ঐ বাঙালী মাদ্রাজী অফিসর দু-জন, ওরাই তো কেষ্টবিষ্টু, 'ডেলিভার দি গুডস' যদি কেউ করতে পারে তো ওরাই। ওদের দিকে না তাকিয়ে ও কিনা দেখতে গেল পড়তে গেল কাকলির মুখ, যা কিনা অবস্তু, অবন্ধু, অন্যমনস্ক। যা কিনা আগাগোড়া নিস্পৃহতার ইস্পাত দিয়ে মোড়া।

আশ্চর্য, ইচ্ছে করে ফেলে নি চোখ, যেন মধুকর আপনা থেকেই উড়ে গিয়ে বসল ফুলের উপর।

আশীর্বাদের মত সুন্দর মুখখানি তুলল কাকলি। ঈশ্বর যে মুখ দিয়েছিল, এ সে মুখ নয়। এ মুখ কাকলি নিজে সৃষ্টি করেছে। এ মুখে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, জ্বালা নেই, হিংসে নেই, শুধু দুঃখের লাবণ্য দিয়ে ভরা। ঈশ্বর দুঃখের কী জানেন! তাই তাঁর সাধ্যি নেই, এসব মুখ তিনি আনেন কল্পনায়।

এ মুখ কাকলির একার তৈরি। কে জানে হয়তো এতে সুকান্তেরও কিছু হাত আছে। কিছু হয়তো কাজ করেছে ওরও রঙ-তুলি-জল।

তাকিয়েছিল তাকিয়েছিল, কিন্তু হাসল কেন? দুটি চোখ যেন দুটি নীরব প্রার্থনার নিরালা কুটির। সহসা তাতে দুটি দীপ জ্বলে উঠল কেন? কী বলতে চায় সে হাসি?

পৃথিবীতে কত তারা, কত ফুল, কত আলো, কত গান, কত মণি-মুক্তো—তার উপরে আবার এই হাসির টুকরো। এটিও পৃথিবী রেখেছে জমিয়ে। হারিয়ে ফেলে নি। ধুলোয় দেয় নি ধুলো করে।

অনেকক্ষণ বসে আছেন, এবার প্রতীক্ষার শেষ হল, যন্ত্রণার শেষ হল, বাড়ি যান নিশ্চিন্ত হয়ে—এই হাসি কি শুধু তাই বলছে? এ হাসি কি শুধু এক সমাপ্তির রেখা? শুধু এক উপশমের ইঙ্গিত? নাকি, আপনার আবেদন মঞ্জুর হবে, শুধু সেই এক আশার স্ফুলিঙ্গ? মঞ্জুর হবে কী, মঞ্জুর তো হয়েছে, এই তো বোঝা গেল শেষ পর্যন্ত—

তবে সেই হাসি কি তার সাফল্যে মামুলি অভ্যর্থনা? শুধু ঐটুকু? তার বেশি আর কিছু নয়?

তার অনেক অনেক বেশি। তোমার পদোন্নতি হল, এতে তোমার আনন্দকে শুধু সংবর্ধনা করা নয়—তোমার পদোন্নতি হল, এতে আমার আনন্দকেও লিপি-বদ্ধ করলাম। তোমার সুখে নিজেকেও সুখী বলে অনুভব করলাম। তোমার যে জয় হল, প্রচ্ছন্নে এটা আমারও জয়। তোমার উন্নতিতে আমার গৌরব।

এমন আশ্চর্য কথা হিসেবের খাতায় লেখে না। আমার শোকে-দুঃখে সমব্যথী হয়তো পাব, কিন্তু আমার সুখে সুখী হবার লোক কই। আমার যারা সুখে বাহ্যিক অভ্যর্থনা করতে আসে, আসলে তারা ঈর্ষী, অন্তরে তাদের দাহ। কিন্তু কাকলি এখন যে হাসি হাসল, সেটি হৃদয়ের বিদ্যুৎ, জ্বালা দিয়ে নয়, তৃপ্তি দিয়ে আঁকা। এমন তো কোনো কথা ছিল না। আমি সুখী হলে, আমি জয়ী হলে তার কী! পক্ষান্তরে আমি পরাস্ত হই, অপমানিত হই, তাতেই বা তার কী এসে যায়!

শুনেছে, মানুষের মনের দর্পণ চোখ। হাত ভণ্ডামি করতে পারে, কিন্তু চোখ ছলনা জানে না, মনের ঠিক ছবিটি তুলে ধরে হুবহু। অন্তরের চিঠি পড়বার ভাষাই তো চোখ। মন যদি অনুপস্থিত, চোখও অনুপস্থিত। দুটি চোখই মনের আকাশের চন্দ্র-সূর্য।

যে হাসিটি হাসল এখন কাকলি, তার কী ব্যাখ্যা হতে পারে সারাক্ষণ তারই বিচার করছে সুকান্ত। হয়তো কিছুই নয়, সুকান্তের দেখবার ভুল। কিংবা হয়তো বা ওটা পরিহাসের ছটা। কেমন পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করছি। বিশেষত যে পুরুষ একদিন শাসন-পীড়ন করত, করবার অন্তত যার ছাড়পত্র ছিল, ভাগ্যের বিধানে সেই দুর্জন আজ কৃপাপ্রার্থী। কিংবা হয়তো বা একটু করুণার আমেজ ঐ হাসিতে। তুমি দীন-হীনের মত দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ, কৃপণের মত নাই বা দিলাম ফিরিয়ে। তোমার আকাঙ্ক্ষা অল্প, নাও এই এক মুঠো।

মন মানতে চায় না সুকান্তের। যেদিকেই তাকাক, যে কথাই ভাবুক, মনের মধ্যে সেই চকিত-স্ফুরিত হাসিটিই শুধু ভেসে ওঠে। সে হাসিটি দুই নয়নের বাইরে, আরেক নয়নের, তৃতীয় নয়নের ভাষা। যেন বলছে, আমি তোমার হিতকামী। তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক, আমার এই শুধু বাসনা। তুমি ভালো থাকলেই আমার ভালো থাকা। তোমার কুশলেই আমার কুশল স্বীকার।

হিত কামনা কে করে? হিত কর্ম করা বরং সোজা, কামনা করাই কঠিন। তোমার অসুখ করেছে, কয়েকটা তোমার সেবার কাজ করে দিলাম, হিত কর্ম সম্পন্ন

হল। কিন্তু তোমার ভালো হোক, তুমি শিগগির ভালো হয়ে ওঠো, সর্বান্তঃকরণে এই হিত কামনা কি করতে পারো? ককখনো না, বুকটা ফেটে যাবে, যদি তুমি না নিতান্ত অন্তরের সুহৃদ হও, আত্মজন হও। তবে সুকান্ত কি কাকলির অন্তরের সুহৃদ, আত্মজন? তাই যদি না হবে, তবে ঐ হাসির ব্যাখ্যা কী?

কোনোই ব্যাখ্যা নেই। অকারণে মানুষ অমনি অনেক হাসে। অকারণে মরীচিকা অমনি অনেক জল দেখায়।

পথে আর দেরি কোরো না, গুটি-গুটি ফিরে যাও ঘরে। আর পথ নেই। পথ বন্ধ।

পথ বন্ধ হবে কেন? সুহৃদের পথ বন্ধ হতে পারে, নিম্নতন কেরানির পথ সব সময়েই খোলা আছে। ঐ ইনটারভিয়ুর ফল কী হল, অফিসিয়্যাল চিঠি ইশু হতে দেরি হচ্ছে কেন, এ তো বৈধভাবেই সুকান্ত জানতে চাইতে পারে। সেই অর্ডার বেরোবার সঙ্গে সুকান্তের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, স্বার্থ মানেই টাকা, তাই তার এই ব্যাকুলতা। বিবেকের কাছে নিজেকে মোটেই তাই অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে না। সন্ধানটা আফিসেও করা যেত বটে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে এতখানি যখন এসেই পড়েছে, তখন আর ঐ বাকিটুকু কী দোষ করল? তার হাতে ওজুহাত নেই এমন কথা তো কেউ বলতে পারবে না। অধস্তন হয়ে ঊর্ধ্বতনের বাড়ি গিয়ে গাফিলতির কৈফিয়ত চাওয়া এমন কী অন্যায়?

আচ্ছা, ঐ হাসিটাতে কি একটি আহ্বানের সুর নেই? তা কি নিরন্তর বলছে না, আমার টাকায় সুখ নেই, খ্যাতিতে সুখ নেই, শক্তিতে প্রতাপে সুখ নেই, শুধু তুমি একবার এসো। সেই তুমি কে, তা কেউ বলতে পারে না। তবু তুমি এসো।

সেই পরিচিত পথ। সেইসব বাড়িঘর, দোকানদানি, রিকশা-স্ট্যাণ্ড, লাইট পোস্ট—সেই লোকচলাচল। ঐ তো অদূরে কাকলিদের বাড়ি, ছাদ, সেই বন্ধুর মত কদম গাছ। আশ্চর্য, গাছটাও মানুষের মত চোখে চাইতে পারে। আর আরো আশ্চর্য, তার চোখে সেই কাকলির হাসি। হে বন্ধু, আছ তো ভালো?

তবু দ্বিধা যায় না পা ছেড়ে।

যদি দেখে, বরেন বসে আছে। থাক না, ভালোই তো, গল্পের পরিধিটা বাড়িয়ে নিতে পারবে। অপ্রতিভ হবার আছে কী। বরং অবস্থাটা এমন হোক, বরেনই অন্য কাজের ছুতো করে বেরিয়ে যাক রাস্তায়। আর যদি বসে থাকতে চায়, শুনুক তাদের আফিসের কেচ্ছা। তাদের বাজার-দরের আলোচনা।

আর যদি বরেন না থাকে! কেউ না থাকে!

হাসতে-হাসতে নামবে কি কাকলি? দু-চারটে বেসরকারি কথা কইবে? অন্তত রাজনীতি নিয়ে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেহারা নিয়ে? চা দেবে খেতে? আবার একদিন আসবেন, বলবে কি যাবার সময়?

বাড়ির দিকে আরেকবার তাকাল সুকান্ত। কাকলি কোন ঘরে আছে? যে ঘরটায় আলো জ্বলছে, সেই ঘরে? নাকি যেই ঘরটা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে?

কিংবা কে বলবে, হয়তো বাড়িতেই নেই।

'আছে।' সুকান্তর প্রশ্নের উত্তরে চাকর বললে।

'শোনো, আমি বাড়ির গিন্নি মাকে চাই না। চাই তাঁর বড় মেয়েকে, মিত্রকে। বুঝেছ? যিনি—'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। যিনি আফিসে কাজ করেন।' জাস্তা মুখ করল চাকর।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁকে খবর দেবে।'

'কী নাম বলব?'

এক মুহূর্ত কী ভাবল সুকান্ত। বললে, 'না, নাম লাগবে না।'

'ইচ্ছে করলে এই স্লিপেও নাম-ঠিকানা লিখে দিতে পারেন।' চাকর কাগজ পেন্সিল এগিয়ে ধরল।

'দরকার নেই। তুমি গিয়ে শুধু বলো, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

চাকর তাই বলতে গেল।

ব্যাডমিণ্টনের শাটল-ককও বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি ফেরত আসে না। চাকর ফিরে এসে বললে, 'দেখা হবে না বলে দিলেন।'

'হবে না?' কোনো মানে হয় না, তবু নিষ্প্রাণ কণ্ঠে পুনরুক্তি করল সুকান্ত।

'না। বললেন ঘুমিয়ে আছেন।'

আর, শাটল-কক নয়, ফুটবলের মতই বেরিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে।

খুব হয়েছে! নিজেই ধর্ম দেখছে এখন। ছি ছি, গাল বাড়িয়ে কেমন চড়টা খেলে! থোঁতা মুখ কেমন ভোঁতা হল! ধানও গেল ধুকড়িও গেল। কাকলি তো গেছেই, আত্মসম্মানটাও গেল।

মন বলে বাদশা হবি, খোদা বলে মেগে খাবি।

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার জন্যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা হল সুকান্তের। নিজেকে ভুলে যেতে, মুছে ফেলতে নিঃশেষে। নিজেকে অন্য সত্তায় নিয়ে যেতে। এখান দিয়ে এখন যদি একটা মিছিল যেত ঠিক ভিড়ে যেত দলে। কিংবা রাস্তার মোড়ে জমত কোনো জটলা, ওও তার শ্রোতা হয়ে বসত।

একটা ভিড়-ভর্তি চলতি ট্র্যামে উঠে পড়ল সুকান্ত। কোথাকার ট্র্যাম জিজ্ঞেসও করল না। কোনোক্রমে এ অঞ্চল থেকে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হয়তো পিছন থেকে সবাই ওকে দেখছে, দেখছে বা ঘেঁষাঘেঁষি করে জানলায় দাঁড়িয়ে, কিংবা ছাদের রেলিঙ ধরে, ঝুঁকে পড়ে। দেখছে লাঠির ভয়ে কেমন লিকলিকে লেজে পালিয়ে যাচ্ছে নেংটি ইঁদুর।

এদিকে কাকলিও নিজেকে বিন্দুমাত্র রেয়াত করছে না। ধিক্কারে শতধা হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো, কলিং বেল তো বাজায় নি—সেই ডবল আওয়াজ! তবে কোন আইনে আগন্তুককে বরেন বলে সাব্যস্ত করল? খুব অহংকার হয়েছে, তাই একবার নিচে নামতে পর্যন্ত পারল না। কৌতূহল পর্যন্ত হল না সে নামহীন লোকটি কে? খুব ড্রয়িংরুম করেছে, খুব খুলেছে সে সোফা-সেটির শো-রুম। খুব কার্পেট বিছিয়ে সে ধুলো ঢেকেছে। খুব রেখেছে সে চাকর, কাগজ-পেন্সিল, খুব বসিয়েছে সে কলিং বেল! এত বাড় যে বাড়ে, তাকে ঝড় ভাঙবেই ভাঙবে। একেই বলে অতিমেঘে অনাবৃষ্টি। আশ্চর্য, তুই কাকলি, নিজেকে নিজে সে তিরস্কার করছে, তুই এত হিল্লি-দিল্লি করিস, সামান্য কটা সিঁড়ি ভেঙে তুই নিচে নামতে পারিস না? সাত ঘাট ঘুরে এসে তুই তোর নিজের পুকুরে ডুবে মরিস! তোর কী হয়েছিল? কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।

এখন ছাদে ওঠবার কোনো মানে হয়? আর সব জায়গা ফেলে সে ছাদে এসে রয়েছে? কোন পথ দিয়ে এল শুনি, কোন সিঁড়ি বেয়ে? কে জানে। তবু একা-একা ছাদেই খানিকক্ষণ পায়চারি করল কাকলি। যে আসতে জানে, সে স্মৃতির পথ দিয়েই আসতে পারে, আসতে পারে অনুভবের সিঁড়ি ভেঙে। অন্ধকারেই তার আলোকিত উপস্থিতি।

বেজায়গায় ট্র্যামে উঠে পড়েছে, খানিকদূর যেতেই টের পেয়ে নেমে পড়ল সুকান্ত। আচ্ছা, দেখা হবে না যে বলল, কার সঙ্গে দেখা হবে না—এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল কাকলি? তবে ক্ষুব্ধ মুখে অমনি চটপট উঠে আসার কোনো মানে হয়? সে তো কথায় বা লেখায় মোটেই এমন জানান দেয় নি যে সুকান্তই এসেছিল। তবে কাকলির প্রত্যাখ্যানের অন্য অর্থ, নির্দোষ অর্থও তো হতে পারে। আশ্চর্য, সে নিজে প্রত্যক্ষরূপে সত্যাসত্য নিরূপণ করল না কেন? বেশ তো, কাকলি এসে দাঁড়াত সামনে, সামনে না হলে অন্তত সিঁড়ির রেলিঙ ধরে, বলত, না হবে না দেখা, আমি বাজে লোকের সঙ্গে দেখা করি না। কেন যাচাই করে দেখল না স্বচক্ষে, রূঢ় ভাষাটা শুনল না স্বকর্ণে। সে তো আর পকেটে করে

পুরোনো দিনের কঙ্কাল নিয়ে আসে নি, সে নতুন সম্পর্কের, আফিস-সম্পর্কের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছে। তবে অত পালাই পালাই কেন? বসে থেকে এপার-ওপার কেন দেখে গেল না? কথায়-লেখায় জানান দেয় নি, একবার গলা ছেড়ে সেই 'কলি' বলে ডেকে উঠতে কী হয়েছিল? দেখত সে ডাক কী প্রতিধ্বনি নিয়ে আসে! গেট আউট, ক্লিয়ার আউট বলায় কিনা।

খুব কেরদানি দেখিয়েছ। নিজেকেই নিজে টিটকারি দিল সুকান্ত। এখন হোটেলের ছেলে হোটেলে ফিরে যাও।

হ্যাঁ, হোটেলে যেতে দোষ কী। ইনটারভিয়ুর সময়ে ঠিকানাটা তো চোখে পড়েছিল কাকলির। আর চোখে পড়া মাত্রই কোনো-কোনো ঠিকানা কারু কারু মনে যদি গাঁথা হয়ে যায়, তবে আর কী করা যাবে? হোটেলে মানুষ তো কত কাজেই যেতে পারে, শুধু লোক খোঁজবার জন্যেই বা হবে কেন? ঘর খালি আছে কিনা, কিরকম রেট—এই অনুসন্ধান তো খুবই সাধারণ। অত কথায় কাজ কী। হোটেল যখন, তখন অনায়াসে সেখানে খাওয়া চলে, বাইরের লোক নিষিদ্ধ নয় নিশ্চয়ই। অত যাচাই কিসের? সোজাসুজি সুকান্তের খোঁজ করলেই বা কী দোষ। শত হলেও প্রমোশন পাবার পর ও তো এখন তার 'কলিগ,' সমান-সমান, আফিস-এটিকেটেই তো রিটার্ন-ভিজিট দেওয়া চলে। আকস্মিক যখন এসেছিল, তখন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি ঠেকা ছিল, অন্তত সেটুকু জেনে নেওয়াও তো ভদ্রতা।

যাক, খুব কর্মদক্ষতা দেখিয়েছ। নিজেকেই নিজে গঞ্জনা দিচ্ছে কাকলি। দশ হাত কাপড়েও কাছা দিতে শেখো নি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী! লোকটা কে খোঁজ না নিয়েই চলে যেতে বললে। পাখিটা খাঁচায় এসেছিল, দরজা বন্ধ করলে না, উড়ে পালাল। এখন বলছ, বন থেকে তাকে খুঁজে আনবে। বলি, চাকরিতে তোমার প্রমোশন হয় না?

ক্রিং-ক্রিং, ডবল বেল বাজল।

তবু, কে জানে কে, নিজের চোখে দেখি গে। এমনও হতে পারে, আবার আজ এসেছে, চাকরের অপেক্ষা না করে নিজেই বেল টিপেছে। আর, কিছু না জেনেই, সাধারণভাবেই দুটো আওয়াজ করেছে।

শব্দ শোনা মাত্রই ছুটে নেমে এসেছে কাকলি।

না, আর কেউ নয়, বরেন বসে।

খুব ত্বরান্বিত হয়ে এসেছে, আর খুব আনন্দিত মুখ, কাকলিকে দেখে উথলে উঠল বরেন: 'এখন পথ নিষ্কণ্টক। অবজেকশান বাতিল হয়ে গেছে। এবার দিনটা ঠিক করে ফেলো।'

মুহূর্তে নিবে কালো হয়ে গেল কাকলি। দুর্বলের মত শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসল। বললে, 'আমি বলছিলাম কী—'

'কী বলছিলে?'

'বলছিলাম, আমার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, কয়েকদিন ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাব ভাবছি। তাই বলছিলাম, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না?'

বরেন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু বুঝি বা কী চিন্তা করল। নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়াল দাঁত দিয়ে। বললে, 'বা, অপেক্ষা করা যাবে না কেন? কিন্তু এ নোটিশটা তা হলে ল্যাপ্‌স করে।'

'তা করুক না।' মুহূর্তের জন্যে আবার উজ্জ্বল হল কাকলি: 'পরে আবার নোটিশ দেব।'

'আবার যে তার তিন মাসের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে না তার ঠিক কী।' পাশের ঘর থেকে গায়ত্রী এসে বললে গম্ভীর মুখে, 'তোমার এমন কিছুই এখন অসুখ করে নি। একটু বুক কাঁপা বা মাথাধরা—সে একটা কিছু অসুখই নয়।'

মিনতি-ভরা চোখে মার দিকে তাকাল কাকলি।

গায়ত্রী বললে, 'ছুটি নিতে চাস, নে। সেটা বিয়ের ছুটি।'

'আমিও ছুটি নেব।' বললে বরেন, 'তারপর হনিমুনে যেখানে বলো সেখানে ঘুরতে যাব। দেশে বলো দেশে, বিদেশে বলো বিদেশে।'

'সেইটেই তো চমৎকার চেঞ্জ হবে।' সায় দিল গায়ত্রী।

কথা কয় না কাকলি তবু।

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে আয়ত্ত করে নিল বরেন। নিয়ে এল নখ-দর্পণে। বুঝল, যে কোনো কারণেই হোক, কাকলির মধ্যে অনিচ্ছা জেগেছে। সে অনিচ্ছাকে বাড়তে দেওয়া হবে না, সবল হাতে উপড়ে ফেলতে হবে—আর সম্ভব হলে, আজই, এক্ষুনি। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে ওর মধ্যে আর দ্বিধা না থাকে, আড়ষ্টতা না থাকে। যাতে অকুণ্ঠ আগ্রহে ও-ই বিয়েতে অগ্রণী হয়, ওর নিজের স্বার্থে, নিজের মঙ্গলে। বিয়েটাকে আবশ্যিক করে তুলতে হবে। ওর জীবনে এঁকে দিতে হবে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। দাগি করে দিতে হবে দলিল।

এইখানে একটু সতর্ক হল বরেন। বললে, 'শরীর যদি ভালো না থাকে, শুভ কাজ পিছিয়ে দিতেই হবে। তার আর কথা কী। শরীরমাদ্যং—'

'একজন স্পেশালিস্ট তা হলে দেখাও।' গায়ত্রী বললে।

'তা হবে'খন। ব্যস্ত কী।' বরেন কাকলির দিকে তাকাল। বললে, 'চলো বেরিয়ে আসা যাক। দেবনাথের ফার্মের জায়গাটা দেখবে চলো।'

'হ্যাঁ, চলুন,' সুখে আর সরলতায় ঝলমল করে উঠল কাকলি: 'ও জায়গাটা আমার দেখা হয় নি।'

'তা হলে চট করে তৈরি হয়ে এসো।'

যেতে-যেতে পিছন ফিরল কাকলি। হাসিমুখে বললে, 'আর ঐটেই বুঝি আপনার বাগানবাড়ি?'

উদাসীনের মত মুখ করে বরেন বললে, 'হ্যাঁ, আছে একটা চালাঘর।'

৫১

'চলুন।' ঝুলন্ত আঁচলটাকে শান্ত করতে করতে এগিয়ে এল কাকলি।

দ্রুত চোখে আনুপূর্বিক দেখল একবার বরেন। অবাধ, মুক্ত, অনর্গল। একতাল নির্ভর আর দুর্বলতা। কোথাও বন্ধন নেই, গ্রন্থি নেই, নেই কোথাও নিশ্চয়ই লুকোনো বাঘনখ।

'চলো।' এক লাফে উঠে পড়ল বরেন।

গায়ত্রী চলে গেল ভিতরে।

কাকলি আগে উঠল গাড়িতে। বরেন তার পাশে বসেই ফের নেমে পড়ল। বললে, 'মাকে একটা কথা বলে আসি।'

প্রায় ছুটে ঢুকল অন্তঃপুরে। কাকে কী বললে কে জানে, আবার অমনি চলে এল বাইরে। গাড়িতে উঠেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলে। আর, কোনোদিন যা করে না, তক্ষুনি-তক্ষুনি সিগারেট ধরাল।

'কী বলতে গেলেন?' চোখে নির্মল কৌতূহল, জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'কিছু নয়।' একমুখ ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বললে বরেন।

ধরনটা ভালো লাগল না। মার সঙ্গে কী এমন কথা থাকতে পারে যার মধ্যে কাকলি নেই। তবু, ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, চুপ করে রইল। বিয়েটা পিছিয়ে দিতে চাইছে, ও কথা বলাতে বরেন সাংঘাতিক বিরক্ত হয়েছে, তাকে আরো খোঁচা মারা

উচিত হবে না। বরং তার বিরক্তির উপর একটি প্রশান্তির প্রলেপ দেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। একটু কথা, একটু ভঙ্গি, একটু বা প্রশ্রয়।

কিন্তু এমন তো কোনোদিন হয় না। এতক্ষণ এই চুপ করে থাকা। চুপ করে বসে নিজের মনে সিগারেট টানা। কতক্ষণ ধরে কাকলির এক পাশে ফেলে রাখা হাতখানি তুলে না ধরা। যেন, শুধু প্রতিবেশিতা নয়, সমস্ত অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দেওয়া।

কী যেন ভাবছে। একটা নিরবয়ব চিন্তার পাথরে সংকল্পের ক্ষুরকে শান দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

কথা তা হলে কিছু কাকলিকেই বলতে হয়। সন্ধে হয়ে গেল, এখন কি কিছু ভালো করে দেখা যাবে—এমনি ধরনের মামুলি কিছু। কিংবা কতক্ষণের পথ? লেভেল-ক্রসিং পড়ে নাকি? জায়গাটা কি বড় রাস্তার ধারেই, নাকি গাঁয়ের মধ্যে?

কতক্ষণ চলবে এমনি একটানা? এই নিঃশব্দতার জলস্রোত?

ড্রাইভারকে একটা রেস্টোর‍্যান্টের নাম করল বরেন।

'ওখানে কী?' কাকলি চমকে উঠল।

'ওখানে খাওয়া। ওখানে কিছু খেয়ে নেব দু-জনে।' বরেনের গলায় কেমন যেন প্রভুত্বের স্বর।

কী হল বরেনের? আগে হলে একটি বা মিনতির স্বর রাখত। বলত, চলো না কোথাও দু-জনে খাই গে। কিংবা অনুমতি চাইত, যাবে অমুক রেস্টোর‍্যান্টে? খাবে কিছু? আজ যেন ওর নিজের ইচ্ছেই স্বপ্রধান। কাকলির সম্মতির কোনো প্রয়োজন আছে এ যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

তবু কাকলি প্রতিবাদ করে উঠল: 'না, না, আমি কিছু খাব না। আমার একটুও খিদে নেই।'

নিস্পৃহের মত হাসল বরেন: 'তোমার খিদে নেই বলে জগৎসংসারে আর কারুরই খিদে থাকবে না এতটা ভাবা ঠিক হবে না। তোমাদের বাড়িতে যে গিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলে? দিয়েছিলে খেতে?'

'ও মা, ছি ছি, সত্যি, বলেন নি কেন?' আত্মধিক্কারের স্বর তুলল কাকলি: 'আপনার খিদে পেয়েছে জানলে মা ককখনো আপনাকে ছেড়ে দিতেন না।'

'মাকে টানো কেন? তুমি হলে কী করতে? কী করতে সত্যি-সত্যি?'

'আমি হলেও ছাড়তাম না ককখনো। পেট ভরে খাইয়ে দিতাম।' সরলতার ছবি হয়ে কাকলি বললে।

'ককখনো না। তোমার যা স্বভাব, তুমি শুধু বসিয়ে রাখতে। টালমাটাল করতে।'

'আপনি তখন বাইরে বেরুবার এমন এক রব তুললেন—'

'না তুলে উপায় কী। দেখলাম, বসে থেকে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যাবে না। নিজের বাহুর জোরে ভাঁড়ার লুট করে ছিনিয়ে নিতে হবে। যারা লুটেরা, যারা ডাকাত, তারাই রব তোলে, জানান দেয়—'

গহনে একটা ইঙ্গিত রেখেছে এ বেশ বুঝতে পারছে কাকলি, তবু সংকীর্ণ অর্থে উদরের দিকে একেবারেই দৃষ্টি নেই এ নাও হতে পারে। কে জানে সত্যিই হয়তো খিদে পেয়েছে বরেনের। আর আত্মীয়-পরিচিতের খিদের কথা শুনলে কোন মেয়ে না কোমল হয়।

'বেশ, যেতে চান, চলুন।' কাকলি বললে, 'আপনি কিন্তু একা-একা খাবেন। আমি বসে বসে দেখব।'

'জগৎসংসারে তেমন যদি কোনো ব্যবস্থা থাকে, তবে তাই হবে।' বরেন বললে উদাসীনের মত।

রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকে সবিস্তার অর্ডার দিল বরেন। আর, সবই দু-জনের মত।

'এ কী, রাত্রের খাওয়াই সেরে নিচ্ছেন নাকি?'

'না, আরম্ভ করছি।' বরেন তাকাল কাকলির দিকে: 'আমার খিদে কি এতটুকু? আমার বাসনা কি শুধু বাসনে ধরবার?'

তবু কাকলি এগোয় না।

বরেন বললে, 'উপস্থিত খাদ্যকে অশ্রদ্ধা করতে নেই।'

'খাদ্যের মূল্য শুধু খিদের প্রেরণায়।' কাকলি বললে, 'খিদে না থাকলে সুখাদ্যও বিষ হয়ে ওঠে।'

'বলা যায় না। কখন আবার খেতে-খেতে খিদে পায়। অভ্যেস থেকে অনুরাগ আসে। তখন আগে যা মনে হয়েছিল বিষ তাই অমৃত মনে হয়।'

একটু বুঝি বা হাত লাগাতে হয় কাকলিকে। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। তা না হলে তাড়াতাড়ি করবে না বরেন। বসে বসে সুতোটাকে শুধু লম্বা করবে। রাত করে ফেলবে। ফিরতে দেরি করিয়ে দেবে কাকলির।

'নিন, আমিও খাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, কী যেন বলেছে—ফর টুমরো উই ডাই।'

'টুমরো? হাতে খানিকটা সময় রেখেছে বুদ্ধিমান।' হাসল কাকলি: 'মৃত্যুর

কথাই যখন ভাবছে তখন আগামী কাল কেন, হোয়াই নট টু-নাইট, দি নেক্সট মোমেণ্ট ?'

কাকলির মুখের এতগুলো শব্দের মধ্যে থেকে 'টু-নাইট' কথাটা লুফে নিল বরেন। দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'টু-নাইট ? আজকের রাত কি মরণের রাত ? আজকের রাত বরেনের রাত।' বলে হেসে উঠল শব্দ করে।

তবু ভড়কাল না কাকলি। বললে, 'তার আগে বরণের রাত আসা উচিত।'

'ও কিছু নয়। কোনো ব্যবধান নেই দুই রাতে! ওরা একই রাত, একাত্ম। বরেনের মধ্যেই বরণ আছে লুকিয়ে। আর এ-কারটা একত্র হবার এ-কার।' ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল বরেন। উচ্ছল হাতে বিল চুকোল।

পথে নেমে কাকলি বললে, 'এখন তো দিব্যি রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে কী দেখব!'

'দেখা কি আর পায়ে হেঁটে ঘুরে-ঘুরে দেখা ? একটা আইডিয়া নেওয়া। চলো। ওঠো।' তাড়া দিল বরেন।

'আরেক দিন গেলে হয় না ?' করুণ মুখ করল কাকলি।

'আবার আরেক দিন ?' প্রায় তিরস্কারের মত করে বললে বরেন, 'কথায় বলে আজকের ডিম কালকের মুরগির চেয়ে বেশি দামি। তা ছাড়া তুমি তো মাঠঘাট দেখছ না, দেখছ আমার চালাঘর। দেখবে চলো পছন্দ হয় কিনা।'

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে এটা ভাবতেও ভালো লাগছে না কাকলির। আর বাড়ি যেতে হলেও তো এই বরেনের গাড়িতেই যেতে হবে। মিছিমিছি তবে এখুনি পেছুই কেন ?

'চলুন।' দৃঢ় ভঙ্গি করেই কাকলি উঠল গাড়িতে।

হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, বরেন বললে, 'চেঞ্জে যেতে চাইছিলে না ?'

'হ্যাঁ, একটু চেঞ্জ একরকম মন্দ হত না। বহুদিন এক জায়গায়, এক ভাবে আছি—'

'চেঞ্জে একাই যেতে ?'

'কেন, আপনি যেতেন ? বা, তা হলে তো ভালোই হত। আমার খরচ বেঁচে যেত। এখন বলতে আর কী দোষ, বললে কাকলি।

'সত্যি বলছ ?'

'বা, এখুনি চলুন না বাড়ি। পরামর্শ করে জায়গা, যাবার তারিখ, থাকবার হোটেল না ঘর—যা হয় সব ঠিক করে ফেলি।' চতুর চোখে হাসল কাকলি।

'তা এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই দু-জনেই যাচ্ছি। সেই চেঞ্জই হচ্ছে। জায়গাটার আর কিছু না থাক দুটো স্বাস্থ্যকর সম্পদ আছে—এক নির্জনতা, আরেক অন্ধকার।'

'অন্ধকার?' গা কেমন ছমছম করে উঠল কাকলির।

'অন্ধকার মানে দোকান-বাজার লোকালয় নেই ধারে-কাছে। বাস-ট্রাক-মোটর যায় অনেক দূর দিয়ে। তাই শব্দ-টব্দও বিশেষ শোনা যায় না। চেঞ্জের পক্ষে আইডিয়াল জায়গা। মাঝরাতের কাছাকাছি একটা ট্রেন যায় বটে পাশ দিয়ে, যদি জেগে থাকো, এঞ্জিনের সিটিটা বাঁশির মতই মিষ্টি লাগবে। তবে, মাঠের মধ্যে ঘুম এমন গভীর হবে যে সিটিটা শুনতেই পাবে না। আর শেষ রাতের দিকে হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় তখন মনে মনোরম একটি দ্বিধা জাগবে ট্রেনটা আমাকে না জানিয়েই চলে গেল নাকি, নাকি এখনো যায় নি। আর সেই দ্বিধার মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ভোরবেলা?' জয়ে, আনন্দে বরেন শিশুর মত হয়ে গিয়েছে: 'ভোরবেলা মানে সূর্য ওঠবার অনেক আগে থেকেই গাছ-ভর্তি শুনতে পাবে পাখিদের পাখা-ঝাপটানি, তারপরেই ডাক—মনে হবে এ যেন শব্দ নয়, এ রঙ ফুটছে, নীল, সবুজ, হলদে—'

'রাতে মাঝে মাঝে থাকেন বুঝি ওখানে?' কাকলির নিজের স্বর নিজেরই কানে মৃদু শোনাল।

'কোনোদিন থাকি নি এ পর্যন্ত। তবে থাকলে ওরকমই মনে হবে অনুমান করতে পারছি। সুতরাং বুঝতেই পারছ, চেঞ্জের পক্ষে খুব ভালো জায়গা। তোমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলছিলে না?' ঠিক পাশেই না পেয়ে কাকলির কোলের থেকে একটা হাত কুড়িয়ে নিল বরেন: 'কেন, কী হয়েছে, কিসে খারাপ বুঝছ?'

কাকলি নিজেই টের পেল তার যে হাতে গোড়ায় প্রবোধের ভঙ্গি ছিল এখন সে হাতে অলক্ষ্যে একটা প্রতিরোধের ভঙ্গি ফুটেছে। বললে, 'কোথায় কোন স্নায়ুতে সূক্ষ্ম ছন্দপতন চলেছে বোঝে কার সাধ্যি? আর তারই জন্যে সমস্ত শরীর মন্থর, বিষণ্ণ।'

'ও কিছু নয়, একটা মানসিক অসাম্য।' কাকলির কাষ্ঠ-রুষ্ট হাতটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল বরেন: 'দু-চার দিন অমনি নিরিবিলিতে থাকতে পারলেই শরীর ভালো হয়ে যাবে। ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

'চলুন দেখে আসি।' একটা ফিরে আসার পথ রাখতে চাইল কাকলি।

যতই দূর ভেবে ঝাপসা-ঝাপসা ভয় পেয়েছিল .কাকলি তেমন কিছু দুর্গম নয়।

শহর পেরিয়ে খানিকটা শহরতলি, আর শহরতলিতে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ফাঁকা গলি পথে ঢুকে একমাঠ অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটা ঘর।

হর্নে হেড-লাইটে জানান দিতেই পাশের চালা থেকে মালী বেরিয়ে দরজার তালা খুলে দিল। ইলেকট্রিক কনেকশান আছে। আলো জ্বালাল বরেন। কাকলির উদ্দেশে বললে, 'এসো।'

মেঝে-দেয়াল পাকা, বাংলো ধাঁচের ছোট ঘর, চাল টালি না অ্যাসবেসটোস কে জানে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই তাক লেগে গেল কাকলির। সামনে একফালি একটা বারান্দা, বেত-বাঁশের তৈরি হালকা কটা বসবার চেয়ার, তা পেরিয়ে ভিতরে ঘরে প্রকাণ্ড খাট পাতা, তাতে ঢালাও বিছানা করা। নেটের মশারির কোণটুকু থেকে শুরু করে বালিশের অড়ের কুঁচিটুকু পর্যন্ত নিখুঁত। এক স্তূপ বালিশ—মাথায়, বুকে, পায়ে, পাশে, পিঠে, যখন যেরকম দরকার, এলাহি ব্যবস্থা। দুধের ফেনার মত শাদার শতদল।

কাকলির ভারি লোভ হল বিছানা দেখে। ইচ্ছে করল হাত পা ছড়িয়ে চত্রাকার হয়ে শুয়ে পড়ে। হাত পা ছুঁড়ে বালিশের জঞ্জাল দূর করে দিয়ে বিছানাটাকে নির্ঝঞ্ঝাট করে নিয়ে ঘুমোয়। কত দিন এমনি দিলদরিয়া দরাজে বিছানায় শোয় নি, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করতে করতে ঘুমোয় নি নিশ্চিন্ত হয়ে। না, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল একবার কাকলি, না, বেড-সুইচ নেই, তা হলে তো আরো নির্বাধ আরো উদাত্ত। কী আশ্চর্য, কোনো একাকী মেয়েরই যেন এত বড় বিছানা হতে নেই জীবনে। কৃশ শরীরটাকে কৃশ একটা শয্যার পরিমিতিতে আটকে রেখেছে চিরদিন। এত বড় এক বিছানা রাখাই একটা সন্দেহকে বিস্তৃত করে রাখা। অতখানি শূন্যতা আবৃত করে রাখবার মত কার অত দুঃসাহস!

নিজের মনেই হাসল কাকলি। এ বাড়িঘর তার নয়। বিছানাটা তার নয়। তার কিছুই হুকুম করবার নেই। তার পাঠ আজ পালন করবার। অনুগত থাকবার।

কিন্তু কী মজা হত যদি বরেন বলে কেউ না থাকত দাঁড়িয়ে। এই অন্ধকার আর নিঃশব্দতা আর এই অঢেল বিছানা তার যদি একলার হত! তবে পেরু থেকে কামস্কাটকা কী অঘোর ঘুমোত আজ কাকলি।

'এই দেখ এপাশে খাবার ঘর।' বরেন গর্বের ভঙ্গিতে দেখাতে লাগল: 'আর এই বাথরুম।'

টবে-ড্রামে জল টলমল করছে, তোয়ালে সাবান আনকোরা, আরো অনেক সব টুকিটাকি। যদি ঘুমুতে যাবার আগে স্নান করবার রেওয়াজ থাকে, গা ভাসিয়ে সিক্ত হতে পারো।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল বরেন। হাত দিয়ে একটা ঘের দিল শূন্যে। বললে, 'এই সমস্ত জমিটাই এ বাড়ির লপ্ত। মানে আমার জমি। মানে,' হাসল বরেন : 'ফার্মের জমি।'

'ঐ চালাঘরটা ?'

'ওটাও আমারই মধ্যে। ওখানে মালী থাকে। বাড়ি-জমির তদারক করে। কী এক্সপার্ট দেখেছ, কেমন সুন্দর ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে।'

'নাম কী ?' কী জানি কী মনে হল কাকলির, নামটা জেনে রাখা ভালো।

'নাম জানি না। মালী বলেই ডাকি।' বরেন তাকাল বাইরে : 'চালাটা ছোট। তাই পরিবার আনতে পারে নি। আর সবচেয়ে অসুবিধে, গারাজ করতে পারি নি এখনো। যার থেকে সম্পত্তিটা কিনি তার গারাজ ছিল না। তাই এই বিপদ—'

'মালীর পরিবার থাকলে বেশ হত, গল্প করা যেত।'

কথাটা বরেন কানেও নিল না। বললে, 'তাই সর্বাগ্রে একটা গারাজ করতে হবে। ভাবছি তোমাকে এবার একটা নতুন মোটর কিনে দেব।,

'আমাকে ?' হাসল কাকলি : 'আর সেই গাড়ি আমি চালাব ?'

'চালালে ক্ষতি কী !'

'এক নাগাড়ে পথে চাপা দিতে দিতে এগোব, বলছেন, ক্ষতি কী !'

'কিছু লোক তো চাপা পড়ে মরবেই।'

'মরবেই ?'

'হ্যাঁ, এখন তো শুধু দুই কারণে মানুষের মৃত্যু হবে। এক গাড়িচাপা পড়ে, দুই থ্রম্বসিস হয়ে। ডাক্তারদের পসার শেষ। কেউ আর তাদের ডাকবার সময়ই দেবে না। পড়বে আর মরবে।'

বেশ হাওয়া আসছে। এই হাওয়াটুকুর মতই লঘু সুরটুকু বজায় থাকে কথাবার্তায় এই সর্বক্ষণ এখন চাইছে কাকলি। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।

আবার ঘরের মধ্যে চলে এল বরেন।

বললে, 'দেখছ চারদিকে কেমন অন্ধকার !'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক। চেঁচালে কেউ শুনতে পাবে এমন মনে হয় না।'

'আর কিরকম নিঝুম। টুঁ শব্দটি কোথাও নেই।' বরেন বললে তন্ময় হয়ে, 'কলকাতার ঘড়িতে এখন আটটা, কিন্তু এখানে এখন নিশুতি রাত।'

'সত্যি মনে হচ্ছে যেন কোন সুন্দর বিদেশে এসেছি।'

ঘরে ফ্যান ঘুরছে, তবু হঠাৎ, দুই টানে টেনিস শার্টটা গা থেকে খুলে ফেলল বরেন। অবশেষ গেঞ্জিটাও খুলে ফেলা যায় কিনা ভাবতে ভাবতে বললে, 'এ কী, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো। নাকি বারান্দায় বসবে?'

ঘরের মধ্যে বিছানারই অদূরে কতকগুলি চেয়ার পাতা আছে, তারই একটা বেছে নিয়ে বসল বরেন। হাত দিয়ে তুলে কাকলিরই কাছে দিল একটা এগিয়ে।

কাকলি বসল না। বললে, 'সবই তো সুন্দর দেখা হল। এবার চলুন ফিরে যাই।'

বরেন বললে, 'আজকে আর ফিরে যাওয়া নেই। আজকের রাতটা আমরা এখানে কাটাব।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, আমি আর তুমি।'

'সে কী?'

'এতে আর অবাক হবার কী আছে?'

'বা, বাড়িতে ভাববে না?'

'না। তোমার মাকে বলে এসেছি।'

'মাকে কখন বললেন?'

'ঐ যে গাড়িতে উঠতে যাবার আগে ভিতরে গেলাম—'

'মিথ্যে কথা।' কাকলি রুখে উঠল: 'কোনো মাকে বলা যায়, আপনার মেয়েকে নিয়ে বাইরে রাত কাটাতে চললুম? অসম্ভব।'

'তা হলে কী বলা যায়?' সিগারেট ধরাল বরেন।

'বড় জোর বলা যায়, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, আপনারা ভাববেন না।'

'বেশ তো, তা হলে ঐটুকুই বলেছি। তা এখনো দেরি তো কিছু হয় নি।' হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল বরেন: 'সুতরাং অনায়াসে আরো কতক্ষণ বসে যেতে পারি। চাই কি, এক চমক ঘুমিয়েও নিতে পারি দু-জনে।'

'আপনি ঘুমোন। আমি বসে আছি চেয়ারে।' কাকলি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

নিজের চেয়ারটা কাকলির মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিল বরেন। বললে, 'খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের প্রথম রাতটা দু-জনে এখানে কাটাব।'

'তা কাটাবেন।'

'ম্যারেজ অফিসারের সামনে পাকা দলিল সই করে দু-জনে সটান চলে আসব এখানে। যেদিন খুশি, সন্ধেসন্ধি। খাওয়া-দাওয়া আগেভাগে সেরে নেব হোটেলে। ঠিক আজকের মত। তারপর ঘরে ঢুকে সেই যে দরজায় খিল দেব—'বরেন উঠে দরজায় খিল দিল।

ছটফট করে উঠল কাকলি। আর্তমুখে বললে, 'বা, সেই রাতটা আগে আসুক।'

বরেন ফের চেয়ারে এসে বসল : 'সেই রাতটাই তো এসেছে।'

'আজকে কি আমাদের বিয়ের রাত? আমাদের বিয়ে কি হয়েছে বলতে চান?'

'বিয়ের আর বাকি কি। নোটিশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কী একটা অবজেকশান পড়েছিল তাও গিয়েছে বাতিল হয়ে। এখন শুধু একদিন—তাও যত শিগগির সম্ভব—নোটিশের মান রাখতে হলে তার তিন মাসের মধ্যে—আর সে হিসেবে আজ থেকে দিন পনেরো কুড়ি মোটে আছে—ম্যারেজ অফিসারের কাছে গিয়ে সাক্ষী রেখে ডিক্লেরেশান ফর্মটা সই করে দিয়ে আসা। আর ঢং করে মন্ত্র উচ্চারণ করা—আশ্চর্য, সেখানেও মন্ত্র—আমার বলা, তোমাকে নিচ্ছি আমি আমার বৈধ স্ত্রীরূপে, আর তোমার বলা, তুমি নিচ্ছ আমাকে বৈধ স্বামীরূপে—ব্যস্, তা হলেই পূর্ণ স্বরাজ—'

ডুবন্ত লোকের কুটো ধরার মত বললে কাকলি, 'তা তো এখনো বাকি।'

'সে কাল পরশু তরশু—ঐ বাকি মেয়াদের মধ্যে—যে কোনোদিন হতে পারে। তারিখ পেরিয়ে যায়, ব্যাক-ডেট করে নেওয়া যায় ঘুষ দিয়ে। নিতান্ত একটা কাগুজে ব্যাপার। আসল দুটো হার্ডল—নোটিশ আর তার অবজেকশান—তা নির্বিঘ্নে পার হয়ে গিয়েছে—'

'যেটুকু এখানো বাকি আছে, ঐ সই আর মন্ত্র, যাকে আপনি কাগুজে ব্যাপার বলেছেন—যা না হলে বিয়েটা সম্পূর্ণ হবে না—সেটুকু আগে হয়ে যাক।' কাকলিরই কানে দুর্বল ছলনার মত শোনাল বুঝি কথাটা।

'সেটুকু আর আগে হবে না। আমি জানি তুমি গড়িমসি করবে। পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতে চাইবে। সে আর হতে দিতে আমি প্রস্তুত নই। বরং আমি জানি যদি এ রাত তোমার সঙ্গে এখানে কাটিয়ে যেতে পারি তা হলেই তোমার ঐ সইয়ে আর মন্ত্রে চাড় আসবে! তখনই তুমি দলিলে ঢাকতে চাইবে নিজেকে।' বরেন উঠে

দাঁড়াল, উদ্ধত ও নিষ্ঠুর : 'আর যদি অল্প রাতেই বাড়ি ফিরতে চাও তাতেও আমার আপত্তি নেই।' বলে বরেন সহসা সুইচ অফ করে অন্ধকার করে দিল।

অন্ধকারের প্রথম প্রতিক্রিয়া একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরুতে চাইল কাকলির থেকে। কিন্তু কাকলি সেটাকে হাসিতে বদলিয়ে দিল। বরেনের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে প্রতীক্ষা না করেই হেসে উঠল। বললে, 'ও কী, অন্ধকার করছেন কেন ? যা আনন্দের তা কি চোখ দিয়ে একটুও দেখবার নয় ?'

বরেনের পরবর্তী পদক্ষেপে দ্বিধা এল।

কাকলি বললে, 'আলো জ্বালান। আপনার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা আছে।'

বরেন সুইচটা অন করল।

'কী কথা ?' এক পা এগুল বরেন।

'শুনুন। বসুন শান্ত হয়ে।' চেষ্টা করে ক্ষীণ রেখায় হাসল কাকলি।

'বেশ। বসলাম।' চেয়ারটা বরং আরো কাছে টেনে নিয়ে বরেন বসল।

'অস্থির হবেন না।' যেন শোকার্তকে সারহীন সান্ত্বনা দিচ্ছে 'কাকলির নিজের কানেই এমনি বাজে শোনাল।

'না, না, আমি খুব স্থির।'

—'স্থির ?'

'হ্যাঁ, সংকল্পে স্থির। আমার প্রাপ্য আমি আজ কিছুতেই ছেড়ে দেব না।'

'প্রাপ্য ?' রুক্ষ হবার মত সাহস নেই, করুণ রেখায় আবার হাসল কাকলি।

'এক শো বার প্রাপ্য। আদালত তাই সাব্যস্ত করে দিয়েছে।'

'বা, আদালত আবার কী সাব্যস্ত করল ?' কাকলি অবাক হবার ভাব করল। যতটা সাধ্য দীর্ঘ করা যাক কথাবার্তা। যদি দীর্ঘ করলে ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক জুটে যায়।

'ন্যাকামো কোরো না।' ধমকে উঠল বরেন : 'আদালত বলে দিয়েছে তুমি আমার। ন্যায়ে না হোক অন্তত অন্যায়ে। সুতরাং—'

'আদালত কি ওভাবে কিছু বলেছে ?' চোখের দৃষ্টিটাকেও একটু দীর্ঘ করল কাকলি।

'ভাব যাই হোক, বলে দিয়েছে তুমি আমার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত।' বরেন চেয়ারে হেলান দিতে চাইল, পারল না : 'ও কথার শুধু একটা মাত্রই মানে। সুতরাং—'

কাকলি এবার চোখেও হাসল। বললে, 'মোটেই নয়। ব্যভিচার কথাটার একাধিক মানে। যে কোনো অন্যথাচরণই ব্যভিচার।'

'রাখো।' আবার ধমকে উঠল বরেন : 'কথাটা বাঙলা নয়, কথাটা ইংরিজি। অ্যাডালটারি। ও কথাটার একটিমাত্রই মানে। সেই লিভিং ইন অ্যাডালটারি। সুতরাং আমার সঙ্গে রাত কাটালে তোমাকে এমন কিছু যোগভ্রষ্ট দেখাবে না। তুমি যদি আদালতেও যাও, আদালত বলবে, বা, এতে আবার নালিশ কী, এ তো জানা কথা। এ তো ঠিকই হয়েছে, এরকমই তো হবে, হওয়া উচিত।'

'আদালত তার নিজের বুদ্ধিতে কী বলবে তাই মেনে নিতে হবে?' কাকলি আবার একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

'নিশ্চয় নিতে হবে। আদালত যে ডিভোর্সের ডিক্রি দিয়েছে তা মেনে নাও নি?' মুখিয়ে উঠল বরেন : 'তা যদি নিয়ে থাকো তবে যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই ডিক্রি তাকেও মানতে হবে।' চেয়ারটা আরো একটু কাছে, পাশে, টেনে এনে বরেন কাকলির একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরল : 'সুতরাং ওঠো, চলো'—

'আদালতের বিচারে কি ভুল হয় না?' হাসি-হাসি মুখ করল বটে কাকলি, কিন্তু কান্না-কান্না শোনাল।

'না, কী করে হবে! সেই আদালতের বিচার তোমার নিজের স্বীকৃতিতে। তা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? সুতরাং এসো।' হাত ধরে টানল বরেন : 'আর তোমার এখন ফিরে যাবার পথ নেই।'

'তার মানে বলতে চান আদালতের মান রাখতে এখন প্রাণ দেব?'

'শুধু প্রাণটুকুই দেবে না, আর বাকি সমস্ত কিছু দেবে।'

'কিন্তু,' হাতটা ধীরে ছাড়িয়ে নিল কাকলি, 'আদালতের বিচার যাই হোক, আপনার বিচারে ভুল থাকে কেন?'

'ভুল?'

'হ্যাঁ, ভুল বৈকি। আদালতের মামলায় আমার না হয় সম্মতি ছিল কিন্তু আপনার এ বর্তমান মামলায় আমার বিন্দুমাত্র সম্মতি নেই।' একটু বা কঠোর শোনাল কাকলিকে : 'সুতরাং সে ক্ষেত্রে—'

'তোমার সম্মতি-অসম্মতি অবান্তর।' উঠে দাঁড়াল বরেন, কাকলির কাঁধের উপর দৃপ্ত হাত রাখল, বললে, 'ওঠো। নয়তো জোর করে, কোলে করে তুলে নিয়ে যাব।'

মূর্তি দেখে ভয় পেল কাকলি। বন্যতায় বিশাল দেখাচ্ছে বরেনকে। উদগ্র

উদ্ধত। অপ্রতিবার্য। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত। হয়তো বা বঞ্চিত বলে আহত বলে বেশি ক্রুদ্ধ।

কিন্তু এখন কাকলি কী করবে? কী করতে পারে?

কাঁদবে? যেমন করে নিপীড়িতারা কাঁদে? নাকি পায়ে পড়ে মিনতি করবে? যেমন করে অসহায়ারা ভিক্ষে চায়?

ভাবতেও সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল কাকলির।

নইলে কি চেঁচাবে? চেঁচিয়ে লোক ডাকবে? কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও, এই বলে রব তুলবে? নয়তো, চোর, চোর, ডাকাত, ডাকাত—এমনি একটা ঢালা চিৎকার?

এ আরো লজ্জাকর।

তা ছাড়া মিনতিতে ভিজবে বা কান্নায় গলবে বরেনের এই এখন চেহারাই নয়। বরং ঐ বিগলিত ভঙ্গিতে তার সুবিধে-সুযোগ আরো বেড়ে যাবে। আর চেঁচিয়েই আশু কোনো ফল হবে এমন মনে হয় না। গলার পর্দা কত উঁচুতে তুলতে পারবে? স্টেজে রিহার্সেল দেওয়া থাকলে বরং সহজ ছিল। আর স্বর উচ্চগ্রামে তুলতে পারলেও বা শুনছে কে? যারা আশেপাশে আছে, মালী বা ড্রাইভার, তাদের কানে যদি আওয়াজ ঢোকেও, শুনেও শুনবে না। তা ছাড়া এখন বুঝি জোরে হাওয়া দিয়েছে বাইরে। ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টি-বৃষ্টি আকাশ, কে কার অর্তনাদ শোনবার জন্যে কান পেতে আছে?

নখে-দাঁতে লড়তে পারে অবশ্যি। তা না হয় লড়ল। কিন্তু যেরকম ভয়ানক দেখতে হয়েছে বরেনকে, শারীরিক শক্তিতে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে এমন ভরসা হয় না। শেষ পর্যন্ত নিরস্ত তো করতে পারবেই না, মাঝখানে নিজে জখম হবে, প্রকাশ্যে মুখে-গালে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াবে—সে আরেক কলঙ্ক, দ্বিগুণ কলঙ্ক। হাতাহাতি ঝটাপটি শুরু হলে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠবে বরেন, আর যেমন দুর্বার তার মূর্তি, কোনো কিছুতেই সে পেছপা হবে না। যে মুহূর্তে সে সন্দেহ করেছে কাকলির সরে পড়ার মতলব সে মুহূর্তে সে হঠকারিতার তুঙ্গে এসে উঠেছে। চাই কি, গলা টিপে মেরেও ফেলতে পারে। অতদূর না যাক, মারাত্মক আঘাত করতে কসুর করবে না।

তবে উপায় কী?

এখানে এসেছে বলে অনুতাপ হচ্ছে কাকলির। ঘটনা এমন একটা বিসদৃশ চেহারা নেবে আঁচ করতে পারে নি। বাধা সরে যাওয়া সত্ত্বেও বিয়ে পিছিয়ে দিতে

৫৫১

চাইছে এতে খুব বেশি ক্ষুণ্ণ না হয় তারই জন্যে বরেনকে প্রশস্ত সঙ্গ দেবার খাতিরে ফার্ম দেখতে রাজি হয়েছিল। ভাবে নি আজই, এক্ষুনি-এক্ষুনি, এমনি উদ্দাম হয়ে উঠবে। এমনি একটা বিপন্নয় মুহূর্ত না আসে তারই জন্যে সজাগ থাকতে-থাকতে কখন একটু হঠাৎ শিথিল হয়ে পড়েছিল, আর তারই জন্যে এই লাঞ্ছনা।

এখন করে কী কাকলি?

চারিদিক আর্ত চোখে তাকাল নিঃস্বের মত। কোনো পথ নেই, উপায় নেই। রাজিই বোধ হয় হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

'শেষকালে গায়ের জোর দেখাবেন?' করুণ চোখে তাকাল কাকলি।

'হ্যাঁ, তাই তো দেখাব। গায়ের জোর ছাড়া আমার আর কী আছে! এখন তো একমাত্র গায়ের জোরেই আমি পুরুষ তোমার কাছে।'

'কিন্তু গায়ের জোর কি সম্ভ্রান্ত?

'সম্ভ্রান্ত হবার মত বোকা আর আমি নই। গায়ে যে এখনো গেঞ্জিটা আছে এই যথেষ্ট। একটানে এটাও খুলে ফেলব। শোনো,' কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বরেন দাঁড়াল মুখোমুখি: 'যে অ্যাডালটারার সে আবার সম্ভ্রান্ত কবে?'

'ডিক্রি হয়ে যাবার পর আর অ্যাডালটারি কোথায়?' কাকলি আবার হাসিমুখ করল: 'বিয়েই যেখানে নাকচ হয়ে গেল সেখানে আর অ্যাডলাটারির অবকাশ নেই। সেখানে অ্যাডালটারিও নাকচ হয়ে গেল। সুতরাং—'

'তোমার ওসব সূক্ষ্ম তর্কে আমি আর ভুলতে রাজি নই। নাও, ওঠো।' বরেন আরো ঘেঁষে এল: 'অ্যাডালটারির কেস আর না থাক, বিয়ের কেসটা তো আছে। তুমি নিজের হাতে নোটিশে সই করে দিয়েছ। কি, সেটা তোমার সম্মতি-দলিল নয়? বর্তমান মামলায় তোমার সম্মতি নেই, তোমার এ কথা আর খাটে না।'

'বা, বিয়ের মত তো আমার আছেই। তাই বলে বিয়েটা ঘটবার আগেই—'

'রাখো।' হুমকে উঠল বরেন: 'তোমার আর কোনো ছলনাতে আমি ভুলছি না। আমার জাতও যাবে পেটও ভরবে না, এ অসম্ভব। বদনাম কিনব অথচ বিয়ে দিয়ে ঢাকতে পারব না, দুই ইনিংসেই আমি গোল্লা খাব—এ সহ্যের বাইরে! সুতরাং—' বরেন বাহু ধরল কাকলির।

'প্লিজ—' মিনতি মাখানো সজল চোখে বললে কাকলি।

'ওসব পুরোনো হয়ে গিয়েছে।' জোরে কাকলিকে আকর্ষণ করল বরেন: 'রাত বেশি করে লাভ নেই। ওঠো, চলো।'

'কোথায় যাব?' উঠে পড়ল কাকলি।

'ঘুমুতে চলো।'

কাকলি ফের বসল চেয়ারে। গম্ভীর হয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, 'এ হয় না।'

'এক শো বার হয়।' বরেন এবার দুই বাহু ধরে সবলে কাকলিকে দাঁড় করিয়ে
।

'আমি যেখানে 'না' বলছি আপনি সেখানে পাশবিক জোর দেখাবেন?'

'পাশবিক জোর আছেই তো দেখাবার জন্যে!'

'তা হলে আপনি আমাকে ভালবাসেন নি একটুও?'

'যেন তুমিই আমাকে বেসেছ! শোনো,' বরেন আরো নিবিড়ে আকর্ষণ করতে
াইল কাকলিকে: 'তোমার সকল সুবিধে একে-একে আদায় করে নিয়ে তুমি সরে
ড়বে, আর আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব এ ভালো-বাসায় আর বিশ্বাস
নই।'

'তবে এখন কিসে বিশ্বাস?'

'এখন বিশ্বাস শুধু পৌরুষে। পাশবিকতায়।' বরেন কাকলিকে আলিঙ্গন করে
রল।

চোখে অন্ধকার দেখল কাকলি। অনুভব করল শরীরে এমন শক্তি নেই যে
র্ধর্ষ বরেনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে মাটিতে। গলায় এক তন্তু আওয়াজ আনতে
।

উপায় নেই। রাজিই হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

'বাব্বাঃ, তুমি কী জবরদস্ত! কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।' লোলকটাক্ষে তাকাল
কলি: 'সাধ্য কী তোমার কাছে হার না মানি। সব না দিয়ে দিই তোমাকে।'

সম্ভাষণের মদিরতায় অভিভূত হয়ে গেল বরেন। গদ্‌গদ স্বরে বললে, 'তবে—'

'যাও শোও গে,' স্থির নিষ্কম্প স্বরে বললে কাকলি, 'আমি ওখান থেকে একটু
আসছি।'

'কোনখান থেকে?'

'আহাহা—বাথরুম থেকে!

'বরেন ছেড়ে দিল আলিঙ্গন। আর তক্ষুনি ত্বরিত পায়ে কাকলি ঢুকে পড়ল
থরুমে। দরজায় ছিটকিনি দিল।

গভীর করে নিশ্বাস ফেলল আরামের। আর তাকে পায় কে! দরজার ওপার
কে শত ধাক্কা দিলেও কিছুতেই খুলবে না কাকলি। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করবে
যাতে বরেনের সন্দেহ হয় কাকলি ভয়ানক কিছু করেছে, হয়তো আত্মহত্যা

করেছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে বেশ তাকে ভাবতে হবে, জড়ো করতে হ
লোকজন, হয়তো বা খবর দিতে হবে পুলিশে। আর পুলিশের সামনে, লোকজ
সামনে দরজা ভাঙা হলে তার আর ভয় কী!

সমাধান আরো সহজ মনে হল। কাকলি দেখল বাইরের দিকে বাথরুমের
একটা দরজা আছে। ঐ দরজা দিয়েই বোধ হয় মেথর আসে পরিষ্কার করতে।

ঐ দরজা খুলেই পালাবে কাকলি।

ড্রাইভারকে বললে তাকে বড় রাস্তায় পেঁাছে দেবে না? কিংবা বাসটার্মিনা
কিংবা যতক্ষণ না নাগাল পাই একটা ট্যাক্সির?

কী বললে একা কাকলিকে নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালাতে রাজি হবে তাও
একটু ভাবা দরকার।

সে পরে হবে। আসল হচ্ছে বেরিয়ে পড়া।

যদি ড্রাইভার রাজি নাও হয়, পায়ে হেঁটে, ছুটেই, এগোবে কাকলি। অন্ধকার
পথ করে নেবে।

বাইরে নিশ্চয়ই বরেন আর তাকে তাড়া করবে না। আর যদি পিছু নেয়ও, পার
না আয়ত্তে আনতে। হামলায় মাততে, হাত ধরে টানাটানি করতে। আর যদি ব
পর্যন্ত চলে আসে, সে অন্য ভূমিকায়, অন্য পরিবেশে। অন্তত ভদ্রলোকের জামাকাপড়

টুক করে বাইরের দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল কাকলি। অন্ধকার, তবু
গাড়ীর মধ্যেই ঘুমুচ্ছে ড্রাইভার।

'এই। শোনো।' কাকলি যতদূর সম্ভব আতঙ্কমন্থর করল কণ্ঠস্বর।

চটকা ভেঙে উঠে পড়ল ড্রাইভার।

'কাছাকাছি কোথাও একটা ডাক্তারখানা আছে?' দরজা খুলে তড়ি
নিজেই ভিতরে ঢুকে পড়ল কাকলি: 'শিগগির। বাবুর একটা হার্ট-অ্যা
হয়েছে। বিছানায় খানিকক্ষণের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ডাক্তারখানা পে
ডাক্তারের হদিস পাওয়া যাবে নিশ্চয়। শিগগির।'

আচ্ছন্নের মধ্য থেকে কী বুঝল ড্রাইভার, গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হর্নও বুঝি দিতে হল কয়েকবার।

সন্দেহ কি, ধড়মড় করে উঠে পড়েছে বরেন। আর, যতই গাড়িটাকে
নিয়ে যাওয়া ততই বরেনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, এ সহজ সত্য ভুলে গিয়ে নির
ভয়ে শিউরে উঠছে কাকলি, এই বুঝি বরেন তার পিছু নিল। ধরে ফেলল!
আটকাল সামনে দাঁড়িয়ে।

'ঐ ট্যাক্সিটা আসছে, ওটাকে আটকাও।' চেঁচিয়ে উঠল কাকলি।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াল।

গাড়ি ছেড়ে দিল কাকলি। ড্রাইভারকে বললে, 'আমি এই ট্যাক্সি করেই ক্তার আনতে যাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও গাড়ি নিয়ে। দেখ গিয়ে বাবুকে। এ য় বাবুর কাছে একজনের থাকা দরকার।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মানেই একটা পাপের বিবর থেকে বেরিয়ে আসা। ন্তু গা থেকে মালিন্যের শেষ পঙ্কটুকু মুছে ফেলা।

কিন্তু গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া বুঝি বুদ্ধিমানের কাজ হল না। গাড়িটা পেয়েই ং বরেন দ্রুততর অনুসরণের সুযোগ পাবে। পথে ধরতে না পায় একেবারে কলিদের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হবে, হাজির হবে মায়ের প্রশ্রয়ের খাসমহলে। জানে, কোথায় না জানি আছে শর্টকাট, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বরেন তার চেয়ে অনেক শি রপ্ত, ট্যাক্সির আগেই গিয়ে হাজির হবে। ট্যাক্সিকে সে তাদের পাড়া, খুব হলে দের রাস্তার নাম শুধু বলতে পারে। আর, ট্যাক্সিদের যা স্বভাব, 'যতদূর সাধ্য টাকে দীর্ঘ করতে চাইবে, মুখ দিয়ে না খেয়ে নাক দিয়ে খাবে। তাই বাড়িতে ার আগে আর কোথাও যাওয়া যায় না? যাতে মার কাছে নালিশ করতে গিয়ে ন দেখে বাড়িতেও কাকলি ফেরে নি।

সেই ভালো। একটা অভিভাবকত্বের অধীনে আশ্রয় নিতে পারলে কাকলি আরো শ্চন্ত নিরাপত্তায় চলে আসে। তখন লড়বার ভূমিকা আর তার হাতে থাকে না। হাতে যায়, তার সামান্য সান্নিধ্যই তখন বোধ হয় বিরাট দুর্গের কাজ করে।

ট্যাক্সিওয়ালাকে সুকান্তের হোটেলের ঠিকানা বললে কাকলি।

হাতঘড়িতে সময়টা এবার দেখে নিল। না, এমন কী রাত হয়েছে!

দোতলায় চলে এল কাকলি।

ঐ সুকান্তের ঘর। দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। আলো জ্বলছে ভিতরে।

পর্দার কাছে কী এক আধেক-দেখা-না-দেখা ছায়া দুলে-দুলে উঠল।

'আসুন।' তপ্ত অন্তরঙ্গতায় ডেকে উঠল সুকান্ত।

দরজা আর পর্দার মাঝখানে যে ফাঁক হয়ে আছে তারই কাছে ছায়া বুঝি ঘন এল।

'আশ্চর্য, আমি তারিখটা একদম ভুলে গেছি। সত্যি, আজই কি আপনার সেই ন্ত্রণের দিন?' তক্তপোশে বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল সুকান্ত: 'তা হোক, যখন সবেন তখনই নিমন্ত্রণ।'

কী বুঝল কে জানে, ছায়া ঘরের মধ্যে শরীরিণী হয়ে উঠল।

'এ কি, আপনি ?' স্তব্ধীভূত হয়ে গেল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার রিটার্ন-ভিজিটটা দিয়ে আসি কাকলি স্বচ্ছমুখে বললে, 'আপনি কারু অপেক্ষা করছেন বোধ হয়। আচ্ছা, আমি নমস্কার।'

৫২

'শুনুন ! শুনুন ! চলে যাচ্ছেন কেন ?' ডাক দিল সুকান্ত।

প্রস্থান-উদ্যত ভঙ্গিটাকে নিবৃত্ত করে স্বস্থানে নিয়ে এল কাকলি।

'যখন দয়া করে এসেছেন, তখন একটু বসে যান।' দিব্যি চোখের উপর চো রেখে বলতে পারছে সুকান্ত, 'শুধু দাঁড়িয়ে গেলে রিটার্ন-ভিজিট হয় না। অফিসিয়া ডিকোরাম-এর বইটা আপনি পড়ে দেখবেন।'

'ভিতরে এসে একটু বসে যেতে হয় বুঝি ?' কাকলি দিব্যি চোখের পাতা পার নাচাতে।

'নিশ্চয়। আপনি যদি এসে দেখতেন আমি বাড়ি নেই, আমার ঘর বন্ধ, হলেও আপনার রিটার্ন-ভিজিটটা ভ্যালিড হত না। আপনার শুধু আসাটা সাফিসিয়েণ্ট নয়। চিরকুট বা একটা কার্ড রেখে গেলেও নয়।'

'তা হলে আপনি বলতে চান, রিটার্ন-ভিজিটটা ভ্যালিড করতে হলে আমা: আপনার ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে যেতে হবে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শূন্য ঘরে স্ট্যাচুর মত বসে থাকলে হবে না। ঘরওয়ালার স: একটু গল্পও করে যেতে হবে।'

'তাই নাকি ?' কাকলি ঘরে ঢুকে ভালো করে দেখতে লাগল কোথায় ব যেদিকে তাকায় সেইদিকেই স্তূপাকার এলোমেলো। একরাশ কাপড়, ধোয়া অ আধোয়া, কাঠের চেয়ারটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে, প্রথমটা হদিস পায় নি। প ঠাহর করতে পেরে নিজেই উদ্যোগী হয়ে কাপড়ের জঞ্জালটাকে বিছানার উপর নামি রাখল : 'যদি কিছু মনে না করেন, চেয়ারটাকে মুক্ত করি।'

'নয়তো বিছানাটাও আছে। চেয়ারে না কুলোলে বিছানায় বসেও গল্প

যায়। প্রায় বলতে যাচ্ছিল সুকান্ত। কিন্তু আফিস-কলিগ্ ভদ্রমহিলাকে এভাবে বলাটা মোটেই সংগত হবে না। তাই দ্রুত সামলে নিল।

চেয়ারে বসে কাকলি বললে, 'কিন্তু গল্প—কী গল্প করব ?'

'দুই আফিস-কলিগ্ কী আর গল্প করতে পারে বলুন। তাদের তো শুধু এক গল্প।' হাসল সুকান্ত। বিছানায় পা তুলে বসল।

'এক গল্প ?'

'হ্যাঁ। শুধু শপ-টক। মানে আফিস নিয়ে আলোচনা। আফিসের চিট-চ্যাট, শাদা বাঙলায়, কেচ্ছা। কিন্তু আপনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, যা আপনার খুশি, গল্প করতে পারেন। দেখছেনই তো, আমি তো আর আপনি নই।'

'আমি নন মানে ?' কাকলির চোখের দৃষ্টি ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'মানে, আমি চাকর দিয়ে অতিথিকে তাড়িয়ে দিই না বাড়ি থেকে।' সুকান্ত মেঝের দিকে তাকাল : 'তাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে এনে বসাই।'

'দেখুন ছি ছি, সেদিন ভারি ভুল হয়েছিল, অন্যায় হয়েছিল।' অনুশোচনায় উদ্বেল হয়ে উঠল কাকলি : 'আমি মোটেই বুঝতে পারি নি।'

'কী বুঝতে পারেন নি ?'

'যে, আপনি এসেছেন।'

'বুঝতে পেলে কী করতেন ?' দৃষ্টিটাকে তুলে সুকান্ত একফালি জ্যোৎস্নার মত কাকলির গায়ের উপর রাখল।

'বুঝতে পেলে নিচে নামতুম, দেখতুম—'

'দেখেন নি বলে যা হোক চাকরকে দিয়ে পরোক্ষে তাড়িয়েছিলেন, দেখতে পেলে প্রত্যক্ষে তাড়াতেন।' চোখের দৃষ্টিটাকে নির্লিপ্ত করে কাকলির মুখের উপর রাখল সুকান্ত।

'মোটেই নয়। আফিস-কলিগ্‌কে কি কেউ তাড়ায় ? শুনেছেন কোথাও ?' হাসতে চেয়েও হাসল না কাকলি : 'কিন্তু আপনিই বা কেমন! এসেছেন যখন, নামধামটা তো বলতে হয়। নইলে ভিতরের লোক কেমন করে বুঝবে ?

'ভিতরে কোথায়, আপনি তো উপরে ছিলেন। তাই ভিতরের লোক না বলে উপরের লোক বলুন।'

'ও একই কথা। স্লিপ ছিল, পেন্সিল ছিল, তাতেও তো লিখে দিতে পারতেন।'

'পার্পস অফ ভিজিটটাও লিখতে হয়, না ?'

'সে তো আফিসের স্লিপে। বাড়ির স্লিপে ওটা না হয় ব্ল্যাঙ্ক রাখতেন।' নড়ে-চড়ে উঠল কাকলি : 'পুরো নাম না লিখে শুধু ইনিশিয়্যাল্‌স লিখলেও নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।'

'আরো সংক্ষেপে, একজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে, শুধু এটুকু বললে হত না?'

'কী করে হবে? জীবনে অবাঞ্ছিত ভদ্রলোকও তো আসে ধূমকেতুর মত।'

'যা বলেছেন!' উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সুকান্ত : 'আমার জীবনেও যেমন এসেছে এক অবাঞ্ছিতা।'

'অবাঞ্ছিতা?' ভাসা-ভাসা সরল-দীঘল চোখে তাকাল কাকলি : 'যার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছিলেন? যার এখানে নেমন্তন্ন?'

'আর বলেন কেন!' আহতের মত মুখ করল সুকান্ত : 'জীবনে এসেছে বললাম না? বলা উচিত কপালে জুটেছে।'

'কিন্তু যার জন্যে আপনার অপেক্ষা, যাকে আপনার নেমন্তন্ন, সে কি কখনো অবাঞ্ছিতা হতে পারে?'

'সেইই তো ট্র্যাজেডি। শুনুন তা হলে অবস্থাটা—' আসনে আরো দৃঢ় হল সুকান্ত।

'একজন আফিস-কলিগ্‌কে বলবেন আপনার প্রাইভেট কথা? সেটা কি ঠিক হবে?'

'কেন, বলা যায় না কলিগ্‌কে?' অসহায় মুখ করল সুকান্ত : 'যদি কলিগ্‌ ছাড়া সম্প্রতি আর কেউ তার না থাকে?'

'তা হলে বোধ হয় বলা যায়।' কাকলিও আঁট হল চেয়ারে : 'আগে তবে বলুন ভদ্রমহিলাটি কে?'

সিলিঙের দিকে তাকাল সুকান্ত : 'তাকে কি আপনি চিনতে পারবেন? ধরুন একজন শিক্ষিকা। বেশ কথাটা এই শিক্ষিকা—তাই না?'

'হ্যাঁ, আগে যে শিক্ষয়িত্রী চলত তার চেয়ে ভালো।'

'তার আগে যা চলত সেটা ভয়াবহ।'

অবাক হবার মত মুখ করল কাকলি : 'সেটা কী?'

'মিসট্রেস। কখনো-কখনো বা হেড-মিসট্রেস! শিক্ষিকা শব্দটা সম্ভ্রান্ততা এনেছে। বলা যায় অর্থের পুনর্বাসন ঘটিয়েছে। তেমনিধারা নার্স কথাটার জন্যেও একটা কুলীন প্রতিশব্দ দরকার। কেউ যদি শোনে, ঘরে নার্স এসেছে, তা হলে কেউ রুগীর খোঁজ করবে না, উলটে ঐ আসাটারই একটা রুগ্ন মানে করে বসবে।'

'নার্স-টার্স জানি না, কিন্তু যে শিক্ষিকার কথা বলছেন, অনুমান করছি, সে তো আগে-আগে আরো এসেছে আপনার হোটেলে, আর নিশ্চয়ই তা আপনারই নিমন্ত্রণে।'

'ঐ দেখুন, ঐ আরেকটা শব্দ—হোটেলে আসা। তেমনিধারা বাগানবাড়িতে যাওয়া, কিংবা ডাকবাংলোয় ডাকা। বাঙলা ভাষায় ঐ কথাগুলোর প্রক্ষালন দরকার। যদি কোনো মহিলা হোটেলে আসেন, কিংবা কোনো মহিলাকে বাগান-বাড়ি নিয়ে যাই কিংবা ডাকবাংলোয় ডেকে আনি, বাঙলা করে বললেই লোকে তার হেয় অর্থ করবে। কী, বলুন, করবে না?'

'করবে।' যতদূর সাধ্য মৃদু করে বললে কাকলি।

'যেমন আপনি এখন করছেন। যেহেতু শিক্ষিকাটি আমার ঘরে এসেছেন সেই হেতু দুয়ে-দুয়ে চার ছাড়া কিছু হবার নয় ভাবছেন। কিন্তু তার এই আসাটা যে উৎপাত হতে পারে, নিমন্ত্রণটাই যে নিপীড়ন, তা ধারণাই করতে পারলেন না।'

'কিন্তু কেন, উৎপাত কেন?'

'শিক্ষিকাটির বিশ্বাস যে তাঁর সঙ্গে মেলামেশাটা দীর্ঘ হয়ে উঠলেই একদিন তিনি আমার স্ত্রী হয়ে উঠবেন। বলুন, তা কি হয়?'

'কেন হয় না? খুব হয়।'

'আপনি কিছু জানেন না। শুধু মেলামেশাতেই কি ভালোবাসা জাগে? আর ভালোবাসা না জাগলে বিয়ে কী।' দিদ্যি চোখে চোখ রাখল সুকান্ত: 'বলুন, ঠিক নয়?'

'বললেনই তো, আমি কিছু জানি না।' কাকলি চোখ নামাল।

'আপনার জীবনে তেমন কিছু হয় নি বোধ হয় অভিজ্ঞতা। সকলের জীবনে হয় না। যেমন সকলের গলায় গান আসে না। সকলের চিত্তে জন্মায় না রসবোধ। যার আসে তার মহাভাগ্য।'

'আপনার এসেছিল?'

'হ্যাঁ, একদিন এসেছিল, কিন্তু সে কথা থাক। শিক্ষিকার কথাটাই বলি।'

'বলুন।'

'শিক্ষিকার ধারণা যেন গাধা পিটিয়েই ঘোড়া করা যায়। জোর করেই আনা যায় সুর, লেখা যায় কবিতা। অভ্যেস থেকেই আসা যায় আশ্চর্যে। সূর্যের তাপে ফুল ফোটে কিন্তু যেহেতু সূর্য নেই সেহেতু আগুনের দাহেই ফুটবে। তা কখনো হয়! বলুন না, আপনিই বলুন না। গায়ের জোরে চাষ করতে পারি, কিন্তু বৃষ্টি

আনতে পারি গায়ের জোরে? আর বৃষ্টিই যদি না ঝরল, ফসল কোথায়? কী, আপনার মত কী?'

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল কাকলি। বললে, 'আমি কী বুঝি! আমার কতটুকু জীবন, কী বা হয়েছে আমার জীবনে!'

কথায় বলে, রাস্তা ধরে শুধু হেঁটে যাও, এগিয়ে যাও, ঠিক মিলবে সরাইখানা। শিক্ষিকার বোধ হয় তাইতেই বিশ্বাস। কিন্তু রাস্তা যে সব সময়ে সরাইয়ে গিয়েই শেষ হয় না, কখনো কখনো শূন্য প্রান্তরে এসে মেশে, তা তার জানা নেই।'

'কিন্তু নদী ধরে চললে, কোনো ভুল নেই, ঠিক সমুদ্রে এসে পড়া যায়।' কাকলি বললে।

একটু বুঝি চঞ্চল হল সুকান্ত। বললে, 'আচ্ছা, আপনাকে যদি একটু চা এনে দি, খাবেন?'

হাসল কাকলি: 'এটা অফিসিয়াল কোডে পড়ে তো?'

'এক কলিগ্ আরেক কলিগ্কে চা খাওয়াবে এতে বারণ তো কিছু দেখি না।'

হাতের ঘড়ি দেখল কাকলি: 'সময়ের বারণ।' আবার দেখল চারদিকের ছন্নছাড়া চেহারা: 'স্থানের বারণ। তা ছাড়া রিটার্ন-ভিজিটের মেয়াদ বুঝি পেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। এবার তবে উঠি।'

'উঠবেন কী! বৃষ্টি নেমেছে।'

'সত্যিই তো।' জানলার বাইরে থেকে চোখ ঘরের মধ্যে আনতেই সুকান্তের চোখের উপর এসে পড়ল। সামলে নিল কাকলি। বললে, 'কিন্তু আপনার কী! আপনার তো মজা। পৌষ মাস। দিব্যি নিজের জায়গায়, নিজের ঘরে আছেন। আর আমি! আমি কতদূর যাব বলুন তো?'

'আপনাকে তবে একটা ট্যাক্সি ডেকে দি।' তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল সুকান্ত।

'তাই দিন। সো কাইণ্ড অফ ইউ।'

'হ্যাঁ, রাত বাড়বে বৈ কমবে না। আর আপনার অভিভাবকেরা ভাববেন।'

'অভিভাবক দেখি এক দঙ্গল করে দিলেন।' স্বচ্ছ মুখে হাসল কাকলি।

'আপনার মা বাবা আছেন নিশ্চয়ই। তদতিরিক্ত আরো একজন কোন না আছেন! মেয়েদের সব সময়েই এক দঙ্গল অভিভাবক। নিরভিভাবক যদি কাউকে বলতে চান তো আমি। কেউ নেই আমার জন্যে ভাবে।'

'আপনার কথা জানি না। কিন্তু তদতিরিক্ত লোকের কথা যা আপনি বললেন সেটাও অতিরিক্ত বললেন।'

'মানে, বানিয়ে বললাম?'

'বানিয়ে ঠিক না হোক, বাড়িয়ে বললেন।'

'সে কী, তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে না?' মুহূর্তে তপ্ত হয়ে উঠল সুকান্ত। সহকর্মীর নৈর্ব্যক্তিক সীমা সহসা অতিক্রম করে ফেলল।

'কী করে হয়, বলুন। ঐ যে সুন্দর করে বললেন কথাটা ঐটেই সত্যি কথা।' হাসতে শুরু করে শেষে গম্ভীর হল কাকলি।

'বা, আমি আবার কী বললুম!'

'ঐ যে বললেন, শুধু মেলামেশাতেই কি ভালোবাসা হয়? আর ভালোবাসা যদি না জাগে কিসের বিয়ে কিসের বাজনা! গায়ের জোরে চাষই করা যায়, বৃষ্টি ঝরানো যায় না। আর বর্ষণ না হলে সব নিষ্ফল।'

চাকর অনেকক্ষণ গেছে ট্যাক্সি আনতে, কিন্তু ফেরবার নাম নেই।

সুকান্ত দুশ্চিন্তায় ফেলল। বললে, 'বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। তারপর কোন রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে, ট্যাক্সি পেলেও আসে কিনা ঠিক কী। ট্রাম অচল, বাস দুরারোহ।'

'তা হলে কী হবে?' ভয়-পাওয়া পাখির মত তাকাল কাকলি।

'রিকশা করে যেতে হবে।'

'আমি একা-একা কী করে যাব রিকশাতে! কতটা পথ তার খেয়াল আছে?'

'কী করে থাকবে! তা ছাড়া দুই কলিগ এক রিকশা চড়েছে এমন কোনো প্রিসিডেন্ট নেই। বিশেষত দু-জনের মধ্যে একজন যখন অনাত্মীয় মহিলা।'

'বিপদে নিয়ম নেই।' করুণ করে বললে কাকলি।

'কিন্তু স্ত্রীলোকে সব সময়েই নিয়ম। স্ত্রীলোক মহাবিপদ।'

'তা হলে পায়ে হেঁটে চলুন।' ব্যস্ত হয়ে উঠল কাকলি: 'ছাতা-ফাতা যোগাড় করুন হোটেল থেকে।'

'তা করছি। কিন্তু আমি যাব কেন?'

'বা, আমাকে একা ছেড়ে দেবেন? একজন আফিস-কলিগের নিরাপত্তা দেখবেন না?'

'যখন বলছেন, বেশ, ততটুকু না হয় দেখব।'

'হ্যাঁ, বলুন, আমার কী অপরাধ! আপনার কাছে রিটার্ন-ভিজিট দিতে এসেই

তো আমার এই দশা। আপনার তো উচিত আমাকে এই পরিবেশে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

'কোডে যদি থাকে তবে দেব পৌঁছে। কী, মাথায় ছাতা ধরে?' হাসল সুকান্ত।

আরো হাসল যখন দেখলে এত সব ভয়জল্পনাকে ধূলিসাৎ করে চাকর ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হয়েছে।

এগিয়ে দিতে নামল সুকান্ত। দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই শিষ্টাচার।

কিন্তু ড্রাইভারের চেহারা দেখে পাংশু হয়ে গেল কাকলি। একা ড্রাইভার নয়, তার পাশে বসা সঙ্গী। দুইই দুর্ধর্ষ।

'আপনিও চলুন।' আকুল অস্ফুটে মিনতি করল কাকলি।

কোড-ফোড আর দেখতে চাইল না সুকান্ত: 'চলুন'।

ম্যানেজারকে বললে, 'ঘর খালি রইল। দেখবেন।'

ওদিকে গাড়ি ফিরে আসবার আগেই বরেন সব টের পেয়েছে, বুঝে নিয়েছে। যত রাগ গিয়ে পড়ছিল ড্রাইভারের উপর। কিন্তু ড্রাইভার ফিরে এলে তাকে আর বকল না। তম্বি করল না। ড্রাইভারের চেয়ে সে যে বেশি বোকা তর্ক উঠলে সে কথাটাই তো স্পষ্টীকৃত হবে।

বরেনের উচিত ছিল বাথরুমের বাইরের দরজাটা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা। আর ভিতরের দরজাটার ছিটকিনি উড়িয়ে দেওয়া। যেমন গারাজ হয় নি, এগুলোতেও তেমনি ত্রুটি থেকে গেছে। এতেই যজ্ঞ পণ্ড হত না নিশ্চয়।

চোর পালাবার পর বুদ্ধি বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু কতদূর পালাবে? কতবার?

ড্রাইভার ফিরে এসে যে গল্প বললে তা বরেন কোনো অংশে খণ্ডন করলে না। সব মেনে নিল। প্রতারিত হয়েছে এ প্রচারিত করে গৌরব কোথায়!

'আমি এখন অনেক ভালো আছি। ডাক্তার লাগবে না। চলো, বাড়ি চলো।' বরেন উঠল গাড়িতে।

রাস্তায় নেমে খানিক ঘোরাঘুরির শেষে নির্দেশ দিলে কাকলিদের বাড়ি যেতে।

'খুকি কোথায়? কাকলি?' বরেনকে একা নামতে দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

'সে কি! এখনো ফেরে নি বাড়ি?' বলে বরেন ছোট্ট একটি কাহিনী ফাঁদল। দু-জনে একসঙ্গে ফিরছিল—সে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে—কাকলি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। বললে, আফিসের কোন এক বন্ধুর বাড়ি যাবে, কী এক জরুরি

দরকার আছে। আরো বললে, বরেন যেন প্রতীক্ষা না করে, সে একাই ফিরতে পারবে। দায়িত্বজ্ঞান আছে বলে বরেন খোঁজ নিতে এসেছে সে ঠিকমত ফিরল কিনা।

'তুমি সে বন্ধুর বাড়িটা চেনো ?' গায়ত্রী অধীর হয়ে উঠল।

'দরকার হলে বার করা যাবে নিশ্চয়ই। কে জানে সেখান হতে হয়তো আর কোথাও গেছে। ভাববেন না, এসে পড়বে এক্ষুনি।' আশ্বস্ত করল বরেন।

কী বিচিত্র রাত, ট্যাক্সিতে কতদূর আসতেই দেখা গেল, আর বৃষ্টি নেই, শুকনো খটখট করছে পথঘাট।

'বাঃ,' উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল কাকলি : 'বৃষ্টির পথে খানিকটা এগিয়ে আসবার পরেই আবার শুকনো।'

'আবার কে জানে শুকনো পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই আবার জল।' হাসল সুকান্ত।

'তেমন দু-জন একসঙ্গে থাকলে ঘোর বর্ষাই খরা।' কাকলি বললে।

'আবার ঘোর খরাই বর্ষা।' বললে সুকান্ত, 'কিন্তু এ কি ঠিক কলিগের মত কথা হচ্ছে ?'

'হচ্ছে না বুঝি ? না যদি হয় তা হলে চুপ করে থাকুন।'

চুপ করল দু-জনে।

'তেমন দু-জন হলে স্তব্ধতাও কথা।' সুকান্ত টিপ্পনী ঝাড়ল।

'আবার কথাও স্তব্ধতা।' সায় দিল কাকলি।

'সুতরাং কথা বলুন।'

'সুতরাং চুপ করে থাকুন।'

'ও একই কথা।' একসঙ্গে বলে উঠল দু-জনে।

বাড়ির কাছাকাছি ট্যাক্সিটা আসতেই কাকলি বললে, 'তুমিও চলো।'

'হ্যাঁ, যাব বৈকি। তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।'

'কি, অভিভাবকের মত ?'

'না। আফিস-কলিগের মত।'

ট্যাক্সি-ভাড়াটা সুকান্তই দিল। এটা কি আফিস-কলিগের মত হল ? তাকাল কাকলি। একরকম একটা হল। হাসল সুকান্ত।

বরেন আর গায়ত্রী একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে কাকলি এ কার সঙ্গে নামল ? কে তাকে দিয়ে গেল বাড়িতে ?

'এই আমার মা।' আফিস-কলিগ্‌কে যেমন আলাপ করিয়ে দেয় তেমনি ভঙ্গিতে বললে কাকলি।

কোডে নমস্কারের কথাই বলেছে, সুকান্ত একেবারে পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করতে গেল।

কী সর্বনাশ! আঁতকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল গায়ত্রী।

'আর ইনি বরেন্দ্রবাবু—'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কেটে পড়ল বরেন। এমন ভাব যেন সে থানায় গেল পুলিশে খবর দিতে।

'আর উপরে বাবা আছেন—'

'হ্যাঁ, আছি, আছি,। মরি নি এখনো।' উপর থেকে বনবিহারী আনন্দধ্বনি করে উঠলেন: 'দেখবার জন্যে বেঁচে আছি। আমার বাড়ি, আমি বলছি, উঠে এসো উপরে।'

'আরেক দিন আসব। সবার সঙ্গে আলাপ করে যাব। আজ অনেক রাত হয়েছে। আজ চলি।'

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছে। পায়ে হেঁটেই ফিরে চলল সুকান্ত।

·৫৩

কাকলির পিছু-পিছু গায়ত্রী প্রায় ছুটতে-ছুটতে উপরে উঠে এল।

'এসবের মানে কী?' প্রায় চড়াও হল মেয়ের উপর।

কাকলি একেবারেই তর্কের ভঙ্গি নিল না। শরৎকালের সরল প্রভাতের মত হেসে ফেলল। বললে, 'মানে আমিই কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।'

কিন্তু না বুঝিয়ে ছাড়বে না গায়ত্রী। বললে, 'ওটাকে আবার কোত্থেকে জোটালি?'

'কোনটাকে?' কাকলি খিলখিল করে হেসে উঠল।

'ঐ কান্তটাকে।' রাগে তোতলাতে লাগল গায়ত্রী।

'যদি শুধু কান্ত বলো, মানেটা অন্যরকম দাঁড়ায়।' পরম শান্তির স্বরে কথা

বলছে কাকলি, 'তা হলে আর জোটানোর প্রশ্ন ওঠে না। কেননা যে কান্ত, যে স্বামী, সে আগে থেকেই জুটে রয়েছে। তবে যদি সুকান্তকে মীন করো—'

'হ্যাঁ, ঐ সুকান্ত, ঐ জুতোকান্তকেই মীন করছি।'

বুকের মধ্যে ঘা খেল কাললি। মুখের হাসিটুকু উড়ে গেল এক ফুঁয়ে। কোনো কথা কইল না।

কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয় গায়ত্রী। বললে, 'ঐ সুকান্তকে জোটালি কোত্থেকে?'

'সেই তো আশ্চর্য।' কাকলি কথা বলল।

'ওর বাড়ি গিয়েছিলি?' কথা তো নয়, যেন চাবুক মারছে গায়ত্রী।

'ও তো বাড়িতে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'হোটেলে থাকে।'

'হোটেলে? হোটেলে থাকে? সেই হোটেলে গিয়েছিলি তুই?'

'বা, হোটেলে যেতে বাধা কী! সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান। কত লোকে যাচ্ছে।'

'হোটেলে যেতে ওর সঙ্গে দেখা হল, না, ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই গিয়েছিলি হোটেলে?' ঝানু উকিলের মত জেরা করছে গায়ত্রী।

'হোটেলে যেতেই কি অমনি-অমনি কারু সঙ্গে দেখা হয়?' মৃদু মৃদু হাসল কাকলি: 'কারু সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই যায় হোটেলে।'

'ওর সঙ্গে তোর দেখা করতে যাবার ঠেকা কী?'

'না, ঠেকা কী! একটা শিষ্টাচার!'

'শিষ্টাচার?

'মানে অফিসিয়্যাল এটিকেট। ও তো আমার সহকর্মী, আমরা এক আফিসে কাজ করি। তারই জন্যে—'

'তারই জন্যে কী?' গায়ত্রী আবার হুমকে উঠল।

'তার জন্যেই ও সেদিন এসেছিল এ বাড়ি। সেই যে সেদিন, মনে নেই?' কাকলি মনে করিয়ে দিতে চাইল।

'কিন্তু, কেন, কেন আসে?'

'সেও বোধ হয় শিষ্টাচার।' বেশেবাসে কাকলি এতক্ষণে অনেক আটপৌরে হয়ে গিয়েছে, এখন সাবান-তোয়ালের দিকে হাত বাড়াল।

'আফিসের শিষ্টাচার তো বাড়িতে কেন?'

'সে কথার উত্তর আমি দিই কী করে?' তাকের থেকে সোপকেসটা কুড়িয়ে নিল কাকলি : 'সে কথার উত্তর সুকান্ত দিতে পারে।'

'সুকান্ত দিতে পারে?' মেয়ের মুখে সুকান্ত নামটাই যেন গায়ত্রীর অসহ্য লাগছে।

'হয়তো ওও পারবে না। কেউই দিতে পারে না সে উত্তর।' ব্যস্ত হতে চাইল কাকলি।

'কিন্তু সেদিন তুই তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি বাড়ি থেকে?'

'সেটা যে সত্যি তাকে নয় সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।' কাকলি বাথরুমের দিকে ধাওয়া করল।

'তার মানে বরেনের সঙ্গে তোর বিয়েটা হবে না?' গায়ত্রী বাধা দিতে চাইল।

নিজের থেকেই থামল কাকলি : 'বা, তার মানে কি তাই দাঁড়ায়? এর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক নেই তো বরেনকে অমনি একা-একা চলে যেতে দিলি কেন?'

'কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে আমি ঠেকাই কী করে?'

'ঐ আগন্তুকটার সঙ্গে অহেতুক তোকে দেখলে না গিয়ে সে করে কী?'

'বা আমি আমার আফিসের সহকর্মীর সঙ্গে সামান্য মিশতে পারব না?' পিছনে তাকাল কাকলি : 'আমার সঙ্গে আমার কোনো সহকর্মীকে একত্র দেখলেই উনি চটে যাবেন এ তো ভীষণ কথা। এ তো তা হলে সূত্রপাতেই বজ্রপাত।'

'তার মানে তুই ঐ সুকান্তর কাছেই ফিরে যাবি? যে তোর অত বড় শত্রু, যে তোকে অত বড় অপমান করল—'

'বা, একজনের ভিজিট ফিরিয়ে দেবার মানে সেই ভিজিটারের কাছে ফিরে যাওয়া?' নিজেই একটু ফিরল কাকলি : 'এত সোজা? এত সস্তা?'

তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কাকলি। উঃ, চারদিকে কী অগাধ, অবাধ নিশ্চিন্ততা! উন্মুক্ত শান্তি! সর্বাঙ্গে জল ঢালতে লাগল অঝোরে। জয়ের জল, মুক্তির জল, শক্তির জল। শুধু ক্লান্তি প্রক্ষালন করছে না, দেহকে স্বস্থ করছে, তপ্ত করছে, আকাঙ্ক্ষায় আনছে নির্মল তীক্ষ্ণতা। যে জল অতলের দিকে টানে, ঢেলে দিয়ে সঁপে দিয়ে আপনাকে ফুরিয়ে দিয়ে যার সুখ, এ যেন সেই জল, সেই প্রবল প্রাণের প্রতিনিধি।

অগত্যা গায়ত্রী নবিহারীর কাছে গেল।

'ব্যাপারটা যে ঘোরালো হয়ে উঠল—' মুখ চোখ গলা একসঙ্গে ভার করে বললে ায়ত্রী।

এতটুকু চঞ্চল হলেন না বনবিহারী। যেমনি শুয়ে ছিলেন তেমনি শুয়ে রইলেন। ধু শুধোলেন, 'কী হল?'

'বরেন চলে গেল।'

'কেন?'

'কী অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়।' বিছানার পাশে বসল গায়ত্রী: 'কাকলি আবার সই পশুটাকে জুটিয়ে এনেছে।'

পশু? পশু আবার কে?

'ঐ যে—কী না জানি নাম—সুকান্ত। সুকান্ত-পশু।'

'বলো কী? এনেছে, না, এসেছে?' একটা ঝড়ে-পড়া গাছ যেন তার আপন হিমায়, তার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখায় উঠে বসল: 'এমন গোলমেলে হয়ে যায় জিনিসটা –আনা না আসা ঠিক বোঝা যায় না। তুমিই ডেকে আনলে, না আমিই এলাম থেকে—এ দুটোকে আর আলাদা করা যায় না। কিন্তু সুকান্তকে তুমি পশু লছ কোন হিসেবে? ও তো সুকান্ত-পশু নয়, ও তো সুকান্ত বসু।'

'ওটাকে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল কাকলি—' ঘৃণায় বললে গায়ত্রী।

'তাড়িয়ে দিয়েছিল তো আবার ধরল কেন? তার মানেই তো যায় না তাড়িয়ে ওয়া। জীবনে একটা কিছু আছে যার জড় ফেলা যায় না উপড়ে।'

'ছি ছি, কী লজ্জা, কী ঘেন্না—

'কে কাকে তাড়ায়! সুকান্ত তাড়াল কাকলিকে, কাকলি তাড়াল সুকান্তকে। ন্তু কেউ ওরা ভালোবাসাকে তাড়াতে পারল? শত কাটা-ছেঁড়া করেও পারল মূল লে ফেলতে? পারল না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পারল না।'

'তার মানে তুমি চাও কাকলি আবার ঐ অপদার্থের সঙ্গে গিয়ে মিলবে?'

হাসলেন বনবিহারী: 'আমার চাওয়ায় কী হবে? কথা হচ্ছে কাকলি চায় কিনা। কাকলি চায় তা হলে আর অপদার্থতা কোথায়? তাহলে কাকলির চাওয়ার লোহাও সোনা, চিরন্তন সোনা।'

'এ অসম্ভব।' দৃঢ় হল গায়ত্রী: 'যে কোর্টে গিয়ে স্ত্রীর নামে জঘন্য বদনাম দিয়ে য়ে বিচ্ছেদ করে নেয় তাকে সেই স্ত্রী, যদি তার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে, ফের মালা দেয় না, না, ককখনো না—'

'কিন্তু যদি ভালোবাসা না মরে, যদি ভালোবাসা থেকে যায়, তা হলে কিসের

বদনাম, কিসের বিচ্ছেদ ? অপমানের জ্বালা খেসারতে পূরণ হয় না, পূরণ হয় ভালো-বাসায়। রক্ত কি জলে যায় ? যায় না। যন্ত্রণা লেগে থাকে। যন্ত্রণাও ভালোবাসাই ধুয়ে নেয়। আমিও একদিন বিমুখ ছিলুম ওদের উপর, যখন ওদের বিয়ে হয় নি—' বনবিহারী আবার বিছানায় ঢলে পড়লেন : কিন্তু শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ওদের ভালোবাসা যখন বিয়েতে বিকশিত হল তখন মনে মনে সংবর্ধনা করেছি ওদের,—আর প্রার্থনা করেছি, যত দুঃখ পাক, ওদের সংযোগ যেন স্থায়ী হয়, ওদের সংসার যেন সুখের হয়—'

'কই আর হল !' বললে গায়ত্রী, 'বিচ্ছেদ করাতে আদালত বসাল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু শেষ পরিচ্ছেদ এখনো বাকি। বোঝো সেই শক্তি যে আইন মানে না, দেশকাল মানে না, রাজসম্পদকে তুচ্ছ করে। সব চেয়ে বড় কথা, বিচ্ছিন্নকে যুক্ত করে দেয়।'

'তুমি যাই বলো, উঠে পড়ল গায়ত্রী : 'যে বিয়ে একবার ভাঙা হয়েছে তা আর জোড়া যাবে না।'

'ভাঙাকে কে জুড়তে চাচ্ছে ? এ পুরোনোকে নতুন করে চেনা, নতুন করে পাওয়া। যেমন শেষ অঙ্কে দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে। নতুন চোখে নতুন মুখ-চন্দ্রিকা।'

'ও একই কথা। এ আমি ঘটতে দেব না। কিছুতেই না।'

'ঘটতে দেবে না—কী করবে ?'

'সুকান্তকে ঠেকাব। আর যে করে পারি কাকলির নিজের হাতের সই-করা বিয়ের নোটিশের মান রাখব।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাও রক্তের দস্তখতের চেয়ে কালির দস্তখতের দাম বেশি হবে ?'

'নিশ্চয় বেশি হবে। ওদের রক্ত কতক্ষণ ? দু দিন পরে আবার যে কান্না সেই কান্না। সেই ঝগড়া, সেই মারামারি, সেই সন্দেহপনা।'

'আর বরেনের বেলায় তার আশঙ্কা নেই ?'

'না, নেই। বরেন ঢের বেশি সম্ভ্রান্ত।'

'আর তুমি—তুমি সম্যক ভ্রান্ত !'

'দেখা যাক কে হারে কে জেতে—' রাগ ফলিয়ে চলে গেল গায়ত্রী।

'সবটাই গায়ের জোর ?' নিজের মনে বলে উঠলেন বনবিহারী : 'গায়ের জোরের উপরে প্রাণের জোর কি জয়ী হবে না ?'

কাকলিকে ডেকে পাঠালেন। একটু যদি গোপনে পরামর্শ করা যেত তার সঙ্গে।
খবর এল, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি।

আহা, ঘুমুক। বিশ্রাম করুক। কত ক্লান্ত না জানি, মগ্ন হোক, স্নিগ্ধ হোক।

ঘুমুচ্ছে তো কত, চোখ বুজে ইচ্ছে করে একটা আগুনের ছবি আঁকছে কাকলি। স্বপ্ন দেখছে। অন্ধকার কোথায় যেন আগুন লেগেছে, লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। াগুন নয়, হয়তো বা সমুদ্রে স্নান করে সূর্য উঠছে। কিংবা কে জানে রুক্ষ প্রান্তরে ঠাৎ কোথাও বা গুচ্ছ-গুচ্ছ পলাশের সমারোহ। টকটকে লাল। আরো অনেক-

একাগ্র চোখে মনোযোগ করে দেখতে লাগল কাকলি। না, আগুন নয়, সূর্য নয়, ষ্পস্তবক নয়, কী লজ্জা, সুকান্তের সামারকুল গেঞ্জিটা তার প্রথম সিঁথির সিঁদুরে খামাখি হয়ে গেছে।

আর, কী তোমার কীর্তি, জনে জনে সবাইকে বলে দেব, এই অভিযোগের সঙ্গে, াহা, কি তুমি সুন্দর, আনন্দময়, এ কথা কি বলা যার আর কাউকে, এই আশীর্বাদ-রা দুটি মদির-লাজুক চোখ সর্বক্ষণ অন্ধকারে জ্বলতে দেখছে সুকান্ত।

ঘুম ভাঙবার পর সুকান্তের মনে হল এমন রাতও ঘুমে ফুরিয়ে দিতে হয়!

আর কাকলির মনে হল, ছি ছি, কত বেলা হয়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে াবার আফিসে বেরুতে হবে। হ্যাঁ, বেরুতে হবে আফিসে। আফিসে না বেরুলে ার সঙ্গে আবার একটু দেখা হবার সম্ভাবনা কোথায়, ওজুহাত কোথায়?

সকাল হতে বনবিহারী কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছেন, কিছুতেই কাছে পাচ্ছেন া কাকলিকে। সব সময়ে গায়ত্রী তাঁকে ঘিরে রয়েছে, আড়াল করে। আর ন গায়ত্রী কাছে নেই, তখন কাকলিকেও ধারে-পারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর এমনি কাউকে দিয়ে ডাকাতে গেলে এমন হৈচৈ তুলছে যে গায়ত্রী নিজেই লে আসছে তামিল করতে। আর মেয়েরও এমন একটা ভাব নেই যে বাবার াছে গিয়ে নিরিবিলি একটু বসি, বন্ধুর মত নিভৃতে দুটো কথা কই। কেবল স আর আফিস, কেবল ছুটিহীন ছোটাছুটি।

না, একটা জরুরি কথা তাকে বলতে হয় গোপনে। আজই, এখুনি। দেরি গেলে বিপদ হতে পারে।

ছটফট করতে লাগলেন বনবিহারী।

খেয়েদেয়ে উপরে উঠেছে কাকলি, আফিসের সাজ ধরবে এবার, বারান্দাতে , বনবিহারীর সঙ্গে তার ছোট্ট চোখোচোখি হল। বনবিহারী ছোট্ট হাতছানি তাকে ডাকলেন।

দ্রুত চলে এল কাকলি।

'তোর মা কোথায়?'

'নিচে।'

'শোন, কাছে আয়। তোকে আমার ছোট্ট একটি উপদেশ আছে।' বনবিহারী কাকলিকে আরো একটু কাছে টেনে নিলেন: 'তুই তো আবার উপদেশ শুনিস না।'

'বা, সে কী কথা? কে বললে শুনি না?'

'হ্যাঁ, উপদেশ না বলে বলতে পারি পরামর্শ। এক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোকেরপরামর্শ।

'বা, বলো না—'

'শোন, আফিসে একা-একা যাবি না, কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি। আর ফেরবার সময়—'

'আফিসে তো আমি বাসে-ট্র্যামে যাই। বাসে-ট্র্যামে তো গাদা-গাদা লোক।'

'কিন্তু স্টপ পর্যন্ত যেতে কিংবা স্টপ থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসতে বেশ খানিকটা হাঁটা পথ। একা-একা হাঁটবি নে রাস্তায়।'

'কেন, কী হবে?'

'কিছু হবে না। তবু, আমার অনুরোধ, একটা লোক সঙ্গে রাখবি। বললে আফিস থেকে পাবি না একজন আর্দালি?'

'কেন, লোক দিয়ে কী হবে? আমাকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে?' কাকলি রুখে দাঁড়াল: 'আমি কি ছেলেমানুষ?'

'ঐ নাও। মেয়ের আবার তক্ষুনি লেগে গেল। আমি বলছি, সাবধান থাকা ভালো। কটাক্ষগর্ভ চোখে তাকালেন বনবিহারী: 'সাবধানের মার নেই।'

'না, আমি খুব সাবধান আছি।' কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল কাকলি।

আফিসের সাজগোজ সেরে নিচে নামছে কাকলি, একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একা ট্যাক্সি চড়াও হয়তো ঠিক হবে না। কে জানে কার তাঁবেদার হয়তো ট্যাক্সিওয়ালা। কিন্তু ট্যাক্সিটা কি খালি আছে? আফিস-টাইমে খালি ট্যাক্সি পাওয়া হাতে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও বড় সান্ত্বনা। কিন্তু না, লোক আছে। কে যেন নামছে ট্যাক্সি থেকে।

'এ কি, আপনি?' বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে কাকলি বললে।

আফিসের পোশাকে, আনন্দে, ঝলমল করতে লাগল সুকান্ত। বললে, 'উঃ, কী ভাগ্যি, ধরতে পেরেছি আপনাকে। আমি ভাবছিলাম বেরিয়ে গেছেন বুঝি। না, পেরেছি ধরতে। চলুন, যাবেন না আফিসে?'

'বা, যাব বৈকি ! যাব বলেই তো তৈরি হয়ে বেরুচ্ছিলাম—'

'হ্যাঁ, আমি যখন যাচ্ছি, ভাবলাম আপনাকেও নিয়ে যাই। একই যখন পথ, আর একই যখন গন্তব্য। ভাবলাম আপনার আর একা-একা যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'দাঁড়ান, বলে আসি।' কী করবে কী বলবে যেন দিশে পাচ্ছে না কাকলি।

'কাকে আবার বলবেন ? সুকান্ত থ হয়ে রইল।

'বাবাকে বলে আসি। দাঁড়ান। প্লিজ। এক মিনিট।' উর্ধ্বশ্বাসে উপরে ছুট দিল কাকলি।

বনবিহারীর কাছে গিয়ে বললে হাঁপাতে-হাঁপাতে, 'উনি নিজেই একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন—'

'উনি—কে উনি ?' ব্যাকুল চোখ মেলে তাকালেন বনবিহারী।

আফিসের আর্দালি—কাকলির ইচ্ছে হল তাই বলে আনন্দে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কিন্তু না, নামটা ঘোষণা করতেই বোধ হয় বেশি সুখ পাবে এই মুহূর্তে। তাই দ্রুত, দীপ্ত স্বরে বললে, 'সুকান্ত—সুকান্তবাবু। উনি আর আমি এক আফিসেই কাজ করি কিনা—'

'বা, সুকান্ত এসেছে ? নিজে থেকে নিয়ে যেতে এসেছে ? তা হলে আর ভাবনা কী। তা হলে আর ভয় কিসের ?' লাঠিতে ভয় দিয়ে বনবিহারী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন : 'আমি একটু দেখি দৃশ্যটা। যদিও মনে মনে আমার জানা, তবু একবার দেখি চোখ মেলে। পৃথিবীর কত দৃশ্য দেখি নি, দেখব না, শুধু এটা দেখি—'

কখন আবার ত্বরিত পায়ে নির্ঝরের মত নেমে গিয়েছে কাকলি, আর গোলমাল শুনে যদিও গায়ত্রী বেরিয়ে এসেছে, তাকে ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বুঝতে না ই, ট্যাক্সিতে সুকান্তের পাশে উঠে বসেছে। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে স্টার্ট-াওয়া গাড়ির ভরপুর আনন্দে বলে উঠেছে, 'চলুন।'

গাড়িটা কতদূর যেতেই সুকান্ত বললে, আজ আফিস না গেলে কেমন হয় ?'

'খুব ভালো হয়। এই গাড়িতে করে একটানা—' দিব্যি সায় দিল কাকলি।

'পাগল !' কাকলির চোখের উপর চোখ ফেলল সুকান্ত : 'আফিস কামাই করলে কি চলে ?'

'সর্বনাশ।' হেসে উঠে সায় দিল কাকলি : 'সবার উপরে আফিস সত্য তাহার উপরে নাই।'

৫৪

প্রায় দুটো, কাকলির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

সামান্য চা-টোস্টে নিরীহ টিফিন করছে কাকলি, তাতে পর্যন্ত বিঘ্ন। বাজুক গে. তুলবে না রিসিভার।

বাঁ হাতে আধখাওয়া টোস্ট, ডান হাতে ডাঁটিধরা চায়ের পেয়ালা—টেবিলের উপর মেলে-ধরা পত্রিকাটার পৃষ্ঠায় চুপচাপ চোখ রেখে বসে রইল কাকলি।

বাজুক কত বাজতে পারে। একসময় নিজেই ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেবে। অনুম করে নেবে ঘরে কাকলি নেই। অন্যত্র গিয়েছে।

হয়তো বাজে ডাক কিন্তু টেলিফোনটা বেজে-কেঁদে এমন একটা ভাব দেখাবে যেন কত জরুরি। যেন কান পেতে কথাটা না শুনে নিলে রাজ্য ভেসে যাবে। একটা জ্যান্ত লোক সশরীরে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করলে কেউ গ্রাহ্য করে না, কিন্ত ফোন বেজেছে কী, তক্ষুনি তার তাঁবেদারি করতে ছোটো। রেহাই দেবে না, প্রাণ ঝালাপালা করে ছাড়বে। দশ দিক থেকে দশটা লোককে ছুটিয়ে আনবে হ মত। এতটুকু ভদ্রতা নেই, নীরবে এতটুকু প্রতীক্ষা করবার শালীনতা জানে না

টেলিফোনটা একেকসময় বেআব্রু যন্ত্রণা।

বাজুক যত খুশি। কান দেবে না।

সাধ্য কী উদাসীন থাকো। দরজার পাশে চাপরাসি মোতায়েন, সে উঠে এল, মেমসাহেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? নাকি অন্যভাবে ব্যস্ত?

রিসিভারটা তুলে নিল কাকলি।

'হ্যালো।'

'আমি কি মিস মিত্রর সঙ্গে কথা বলছি?' ওপার থেকে প্রশ্ন এল।

'হ্যাঁ। মিস মিত্র। বলুন।'

'সেই ফতেচাঁদ নাথমলের ফাইলটা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ছিল।'

'কার ফাইল?'

নামটা ওপার থেকে পুনরুক্ত হল।

'কী বললেন ? লালচাঁদ জেঠমল ? বেশ তো, আপনার যা বক্তব্য, নোট দিয়ে দিন না।' বললে কাকলি।

'শুধু নোট দিলে হবে না। একটু ডিসকাশন দরকার।'

'যদি ডিসকাশন দরকার বোঝেন ফাইলটা নিয়ে চলে আসুন।'

'এখুনি যাব, না অন্য সময় ?'

'বিষয়টা যখন জরুরি তখন এখুনি বৈকি।' কাকলি একবার অবশিষ্ট চায়ের পরিমাণ ও টোস্টের আয়তন দেখে নিল : 'যদি অসুবিধে না হয় এই মুহূর্তে।' টোস্টের বাকি টুকরোটা মুখে পুরে বাকি চাটুকু এক ঢোঁকে শেষ করে ছিমছাম হয়ে বসল কাকলি।

চারদিকের দেয়ালগুলোকে ঠিক শোনানো হয়েছে। ঠিক শোনানো হয়েছে আর্দালি চাপরাসিকে। আর যদি কারু আড়ি পাতা অভ্যেস থাকে সেও শুনে রাখো।

ফাইল হাতে সুকান্ত কাকলির ঘরে ঢুকল। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল চাপরাসি।

মুখোমুখি চেয়ারে বসল সুকান্ত। একরাশ গাম্ভীর্য দিয়ে মুখের মৃদু হাসিটি চাপা দিল কাকলি।

'আপনার টিফিন হয়ে গিয়েছে ?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'হ্যাঁ। আপনার ?' কাকলি চোখ তুলল।

'না। এবার যাব ক্যান্টিনে।'

'কেন, আপনার হোটেল থেকে আনিয়ে নিলেই তো পারেন।'

'হরে দরে সেই একই কথা। যা হোটেল তাই ক্যান্টিন। যা মেকি তাই ভেজাল।'

'হ্যাঁ, যখন বাড়ি হবে, তখনই আসবে বাড়ি থেকে।'

'আর, তখন, যদি আপত্তি না করেন, ঐ সঙ্গে আপনারটাও আসবে।'

হাসি উঁকি দিতে চাচ্ছিল, আবার তা ঢেকে দিল কাকলি। বললে, 'ডিসকাশন তো হল, ফাইলটা রেখে যান।'

উঠতে চেয়েও উঠল না সুকান্ত। বললে, 'কিন্তু দেখবেন মেন পয়েণ্টটা যেন মিস করবেন না।'

'হ্যাঁ দেখছি। কী বলুন তো পয়েণ্টটা ?'

হঠাৎ গলা নামাল সুকান্ত। প্রায় ধূসর বর্ণের করে তুলল। বললে 'ছুটির পর দু-জনে একত্র ফিরব।'

কাকলি কথা না বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিল।

উঠে চলে যাচ্ছিল সুকান্ত। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরল। বললে, 'হ্যাঁ, আরো একটা পয়েন্ট আছে। মাইনর মনে হতে পারে কিন্তু অল দি সেম—'

'কী বলুন ?'

টেবিলের প্রতিকূলে না দাঁড়িয়ে একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল সুকান্ত। অস্ফুটে বললে, 'এই আপনাকে আপনি করে বলতে খুব মিষ্টি লাগছে।'

মধুতে মুখ-চোখ ভরে গেল কাকলির। পরিহাসের দীপ্তিটুকু বাঁচিয়ে রেখে বললে, 'বেশি আপনার হলে অমনি করেই বোধ হয় বলতে হয়। তেমনি বোধ হয় নিয়ম বাঙলা ভাষার।' বলেই বদ্ধ ঠোঁটের উপর কাকলি তর্জনী রাখল। যেন শব্দ করে না হেসে ওঠে সুকান্ত।

আফিস ছুটির পর দু-জনে, সুকান্ত আর কাকলি, একত্র হল। গাড়িঘোড়া দূর স্থান, দু-জনে চলল পদব্রজে।

'জগজ্জন আমাদের দেখছে।' চলতে-চলতে বললে কাকলি।

'তার চেয়ে বড় কথা, আমরা আমাদের দেখছি।' সুকান্ত দূরে ছিটকে পড়লেও ভিড়ের ব্যবহারে আবার কাছে সরে এল।

'দেখছি আমাদের অফুরন্ততা। আমাদের অনেক স্থান, অনেক আশা, অনেক ভবিষ্যৎ। দেখছি বিচ্ছেদের শেষ আছে কিন্তু মিলনের শেষ নেই।'

'আর ভালোবাসার ?' ডালহৌসি স্কোয়ারের মত জায়গায় এ প্রশ্ন চলে কিনা ভেবেও দেখল না কাকলি।

'প্রহরের শেষ আছে কিন্তু মধুরের শেষ কই। শুনুন—'

'শুনছি।'

'আমার হোটেলে আপনার বন্ধু বিনতার যেদিন নেমন্তন্ন, আমার ইচ্ছে সেদিন আপনিও থাকেন সেই আসরে।'

'মানে সেদিন আমারও নেমন্তন্ন ?' খুশিতে উছলে উঠল কাকলি : 'সে নেমন্তন্ন তো রাতে।'

'আমার ইচ্ছে আপনি সেদিন সন্ধে থেকেই আমার হোটেলে থাকেন।'

'সন্ধে থেকেই ?'

'মানে, বিনতার পৌঁছুবার আগে থেকেই। ধরুন', কাকলিকে একটা জায়গায় দাঁড় করাল সুকান্ত : 'ধরুন, বিনতাকে সময় দেওয়া হল আটটা, আর আপনি এক ঘণ্টা আগে থেকে, সাতটা থেকেই, উপস্থিত।'

'কেন, আমিও তো আগন্তুক, বাইরের লোক, আমিও আটটার সময়ই আসব।' বললে কাকলি।

'না, না, সেদিন আপনার অনেক কাজ, আপনি আগে না এলে চলবে না।' সুকান্তের স্বরে মিনতি ঝরতে লাগল: 'আপনি এসে ঘরদোর সাফসুতরো করবেন, খাবার টেবিলটা একটু সাজাবেন-গুছোবেন, মানে ঘরের একটু কাজকর্ম করে দেবেন আর কি।'

'বুঝেছি।' মুচকে হাসল কাকলি।

'কী বুঝেছেন?'

'বুঝেছি, যাতে বিনতা এসে বুঝতে পারে আমিই আগে থেকে ঘর জুড়ে রয়েছি— তার ঢুঁ মারা বৃথা।'

'ঠিক বুঝেছেন।' উল্লসিত হয়ে উঠল সুকান্ত: 'আপনি কী বুদ্ধিমতী! বুদ্ধিমতী না হলে এত উন্নতি হয় আপনার?'

'কিন্তু, না, সেটা ঠিক হবে না।' আবার চলতে শুরু করল কাকলি।

'না, না, ঠিক হবে, সুন্দর হবে।' কখনো রাস্তায় কখনো ফুটপাথে নেমে-উঠে উঠে-নেমে পথ করতে লাগল সুকান্ত: 'আমাকে তা হলে আর বক্তৃতা করে বোঝাতে হয় না। ছোট্ট নীরব দৃশ্যটি থেকেই ও সব বুঝে নিতে পারে। যেমন সেদিন আপনাদের বাড়ির দরজায়, কিছু বলতে-কইতে হয় নি, কাঠখড় পোড়াতে হয় নি, চক্ষের নিমেষে বুঝে নিয়েছিল বরেন।'

'বরেনবাবুর কথা আলাদা।' নিজেই এবার দাঁড়াল কাকলি: 'বরেনবাবুর জন্যে সে দৃশ্য দৈব রচনা করেছিল। তার উপর কারু হাত নেই। আর বিনতার জন্যে এ দৃশ্য আমরা নিজেরা রচনা করতে যাচ্ছি। মানে ওকে ডেকে এনে আঘাত দিতে যাচ্ছি। এ রূঢ়তাটা ঠিক নয়। কী দরকার এই রূঢ়তার?'

'মানে, বোঝানোটা নির্বিবাদ করা যেত।'

'কী দরকার! আমি নিজেই গিয়ে বলব সব ওকে।'

'আপনিই বলবেন? কী বলবেন?'

'বলব,' একমুখ হাসল কাকলি: 'বলব যে রাম মরেও মরে না। ভালো-বাসাকে তাড়িয়ে দিলেও যায় না চলে। দরজার কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।'

হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে চলে এল মার্কেট।

ছেলেমানুষির হাওয়া লাগল দু-জনকে।

'জীবনে ভোগ্য কী জানেন?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'জানি।'

'কী ?'

'জীবনে ভোগ্য সহজ সুখ।'

'আপাতত কী ?'

'আপাতত ডালমুট কিনে খাওয়া।'

'ছাত্র হিসেবে আপনি বরাবরই ব্রিলিয়ান্ট। কী সুন্দর পারলেন বলুন তো।'

একই ঠোঙা থেকে তুলে-তুলে দিব্যি এগুতে লাগল দু-জনে। বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কাকলি, 'এ কি, ভুলে যাচ্ছেন কেন ? ওজন নিতে হবে না ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' পরিপূর্ণ প্রতিধ্বনি করল সুকান্ত : 'সেই সেবার বিয়ের আগে ওজন নিয়েছিলাম, এবার আবার বিয়ের আগে ওজন নিতে হয়।'

আর দরকার নেই। মাথায় আলোর টুপি-পরা গাড়ি পাওয়া গিয়েছে একটা। দু-জনে ছুটে গিয়ে উঠে বসল।

'সেবারে ওজন কমে গিয়েছিল।' বললে কাকলি।

'এবারে নির্ঘাত বেড়েছে।' সুকান্ত বললে।

ট্যাক্সিটা কাকলিদের বাড়ির কাছে এসেই থামল। নামবার আগে সুকান্ত বললে, 'তা হলে বিনতার নেমন্তন্নটা ক্যানসেলড হল ?'

'হ্যাঁ, ক্যানসেলড। ওর নেমন্তন্নটা এ বাড়িতে হবে। আমিই ওকে বলে বুঝিয়ে এখানে নেমন্তন্ন করে আসব।' তদ্গত হয়ে বললে কাকলি, 'ও কেন অসুখী হবে! আমি আমার নিজের জিনিসই ফিরে পাচ্ছি। এতে ওর ঈর্ষা করবার কিছু নেই। ও ভালো মেয়ে। ও ঠিক খুশি হবে দেখবেন। আসবে নেমন্তন্নে। ও আমাকে আবার সাজিয়ে দেবে।'

'দিক। মনে রাখবেন ওর নেমন্তন্নটাই ক্যানসেলড। আপনারটা নয়।' বললে সুকান্ত, 'তাই আপনি আসবেন—'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ কলিগ্ আছি যাব মাঝে-মাঝে।'

'আর যখন কলিগ্ থাকবেন না ? কিংবা কলিগ্ ছাড়া আরো কিছু হবেন ?'

'তখন আর যাব কী ! তখন থাকব।'

দু-জনে একসঙ্গে নামল আর নেমেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী। স্তব্ধ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মূর্তি। যেন ওদেরকে দেখবার জন্যেই রয়েছে দাঁড়িয়ে।

'বাবা জেগে আছেন ?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'না, ওঁর শরীর ভালো নেই এ বেলা। ওঁকে ডিস্টার্ব করাটা ঠিক হবে না।'

'আমি তা হলে আরেক সময় আসব।' ট্যাক্সি ছেড়ে দেয় নি, ওটা নিয়েই ফিরে গেল সুকান্ত।

কতক্ষণ পরে বনবিহারী কাকলির খোঁজ করলেন।

কাছেই বসে ছিল গায়ত্রী, বললে, 'এখনো ফেরে নি।'

'ফেরে নি? সে কী? রাত কত হল?'

ঘরে মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে, ঘড়ি দেখা যায় না। 'কে জানে কত!' গায়ত্রী বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠল: 'কোথায় কোথায় ঘুরছে!'

'আহা, ঘুরুক। কতদিন পরে বালিতে-পোঁতা পরশমণির টুকরোটা ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে, যা কিছু ছুঁচ্ছে সোনা করে দেখছে। আহা, তাই দেখুক, সমস্তই সোনা করে দেখুক।' নড়ে-চড়ে উঠলেন বনবিহারী: 'কিন্তু সুকান্ত 'একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না কেন? ওর বিয়ে, ওরই তো তোড়জোড় করার কথা। বাঁধন ও-ই ছিঁড়েছে, ও-ই তো উদ্যোগ করে এসে গ্রন্থি দেবে। বিয়ের পর কাকলিকে নিয়ে কোথায় উঠবে, ফ্ল্যাটে না বাড়িতে—সব আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে তো! শোনো, কালকেই নরনাথকে ডাকাও, দেবনাথকে পাঠাও ওর কাছে। নরু এসে না পড়লে কিছু হবে না।'

কাউকে পাঠিয়ে কাজ নেই, গায়ত্রী পরদিন নিজেই গেল নরনাথের কাছে। বললে, 'ঠাকুরপো উদ্ধার করো।'

'কেন, কী হল?' হাসতে হাসতে নরনাথ বললে, 'কোনো বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার হয় তো, বলুন, ঠিক ম্যানেজ করে দেব।'

'কাকলি সেই বিয়ের নোটিশ দিয়েছিল না—তুমি তো জানো—' ইন্দিরা এসে গিয়েছে, তাকে লক্ষ্য করল গায়ত্রী: 'সেই বরেনের সঙ্গে বিয়ে।'

'বা, জানি বৈকি।' ইন্দিরা গর্বের ভাব করল, 'আমি তো ছিলাম যখন নোটিশ সই করে দু-জনে। কেন, এখন কী হয়েছে?'

'কাকলি টালবাহানা শুরু করেছে। ঐ নোটিশে এক্ষুনি-এক্ষুনি বিয়ে করতে চাচ্ছে না।'

'কী বলছে?' নরনাথ গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল।

'বলছে, শরীর খারাপ, মন, অস্থির—হেন-তেন, যত সব ছেঁদো কথা।' গায়ত্রী গলা নামাল: 'আসল কারণ যা আন্দাজ করছি, ঐ লোকটা, আগের ঐ স্বামীটা ওর পিছু নিয়েছে। তাইতেই ওর মনটা নরম হতে চাইছে, সময় চাইছে, বলছে, ঐ নোটিশটা যাক, দরকার হয় আবার না-হয় নতুন দেব।'

'ছি ছি ছি, আবার ঐ সুকান্তটার সঙ্গে মিলবে ?' নরনাথ ধিক্কার দিয়ে উঠল : 'তা হলে তো আবার ঝগড়া, আবার কোর্ট, আবার ডিভোর্স। যে ঢু কাঠি একবার বাজে, বারে-বারেই বাজে। তা ছাড়া বরেনের কাছে সুকান্ত একটা পাত্র! কুমিরের কাছে টিকটিকি!'

'তা হলে তুমি একটা বিহিত করো।' গায়ত্রী উৎসাহে এগিয়ে এল।

'তা করে দিচ্ছি। নোটিশের আয়ু আর কতদিন ?'

'যতদূর শুনেছি দু-চার দিন আরো আছে।'

'বেশ, কাল শনিবার, কালকেই বিয়েটা লাগিয়ে দিতে হয়।'

'কালকেই ?'

'হ্যাঁ, দেরি করা চলবে না। একবার একটা নোটিশ ল্যাপ্‌স করে গেলে দ্বিতীয় নোটিশে বরেনকে পাওয়া যাবে এ মনে হয় না। তার বয়ে গেছে অপেক্ষা করতে।' নরনাথ পায়ের উপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসল চেয়ারে : 'যে নোটিশটা দেওয়া হয়েছে সেটা তো আসলে বরেনকেই আটকাবার ফাঁদ। ওটাকে কিছুতেই ফসকাতে দেওয়া নয়। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রং, হ্যাঁ, কাল, কালই বিয়েটা হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে!'

'কঠিনটা কী! ম্যারেজ আফিসে গিয়ে ফর্মটা সই করে দেওয়া। আর তিন জন সাক্ষী হওয়া। সে আমি, তুমি আর ইন্দিরাই হতে পারব।'

'কিন্তু কাকলিকে সেখানে নেবে কী করে ?'

হাসল নরনাথ : 'সে আমি দেখব।'

'আর নিলেই বা কী! সই করাবে কী করে ?'

'যদি নিয়ে যেতে পারি, সই করাতে বেগ পেতে হবে না!' নরনাথ অনুতাপের সুর আনল : 'ও জানে না ও কী হারাতে বসেছে! ওর যা দ্বিধা তার মূলে একটা প্রাচীন সংস্কার শুধু কাজ করছে। কলমের নিবের এক আঁচড়ে কেটে যাবে সেই দ্বিধা, আর যখন পরিচ্ছন্ন অক্ষরে ও দলিল সই করে উঠবে, দেখবে সমস্ত কিছু পরিচ্ছন্ন। আরেক আকাশে আরেক সূর্য। কিন্তু দাদা, দাদা কী বলেন ?'

'যার পক্ষাঘাত দেহে তার পক্ষাঘাত মনেও!'

'বুঝেছি। তুমি কিছু ভেবো না। সব ব্যাধি সেরে যাবে।' নরনাথ পা নামাল : 'তুমি বাড়ি যাও। চুপচাপ থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থা তো ভারি! শুধু ফর্মে কাকলির একটা সই! তা আর করিয়ে নিতে কতক্ষণ! এমন সোনার নোটিশ অবহেলায় বা ঔদাসীন্যে বরবাদ করে দেওয়া যায় না।'

বরেনের আফিসে খবর নিয়ে জানল বরেন কদিন আসছে না আফিসে। না, তেমন কোনো অসুখ-বিসুখ নয়, এমনি আসছে না। বাড়িতেই আছে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

বেশ, ওকে ওর বাড়ি থেকেই তুলে নিতে হবে। বেশ একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে ওর কাছে। বিরাট আনন্দের ব্যাপার।

সন্ধের দিকে নরনাথ গেল বনবিহারীর কাছে।

'ডেকেছেন ?'

'হ্যাঁ, এবার তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দাও বিয়েটা। তুমি এসে না পড়লে কিছু হবে না।' স্বপ্নের চোখে বলতে লাগলেন বনবিহারী : 'এবার ছাদ জুড়ে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল তোলো, আলো জ্বালাও। নহবত বসাও। খরচের এস্টিমেট করো। নিমন্ত্রণের লিস্টি—'

'ইন এনি কেস, বড় করে নেমন্তন্ন তো একটা করতেই হবে।' বললে নরনাথ।

'তা তুমি খরচের জন্যে ভেবো না। সেই দশ হাজার টাকা যা একবার কাকলিকে দিয়ে ফের ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তা তোলা আছে।' বললেন বনবিহারী, 'সেই টাকা এবার কাজে লাগবে।'

'তা সব করে দিচ্ছি ঠিকঠাক। অর্থাৎ যা মহামায়া করাচ্ছেন।' বিজ্ঞের মত হাসল নরনাথ : 'কই, বউদি কই, কাকলি কই ! কালকে দুপুরে আমাদের ওখানে নেমন্তন্ন তোমাদের।'

'কেন, কাল কী ?' হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল গায়ত্রী।

'কালকে আমাদের বিয়ের অ্যানিভার্সারি।' অলজ্জের মত হাসল নরনাথ : 'এ উৎসব তো ঢোল সহরত করে করা যায় না। একটু গোপনেই করতে হয়। তাই নেমন্তন্নটা বাড়িতে নয়, হোটেলে। লাঞ্চের নেমন্তন্ন।' কাকলিকে দেখা গেল বাইরে, তাই এবার তাকে লক্ষ্য করল নরনাথ : 'বারোটার মধ্যেই ফিরে এসো বাড়ি ; বেশ, সাড়ে বারোটা। আমি আর ইন্দিরা আসব গাড়ি নিয়ে। তৈরি থেকো, হ্যাঁ, কাল, শনিবার। শনিবার ভাঙা আফিস ফেলে চলে আসতে বেগ পেতে হবে না।'

কাকলি বললে, 'বিয়ের বার্ষিকীতে কী উপহার চলে—'

'ফুল, ফুল, যে কোনো অবস্থাতেই ফুল। জন্মদিনে মৃত্যুদিনে বিয়ের রাত্রে।'

'বিয়ের রাতের কথা কে বলছে ? বিয়ের দিনে, মানে বিয়ের বার্ষিকীতে ?'

'সিঁদুর—সিঁদুরের কৌটো।' গায়ত্রীর দিকে তাকাল নরনাথ।

পরদিন আফিসে গিয়ে সকালের দিকেই সুকান্তকে ফোন করল কাকলি।

'আমি আজ বারোটায় ফিরে যাচ্ছি বাড়ি। আমাকে আর মাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছেন নরুকাকা। নরুকাকার বিয়ের অ্যানিভার্সারি আজ। না গেলেই নয়। আপনি তাই আজ একাই ফিরবেন।'

'একাই ফিরব! ভবসংসারে একা এসেছি একাই ফিরব।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'শুনুন, আজ দুপুরে, একটা নাগাদ আপনি আসুন এ বাড়ি, বাবার সঙ্গে দেখা করুন। আজই সুবিধে, মা থাকবে না দুপুরে। চলে আসুন—'

'আপনিও তো থাকবেন না।'

'তার মানে কোনো বাধাই থাকবে না আপনার।' হেসে উঠল কাকলি: 'আমি বাবাকে বলে রাখব। বাবা আপনার জন্যে জেগে থাকবেন।'

সেই অনুসারে দুপুরে চলে এসেছে সুকান্ত। দরজা খোলা পেয়েছে। সোজা উঠে এসেছে বনবিহারীর কাছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে চলতে-চলতে। কোনো দিকে কোনো বাধাই দেখতে পাচ্ছে না।

প্রণাম করে বিনম্র মুখে দাঁড়াল সুকান্ত।

বনবিহারী উঠে বসে একেবারে হাতে ধরে তাকে বসালেন পাশটিতে। অনেকক্ষণ সানন্দ স্নেহে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর কথা শুরু করলেন। অনন্ত কথা, অবান্তর কথা, অনন্ত আনন্দের অবান্তর কথা।

'তোমাকে একটু চা দেবে কে?'

'আমি আছি।' খাবারের প্লেট আর চায়ের ডিশ নিয়ে পত্রালি বেরুল।

'কাকলি আর ওর মা নেই বুঝি বাড়ি?' বলে মুখে উদ্বেগের রেখা ফোটালেন বনবিহারী: 'কাকলি একা-একা বাইরে থাকে এ আর আমার এখন পছন্দ নয়। বাইরে যতক্ষণ তোমার জিম্মাদারিতে আছে ততক্ষণই আমি নিশ্চিন্ত। শোনো, তুমি ওকে বাইরে থাকতে দিও না একা-একা।'

'ও তো এখন মার সঙ্গে আছে, নরুকাকার সঙ্গে। এখন আর ভয় কী।' মৃদু রেখায় হাসল সুকান্ত।

'না, না, কাউকে বিশ্বাস নেই। পুরোপুরি কেউ জাগ্রত নয় তোমার মত।'

'কাকলি নিজেই জাগ্রত।'

'হ্যাঁ, আরো শোনো, তোমাদের বিয়েটার আর দেরি হচ্ছে কেন? টাকার কথা ভাবছ? টাকা আমি দেব। কাকলির দশ হাজার টাকাই আমার কাছে মজুদ আছে।'

'না, না, টাকার কথা নয়।'

'তবে? বিয়ের পরে বাসস্থানের কথা?'

'না, সেটা আবার সমস্যা কী।'

'তবে?'

'আইনের একটু বাধা আছে সামান্য।'

'আইনের বাধা?'

হ্যাঁ, ডিভোর্সের ডিক্রির পর এক বছর না যেতে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী ফের বিয়ে করতে পারে না।' হাসল সুকান্ত: 'তা, বছর ঘুরতে আর দেরি নেই। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে কটা দিন। আপনি তার জন্যে ভাববেন না।'

'ততদিন আমি যদি না বাঁচি?' ক্লান্ত চোখ বুজে শুলেন বনবিহারী।

...৫৫

পথে যেতে-যেতেই নরনাথ বললে, 'আরেকজনকে পিক আপ করে নিতে হবে।'

'আগে থেকে বলা আছে তো?' মুখে বিরক্ত ভাব আনবার চেষ্টা করে গায়ত্রী বললে।

'আগে থেকে বলা না থাকলেই বা কী!' ড্রাইভারের পাশে বসা নরনাথ বললে, 'পুরুষমানুষ তো, এক ডাকে তৈরি হয়ে নেবে।' তারপরে কথাটা একটু চলুক, কথার পিঠে কাকলি কিছু বলুক, বলতে-বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাক, সেই আশায় নরনাথ বললে, 'এ তো আর মেয়ে নয়। মেয়েদেরই তো হয় না। হয় না, হয় না, হয়ই না। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার পর সিনেমায় ঢোকে।'

প্রতিবাদ যা এল, কাকলির থেকে নয়, ইন্দিরার থেকে।

'পুরুষদের কথা আর বলতে হবে না। বেরিয়েও বেরুনো হয় না, ফিরে আসে। সেদিন বেরিয়েছে সেজেগুজে, ও মা, কতক্ষণ পরে দেখি ফিরে এসেছে। কী ব্যাপার? না, পকেটে রুমাল নেই!' হাসতে লাগল ইন্দিরা।

'উঃ, সে কী ট্র্যাজেডি, পকেটে রুমাল না থাকা। সঙ্গে পার্স না থাকলেও হয়তো ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু রুমাল না থাকলে! ঈশ্বর রক্ষা করুন। পকেটে রুমাল নেই মানে বুকে হৃৎপিণ্ড নেই।'

'তারপর সেই রুমাল খোঁজা মানে প্রায় সীতা-খোঁজা—প্রায় কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড।' ইন্দিরাই বললে, 'সব দেখা গেছে। পুরুষেরও কম দেরি হয় না তৈরি হতে। বেরুবার আগে হয়তো দাড়ি কামাতে বসল, নয়তো জুতোয় কালি দিতে—ওসব বালাই মেয়েদের নেই—'

'ওসব নন-এসেনশিয়াল, ওসব পুরুষ অনায়াসে বাদ দিয়ে দিতে পারে। কে বা তার মুখ দেখে, কে বা তাকায় পায়ের দিকে। কিন্তু মেয়েদের শুধু ম্যাচ করতে করতেই জীবন কাটল। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে ব্লাউজের হাতার, ব্লাউজের হাতার সঙ্গে শাড়ির পাড়ের। আবার সেই রঙের এক ঝাঁক প্লাসটিকের চুড়ি। এদিকে জীবনে আসল ম্যাচেই হয়তো ফাট হয়ে গিয়েছে।'

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল নরনাথ। কাকলি এতটুকু হাসছে না। যেন কানেই নিচ্ছে না কথা। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'যে যাই বলুক, কবরস্তম্ভকে চুনকাম করা মেয়েদের পক্ষে এসেনশিয়াল—'

'কথাটা কী বললে ?'

'কবরস্তম্ভ।'

'সে আবার কী ?'

'যতদিন মেয়েদের স্বাস্থ্য শ্রী যৌবন থাকে ততদিন পলেস্তারার দরকার হয় না। কিন্তু যখন ওগুলো চলে যায় গোরস্থানে তখন মুখখানি শুধু স্মৃতিস্তম্ভ, কবরস্তম্ভ হয়ে থাকে। তখন তার কলি না ফিরিয়ে আর উপায় থাকে না। লজ্জায় মুখ চুন করার একটা কথা আছে বাঙলা ভাষায়। ঘুম যখন আগে থেকেই চুন তখন আর লজ্জার দরকার কী ! তাই লজ্জাও উঠে গিয়েছে দেশ থেকে।'

এ দস্তুরমত আঘাত করার মত কথা। তবু কাকলির এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই।

আরেকজন পুরুষকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে অথচ সে কে মা বা নরুকাকিমা কেউই কিছু ভাঙতে চাইছে না ; আর নরুকাকা চেপে যাচ্ছেন এটা তার কাছে কেমন বিসদৃশ লাগল। পরিষ্কার করা উচিত। সে কি এক টেবিলে পড়ে, এক সংশ্রবে ?

'হ্যাঁ, পুরুষদের বেলায়ও ঝামেলা কম নেই।' যত আজেবাজে কথার জের টানছে নরনাথ : 'হয়তো পাটভাঙা কাপড়টা খুলতে যেতেই ছেঁড়া বেরুল। আরো মারাত্মক, বাইরে বেরুবার পর হাঁটুর উপর নজরে এল ছেঁড়াটা। তখন সেটাকে ঢাকবার কী দুশ্চেষ্টা। হাঁটুর উপরে হাঁটু তুলে বসার স্টাইল করা। কিংবা ধরো, ধোপদস্ত পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলে একটাও বোতাম নেই, বোতাম লাগাবার লোক নেই—'

'না, তোমার বোতাম কি আর লাগিয়ে দেওয়া হয়!' উত্তর দিল ইন্দিরা।

'মানে, ঠিক সে সময়টায় হয়তো প্রস্তুত নেই। তিনি থাকলেও ছুঁচ সুতো হয়তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন গোটা দুই আলপিন কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া—'

'যেন আলপিনই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি। পুরুষেরও অনেক ন্যায্য বাধা আছে, তবু সব সত্ত্বেও পুরুষ মেয়ের চেয়ে ক্ষিপ্র—'

কিন্তু এ কোন এলেকায় এসে পড়ল গাড়িটা?

গাড়িটা বেশ বড় জোগাড় হয়েছে, পিছনের সিটে মেয়ে তিনজন বসেছে আরাম করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে অনায়াসে ধরবে ড্রাইভারের পাশে, তাতে কিছু ব্যস্ত হবার নেই। আর এ এলেকাতেই যে ভদ্রলোকের বাড়ি গাড়ি, মন্থর হয়ে আসাতেই তা বোঝা যাচ্ছে।

'এক মিনিট!' গাড়িটা থামতেই সামনের দিকের দরজা খুলে দ্রুত নেমে পড়ল নরনাথ: 'বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

নরনাথ পাশের একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বিদ্যুৎবেগে নেমে পড়ল কাকলি: 'যাই আমিও একটু ঘুরে আসি, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

ক্ষিপ্রতা আর কাকে বলে। নেমে পড়েই চোখের পলকের মধ্যে তীরের মত কতটা পথ বেরিয়ে গিয়েছে কাকলি। কে তাকে ধরে! কে তার পিছু নেয়।

'এ কী, কোথায় যাচ্ছিস তুই?' হাওয়ায় ক্ষীণ কণ্ঠ তবু পাঠাল একবার গায়ত্রী।

কাকলি ফিরেও তাকাল না।

'ওদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকল।' ইন্দিরা বললে।

'ওখানে ওর কে আছে?' ভাবনা ধরল গায়ত্রীকে: 'তবে ও পালাল নাকি?'

'না, পালাবে কেন? পালাবে কোথায়? ফেরবার সময় ঐ গলির ভিতর দিয়ে যাব—হর্ন দিলেই কাকলি বেরিয়ে আসবে।'

'ঐ গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না।' ড্রাইভার বললে।

'আচ্ছা, এটা যে বরেনের বাড়ি সেটা কাকলি বুঝতে পেরেছে?' অসহায়ের মত বাড়িটারদিকে তাকাল গায়ত্রী।

'তা কোন না পেরেছে! এত পরিচয়ের মধ্যে এক দিনও কাকলিকে নিজের বাড়িঘর দেখায় নি এ কী করে কল্পনা করা যায়!'

'তাই আমার ইচ্ছে ছিল না, সবাই একসঙ্গে এসে তুলে নিয়ে যাই বরেনকে। ম্যারেজ আফিসে বরেন দিব্যি আগে যেত, আমরা পরে গিয়ে শামিল হতাম।' ক্রুদ্ধ

আক্রোশে ফুঁসতে লাগল গায়ত্রী : 'তখন দেখতাম কী করে পালিয়ে যেত ঝটকা মেরে !'

'বা, কাকলি যদি অনিচ্ছুক হত, বিয়ের ফর্মে সই করত না। জোর করে সই করাতে কী করে ?' ইন্দিরা বললে, 'ধরতই না কলম। কী সব বলতে হয় মন্ত্র, উচ্চারণই করত না। বিয়ে পাশ করত না অফিসার।'

'রাখো,' নড়ে-চড়ে আঁট হয়ে বসল গায়ত্রী : 'আমি জানি কী করে ফর্মে ওর নিতে হয় সই, কী করে—'

'হ্যাঁ, সবই হচ্ছে সই, দলিলী ব্যাপার।' ইন্দিরা আরো গভীরে গেল : 'আর যখন দলিলী ব্যাপার তখন জোর-জবরদস্তিতে যাওয়া কেন ? সরকারি লোকদের ঘুষ দিয়ে এত সব কাণ্ড হচ্ছে আর একটা বিয়ে হবে না ?'

'বিয়ে ?'

'বিয়ে মানে বিয়ের দলিল তৈরি হবে না ? তিন সাক্ষী আর বরের সই তো মজুদই আছে, শুধু এক কনের দস্তখত। তা একটা মেয়েলি সই কারচুপি করা যাবে না ? আর টাকায় এত সার্টিফিকেট হয় একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট হতে দোষ কী।'

'ঠিক বলেছ।' ক্রোধে আরো সংকীর্ণ হল গায়ত্রী : 'ঠাকুরপোই তা ম্যানেজ করতে পারবে। তখন দেখব, উলটো গলিটার দিকে শ্যেনদৃষ্টি ছুঁড়ল : 'কোথায় পালায় ? কে ওকে আশ্রয় দেয় ?'

দুপুরে ঘুমুচ্ছে বরেন, তাকে ঠেলে তুলতেই প্রলয়কাণ্ড।

'উঠুন, চলুন চটপট—এখনো জামাই হন নি তাই তুমি বলছি না।' দরজার ছিটকিনি খুলে দিতেই ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল নরনাথ : 'না, দেরি করবার সময় নেই। যতদূর সম্ভব, সংক্ষেপে তৈরি হয়ে নিন। এই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল তৈরি হয়ে বেরুতে কে বেশি দ্রুত—'

'সে কী ? কোথায় যাব ?'

'ম্যারেজ আফিস।'

,সেখানে কী ?'

'সেখানে চণ্ডীপাঠ। ঝাঁজিয়ে উঠল নরনাথ : 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্যা। সেখানে বিয়ে। বলুন, কার বিয়ে ? তারও উত্তর দিচ্ছি, আপনার। বলুন, কার সঙ্গে ? বলুন, তারও চাই নাকি উত্তর ?'

'বা, সেই তো আসল জিজ্ঞাসা।'

'আমার ভাইঝি কাকলির সঙ্গে। কী, চিনতে পারলেন? নাকি দেখতে চান একবার?'

বরেন হাসল। চেয়ারে বসল। মুখোমুখি চেয়ারটাতে নরনাথকে ইশারা করল বসতে।

'বসবার সময় নেই। দেরি হলে ম্যারেজ আফিস বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কাকলিকে আমি বিয়ে করি কী করে?' বরেন সিগারেট বার করল: 'কাকলি যে বিবাহিত।'

'বিবাহিত?' খেপে উঠল নরনাথ: 'কে বললে? কই, কোনো রিম্যারেজ তো হয় নি।'

'আহা, রিম্যারেজ হতে যাবে কেন? নরনাথের দিকে সিগারেটের কেসটা বাড়িয়ে দিল বরেন। নরনাথ নিল না বলে নিজেই একটা ধরাল একা একা। বললে, 'ওর বিয়েটা হয়েছিল, সেটাই এখনো চলে আসছে।'

'সেটা চলে আসছে কী!' নরনাথ তর্জে উঠল: 'সেটা কোর্ট নাকচ করে দেয় নি? ওদের বিয়ে ডিজলভড্ হয়ে যায় নি?'

'এমন এক ভালোবাসা আছে যা অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলেও যায় না।' করুণ করে হাসল বরেন: 'তেমনি আবার ভালোবাসা আছে যা স্বক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে সেই বিয়ে ভেঙে গেলেও বেঁচে থাকে।'

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।'

'আমিও পাচ্ছি না। এ কাগজ-কলমে হিসেবের অঙ্ক নয় যে বোঝানো যায়। এ বুদ্ধির অগম্য। রক্তের গভীরে এক প্রচ্ছন্ন ব্যাধি।'

'আমরা অত শত বুঝি না।' নরনাথ দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল: 'আমরা বুঝি সজ্ঞানে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে করেই হোক তার মান রাখতে হবে।'

'তার মানে, ছলে বলে কৌশলে যে উপায়েই হোক বিয়েটা ঘটাতে হবে?' জিজ্ঞেস করল বরেন।

'নিশ্চয়ই। ঘি যখন আমার আর সে ঘি যদি সোজা আঙুলে না ওঠে—'

'তখন আঙুল বাঁকা করে ঘি তুলতে হবে? না।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন: 'বাঁকা আঙুলের ঘিয়ে শ্রম বেশি, স্বাদ কম। জোরের মধ্যে শুধু জেল্লাই আছে, স্ফূর্তি নেই। কী হবে উৎসবের আলো জেলে যদি প্রতিমায় না প্রাণ আনবার মন্ত্র জানি। এ কথা শুধু আমি কেন, পুরাকালের সেই রাবণেরও জানা ছিল।'

'কার জানা ছিল?' হকচকিয়ে গেল নরনাথ।

'রাবণের। রামের সীতাকে যে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল বনের মধ্যে সে কি জোর করে সীতাকে বশীভূত করতে পারত না? শারীরিক, পাশবিক, শক্তি কি তার কম ছিল?'

'রাবণ তো মূর্খ।' উড়িয়ে দিল নরনাথ।

'রাবণ মহান। কামে ক্রোধে মদে দর্পে অন্ধ হলেও রাবণ বুঝেছিল সেই আদিম সত্য কথা, যে কবিতা স্বয়মাগতা না হলে রস নেই! সীতাকে বললে, পরস্ত্রীহরণ বা পরস্ত্রীগমন রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু সীতা, আমি তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্পর্শ করতে চাই না। তুমি নিজে থেকে আসবে তারই আশায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

সশব্দে হেসে উঠল নরনাথ : 'বা, নিজে থেকেই তো এসেছে।'

'নিজে থেকে এসেছে! কে নিজের থেকে এসেছে?' বরেন মূঢ়ের মত স্থির হয়ে রইল।

'সীতা নয়, আপনার কাকলি।'

'কাকলি?'

'শুধু এসেছে নয়, নিচে গাড়িতে বসে আছে।'

'বাজে কথা।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

'শুধু কনে একা নয়, তার বিয়ের তিন হবু সাক্ষী। এক সাক্ষী আমি আর সাক্ষী তার মা ও কাকিমা। এখন দয়া করে বর গাত্রোত্থান করলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।'

'বলেন কী! ওঁরা সব বাইরে বসে আছেন? সে কী কথা? ওঁরা ভেতরে এসে বসুন।' বরেন উদ্বেল হয়ে উঠল। পোড়া সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে দিল বাইরে। নিচে নামবার জন্যে উন্মুখ হল।

বাধা দিয়ে নরনাথ বললে, 'একেবারেই বেরুনো যাক চলুন। ম্যারেজ আফিসে হিজিবিজি কাজটা সেরে সোজা হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ তৈরি। তারপর আর সব।'

'না, না, তবু নিজের থেকে আগেই একবার দেখে নিই স্বচক্ষে।' ঘরোয়া পোশাকেই নেমে চলল বরেন। পিছনে নরনাথ।

দরজায় গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে আছে বটে। হুইলে ড্রাইভার। ভিতরে দু-জন মহিলা—কাকলির মা আর কাকিমা। কিন্তু এ কী গান্ধর্বী মায়া! কাকলি কোথায়?

'সে কি! কাকলি কোথায়?' রাস্তায় নেমে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল নরনাথ।

‘এই তো এতক্ষণ ছিল গাড়ির মধ্যে।’ গায়ত্রী বললে, ‘গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল। এই একটু ঘুরে আসছি বলে চলে গেল ঐ দিকে, ঐ গলির মধ্যে—’

‘এই এখুনি আসবে।’ স্তোকের মত বললে ইন্দিরা, ‘নয়তো যাবার সময় ওখান থেকে ওকে তুলে নেব।’

সকলের উদ্দেশে করজোড়ে নমস্কার করল বরেন। তারপরে সদর, যেটা সাধারণত এ সময় খোলাই থাকে, বন্ধ করল নিজের হাতে, সশব্দে। তারপর উপরে, নিজের ঘরে চলে এল। বিছানাটার দিকে তাকাল। মনে হল এখনো কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। তৃপ্তির শব্দ করে শুয়ে পড়ল আবার। পাশবালিশটা বুকে জড়িয়ে চোখ বুজল। বাকি ঘুমটুকুকে ডাকল, ডাকতে লাগল।

...৫৬

যত দূর সাধ্য জোরে পা চালিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা করে বাড়তে লাগল কাকলি। দু-একটা খালি ট্যাক্সি কোন না চোখে পড়ল এখানে-ওখানে। লোভ হলেও ডাকতে সাহস হল না। কে জানে কোন চক্রান্তে মানুষ বইবার সোজা গাড়ি না হয়ে পাখি ধরবার ফাঁদ হয়ে এসেছে। কোন পথ দিয়ে ছুটিয়ে কোন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে তার ঠিক কি।

তার এখন কাজ হবে কি জালে পড়া আর জাল থেকে বেরিয়ে আসা?

বড় রাস্তা পেতে দেরি হল না। কিন্তু কোথাও কি একটু ছায়া নেই যে শান্তিতে দাঁড়ায়? দেখে-শুনে বাস ধরে?

বাণবেঁধা যন্ত্রণার মত লাগছে এখন এই দুপুরটাকে। যদি তেমন একটা দরজা-জানলা-আঁটা ছায়া-ছায়া-করা ঘর পাওয়া যেত আর একটা শীতলপাটির ঢালা বিছানা, তা হলে নদীর জলের উপর যেমন সন্ধ্যা পড়ে উপুড় হয়ে তেমনি কাকলি একরাজ্যের ঘুমের উপরে একরাজ্যের ক্লান্তি হয়ে উপুড় হয়ে পড়ত। নিজের মনে হাসল কাকলি। কেন, তেমন ঘর তো একখানা তার নিজের বাড়িতেই আছে। নির্জনতা দিয়ে তৈরি, নিঃসঙ্গতা দিয়ে ছায়া-করা। সেই ঘরের দরজা-জানলা এঁটে দিব্যি ঘুমোনো যায় গা ঢেলে। আর ঘুমিয়ে পড়লে পর শীতলপাটি না শীতল মাটি

এ কে খেয়াল করে? তবে বাড়ি ফিরে গিয়েই তো যন্ত্রণার লাঘব করা যায়। কে আর টো-টো করে রোদ্দুরে?

কিন্তু এখন এমন পরিস্থিতি ঘুমুবার সময়ও প্রহরী দরকার। বেশ বিশ্বাসী, মজবুত, সতর্ক প্রহরী। ঘরের মধ্যে নিজের কাজকর্ম, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, অন্যমনস্ক থাকবে, আর পরিপূর্ণ অর্পণে স্তর থেকে স্তরে, তল থেকে তলে, ঘুমের সমুদ্রে নেমে যাবে কাকলি। কতদিন ঘুমোয় নি এমন নিশ্চিন্তে, অনুকূল পাহারার অধীনে। নিশ্চিন্ত না হতে পারলে আর ঘুম কই, ঘুমের সুখ কই?

সুন্দর ব্যবস্থা। নিজের মনেই আবার হাসল কাকলি, আর আরো একজন হাসছে সৌজন্যস্নিগ্ধ স্তব্ধতার অক্ষরে, তাও বেশ বুঝতে পারল। তুমি ঘুমুবে আর আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকব? এদিকে ঘর অন্ধকার।

অন্ধকারে পড়া যায় এমন গ্রন্থও কিছু আছে হয়তো পৃথিবীতে।

তাই নাকি? পড়া যায় আর অন্যমনস্কও থাকা যায়!

কটা বাস ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বাস-এ উঠে পড়ল কাকলি। এতক্ষণে যদি বুদ্ধি করে গিয়ে থাকে বাবার কাছে। কথাটা যদি পেড়ে আসে। তারপর কাকার কাছে পাঠাব। তা হলেই পাকা হবে বন্দোবস্ত। পূর্ণ হবে বৃত্তবলয়।

'বিনতা আছিস?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে হাঁক পাড়ল কাকলি।

'আছি। এইমাত্র আসছি।' ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল বিনতা: 'এত তীব্র স্বর? আনন্দ, না আর্তনাদ?'

'আনন্দও নয়, আর্তনাদও নয়। এ প্রতিবাদ। এ ক্রোধ।'

'কার উপর? আমার উপর?'

'না। মার উপর।' ঘরের মধ্যে চলে এসে তক্তপোশে বসে পড়ল কাকলি।

'মার উপর? কেন, কী হল?'

'সেই চিরন্তন হস্তক্ষেপ—'

'কেন, কী বলছেন মাসিমা?' উৎসুক হল বিনতা। বসল মুখোমুখি।

'এদিকে বলছেন মেয়ের ইচ্ছেই একমাত্র গ্রাহ্য। আসলে তাঁর ইচ্ছের সঙ্গে মেয়ের ইচ্ছের মিশ খেলেই তবে তা গ্রাহ্য। নইলে ভেবে ছাখ আমি এত বড় ধাড়ী একটা মেয়ে, আমার একটা স্বাধীনতা নেই—'

'মায়ের কাছে মেয়ে কখনো বড় হয়? ডাক-নাম খুকিই থাকে।'

'খুকি? আমি খুকি? তোকে বরং খুকি বলা যায়, আমাকে নয়।' গর্বের ভাব করল কাকলি: 'আমি বিবাহিত।'

'আর বিবাহিত কোথায় ?' মুখ টিপে হাসল বিনতা।

'আর বিবাহিত কোথায় মানে ? আমি কি তবে এখন প্রবাহিত ?'

'প্রবাহিত !' বিনতা এবার শব্দ করে হাসল।

'মানে, আমি এখন শুধু বয়ে যেতে এসেছি ?'

'বয়ে যেতে এলেই বা। প্রবাহিণীরই তো বেশি স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, সেই কথাটা বল। নদী কি পরের হাতে আঁকা রেখা ধরে চলবে ? শুধু জলের নদী নয়, রক্তের নদী, হৃদয়ের আদি গোমুখী থেকে যার উৎসার—'

'বা, সে কী কথা ? হৃদয়ের উপর হাত দেবে কে ? কেন, মাসিমা বলছেন কী ?'

'বলছেন যার-তার সঙ্গে প্রেম করা চলবে না।' বিনতার হাত চেপে ধরল কাকলি : 'বল, এ কথা আমার মত সাবালক মেয়েকে কেউ বলতে পারে ? নিজের পায়ে দাঁড়ানো রোজগেরে মেয়েকে ?'

'বা, তা কী করে বলা যায় !'

'ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যার সঙ্গে আমার ইচ্ছে প্রণয় করব। বল, এতে আইন আমার পক্ষে নয় ? সমাজ ? ধর্ম ?'

'এ কথা এতদিন পরে ওঠে কী করে ?'

'উঠতেই পারে না। স্পষ্ট, শক্ত, দৃঢ় হয়ে আছে।'

'তা ছাড়া যার সঙ্গে প্রেম করছিস সে তো মাসিমার মনোনীত। বিরোধ তা হলে বাধে কিসে ?'

'না, মনোনীত নয়। তারই জন্যে বিরোধ।'

'সে কি, মনোনীত নয় ?' চমকে উঠল বিনতা।

'মার কথা হচ্ছে, গোস্বামীকে ভালোবাসো, ভূস্বামীকে ভালোবাসো, ঠিক আছে, কিন্তু খবরদার, শুধু-স্বামীকে পাবে না ভালোবাসতে।'

'কাকে ? মুথুস্বামীকে ?'

'না, না, কোনো মাদ্রাসীকে নয়। শুধু-স্বামীকে। মানে পরের ভূতকে নয়, পূর্বের ভূতকে। সংক্ষেপে ভূতপূর্বকে।' হাত ধরে ঝাঁকি মারল কাকলি : 'বল, এমন কোনো গ্যাগ চলে— মানা যায় তেমন বন্ধন ?'

'কী বলছিস !' উছলে উঠল বিনতা : 'তোর কাছে ফিরে এসেছে সুকান্ত ?'

'ফিরে আসার কথা নয়। স্বাধীনতার কথা। ফিরে আসতে পারার কথা, পথের কথা। ঘর বাঁধতে হবে বলে নতুন জমিতে নতুন শাজপাটে তুলতে হবে, পুরোনো ভাঙা ঘর মেরামত করে নেওয়া যাবে না সাবেক বনেদে এমন নিষেধ অচল।'

'এক শো বার অচল।' গাঢ় সমর্থন করল বিনতা : 'যদি মেরামত করে নেওয়া যায়, যদি মেরামতের মশলা থাকে, তবে তার মত শ্রেয় তার মত প্রেয় আর কী আছে, কী হতে পারে ? যা শ্রেয় তা সব সময়ে প্রেয় নয়, যা প্রেয় তা সব সময়ে শ্রেয় নয়, চিরদিন এই দ্বন্দ্বের কথা শুনে এসেছি। কিন্তু এইখানে নির্দ্বন্দ্ব, এইখানে শ্রেয়-প্রেয় একসঙ্গে।'

কী সুন্দর করে প্রশান্ত মুখে বলছে বিনতা। আর অমন নিপুণ করে কথাটা কাকলি সাজিয়েছিল বলেই না পেল অমন করে বলতে।

'হৃদয়ের কোন আকরে কোন মশলা যে লুকিয়ে আছে উপর-উপর বোঝা যায় না। গভীরে যখন ঘা লাগে তখনই কঠিনের শয্যায় রসের ঘুম ভাঙে।'

'কিন্তু এতে মাসীমার অপ্রসাদ কেন ?'

'আর তোর ?' ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকলি।

'সোনার বাসন ভেঙে গিয়েছিল, আবার তা জোড়া পড়বে, এতে আমার আনন্দ, কার না আনন্দ, সকলের আনন্দ। আর তা ছাড়া যে পুরাতন ছিল, ছিন্নমূল হবার পর ফের স্বস্থানে তার পুনর্বাসন হচ্ছে এ প্রসঙ্গের কাছে বিনতা-বরেন অবান্তর, তুচ্ছ। যেমন হৃদয়ের কাছে দেহাভ্যাস তুচ্ছ। যদি সুকান্তকে আনতে পারিস তবে তো তুই জয়ী, তোর প্রেম জয়ী। সে ক্ষেত্রে মাসিমার তো উচিত তোকে সংবর্ধনা করা।'

'মার ধারণা আমি সুকান্তকে আনছি না, সুকান্তই আমাকে টানছে। সুতরাং আমার মান ইজ্জত থাকল না কিছু।'

'সুকান্ত আনীত, না তুই টানিত, এ প্রসঙ্গও অনর্থক। মরুভূমির হাওয়া শুকনো তার মধ্যে জল নেই, তাই মেঘ এলেও তার থেকে বৃষ্টি সে আদায় করতে পারে না।' শান্ত শ্রী মুখে মেখে বিনতা বললে, 'কিন্তু যেখানে মেঘেও জল হাওয়াতেও জল সেখানেই বর্ষণের আশীর্বাদ। যদি আবার তোদের মিলন হয়, আনন্দবর্ষণ হয়, এরই জন্যে হবে যে তোর প্রাণের এক কোণে একটুকু ভালোবাসা ওরও প্রাণের এক কোণে একটুকু লেগে ছিল। সে খুনী রঙ গেল না কিছুতেই। সেই ক্ষেত্রে ভালোবাসারই তো জয় দেব সবাই।'

'যদি বিয়ে হয়, যাবি তো ?'

'এক শো বার যাব।' বলেই জিভ কাটল বিনতা : 'না, এক শো বার নয়। এক বার যাব। গিয়ে প্রাণ ভরে সাজাব তোকে। দুর্গার মতন সাজাব !'

সেখান থেকে ফের বাস-এ করে সুকান্তের হোটেলে এল কাকলি। বললে, 'শিগগির কিছু খাওয়ান। লাঞ্চ ভেস্তে গিয়েছে। সারাদিন প্রায় অভুক্ত আছি।' নিজেই

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল : 'কই, ডাকুন কাউকে। মোগলাই পরোটার মত মুখ করে থাকবেন না।' বসল চেয়ারে।

'জানেন, আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'খেতে দিয়েছিল ?'

'প্রচুর।'

'আর আপনি আমাকে দিচ্ছেন না কিছুই—'

'আর সব চেয়ে যা প্রচুর, আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হল।'

'হল ? কেমন দেখলেন ?'

'খুব ভালো। হিতৈষী। আপনার জন।'

'বিকেলে আরেক বার যাবেন, মাকে দেখে আসবেন। জ্বরকে তো ডরাই না, কাঁপুনিকে ডরাই।' আতঙ্কগ্রস্তের মত মুখ করল কাকলি।

'কাউকে ডরাই না। কিন্তু আপনাদের লাঞ্চটা ভেস্তে গেল কেন ?'

'তার মানে, আপনার মতলব, আমি সেই বিরাট কাহিনী বিশদ করে বলি, আর বলতে বলতে তবু এখনো কোনোরকমে টিঁকে আছি, শেষ পর্যন্ত না খেতে-খেতে টেঁসে যাই। আপনার সর্বসমস্যার সমাধান হোক।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে সুকান্ত বয়কে ডেকে বিস্তীর্ণ অর্ডার দিল : 'আমি কিন্তু কিছু খাব না।'

'একটু একটু খাবেন।

'একটু একটু ? কেন, আমি কি পাখি ? চঞ্চুভোজী ?'

'তবে—'

'কেন, আমি গোগ্রাসে খেতে পারি না ?'

'আপনি—আপনি সব পারেন।'

টেবিল সাজিয়ে দিল বয়।

খেতে খেতে কাকলি বললে, 'এখন আরেকটা কাজ বাকি।'

'মোটে আরেকটা ?' উসখুস করে উঠল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, আরেকটা।' গম্ভীর হল কাকলি।

'কী, বলুন।'

'এখন একবার আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার বাবাকে বলা—'

'আমার বাড়ি ! আমার বাড়ি-টাড়ি কিছু নেই।' মুহূর্তে প্রতিহত হল সুকান্ত।

'সে তো কারুরই কিছু নেই। দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার—

এসব ভাব তো আছেই। এসব ভাব তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। কিন্তু যেখানে আপনার বাবা-মা, আপনার ভাই-বোন, আপনার—' দু চোখে আনন্দের আয়ত দুটি দীপ জ্বালল কাকলি।

'কে আমার ?'

'আপনার সেণ্টু—' দীপশিখা কাঁপতে লাগল উজ্জ্বল হয়ে।

'ও! সেণ্টু! আপন মনে হাসতে লাগল সুকান্ত।

'যেখানে ওরা রয়েছে সেখানেই আপনার বাড়িঘর। তা আপনি শখ করে দূরেই থাকুন বা আলাদাই থাকুন—'

'আপনি আবার শখ করে ঐ বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে চান নাকি ?'

কাকলি হাসল : 'তার আমি কী জানি! আপনার বাড়ি, আপনি জানেন দেবেন কিনা ঢুকতে। কিন্তু এখন ঢোকার কথা হচ্ছে না। এখন বলার কথা হচ্ছে, ঘোষণার কথা হচ্ছে। তাই যান একদিন, বাবাকে গিয়ে বলুন সবিনয়ে।'

'উরে বাবাঃ, এ অসম্ভব। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'সবাই সবাইকে তাড়িয়েছেন। আপনার বাবা আপনাকে, আমার বাবা আমাকে। আপনি আবার আমাকে, আমি আপনাকে! দুই মা বুঝি দু-জনকেই। মনে হচ্ছে যেন অরাজক রাজত্বে ছন্নছাড়া প্রজার মত বাস করছি। কিন্তু না, রাজা একজন আছে ঠিক বসে, শত বিক্ষোভে-উপদ্রবেও তাকে তার সিংহাসন থেকে নামানো যায় নি, যায় না নামানো।'

'সিংহাসন আবার কোথায় ?'

'সবই জানেন তবু জিজ্ঞেস করছেন!'

'সবই তো জানি তবু শুনতে ইচ্ছে হয়। শোনা দিয়ে জানায় আবার নতুন অর্থ আসে, আস্বাদ আসে।'

'সে সিংহাসন অন্তরে, আর সে রাজার নাম ভালোবাসা।'

'তার হাজার নাম থাক, কিন্তু আসল কথা, আমি গিয়ে বলতে পারব না, আপনি গিয়ে বলুন।'

'আমি গিয়ে বলব কী! .আমার কোনো লোকাস স্ট্যাণ্ডিই নেই।' কাকলি হেসে উঠল : 'বিয়ের আগে কনে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বলবে আমি আপনাদের বউ এলাম। এ কোনোদিন কেউ শুনেছে ?'

'তার চেয়ে আমি ভাবছিলাম একেবারে কাজ-টাজ সেরে সাজসজ্জা করে যুগলে গিয়ে হাজির হই, সবাইকে চমকে দিই একসঙ্গে—'

'কাজ-টাজ আগেই সেরে ফেললে লোকে চমকাবে কখন! আর কাজ তো শুধু দু-জনের নয়, দুটো বাড়ির কাজ।' ঝোলে-মাখা আঙুল চুষতে লাগল কাকলি: 'দুটো বাড়িকে যদি আলোয় বাজনায় গানে হাসিতে মুখর করে দিতে না পারি তা হলে আর কী হল।'

'উঃ, ওসব প্যারাফার্নেলিয়া কী কঠিন ক্লান্তিকর!

'গ্রাস মেলে খেয়ে নেওয়া তো সোজা কিন্তু তার পিছনে আয়োজনটা একটু দেখুন। সেই উনুন ধরানো থেকে শুরু করে বাজার করা, কুটনো কোটা, মশলা পেষা, রান্না করা—হাজার রকমের অনুসঙ্গ। তবেই আপনার খাওয়া, আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি।'

'শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি বলছেন কেন? আমার তুষ্টি, আমার পুষ্টি।'

'তবে কঠিন ক্লান্তিকর বলছেন কেন?'

'কিন্তু যাই বলুন, বাড়ি গিয়ে অমন নাটকীয় পোজে বাবার সামনে দাঁড়াতে পারব না। আর কিছু ভাবুন।'

'ভেবেছি। তবে কাকার কাছে গিয়ে বলুন।' ঝোলে আবার হাত ডোবাল কাকলি।

'এটা বরং সম্ভব। আর তার জন্যে বাড়িতে না গেলেও চলবে।'

হ্যাঁ, আফিসেই পারবেন বলতে। আর আফিসে যখন, কথাবার্তা সংক্ষেপে হবে। কণ্ঠস্বর নিম্ন।'

'সে আবার আরেক হাঙ্গাম। আকস্মিক অল্প কথাই বা কী বলা যায় ভদ্রভাবে।'

'খানিকক্ষণ আমতা-আমতা করবেন, মুখটা লাজুক-লাজুক, বুঝে নেবেন কাকা।'

'সঙ্গে আপনিও চলুন।'

'মাথা খারাপ! আমি তো তখন পিকচারেই নেই, ফিল্ডেই নামি নি। আপনাদের খুড়ো-ভাইপোর প্রাইভেট পরামর্শের মধ্যে আমার স্থান কই?'

'কী পরিশ্রমের মধ্যে যে ফেললেন!'

'উপায় নেই।'

'তা না থাক, কিন্তু মাংসের ঝোলমাখা আপনার মুখখানা দেখে আমার কী ইচ্ছে করছে জানেন?'

'জানি। সুতরাং ইচ্ছাকে অব্যক্ত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।' হাসতে-হাসতে উঠে পড়ল কাকলি। বেসিনে হাত ধুতে গেল।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে কাকলি বললে, 'চলুন সিনেমায় যাই।'

বেলা ঢলে পড়েছে অনেকক্ষণ।

'চলুন আবার তেমনি ব্যালকনিতে সেই এসকেপিস্ট হয়ে বসি।'

'না, এসকেপিস্ট নয়।' কাকলির হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সুকান্ত। বললে, 'বলো আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

মুখ নিচু করে কাকলি জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সিনেমার পর আবার তুমি আসবে এখানে—'

'বাড়ি ফিরতে তবে দেরি হয়ে যাবে না?'

'হোক দেরি। এখানে থেকে যাবে কিছুক্ষণ। আমার কাছেই তো থেকে যাবে। কিছুক্ষণ মানে বেশ কিছুক্ষণ।'

সুকান্তর চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল কাকলি। বললে, 'এতদিন হল, আর কটা দিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'যায়। কিন্তু তুমি তো জানো আমার সেই কৌমারহর হবার সাধ—'

হো-হো-হো করে হেসে উঠল কাকলি: 'আমি কি কুমারী?'

'তা ছাড়া আর কী! আপনি তো মিস মিত্র।'

'চলুন, চলুন উঠে পড়ুন। শো শুরু হতে আর দেরি নেই।'

হুলস্থুল করে বেরিয়ে পড়ল দু-জনে।

শোর শেষে ট্যাক্সি করে কাকলিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে এল সুকান্ত। আর বাড়ি ফিরে এসে মাকে কী ভাবে দেখবে তাই ভেবে সারা পথ ম্লান হয়ে রইল কাকলি।

গাড়ি থামতেই গায়ত্রীকে দেখা গেল না। পত্রালি বেরিয়ে এসেছে। সুকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, 'বাবা আপনাদের ডেকেছেন।'

'মা কোথায় রে?' কাকলি জিজ্ঞেস করল।

'বাবার কাছে বসে।'

দু-জনে, কাকলি আর সুকান্ত, বনবিহারীর কাছে এসে দাঁড়াল।

বনবিহারী বললেন, 'ট্যাক্সিটা ছেড়ে দাও। পরে আবার একটা ডাকিয়ে দেব। রাত্রে এখানে খেয়ে যাবে।'

বাবা খাওয়াচ্ছেন কী, মার আনুকূল্য ছাড়া—কাকলি গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। আশ্চর্য, গায়ত্রীর মুখে হঠাৎ নতুন রঙ, কোমলতার রঙ, কমনীয়তার রঙ।

'জিজ্ঞেস করুন ভীষণ খেয়েছি দু-জনে।' সুকান্ত সহাস্য প্রতিবাদ করল: 'আজ আর চলবে না কিছুই।'

'তা হলে কালকে এসো।' গায়ত্রী বললে, 'একেবারে আফিস থেকেই চলে এসো। নেমন্তন্ন রইল। ভুলো না।' কাকলিকে বললে, 'তুই বরং কাল আফিসে একবার মনে করিয়ে দিস।'

কাকলি হাসল, হাসতে লাগল।

...৫৭...

হেমেন বাড়ি ফিরে চোরের মতন হয়ে গেল। মন বেশ ভালো করে এসেছিল, এবং তারই জন্যে হয়তো একটু আগে-আগে এসেছিল কিন্তু ঘরে পা দিতেই শুনতে পেল উপরে একটা কোলাহল হচ্ছে। কান তীক্ষ্ণ করতেই টের পেল একটি কণ্ঠস্বর বিজয়ার। আরেকটি কার বলে দিতে হবে না।

দেখল নিচে বসে প্রশান্ত চা খাচ্ছে।

'কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

'প্রথম কী নিয়ে লেগেছিল জানি না, এখন তো দেখছি ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে কথা হচ্ছে।' প্রশান্ত শান্ত স্বরে বললে।

'ইলেকট্রিসিটি নিয়ে?'

'মানে, কার ঘরে অকারণে কত লাইট-ফ্যান খরচ হচ্ছে তার খুঁটিনাটি হিসেব।'

'তারপরেই বিষয়টা বদলে যাবে।'

'গেল বলে।' জলখাবারের তদারক করছিল বন্দনা, তার মুখের দিয়ে চেয়ে প্রশান্ত বললে, 'এক্ষুনি শাড়ি-টাড়ি নিয়ে শুরু হবে।'

'মানে, কার কখানা আছে তা নিয়ে নয়, কাকে কবে কে দেয় নি কিংবা কে কবে কারটা পরতে নিয়ে ফেরত দেয় নি তার ইতিহাস।' হেমেন সমর্থন করল।

বন্দনার মুখ থমথম করছিল, কথা শুনে একটু হাসল। ওটুকু হাসিতে মেঘভার কাটল না সম্পূর্ণ। তার মানে যে বিবাদটা চলছে তাতে বন্দনাও একেবারে অপক্ষ নয়।

'তারপর কথা হয়তো বাপের বাড়ির দিকে চলে যাবে।'

'ধর্মের দিকেও যেতে পারে, মানে, ধর্মে কার কত গভীর বিশ্বাস সেই দিকে।'

'হ্যাঁ, যে কোনো দিকে।' বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকল হেমেন।

তারই জন্যে আদালতের কলহে 'ইস্যু' ধার্য করে নিতে হয়। কোনো পক্ষকেই 'ইস্যু'র বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। যা 'ইস্যু'তে নেই তাকে নিয়ে বিতণ্ডা

বেআইনি। কিন্তু মেয়েদের বেলায় কোনো 'ইস্যু' নেই, কেবল 'টিস্যু'—সুতোর পরে সুতোর বুনন, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। খেলার মাঠে বল লাইনের বাইরে চলে গেলে খেলা স্থগিত থাকে যতক্ষণ না বল ফের মাঠে আসে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় বল লাইনের বাইরে চলে গেলে মাঠও লাইনের বাইরে চলে যায়। মানে, মাঠও বিস্তীর্ণ হতে থাকে। তা ছাড়া এ বেলার বচসা এ বেলার ঘটনাতেই আবদ্ধ থাকে না, তিন সন আগে কী ঘটেছিল সেইসব মরা কথা রক্তবীজের মত বেঁচে ওঠে। মেয়েদের ঝগড়ায় কথার তামাদি নেই।

'কোথায় ?' হাঁক ছাড়ল হেমেন।

এক ডাকেই যা হোক ক্ষান্ত হল বিজয়া। রাগে ভর-ভর দীপ্ত মুখে নেমে এল।

'কই, সেই কথাটা বলবে না এখন ?'

'কোন কথা আবার ?' খাটে বসে উপুড় করে রাখা ম্যাগাজিনটা মুখের উপর মেলে ধরল বিজয়া। পড়তে-পড়তে কোথাও সাময়িক ডাক পড়ল বা উঠে যেতে হল তখন পড়া বন্ধ করতে হলে বইয়ের ঐ দশা হয়। পড়া বন্ধ হোক, বই যেন বন্ধ না হয়। হাতের কাছে সব সময়েই চুলের কাঁটা জাতীয় পেজমার্ক কোথায়, পৃষ্ঠা খুঁজে শেষ পাঠরেখা বার করবারই বা ধৈর্য কোথায়, কেমন সব উত্তেজনা ছত্রে-ছত্রে, তাই পত্রিকারই বিপরীত শয়ন।

'যে কথাটা ঝগড়ার পরেই বলতে নির্ঘাত ?'

'কী বলতাম ?'

'যে, চলো এই বাড়ি ছেড়ে, ফ্ল্যাট দেখ।'

'বা, সেই কথা বলার আর কী দরকার !' শরীরে গর্বের ঢেউ তুলল বিজয়া।

এক মুহূর্ত অচপল চোখে তাকিয়ে রইল হেমেন। বললে, 'ঝগড়ার মুহূর্তে চরম কথাটা মোক্ষম কথাটা বলে ফেলো নি তো ?'

'সেটা আবার কোন কথা ?'

'যে, মিছে কেন চোপা করছেন, এই বাড়ি তো আমার, আপনারা তো আমার ভাড়াটে, এক নোটিশেই উৎখাত—'

'ওসব কথা মনেও ছিল না।' পত্রিকায় আবার মুখ ঢাকল বিজয়া।

'হ্যাঁ, মনে আসতেও দেবে না। আমি মনে করিয়ে দিলেও না।' জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে হালকা হতে-হতে হেমেন বললে, 'আগামী যুদ্ধে যে পক্ষ হারো-হারো হবে সেই নাকি প্রথম অ্যাটম বোম ছুঁড়বে। ঝগড়ায় তুমি কখনো হেরে গেলে বা বেকায়দায় পড়লেও তুমি কখনো ছুঁড়বে না সেই অ্যাটম বোম, কখনো না।'

সর্ব শরীরে গরিমার ভরিমা নিয়ে বিজয়া বললে, 'আমি আর হারি না।'

এও তো এক মারাত্মক ভঙ্গি।

'কেন, কী করো?'

'টু দি পয়েণ্ট গোটা কয়েক কথা বলেই চুপ করে যাই।'

'টু দি পয়েণ্ট?' হাসল হেমেন: 'সে তা হলে ভীষণ পয়েণ্টেড?'

'তা জানি না। তবে কথা কমিয়ে আনছি। কথা কমিয়ে আনা ভালো।'

'কথা কমিয়ে আনতে আনতে শেষে এক কথায়, চূড়ান্ত কথায় না চলে আসো।'

'বারে-বারে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছ কেন? চাও নাকি যে বলে ফেলি?'

'রক্ষে করো।' পরে মুখে নির্লিপ্ততা আনল হেমেন: 'তবে ঝগড়ার মধ্যে মৌখিক কথাটা শুনলে চমকাবে মাত্র, বিশ্বাস করতে চাইবে না। বেশি কিছু বললে দলিল দেখতে চাইবে। তা যাক গে, আজ কথাটা কী নিয়ে? তেতলার ঘরে কে থাকবে?'

'তেতলার ঘরে কে থাকবে তা তো ঠিক হয়েই আছে।'

'ঠিকই হয়েই আছে? কে থাকবে?'

'কে আবার! আমি।' পা ছড়াল বিজয়া: 'বাড়ির নীচতা আর সইব না কিছুতেই।'

'নীচতা মানে নিচে, নিচের তলায় থাকা তো?'

বিজয়া কথা কমাল। চোখের দৃষ্টিটাকে খোলা পৃষ্ঠায় রাখতে চাইল স্থির করে।

'আর যিনি সম্পর্কের উচ্চতার খাতিরে থাকতে চান উপরে?'

'তারই তো পরীক্ষা আজ সংসারে। মান বড়, না ধন বড়?' চোখ না তুলেই সংক্ষেপে বলল বিজয়া।

'যাক গে, সে নিয়ে যখন আজকের ঝগড়া নয়। বলো না আজকের ঝগড়াটা কী নিয়ে?

'দিদি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আমাদের কোন গুণ নেই। যেহেতু আমরা বি-এ এম-এ নই, চাকরি করে পয়সা রোজগার করতে পারি না, যেহেতু আমরা না জানি নাচতে বা গাইতে বা ছবি আঁকতে বা সভা-সমিতি করতে—'

'তাই বড় বউমার মুখখানা ম্লান দেখলাম। একসঙ্গে তোমাদের দু-জনকে ব্র্যাকেট করেছে—'

যত গুণ শুধু তাঁর নিজের আর তাঁর ছোট বউয়ের!'

'তোমার গুণ নেই, রূপ কিছু আছে তো? আজকাল তো রূপও গুণ। রূপ

লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। কিন্তু তোমার গুণ নেই এ কে বলে? বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রধান ধারক তুমি, যত সিনেমা হয় সব তুমি দেখ, যত সিনেমার কাগজ বেরোয় সব তুমি পড়ো, যত ফাংশন হচ্ছে সর্বত্র তুমি টিকিট কাটো, তোমার গুণ নেই? এর নিদারুণ প্রতিবাদ করা উচিত।'

কথা বলল না বিজয়া।

'কিন্তু ছোট বউয়ের কথা কী বলছিলে?' হেমেন মনোযোগে তীক্ষ্ণ হল: 'তাকে তো বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাকে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তার আবার গুণ কী!'

'কাকলির কথা কে বলছে?' আবার পা গুটোল বিজয়া: 'এ হচ্ছে বিনতার কথা। যিনি ছোট বউ ছিলেন তিনি নন, যিনি ছোট বউ হবেন তিনি।'

'বিনতা! ও, হ্যাঁ, কিন্তু তার গুণ কেন?'

'দিদির মতে যারা আফিসে কাজ করে তারা সব খারাপ! খারাপ মানে রুক্ষ, দুর্বিনীত। কিন্তু যারা ইস্কুলে মাস্টারি করে তারা বেশ ভদ্র, বাধ্য। পবিত্র পরিবেশে মহৎ ব্রত উদযাপন করছে বলে ওদের বাক্য ও ব্যবহারে স্নিগ্ধতার লাবণ্য ঝরে পড়ছে। ওরাই সত্যিকার গুণী। সংসারকে স্বর্গ করবার সত্যিকার কারিগর। গুণের ফিরিস্তি দিয়ে পঞ্চমুখে শেষ করতে পারছে না দিদি। আমি বললাম, মাস্টারের কত গুণ তা জানা আছে। মাস্টারও যা ব্ল্যাক বোর্ডের ডাস্টারও তাই।'

'ও! এই বিয়ের কথাই বুঝি বলতে এসেছিল স্বকু—' বেশ উচ্চঘোষেই বলল হেমেন।

কোথায় বলতে এসেছিল?'

'আমার আফিসে। আজ— এই তো, এই কতক্ষণ আগে।'

'কী বললে স্বকু?'

বললে, তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, কনেকে আমরা যেন একদিন আশীর্বাদ করে আসি। বলতে বলতে ইচ্ছে করেই ঘরের বাইরে চলে এল হেমেন।

'তুমি কি বললে?' উত্তেজনায় বিজয়াও বাইরে এল।

'আমি ওর কথায় বেশি গা করলাম না। বললাম, তুই বিয়ে করছিস তো করবি, তাতে আমাদের সংস্রব কী! আমাদের কাছে আবার সাহায্য কিসের! তোর নিজের বাছা মেয়ে, তোর একার দায়িত্ব—এতে সংসারকে টানা কেন?'

'ও মা, সে কী কথা!' প্রত্যাশিত পদক্ষেপে নেমে এল মৃণালিনী: 'এ ওর নতুন বিয়ে, এ বিয়েতে সংসার আসবে না তো কী!'

'কেন, হোটেল, ওর হোটেল কী করতে আছে!' টিটকিরি দিয়ে উঠল হেমেন।

'যে অবস্থার জন্যে হোটেল সে তো শেষ হয়ে গিয়েছে! এখন নতুন বিয়ে, নতুন পত্তন। তাই সংসারও আবার নতুন করে আরম্ভ।'

'তা হলে বলতে চাও এই বাড়ি থেকেই স্বকুর বিয়ে হবে?'

'নিশ্চয়, এক শো বার।' মৃণালিনী গলা চড়াল: 'আর বিয়ে করেও বউ নিয়ে উঠবে এই বাড়িতে। তেতলার ঘর নিয়ে খুব দ্বন্দ্বে পড়েছিলে না? এই তেতলার ঘরে স্বকু থাকবে নতুন বউ নিয়ে।'

'কোন নিয়মে?' ফোঁস করে উঠল বিজয়া: 'ঘর তৈরি করবার টাকা দিলাম আমরা আর তাতে বাস করবেন নতুন বউ! আর রাজ্যে বামুন নেই—'

'টাকা সমস্ত দিলিই বা, কিন্তু স্বকু তোর নিজের ছেলের মত, সে বিয়ে করে বউ আনছে তাকে একটু সুখশান্তি দিতে তোর বুকটা ফেটে যাবে?'

'স্বকুকে দিতে ফাটবে কেন?' পালটা জবাব দিল বিজয়া: 'কিন্তু তার নতুন বউ উড়ে এসে জুড়ে বসবে মাথার উপরে, এ সইবে না। যদি কাকলি আসত হাসিমুখে ছেড়ে দিতাম।'

'তার কথা আলাদা।' বন্দনাও স্বীকার করল একবাক্যে।

'যা হয় না, হবার নয়, তা ভেবে লাভ কী! যা ছাই হয়ে গিয়েছে তাকে উড়িয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।' বললে মৃণালিনী, 'যে নতুনের নামজারি করতে আসছে তাকেই উচিত সংবর্ধনা করা।' ততক্ষণে কোর্ট থেকে ভূপেনও চলে এসেছে। তার দিকে একবার আর হেমেনের দিকে অনেকক্ষণ করুণ চোখে তাকিয়ে রইল: 'যদি আবার ও বউ নিয়ে ঐ ছোট ঘরটাতে থাকে তা হলে আবার ওদের ছাড়াছাড়ি হবে। তোমরা আপনার লোক হয়ে, অভিভাবক হয়ে, ওর মঙ্গল দেখবে না?'

কার আবার বিয়ে, কার আবার ছাড়াছাড়ি! ভূপেন হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'স্বকু আবার বিয়ে করছে—সেই কথা।' হেমেন ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'আপনি হাতমুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে শান্ত হোন, আমি সব বলছি।'

'স্বকু—স্বকু কোথায়?' ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

'বাড়ি আসে নি এখনো। আসবে। আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আমার আফিসে—হ্যাঁ, আজ, দুপুরবেলা—'

'কই, কই কাকা!' তার বেড়াল তাড়াবার ছোট্ট লাঠিটা নিয়ে নেমে এসেছে সেন্টু: 'আমি তার ঠ্যাং ভেঙে দেব। কথা ছিল একজামিন হয়ে গেলে কাম্মাকে

৫৯৯

নিয়ে আসবে। তা কাম্মাকে না এনে বউ নিয়ে আসছে! কোথায় বউ? দাঁড়াও—' লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগুতে লাগল সেন্টু।

হাত বাড়িয়ে বিজয়া তাকে লুফে নিল। বললে, 'তোর কাকা আর তার নতুন বউ কেউ আসে নি।'

'কিন্তু কাম্মা? কাম্মা আসবে না?'

'আসবে।'

'কবে আসবে?'

'তার একজামিনটা আগে শেষ হোক—'

'কবে শেষ হয়ে গেছে! একজামিন বুঝি এত দিন ধরে চলে! তুমি কিচ্ছু জানো না।' বিজ্ঞ মুখে বিষাদ মাখাল সেন্টু: 'আন্টি ইস্কুলে আমাদের একজামিন নিলে—ওয়ান থেকে টেন লেখো—এক দিনেই তো শেষ।' বিজয়ার চিবুক ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে: 'সেই যে সেবার আমাকে কাম্মার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে, অমনি আবার আরেক দিন নিয়ে চলো না—'

'তার বাসা এখন কত দূরে তা কে জানে।'

'বেশ, আমাকে না নাও, তুমিই একদিন নিজে গিয়ে জেনে এসো না কবে তার একজামিন শেষ হবে, কবে আসবে বাড়ি, কবে আমাকে কোলে নেবে।' আবার বিজয়ার চিবুক ঘোরাল সেন্টু: 'যাবে একদিন বিজু?'

'যাব।'

নিরিবিলিতে বৈঠকখানায় ভূপেনের কাছে গিয়ে বসল হেমেন। বললে সমস্ত কথা।

নিজের ঘরে আফিসে বসে কাজ করছে, বেয়ারা কার্ড নিয়ে এল। কে? ভুরু কুঁচকে নাম দেখল হেমেন। এ কোন সুকান্ত বসু? আর কে! আমাদেরই শ্রীমান। ঘরে ঢুকে নত হয়ে প্রণাম করে বসল চেয়ারে।

'তুই? তুই কী মনে করে? ভালো আছিস?' হেমেনের সংবর্ধনাটা খুব মোলায়েম শোনাল না।

খানিকক্ষণ আমতা-আমতা করে সুকান্ত বললে, 'একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি—'

'কী ব্যাপার?'

তবুও বিশদ হয় না সুকান্ত। গাঁইগুঁই করে।

'মানে, কোনো বিপদ? চাকরি নিয়ে গোলমাল? অর্থাভাব? বলবি তো বিপদটা কী!'

'ঠিক বিপদ নয়। বিয়ে।'

'বিয়ে? তোর বিয়ে? তোর বিয়ে তো এখানে কী! কার সঙ্গে বিয়ে?'

'সেই যে কাকলি মিত্র—'

'কে কাকলি মিত্র?' খেঁকিয়ে উঠল হেমেন।

'সেই যে আপনার ছোট বউমা।' মাথা চুলকোতে লাগল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোট বউমা। কই, এসেছেন এখানে?' চঞ্চল হয়ে চেয়ার ঠেলে উঠতে চাইল হেমেন।

'না, না, আসে নি।' গম্ভীর স্বরে নিরস্ত করল সুকান্ত।

উদ্বেগমাখানো মুখ নিয়ে হেমেন বললে, 'কেন, তার কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

'তবে তার কথা ওঠে কেন?'

'ওঠে', আবার কান চুলকোতে লাগল সুকান্ত, 'তার সঙ্গে আমার বিরোধটা মিটে গেছে।'

'তা তো যাবেই।' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল হেমেন: 'তা ছাড়া বিরোধ কোথায়? শুধু তো একটা জেদ, গোঁয়ারতুমি, শুধু ঘাড়টা মোটা করে শক্ত করে থাকা। শুধু একটা সাময়িক সংকীর্ণবুদ্ধি। মিটে গেছে! বেশ, ভালো কথা। টুটলেই বিষ, মিটলেই মধু। তা এখন, মিটে যাবার পর?'

'আমরা মিলতে যাচ্ছি।'

'সে তো খুবই স্বাভাবিক। তা আমাকে কী করতে হবে?'

'কিছু করতে হবে না। আপনাকে জানিয়ে দিলাম।' ওঠবার ক্ষীণ চেষ্টা করল সুকান্ত।

'শুধু একটা সংবাদ দিলি? বেশ, সুখের কথা। বিয়েটা হবে কোথায়?'

'কাকলির বাপের বাড়িতে। ওদের সঙ্গেও বিরোধটা মিটে গেছে।'

'বা, চারদিকেই মেটামিটি। তারপর বিয়ে করে বউ নিয়ে উঠবি কোথায়? থাকবি কোথায়?'

'তা একটা ভালো ফ্ল্যাট দেখে নেব। এখন দু-জনের চাকরি—'

'ছোট বউমাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে উঠবি? তুই এই খবর দিতে আমার কাছে এসেছিস? গেট আউট। গেট আউট। আমার সমুখ থেকে এখুনি বেরিয়ে যা বলছি—'

লোকজন ছুটে আসতে চাইল চারপাশ থেকে। সুকান্ত একেবারে থ।

'তুমি এবার সত্যি-সত্যি ভাঙবি আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। আর তোর জন্যে তোদের জন্যে আমরা বাড়ি কিনছি, তেতলায় ঘর তুলছি।'

'তেতলায় ঘর?' উঠি-উঠি করছিল সুকান্ত, বসে রইল।

'হ্যাঁ, সকলের মাথার উপরে। হ্যাঁ, পৃথিবীর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাথার উপরে আমাদের, ভারতবর্ষের এই একান্নবর্তী পরিবার। সেই প্রতিষ্ঠানে তোরা কুড়ুল মারবি? কই, ছোট বউমা কোথায়? তাঁকে নিয়ে এলি না কেন সঙ্গে করে? তাঁরও কি সেই মত? ছোট একটা স্বার্থের অন্ধকূপে হাত পা গুটিয়ে বাস করা? এমন একটা গাছ পোঁতা যার শুধু কাণ্ডটাই আছে, শাখাপ্রশাখা নেই, পুষ্পপল্লব নেই, যার কোলে ছায়া নেই একবিন্দু। বল, সেই সংসারে থাকবি যেখানে সেন্ট্‌ নেই, নাতি-নাতনি নেই, নাতিনাতনির আনন্দ নেই। ক্ষমা নেই, উদারতা নেই, স্বার্থত্যাগ নেই, অক্ষমকে রক্ষা করবার, অমানীকে মান দেবার সাধনা নেই! তবে বসে আছিস কেন? উঠে যা। একটা শূন্য পুরীতে আজকের দুই যুবক-যুবতীর দুটো অন্ধপ্রায় জরাজীর্ণ বুড়ো-বুড়ি হয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াবার স্বপ্ন ছাখ। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে বাসা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে আর তোরা দু-জনে অশক্ত অথর্ব হয়ে বুক চাপড়াচ্ছিস—'

'কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলেই তো ক্ষুদ্রতা—'

'ক্ষুদ্রতা না থাকলে উদারতা দেখবার অবকাশ কোথায়? আঘাত-অপমান আছে বলেই তো ক্ষমার অস্তিত্ব। শত্রুতা আছে বলেই তো পরোপকারের মহিমা। কার্পণ্য আছে বলেই তো আত্মত্যাগের ঔজ্জ্বল্য। বিরোধ আছে বলেই তো নিষ্পত্তির শান্তি। নইলে ওসব মহৎ গুণ মানুষ দেখাবে কোথায়? মানুষ বড় হবে কি করে?'

'তবে যখন বলছেন, সুকান্ত আবার মাথা চুলকোল: 'বাড়িতেই ফিরে যাব। এখন তবে উঠি।'

তখন আবার সুকান্তকে ধরে রাখতে চায় হেমেন। কি করে কী হবে তার খুঁটিনাটি পরামর্শ করে। সন্দেশ এনে খাওয়ায়। নিজেও গোটা দুই একসঙ্গে মুখে পোরে।

'ঠিক করেছি আগে আমরা মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাব।' ভূপেনকে বললে হেমেন, 'পরে বিয়ের দিন পাকা হলে সুকান্ত বাড়ি আসবে।'

ভূপেন হাসতে লাগল।

বিজয়াকে ঘরের নিরিবিলিতে নিয়ে হেমেন বললে: 'তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না,

ধন বড় না মান বড়, তারই পরীক্ষা হবে সংসারে? পরীক্ষা হয়ে গেছে। সকলের চেয়ে সব কিছুর চেয়ে বড় হচ্ছে ভালোবাসা।'

'ভালোবাসা?'

'হ্যাঁ, তেতলার ঘর। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়েছে। কে বলে তোমার গুণ নেই?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'সুকান্ত কাকলিকে নিয়ে আসছে ফের বিয়ে করে।'

'সত্যি?' আনন্দে বিহ্বল হল বিজয়া : 'শাঁখ বাজাব?'

'ফুঁ কী, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না। আগে মেয়েকে পাকা দেখে আসি। বউদিকে দেখাই। কি, কি গো, কার এখন তেতলার ঘর?'

'ভালোবাসার। সুকান্ত-কাকলির।'

কোথায় তবে এই উদারতা দেখাবার অবকাশ! অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দিত হবার!

৫৮

এখানেও নরনাথই এসেছে তদবিরে।

'আমার দাদা বনবিহারী মিত্তির পাঠালেন আমাকে।' ভূপেনের বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে বললে নরনাথ।

বনবিহারী কোনো জুনিয়র উকিল-টুকিল হবে এমনি আঁচ করল ভূপেন। 'কে বনবিহারী?'

'আপনার দ্বিতীয় পুত্র যাকে বিয়ে করছে তার বাবা।'

'আরে কী আশ্চর্য, আসুন, বসুন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভূপেন। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ডেকে আনল হেমেনকে।

'শুভদিন তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে হয় এবার।' বললে নরনাথ।

'হ্যাঁ, যত শিগগির হয়।' বললে হেমেন, 'মানে, যত শিগগির পাত্রপাত্রীরা ঠিক করে।'

'তা তো ঠিকই। আরেক কথা,' নরনাথ ঘাড়ের উপর হাত বুলোল : 'দাদা বলছিলেন আপনাদের কোনো দাবি-দাওয়া আছে কিনা।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল হেমেন: 'পাত্রপাত্রীরা যেখানে স্বেচ্ছায় মিলিত হচ্ছে সেখানে আবার দাবি-দাওয়া কী! ভজনও করবে আবার ভোজনও মারবে এ হয় না।'

'কিছু বলা যায় না মশাই।' গম্ভীর হল ভূপেন: 'সব আমার স্ত্রী জানেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানাব আপনাদের।'

'জানাবেন। আরেকটা কথা।' নরনাথ নাকের ডগা চুলকোতে লাগল. 'আপনারা কি মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবেন?'

ভূপেন আর হেমেনের মধ্যে দ্রুত একটা চোখ তাকাতাকি হল। প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল দু-জনে: 'কী দরকার!'

হেমেন আরো একটু বিশদ হল: 'ওদের নির্বাচনে আমরা যখন সম্মতি দিলাম তখনই তো হয়ে গেল আশীর্বাদ।'

'বেশ। এখন, আরেকটা কথা, বলতে পারেন, শেষ কথা।' নরনাথ এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল: 'বিয়ের পর ওরা কি এ বাড়িতে থাকবে?'

'তা না হলে কোথায় থাকবে?' হেমেনকে কেমন কাঠখোট্টা শোনাল।

'এ বাড়িটাতে যথেষ্ট জায়গা নেই বলে শুনেছি।'

'রাখুন।' হেমেন নিজের বুকের উপর হাত রাখল: 'যদি প্রাণ থাকে তা হলে স্থানও আছে। কেন, ওরা কিছু বলছিল নাকি?'

'না, তেমন কিছু শুনি নি পস্টাপষ্টি।' নরনাথের হাত এবার উঠে এল কানের পিঠে: 'তবে আধুনিক ছেলেরা বিয়ের পর আলাদা হয়ে যেতে চায় তো।'

'আমরা দেব না যেতে। যতদিন পারি ততদিন পরিবারের একান্নবর্তিতা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করব। আমাদের সব ঐতিহ্য সব বৈশিষ্ট্য চলে যেতে বসেছে কিন্তু পারিবারিক সংহতির যে আদর্শ এতদিন চলে আসছিল তা আমরা পারতপক্ষে ক্ষুণ্ণ হতে দেব না।'

'কী করে রাখবেন?' নরনাথ বললে, 'অর্থনৈতিক কারণেই তো ভেঙে যাচ্ছে।'

'অর্থনৈতিক কারণে তত নয়, যত স্বার্থনৈতিক কারণে। অকর্মণ্য হয়ে একজন আরেকজনের ঘাড়ে বসে খাবে এ অন্যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন অক্ষমকে আর সকলে সাহায্য করবে না, পৃথক করে দেবে, এ অন্যায়ের চেয়েও অন্যায়।'

'তা হলে বার্ধক্যে আমরা পুত্রবধূর সেবা পাব না?' ভূপেন বললে।

'পাব না নাতিনাতনির মাধুর্য? গৃহ শুধু একটা গুহা হয়ে থাকবে? দুপুরবেলা

খাওয়া-দাওয়ার পাট উঠে যাওয়ার পর অতিথি এলে তাকে ছুটো ফুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে না ?'

'না, না,' কথা পালটে নিতে চাইল নরনাথ : 'যৌথ পরিবার বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তো ভালোই। সবাই যদি মিলে-মিশে থাকতে পারে তা হলে আর কথা কী!'

'যাকে আধুনিক রাজনীতির ভাষায় বলতে পারেন সহাবস্থান।' হেমেন বললে।

'পঞ্চশীল ?'

'পঞ্চশীল তো নয়, পঞ্চশূল। আর সব চেয়ে দীর্ঘ শূলটার নামই ক্ষুদ্রতা। চিত্তদারিদ্র্য।' হেমেনের স্বর তপ্ত হয়ে উঠল : 'যে জ্যেষ্ঠ সেই কর্তা হবে নিঃসন্দেহ, যদি সে, অভিমানে নয়, সানন্দে না দাবি ছাড়ে। যে কর্তা সে অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা পাবে সকলের, কিন্তু শ্রদ্ধা, জানেন তো, আপনাআপনি আসে না, আকর্ষণ করে নিতে হয়। আর সে আকর্ষণ সহজ হয় সেই ক্ষেত্রে যেখানে কর্তা উদার, ত্যাগস্বীকারে সম্মত। এখানে কর্তা কথাটা কিন্তু জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট অনুসারে বুঝতে হবে। কর্তা ইনক্লুডস কর্ত্রী। নইলে কর্তা যদি ক্ষুদ্রাত্মা হয়, যদি একা তার পাতেই মাছের মুড়ো পড়ে, মানে যদি নিজের কোলের দিকেই অনবরত সে ঝোল টানে, নিজের ছেলেটিকে নন্দদুলাল ভেবে জায়ের ছেলেটিকে নাড়ুগোপাল ভাবে—তা হলেই সর্বনাশ। তা হলেই সংসারে আর লক্ষ্মী নেই, আছে শুধু তার বাহনের চিৎকার।'

'এই লক্ষ্মীর সংসার হবে কিসে ?' উঠতে উঠতে নরনাথ শুধোল।

'শুধু বউয়ের গুণে।' বললে হেমেন।

'শুধু বউয়ের ?' উঠে পড়ল নরনাথ।

'হ্যাঁ, ছেলে যতক্ষণ একা থাকে ততক্ষণ সমস্যা কোথায় ? বউ নিয়ে এলেই তখন স্থান সংকুলানের কথা। যে এতকাল দার হয়ে দীর্ণ করেছে ভেদ করেছে, সে এখন দ্বার হয়ে রক্ষা করবে, রোধ করবে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, হেরে যাবে না। এই হবে তার হাতের লোহা, মাথার সিঁদুর।'

'তেমন মেয়ে কোথায় আর আজকাল ?' নরনাথ টেবিলের ধার থেকে সরে এল।

'না, না, আছে, আছে।' ভূপেন বলে উঠল : 'ধৈর্যের প্রতিমা। স্নিগ্ধ অথচ তেজস্বিনী। আছে, আছে।'

'থাকুক বা না থাকুক, সে আমাদের কোনো সমস্যা নয়।' হেমেনও উঠে পড়ল : মোটকথা, আমরা কিছুতেই আমাদের দুর্গ, আমাদের যুক্ত পরিবার ভাঙতে দেব না। যদি ভাঙেও কোনোখানে, তা আবার জোড়া লাগাব। নাতির সঙ্গে সোনার থালায় ভাত খাব আমরা। নইলে অমাদের কিসের কেরামতি।'

'বেশ, ভালো কথা, সুখের কথা।' নমস্কার করে বেরিয়ে গেল নরনাথ।

হেমেনও বেরুচ্ছিল, তার আগেই ঢুকে পড়ল মৃণালিনী।

'মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের কেউ এসেছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ, কাকা এসেছিল।' হেমেন কেটে পড়তে চাইল।

'আশীর্বাদের কথা কী বলছিল?' ভূপেনের দিকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত হল মৃণালিনী।

'বলছিল আশীর্বাদ করতে যাব কিনা।'

'আর শুনলাম তুমি 'না' করে দিলে।'

'হ্যাঁ, কী দরকার আর ওসব হাঙ্গামার। ওরা যখন পরস্পরে সম্মত হয়েছে—'

'না,' ধমক দিয়ে উঠল মৃণালিনী: 'আশীর্বাদ করতে হবে বৈকি। তুমি দিন ঠিক করে ওদের খবর পাঠাও, হবে আশীর্বাদ। এইসব অনুষ্ঠান হয় না বলেই পরে সব নষ্ট হয়ে যেতে চায়। আশীর্বাদের বদলে দেখা দেয় অভিশাপ হয়ে।'

'তা বেশ, খবর পাঠাব। আমি আর হেমেন গিয়ে পাকা দেখে আশীর্বাদ করে আসব।' ভূপেন বলল।

'সঙ্গে আমিও যাব।'

'তুমি যাবে কী! শাশুড়ী কখনো যায় পাকা দেখতে?'

'রাখো। ছাড়ো ওসব সেকেলেপনা। পারলে শাশুড়ি বরযাত্র যায়, আর এ তো শুধু পাকা দেখা। জানো সেদিন নীরেনবাবুর ছেলের বউভাতে গিয়েছিলাম, শাশুড়ির ডিরেকশানে ছেলের বউ অন্ন-নৃত্য নাচল—'

'অন্ন-নৃত্য?' হেমেন হাঁ হয়ে রইল।

'তুমি তো কোনোখানে যাও না, গেলে দেখতে পেতে।' মৃণালিনী হাত-মুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগল, 'স্ত্রী-পুরুষ খেতে বসেছে, সামনে স্টেজ বাঁধা। যে বউ হয়ে এসেছে সে নামকরা নাচুনী, বিজয়া নাম বলতে পারবে। নিমন্ত্রিতদের সেই নাচ না দেখালে চলে কি করে, কি করে শাশুড়ির মান বাড়ে! শাশুড়ি বললে, যদি দুর্ভিক্ষ-নৃত্য হতে পারে, অন্ন-নৃত্য হবে না কেন?'

'ঠিকই তো।' সহজেই সায় দিল ভূপেন।

'সুতরাং ওসব সেকেলে নিয়ম চলবে না। আমিই যাব অগ্রণী হয়ে। সোনার সাত লহর হার দিয়ে আশীর্বাদ করব। কী যেন তুমি প্রশংসা করছিলে মেয়েটির!' ভূপেনের দিকে তাকাল মৃণালিনী: 'কিসের যেন প্রতিমা বলছিলে?

'প্রতিমা? কিসের প্রতিমা?' সাহায্যের জন্যে হেমেনের দিকে তাকাল ভূপেন।

'ও, হ্যাঁ, লক্ষ্মীর প্রতিমা।' মৃণালিনী নিজেই মনে করতে পারল: 'নামটিও বিনতা। সুন্দর নাম।'

'বিনতা?' আঁতকে উঠল হেমেন: 'সে তো মহাবিহঙ্গমের মা।

'মা?' ঘা খেয়ে যেন বসে পড়ল মৃণালিনী: 'সে কুমারী। কী জানি মেয়ে-ইস্কুলটার নাম, সেখানে সে চাকরি করে। একটা ভদ্র উচ্চশিক্ষিত মেয়ের নামে যা-তা একটা কলঙ্ককথা বললেই হল?'

'আহা, ঠাট্টা বোঝো না কেন?' ভূপেন বললে, 'মহাবিহঙ্গম মানে বড় পাখি। সব চেয়ে বড় পাখি কে? গরুড়। আর ঐ গরুড়ের মায়ের নামই বিনতা।'

'এ যে গাঁট্টা মেরে ঠাট্টা। এরকম ঠাট্টা ভালো নয়। যে বাড়ির বউ হয়ে আসবে তার সম্বন্ধে এসব কী কথা! আর শোন,' মৃণালিনীর মুখ থমথমে হয়ে উঠল: 'আরেকটা কথা বলে রাখছি।'

'বলো।' ভূপেন ঘাড় কাত করল।

'তেতলায় যে ঘর উঠেছে—'

'এখনো সম্পূর্ণ ওঠে নি, প্রায় হয়ে এসেছে বলতে পারো।' হেমেন সংশোধন করতে চাইল।

'ঐ হল। বিয়ে হতে হতে তৈরী হয়ে যাবে। ঐ ঘরে কিন্তু নতুন বউ থাকবে।'

'কোন আইনে?' প্রায় রুখে উঠল ভূপেন।

'আইন তুমি বোঝো গে যাও। আমার ইচ্ছে সমস্ত আইনের চেয়ে বড়। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ এ বাড়িতে একমাত্র আমার কথাই চলবে। আর কারো কথা নয়।

'না, না আগে যেমন ছিল তেমনি সুকু আর তার বউ থাকবে দোতলায়।' ভূপেন দৃঢ় হবার চেষ্টা করল।

'তা হলে তেতলার ঘরে? সেখানে তুমি থাকবে?' দাঁতে দাঁত লাগাল মৃণালিনী।

'না।' কঠিন হল ভূপেন: 'যাদের এ বাড়ি তারা থাকবে।'

'কাদের এ বাড়ি? মানে, বাড়িওলারা?'

'বা, তা কি করে হয়? যারা এ বাড়িটা কিনেছে, মানে হেমেন আর বিজয়া, তারা থাকবে।'

'মানে, ঠাকুরপো এই সম্পূর্ণ বাড়িটা কিনে নিয়েছে?' চোখে যেন অন্ধকার দেখল মৃণালিনী: 'শুধু তেতলায় ঘর তোলবার খরচ দেওয়া নয়, সমস্ত বাড়িটাই সাকুল্যে কিনে নিয়েছে?' অসহায় চোখ ফেলল হেমেনের উপর।

'সমুদয় কিনে নিয়েছে। মোট দাম আশী হাজার।' ভূপেনের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'কত বড় কথা! হেমেন বাড়ির মালিক হয়ে গেল।'

'আর তুমি?' দুহাতের দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মৃণালিনী মুখ খিঁচিয়ে উঠল: 'তুমি কী হলে?'

'আমার কোন পরিবর্তন নেই। যা ছিলাম তাই রইলাম। নিস্পৃহ গলায় ভূপেন বললে, 'যে ভাড়াটে সেই ভাড়াটে।'

'আমরা ঠাকুরপোর ভাড়াটে হয়ে গেলাম?' শোকের স্বর বার করল মৃণালিনী।

'তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কী হল?' ভূপেন আশ্বস্ত করতে চাইল: 'ওপর-ওপর স্বত্বের কী আদল-বদল হয় না হয় তাতে আমাদের কী এসে যায়? আমরা যেমন গুনছিলাম তেমনি ভাড়া গুনে যাব। আগে ভাড়া দিতাম এক জমিদারকে, এখন থেকে দেব হেমেনকে। আমাদের পক্ষে একই কথা। হরে দরে হাঁটুজল।'

'তা হলে,' আতঙ্কে চোখ কপালে তুলল মৃণালিনী: 'ঠাকুরপো যদি উচ্ছেদের নোটিশ দেয় আমাদের উঠে যেতে হবে?'

'উপায় কী তা ছাড়া? তাই যাতে ঝগড়া-টগড়া না করো, কর্তৃত্ব একটু কম ফলাও, ওদের একটু মন মজিয়ে চলো—'

'অসম্ভব। তুমি এখুনি অন্য বাড়ি দেখ। নোটিশ দেবার আগেই যাতে মানে মানে সরে পড়তে পারি।'

'আমরা বেঁচে থাকতে কি আর নোটিশ দেবে? ছোট থেকে বড় করে তুলেছি, মানুষ করে তুলেছি, ও কি কৃতঘ্নতা করবে? কি রে, করবি?' হেমেনের দিকে তাকাল ভূপেন।

হেমেন মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

'কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আজকের শুভবুদ্ধি কালকে দুষ্টবুদ্ধি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলো।'

'আগে ওরা অন্যত্র যেতে চাইত, এখন উলটে তুমি চাইছ।' ভূপেনও হাসল: 'কিন্তু আমাদের সাধনা একত্র হয়ে থাকবার সাধনা। ব্যক্তির স্বার্থকে সমষ্টির মঙ্গলে পরিণত করার সাধনা। দায়ে পড়ে নয়, শুধু আনন্দে প্রীতিতে নিজের ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দেওয়া।'

'রাখো।' আবার ধমকে উঠল মৃণালিনী: 'সংসারে যার যেমন হাতের তাস। ভাগ্যের খামখেয়ালিতে কারু হাতে বা টেক্কা, কারু হাতে বা দুরি-তিরি। রঙের টেক্কা কেউ পাশায় না, পাশানো যায় না। না চাইলেও টেক্কার গুণেই পিঠ উঠে

আসে। ভাইয়ের তুল্য যেমন মিত্র নেই তেমনি আবার ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই। সুতরাং ভাইয়ের উপর নির্ভর না করে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও।'

'আমার একার সামর্থ্য কোথায়?' হাত-পা-ছাড়া গলায় ভূপেন বললে।

'তা হলে সুকুকে ডাকো। ও যেখানে ওর বউকে নিয়ে থাকবে সেখানেই এক পাশে আমি ঠাঁই করে নেব। তুমি থাকো তোমার ভাইয়ের গোয়ালে।'

'তোমার ছেলে, তুমিই তাকে খবর দাও।' ভূপেন মুখ ফেরাল।

'তাই দেব।'

দুর্ধর্ষ ঘাই মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মৃণালিনী, হেমেন পথ আটকাল। হাসিমুখে বললে, 'শোনো, সব কথা বলা হয় নি। দাদা কিছু কম করে বলেছেন।'

মৃণালিনী থামল।

হেমেন বললে, 'বাড়িটা সত্যি কেনা হয়েছে নগদ আশি হাজারে। কিন্তু ক্রেতা শুধু একা আমি নই, ক্রেতা আমি আর দাদা দু-জনে, সমানাংশে।'

'সত্যি?' মৃণালিনী দশ দিক আলো করে ঝলমল করে উঠল।

'তোমাকে দলিলটা দেখাই। দলিল না দেখলে তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না।'

পাশের ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে দলিল বার করে আনলে হেমেন। মৃণালিনীর হাতে দিয়ে বললে, 'এই দেখ ক্রেতাদের নাম, অংশ আট আনা করে। পড়ে তর্জমা করে বুঝিয়ে দেব তোমাকে?'

'বুঝেছি, যখন বলছ। কিন্তু উনি চল্লিশ হাজার টাকা পেলেন কোথায়?'

'শোনো। মূলে সমস্ত টাকাটাই আমার। ধরো আমি ওঁকে এই চল্লিশ হাজার টাকা দান করেছি—ছোট হয়ে বড়কে কি দান করা যায় না? খুব যায়। দেবতাকে যদি দেওয়া যায় তা হলে দাদাকেও। কিংবা ধরো ঐ টাকাটা উনি আমার কাছ থেকে ধার করেছেন। যদি ছেলেরা পারে যেন শোধ দিয়ে দেয়। যদি না পারে তাতেও ক্ষতি নেই। যেহেতু ঐ ছেলেরা আমারও ওয়ারিশ। আমার যা থাকবে না-থাকবে শেষ পর্যন্ত ওরাই পাবে।'

'কিন্তু আসলে দলিলে লিখেছ কী?' বাস্তবের গলায় জিজ্ঞেস করল মৃণালিনী।

'লিখেছি, আমিই চল্লিশ হাজার টাকা ধারতাম দাদার কাছে। এই কবালায় সেই ঋণ থেকে মুক্ত হলাম আর সমান অংশে দু-জনে, দাদা আর আমি, স্বত্ববান হলাম বাড়িতে। কি, এই ব্যবস্থাটা ভালো হল না? সমান অধিকারের ব্যবস্থা। কেউ কারো অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকবে না, সবাই এক নৌকোর সোয়ারী হয়ে পাল তুলে দেবে। উঠবে নতুন আরেক সমৃদ্ধির বন্দরে।'

'কিন্তু যদি বেনামীর কথা ওঠে ?' অনেক তলাতে পারে মৃণালিনী।

'কে তুলবে সেই প্রশ্ন ? আমার অবর্তমানে বিজয়া তুলবে ? তুলে তার লাভ কী, যাবে কোথায় ? তার নিজের বলতে তোমরা ছাড়া, প্রশান্ত-সুকান্ত ছাড়া আছে কে ? তোমাদেরকে আঁকড়েই তাকে বাঁচতে হবে যদি অবশ্য পুণ্যবলে সধবা না যায়। তার জীবদ্দশায় তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই এই বাড়ি কেনা, সকলকেই নিশ্চিন্ত করার জন্যে। আর আমাদের কে হটায়, কে আমাদের ঘর ভাঙে ?'

'আর বাড়িভাড়া ?'

'কে দেবে ? কাকে দেবে ? ভূপেন বললে, 'বাড়িভাড়ার দফা রফা।'

'তা হলে তো খুব ভালো।' উথলে উঠল মৃণালিনী। মমতাময় চোখে তাকাল হেমেনের দিকে : 'এতই যখন ছাড়লে তখন তেতলার ঘরটা সুকু আর তার বউকে ছেড়ে দিতে পারো না ?'

'যে ঐ ঘর দাবি করছে সেই বিজয়াকে জিজ্ঞেস করো।'

বিজয়াকে ডাকল মৃণালিনী। দরজার বাইরে প্যাসেজের কাছটায় বিজয়া এসে দাঁড়াল। মৃণালিনী তার কাঁধে হাত রাখল। রাখতেই দু-জনে আট আনা আট আনা হয়ে গেল। মৃণালিনী বললে, 'আমাদের দু-জনেরই যখন সমান স্বত্ব তখন ঐ তেতলার ঘরের দাবি আমরা একত্রে ছেড়ে দিলাম। ঐ ঘরে সুকু আর বিনতা থাকবে।'

'বা, সুকু আর তার বউয়ের জন্যেই তো ঐ ঘর উঠেছে।' সোহাগে গলে গিয়ে বললে বিজয়া।

হেমেন বললে, 'সুকুকে খবর পাঠাব ?'

মৃণালিনীর মুখ স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে : 'আর কী দরকার !' তারপর স্পষ্ট প্রসন্নতা ফুটে উঠল : 'সর্বসমস্যার সমাধানই তো হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, হয়ে গেল, তবু—' মাথা চুলকোল হেমেন : 'তার বিয়ে নিয়ে কিছু বলতে পারত তোমাকে।'

'তোমাকেই তো বলেছে। তোমরা এখন যা ঠিক করবে তাই হবে।'

'হ্যাঁ, আট আনা আট আনা।' হাসল ভূপেন।

'চল', বিজয়াকে ডাকল মৃণালিনী : 'চল, তেতলার ঘরটা দেখে আসি।'

'যাচ্ছি।' হাতে কী একটা কাজ আছে এমনি ভাব দেখাল বিজয়া।

মৃণালিনী একাই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

হেমেন বললে, 'প্রকাণ্ড একটা জট কিন্তু থেকে যাচ্ছে। খোদ পাত্রী নিয়েই

গোলমাল।' ভূপেনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল হেমেন: 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব নাকি?'

'সর্বনাশ।' সাপ দেখার মতন লাফিয়ে উঠল ভূপেন: 'এখন কিছু ভাঙতে গেলে তুমুল করবে। সমস্ত তছনছ ওলটপালট করে দেবে। হয়তো, শেষকালে যেমন যায় সব শাশুড়ি, কাশী কি পুরী পালাবে। ভরাডুবি হবে।'

'হ্যাঁ, আমিও বলি, এখন চেপে যাওয়া ভালো।' বিজয়া বললে স্থির স্বরে, 'পাকা দেখার সভায় প্রথম দেখবে, আশীর্বাদ করতে বাধ্য হবে, তখন আর রাগ দেখিয়ে করবে কী। যদি বা রাগ দেখায়, তা হলেও আশীর্বাদ তো পণ্ড হবে না, যেহেতু আপনারা আছেন। আর আশীর্বাদ একবার হয়ে গেলে সর্বত্র অভয়।' সুন্দর করে হাসল বিজয়া: 'বরং সেদিন সুকুকে ও বাড়িতে হাজির থাকতে বলুন। দিদি যদি কিছু গোলমাল করতে চায় সুকুই সামলাতে পারবে।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো।' ভূপেন উদার উচ্ছ্বাসে সায় দিল: 'সুকই সামলাবে তার মাকে। আমরা কেন মাথায় লাঠি খাই।' বলে নিজের টাকে হাত রাখল।

কদিন পর এক রবিবার পাকা দেখার দিন ঠিক হল আর ক্ষণ ঠিক হল বেলা দশটা।

সাজতে বসল মৃণালিনী।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ, মা?'

ঘাড়ে গলায় বুকে পাউডার ঢালতে ঢালতে মৃণালিনী বললে, 'তোর ছোড়দার বউকে পাকা দেখতে।'

'কাকে? বিনতাদিকে?'

'হ্যাঁ। হস্টেল থেকে কোন এক কাকার বাসায় এসে উঠেছে, সেইখানে।'

'কিন্তু তুই ভদ্রমহিলাকে বিনতাদি বলিস কোন সুবাদে?' ঘরে স্নবীর ছিল প্রতিবাদ করে উঠল: 'তোদের ইস্কুলে পড়ায়?'

'নাই বা পড়াল!'

'নাই বা পড়াল? তা হলে দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষিকাই তোর দিদি?'

'বা, সম্মান করে কথা কইতে হবে না?' জয়ন্তী ফোঁস করে উঠল।

'তার জন্যে তুই দিদি বলবি? আমরা মাস্টারদের দাদা বলি? যখন ঘরে আসবে তখন তো বউদিই বলবি?'

'এখন?'

'এখন কিছুই বলবি না। ওসব নাম মুখে উচ্চারণও করবি না।' সুবীর ভারিক্কি চালে বললে, 'তুই আদার ব্যাপারী, তোর জাহাজের খোঁজে কী দরকার?'

আঁচল এলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে নেমে গেল মৃণালিনী। বিজয়াকে ডাকল।

ঝণ্টু গেল তার মাকে খবর দিতে। বললে, 'ঠাকুমা কাকার নতুন বউ আনতে গেল—'

কচি আঙুলে কর গুনে গুনে ছোট-ছোট যোগ করছিল সেণ্টু। সে হঠাৎ তার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝণ্টুর উপরেই তেরিয়া হয়ে উঠল: 'ভালো হবে না বলছি। ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

'কেন, ওর ঠ্যাং খোঁড়া করবি কেন?' বন্দনা নিবৃত্ত করল ছেলেকে: 'যে আসবে তার ঠ্যাং খোঁড়া করবি। ও কী করেছে?'

যুক্তিটা বোধ হয় মেনে নিল সণ্টু। লাঠি সরিয়ে রেখে আবার সে পেন্সিল নিয়ে বসল! হাতে রেখে যোগ করতে শেখে নি এখনো। তাই রিক্ত বাঁ হাতখানি পেতে এক রতি আঙুলে দুইটি বিচ্ছিন্ন সংখ্যার যোগফল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'ছোড়দিদিও গেল সেই সঙ্গে।' ঝণ্টু আরেকটু জুড়ল।

'সে কি! বিজুও গেছে? আমাকে নিয়ে গেল না কেন?' খাতা পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল সেণ্টু: 'আমরা কাম্মার খোঁজ নিয়ে আসতে পারতাম। এতদিনে নিশ্চয়ই তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে।

'হ্যাঁ, অগ্নিপরীক্ষার পর এবার তার পাতাল প্রবেশ। প্রশান্ত ঘরে ছিল, ছেলেকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল বইখাতার সামনে: 'আর সে আসবে না।'

'না, না, আসবে।' আবার সেণ্টু চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, আসবে।' সেণ্টুকে স্তোক দেবার জন্যে বন্দনা বললে, 'আর এসে একবারে সকলের মাথার উপরে বসবে। বিচারটা একবার দেখ।' স্বামীকে এবার সে লক্ষ্য করল: 'সিনিয়রের প্রমোশন নেই। ওপেন মার্কেট থেকে কোন একটাকে ধরে এনে টঙে বসিয়ে দিলে।'

'আজকাল এই রেওয়াজ।' প্রশান্ত বললে, 'শুধু খাতিরের শ্রীক্ষেত্র।'

'বলে কিনা আমাদের গুণ নেই। আর যে মাস্টারনী আসছে সে একেবারে গুণের গম্বুজ। যে আবিষ্কার করেছে সে নিজেও একটি স্তম্ভ। টিঁকলে হয় ঝড়ে-জলে। হ্যাঁ, কাকলি হত, মুখে যাই বলি, মনে মনে মানতে হত এক শো বার।'

'কিসে গেল ওরা?' বন্দনাকে থামাবার জন্যে ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

ঝণ্টু বললে, 'ট্যাক্সিতে।'

···৫৯·······························

ট্যাক্সিতেই হেমেন জিজ্ঞেস করলে মৃণালিনীকে, 'হারটা নিয়েছ?'

বিজয়া বললে, 'নিয়েছি।'

পথেই কিন্তু একটা আভাস দিয়ে রাখা ভালো, নইলে ব্যাপারটা কিরকম ঘোলাটে থেকে যাবে, হয়তো বা দেখাবে প্রতারণার মত! যেন কারে ফেলে মজা দেখা হচ্ছে এমনি একটা শত্রুতার ভাব। এটা ঠিক নয়।

'আচ্ছা বউদি,' হেমেন আবার লক্ষ্য করল মৃণালিনীকে, 'আমরা যদি গিয়ে দেখি এ মেয়ে তোমার বিনতা নয়—'

'বিনতা নয় মানে?' মৃণালিনী রুক্ষ মুখে বললে, 'তবে আবার কে?

'ধরো আর কোনো প্রণতা?' হেমেনের দু চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

না, না, আর কেউ হতে যাবে কেন? বিনতাই প্রণতা। তোমরা তো জানো না এর মধ্যে কতবার ও এসেছে আমার কাছে, কত বলেছে ঘর-সংসারের কথা—'

'কিন্তু সুকু তো কিছু বলে নি।' বললে হেমেন, 'ও তো আর আসে নি তোমার কাছে।'

'না আসুক, না বলুক।' বিজ্ঞের মত মুখ করল মৃণালিনী: 'এক দিকের কথা শুনেই আরেক দিকের কথা বেশ বোঝা যায়। বিনতার ভাব-সাব থেকেই বোঝা গেছে সুকুর মতি-গতি, সুকুর পছন্দ।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ল: 'তবে তোমরা মেয়ে কে ঠিক না জেনেই চলেছ পাকা দেখতে?'

'আমাদের জানবার কী দরকার!' ও পাশ থেকে বললে ভূপেন।

'জানবার কী দরকার মানে?' ঝলসে উঠল মৃণালিনী: 'তাই বলে যা-তা একটাকে ধরে নিয়ে আসবে?'

'আসবে—আমরা তার কী করব?' ভূপেন উদাসীন ভঙ্গি করল। পরে একটু জেরার মত করে প্রশ্ন করল: 'প্রথম বার যে ধরে এনেছিল, জানিয়েছিল আমাদের? মত নিয়েছিল? যা সংসারে এনে নিক্ষেপ করেছে তাই আমরা বিনা আক্ষেপে গ্রহণ করেছি। এবারও তাই যা ছুঁড়ে মারবে তাই তুলে নেব। ওর যাতে পছন্দ তাতেই আমাদের সমর্থন। শত হলেও ছেলে। সেই ছেলে আর ছেলের বউকে কে পারে ফেলে দিতে?

'বিশেষ করে কৃতী রোজগেরে ছেলে।' ফোড়ন দিল হেমেন।

'বা, সেই যে মেয়ের কাকা এল বাড়িতে, পাকা দেখার দিন ঠিক করতে, তার থেকেও ব্যাপারটা স্পষ্ট করে নিলে না—কে মেয়ে, কী পরিচয়?' মৃণালিনী যেন ফাঁপরে পড়ল: 'এটা কোন ধরনের কথা?'

'অত্যন্ত আধুনিক ধরনের।' বললে হেমেন, 'পাত্রীর মনোনয়নে বাবা-কাকার যখন কোনো কথা খাটবে না, ভূমিকা থেকে পরিশিষ্ট কোনোখানে না, তখন পাত্রী কে, এ সম্পর্কে বাপ-কাকার কৌতূহল অবান্তর। শুধু অবান্তর নয়, অসংগত। শুধু এসে বললে, বিয়ে করছি, বললাম ঠিক আছে। আগন্তুক ভদ্রলোক এসে বসলে, আমি পাত্রীর কাকা, নিমন্ত্রন্ন করতে এসেছি আপনাদের, বললাম ঠিক আছে, ঠিকানাটা রেখে যান। এর বেশি আমাদের বক্তব্য নেই, থাকতে পারে না—'

'এর বেশি কিছু বলতে কইতে গেলেই একসারসাইজিং এ জুরিসডিকশন নট ভেস্টেড ইন কোর্ট হয়ে যাবে।' হাসিমুখে লেজুড় জুড়ল ভূপেন।

'তবে যেখানে পাত্রী জানা নেই সেখানে আশীর্বাদের ঘটা কিসের?'

'শুধু স্বকুর অনুরোধে।' ড্রাইভারের পাশে বসার দরুন বারে-বারে ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে তাকাতে হচ্ছে না এই হেমেনের আরাম।

'এসব ঘটা হয় নি বলেই প্রথম বারেরটা ভেস্তে গিয়েছিল।' ভূপেন বললে, 'তাই দ্বিতীয় বারের বেলায় সাবধান হয়েছে।'

'তা ছাড়া যে পাত্রীকেই স্বকু মনোনীত করবে তারই উপর আমাদের আশীর্বাদ। তা সে পাঁচিই হোক আর খেঁদিই হোক।' হেমেন উদার স্বরে বললে।

'বললেই হল?' বিজয়ার হাসি ছাপিয়ে ধমকে উঠল মৃণালিনী।

'না বললেও হবে।' গম্ভীর হল হেমেন: 'পাঁচি হলেও আমাদের আদরের, খেঁদি হলেও আমাদের আদরের। স্বকুর বউকে ফেলব কোথায়? এ তো তবু যদ্দূর বুঝছি বাঙালী বিয়ে করছে, কিন্তু যদি ধরো বিদেশে গিয়ে অজাতকুজাত এক মেম বিয়ে করে আনত, 'শেম' 'শেম' করতে পারতাম না, ঠিক বরণ করে নিতাম—'

'আর সে মেম গাউন ছেড়ে শাড়ি-ব্লাউজ না ধরলেও, শাঁখা-সিঁদুর না পরলেও—' ভূপেন মাথা নাড়তে লাগল।

'বলো কী ভীষণ কথা!' মৃণালিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'আমাদের কোর্টের উকিল মহীতোষবাবুর বড় ছেলে করল কী! বিদেশ থেকে মেম বিয়ে করে আনল।' বলতে লাগল ভূপেন, 'মেমসাহেব যদিও শাড়ি-ব্লাউজ পরতে রাজি, শাঁখা-সিঁদুর পরতে, কিন্তু মহীতোষবাবুর ছেলে কিছুতেই তাতে রাজি

নয়। বলে, তুমি যদি ওসব পরে বাঙালী মেয়ে সাজতে চাও, তা হলে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন! স্ট্রেইট বাঙালী মেয়ে বিয়ে করলেই তো হত। তা ছাড়া, তুমি যদি ওসব পরো, তোমাকে সঙের মতন দেখাবে। ইংরেজও নয়, বাঙালীও নয়, হয়ে দাঁড়াবে 'বাংরেজ'। তোমার সমস্ত গ্ল্যামার ধুয়ে যাবে, তোমাকে ডাউডি দেখাবে—'

'সে আবার কী!' আতঙ্কে শিউরে উঠল মৃণালিনী।

'মানে, তুমি বোদা, বিস্বাদ হয়ে যাবে, লেশমাত্র আকর্ষণ থাকবে না।' বিশদ হল ভূপেন: 'তোমার রূপ তোমার পোশাকে চুলে, গয়না-টয়না না-পরায়, হাঁটা-চলায়, কথা বলায়, সর্বোপরি তোমার ভাষায়। তুমি আধো-আধো বাঙলা শিখে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করবে এ দুশ্চেষ্টা কেন! যদি বাঙলাতেই আলাপ করব তবে ষোল আনা বাঙালী মেয়ের দ্বারস্থ হতে দোষ কী ছিল!'

'তারপর হল কী?' অস্থির হয়ে উঠল মৃণালিনী।

'যাও না, মহীতোষবাবুর বাড়িটা দেখে এসো না। দোতলাটা ছেলে-বউকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন। আর সামনের রাস্তা থেকেই দেখবে দোতলার বারান্দায় হাঁটু-ছোঁয়া ফ্রক পরে মেমসাহেব, মহীতোষবাবুর পুত্রবধূ, পাইচারি করছে আর সিগারেট ফুঁকছে। ছেলের ইচ্ছায়, গ্ল্যামারের খাতিরে সব মেনে নিতে হয়েছে মহীতোষবাবুকে। ফেলবে কোথায়!'

'কী সাংঘাতিক!' মৃণালিনীর হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে গেল!

'এ তো ধূমাবতী দেখলে,' হেমেন বলল, 'এবার ছিন্নমস্তা দেখবে চলো।'

'সে আবার কী?' উদ্বিগ্ন হল বিজয়া।

'ছিন্নমস্তা মানে আমাদের আফিসের সুখময়বাবুর ছেলের বউ।'

'সে আবার কী করল!' ভূপেন কৌতূহলী হল।

'সুখময়বাবুর ছেলে বিধবা বিয়ে করেছে।' বলতে লাগল হেমেন, 'কিন্তু বিয়ে করার পর বউকে সাজতে-গুজতে দিচ্ছে না, পরতে দিচ্ছে না গয়না। শুধু তাই নয়, সিঁথিতে সিঁদুর আঁকতে দিচ্ছে না, পায়ে আলতা, ঠোঁট রাঙাতে দিচ্ছে না পান খেয়ে। বলে তুমি যদি উদগ্র সধবা সাজবে, তা হলে তোমার চার্ম কোথায়? যাকে আমি ভালোবেসেছি সে কোথায়? এ সাজাগোজা মহিলা তো আরেক লোক, সুতরাং আগে যেমন ছিলে, তেমনি বিধবা সাজো। হ্যাঁ, স্বামী বেঁচে থাকলেও বিধবা। আর সেই যে করুণ-করুণ মুখ করে থাকতে, যে মুখ আমাকে মুগ্ধ করেছে, সেই করুণ-করুণ মুখ করে থাকো। নচেৎ যদি রঙ্গে-রসে হাসিতে-আনন্দে প্রগল্ভ হও, তা হলে

তোমার জাত মারা যাবে, তোমাকে অশ্লীল দেখাবে, অশুচি দেখাবে, তোমাকে আর ভালোবাসা যাবে না—'

'তারপর ?' ভূপেনই জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আর কী! আগের সেই বৈধব্যবেশই ধরল বউ। ছেলে বলে কিনা, শাদা থান না পরলে, কপাল-মাথা শাদা না রাখলে, ভালোবাসা যাবে না। ভাবতে পারো বউদি, ছেলে বেঁচে, অথচ তার বউ পাড়-ছাড়া শাদা শাড়ি পরে করুণ-করুণ মুখ করে সংসারি করছে।'

'উঃ, কী দিনকালই পড়েছে!' অন্তরে-অন্তরে শিউরে উঠল মৃণালিনী : 'আমার স্বকু না জানি কী কাণ্ড করে বসেছে!'

'যাই করুক, যে মেয়েকেই পছন্দ করুক, যুগের যেমন হাওয়া,' ভূপেন বললে, 'তাকেই আমরা আশীর্বাদ করব।'

মনে-মনে গুরুদেবের শরণাপন্ন হল মৃণালিনী। কিন্তু জোর পেল না। তাই গেল কালীঘাটে মা কালীর দুয়ারে। হে মা কালী, স্বকু যেন বিদঘুটে কিছু করে না বসে। বিনতা হোক প্রণতা হোক, একটি বাঙালী মেয়েই যেন ওর বউ হয়। আর কিছু চাই না, যেন বয়সে বড় না হয়। বুড়ি না হয়। যেন কুমারী হয়। আর, ভগবান, যেন অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ থাকে। আমার আগের বউকে তো জানো। সে কত বিদুষী ছিল। কত গুণী। একেবারে হেজিপেজি না হয়। একেবারে আজেবাজে হলে লোকে ধর্ম দেখবে। আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে।

দুয়ারে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই বাড়িভর্তি লোক কলধ্বনি করে উঠল। বহু মুখে বেজে উঠল শঙ্খ। আর এত বড় একটা সম্ভ্রান্ত জনতা দেখে মৃণালিনী কিছুটা আশ্বস্ত হল, হয়তো পাত্রী একেবারে পরিত্যজ্য হবে না। সর্বত্রই দেখছি খোলা মাঠের হাওয়া, সারল্যের জল, কোথাও এতটুকু লুকোলুকি ঢাকাঢুকির কুয়াশা নেই।

তবু বিধাতাপুরুষ যে এক সাংঘাতিক রসিক ব্যক্তি এ জ্ঞান ছিল বলেই মৃণালিনী স্তব্ধ হয়ে রইল, বিনীত হয়ে রইল।

কেউ কারু প্রত্যক্ষ পরিচিত নয়, গায়ত্রী আর ইন্দিরা মেয়েদেরকে অভ্যর্থনা করল, আর নরনাথ পুরুষদের। 'দাদা অসুস্থ, বিশেষ হাঁটতে-উঠতে পারেন না, নিজের ঘরে আছেন বন্দী হয়ে।' বনবিহারীর অনুপস্থিতির সাফাই দিল নরনাথ।

'হ্যাঁ, যাবার আগে দেখা করে যাব।' ভূপেন বললে।

কাকলির ঘরেই জিনিসপত্র সরিয়ে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা হয়েছে। বরপক্ষীয়েরা

বসল তার উপর। তাকিয়ে রইল মুখোমুখি দরজার দিকে। কখন কী মূর্তিতে দেখা দেবে কন্যা, বিকটদর্শনা না কি অমিয়ময়ী অম্লানলক্ষ্মী!

পাশের ঘরে সাজছে কাকলি। সাজছে মানে সাধারণভাবে একটু ফিটফাট হচ্ছে। গায়ত্রীর ইচ্ছে একটু গয়না-টয়না পরে ভরা-ভর্তি সাজে; গায়ে দামি রঙিন শাড়ি দোলায়, চুলে বিনোদ বেণী তৈরী করে। আর কবে দেখতে পাব সেই সাবেকী ঠাট—একটু বা আপসোস করে।

'মাথা খারাপ!' হাসিমুখে সমস্ত প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় কাকলি: 'চেনা বামুনের পৈতের দরকার কী: যেমনটি আছি তেমনটি গিয়ে দাঁড়াব।'

এখন কথা উঠেছে খালি মাথায় দাঁড়াবে, না মাথায় একটু তুলে দেবে আঁচলের প্রান্তটা। কিসে ফুটবে শালীনতার ভাব।

এ নিয়ে আবার কথা কী! আমি তো এখন মিস মিত্র। নবজাত।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দরজার কাছে প্রথমেই ভূপেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল কাকলি। এতক্ষণ আড়ালে ছিল, ভূপেন এসেছে বুঝতে পারে নি। এখন চকিতে, চোখাচোখি হতেই, মাথায় কাপড় টেনে দিল কাকলি। আর, মাথায় কাপড় দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াল সভাস্থলে।

কন্যার সঙ্গে যেমন একজন বাহিকা আসে, কাকলির সঙ্গে তেমনি আসছিল ইন্দিরা। ইন্দিরা তো প্রকটরূপেই বিবাহিতা, কিন্তু সঙ্গে অপর একজন যে এগুচ্ছে, স্বর্ণাক্ষরে খুব রক্তিম না হলেও তারই তো সমগোত্রীয় মনে হচ্ছে। বিবাহিতা না হলে আর মাথায় ঘোমটা কেন? কেন ভঙ্গিতে এত গাম্ভীর্য!

আঁতকে উঠল মৃণালিনী। পাশে বসা বিজয়ার একটা হাত ধরে ফেলে দিশেহারার মত বললে, 'এ আবার কার বউ বিয়ে করছে স্কু?'

'ভালো করে দেখুন না তাকিয়ে।' হাসিভরা মুখে বললে বিজয়া।

সকলের আগে নিচু হয়ে মৃণালিনীকেই প্রণাম করতে এগুল কাকলি।

'অ্যাঁ! তুমি? আমাদের ছোট বউমা?'

'পরের বউকে কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাবে?' বিজয়ার দুই চোখে খুশি উপচে উঠল: 'নিজের বউকেই বিয়ে করছে স্কু।'

'খুব ওরিজিন্যাল।' টিপ্পনী কাটল হেমেন।

'তুমি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছ।' কাকলির চিবুকে একটু হাত বুলোল মৃণালিনী: 'উঃ, আমি কত কী আবোলতাবোল ভাবছিলাম, আমার বুকটা এখনো টিপটিপ করছে। বাবাঃ, পাথর নেমে গেছে বুক থেকে। চলো, ঘরের লক্ষ্মী

ঘর আলো করবে চলো। কই, সব সরঞ্জাম কই? ধানদুব্বো কই?' বিজয়ার দিকে সাগ্রহ হাত বাড়াল : 'দে, হারটা দে।'

বাক্সটা এগিয়ে দিল বিজয়া।

সাতলহর হারটা শূন্যে একবার দুলিয়ে মৃণালিনী কাকলির গলায় পরিয়ে দিল।

মৃণালিনীকে আবার প্রণাম করল কাকলি। এবং ক্রমে-ক্রমে আর সকলকে।

ভূপেনের দিকে তাকিয়ে মৃণালিনী বললে গদ্‌গদ হয়ে, 'স্বকুর যে এমনতর কীর্তি বুঝতে পারি নি—'

'আমরাও কি পেরেছি?' সায় দিল ভূপেন।

'যদি একজনকে দেখতাম, বাড়িটা ঠিক ধরতে পারতাম।' কাকলিকে লক্ষ্য করল মৃণালিনী : 'তোমার সেই দাদা কোথায়? তাকেই তো একমাত্র চিনি।'

দেবনাথের খোঁজ শুরু হল। দেবনাথ বাড়ি নেই। কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছে।

'আরেকজনকে দেখলেও হয়তো ধরতে পারতে।' হেমেন বললে, 'কই, সে আসে নি?'

সবাই ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। সে কে?

'স্বকু।'

'ও মা, সে কেন আসবে?' বিজয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরো সকলে হেসে উঠল। 'সেও দেখবে নাকি পাকা করে?'

চারদিকে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল। শুরু হল খাওয়া-দাওয়া। বনবিহারীর সঙ্গে দেখা করা। দিনক্ষণের হিসেবে আসা।

'সেন্টুকে নিয়ে এলেন না কেন?' বিজয়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কাকলি।

'যাও না, দেখে এসো না সেন্টুকে।' বিজয়া বললে হাসতে-হাসতে, 'সে একটা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকার ঠ্যাং ভাঙবে বলে।'

'কাকার অপরাধ?'

'কাকা তার কাম্মাকে ফিরিয়ে না এনে আবার বিয়ে করছে বলে।'

কথা শুনে হাসতে লাগল কাকলি। কিন্তু হাসির রোদে জলের ফোঁটা চিকচিক করে উঠল।

একটু আড়ালে কাকলিকে ডেকে নিল মৃণালিনী। গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গের মত বললে, 'তোমার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে?'

'আপনাদের আশীর্বাদে কিছু হয়েছে।'

'মাইনে বেড়ে কত হয়েছে এখন?' গলার স্বর আরো ঝাপসা করল মৃণালিনী।

'তা নেহাত মন্দ নয়।' ভয়ে-ভয়ে শুকনো মুখে কাকলি বললে।

'তা মন্দই হোক আর ভালোই হোক, সব টাকাই তোমার। তোমার ইচ্ছেমত তুমি খরচ করবে, তোমার বুদ্ধিমত, বিবেকমত। আয়েও যেমন তোমার স্বাধীনতা, তেমনি ব্যয়েও। কারও কিছু বলবার-কইবার নেই, দাবি করবার নেই। যার উপর দাবি করবার আছে সে স্বকু— তা, শুনেছি তারও নাকি রোজগার বেড়েছে। তাই তুমি খোলসা মনে কাজ করে যাবে, যতদিন অবশ্যি তা সম্ভব রাখেন ভাগবান, তা কেন, যতদিন তোমার খুশি।'

বিগাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকলি।

এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যটুকু হেমেনের চোখ এড়াল না। সে বলে উটল, 'আর কিছু নয়, দুনিয়ায় শুধু মিষ্ট মুখেই ইষ্ট লাভ।'

আনন্দের হাটে ভাঁটা পড়ল, বরপক্ষীয়েরা যখন চলে গেল ট্যাক্সি করে। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের একজন এখনও বাকি।

'এ কী, তুমি কোত্থেকে?' চোখ প্রায় কপালে তুলল কাকলি।

'ও পাশের ছোট ঘরটায় ছিলাম এতক্ষণ বন্দী হয়ে!' কাঁচমাচু মুখে বললে স্বকান্ত।

'সে কী? তুমিও আমাকে পাকা দেখবে নাকি?

'না, আমার তোমাকে নিরন্তর কাঁচা দেখা। পাকা করে দেখতে গেলেই তো শেষ হয়ে যাবে। আমার কাঁচা দেখায় শেষ নেই, পুরোনো হওয়া নেই। সে সব সময়েই নতুন করে দেখা, আরেক রকম করে দেখা। তাদের রম্যং রুচিরং নবং নবং—'

'নবং নবং পরে হবে। কিন্তু পাকা দেখার সময় তুমি কী করে এখানে আসো, কোন নিয়মে? কোনো হাইকোর্টে এর নজির আছে?'

'আমরা বে-নজির।' উদার হাস্যে উদ্ভাসিত হল স্বকান্ত: 'এ মামলা অফ ফার্স্ট-ইম্প্রেশন। আসলে আমার উপস্থিতি তোমাকে রক্ষে করতে—'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স হতে। আর তা কাকার আদেশে। মানে পাত্রী নিয়ে যদি কোনো হৈচৈ হয় তা শান্ত করতে।'

'মানে, সন্দেহ ভঞ্জন করতে।'

'বলতে পারো সন্তোষবিধান করতে।'

'কই, লাগল না তোমাকে?'

'পরে লাগবে।'

'ছাই লাগবে! আমি একাই জিতে নিলাম।'

'একা কিছুই হবার নয়। আমার শানাইয়ের পোঁ আছে বলেই তো মনোহারী করতব।'

গায়ত্রী এসে বলে গেল এখানেই খেয়ে যাবে সুকান্ত।

'তা হলে আর কথা কী! চলো ঘুরে আসি।' আনন্দের ঢেউ তুলল কাকলি।

'চলো'

৬০

বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল দু-জনে।

কাকলি বললে, 'চলো কিছু কেনাকাটা যাক।'

'না, না, কেনাকাটা নয়, অন্তত এখন নয়।' বললে সুকান্ত, 'এখন শুধু একটু ঘোরা, নিরুদ্দেশে বেড়ানো। আমরা যে নতুন, চিরন্তন নতুন, আলোতে-হাওয়াতে এ নতুন করে অনুভব করা। সৌন্দর্যে নতুন, যৌবনে নতুন।'

'তা হলে বলতে চাও এ মিলন শুধু সুকান্তর সঙ্গে কাকলির নয়, এ মিলন চিরন্তন সুন্দরের সঙ্গে চিরন্তন যৌবনের।' বললে কাকলি।

'আর এই মিলনের মন্ত্র ভালোবাসা। চিরন্তন নবীন থাকবার মন্ত্র।' বললে সুকান্ত, 'এমনিতে প্রতিদিনের অভ্যস্ত পৃথিবী তো জীর্ণ ধূলিধূসর কিন্তু যেই খবর আসে যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে অমনি সমস্ত শ্রীহীন সুন্দর হয়ে ওঠে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'

'আর,' কথার জের টানল কাকলি: 'মরা কাঠে যৌবনের মঞ্জরী জাগে, মরা নদীতে যৌবনের জোয়ার।'

'তোমাকে যদি এখন দু বাহুর মধ্যে জড়াতে পারতাম,' সুকান্ত ছেলে-মানুষের মত মুখ করল, 'তা হলে বলতে পারতাম চিরসুন্দরের বাহুপাশে চির-যৌবন বাঁধা পড়ে আছে।'

'তা বলো না যত খুশি।' কাকলির শৈশব-সরল মুখ করল: 'মুখে বলতে দোষ কী। কাজে না করলেই হল।'

'আমরা-চলেছি কোথায় ?' হতাশের মত জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'চলো আমাদের সেইসব পুরোনো দৃশ্যগুলি আবার দেখি।'

সুকান্ত তেমনি নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। কতদূর যেতেই বলল, 'আর্যে! এই সেই স্বাতী চিত্রগৃহ, যেখানে একদা এক বর্ষাসিক্ত সন্ধ্যায় আপনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবার ভান করিয়াছিলেন—'

কতক্ষণ পরে সুকান্ত আবার বললে, 'আর্যে, অবলোকন করুন, এই সেই ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ, যার দ্বারদেশে আমি আপনার জন্য তৃষ্ণার্ত নয়নে অপেক্ষা করিতাম আর নির্ধারিত সময় অন্তেও আপনি আসিতেন না—'

'আর অদূরে ঐ যে মাঠ দেখিতেছি ?'

'উহাই প্রসিদ্ধ গড়ের মাঠ। কতদিন ঐখানে বসিয়া আমরা একত্র পাঠ্য-পুস্তক নিয়া আলোচনা করিয়াছি আর পথচারীরা আমাদিগকে গৃহহীন উদ্বাস্তু মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে—'

তারপর ওরা একদিন বেড়াতে এল জুতে।

'বরাননে, এই সেই বিচিত্র পশুশালা, যেখানে কেন কতককে খাঁচায় পোরা হইয়াছে ও কেন কতককে হয় নাই এই প্রশ্ন চিরবিস্ময়ের চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—'

আবার একদিন লেকে।

'চারুনেত্রে! রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে মার্জনা করুন, এই সেই রবীন্দ্র-সরোবর, যার জলে আমরা একত্র নিমজ্জিত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—'

'মিথ্যে কথা।' ছোট্ট চিমটি কাটল কাকলি।

তারপর আকাশে একদিন নবীন বর্ষার মেঘ করে এলে, সন্ধ্যাকালে ওরা দু-জনে ছাদে চলে এল।

কদম গাছের কাছে এসে কাকলি বললে, 'দেখ আনন্দে কেমন রাশি-রাশি ফুল ফুটেছে। প্রতি বছরেই ফোটে, প্রতি বছরেই মনে হয় এই বুঝি প্রথম। জগতের পাত্রে এক কণা অমৃতেরও ক্ষয় নেই।'

'তেমনি জীবনের পাত্রেও যেন এক কণা না কম পড়ে!'

'দেবতার কাব্য দেখ। মরেও না, জীর্ণও হয় না।'

'তেমনি করা যায় না জীবনের কাব্য ? ন জীর্যতি না মমার।'

'আজ কিন্তু চেয়ার নিয়ে উঠছে না চাকর।'

'আর কদম ফুল চিনি না বলে কেউ বলছে না, কে ড্যাম ফুল !'

দু-জনে হেসে উঠল একসঙ্গে।

দু তরফ থেকেই বিয়ের সরকারি নিমন্ত্রণপত্র ছেপে এসেছে। ঠিক হয়েছে ওদের যারা সমান বন্ধু তাদেরকে একসঙ্গে গিয়ে নিমন্ত্রণ করবে। আর যারা একক বন্ধু তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে।

সমান বন্ধু বলতে আফিসের কজন আর বাইরের বলতে দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের বাড়ি একদিন চলল দু-জনে।

সন্ধ্যাশেষে গলিটা অন্ধকার মত। ওরা ঢুকছে, দেখল কে একটি মহিলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গলি থেকে।

'চিনতে পারলে ?' জিজ্ঞেস করল কাকলি।

'লক্ষ্য করি নি।'

'যতদূর মনে হচ্ছে, বিনতা।'

'তা—এখানে ?'

'বোধ হয় দীপঙ্করের কাছে এসেছিল।'

'দীপঙ্করের কাছে আসবে কেন ?'

'কে জানে হয়তো কোনো গোপন ষড়যন্ত্রে।' চিন্তিত মুখ করলে কাকলি: 'মুখের গ্রাস কেড়ে নিলাম, হয়তো বা সেই যন্ত্রণায়। আর যার উপকার করেছি সেই দীপঙ্কর যদি এখন শত্রুতা করে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'চলো যাই না, জিজ্ঞেস করি না দীপঙ্করকে।'

ঘরে ঢুকেই দীপঙ্করের চমকের ঢেউটা না কাটতেই কাকলি বলে উঠল, 'কে এসেছিল ? একটি মহিলাকে দেখলাম।'

'আরে, সে তো আপনারই বন্ধু, আপনারই নাম করে এসেছিল, বিনতা সেন—'

'বক্তব্য কী ?'

'বক্তব্য আর কী ! বক্তব্য মাস্টারি আর ভালো লাগে না, যদি অন্যত্র আর কোনো একটা চাকরি তাকে জোগাড় করে দিতে পারি।' দীপঙ্কর হাসল: 'বললাম, আমিই নিধিরাম সর্দার, আমি কোত্থেকে কী যোগাড় করে দেব ? তবে ভদ্রতা করে যা বলতে হয়, তাই বললাম। বললাম, দেখব চেষ্টা করে। দেখবেন ভুলবেন না, আবার আসব খোঁজ নিতে, বলে চলে গেল।'

'চলে কী আর যায় ! ওঠেই না।' বিরক্ত মুখ করে দুর্গাবালা বললে, 'শেষকালে আমি তাড়া দিতে উঠল।'

'এমন তাড়া যে আমাদের দেখেও দেখল না।' কাকলির ক্ষুণ্ণ স্বর।

'তার মানে ধরা পড়তে চায় না।' দীপঙ্করের স্বরে সমবেদনার ছোঁয়া।

'মেয়েদের সব চেয়ে বড় চাকরি হচ্ছে বিয়ে।' বললে দুর্গাবালা, 'আসলে সেই চাকরির খোঁজ। মধুর অভাবেই গুড়ের ডাক। তা তোমাদের তো ফের বড় চাকরি জুটে গেল।' দুর্গাবালার গলায় একটু বা খোঁচা মারা।

'হ্যাঁ, শুনেছেন তা হলে।' হাসল কাকলি।

'হ্যাঁ, এই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল শুনলাম, আবার এরই মধ্যে বোঝাবুঝি হয়ে গেল ?'

'সোজাসুজির আবার বোঝাবুঝি কী।' হাসির পর্দা আরো উঁচুতে তুলল কাকলি : 'তাই মিলতে দেরি হল না।'

'যাই বলো, তুমি অস্থিরচিত্ত।' প্রায় ভৎর্সনা করল দুর্গাবালা : 'এই হস্তদস্ত হয়ে বিয়ে করলে, কদিন যেতে না যেতেই বিয়ে ভাঙলে, আবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেই সোয়ামীতেই বিয়ে বসতে চলেছ ? সেই মাটিতেই আবার মৃদঙ্গ তৈরি ? মানুষে বলবে কী !'

'মানুষে কবে কী ভালো বলল ! ভাঙলেও নিন্দে, গড়লেও নিন্দে।' কাকলির হাসি আর থামে না।

'এই অস্থিরতার ফল হবে আবার এই বিয়ে ভেঙে যাবে—' দুর্গাবালাকে রূঢ় শোনাল।

তাই বুঝেই হয়তো দীপঙ্কর বললে, 'বা, এই বয়সটাই তো অস্থির হবার। যেমন ভাঙবার তেমনি ভালেবাসাবার।'

'যদি ভেঙে যায়, অস্থির হাওয়ার দরুন, পারব না বিচ্ছিন্ন থাকতে। আবার মিলব।' সমস্ত মেঘ উড়িয়ে দিল কাকলি : 'অস্থিরতার শেষ হচ্ছে শান্তি। আর কে না জানে, শেষের সুখই সুখ। শেষের ঘুমই ঘুম।'

কাকলির হাত ধরে আড়ালে টেনে নিল দুর্গাবালা। নিচু গলায় বললে, 'যখন একবার ছেড়ে ছিলে তখন আবার ঐ ঝগড়াটে বাড়িতে ঢুকছ কোন সাহসে ? আর কোনো ঠাণ্ডা বাড়ি খুঁজে পেলে না ?'

'ভবিতব্য।' কপাল দেখাল কাকলি।

'এত আমাদের উপকার করলে, আরেকটা উপকার করলে কী হত ! দীপঙ্কর তো এমন অযোগ্য ছেলে ছিল না !'

কাকলি হাঁ হয়ে রইল।

'এখন তোমার অতগুলি টাকা কী করে তুলে দিই সংসার থেকে? কী করে শোধ করি?'

'শোধ করতে হবে না। এই নিন নেমন্তন্ন চিঠি। যাবেন সকলকে নিয়ে।' সুকান্তকে প্রায় টেনে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বেরিয়ে আসতে-আসতে সুকান্ত বললে, 'তুমি কী সুন্দর বললে বলো তো! শেষের সুখই সুখ।'

এখন বরেনের কাছে কে যায়? সে কি উভয়ের বন্ধু, না একলা একজনের? কোনো কথা হয় নি। কিন্তু তার নিমন্ত্রণ হবে না এ ভাবনার অতীত। কে না জানে সে ছিল বলেই এই মিলন সম্ভব হয়েছে। নিমন্ত্রণ-সভায় যদি কেউ অগ্রগণ্য থাকে তবে সে বরেন ছাড়া কেউ নয়।

এখন সে যদি একলা একজনের বন্ধু, তবে কার বন্ধু?

একলা কাকলিই গেল তাকে চিঠি দিতে। দিনের বেলা, তার খোলা-মেলা বাড়িতে, দোতলায়। দিব্যি চাকরের হাতে কার্ড দিল। ঘরে বাবু একা। হলই বা না, ভয় কিসের! বলে দাও আমিও একা।

নিচু সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে বরেন। উঠল না, শান্ত নিস্পৃহ চোখে তাকাল এক মুহূর্ত। বললে, 'আপনাকে আবার এভাবেই দেখতে পাব কল্পনা করি নি।'

'আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

এবার বরেন একটু মনোযোগী দৃষ্টি ফেলল। কিন্তু সেই তার সর্বাঙ্গলেহী হাড়মাস বিদ্ধ করা তীক্ষ্ণ চাউনি কোথায়? চোখে একটু বা উদাসীন ছায়া নিয়ে বললে, 'নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, কথাটা ঠিকমত বলেন নি। চট করে শুনলে অন্যরকম মানে হয়।'

'আমার বিয়ে। আমার বিয়েতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।' আগের বাক্যটা দ্রুত সংশোধন করল কাকলি। দাঁড়াল দৃঢ়দৃপ্ত হয়ে।

'বুঝেছি। ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।' নিচু চোখে আবার পড়ায় মন দিল বরেন।

চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিল না দেখে, সামনে যে মোড়ার উপর ছাইদান সে মোড়ার উপর রেখে কাকলি বললে, 'যাবেন। শত হলেও আপনি বন্ধু—'

'চেষ্টা করব।'

'আচ্ছা, আসি। ধীরে চলে গেল কাকলি।

সিঁড়ি প্রায় ধরেছে, বরেন ডাক দিয়ে উঠল, 'শুনুন।'

যাই কি না যাই, আবার ধীরে ফিরল কাকলি। নির্মল মুখে দাঁড়াল কাছে গিয়ে।

'শুনুন। একটা কাজ আমার করে আসা হয় নি। মনের মধ্যে তাই খুঁত-খুঁতুনি রয়ে গেছে—' চোখ না তুলেই বরেন বললে।

'কী কাজ?'

'আপনার দাদা দেবনাথবাবুর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেওয়া। নতুন করে সিগারেট ধরাল বরেন: 'দেখুন, জোগাড় হয়েছে একটা। যদি আপত্তি না থাকে ওঁকে আমার আফিসে পাঠিবে দেবেন—' আবার কাগজে মন দিল বরেন।

'বলব দাদাকে।' সিঁড়িতে ধাপে ধাপে জুতোর শব্দ করতে-করতে নেমে গেল কাকলি।

সেখান থেকে বিনতার হস্টেল। বিনতা যে কাকলির একলার বন্ধু তাতে আর সন্দেহ কী।

এসে দেখল বিনতার জ্বর। রুক্ষ চুলে রোগা মরাটে চেহারায় শুয়ে আছে।

'এ কী, আমার বিয়েতে যাবি না? সাজাবি না আমাকে?'

ম্লান হেসে বিনতা বললে, 'দেখছিস তো! এখন আমাকে না কেউ সাজিয়ে দেয়!'

'হ্যাঁ, আমিই সাজিয়ে দেব। কিন্তু যা ভাবছিস, খাটে নয়, পাটেই দেব তোকে সাজিয়ে। হ্যাঁ রে, তুই চাকরি খুঁজছিস? মাস্টারি ছেড়ে দিবি?'

'হেড-মিসট্রেসের সঙ্গে বনছে না।'

'তা চাকরি খুঁজছিস তো দীপঙ্করের কাছে কেন?'

'আমার আবার মুরুব্বি কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস চাপল বুঝি বিনতা: 'সত্যি কথা বলতে, আমার তো তোর নাম ধরে যাওয়া।'

'যাবি তো রাজার বাড়ি যাবি। বড় গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবি।'

'বড় গাছ?'

'হ্যাঁ, বরেনের কাছে যাবি। আমার নাম করে যদি দীপঙ্করের কাছে যেতে পারিস, তবে বরেনের কাছে যেতে বাধা কী!

'বা, তার সঙ্গে তো তোর ঝগড়া হয়ে গেছে।'

'আমার সঙ্গে ঝগড়া হলে কী হয়, আমার নামের সঙ্গে তো হয় নি।' কাকলি বিনতার হাতে একটু হাত বুলিয়ে দিল: 'আমার নাম বললে নিশ্চয়ই সে তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবে। তুই ভালো হয়ে একবার গিয়ে দেখা করে আখ না—'

'যাব, যখন তুই বলছিস—'

সেই বরেনের কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে আবার সুকান্ত এসে হাজির।

'আরে, আয়, আয়—' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বরেন।

'আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এলাম।'

'কবার নেমন্তন্ন? সেই যে সেদিন—' বলতে-বলতে চেপে গেল বরেন। বুঝল কাকলির নেমন্তন্ন করতে আসার খবরটা সুকান্ত জানে না। সুকান্তের কাছ থেকে যদি তা কাকলি গোপন করে রেখেছে, বরেনও তাই রাখতে পারবে।

'তুই তো এই মিলনের সেতু।'

'কিংবা বলতে পারিস হেতু।'

'একই কথা। যাস কিন্তু।'

'চেষ্টা করব।'

সুকান্ত চলে যাচ্ছিল, ডাকল বরেন। বললে, 'শোন, আবার যদি কোনোদিন আমাকে দরকার হয়, খবর দিস—'

সশব্দে হেসে উঠল দু-জনে।

রাত্রে' ট্যাক্সিতে, সশব্দে হেসে উঠল কাকলি আর সুকান্ত। অকারণে। অবারণে।

এবার কান্না-কান্না ভাব আনল সুকান্ত। বললে, 'আর তিন দিন মোটে আছে। এখন একটু নিয়মভঙ্গ করলে দোষ কী।'

'তিন দিন দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।'

'কাল আমি বাড়ি চলে যাব। তারপর দু-দিন আর দেখাই হবে না। উঃ, কী নিদারুণ।'

'দুরন্ত-দুঃসহ।'

'একটু কাছে এসো না সরে। ড্রাইভারের আয়না? ড্রাইভারে কী আসে যায়!'

'রাস্তায় পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। ভুলে যাচ্ছ কেন, ময়দানের কাছাকাছি ঘুরছ। কী সব মারাত্মক নাম! লাভার্স লেন। ফিল্ম স্টার্স গ্রোভ। নির্ঘাত থানায় ধরে নিয়ে যাবে।

'আমরা ঠিক বর্তমান মুহূর্তে না হই, অদূর অতীতে একদিন স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, এই ডিফেন্স চলবে না?'

'তন্তুমাত্র না।'

'নো ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট অ্যাজ ম্যান অ্যাণ্ড ওম্যান?'

'নান্।'

'তবে লম্বা মুখ করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কী !'

কতক্ষণ চুপচাপ কাটাবার পর হঠাৎ তপ্ত গাঢ় গলায় বলে উঠল কাকলি : 'এসব কি চেয়ে-চিন্তে হাত পেতে ভিক্ষে করে সেধে কেঁদে পাওয়া যায় ? ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে আদায় করে নিতে হয়।' বলেই কাকলি পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে সুকান্তর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাকুল বাহুতে জড়িয়ে ধরে নিবিড় অধরে বিহ্বল চুমু খেল।

দুই হাতের মধ্যে গুচ্ছ-গুচ্ছ সদ্যফোটা নতুন কদম ফুল, উচ্ছল স্বাস্থ্য আর সমর্পণ, সুকান্ত যতদূর সাধ্য দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ করল সেই মদিরতা।

'তোমার দাম আমার এই আনন্দের মধ্যে।' বললে কাকলি।

'আর এই আনন্দ সমগ্রের সুখের মধ্যে, জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে—'

কাকলিকে তার বাড়িতে পৌঁছে সুকান্ত হোটেলে চলে গেল।

পরদিন বাড়ি, আর পড় তো পড়, একেবারে সেণ্টুর সামনে।

'তুমি একলা যে, আমার কাম্মা কই ?'

হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিতে গেল সুকান্ত, কিন্তু জবাব পাবার আগে কিছুতেই সেণ্টু ধরা দেবে না।

'তোর কাম্মার কথা তো বিজু জানে।'

'বিজু জানে ? আমার কাম্মাকে ফেলে রেখে তোমার একটা নতুন কাকিমা আনবার মতলব। আমি বুঝি জানি না কিছু ?'

'দেখিস না তোর কাম্মার থেকে এই নতুন কাকিমা কত সুন্দর। কত ফর্সা।'

'কত ফর্সা না হাতি !' চোখ ছলছল করে এল সেণ্টুর।

'দেখিস না কত তোকে বেশি ভালোবাসবে নতুন কাকিমা। কত তোকে জিনিস দেবে।'

'তুমি জিনিস নাও গে। আমার জিনিস চাই নে।'

'চল, আমার তেতলার ঘরটা দেখে আসি—' আবার হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল সুকান্ত।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাব না তোমার কাছে। দেখ না আমি কী করি।'

'কী করবি ?'

'পুলিশে খবর দেব। পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ কাম্মাকে না এনে দেবে ততক্ষণ তোমাকে ছাড়বে না।'

'পুলিশ পাবি কোথায় ?'

'রাস্তা দিয়ে কত যাত্রী, একজনকে ডেকে এনে ভাব করে নেব।'

'শেষকালে তোকে পুলিশে না ধরে!'

'ধরুক। তবু তুমি যা না, তোমার চেয়ে পুলিশ ভালো।'

হাসতে-হাসতে তেতলার নতুন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সুকান্ত।

নিজের ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছে প্রশান্ত। আয়নার মুখচ্ছায়াকে সম্বোধন করে বলছে, 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

'না, না, তিমিরে হতে যাবে কেন।' বন্দনা এল হাসতে হাসতে: 'এই দেখ পদোন্নতি।' বলে হাতভরা এক গোছা চাবি দেখাল। হাতের তালুতে নাচাতে লাগল।

'তার মানে?'

'আমিই এখন ভাঁড়ারের মন্ত্রী, পরিবেশনের থালা আমার হাতে।'

'বলো কী! মাছ দুধ সব তেতলায় উঠবে না তা হলে?'

'না। সংসারের ভার মা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়ের বাড়ি থেকে রেডিও গ্রামোফোন রেফ্রিজিরেটার দিচ্ছে, আরো কত কী, মা এখন ওসব নিয়ে থাকবেন, তাঁর পাঠ-পূজা নিয়ে, সভা-সমিতি নিয়ে—'

'আর কাকিমা?'

'তাঁর তো ম্যাগাজিন আর ফাংশান।'

'বলো কী, তা হলে তুমিই একমাত্র কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে তোয়াজ না করলে এক টুকরোর বেশি দু টুকরো মাছ পাচ্ছ না, এক হাতার বাইরে দুধের কড়া ঠনঠন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান ধরল প্রশান্ত: 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।'

সুকান্ত-কাকলির বিয়ে হয়ে গেল। গাছভরা ফুল, বাড়িভরা আলো, মুখ-ভরা হাসি আর মনভরা মধু।

আর দেহভরা পরমাশ্চর্যের রহস্য।

নতুন বউ বাড়ি এসেছে, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে, সমস্ত দিকদেশ ব্যাপ্ত করে উৎসবের বাজনা—এমন সময় আর্তরব উঠল, সেণ্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

'ওরে সেণ্টু, ছাখ এসে কে এসেছে।' সকলে ডাকতে লাগল উচ্চরোলে।

কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

সকলের মুখে উদ্বেগ, কোথায় গেল সেণ্টু? সমস্ত জ্যোৎস্না ঢেকে যেন কালো মেঘের উদয় হল সহসা।

বিজয়াই [illegible] খুঁজে তেতলার ঘরে খাটের নিচে নতুন জিনিসপত্রের আড়ালে মাথায় ফেটি বাঁধা লাঠি হাতে যুদ্ধের সাজে চুপ করে বসে আছে সেণ্টু। তার শত্রুরা একসময়ে যে এই দুর্গে প্রবেশ করবে সে তা বুঝে নিয়েছে এবং খাটস্থ হলেই অতর্কিত আক্রমণ করবে তারই আশায় মুহূর্ত গুনছে।

'এই যে, এইখানে সেণ্টু!' জিনিসপত্র সরিয়ে সেণ্টুকে বার করে আনল বিজয়া।

আর তার ডাক শুনে প্রায় সমস্ত সংসার, আর সকলের আগে কাকলি, উঠে এল উপরে।

'ঐ ছাখ কে এসেছে।'

তাকাবার আগেই মাথার ঘোমটাটা টেনে অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছে কাকলি। আর সেণ্টুকে ধরবার জন্যে বাড়িয়েছে দুই হাত।

'আমি যাব না ওর কাছে। ও ডাইনি বুড়ি। ও পেত্নী। শাঁকচুন্নি।' প্রবলতর প্রতিবাদ তুলল সেণ্টু।

তত্রাচ কাকলি তাকে দুই হাতে টেনে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরল।

'আমাকে নামিয়ে দাও বলছি।' নেমে পড়বার জন্য হাত পা ছুঁড়তে লাগল সেণ্টু: 'আমি তোমার কোলে যাব না। কিছুতেই না। আমি পুলিশে খবর দেব।'

'আমাকে পাচ্ছ না চিনতে?' ঘোমটা-ঢাকা অবস্থায়ই কাকলি বললে, 'আমি তোমার নতুন কাকিমা।'

আর সকলে, ছেলেমেয়েদের দল, হেসে উঠল খিলখিল করে।

'আমি নতুন-ফতুন চাই না। কাকিমা, না ফাঁকিমা। আমি আমার কাম্মাকে চাই।' কান্না জুড়ল সেণ্টু।

আর সেই মুহূর্তে কাকলির মুখের ঢাকা সরিয়ে দিল বিজয়া।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে মোহিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেণ্টু: 'এ কী, তুমি, কাম্মা?' সহসা অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি সেই খুশিকে কাকলির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

'এ কি, কাঁদছ কেন? আমিই তো এসেছি।'

ভালো করে আবার দেখবার জন্যে মুখ তুলল সেণ্টু। এবার তার কান্নাভরা চোখে হাসিভরা রোদ্দুর।

সত্যিই। সত্যিই তার কাম্মাই এসেছে।

আবার মুখ লুকোল সেণ্টু। আচ্ছন্ন স্বরে বললে, 'তুমি আর চলে যাবে না?'

'না, না, আর যাব না।' কাকলি তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল: 'তোমাকে ফেলে আর কি যেতে পারি কোথাও?'

'তবে ওরা যে বলছিল নতুন কাকিমা আসছে।'

'আমিই পুরোনো, চেয়ে দেখ, আমিই আবার নতুন।' বললে কাকলি।

সেণ্টু বুঝেছে। তার আর দেখবার দরকার নেই।